পন্থা।

তৃতীয় ভাগ (নব পর্য্যায়) অষ্টাদশ বর্ষ।

১৩২১ বঙ্গাব্দ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিষয়		লেখকগণ	পত্রাঙ্ক।
অদৃশ্য	...	... ...	৩৭৭
অন্বেষণ	...	শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেন গুপ্ত	৩৬৭
অভিসারিকা	...	,, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম, এ, বি, এল,	৬৮
অতৃপ্ত তৃষা	...	,, বিশ্বনাথ মিত্র	১৭৭
অরুচি	...	... ..	২১৪
আমাদের অষ্টাদশ বৎসর		,, রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,	২
আমার মা	...	... ...	২৫৭
আকিঞ্চন	...	শ্রীমতী লীলা দেবী	৩৮
আর কি আসিবে না	...	... ...	২৮০
আবাহন	...	... ...	২৯৫
আসিবে	...	... ...	৩০০
আমি ভক্তি বাঁধনে বাঁধিব		শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মিত্র	৬১১
আত্মতত্ত্ব	...	,, হেমচন্দ্র মিত্র	১৩৮, ৩৬৮, ৫৩১
উদ্বোধন	...	,, চিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী	১৩৬
উৎসর্গ	...	,, প্রসন্নকুমার দাস	৪৪৯
উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ভূমা		,, হেমচন্দ্র মিত্র	৮০, ১৫২, ২০৩, ৪১৬
উর্দ্ধবাহু	...	,, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১২১, ১৮৫
ঔপনিষদিক দর্শন ও যোগমায়া		,, প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,	৭৫
কঃ পন্থা	...	,, রামসহায় কাব্যতীর্থ	২১০

বিষয়		লেখকগণ		পত্রাঙ্ক।
কেন	...	,, প্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ,		৬১৮
কে তুমি	...	...	...	১৮
রূপাময়ী	...	শ্রীমতী লীলা দেবী		২৭৭
শ্রীশ্রীকালীরূপ বর্ণন	...	শ্রীচিন্তা ...	...	৩৫১
গঙ্গাস্নানে	...	✓শ্রীযুক্ত হরিকৃপা চৌধুরী		১০০
চন্দ্রালোকে বারাণসী	...	,, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম, এ,		৬০৪
জড় প্রেম	...	,, শশধর মৈত্র		৪৫৫
জানা	...	...	...	২৪৩
জৈন দর্শনম্	...	,, ঈশ্বরচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শন-তীর্থ শাস্ত্রী		৬১২
জ্ঞানই প্রেম বা প্রেমই জ্ঞান		...	...	৫১৭
জ্ঞানই অগ্নি	...	...	...	১৯৩
জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে	...	...	...	৪৩৩
জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি		শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ		২৫২
তোমায় ছাড়িয়ে	...	, রমণীরঞ্জন সেন গুপ্ত		৩৬৭
দ্বাদশী ব্রত	...	"দিশেহারা"		৫৪৮
দুর্গারাণী	...	,, অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল,		৩৩৪, ৪১০, ৪৮০
দোল	...	...	...	৫৩০
ধর্ম্মপথ	...	শ্রীযুত হৃদয়নাথ মিত্র		২৪
পন্থা	...	,, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		২১৩
পাগলের প্রলাপ	...	...	...	৩০৬
পূজার ফুল	...	,, চিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী		১৯৩
প্রলাপ	...	,, বিধুভূষণ সেন গুপ্ত		৪৪৫
প্রণয়রহস্য	...	,, খগেন্দ্রনাথ অলব্ধ-বেদান্ত		৮৬, ১৫৮
প্রত্যাবর্ত্তন	...	,, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম, এ, বি, এল,		১৯৭
প্রায়শ্চিত্ত	...	,, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		৫৯৮
প্রেমময়	...	...	...	৩০৬

বিষয়		লেখকগণ		পত্রাঙ্ক।
বিদ্যাবিলাস	...	,, বামাচরণ বসু		২৯৬, ৩৮০
বিশেষ নিবেদন	...	...	...	৫৮০
বিশেষ দ্রষ্টব্য	...	...	...	৬১৯
ভক্ত	...	,, প্রসাদ		৪৪৫
ভক্তিসুধালহরী	...	,, অতুলচন্দ্র সেন		৪৩৫
ভক্তিতত্ত্ব	...	...	...	৫০৩
ভাগবতের উপদেশ	...	,, যোগানন্দ ভারতী		৫০৩৯, ১৪৭
ভাষাতত্ত্ব	...	,, ঈশ্বরচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ শাস্ত্রী		৬১২
ভারতে লিঙ্গপূজা	...	,, অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ,		২২১
বসন্তে কাতরা	...	,, সারদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়		২৫১
বাসহীন ফুল	...	,, মানময়ী দেবী		৯৪
বাঞ্ছারামের খবর	...	,, অরূপচাঁদ গোস্বামী		৬২
ব্রাহ্মণ	...	,, জগত্তারণ দাস		১২০
ব্রহ্মচর্য্য	...	,, বিধুভূষণ সেন গুপ্ত		৬০৫
বিরহে	...	শ্রীমতী লীলা দেবী		৬১৭
বিপ্রলব্ধা	...	শ্রীযুত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল,		৮, ১২৯
ভোগ ও ত্যাগ		শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী		৩০৮
ভ্রান্তি	...	,, হৃদয়নাথ মিশ্র		৩৮৬
মহামায়ার খেলা	...	,, সুরেন্দ্রনাথ দাস		৫৫, ১০৯, ২৩২, ৫৭৩
মহাপূজা	...	,, সম্পাদকয়োঃ		২৮২
মায়ের পূজা	...	,, বিশ্বনাথ মিত্র		৩১৪
মিশামিশি	...	শ্রীযুক্তশিবপ্রসাদ কাব্যতীর্থ এম, এ, (ভট্টাচার্য্য)		১৬৫
মিলনের সময়	...	...	...	৪৩৪
মুগ্ধ	...	শ্রীমতী ক্ষিরোদকুমারী ঘোষ		৫৯৪
মৃত্যুপথ	...	শ্রীযুত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়		১০১, ৪৬৮
মোক্ষ	...	,, কস্যচিৎ ভট্টাচার্য্যস্য		১৯৭, ২৭৭
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস		৬৬

বিষয়	লেখকগণ	পত্রাঙ্ক।
মুখসপরা ...	... ...	৭৫
যমুনা বিহার ...	... ...	৫০১
যাজ্ঞবল্ক্যগার্গী সংবাদ	,, রামসহায় কাব্যতীর্থ (ভট্টাচার্য্য)	৩০১
রাই বিরহিণী ...	,, শরচ্চন্দ্র	৫৯৫
শক্তিতত্ব ...	,, ঈশ্বরচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ শাস্ত্রী	৪০০
শিবাষ্টক ...	,, চিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী	১
শিবসঙ্গীত লহরী ...	,, হরিকৃপা চৌধুরী	৫৮১
সাধনার পথে ..	,, প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,	১৯, ১৩০, ৫৮০
সাধনার বিঘ্ন ...	,, হৃদয়নাথ মিশ্র	৪৬২, ৫৮৩
সমালোচনা ...	... ...	৫৭৯
সমস্যা ...	,, যতীন	৩২
সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে ...	,, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (কাব্যতীর্থ) এম, এ,	৩৯
সর্ব্বাত্মিকা ...	,, চিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী	৬৫
সংযম ও চিত্তশুদ্ধি ...	,, প্রসন্নকুমার দাস বি, এ,	৯৫
সহজ যোগ ...	,, যোগানন্দ ভারতী	১৬৬
স্বামীজীর সংবাদ ...	,, ঐ	২৫৯
স্বামীজীর শ্যামাপূজা	,, ঐ	৩৫৪
সন্দেহ ও তাহার নিরাকরণ	,, নিবারণচন্দ্র নন্দন	৩১৮
মন্মোহন বিদ্যা ...	,, দেবেন্দ্রনাথ রায়	৪৫৬
শুদ্ধ ...	,, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম, এ, বি, এল,	৪১৫
হরিদ্বার ...	শ্রীযুক্ত পান্নালাল সিং	১৭৮,২১৫,৩৯৬,৪৫১,৫৬১
হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	,, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ	৪১, ১১৬
হিন্দোল লীলা —	,, গোবিন্দ পাল	২৫৮

তুলসীতলায়—

শ্রীজ্যোতিম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ। বৈশাখ, ১৩২১। ১ম সংখ্যা।

মোক্ষ]

শিবাষ্টকম্।

(Iconographical)

জবাকুসুম দল, রাতুল চরণতল
    নখনিকর পূর্ণ শীতকর ভাতি।
অঙ্গুলি মনোহর সিত শতদল-দল
    জ্যোতি বিভাসিত সুন্দর কাঁতি ॥১॥
পীন মীন-অঙ্গ, সুবলিত জঙ্ঘ
    কর্কট প্রতিকৃতি বর্ত্তুল জানু।
ন্যুব্জিত নব রাম-রম্ভা সুবলিত
(গুরু উরু যুগল সহোদর যমল)
কৃত্তিবসন-বদ্ধ সুমিলিত তনু ॥২॥
মৃগেন্দ্র কটিপর, গোমুখ তনুবর
    বলী বেষ্টিত গভীর নাভি শম্বু।
বিলম্বিত শুণ্ড-যুগ করি-তুণ্ড
    বিমুখীকৃত ধৃত কণ্ঠ কম্বু ॥৩॥
রজত-গৌরতনু জ্যোতি জিত কোটীভানু
    নীলমণি-দ্যোতি জিত কবাট বক্ষ।
ফণিমণি মণ্ডিত ফণিরাজ গণ্ডিত
    কঙ্কাল কপাল মালা শোভিত অঙ্ক ॥৪॥
আজানুলম্বিত বালক-দলীযূথ,
    ভক্ত-কৃপা-কর বেদ-ভুজ সুন্দর।
যুগ-কমল-দ্বন্দ্ব, অঙ্গুল চম্পক ছন্দ
    ধৃত অভয় বর-পরশু-মৃগবর ॥৫॥
ধুতুরাক্রান্ত গণ্ডল, স্মিত মুখমণ্ডল,
    চ্যুত বীজদল জিত চিবুক চারু।
অধর বন্ধূক-জিত, নাশা শুক চঞ্চু জিত,
    নিম্বপত্র দ্বন্দ্ব-জিত যুগ্ম ভুরু ॥৬॥
অরুণ করুণাময়, কমল নয়নদ্বয়
    আকর্ণ-লম্বিত আধ নিমীলিত।
শশি-খণ্ড-বিমণ্ডিত ভাল ধনুষাকৃত
    তৃতীয় লোচন বিভূষিত ॥৭॥
মৃদুনাদ কল্লোলিত, সুর-তরঙ্গিণী স্নাত,
    শিরধৃত পিঙ্গলজটাকলাপং।
নমামি মহেশং গবেশং গণেশং
    মকাররূপ হর মহাপাপং ॥৮॥

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী।

মোক্ষ] আমাদের অষ্টাদশ বৎসর।

ওঁ অধ্যাত্মনে নমঃ হরিঃ ওঁ।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥

সেই দিব্য, অমূর্ত্ত, বাহ্য এবং অভ্যন্তরে একরূপে অবস্থিত, অপ্রাণ, অমন, অজ, শুভ্র, অক্ষর হইতে পর, পুরোষোত্তমের চরণকমলে আমাদের "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈ বুদ্ধ্যাত্মনা অনুস্মৃতি স্বভাবাৎ"—কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়গ্রাম, বুদ্ধি ও 'আমি' জ্ঞানদ্বারা,—অনুস্মৃতি ও স্বভাব কর্তৃক প্রণোদিত, গতবর্ষের কৃত কর্ম্ম-প্রসূন সকল ভক্তি-চন্দনচর্চ্চিত হইয়া অর্পিত হউক! আশা এই যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমাদের কৃত কর্ম্মসকল পুরুষোত্তমের পরমপাবন শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে ও সেই পরমাকর্ষক পরমতত্ত্ব যেন আমাদের বুদ্ধির প্রেরণা করেন। ওঁ তন্নো ধীয়ো প্রচোদয়াৎ ওঁ।

গত বৎসর আমরা সেই বেদ নিহিত, বেদবেদ্য পুরুষের প্রীতি কামনায় 'পন্থার' গতি স্বরূপ তাঁহাকে লক্ষ্য করত, চতুর্বর্গ জ্ঞানফল ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের মধ্য দিয়া তাঁহারই মহিমা ব্যঞ্জনা করিবার জন্য প্রেরিত হইয়া যাহা করিয়াছি, তাহাতে এক শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসের আশাতীত ফল ফলিয়াছে। অনেকেই বুঝিয়াছেন যে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার নানাত্বের মধ্যে সনাতন-ধর্ম্ম সেই শ্রীপদ অঙ্কনের জন্যই প্রয়াস করিতেছে। ফলতঃ বেদ বল, অক্ষরতত্ত্ব বল, যজ্ঞ বল, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম্ম ও গতিই বল, এ সকলে সর্ব্বভাবে সেই সর্ব্বাশ্রয় ঘন একরূপ বাসুদেবই একমাত্র লক্ষ্য ও বেদ্য। তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়া দেখিলে, বেদও অবিদ্যা-প্রসূত হইয়া যায়। শুভ্র হইতেও শুভ্রতর তাঁহার জ্যোতি হৃদয়ে না ফুটিলে যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, সকলই কেবল ভেদাত্মক অহঙ্কার প্রসব করে। তাঁহার ইঙ্গিত দেখিতে না শিখিলে, জ্ঞান অজ্ঞানরূপে পরিণত হয়; তপস্যা বৃথা শ্রম ও 'খাটা খাটুনী' হইয়া যায়; ধর্ম্ম সমগ্র জগতের একত্ব সংস্থাপন না করিয়া ব্যক্তিগত অহঙ্কারের সোপানে পরিণত হয়; এবং পরাগতি নিত্যসিদ্ধ মোক্ষতত্ত্ব অবিদ্যা কল্পিত ক্রমমুক্তি ও ক্রমোন্নতি রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। যে নিত্য-শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরম তত্ত্বে নিত্য অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, যে জ্যোতি মনের মননে, কামের

প্রেরণায়, ইন্দ্রিয়ের আভাসে, বুদ্ধির অধ্যবসায়ে, এক ও সমরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, যে ভগবানের প্রেমের আকর্ষণে অণুগুলি (attraction and repulsion) আকর্ষণ ও বর্জ্জনরূপ ভাষায় অস্ফুট বাক্যবিন্যাস করিবার প্রয়াস করিতেছে,—সেই স্বতঃসিদ্ধ ভগবান্‌কে আমরা ভেদের মোহে ক্রিয়া, প্রযত্ন ও সাধনার শেষ ফল (last term) ভাবিয়া ফেলি। আমাদের এমন মোহ যে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে, তিনি যে সর্ব্বময়, তাহারই আভাস জ্ঞাপনার্থে সৃজিত পথপ্রান্তে প্রস্ফুটিত অবিদ্যা তরুর প্রসূন সকলে সমাকৃষ্ট হইয়া পরম গতির কথা ভুলিয়া যাই। কেহ যোগ, কেহ তপ, কেহ শাস্ত্রাভ্যাস, কেহবা সাধন ভজন, ইত্যাদি বাহিরের বস্তু ও ভাব গুলিকে হৃদয়ে তুলিয়া লই। 'পায়ের নূপুর পরিয়া গলায়, গলার হার মোরা পরে থাকি পায়।'

সেই পরম ভাব ভুলিয়া গিয়া "ভাব্ ভাব্ ডুমুরের ফুল" গুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করি, এবং প্রত্যেকটিকেই সেই অমেয়, পর, নিষ্কল তত্ত্বের পরিমাপক, প্রাপক ও একমাত্র ব্যঞ্জনা বলিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বগল বাজাইয়া সম্প্রদায় গঠনে প্রবৃত্ত হই। সেই অগতিরূপ গতি, সেই অবাধ্য, আনন্দের আনন্দ-স্বরূপ শ্রীনন্দনন্দনকে বিশিষ্ট ভোগাত্মক কর্ম্ম ও প্রযত্নের ফলরূপে কল্পনা করিয়া ক্রমোন্নতির মার্গে তাঁহাকে পাইতে চেষ্টা করি। যাঁহার আভাসে বিশ্ব প্রতিভাসিত, যাঁহা দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্ব সকল উজ্জীবিত হইয়া সদাই যাঁহাকে পাইবার জন্য ছুটিতেছে, যিনি ইন্দ্রিয়ে, কামে, মনে ও বুদ্ধিতে নিত্য লীলা-পরায়ণ, ভাই! তাঁহাকে পাইবার জন্য এত প্রয়াস,—এত কষ্ট কল্পনা কেন? যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং, তাহাকে লাভ করিবার জন্য নির্দ্দোষী ইন্দ্রিয়গণকে এত পীড়ন কেন? যাঁহার বীজ কাম,—কাম যাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য 'রূপ'সাগরে ডুবিয়া যাইতে সদাই চেষ্টিত, সেই শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য একদিকে কামের নিষ্পেষণ, ও অপরদিকে রূপভোগাকৃষ্ট হইয়া 'বেনামী ভাবে' কাম-সেবন কেন? কাম কি আর কামপতির পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত দেয় না? মন তাহার 'সর্ব্ব' সংগ্রাহক বা 'সঙ্কল্প' বৃত্তিব মধ্য দিয়া, 'বিকল্প'বৃত্তির দ্বারা যে পরম বিশেষের ইঙ্গিত করে, তাহা না বুঝিয়া যেমন প্রিয়জনের মনুষ্যরূপ সামান্য ভাবের মধ্য দিয়া অভিনব উপায়ে এক বিশেষ পরিপূর্ণতার আভাস আছে বলিয়াই প্রিয়জনকে মনুষ্য বলিয়া জানিলেও তাহার ভিতরে কি এক বিশেষের ইঙ্গিত দেখিতে পাই,—এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া কেন বেচারী মনকে ও তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্মকে জোর করিয়া নিরোধ করিবার চেষ্টা

করি ? যে মনের সঙ্কল্পশক্তির সাহায্যে চন্দ্রকিরণচ্ছটার দ্বারা শ্রীভগবানের নখজ্যোতি কল্পনা করি ও যাহা কর্তৃক উপদিষ্ট আধার তত্ত্বের সাহায্যে শ্রীপদের ইঙ্গিত পাই, যে মনস্তত্ত্ব এইরূপে 'সর্ব্বভাব' সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে কি কৌশলে 'সর্ব্বের' অতীত ও অতিগ বিশেষের স্থাপনা দ্বারা বিরজার পরপারে স্থিত পরম বিশেষের ইঙ্গিত করে, তাহাকে অহঙ্কারের ও ভেদবুদ্ধির মন্দান্ধকারে শত্রুরূপে কল্পনা করিয়া এত মল্লযুদ্ধের প্রবৃত্তি কেন ? যে বুদ্ধির সাহায্যে জগতের অনন্ত বিরুদ্ধ ভাবরাশিকে আধাররূপ একত্ব জ্ঞানে সমাহৃত করিয়া রাখি, যাহার সহায়ে আমার পুত্ররূপ আধারে পাপ ও পুণ্য এমন করিয়া মিশাইয়া দিই যে তদ্দ্বারা মূলভাব পুত্রত্বের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না,-- পুত্রটি পরম ধার্ম্মিক বা পাপিষ্ঠ হইলেও 'আমার পুত্র' এই একত্ব বুদ্ধির অপলাপ হয় না, সেই বুদ্ধিতত্ত্ব বিভিন্ন বৃত্তি, নামরূপ প্রভৃতি বিভিন্নভাব গুলিকে কি আশ্চর্য্য কৌশলে এক অধিকরণ জ্ঞানে পরিসমাপ্ত করিয়া দিয়া বৃত্তি-খেলার অতীত এক স্থির সত্ত্বার ইঙ্গিত করে, সেই বুদ্ধিতত্ত্ব কি আমাদের শত্রু ?

আমাদিগের এই মোহের কারণ কি ? যে পুরুষের অয়ন পুরুষোত্তম পুরুষকে প্রাপ্ত হইলে নাম রূপ ও হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, তাঁহারই দিকে চাহিয়া পথ চলিতে যাইয়া আমরা এই মোহে নিমজ্জিত হই কেন ? দেশে 'ত' শাস্ত্রগ্রন্থের অভাব হয় নাই ; ব্রাহ্মণগণ ত' এখনও সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রচর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই ; হিন্দু সন্তান ত' এখনও গুরু, জপ, তপ, সাধনা প্রভৃতি বর্জ্জন করেন নাই ! তবে কি দোষে আমাদের সনাতন পন্থা হইতে এত অধঃপতন হইতেছে ? ইহার একমাত্র উত্তর অদ্বৈত বুদ্ধির ও একত্ব জ্ঞানের অভাব, এবং ভেদ-বুদ্ধি অহঙ্কারের প্রভাব। অদ্বয় বুদ্ধি কথাটি শুনিয়া যেন ভক্তগণ চমকিয়া উঠেন না। যে "অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব" মহাপ্রভু "ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন" নামে অভিহিত করিয়াছেন, যে অদ্বৈত জ্ঞানই শ্রীভগবানের রূপ, সেই জ্ঞানে কি ভক্তির অপলাপ হয় ? অহঙ্কারে বদ্ধ জীব সর্ব্ব ব্যাপারেই আপনার বিশিষ্ট অহঙ্কারটীকে সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়। আধুনিক ভক্তগণ ভুলিয়া যান যে অহঙ্কার তত্ত্বটি তাঁহাদের বিশিষ্ট অহং স্থাপনের জন্য নহে ; উহা এই পরম বিশেষ অদ্বয় তত্ত্বকে দেখাইবার জন্যই রহিয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ভগবান্‌কে সুধু 'আমার' করিলেই হইবে না, তাঁহাতে 'আমি'টী পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যোগপরায়ণ যোগী তাঁহার স্থূল দেহটীকে 'আমার' না ভাবিয়া, সর্ব্বাত্মিক নিয়মের বশানুবর্ত্তী হইয়া, সাদরে দেহবুদ্ধি ভগবানের বৈশ্বানর তত্ত্বে আহুতি

প্রদান করিলে যেমন বাস্তবিক দেহটী ধ্বংস হয় না,—কেবল তাহাতে তাহার কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হইয়া 'গতি ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী' ভগবান্‌কেই তাহার পতিত্বে বরণ করা হয় এবং যেমন সেই দেহের প্রত্যেক কার্য্যই পরম অদ্বৈত ভগবানের প্রকাশক হয়,—মহাপ্রভু যেমন সাধকরূপে আপনাকে শ্রীভগবানে সমর্পিত করিবা মাত্র তাঁহার তত্ত্বগুলির ভিতর দিয়া সেই কালশশীর প্রকাশ হইত,—সেইরূপ মিথ্যাভূত ভেদাত্মক 'আমি' জ্ঞানটীকে শ্রীভগবানে অর্পণ করিলে ভেদাত্মক 'আমি' জ্ঞানের তিরোভাব হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত 'আমি' জ্ঞানের অভাব হয় না। ভক্তি ভিন্ন ত্যাগ বা অর্পণ করা যায় না। সে ভক্তিতে আর ছোট 'আমি'টী রাখিবার চেষ্টা থাকে না। সত্য বটে এই প্রকৃত ভক্তির উদয় হইবার পূর্ব্বে, জীব শ্রীমতীর ভাষায় বলে,—

ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে, কে আর আমার আছে।
রাধা ব'লে আর দাঁড়াইতে নাই জুড়াব কাহার কাছে ;—

সত্য বটে, সেই কোমল-শ্রদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ হইলে, সে

করইতে কোরে ধনি মোড়সে অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনে জনু বাল ভুজঙ্গ ;—

সত্য বটে, ভগবানের চৈতন্যের স্রোতে পড়িলে তাহার ভয় হয়, বুঝি বা সাধের 'আমিটী' হারাইয়া যায় ও কত যুগের সংস্কারপুষ্ট ভেদাত্মক 'আমি' জ্ঞানটী ত্যাগ করিতে হইলে ভীতির আবেশে মধুরাদপি মধুর ভগবান্‌কে ভীষণং ভীষণানাং বলিয়া মনে হয়,—কিন্তু ঐ দুঃখ, ঐ ভয়, ভেদাত্মিকা গুণময়ী প্রকৃতির শেষ চেষ্টা মাত্র। উহা সংস্কার-জন্য। প্রায়ই এইরূপ সংস্কার-জন্য ভয় দেখা যায় ; স্বেচ্ছায় ত্রিলোক বিচরণক্ষম সাধুও স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিবার সময়, মৃত্যুর সময়, কখনও কখনও একটু বিচলিত হয়েন। ভূতযোনি লইয়া খেলা করিতে সক্ষম ব্যক্তিরাও অনেক সময়ে ভূতের ভয় পায়। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবও এই চরম সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়া সেই মিথ্যা ভীতি নাশের জন্য "নহি হম্ তুঁহু তুঁহু" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। সেইজন্য ভক্ত কবি বিদ্যাপতি বলেন,—

তিল আধ দুঃখ, জনম ভরি সুখ।
তব ধনি কাহে তুহুঁ মোড়সি মুখ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহু রসসাগর মুগধিনী নারী ॥

এইরূপে যখন ছোট 'আমি'টী ছাড়িয়া দিবে, তখনি দেখিবে যে তোমার ভিতর

দিয়া 'জ্যোতিষামপি তদ্‌জ্যোতি' চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন এক মহান্‌ 'আমির' আবির্ভাব হইতেছে। তখন দেখিবে,—

ফুটে উঠে রূপ গগনে ভূতলে, আনন্দ স্বরূপ ফুটে জলে স্থলে।

তখন দেখিবে সমস্ত জগদ্বস্তু,—

স্বরূপ পরশি, ত্যজি নামরূপ 'কাল'রূপে যায় মিশে।
বস্তু, ক্রিয়া, ভাব নির্ব্বিশেষে তাঁর বিভব সদা প্রকাশে।

তখন বুঝিতে পারিবে—'চিরদিনে বিহি আজি পূরল আশ,
হেরইতে নয়নে নাহি অবকাশ।'

ইহাই ভাগবতের দ্রব্যাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত ও ভাবাদ্বৈত সাধনা। এই সম্বন্ধে গত বৎসরে আমরা কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই তিনটীই 'পন্থা'র একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র। 'পন্থা' কোনও বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের পত্র নহে। উহা সনাতন ধর্ম্মের সনাতন স্তরগুলি দেখাইবার জন্য প্রয়াস করিতেছে। বাস্তবিক যাঁহাকে দেখাইবার জন্য আচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, মহাপ্রভুর ভক্তিমার্গও তাঁহারই জন্য; কেবলমাত্র কথার প্রভেদ ইহাই আমাদের বিশ্বাস। সেই মহান্‌ ঘন একের প্রকাশরূপ বিশ্বের মধ্যে সর্ব্ববস্তু, সর্ব্বদর্শন ও সর্ব্বপ্রকার পন্থাই সেই একের আত্মস্ফূরণ বা আত্ম-প্রকাশের কৌশলমাত্র। সেই জন্য 'পন্থা' ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মধ্য দিয়া সেই এককে দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিবে। সেই সনাতন তত্ত্বই সনাতন ধর্ম্মের একমাত্র বেদ্য, গতি, ও আশ্রয়। তিনিই নরের অয়ন—নারায়ণ। তিনিই নররূপে সামান্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, ও বিশেষভাবে গুরু-কল্পতরুর মূল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসরূপে স্বকীয় শাস্ত্রযোনিত্ব ভাব সংরক্ষণ করেন। তিনিই বিদ্যা, ভারতী বা সরস্বতী-রূপে বেদ প্রসব করত ত্রয়ীরূপে বিবিধ ভেদের মোহ নাশ করেন ও অনির্ব্বচনীয় কৌশলে ভেদের মধ্যে অভেদের ইঙ্গিত করেন। তা'ই এস ভাই! জ্ঞানী, কর্ম্মী ও প্রেমিকগণ, পন্থার লেখক ও পাঠকগণ, অদৃশ্যরূপে অধিষ্ঠিত ও প্রেরয়িতা ঋষিগণ বিবিধ শাস্ত্রের মধ্য দিয়া যাঁহাকে উপদেশ করিবার জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ও জীবহৃদয়ে গুরুশক্তিরূপে নিত্য বিরাজ করিতেছেন, সেই দ্রষ্টাগণের উপদিষ্ট সনাতন মার্গে চলিবার জন্য প্রস্তুত হই, ও একবার প্রাণ ভরিয়া বলি,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

কিন্তু দেখিও সেই সমগ্র 'নরের অয়নকে' যেন তোমার রুচি ও সংস্কারদুষ্ট

পার্থক্যের সাম্প্রদায়িক দেবতা করিয়া তুলিও না। তিনি যে ভাই সকলেরই গতি; তাঁহাকে বাদ দিয়া ত' কেহই থাকিতে পারে না। দেখিও সেই পরম কারুণিক ভগবানের, প্রকাশস্বরূপ, ব্যাসদেব-প্রমুখ ঋষিদিগকে যেন সম্প্রদায়-স্থাপয়িতা গুরু বলিয়া না ভাবি! কারণ তাঁহারা ত'

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং;—

তাঁহাদিগকে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভক্তিভরে প্রণাম করি। দেখিও ভাই যেন শুষ্ক মস্তিষ্কালোচনার কচ্‌কচিতে ভারতী দেবীর বিদ্যাভাববিশিষ্ট মতের পরিপোষণের জন্য প্রয়োগ করিও না; সেই তৃষ্ণারূপিণী আনন্দরূপিণী মহামায়াকে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ও আনন্দের তৃষ্ণায় হারাইয়া ফেলিও না। সেইজন্য আমরা দ্বিতীয় স্তরে সেই সর্ব্বপ্রকাশিকা কৃষ্ণপ্রদায়িনী শিবা কাত্যায়নীদেবীর সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যাভাব দেখাইবার চেষ্টা করিব। সত্য বটে আমাদের বিদ্যা নাই, আমরা অখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারি নাই, পাণ্ডিত্য নাই; কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যদি আমরা প্রত্যেক বৃত্তির মধ্য দিয়া কেবল শ্রীভগবান্‌কেই দেখিতে চাই, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় তাঁহার ইঙ্গিত নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব। যিনি মুগ্ধ দম্পতির মধ্য দিয়া, ভেদাত্মক লৌকিক প্রণয়ের ভিতর দিয়া আপনার প্রেমময় ভাব সদাই প্রকাশ করিতেছেন, যিনি জীবহৃদয়ে অহং-সংরক্ষণের প্রবৃত্তিরূপে আপনারই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি প্রকট করিতেছেন, তিনি ত' জগৎ ছাড়া কিম্ভূত-কিমাকার পদার্থ নহেন; তাঁহার ত' ভেদভাব নাই, তাঁহার ত' মোহ নাই, তাঁহার ত' আবরণ নাই; তিনি যে বড় সুলভ, তিনি যে নিত্য সিদ্ধ ও স্ব-প্রকাশ, তাঁহার কৃপায় বিশ্ব সদা উজ্জীবিত রহিয়াছে। তিনিই আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা; তিনিই আমাদের বিদ্যা, তপস্যা ও গতি।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

বিপ্রলব্ধা।

(গীত গোবিন্দ)

১

উয়ল চিত-হর, চাঁদ গগন পর,
বিহিত সময় চলি যাতি।
সুখয়িতে মরমে, কানন-পথ মে,
জীবন-কান্ত ন আতি ॥

২

বিফল ভেল মঝু, নিরমল যো কছু,
এ নব যৌবন-কাঁতি ॥
বঞ্চল অব যঁহু, শরণ যাব কঁহু?
পহু বিনু ফাটত ছাতি ॥

৩

যঁহু সুখ-মেলন, কাময়ি কানন,
আওলু যামিনী মাহ।
মদনক শায়ক, হানল হিয় পর,
নিরদয় সো মঝুনাহ ॥

৪

চেতন বিগলিত, বিফল কলেবর,
লাগব অব কতি কাজে?
বিরহ অনল হাম, সহব কোন কাম,
বিধুরে মরণহি সাজে ॥

৫

অহহ! সুভাগিনী, আজু কোই কামিনী
ভুঞ্জত মঝু পিয়-সঙ্গ?
ইহ মধু যামিনী, বিফল করল চিত
ডারয়ি গরল-তরঙ্গ ॥

৬

নিষ্ফল ধারণ, কঙ্কন-ভূষণ,
দূর রহল যব কান।
হরি-বিরহানল, তাপয়ি সো সব,
অব মঝু দহই পরাণ ॥

৭

মণি-ভূষণ কিয়ে? কুসুম-হার হিয়ে,
বিষম-মদন-খর-বাণে।
কোমল ফুল সম, খেদই তনু মম,
বিরহক বেদন দানে ॥

৮

বেতস কণ্টক, পূরিত বনপথি
যছু লাগি ধরলুঁ পরাণ।
—ভনই ভুজঙ্গম—হরি! হরি সো ধন
অব মুঝে ভুজগ সমান ॥

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

উয়ল—উদিল,
সুখয়িতে—সুখ দিতে,
আতি—আসিতেছেন,
ভেল—হইল
যোকছু—যেকিছু
কাঁতি—কান্তি
বঞ্চল—বঞ্চনা করিল,
কঁহু—কাঁহার,
পহু—প্রভু,
কাময়ি—কামনা করিয়া,
মাহ—মধ্যে
নাহ—নাথ
কতি—কোন্,
করল—করিল,
ডারয়ি—ঢালিয়া,
তাপয়ি—তপ্ত করিয়া
সো সব—সেই সকল অলঙ্কারকে
মঝু—আমার,
দহই—দগ্ধ করিতেছে,
খেদই—খিন্ন করিতেছে,
যছু—যাহার,
ভনই—ভনিতেছে,
মুঝে—আমার নিকট,
অব—এখন।

ভাগবতের উপদেশ।

(গত বৎসর ফাল্গুন সংখ্যার পর।)

আমরা গতবারে ভগবৎ সাধন-পথের দুইটী স্তর দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রথমটীতে আমিটীর মধ্যে 'স্ব' বা 'পর' ভগবৎ সত্ত্বার দর্শন হওয়া আবশ্যক। তারপর দ্বিতীয় স্তরে সেই মহান্ সত্ত্বায় অহংটিকে সম্পূর্ণ নিবেদন করিতে হয়। ইহাই নিমিরাজার প্রশ্নে শ্রীহরি ঋষির উপদেশ ;—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ভাগবৎ ১১।২।৪৫

প্রথমটীকে লক্ষ্য করিয়া Light on the Path নামক অসাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলেন "Seek the way by retreating within; for within you is the Light of the world, the only light that can be shed on the Path."

ভাবিয়া দেখহ এ তিন ভুবনে কে আর 'আমি'র আছে।
বাহ্য ভাবে নাই সমাপ্তি তাহার, কেন ছুট তা'র পাছে?
তোমাতে মিশিয়া অখিল জগত, দেখ, সদা হয় স্থির।
'আমি'তে মিশিছে নাম রূপ ত্যজি, সলিলে যেমত নীর।
তোমাকে লইয়া শকতিনিচয় অশেষ খেলিছে কত।
অতল 'আমিতে' মিশিছে দেখহ সকল সাধন পথ।
সুখ দুঃখ আর পাপ পুণ্য আদি 'আমি'কে লইয়া সব।
জগতের যত কোলাহল সব 'আমি'তে হয় নীরব।

এইরূপে যখন 'আমি'টীকে অদ্বিতীয় পরাগতি বলিয়া চিনিতে পারা যায়, যখন দেখা যায় যে ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য, ইহারা সেই 'আমি'রূপ অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রের তরঙ্গ মাত্র,—তাহাতেই উঠিয়া তাহাতেই নিঃশেষে মিশিয়া যায়, তখনই জীব অভয়ের বাণী শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠে,—

খুঁজিয়া খুঁজিয়া পথ পাওয়া গেছে, ভয় কি আমার আর।
'আমি'র ভিতরে পেয়েছি দেখিতে করুণ পদাঙ্ক তাঁ'র।

এই অবস্থাতেই খ্রীষ্টীয় সাধক আনন্দে বলিয়া উঠেন,—I am redeemed. ইহারই আকর্ষণে বৈষ্ণব বলিয়া উঠেন "গৌর হরি নাম এনেছে,ভয় ঘুচে গেছে।" রামপ্রসাদ ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া গাহিলেন,—

"ছুঁওনারে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যদি বল ওরে শমন আমার জাত গেল কিসে,
'আমি' ছিলাম গৃহবাসী, কেলে 'সর্ব্ব'নাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।"

তখন ত' আর 'সর্ব্বের' মোহ নাই; তখন 'সর্ব্ব' ঘন হইয়া আমিতেই মিশিয়া যাইতেছে। ইহাই পূর্ব্বরাগ বা ভগবানের অনুগ্রহাবস্থা; তিনি অণুরূপে 'আমি'কে গ্রহণ করেন বলিয়া সেই অনুগ্রহে 'সর্ব্বে'র নাশ হয়।

যস্যানুগ্রহমিচ্ছামি তস্য 'সর্ব্বং' হরাম্যহম্।

ইহাই ভাগবতের "দৃষ্টেবাত্মনীশ্বরে"। ইহাই—প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্ব সংস্থাপন নিবন্ধন 'সর্ব্ব'ভাব পরিত্যাগরূপ যোগের অবস্থা—

একত্বং প্রাণমনসোরিন্দ্রিয়াণাং তথৈব চ।
'সর্ব্ব'ভাব পরিত্যাগো যোগ ইত্যভিধীয়তে॥ মৈত্রায়ণ শ্রুতি।

সর্ব্বাত্মিকা মহাবিদ্যা কাত্যায়নী দেবীর প্রসাদ ব্যতীত এই স্তর সিদ্ধ হয় না; ইহাই বিদ্যাতত্ত্ব।

তারপর 'আমির'ভিতর পরাগতি দেখিতে পাইয়া সাধক, যখন সেই গতিটীকে শ্রীভগবানেই পরিসমাপ্ত দেখিতে পান, তখন আত্মতৃপ্ত 'সর্ব্ব'ভাব হইতে বিচ্যুত ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে পরপুরুষকে দেখিতে পাইয়া তাহাতে'আমি'টিকে হারাইয়া ফেলিতে হয়। Light on the Path এ সম্বন্ধে বলেন, "Seek the way by boldly stepping forth beyond", আমির অতিগ পর শ্রীভগবানে এইবার অকুতোভয়ে ঝাঁপ দিতে হইবে; ইহাই বৈষ্ণবগণের রাধা-ভাবের সাধনা। আর 'আমি' নাই, কেবল তিনিই আছেন। সেই শ্রীরূপসাগরে এইবার আত্মতত্ত্ব ও আত্মরূপ মিশিয়া যাইবে। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন,—

* * * নমুক্তির্ন মেয়ম।
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহহম্ শিবোহহম্॥

বিশিষ্ট 'আমি' নাই বলিয়া, আর 'আমি মুক্ত' বা 'আমি বদ্ধ' জ্ঞানটীও নাই; আছে কেবল সেই চিরসুন্দর মদনমোহন। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবৎ বলেন,—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাপ্যরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরেঃ।

বিশেষ আমি জ্ঞানে পরিপুষ্ট মুনিগণ ক্ষুদ্র 'আমি'-বন্ধন মুক্ত হইয়া উরুক্রম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; গুণময় হরির গুণই এই প্রকার। সমুদ্রাভিসারিকা পয়ঃপ্রবাহিনী যখন তাহার পরম বিশ্রাম ভবনে উপনীত হয়েন, তখন আর তাহার কুল, শীল, মান কোথায় থাকে? তাহার কুলের বন্ধন মুক্ত হইয়া পড়ে, সাধন ভজনাদি শীলতা লুপ্ত হইয়া যায়, ও ক্ষুদ্র 'আমির' মাপ কাঁটি বা মান ভাসিয়া যায়।

কথাটী আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক। সনাতন ধর্ম্মের উপদেশগুলি তিনটী স্তরে (Stratum) পর্য্যবসিত। এই তিনটীর নাম যথাক্রমে বিদ্যাতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব। ইহাই Light on the Path গ্রন্থের "Seek out the way" অর্থাৎ বাহিরে 'জগৎ' ভাবের মধ্য দিয়া পথ অন্বেষণ কর; (২) "Seek the way by retreating "within" ভিতরে 'অহং তত্ত্বের' মধ্যে পথ অন্বেষণ কর; তৃতীয়টী "Seek the way beyond" অর্থাৎ 'পর' ও অদ্বিতীয় ভাবের সাহায্যে 'অহং' ও 'জগৎ' ছাড়িয়া দিয়া পথ অন্বেষণ কর। এই তিনটী স্তর পরে পরে সাধিত হইবে। তন্ত্রেও এই তিন মহাভাবকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাতত্ত্বায়, আত্মতত্ত্বায় ও শিবতত্ত্বায় নমঃ, এই সঙ্কেতে উক্ত তিনটী স্তরের উপদেশ আছে। বেদান্তে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বাক্যে বিদ্যাতত্ত্ব উপদিষ্ট হইতেছে। তারপর "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যে অহং তত্ত্বের সিদ্ধি। "সোহহং" এই বাক্যে সুসিদ্ধ হইয়া 'অহং' টীকে সেই অখণ্ড 'পর' 'স'এ মিশাইয়া দিতে হইবে।

আমরা এক্ষণে সামান্যভাবে এই তিনটী স্তরের আলোচনা করিব। বৃহদারণ্যক ৪র্থ অধ্যায় ৩য় ব্রাহ্মণের ভাষ্যে আচার্য্য বলেন,—"বিদ্যা—সর্ব্বাত্মবিষয়া ... . যঃ সর্ব্বাত্মভাবঃ সোহস্যাত্মনঃ পরমোঃ লোকঃ পরমো আত্মভাবঃ স্বাভাবিকঃ।" "... ... ...বিদ্যায়াঞ্চ কাষ্ঠাং গতায়াং সর্ব্বাত্মভাবঃ মোক্ষঃ।" অর্থাৎ 'সর্ব্বের' আত্মভাবই বিদ্যা; উহাই আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বা প্রকাশ ভাব; উহা স্বাভাবিক। এই বিদ্যাভাব অবিদ্যাভাবজনিত মলিনতা হইতে পরিশুদ্ধ হইয়া পরম কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে মোক্ষে পর্য্যবসিত হয়। আচার্য্যের উক্তির মধ্যে তিনটী স্তর দেখা যায়। প্রথমটী ঘন 'সর্ব্ব' বুদ্ধি; এই বুদ্ধি প্রাকৃতিক মানবের জগৎ বুদ্ধি নহে। বৈজ্ঞানিক সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি কতকটা এই ভাবের ব্যঞ্জনা করিতেছে। যেমন এক মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে জানিতে পারিলে, সেই

শক্তির অনন্ত প্রকাশকে আর জানিতে হয় না; এবং অপর ভাবে বিশিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রকাশগুলি ঐ এক ভাবে নিঃশেষে মিশাইয়া যায়; তদ্রূপ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত অনন্তরূপে ব্যবস্থিত এই ব্রহ্মাণ্ড যখন এক আত্মরূপে পর্য্যবসিত হয়, তখনই বিদ্যাভাব সুসিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি (Phenomena) বিভিন্ন মূল তত্ত্বে (Principle) এক করিতে প্রয়াস করেন। বৈদ্যুতিক সমস্ত খেলা বিদ্যুৎ তত্ত্বে, (Electricity), উষ্ণতার সমস্ত প্রকাশ উষ্ণতা (Heat) তত্ত্বে একত্র সমাধান করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তৃপ্ত। এইরূপ অসামান্য ধৈর্য্য ও অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ বাহ্যজগতের ক্রিয়া ও শক্তি নিচয়কে এক প্রকৃতি ও শক্তিতে (matter and motion) মিশাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সার্ব্বজনীন বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বাত্মক নহে! উহাতে মানবের ভিতর দিয়া প্রকাশিত জীব বা 'অহং' তত্ত্বের কোন অবগতি হয় না। মানবের 'আমির' সহিত ঐ তত্ত্ব ও তাহাদের অনন্ত প্রকাশের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; সেই জন্য উহা অনার্য্য ও অবিদ্যাপ্রসূ। আকাশের নক্ষত্র তারকা, পৃথিবীর অনু পরমানু ও বিবিধ শক্তি নিচয়ের সাহায্যে আমার সার্ব্বজনীন (Universal) জ্ঞান হইল বটে কিন্তু তাহাতে কি আমার জীবন মধুরতর ও মহত্তর হইল? ঐ জ্ঞানের সাহায্যে আমার সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নানা ভাবের কি পরিপুষ্টি ও ক্রমোন্নতি সাধিত হইল? আমি পুত্রশোকে কাতর; আমার পক্ষে, পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, বা সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেণ এই উভয় ও বিরুদ্ধ মতগুলির পরিজ্ঞান হইলে কি উপকার সাধিত হইতে পারে? Radium-এর আশ্চর্য্য শক্তি বুঝিতে পারিলে কি আমার পুত্রশোক উপশম হয়? পাশ্চাত্য প্রথা 'অহং' তত্ত্ব হইতে বিশ্লিষ্ট ভাবে সার্ব্বজনীন তথ্য নির্ণয় করিয়াও মানবের প্রকৃত হিতসাধনে অক্ষম। তবে ও ভাব বৃথা নহে; উহার দ্বারা কর্ত্তৃত্বাভিমানী দেহাত্মবুদ্ধি-পরায়ণ মানবের দেহাত্মবুদ্ধির উপর বিষম আঘাত লাগে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা প্রায়ই জাগতিক ব্যাপারগুলিকে লইয়া আমাদের ক্ষুদ্র সাময়িক 'আমি' ও 'আমার' ভাব সিদ্ধ করিবার জন্য মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। তোমার ঘরে আগুন লাগিয়া তোমার সর্ব্বনাশ হইল; 'আমি' ভাবিলাম বেশ হইল, আমার তামাক খাইবার কয়লা আর কিনিতে হইল না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলনে এই ক্ষুদ্র দেহাত্ম-বুদ্ধির প্রভাব কমিয়া যায়, ও জীব

আপনাকে অন্য জীবের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া ভাবিতে শিখে। কিন্তু উক্ত জ্ঞানের দ্বারা 'আমিকে' পাওয়া যায় না। যখন সার্ব্বজনীন জ্ঞান আত্মভাবে সম্পন্ন হয়, যখন বাহিরের নৈসর্গিক নিয়ম, শৃঙ্খলা, প্রভৃতি দ্বারা মানব ভিতরের 'আমিকে' চিনিতে পারে, এবং 'আমি'র ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও নিয়ম দেখিতে পায়, যখন বাহিরের সর্ব্ব ব্যাপারই আত্মার স্বরূপ দেখাইতে সক্ষম হয়, তখনই ঐ জ্ঞান সর্ব্বাত্মিকা ভাব প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বাত্মিকঃ অর্থাৎ "সর্ব্ব যে কেবল আত্মার জন্য ও তাহাতেই পরিসমাপ্ত," এই জ্ঞানই "বিদ্যা"। যে জ্ঞানের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, যৎ সাহায্যে আমরা 'আমি'কে চিনিতে পারি না, তাহা অনার্য্য ও 'অবিদ্যা' নামধেয়। অবশ্য সাধনা ও ক্রমোন্নতির অবস্থানুসারে প্রত্যেক মানব 'আমি' শব্দটীকে বিভিন্ন ভাবে বুঝিতেছে; কিন্তু যে ভাবেই বুঝুক্‌না কেন, বাহিরের সর্ব্বটীকে 'আমি'র সহিত না মিশাইতে পারিলে বিদ্যা হয় না। Occult World গ্রন্থে জনৈক মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়াছেন,—Now *for us* poor unknown philanthropists, *no fact of either of these sciences is interesting except in the degree of its potentiality of moral* results and in ratio of its usefulness to mankind. * * * * * * May I ask then … … what have the laws of Faraday, Tyndall or others to do with philanthropy in this abstract relations with humanity, viewed as an intelligent whole? *What care they for* man as an isolated atom of this great and harmonious whole, even though they may some times be of a practical use to him. অর্থাৎ এক কথায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আত্মরূপ পরাগতি নাই বলিয়া উহাতে বুধগণ রমণ করেন না। প্রাচ্যদিগের জ্যোতিষ, বিজ্ঞান প্রভৃতি অপরাবিদ্যার যে সমস্ত বিভাগ আছে, তাহা সকলেই ব্রহ্ম বা আত্মপর। আর্য্য ঋষি প্রণীত যে কোন অপরাবিদ্যার গ্রন্থ পড়িয়া দেখুন, দেখিবেন সেই বাহ্য ভাষার ভিতর দিয়া ঋষিগণ ব্রহ্ম, আত্মা বা ভগবান্‌কে ফুটাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। আর্য্য ঋষি পাশ্চাত্য শরীর-তত্ত্ববিদের ন্যায় জিহ্বা, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বিশেষ গঠন ও ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা প্রত্যেক ভূত ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অভ্যন্তরে অধিভূত বা বিশিষ্ট ভূত সকলের আধারস্বরূপ ভগবচ্ছক্তির অধিষ্ঠান দেখিতে চাহেন। ইন্দ্রিয়গণের খেলায় তাঁহারা মুগ্ধ না হইয়া, তাহার ভিতর দিয়া

প্রকাশিত অধিদৈব তত্ত্বের ব্যঞ্জনা দেখেন। এইরূপ সকল ভাবেই শ্রীভগবান্ তাহাদের বেদ্য ও গম্য। রস (taste) সকলের বিভিন্নতা দেখিয়া তাঁহারা কেবল জিহ্বারূপ ইন্দ্রিয় সিদ্ধি করিয়া নিরস্ত হয়েন না। জিহ্বা ও রস সকলের মধ্যে তাঁহারা পরিসমাপ্তি বা অয়ন রূপ ভাব দেখিতে চেষ্টা করেন। এই জন্য ঋষি ইন্দ্রিয়গণ-সম্বন্ধে বলিতে গেলেও, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা 'সর্ব্ব' ভাবে ;—* * *
''সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং, সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈবায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে এবায়নমেবং, সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং ইত্যাদি (বৃহদায়ণ্যকোপনিষদ্)।" পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মৃত মনীষী Myers সাহেবের পূর্ব্বে কেহই ইন্দ্রিয় ব্যাপারের মধ্যে প্রকাশিত ও উপলক্ষিত জীবকেও দেখিতে চেষ্টা করেন নাই ; আত্মা ত' দূরের কথা। সর্ব্বভাবকে আত্মার সহিত মিলিত করিতে না পারিলে সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা হয় না। কি করিয়া আত্মার সহিত মিশাইতে হয় এবং আত্মার অর্থ কি, এই দুইটী বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বিভিন্ন স্তরের মানবের জন্য বিভিন্ন দর্শনের অবতরণা হইয়াছে। আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহা আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

এইবার আত্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। এক্ষণে 'আত্মা' শব্দের অর্থ 'পুরুষ'। পুরীতে বা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে শায়িত 'অহং' প্রত্যয়রূপী ভাবময় পদার্থকে আত্মা বলে। ইহাই আমাদের প্রথম স্তরের সংজ্ঞা বা definition। 'অৎ' ধাতুর উত্তর 'মণিন্' প্রত্যয়ে আত্মা পদ সিদ্ধ হয়. ''আত্মাততে ব্যাপ্তের্ব্বাপি ব্যাপ্ত ইব স্যাৎ যাবদ্ব্যাপ্তিভূত ইতি নিরুক্ত।'' সুতরাং ব্যাপ্তিই আত্মার প্রধান লক্ষণ। যাহা 'সর্ব্ব'কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, যাহাতে 'সর্ব্ব' ভাব জলে সৈন্ধবের ন্যায় লীন হইয়া যায়, যাহা 'অ' হইতে 'হ' পর্য্যন্ত 'সর্ব্ব' ভাবকে ব্যক্ত করিয়া 'ম' ভাবে ব্যক্ত খেলার অতিগ ভাবে থাকে, যাহাতে এই 'সর্ব্ব' ভাব নিঃশেষে মিশিয়া যায়, তাহাকে আত্মা বলে। 'আমি রাম' এই বুদ্ধিতে সমস্ত দৈহিক মানসিক খেলার অবসান হয়। রাম দরিদ্র ; ধন রূপ ভাব তাহার বাহিরে রহিয়া গেল ; তাহার 'আমি' ইহাতে অতৃপ্ত হইয়া ধনভাবেও তাহার ব্যাপ্তি সিদ্ধ করিবার জন্য রামকে ধনার্জ্জনে প্রবৃত্ত করিল। নিজে পরম বিশেষ বলিয়া, বাহিরের বিশেষকে আপন করিবার চেষ্টার নাম ব্যাপ্তি (বি+আপ্তি)। ধন অর্জ্জিত হইল ; ও পরে রামের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে দেখিল যে 'আমার' বোধে ধনকে মিশাইতে চেষ্টা করিয়াও •ধন• 'আমিতে' মিশিল না। সুতরাং বুঝা গেল রামরূপ আত্মভাব প্রকৃত আত্মা নহে ; কারণ তাহাতে দুঃখ, জরা প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবগুলি

মিশিতে পারে না ; সুতরাং সে অ'সর্ব্ব' হইয়াই যায়। তারপর তাহাতে বাহ্য ভাবগুলি নিঃশেষে মিশিতে পারে না। এই উভয় দোষের জন্য রামে আত্মভাবের আভাস থাকিলেও উহা প্রকৃত আত্মভাব নহে। ইহাই মিষ্ট করিয়া বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন যে, যাহাতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ও তাহাদের অধিষ্ঠাতা কত শত ইন্দ্র, কত চতুর্ম্মুখ বা অষ্টমুখ ব্রহ্মা নিঃশেষে ডুবিয়া যায়, তাহাই ত' আমাদের প্রকৃত 'আত্মা' বা 'পুরুষ' ভাব ;—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি, পুন তোঁহে সামাওত, সাগর লহরী সমানা॥

"স যোহয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদম্ সর্ব্বম্" সেই পুরুষ যাহা আত্মা, যাহা অমৃত, যাহা ব্রহ্ম, যাহা 'সর্ব্ব' রূপে অবস্থিত। বিভিন্ন আত্মা বা 'পুরুষ' ভাবগুলি যে এইরূপে পরিসমাপ্ত, ইহা বুঝার নামই আত্মতত্ত্ব। শাস্ত্র অধিকারী ভেদে এই আত্ম-তত্ত্বকে ভোক্তা, কর্ত্তা, দ্রষ্টা, নানারূপে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলেরই মূল উদ্দেশ্য সেই পুরুষের ভাব অঙ্কণ করা। যাহাতে বিশিষ্ট পূরের ক্রিয়া, প্রযত্ন, ইচ্ছা, সুখ-দুঃখ বোধ ও প্রত্যয়গুলি নিঃশেষে মিশিয়া যায়, যে সেই সকল খেলার ভিতর থাকিয়াও তাহাদিগের দ্বারা অনাবৃত, অসংবৃত অথচ অভিন্ন, তাহাই 'পুরুষ' বা আত্মা। "স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চিনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্।'' (বৃহদারণ্যক)। এই ভাবের স্ফুরণের জন্য শাস্ত্রে কতকগুলি উপদেশ আছে। 'সর্ব্ব' ভাবে বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত। 'সর্ব্ব' ভাবের অবসানে 'পুরুষ' ভাব প্রতিষ্ঠিত। একটীর খেলা বৃত্তকে লইয়া, অপরটীর খেলা কেন্দ্রকে লইয়া। এই দুইটী ভাব পরস্পর সংযুক্ত ও মিথুনীকৃত বিদ্যার সর্ব্বাত্মিকা ভাবে ছিন্ন বহু গুলিকে এক না করিলে পুর হয় না। পুরে সমস্ত খেলার মধ্যে পরাগতি না থাকিলে 'পুরুষ' বা 'আমি' ভাব সিদ্ধ হয় না। ক্ষণিক ভাবে সমন্বয় করিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে প্রয়াস, সেই বিদ্যার ফলে ক্ষণিক 'পুরুষ' ভাব সিদ্ধ হয়। সেই জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্থির পুরুষকে, এমন কি জীবের নিম্নতর ভাবগুলিকেও, দেখিতে পায় না। পরিবর্ত্তনশীল জগদ্বস্তুর সাময়িক সংযোগ ও বিয়োগে আকস্মিক ভাবে দেহাদির উৎপত্তি হয়,—এই মত স্বীকৃত হইলে 'পুর'গুলি ক্ষণভঙ্গুর ও সাময়িক হয় ; সুতরাং পুরুষ-বুদ্ধিও ক্ষণিক হইয়া যায়। কিন্তু এই ক্ষণিক ভাবের ভিতরে যে কতকগুলি মৌলিক তত্ত্ব আছে ও ঐ তত্ত্বগুলিকে এক কল্পান্ত স্থায়ী, ইহা বুঝিতে পারিলে

'পুরুষ' ভাবও কল্পান্ত স্থায়ী হইয়া যায়। অজ্ঞ, নিরক্ষরা হিন্দু রমণী ইহ জন্মের কর্ম্ম ও ভোগ সমূহকে আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন বলিয়া দেখে না; তাহার বুদ্ধি এই যে এ সকলও পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপ পুণ্যের ফলাফল; সেই জন্য তাহার 'পুরুষ' জ্ঞানটীও ক্ষণিক হয় না; পরন্তু সে সুখ দুঃখ ভোগাভোগের অতিগ ভাবে এক স্থিরতর চৈতন্য স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইজন্য অজ্ঞাতভাবে এক মহত্তর আত্মভাবের স্থিরতা সিদ্ধ হয় বলিয়া স্বধর্ম্মনিরতা হিন্দুরমণী সজ্ঞানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ভীত হন না। আর আমাদের 'পুরুষ' নামধেয় পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষণিক-বিজ্ঞান-পরিতৃপ্ত বিদ্যাভিমানী উপাধিধারীরা plague, cholera নাম শুনিলেই মুক্তকচ্ছ ও পরিধেয় বস্ত্রাদি নষ্ট করত পলায়নপর হয়েন। 'সর্ব্ব' ভাবের সমন্বয়-কারিণী মহাবিদ্যাকে যে যেরূপ ভাবে বুঝিয়াছেন, তাহার আত্মজ্ঞানও সেইরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই 'সর্ব্ব' ভাবের সমন্বয়কে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি শব্দের অর্থও অধিকারী ভেদে বিভিন্ন হইয়া যায়; এই বিভিন্নতাই জীবের স্ব স্ব অধিকারের পরিব্যঞ্জক। আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী নহি; কিন্তু স্বদেশী ভাবের বিকাশ হইতে উপরোক্ত তথ্যের একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিকৃত-মস্তিষ্ক ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী নরেন্দ্র, গজেন্দ্র প্রভৃতি মহারথিগণ 'স্বদেশ' শব্দে জল মাটী প্রভৃতির একটা কিম্ভুত-কিমাকার সমন্বয় ভাবিতেন; কাজেই তাঁহাদের বক্তৃতায় প্রকৃত ঘন দেশব্যাপী একত্বের আভাষ পাওয়া যাইত না। কিন্তু যখন স্বদেশ শব্দে চিন্ময়ী, অতিগা দেবীকে দেখিতে পাওয়া গেল, তখন সেই মহান্ একত্বের আভাসে দেশও সহসা অণুপ্রাণিত হইয়া গেল। সেই আভাসও বিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়াছিল; তাহাতে মুসলমান, ইংরাজ, প্রভৃতির প্রতি দ্বেষ ভাব অজ্ঞাতসারে মিশ্রিত ছিল। চিন্ময়ী স্বদেশরূপিণী মাতার ক্রোড়ে ত' সকলেরই সমান স্থান ছিল; কিন্তু অপরিপক্ক-বুদ্ধি, অসংযত, সনাতন ধর্ম্মের মূল ভাবে অসিদ্ধ, স্বদেশী ওয়ালাগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহার ফলে শ্রীভগবান্-পরায়ণ হিন্দুগণের মধ্যে, বুদ্ধ দেবের অহিংসা মন্ত্রে পূত ভারতবর্ষে, রাক্ষসসুলভ 'বোমা' মতের' সৃষ্টি হইল। যেমন প্রকৃতি সেইরূপ 'পুরুষ', এই মহামন্ত্র আমাদের বুঝা আবশ্যক। সনাতন ধর্ম্মের সাহায্যে রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া প্রকৃতিকে চিন্ময়ী ও সনাতনী করিতে পারিলে, 'পুরুষ'ও চিন্ময়রূপে সনাতন ভাবে স্থাপিত হয়। সেইজন্য ভগবান্‌কে পাইতে গেলে তোমার 'সর্ব্ব' বা 'প্রকৃতি' ভাব-ও তোমার 'অহং' বা 'পুরুষ' ভাব এই উভয় স্তরেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ শ্রীভগবানের পদাঙ্ক দেখিতে পাওয়া চাই। ইহাই প্রকৃত

শিবতত্ত্ব। ইহাই 'সান্তং শিবমদ্বৈতং' ভগবৎ স্বরূপ; ইহাই 'পরম অদ্বয়তা' শিবা মহাবিদ্যার প্রকৃত উপদেশ।

ভাগবতের আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারই এই মহাভাবে ভাবিত হইয়া রচিত হইয়াছে। ইহাতে কি 'পুরুষ', কি 'প্রকৃতি', কি কর্ম্ম, কি দেবতা, সকল তত্ত্বই এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার ফলে 'সর্ব্ব' ভাবেই পুরুষ-প্রকৃতির অতীত পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ভাব ফুটিয়া উঠে। সেইজন্যই রসিক না হইলে, "রসোবৈ সঃ রসংহ্যেবায়ংলব্ধানন্দী ভবতি" যে রস পান করিলে মানব আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়,—যে রস গায়ত্রী-তত্ত্বের তৃতীয় বিকাশ, যাহা আপঃ ও জ্যোতিঃ এই দুই ভাবের উপরে থাকিয়া এই দুই ভাবকে ঘনরূপে মিশাইয়া দেয়, সেই রসে রসিক মৎসর-শূন্য ও ক্ষুদ্র 'অহং' জ্ঞানের স্থাপনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত, সাধু, ভূতানুকম্পী সাধকগণের উপদিষ্ট ধর্ম্ম বা ভাগবতের মর্ম্ম বুঝা যায় না। যাঁহারা এখনও বিশিষ্ট সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িক মত স্থাপনে ব্যস্ত, তাঁহারা এ ভাব বুঝিতে পারিবেন না। ইহার বেদ্য বাস্তব ও শিবদ পদার্থ, এবং এই ভাগবত শ্রবণে যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা জন্মিয়াছে, শ্রবণ মাত্র তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান, বিনা পরিশ্রমে ও প্রযত্নে, আপনা আপনি অবরুদ্ধ হইয়া যান। তাঁহাদেরই নিকট ভাগবত ব্যাসদেবের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিবে। কিন্তু যাঁহারা এখনও অনন্তরূপে বিতন্বত বিশ্বকে শ্রীভগবানের রূপ ও অনন্ত জীব ও শক্তিকে তাঁহার ব্যঞ্জনা বলিয়া বুঝিতে চাহেন না, যাঁহারা এখনও ভোগের ভাষা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, যাঁহারা এখনও বিশিষ্ট মত, বিশিষ্ট ব্যক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা ভাব পোষণের চেষ্টা করেন, যাঁহারা এক কথায় বিদ্যাবুদ্ধি, দলাদলি, ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রভৃতি 'সর্ব্ব'ভাবই শ্রীভগবানের জন্য অকাতরে, সানন্দে ও অকুতোভয়ে ত্যাগ করিতে পারেন না, যাঁহাদের চিত্তে সেই পরমাকর্ষক কৃষ্ণ ভক্তের আকর্ষণ প্রকটিত হয় নাই, যাঁহারা বিশিষ্ট 'আমি' ও 'আমার' প্রভৃতি ভাবকে একেবারে ত্যাগ করিতে ও 'অমানি মানদ' হইতে চাহেন না তাঁহারা যেন এই ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করেন না। অনধিকারী ভগবদ্ভক্তি বিহীন ব্যক্তিগণ জোর করিয়া এই ধর্ম্ম আচরণ করিতে গিয়া নেড়া, নেড়ী, বাউল প্রভৃতি মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ মতের সৃষ্টি করিয়া ফেলেন। বাস্তবিক শ্রীভগবানের বাচক বলিয়াই ভাগবত এই নামের উপযোগী। ইহাতে বাচ্য বা প্রকৃত বাচক বা 'পুরুষ' ভাব নিঃশেষে মিশিয়া গিয়া ঘনাদ্বৈত, আনন্দময় পর পুরুষোত্তমের ব্যঞ্জনা করে। সেই জন্যই আমরা শ্রীভগবানের জন্ম ব্যাপারে, দেশ কালের অতীত পুরুষ ও প্রকৃতির পরি-

নিষ্ঠিতা সর্ব্বাত্মিকা, দ্যোতনশীলা, বুদ্ধিস্বরূপা দেবকী বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মহাভাবের ক্ষেত্রে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' রূপ সর্ব্বময়, সর্ব্বত্র সমরূপে প্রকাশমান বসুদেব তত্ত্বের ঔরস-জাত, আমাদের 'অহং' এর একমাত্র গতি, সাক্ষী প্রভু 'কর্ত্তা' স-রূপ শ্রীভগবান বা 'সোহং' তত্ত্বের আভাসে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তবে এ 'সোহং'-এ'অহং' নাই, তাহা 'স'এ পারি সমাপ্ত। (ক্রমশঃ)

যোগানন্দ ভারতী—

মোক্ষ]

কে তুমি ?

কে তুমি, প্রেমের নিবিড় বাঁধনে—
আমায় বাঁধিয়া রেখেছ হে ?
কে আমার শোকে, দুঃখে, দৈন্যে,
করুণ দৃষ্টি রেখেছ হে ?
দিবস রাত্রি হৃদয়ে আমারি,
কে তুমি, বসিয়া বাজাও বাঁশরী ?
কে মোর হৃদয়ে গোপনে পশিয়ে,
মাধুরী মাখায়ে দিতেছ হে ॥
বিশ্ব-বেদীর সোনার আলোকে—
কে তুমি, দাঁড়ায়ে আকুল পুলকে,
দ্যুলোকে ভুলোকে হতেছে আজিকে—
কাহার মঙ্গল আরতি হে ?
মেঘে ঢাকা দিক, অসীম তিমির,
পথ নাহি পাই রাত্রি নিবিড় ;
তোমার চরণ কমল জ্যোতির—
আলোক ফুটিয়া উঠিছে হে ॥
আঁধার সিন্ধু গরজিয়া উঠে,
তা'রি মাঝে তব জ্যোতি ফুটে উঠে ;
(ঐ) অভয় বিশাল হুঙ্কারি উঠে,
শুনিতে তা' যে গো পেয়েছি।
রোগে, শোকে, তাপে, জীবনে, মরণে,
প্রতি দিনকরে ত্যাগে ও গ্রহণে ;
বাঁধিছ মোরে যে প্রেমের বাঁধনে—
হৃদয়ে তা' যেন বুঝেছি ॥
দুঃখ দিতে চাও ? দিও, তা'ই দিও,
তা' সহিব তোমাকে স্মরিয়া।
যদি অবিশ্বাস, যদি অধীরতা,
আবরিতে চায় আসিয়া ॥
তবু প্রতিদিন হে নাথ ! আমার,
তব চরণে রহিব চাহিয়া,
যে আদেশ প্রভু, দিবে গো আমারে,
ল'ব তাহা শির পাতিয়া ॥
সব দুঃখ, রোগ, সন্তাপ, শোক,
সহিব হাঁসিয়া হে।
শুধু এই ক'র হৃদয়ে আসিয়ে,
কথা কয়ে যেও ক্ষণেক বসিয়ে ॥
নয়নের জল ঝরিবার যাহা,
ঝরুক চরণে হে !
মম সব শোক সার্থক হোক,
তোমায় পরশি হে ॥
আমার এমন দিন কি হবে ?
করিয়া অনেক কষ্ট, যতন—
যে কুসুমগুলি করেছি চয়ন,
তাহা শোভাহীন—তাহা মধুহীন,

তুমি হস্ত পাতিয়া ল'বে।
আকুল মানস জানিনা কি ছলে,
(বসি) কথা কবে দুটো পদছায়া তলে ;
চরণ ধুয়াবে নয়ন সলিলে,
তুমি হাঁসিয়া বারেক চা'বে।
আমার এমন দিন কি হবে ?
কি শোভা ছড়ায়ে রেখেছ জগতে,
নয়ন মুগ্ধ শোভাতে।
কি সঙ্গীতে ভরা এ বিশ্ব তোমার,
শ্রবণ মুগ্ধ তাহাতে ॥
রূপ, রস, গন্ধে, পরশ, শব্দে,—
তব আনন্দ জাগে।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন আবেগে,
তোমার মিলন মাগে ॥
তুমি ইন্দ্রিয় যন্ত্র দিয়াছ যা' নাথ !
তারা মুগ্ধ আপন কাজেতে।
তুমি শোভায় ভরা এ ভুবন গড়িয়া,
শুধু তোমারে দিয়েছ ভুলিতে ॥
প্রভু ! তোমার শুদ্ধ প্রেম ও জ্ঞান,
করুণা করিয়া দাও।
তোমার স্বরূপ চিনিতে বুঝিতে,
তব আনন্দে, আনন্দ লভিতে ;
চরণে তোমার বিনয় নমিতে—
আমারে ভক্তি দাও।
অজ্ঞান-পাশ করিয়া ছিন্ন চরণাশ্রয় দাও ॥

সাধনার পথে।

(চতুর্থানুবৃত্তি)

তারক বাবু তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে যে তুমি কেন অভিভূত ও বিপর্য্যস্ত হইবে তাহার কারণ দেখিতে পাইতেছি না। তিনি যে তোমাকে বলিয়াছেন যে দৈত্যশক্তিনিচয় হইতে নানাবিধ বিপদ্ আসে ও তাহারা সময়ে সময়ে মহাপুরুষদের প্রতিরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য দেখা দেয়, উহা বাস্তবিকই সত্য। তাহাদিগকে যে ঐরূপভাবে মোহিত করিতে দেওয়া হয়, তাহা ত' ভালই। নতুবা সাধকের বিবেকশক্তি, পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হয় না। আচ্ছা, বল দেখি—একজন বহুরূপী বা ব্যবসাদার ভাঁড় যদি আর একজনের পিতার মত সজ্জৎ বর্ণ ও শ্মশ্রু-গুম্ফাদি ধারণ করিয়া আসে ও সে ব্যক্তির যদি তাহাকে নিজের জনক বলিয়াই ভ্রম হয়, তবে তাঁহাকে তুমি কি ভাবিবে ? যতক্ষণ আমরা শুধু রূপে মত্ত ও বাহ্য আকৃতিতে অভিনিবিষ্ট থাকি, ততক্ষণই আমাদের প্রতারিত হওয়া সম্ভবপর ; কিন্তু অন্তশ্চক্ষুঃ (জ্ঞানচক্ষু বা যোগনেত্র) উন্মীলিত হইলে, তখন আর কদাপিও নহে। অতএব যদি

উহাই (তারক বাবুর কথা) প্রকৃত হয়, তবে কোনও উদ্বেগের কারণ নাই। আরও দেখ, যাহাদের সেই পরম তত্ত্বের সর্ব্বমঙ্গলত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্ব-পাবনত্ব ও সর্ব্বাধিষ্ঠানত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, তাহাদের অসত্য বা মায়িক কোনও বস্তু দ্বারা বিচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ তিনি সর্ব্বভূতাধিরাম—সত্য ও মায়ায় সমভাবে বিরাজ করেন।

* * *

যে আলোক শুধু তোমার মনের অন্ধকার আলোকিত করিতে পারে, যে শান্তিই একমাত্র ক্রমবিকাশের মহানিয়মে আপতিত আপৎ সমূহের অন্তরে এবং বাহিরে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত ভাবে বিরাজমান, আমি তোমাতে সেই আলোক ও সেই শান্তি আনয়ন করিবারই চেষ্টা করিতেছি। যদিও তুমি আমার উপস্থিতি অনুভব করিতে পার না, তথাপি আমি প্রত্যহ তোমার নিকট, কখনও কখনও একাধিকবারও, আসি। আমাকে দর্শন করিলে যখন তোমার প্রকৃতই কল্যাণ সাধিত হইবে, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে ;—অন্য কারণে নহে। অতএব যখন আমাকে দেখা উচিত নহে, তখন দেখিবার ইচ্ছা করিয়া তোমার ভিতরের ও বাহিরের সমতা বিচলিত করা তোমার পক্ষে সমীচীন নহে। মনে রাখিও যাঁহারা তোমার জীবন-পথের পরিদর্শক, তাঁহারা তোমার যে বাস্তবিকই কিসের প্রয়োজন আছে, তাহা তোমাপেক্ষা উত্তমরূপই জানেন। অতএব যাঁহারা চিত্তের অসীম ও অপার কারুণ্যবশতঃ অনুদিন জীবের মঙ্গল-প্রয়াসী, সেই মহানুভব ঋষি ও মুক্তপুরুষদের সহিত ঐক্য স্থাপনে অভিলাষী হও। ইহাই ত' পরমার্থের সোপান।

(৫)

অপত্যস্নেহে তুমি যেরূপ রূঢ় আঘাত পাইয়াছ, তাহাতে বর্ত্তমান দুর্ব্বিপাক তোমার নিকট যে কি আলোক বহন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ না ও তজ্জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছ, ইহা অত্যন্তই স্বাভাবিক। তোমায় বর্ত্তমান শোকের অবস্থার বিষয়ে আমি কিছু বলিব কিনা তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। যেই মাত্র মোহ-কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইবে ও কালবশে তোমার মন পুনরায় সাম্যাবস্থা লাভ করিবে, তখনই সেই আলোক তোমার নয়ন সমক্ষে স্ফূরিত ও উদ্ভাসিত হইবে।

বৎস! ঈশ্বর যে সর্ব্বদাই ন্যায়বান ও করুণাময় এবং ইহলোকের সমস্ত ঘটনাই যে তাঁহার মহানিয়মে পরিচালিত হইতেছে, এ তত্ত্বটী মস্তিষ্ক দ্বারা

সর্ব্বদা গৃহীত না হইলেও ধ্রুব সত্য। অতএব ছিন্ন জ্ঞানবশতঃ তোমার অল্পাবগাহী বুদ্ধি ও অনুভব দ্বারা বুঝিতে না পারিলেও, দেখিও যেন অসংশ্লিষ্ট (isolated) ঘটনাসমূহ কখনও তোমার মনে শ্রীভগবানের ন্যায়বত্তা ও মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন না করে। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান অসীম মায়ায় আবৃত ও বেষ্টিত ; অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় সবিতাও অনন্ত আকাশের ঘোরান্ধকার দূরীভূত করিতে পারে না—এ কথা কেন ভুলিয়া যাও? যে ক্ষুদ্র প্রাণীটী সম্প্রতি পরলোকে গিয়াছে. তাহার সম্বন্ধে এই মাত্র আমি বলিতে চাই যে, ইহার জীব শিশু নহে। যদিও ইহার মস্তিষ্ক যন্ত্রণাসমূহের অনুবাদ (প্রকৃতরূপে বোধ) করিতে পারে নাই, তথাপি ইহার বুদ্ধি যাহা শিখিবার তাহা শিখিয়াছে এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হইয়াছে।

এই পরীক্ষার সময় শত্রু (দৈত্যগণ) যে সমস্ত প্রশ্ন তোমার মনে উদিত করিয়াছে, তাহা লইয়া চিত্তকে অবসাদগ্রস্ত করিও না। দৈত্যশক্তিনিচয়ের ক্রিয়া-কৌশল অতি ভীষণ ও তাহাদের গতি অতি সূক্ষ্ম। অতএব শোক যে আমাদের চিত্তকে ঘনমেঘাবৃত করে, ও আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারও যে যৎসামান্য, ইহা মনে রাখিয়া যে বিশ্বাসকে তোমার চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থায় ও স্থিরতর বিবেকের সাহায্যে যুক্তিযুক্ত এবং তৎকালের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ অবস্থাসমূহের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছ, সেই বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত হইও না। সত্য ও জ্ঞানের পথ ক্ষুরধারের ন্যায় শাণিত এবং যে সব বাধা বিঘ্নসঙ্কুল. সেগুলি বিচিত্র ও নানাবিধ। অতি দৃঢ় ও সংযতচিত্ত ব্যক্তিই সে পথে অবিচলিত ও স্থির থাকিতে পারে ;—সে দৃঢ়তাও আবার অস্মিতা মাত্রাপ্রসূত হইলে টিকিয়া থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীগুরু পাদপদ্মে অব্যভিচারিণী প্রণতি ও রতিই জীবের মহত্তর সত্ত্বাকে সঞ্জীবিত রাখে।

অতএব স্বপ্নেও ভাবিও না যে একটী যোগীকে গড়িয়া তুলিবার জন্য একটী নিরপরাধ নিষ্কলঙ্ক জীব কষ্ট ভোগ করিবে। ঐরূপ ভাবনা—অর্থাৎ বাহ্যবস্তু সমূহ আমাদের ভেদভাবাবদ্ধ সত্ত্বার জন্যই অবস্থিতি করে সর্ব্বান্তরাত্মার জন্য নহে,—এরূপ অলীক চিন্তা অহঙ্কার-প্রসূত মিথ্যানুবাদ মাত্র। ন্যায়ের বিধান সর্ব্বলোকেই প্রতিপালিত হইবে ও অব্যাহত থাকিবে; এবং সমস্ত বস্তু, সকল ব্যক্তিই নিয়মানুসারে যাহা পাইবার তাহা পাইবে। কেবল উহার জটিলতাগুলি হয়ত তুমি আমি আজ পর্য্যন্তও বুঝি নাই ; এবং তজ্জন্য বারম্বার এমনতর সমস্যার সম্মুখীন হই যে উহাতে বুদ্ধিকে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় করে। প্রকৃত ভাব

(attitude) এই প্রকার যে, যাহাই ঘটুক না কেন, তুমি অবশ্যই নিজকে বুঝাইবে ও অনুভব করিবার চেষ্টা করিবে যে উহা ন্যায্য ও সঙ্গত না হইয়া থাকিতে পারে' না। কারণ শ্রীভগবানের সংসারে ইহার বিপরীত ভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। যোগীর এ সমস্ত কষ্ট পাইতেই হইবে, তজ্জন্য তিনি অবিচলিত ভাবে যাহাতে তিতিক্ষা অবলম্বন করিতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা করিবেন।

* * *

তোমার স্ত্রী যে বস্তুসমূহের ভিতরকার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃত যোগানুমোদিত পন্থায় শিক্ষিতা হইতেছেন, তাহাতে আমি আহ্লাদিত হইলাম। বস্তুতঃ যতদিন পর্য্যন্ত নিজের স্ত্রী মহত্তর জীবনের আভাস মাত্রও প্রাপ্ত না হন, ততদিন মানুষের জ্ঞান-পথে প্রকৃত স্থির উন্নতি লাভ করা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। যাহা হউক জানিও যে তাঁহার যে কাহাকে গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিকট কিছু প্রকাশ করা তোমার উচিত নহে। কারণ যদিও স্বামী স্ত্রীর বিভিন্ন গুরু হওয়া বিশেষ সুবিধাজনক নহে, তথাপি অকালে তোমার স্ত্রীকে তোমার গুরুর নাম বলিয়া দিয়া হয়ত' তুমি একেবারে কার্য্য পণ্ড করিবে। আমি স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে জানিয়াছি যে, যদি স্ত্রী প্রকৃতই সহধর্ম্মিণী হয়েন, —যদি তিন প্রকৃত সাধনার সহচরী ও কল্যাণকারিণীরূপে সংযুক্তা হইয়া থাকেন, তবে তিনি স্বতঃই নিজের প্রাণে স্বামীর গুরুকে খুজিয়া বাহির করিতে পারেন এবং পরে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার পথ পুষ্প সমাকীর্ণ না করিতে পারিলেও অন্ততঃ কিছু দূর সরল করিতে পারিবেন। সেই পরম কৃপাময় মহাগুরুগণ যেন তোমাদের উভয়কেই রক্ত মাংসের শরীরের সহজাত উপদ্রবগুলি সহ্য করিবার উপযোগী শক্তি ও শান্তি প্রদান করেন এবং তোমাদিগকে ধীরে ধীরে সেই নির্ম্মল স্থির শান্ত লোকে পরিচালিত করেন!! তথায় দুঃখ ভীষণ ছায়া বিক্ষেপ করিতে সক্ষম হয় না; তথায় চিরশান্তি বিরাজমানা।

* * *

প্রিয় বৎস! তোমার উপর যে কি গুরু কর্ম্মভার অর্পিত হইতেছে তাহা আমি জানি। কিন্তু ধৈর্য্য, সাহস বা বিশ্বাস হারাইওনা। বরঞ্চ এই বাহ্য বিপদ রাশি হইতে আভ্যন্তর শক্তি ও দৈবীসম্পৎ যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা শিক্ষা কর,—যাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের খেলা ঘরের ঝটিকাবর্ত্ত হৃদিস্থিত পরমাত্মার স্বরূপ-ভূত পরমশান্তি আর ভঙ্গ করিতে না পারে,—যাহাতে অবশেষে কোন জীব আপনার মঙ্গলময়ী ভাগবতী প্রকৃতি

উপলব্ধি করিতে পারে—যাহাতে তোমার 'আমিটী' তাহার 'তটস্থ' ও দেশ কাল কর্ম্মাতীত মহাভাব ও পরাগতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং মায়া ও তৎ সহকারী পরিণাম সমূহ হইতে আপনার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা ও অপাপবিদ্ধতা বোধ করিতে পারে। তুমি জান যে আমাদের দুঃখ কষ্ট সমূহ স্বকৃত কর্ম্ম-বিপাক মাত্র; উহারা আমাদের বিকারী বা পরিণামী সত্ত্বার বা 'ক্ষণিক আমির' সহিত সংযুক্ত;—আমাদের নিত্য শাশ্বত স্বরূপকে বিন্দুমাত্র খিন্ন করিতে পারে না। অতএব সমস্ত দুঃখ কষ্ট যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জীবের পাবন, তাহাও জানিয়া ঐ গুলিতে আর বিরক্তি প্রকাশ করিও না। বরঞ্চ তাহাদের যা' মূল্য (তাহারা যে ভাবের ব্যঞ্জক) তদ্রূপে গ্রহণ করিবে ও অবিচলিতভাবে উহাদিগকে গ্রহণ করিবে। যাহারা তাঁহাদের (মহাপুরুষদের) সেবক তাহাদিগকে যে দারিদ্র্যে নিষ্পীড়িত হইতে হয়, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। দারিদ্রই সর্ব্বত্যাগের সোপান ও তদ্দ্বারা আমাদের গুণ ও বিশ্বাস (ভক্তি) পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই ভাবের উপর নির্ভর কর যে, যাঁহারা আমাদের নিয়তি পরিচালিত করিতেছেন, ও আমাদের কার্য্যাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা সহস্র গুণে জ্ঞানী; এবং তাঁহারা যাহা করেন, তাহা আমাদের পক্ষে প্রকৃতই মঙ্গলজনক।

সাংসারিক কর্ত্তব্য বলিয়া তোমায় যাহা যাহা করিতে হইতেছে, তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকা সুবিবেচনা সঙ্গত নহে! অতএব মনে করিওনা যে, মর্ত্তহারী একটা খারাপ জায়গা। তুমি নিজেই জান যে মনই বন্ধ মোক্ষের কারণ; উহা স্বর্গকে নরকে ও নরককে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে। যোগীকে যে সকল অন্তরায় অতিক্রম করিতে হয়, তাহার মধ্যে প্রধান একটী এই যে "বহির্বিক্ষেপ" বিরহিত হইতে হইবে, অর্থাৎ বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপেক্ষা করিতে হইবে। এই স্থলে আমি উল্লেখ করিতে চাই যে, এইখানেই যোগবিদ্যা ও বাম মার্গাবলম্বীর (বিভূতির) পথ বিভিন্ন দিগাভিমুখী হয়। শ্বেতদ্বীপের ঋষিরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল বা প্রতিকূল করিতে কোনও প্রয়াস অবলম্বন করেন না। উহা যেরূপই থাকুক, ইঁহারা সেইরূপেই —ভগবদ্রূপেই, তাহাদিগকে গ্রহণ করেন, এবং পরমাত্ম শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ইহাদের উপর আপন প্রভুত্ব স্থাপনা করেন। পক্ষান্তরে বাম মার্গগামীরা, সংঘর্ষে বিশিষ্ট আমিত্বের প্রসার হইবে বাসনায়, স্বেচ্ছায়, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার অন্বেষণ করেন এবং এইরূপে

তাঁহাদের সামর্থ্যের উপর গুরু ভার ন্যস্ত করেন ; নতুবা নির্ঝঞ্ঝাট সরল পন্থার জন্য আকুল হন এবং তজ্জন্য অন্তরে দুর্ব্বলই রহিয়া যান। ভাগবত জ্ঞান ও ভাগবতী শান্তির সাধকের নিকটে বাহ্যাবস্থায় বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। কারণ তিনি অবস্থার বা বাহ্য ব্যক্ত ভাবের দাস নহেন ; বরং তাঁহাকে অতিক্রম' করিয়াই চলেন। শুধু এইরূপেই আমরা ভিতরের শক্তিতে মহীয়ান হইয়া বিকশিত হইতে পারি। (ক্রমশঃ)

শ্রী প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্মপথ।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥

অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত এই সংসারে সকলই নশ্বর। আজ যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, কাল তাগার অস্তিত্ব কোথায়? অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া কোন্ অজ্ঞাত কুহক তলে মোহ-তিমিরাচ্ছন্ন জীবকে যেন দিন দিন বদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। আশা আকাঙ্খা'র নিবৃত্তি নাই—পিপাসারও শান্তি নাই ; নিত্য-নূতন উত্তেজনার হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে আমাদের ভোগ-বিলাস-সুখপালিত জীবন-তরণী কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে! যাহা চাই, তাহা পাই না ; পাইলেও আশা মিটে না ; শুধুই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তীব্র তাড়নে দিন রাত্রি ছুটাছুটি! পদে পদে ছলনাময়ী আশা মরীচিকা, আর আত্ম প্রবঞ্চনা। সংসারে সুখ দুঃখের আশা-নিরাশার পাষাণে কতই না নিষ্পেষিত, নিপীড়িত! কখন আশায় উৎফুল্ল, আবার কখনও বা নিরাশার উষ্ণশ্বাসে—গভীর মর্ম্মবেদনার লেলিহান অগ্নি-শিখায় দেহ মন আশা ভরসা, সহায় সম্পদ সব যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে! চির কল্যাণময়ী বসুন্ধরার শান্ত, শীতল ক্রোড়েও আর যেন সুখ শান্তি নাই, শুধুই উত্তপ্ত সংসার-মরুর অসহনীয় তাপ! বিধাতার আশীর্ব্বাদে এই দুঃখময় সংসারে জীবের দুঃখের অভাব নাই। কিন্তু করুণাসিন্ধু মঙ্গলময় ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু এই সংসার মরুতেও স্নিগ্ধ শীতল উৎস-সমন্বিত উদ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন! সংসারের দুঃখ তাপদগ্ধ বিরহ বেদনা ব্যথিত ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট নরনারী ইচ্ছা করিলে, সেই ফলচ্ছায়া সমন্বিত উৎসের শীতল সলিলে অবগাহন

করিয়া এ জনমের কেন,—বহু জন্মার্জ্জিত পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইতে পারে। এই সংসার মরুতে উৎস-সমন্বিত মরুদ্যানই ধর্ম্মক্ষেত্র। সুদীর্ঘ বালুকা কঙ্করময় মরুভূমি অতিক্রম করিয়া এইখানে আসিতে পারিলে, "ত্রিবিধ দুঃখের" নিবৃত্তি হয়। অকপট ধর্ম্মানুরাগীই এই পথক্লেশ সহ্য করিয়া এইখানে আসিতে পারেন, অন্যের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সংসারে ধর্ম্মপথই মানবের চরম লক্ষ্যস্থল,—দুঃখতাপময় সংসারে শান্তি লীলা-নিকেতন। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মপথ ভিন্ন মানবের গত্যন্তর নাই। কিন্তু এই ধর্ম্মপথে প্রথম প্রবেশ করিতে হইলে, বড়ই সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। ধর্ম্মপথ পরীক্ষা ক্ষেত্র ; বিঘ্ন বিপত্তি পদে পদে ; বিপত্তি বাত্যা অহরহঃ বহিতেছে ; বিঘ্নের আবর্ত্ত যেখানে সেখানে, প্রলোভনের চোরাদহ চারিদিকে ; কুহকিনী আশা উত্তাল তরঙ্গমালা তুলিয়া তোমার চিত্ত হ্রদকে বিক্ষোভিত করিবে। ষড়রিপু গুপ্ত শত্রুরূপে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবে। শয়তান বন্ধুর বেশে তোমার মন ভুলাইয়া সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। তাই বলি হে পান্থ! সাবধান! প্রথমে তুমি দুঃখ, যন্ত্রনার ও নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে পথ দেখিতে পাইবে না। এই বিশাল সংসারে তোমার স্থান হইবে না। হয়ত, তরুতলে ছিন্নকন্থা ও মুষ্টি ভিক্ষা তোমার জীবনের সম্বল হইবে। কিন্তু এই সব বিঘ্ন-বিপদ প্রকৃত পক্ষে ক্ষণস্থায়ী ; এ সব কিছুই নহে, কেবল তোমার পরীক্ষা মাত্র। পরীক্ষায় এই কঠোরতা দেখিয়া অনেক পান্থই ভয় পান, কেহই আর ঐ বিপদসঙ্কুল পথে অগ্রসর হইতে চাহেন না। তাই সংসারে প্রকৃত ধার্ম্মিকের বড় অভাব ; সকলেই প্রায় বৈড়ালব্রতী ও বকোধার্ম্মিকের দল। কিন্তু তাই বলিয়া কি এই পথ ত্যাজ্য?—না কখনই নহে। কেননা, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" (গীতা) এই ধর্ম্মের অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে।

আর এক কথা, এই পথক্লেশ সহ্য করিয়া যদি একবার ঈপ্সিত স্থানে গমন করা যায়, তাহা হইলে সকল ক্লেশের অবসান হয় এবং যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে পথিককে উৎফুল্ল করে ও সারা জীবনের ক্লেশের পরিবর্ত্তে এক পরমানন্দ লাভ হয়। সে লাভের—সে আনন্দের তুলনা নাই। এ আনন্দ কত প্রচুর, কত অতুলনীয়, তাহারই পরিচয় দিতে গিয়া ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "যং লব্ধা চাপরং লাভমন্যতে মাধিকংততঃ" যাহা লাভ করিতে পারিলে অন্য লাভকে আর অধিক বলিয়া মনে হয় না। ইহাই ভূমানন্দ। ভূমাই সুখ—"ভূমৈব সুখং"।

সংসারে প্রকৃত ধর্ম্মের ন্যায় বন্ধু ও আশ্রয়দাতা আর নাই। জীবের সহিত ইঁহার নিত্য সম্বন্ধ। ইনি মানবের ইহকালের ও পরকালের সঙ্গের সাথী। কেহ পরিত্যাগ না করিলে, ইনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না; ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়া থাকেন। যে দিন মানব পৃথিবীর অর্থ-বিত্ত, বিষয়-বৈভব, ত্যাগ করিয়া শ্মশানের অনলে দগ্ধ হইয়া বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন, "শ্মশানানলোদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ" যে দিন "আকাশস্থঃ নিরালম্বঃ বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ" হইয়া কোন্ মহাশূন্যে অবস্থান করিবেন, যে দিন পৃথিবীর কোন বন্ধুই আর তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না; সে দিন এই একমাত্র ধর্ম্মই তাঁহার অনুগমন করিয়া তাঁহার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠিত প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিবে। হিতোপদেশে আছে —

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযায়তি যঃ।
শরীরেন সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥

"ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ। ইনি মরণেও অনুগমন করিয়া থাকেন। অপরাপর সমস্তই শরীরের সহিত বিনষ্ট হয়।" সুতরাং এ হেন ধর্ম্মকে কখনও পরিত্যাগ করিতে নাই। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও অকর্ত্তব্য কি?—যাহাতে অধর্ম্ম হয়।" অতএব ধর্ম্ম রক্ষা করা প্রয়োজন। ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে ধর্ম্মও কাহাকেও রক্ষা করেন না; যথা,—

"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিত।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্ম হতোঽবধীৎ॥

"ধর্ম্মনাশ করিলে সেই নষ্ট ধর্ম্ম মনুষ্যকে বিনাশ করে এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিলে রক্ষিত ধর্ম্মই রক্ষা করে। অতএব ধর্ম্ম নষ্ট করিবে না। ধর্ম্ম নষ্ট না করিলে, ধর্ম্মও কাহাকেও নষ্ট করেন না" মানবের ধর্ম্ম আছে; তাই মানব অন্যান্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; নচেৎ মানবে ও পশুতে কোনও প্রভেদ নাই।

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্
ধর্ম্মস্তু তেষাং হি বিশেষ এব ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।" মনু

"আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ঐ সকল মনুষ্য ও পশু উভয়েরই আছে। কেবল ধর্ম্মই মানবের বিশেষত্বের হেতু; সুতরাং ধর্ম্মহীন হইলে মনুষ্য পশুরই তুল্য।" অধর্ম্মে কখনও মানবের মঙ্গল হয় না। ধর্ম্মপথ অবলম্বনের উদ্দেশ্যই মঙ্গল লাভের জন্য। কিন্তু কেহ হয়ত বলিতে পারেন, অধর্ম্ম পথে থাকিয়া মঙ্গল লাভ করিতে ত' অনেককেই দেখা যায়। একথা নিতান্ত অমূলক নহে।

অধর্ম্ম পথের প্রথম লাভই এইটুকু, —আপাততঃ সুখ ও উন্নতি। কিন্তু পরিশেষে কল্পনার অতীত দুঃখ দুর্গতি, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভগবান মনু বলেন,—

"অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততঃ ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান জায়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

"অধর্ম্মাচরণে মানব প্রথমে বর্দ্ধিষ্ট হয়। তারপর লোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়, তৎপর শত্রু পর্য্যন্ত জয় করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু অবশেষে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" অধর্ম্মের ঠিক ইহাই লক্ষণ; আর ধর্ম্মের লক্ষণ ঠিক ইহার বিপরীত। ধর্ম্মপথের আলোচনার সহিত ধর্ম্ম কথাটীর অর্থ বুঝা প্রয়োজন। ধর্ম্ম কি? ধৃ ধাতু মণ্ প্রত্যয় হইতে ধর্ম্ম কথাটী উৎপন্ন; বস্তুমাত্রং ধ্রিয়তে যেন ধরতি বা যঃ, স ধর্ম্মঃ; অর্থাৎ যাহার দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ধৃত হইতেছে বা যিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম। কিন্তু ধর্ম্ম কথাটীর আরও ব্যাখ্যা আছে। যথা:—

বৈশেষিকের ঋষি ভগবান কণাদ বলেন,—"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ" যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয় তাহাই ধর্ম্ম। (অভ্যুদয় = ইহকালের ও পরকালের উন্নতি। নিঃশ্রেয়স = আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি।*) যে পুরুষার্থ দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়, মহর্ষিগণ তাহাকেই ধর্ম্ম সংজ্ঞা দিয়াছেন। যে অলৌকিকী ঈশ্বরেচ্ছা অখিল বিশ্ব ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে।

সত্ত্ববৃদ্ধিকরো যোঽত্র পুরুষার্থোঽস্তি কেবলঃ।
ধর্ম্মশীলো তমেবাহু ধর্ম্মং কেচিন্মর্ষয়ঃ॥
যা বিভর্ত্তি জগৎ সর্ব্বং ঈশ্বরেচ্ছাহ্যলৌকিকী।
সৈব ধর্ম্মো হি সুভগে নেহ কশ্চন সংশয়॥

যাহাতে সমাজের মঙ্গল হয়, তাহাকেও ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। আমরা প্রধানতঃ কতকগুলি আচার সমষ্টিকেই ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করি। কিন্তু আচারকে ঠিক ধর্ম্ম বলা যায় না। তবে ইহা আচার ধর্ম্ম। আচার ধর্ম্ম লাভের সোপান বলিয়া আচারকে পরম ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। "আচারঃ

* যাহাতে একত্ব বুদ্ধির উপক্রম হয়, (Sense of an organic synthesis) যাহা জীব বা বিশ্বের অনুগুলিকে উন্নত করিয়া পুরুষাভিমুখী করে, (অভ্যুদয়) যে শক্তির সাহায্যে উপাধি অতিক্রম করা যায় (নিঃশ্রেয়স) তাহাই ধর্ম্ম। পং সং

পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত্ত এব চ''—সদাচার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা কথিত হইয়াছে। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ও চিত্ত চরিত্র নির্ম্মল রাখিবার জন্য এই আচার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রযত্নে অবশ্য পালনীয়। বলিতে কি আচার হীন ব্যক্তি কখন ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে Theosophical Societyর কর্ণধার শ্রীমতী আনি বেশান্ত মহোদয়া (Mrs Annie Besant) কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। যথা :—

"For what is religion ? Religion is not a mass of formulæ which people can learn by heart and practise by rote, it is not a number of ceremonies which priests can perform and people look on at; it is not even sacred books however noble, however inspiring, however precious. Religion is the cry of the human spirit to the Life whence it came; it is the appeal of the little self bewildered in the mists of earth to the Supreme Self, whose reflection it is; it is the search of the human heart for God; অর্থাৎ ধর্ম্ম কি? ইহা কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি নহে; কারণ তাহা হইলে সকলেই উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ধার্ম্মিক হইতে পারিত। অপিচ শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান পরম্পরাও ধর্ম্ম নহে; কারণ তাহা হইলে ত' উহা ক্রিয়াকুশল যাজক মাত্রেরই করায়ত্ত হইত। তদ্রূপ সুবুদ্ধি-বিকাশক, মনমার্গ প্রকাশক পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রাদিও ধর্ম্মপদ বাচ্য নহে। তবে ইহা কি? ইহা সেই অচিন্তাব্যক্ত অনাদি অনন্ত জীবন প্রবাহে মিলিত হইবার জন্য সান্ত জীবনের আকুল আকাঙ্ক্ষা; পরমাত্মার পবিত্র জ্যোতি সন্দর্শনের নিমিত্ত সংসার তমিস্রায় পথভ্রষ্ট জীবাত্মার কাতর আবেদন; সেই সর্ব্বেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য মানব হৃদয়ের অতৃপ্ত অনুসন্ধিৎসা।

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * বাস্তবিক প্রত্যক্ষানুভূতির উজ্জ্বল দিবালোকে প্রবেশ না করিলে, প্রকৃত ধর্ম্মপথের পথিক বলা যায় না। আজ কালকার ধর্ম্মবীরের কথা— "আমি যাহা বলি তাহা কর, যাহা করি তাহা করিওনা।" অর্থাৎ আজকাল কেহই ধর্ম্মের অনুভূতিলাভ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদি যে সমস্ত কষ্টসাধ্য

* এগুলি ধর্ম্ম শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ নহে। Loose thinking গত একদেশিক উপপত্তি মাত্র যথা। পং সং

ব্যাপার আছে তাহার অনুষ্ঠান করিতে চাহেন না। সকলেই শুধু বাক্-সর্ব্বস্ব উপদেষ্টা—ধার্ম্মিক। আমরা অজ্ঞতার কুহেলিকাময় রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতে, হৃদয়ে সত্য তত্ত্বের হেমোজ্জ্বল স্নিগ্ধালোক জ্বালিতে না জ্বালিতে, ধর্ম্মলাভ হইয়াছে বলিয়া প্রচার করি এবং নিজেকে একটী ছোট খাট অবতার বলিয়া খাড়া করিতেও পশ্চাৎপদ হই না। শুধু ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিলে বা লম্বা-চওড়া বাক্যব্যয় করিয়া বক্তৃতা দিলে, কিম্বা ধর্ম্মের কতকগুলি শুষ্ক বাহ্যানুষ্ঠান অবলম্বন করিলে ধর্ম্মলাভ হয় না। বাস্তবিক প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত ধর্ম্ম, ধর্ম্ম নামেরই যোগ্য নহে। এক বিন্দু ধর্ম্মানুষ্ঠান ও অপরোক্ষানুভূতি রাশি রাশি বাক্‌প্রপঞ্চ ও মূর্খ সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস হইতে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠতর" * নানাধর্ম্মের নানা মত ও পথ আছে। যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর কিছু না কিছু বিবাদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল ধর্ম্মের মধ্যে প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্মের সার। আর ইহাই ধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাব। তাই ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে আপাততঃ বিরোধ দৃষ্ট হইলেও, উহার মূল উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষানুভূতির বিমলালোকে উপস্থিত হওয়া। কোনও সাধু মহাজন বলিয়াছেন,—

"উদ্দেশ্য নাহিক ভেদ, এক ব্রহ্ম, এক বেদ,
যোগ, ভক্তি, পুণ্য, এক উপাদানে গঠিত।
এক ছাঁদে গড়া দেহ, এক দয়া, এক স্নেহ,
হৃদে হৃদে বহে রক্ত এক বর্ণ লোহিত ॥
ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ,
কিন্তু এক গম্য স্থান।
যে যেমন পারে, ট্রেণে ষ্টীমারে,
হোক সেথা আগুয়ান।"

ইহাই ধর্ম্মের মূল কথা, ভিন্ন ভিন্ন পথ হইলেও গম্যস্থান সেই এক ব্রহ্ম। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান আপাততঃ পৃথক হইলেও, সকলেই সেই সর্ব্বশক্তিমানের অংশ—ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ। জ্ঞানীর চক্ষে—ভক্তের চক্ষে—সর্ব্ব ধর্ম্মের বিশেষ সারবত্তা আছে। শুনা যায় শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ দেব সাধনের প্রথম অবস্থায় নানা ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন। কখন ফকিরের বেশে আল্লার জন্য, কখন 'রাম' 'রাম' বলিয়া হনুমান সাজিয়া শ্রীরামচন্দ্রের জন্য গাছে গাছে বেড়াইতেন; আবার

* স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত ভক্তিযোগ।

কখনও বা স্ত্রীলোকের বেশ হাবভাব ধারণ করিয়া শ্রীনন্দদুলালকে স্বামীরূপে ভাবনা করিতেন, আবার কখনও বা 'মা' 'মা' বলিয়া আবেগভরে অনন্ত ভাবোচ্ছ্বাসে শ্যামামায়ের চরণ-পদ্মে ভক্তি চন্দন-চর্চ্চিত রক্তজবা দিয়া আত্মানন্দে বিভোর হইতেন। সাধক চরিত্রের কি অপূর্ব্ব মহত্ত্ব! সাধকের ঈশ্বরের জন্য কি অপূর্ব্ব ব্যাকুলতা! ধর্ম্মের জন্য—ঈশ্বরের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা না থাকিলে এরূপে কেহ আপনহারা হইয়া আরাধনা করিতে পারে না।

ধর্ম্মে আর ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই। যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই ঈশ্বর। "নিয়ন্তৃত্বাদ্রূপং ধর্ম্মস্য" (কর্ম্মমীমাংসা) ঈশ্বর জগতের নিয়ামক এবং ধর্ম্ম দ্বারা জগৎ পরিচালিত হইয়া থাকে, এই হেতু ধর্ম্ম ভগবদ্রূপ। সাধকের যখন ধর্ম্মপিপাসা প্রবল হয়, যখন তিনি ধর্ম্মকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান করেন, তখন আর তিনি প্রলোভনের সহসা তরঙ্গাঘাতে বিচলিত হন না। রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপথে থাকিয়া লোকাতীত যন্ত্রণা অবাধে সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কঠোর জীবনসংগ্রামে যে তিতিক্ষা, যে অধ্যবসায়, যে সত্যনিষ্ঠা এবং ধর্ম্মের উপর অকপট অনুরাগ ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা দুর্লভ। একমাত্র ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া ন্যায়ের—সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই কত কত মহাত্মা প্রাসাদবাসী রাজাধিরাজ হইয়াও স্বেচ্ছায় হাসিমুখে ভিক্ষুকের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া ধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যিনি ধর্ম্মের জন্য নিজের সুখশান্তি নষ্ট করিয়া, এই সংসার আহবে জয়পতাকা উড়াইতে পারেন, তিনি প্রকৃত মহাপুরুষ—তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক।

তা'ই বলিতেছিলাম ধর্ম্মই যাঁহার একমাত্র অবলম্বন, তিনি এ জগতে কোন দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার পক্ষে দুঃখ, দুঃখই নয় ত'; এ যে তাঁহার আশীর্ব্বাদ। তিনি সমস্ত দুঃখ কষ্টকে আনন্দে ও হাসিমুখে গ্রহণ করেন; আর বলেন,—

"বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
দুঃখ নয় মা দয়া তব, জেনেছি মা দুঃখহরা,
সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে,
তাই বহিতেছি শিরে সুখ দুঃখেরি পশরা।"

দুঃখ কিসের? দুঃখ যতই ভোগ হয়, ততই মঙ্গল। বুঝিতে হইবে এক একটী দুঃখ ভোগ হইলে, এক একটী সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইল। "এ যে

মায়ের স্নেহের শাসন, মায়ের দেওয়া দুঃখ তাপ, জন্মার্জ্জিত পাপ নাশ করে। সন্তান-বৎসলা মা আমাদের সন্তানের মঙ্গলের জন্যই ব্যস্ত! সন্তানকে কখন হাঁসান, কখন কাঁদান, কখনও কোলে করেন, আবার কখনও বা শাসনের জন্য কোল হইতে নামাইয়া দেন। সন্তানের মঙ্গলামঙ্গল মা যেমন বুঝেন, এমন আর কে পারে? তাই মা ছেলেকে শুধুই আদর দিতে ভালবাসেন না। বেশী আদর দিলে ছেলে যে বিগড়াইয়া যাইবে—উদ্ধত হইবে। তাই মা আমাদের সুখ দুঃখের কোমল কঠোর আঘাতে ছেলেকে সুশিক্ষা দেন। ধার্ম্মিক কখনও মায়ের দেওয়া দুঃখ তাপে অধীর হন না। তাঁহার লক্ষ্য ধর্ম্ম—ভগবান। ভক্তের প্রার্থনা দুঃখ—মুক্তি নয়, কেবল সেই চিরবাঞ্ছিতের স্নিগ্ধ নির্ম্মল আলোকোজ্জ্বল অনুভূতির জন্য। ধার্ম্মিক দুঃখের বিনিময়ে চান, প্রেমময়ের পবিত্র চরণ সংস্পর্শ। ভক্ত কবি ঠিকই বলিয়াছেন,—

Impose upon me whatever hardships you please, give me nothing but the bread of sorrow to eat. Lay me in the cold hut of poverty and in the thorny bed of disease. Set death before me with all its terrors; do all this—only let me pillow my head in the bosom of Omnipotence" (Lord Brougham) অর্থাৎ আমার দুর্ব্বল মস্তকে দুঃখের দুর্ব্বহ ভার নিপতিত হয় হউক। শোকের সুতিক্ত রসে আমার মুখের গ্রাস তিক্ত হউক! অভাবের অগ্নিময় গহ্বরে এবং ব্যাধির কণ্টকময় শয্যায় আমার বাসস্থান হউক! বিশ্বাসভাজন বন্ধুগণের সঙ্গসুখে আমি জন্মের মত বঞ্চিত হই! মৃত্যু তাহার শত বিভীষিকায় পরিবৃত হইয়া আমার সম্মুখে অধিষ্ঠিত হউক!—কিন্তু সেই সর্ব্বেশ্বরের প্রতি অনুরাগ যেন আমার অচল থাকে; যেন সেই সর্ব্বশক্তিমানের স্নেহময় বক্ষে আমার পরিশ্রান্ত মস্তক বিশ্রাম লাভ করে।" ধার্ম্মিকের ইহাই কামনা—ধার্ম্মিকের কামনা শুধু ধর্ম্মের সহিত—ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করিবার জন্য। ধর্ম্মের অনন্ত পথ আছে; তন্মধ্যে যে কোন্‌টী সম্যক্‌রূপে অবলম্বন করিলে, ওই ঊর্দ্ধে প্রেমময়ের রাজ্যে শান্তিময়ের নিভৃত কুঞ্জে, জ্যোতির্ম্ময়ের রত্ন সিংহাসন তলে, যেখানে ব্যাস, বশিষ্ঠ, বামদেব, যেখানে শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য, দীপ্ত পাইতেছেন, সেখানে, হের ভাই ধর্ম্মপথের পথিক! তুমিও তাঁহাদের পদরেণু মাখিয়া পূতসলিলা অমৃততোয়া মন্দাকিনীর শীতল সলিলে অবগাহন করিয়া ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইয়া দুর্লভ

মানব জনম সার্থক করিতে পার। আর—আর যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর ধর্ম্মের পথ কি? আমি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের উক্তি আবৃত্তি করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিব—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

ধর্ম্ম]

সমস্যা।

এ যুগের নব্য ছাত্রবৃন্দের সহিত নিভৃতে আলাপ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম্মহীন আধুনিক শিক্ষা তাহাদের মনের ভিতর কি ভয়াবহ দুর্নীতি সকল বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ও ইতিহাস হিন্দু ছাত্রের লক্ষ যুগের আস্তিক্য জ্ঞান এবং সদসৎ বিচারবুদ্ধি একেবারে হৃদয় হইতে মুছিয়া দিতেছে। বাংলা দেশের প্রত্যেক বি-এ, এম-এ, এখন ধর্ম্ম ও কর্ম্মের প্রচারক। ভাবের বশে যখন যে খেয়াল তাহাদের মাথায় উঠে, তাহাকেই চরম সত্য ভাবিয়া সমাজের ঘাড়ে বজ্র-নির্ঘোষে ফেলিয়া দেয়। তাহারা শিখিতেছে, যে সমাজের কল্যাণ উদ্দেশে কোন সাধনাই হেয় নয়, কোন বন্ধনই দৃঢ় নয়, কোন নিয়মই রক্ষণীয় নয়, কোনো পথই জঘন্য নয়! তাহাদের বিশ্বাস, যে অতিরিক্ত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বাংলার লোক অলস, অকর্ম্মণ্য এবং দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও সামাজিক নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া হিন্দু জাতি মর-মর; ধর্ম্মের 'সূক্ষ্ম তত্ত্ব' জাতির মজ্জা হইতে চলিয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে শুষ্ক, জীর্ণ, বিকৃতায়তন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপী কঙ্কালখানি! এইরূপ রোগ নির্ণয় করিয়া তাহারা ব্যবস্থা স্থির করিয়াছে, যে ধর্ম্মকে এখন মাথায় রাখিয়া কর্ম্মকে বরণ করা হউক। তমোগুণে দেশ ভরিয়া গিয়াছে; অতএব রজঃ শক্তির আবাহন কর। ভগবান যদি থাকেন, তবে তিনি পটেই আঁকা থাকুন; তাঁহার সহিত আমাদের এখন কোন বাধ্য-বাধকতা অনুমিত হইতেছে না, অতএব তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবার দিন এখন গিয়াছে! এই সকল সরল, সুগভীর তত্ত্বের মীমাংসকদিগকে প্রমাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাসের বাক্য পাঠ করিয়া শুনায়; মিল্, হেগেল্, স্পেন্সার প্রভৃতি মনীষিদিগের গবেষণা অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যায়! হিন্দুর ঘরের ছেলের মুখে, কর্ম্ম-রহস্য ও সামাজিক তত্ত্বের এমন অকাট্য প্রমাণ ও সরল মীমাংসা শুনিতে হইবে, তাহা আগে কে ভাবিয়াছিল!

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের আমাদের জাতীয় ইতিহাস মনে পড়িতেছে। পাশ্চাত্য 'চাকচিক্যের' মোহ যখন এই বাংলাদেশে শ্রাবণের ধারার মত অবিরাম বর্ষিয়াছিল, তখন দেশের বড় বড় রথিবৃন্দ ঐরাবতের মত সেই স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন; এমন কি সুধী-সজ্জনদিগের মস্তিষ্কও ঐ মদিরায় কলঙ্কিত হইয়াছিল; রক্ষা পাইয়াছিলেন, কেবল সুদূর পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা। নিরক্ষর, ভক্তিপ্রাণ, নির্ভীক ব্রাহ্মণ সন্তানেরা জাতির মাথার মণিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার মহারথীরা স্থির করিয়াছিলেন, যে হিন্দুজাতির সনাতন ভিটেটিকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া, বনেদ্ হইতে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা একান্ত আবশ্যক; তাই তাঁহারা ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আঁতুড় ঘর পর্য্যন্ত, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত, সকল বিষয়েরই সংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিদ্রোত্থিত জীবনের উদ্যম, উৎসাহ, প্রচণ্ড ইং-বঙ্গ বক্তৃতা, সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি পদাঘাত ও তীব্র কষাঘাতের ইতিহাস মনে পড়িলে এখনো বুক কাঁপিয়া উঠে। তাঁহারা কতকগুলি হিন্দু ভাবকে বৈদেশিক শ্রীসম্পদে ভূষিত করিয়া, পাশ্চাত্য মজ্‌লিসে গৌরবের সহিত বাহির করিয়াছিলেন; এবং যে ভাবরাজি পাশ্চাত্য বিদ্যাবুদ্ধির চক্ষে অপ্রিয়, অশ্লীল অথবা নিষ্প্রভ ঠেকিয়াছিল, সে গুলির ঘাড় ভাঙ্গিয়া গঙ্গা-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, মহিলানীতি, কোন বিষয়েই হাত দিতে সঙ্কুচিত হন নাই; এক একটীকে ধরিয়া পাশ্চাত্য আদর্শ-নদীতে ডুবাইয়াছেন এবং মৃতপ্রায় করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে যে দুর্দ্দমনীয় বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, কটাক্ষ সুরদেবীর ছবি সদাসর্ব্বদা আলোকে, আঁধারে, স্বপ্নে, জাগরণে, নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইত, তাহার মোহন মূর্ত্তি মানসপট হইতে মুছিয়া ফেলিবার শক্তি, সে যুগের কম লোকেরই ছিল! সে ধাক্কা সাম্‌লাইতে সকলকেই অল্পবিস্তর বেগ পাইতে হইয়াছে; বহু যুগের সাধনালব্ধ সংযম-রত্ন হারাইতে হইয়াছে। সে মোহ এখনো সম্পূর্ণ কাটে নাই, সে স্বপ্ন এখনো একেবারে তিরোহিত হয় নাই; এখনো কাহারো কাহারো চিন্তা, ভাব, চাল-চলন ঐ রঙ্গে রঞ্জিত; নয়ন ঐ নেশার ঘোরে বিকৃত।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের সংস্কারক দলের এবং আধুনিক শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে মতের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। এ যুগের যুবকেরা কথায় বার্ত্তায় হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। কারণ হিন্দুর ধর্ম্ম, বেদান্তধর্ম্ম; এবং বেদান্ত যে ধর্ম্মের অন্ত, তাহা স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণ নিঃসন্দিগ্ধরূপে জগতে

প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মনের ভাব এই যে "ধর্ম্মচর্চ্চা দুই চারিজনে ভাল করিয়া করুন; তাঁহাদের চর্চ্চার ফল সুযোগ ও সুবিধামত শুনা যাইবে। আপাততঃ ধর্ম্ম করিবার সময় নাই, আগে উদরান্ন সংস্থানের চিন্তা করা দরকার হইয়া উঠিয়াছে।" পূর্ব্বাপরে আচরিত সামাজিকতা সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা বিশেষ অগ্রগামী বা উৎসাহী নয়, একেবারে অমনোযোগীও নয়। যাহা চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক; এবং যাহা দশে মানে, তাহারাও তাহা মানে। দশে যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দৃঢ় স্থাপন করে, তাহারা বিশেষ বাধা দিবে না; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির অভ্যুদয় বা পুনঃ স্থাপনা হইলে তাহারা আনন্দিত হইবে; এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণীরা যদি সকল গণ্ডী ছিন্ন করিয়া সমন্বয় করিয়া ফেলেন, তবে সে কি সুখের দিন হইবে, ছেলেদের এই কথা। কিন্তু তাহাদের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিলে বেশ বুঝা যায়, যে প্রবল প্রতাপান্বিত নানক সম্প্রদায়ের বিপুল বৈভবের পরিচয় পাইয়া, আত্মহারা যুবকবৃন্দ এক হাতে হিন্দুর পুরাতন প্রথাগুলি সংস্কারবশতঃ ধরিয়া আছে, আর অপর হাতে বিড়ালাক্ষী, বিধুমুখী পাশ্চাত্য লক্ষ্মীর গাউন ধরিবার জন্য লালায়িত। তাহারা আমাদের ভাবও চায়, উহাদের ভাবও চায়; মুখে বলে এস ভাই, এই উভয় ভাবের মিশ্রণে আমরা একটা বড় জাতিতে পরিণত হই। কিন্তু ইহাদের অন্তরের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য জাতিদিগের মত সর্ব্ব গুণান্বিত জাতি এ পর্য্যন্ত ইতিহাসে খুঁজিয়া মিলে না—মিলিবেও না; উহাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, বল, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও সভ্যতা যদি আপনাদের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা যায়, তবেই আশা; নচেৎ অন্যান্য পুরাতন জাতির ন্যায় আমাদেরও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্য জাতির হাব-ভাব, চাল-চলন, কথাবার্ত্তা পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার পঞ্চাশ বৎসর অনুকরণ করিয়া, পাইলাম—ঘৃণা—উভয় পক্ষ হইতে! জগৎ এক সুরে বলিয়া দিল—শতবার ধৌত করিলেও কয়লার মলিনতা দূর হয় না। দেব-দেবী, পূজাপদ্ধতি, আচার ব্যবহার, কুল মান যাহাদের জন্য ত্যাগ করিলাম, তাহারা ত' দু'টা মিষ্ট কথা বলিয়াও তুষিল না! তাহাদের শ্লেষবাক্যে ব্যথিত হইয়া সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মকে মনের মত করিয়া, জগতের আদর্শ ধর্ম্মে পরিণত করিয়া দিলাম; তবু কেহই আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল না! পাশ্চাত্য জাতি বিজ্ঞানের বড় ভক্ত জানিয়া, হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থরে থরে তাহাদের সম্মুখে সাজাইয়া দিলাম।

তবু আশা মিটিল না, দুর্দ্দশা ঘুচিল না, নীচতা দূর হইল না। পাশ্চাত্য মোহ-সমুদ্রে সপরিবারে ঝাঁপ দিয়া দেখিলাম, পার্থক্য সম্পূর্ণই রহিয়া গেল;—মাঝে পড়িয়া কুল হারাইলাম! সংস্কারক সম্প্রদায়ের এই কাতরোক্তি—তাহাদের উত্তরাধিকারী আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বোধ করিতেছি।

এই দুঃসময়ে সুদূর পল্লীগ্রামস্থ এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ-সন্তান কলিকাতার নিকটে এক বাগানে সনাতন ধর্ম্মের পেটিকাটি উন্মুক্ত করিয়া, শিক্ষিত সমাজকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। ছিন্ন চীরাবৃত বহুকালের পুরাতন পেটিকার মধ্যে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠমণি থাকিতে পারে, তাহা পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিমুগ্ধ হিন্দুসন্তান কখনো কল্পনা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন, যে হিন্দুর হিন্দুয়ানীই তাহাকে দারুণ দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়াছে; অতএব যতদিন হিন্দুয়ানীর ছায়ামাত্র থাকিবে, ততদিন সুখের মুখ দেখা দুরাশা মাত্র। তা'ই তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বিদেশী সাজিতে ছুটিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুই চারি জন যুবক, ব্রাহ্মণের স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান এবং অমানুষিক সাত্ত্বিক প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সেই সময় হইতেই স্রোত ফিরিয়াছে। তারপর পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় সন্তান মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ যখন হিন্দু ধর্ম্মের গৈরিক নিশান সুদূর আমেরিকায় বিজয়গর্ব্বে উড্ডীয়মান করেন, তখন এই অকূলে ভাসমান দরিদ্র হিন্দু জাতি, ধরিবার তৃণ দেখিতে পাইল; বহু যুগের পর তাহার ম্লানমুখে হাসি দেখা দিল। সে যে গৌরব করিয়া জগৎকে দেখাইবার মত অমূল্য সামগ্রীর একমাত্র অধিকারী, তাহা জানিয়া অপার্থিব আনন্দে তাহার মনপ্রাণ পূর্ণ হইল। *

একদিকে নৈরাশ্য, লজ্জা, ঘৃণা, অভিমান—আর একদিকে অভয় আত্ম-সম্মানবোধ, এই দুই ভাবের ভিতর দিয়া বাংলা জাতি আধুনিক অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদের চক্ষের সম্মুখে এখনো সকল প্রকার ভাবের অভিব্যক্তি জীবন্ত বিদ্যমান। তবে প্রথম যুগের সে উন্মাদনা, সে তীব্র মাদকতা এখন আর নাই,—বন্যার জল নামিয়া গিয়াছে। এখন সকলেরি তৈজস পত্রের দিকে লক্ষ্য পড়িতেছে; এখন স্থিরভাবে ঘর দ্বার সাম্‌লাইবার সময় আসিয়াছে। ভগবানের সংসারে কোন ভাবই বৃথা যায় না। বিপুল বন্যার 'পলি' পড়িয়া

* স্বামী বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্ম্মতথ্য জনসাধারণে প্রচার করেন, তাহা সত্য। কিন্তু Theosophical Society হইতে মূল রহস্যগুলি জগতে উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পং সং—

গিয়া যে সার প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ফলে জাতির মধ্যে একটা যে তীব্র জ্ঞান ও কর্ম্ম-স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে। সকলেই বলিতেছে—'জ্ঞানলাভ কর, তম, আলস্য, জড়তা দূর কর; মানুষের মত খাটিয়া খাও।' এখন জ্ঞান ও কর্ম্ম সমন্বয়ের যুগ আসিয়াছে।

এদেশে অধুনা প্রচলিত ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের সোণার চাঁদ ছেলেদের যৌবনের সকল স্ফূর্ত্তি, সমস্ত শক্তি অপহৃত করিয়া, তাহার বিনিময়ে ছাই ভস্ম দর্শনের কচ্‌কচি আর বিজ্ঞানের সামান্য দু' একটা প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া সংসারে কঙ্কালমাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। তাহারা হিন্দু ধর্ম্মের কথা শুনিয়াছে মাত্র; তাহার সহিত পরিচয় করিবার সময় পায় নাই। কাজেই তাহাদের উদ্দেশ্য স্থির নাই, মতের ঐক্য নাই, ধারণার স্থৈর্য্য নাই। যে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বহুকাল পূর্ব্বে মীমাংসা করিয়া সমাজ মধ্যে আদর্শ জীবন স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন, আজ সমাজের এই বিশৃঙ্খলার দিনে নূতন করিয়া আবার তাহাই শিখাইতে হইবে! দশের দুঃখে সত্য সত্যই যদি কাহারো প্রাণ ব্যথিত হয়, যদি সমাজের কল্যাণ করিবার জন্য কেহ জীবনের সকল সাধ ও আহ্লাদ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে ভাল করিয়া দশকে চিনিতে হইবে; দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে হইবে, দেশের পল্লীগ্রাম, নগর, তীর্থ ও দেবালয় সমূহ দেখিতে হইবে; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য ও তাহার গতি প্রভৃতি বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কেবল পাশ্চাত্য দেশসমূহের ইতিহাস পড়িয়া, ঘরে বসিয়া কল্পনা সাহায্যে একটা ধারণা করিয়া লইয়া দশের কার্য্য করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না।

ভারতবর্ষের একটী তীর্থ বা পুরাতন গ্রাম যদি হিন্দুর চক্ষে কেহ দেখে, হিন্দুর প্রাণ লইয়া কেহ বুঝিবার চেষ্টা করে, তবে সে দেখিবে—যুগ যুগ ব্যাপিয়া কি মহান্ সুন্দর পবিত্র আশ্রমধর্ম্ম এই জাতির অন্তঃস্থল অধিকার করিয়া বিরাজমান ছিল এবং আজও আছে। সে দেখিবে যে এই হিন্দু জাতি রাষ্ট্রীয় হিসাবে যখন জগতের শীর্ষস্থানে আসন পাতিয়া বসিয়াছিল, তখন তাহার প্রাণপক্ষী উর্দ্ধাকাশে মুক্তবাতাসে উড়িতে উড়িতে যে বৈদিক মন্ত্র গান করিত, আর এই দুর্দ্দিনেও কাঙ্গালের বেশে সেই জাতি সাংসারিকতার বদ্ধ পিঞ্জরে বসিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে সেই মন্ত্রই বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিতেছে। প্রভেদ ঘটিয়াছে আবরণের; ভাবের ঘরে চুরি হয় নাই, প্রভেদ হইয়াছে সুর গ্রামের। মন্ত্রগুলি

এখনো জীবিত—এখনো স্পন্দনশীল। আছে সব, কেবল ভস্মে ঢাকা পড়িয়াছে মাত্র। তখন সুর ছিল গম্ভীর, তেজঃপূর্ণ, প্রতি স্পন্দনে ভাব ফুটিয়া উঠিত; প্রতি নিশ্বাসে পবিত্র গন্ধে দিক্ আমোদিত হইত। এখন সুর বড় মৃদু, প্রায়ই করুণোদ্দীপক, নিভৃতে, গুহার মধ্যে ধ্বনিত হয়, এখন ভাব চাপিয়া রাখিতে হয়, কাজেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। তখন নটবর শ্যামসুন্দর বংশীধ্বনি করিয়া ভক্তের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেন; এখন তাঁহাকে সাধকের হৃদয়-মন্দিরে লুকোচুরি খেলিয়া বেড়াইতে হইতেছে;—প্রভেদ এই মাত্র। এখনো ঐ বিরাট্ হিন্দু জনসঙ্ঘ প্রাতঃসন্ধ্যা শঙ্খধ্বনি সহকারে অন্তঃকরণ-বৃত্তি ইষ্টাভিমুখী করে; দরিদ্র, অন্ধ, আতুরকে এক মুষ্ট অন্ন প্রদান করে, গুরু, সাধু, ফকিরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, এবং বংশে এক ব্যক্তি সিদ্ধ হইলে চতুর্দ্দশ পুরুষ চরিতার্থ হইল মনে করে। এখনো এই জাতির মধ্যে সহস্র সহস্র লোক সাধন উদ্দেশে সকল পার্থিব সাধ আহ্লাদ বিসর্জ্জন দিয়া, অতি কঠোর যোগপথ অবলম্বন করিয়া আছে; তাহাদের এক একটী জীবনের বিপুল চেষ্টা ও প্রাণান্তক সাধনার ব্যাপার দেখিলে, বড় বড় বীরের বীরত্বকাহিনী তাহার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ বোধ হয়। এই ভীরু, মুগ্ধ, অলস, অকর্ম্মণ্য, হিন্দু,—যাহার দুঃখে আমাদের প্রাণ 'অবসর মত' কাঁদিয়া থাকে, এই দুর্ব্বল, মৃতপ্রায় হিন্দু যখন ভগবান্ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়, তাহার হৃদয়-যন্ত্রে যখন নামের বাজনা বাজিয়া উঠে, তখন জড়তা ভয়ে পলাইয়া যায়, স্বয়ং যম তার দিকে ঘেঁসিতে সাহস করে না। সে সাধনা, সে উন্মাদনা, সে ভাব-প্রবণতা জীবে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুর জীবন এই সুরে বাঁধা; এই মন্ত্রে তাহার দীক্ষা; ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য সে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসে; অন্য কোন বিষয়ে তাহার উদ্যম, উৎসাহ, বল বুদ্ধি এমন তীব্র বেগে প্রকাশ পায় না। লক্ষ যুগ ধরিয়া হিন্দু সদসৎ বিচার করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যা অবিদ্যার স্বরূপ সাধনা করিয়াছে; যাহা দু'দিনের জন্য, যাহা কালে লয় পাইবে, সেই আপাতঃ-মনোহর প্রেয় বস্তুকে তাহার মন অসৎ জ্ঞানের বন্ধন জানিয়া ত্যাগ করিতে শিখিয়াছে। হে বিদ্বন্, তোমাদের দুদিনের ভাবের ছটায়, ফেনায়িত কথার মোহে, তাহার গতি কি ফিরিয়া যাইবে? তাহার লক্ষ বৎসরের সাধন-পথ কি রুদ্ধ হইয়া যাইবে?

এই মহান্ আদর্শে যে জাতির দৈনিক জীবন গঠিত, যাহার শাস্ত্র বর্ণে বর্ণে, ছত্রে ছত্রে অমৃতের উৎস খুলিয়া রাখিয়াছে, যাহার সমাজ এই দুর্দ্দিনেও চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রসব করিতেছে, সে জাতিকে ক্ষুদ্র কাচখণ্ড

দেখাইয়া কাঞ্চনের ভ্রমে পাতিত করিবার চেষ্টা কি বিফল হইবে না? জগতে কোন্ জাতি এই আদর্শকে জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে এমন করিয়া মাথায় করিয়া রাখিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি এই তেজের নিকটে মাথা হেঁট না করিয়া পারিয়াছে? তবে কেন আমরা আদর্শকে খাটো করিতে চাই? স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সাধ করি? সমাজদেহ ব্যাধি-দুষ্ট হইয়া থাকে, তাহার চিকিৎসকের বা ধর্ম্মের গৃহে যদি অধর্ম্ম প্রবেশ করিয়া থাকে, ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দাও; যেখানে মন মুখ এক না দেখিবে, তমে সত্ত্ব ভ্রম দেখিবে, শাঁস ফেলিয়া খোলা লইয়া টানাটানি দেখিবে, সেখানে তোমার সাধন দৃষ্টির, তোমার ব্রহ্মচর্য্যের, তোমার শাস্ত্রজ্ঞানের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। ভাণের কৃত্রিম পোষাক টানিয়া ফেলিয়া দাও। বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ কর, শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা কর। আদর্শকে খাটো করিবার কল্পনা মনেও আনিও না। যতদিন সাধনার দ্বারা, শাস্ত্র জ্ঞানের দ্বারা এই বৃহৎ কর্ত্তব্য ভার স্কন্ধে লইবার সামর্থ্য না আসে, যতদিন চাপরাস না পাও, আদেশ না আসে, ততদিন সাধুবাক্য মহাজনের পন্থা মানিয়া যাও, অনুসরণ কর। সেবা ব্রতে মন প্রাণ ঢালিয়া দাও।

যতীন—

কাম]

আকিঞ্চন।

১। এত দিন গেল চ'লে, মিছে শুধু কোলাহলে,
হ'ল নাকো নাম করা তাঁ'র।
সে প্রেমে নাহিক তৃষা,— নাহি সে চরণে আশা,
অসীমেতে নাহি ধায় আর।

২। নাহি ধৈর্য্য পদে পদে, না পূরিল ক্ষুদ্র সাধে,
বিধাতারে দুষি বারে বারে,
তবুও দেখি না, স্বামি! কতখানি দিলে তুমি
প্রতিদান নাহি পেলে ফিরে॥

৩। তুমি চাও বক্ষে নিতে; আমি সরি তাহা হ'তে,
কি অন্ধ, এ হৃদয়-লোচন!
ক্ষম নাথ সব দোষ, দাও শক্তি, নাশ রোষ,
কর দেব এ মোহ মোচন॥

শ্রীমতী লীলাদেবী।

কাম]

সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে।

'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং, বিদ্যাবধূজীবনং।
লাবণ্যাম্বুধিবর্দ্ধনং, প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপণং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তণং।"

১।— কাহার ভকতি করিছে প্রচার?
পুরাণ বঙ্গে সুখেরি রঙ্গে, বাজিত যে ভেরী পবন সঙ্গে
সেই ভেরীনাদ, সেই সমাচার;—
ধরমের ভেরী সেই গো! আবার!

২।— সেই ভেরী আজি জাগিছে আবার!
বৈষ্ণবগণে বঙ্গ অঙ্গনে, মিলাইত যাহা বিশ্ব বন্দনে,
হিয়ার অপার সুখের আধার—
আজি কি তাহারি মধুর সঞ্চার!!

৩।— মধুর হিয়ায় মধুর সঙ্গীত!
প্রাণেরি উচ্ছ্বাসে স্তব্ধ হুতাশে, মিশায়ে আপনা আশ্বাস আশে
মানব গাহিছে ভক্তির গীত,—
কোথা সে ভক্তি, কোথা সে অতীত?

৪।— তটিনীর কূলে তটিনীর সনে,
কীর্ত্তন জাগে কীর্ত্তিপরাগে ধবলিয়ে কাল নিরাশারি দাগে,
উপরে তুলিয়ে মানবেরি মনে,
পাপ তাপ হ'তে ভুলায় আপনে!

৫।— ভুলায়ে নিয়ত মোহিত মানবে—
ঐ তরঙ্গ ছাইল অঙ্গ, সুখের লহরে ভাসিল বঙ্গ,
ভাসায়ে অসার ভবের বিভবে,
জাগায়ে চিতের মৃত কলরবে।

৬।— কলরবে ভরা সাঁঝের সময়ে,
আনিয়ে শান্তি, হৃদয় ধ্বান্ত নাশিয়ে, কুটিল অমল কান্ত,
মলিন মরতে পশিল অভয়ে,
মরমে তুলিল ভকতি বিস্ময়ে

৭।— ফুটিয়া উঠিয়া তারকা বিস্ময়ে,
আপন শব্দ শুনিয়ে স্তব্ধ, মিটিমিটি দিঠি করি' আরব্ধ,
রহিয়া চাহিল আকাশ অবশ আলয়ে,
শান্তি জাগিল শান্তি আশয়ে।

৮।— শান্তিতে মজি নাচিল হৃদয়,—
ছিন্ন বাঁধন মর্ম্ম তখন, ভুলিল নিখিল আপন বেদন,
ঝরিল তা' হ'তে, কোমলতাময়
অমিয়-মাখান' ভাবের উদয়।

৯।— এ অমিয়ে ভরা ছিল ত' মানব ;—
অলস বঙ্গে ঘটিত রঙ্গে, সুখের সদনে ভব-তরঙ্গে,
কত ভক্তির লীলা অভিনব,
কত মহতের মহাভাব সব !!

১০।— সে ভকতি কোথা, কোথা সে অতীত ?
শান্তির ধার স্বর্গ দুয়ার, হৃদি ফুলহার ভক্তি অপার,
কোথা গেল বল, কোথা বা রাজিত,
বলনা কোথায়, কোথা সে অতীত ?

১১।— অতীতের স্মৃতি পশিল হিয়ায় —
কোথা 'চৈতন্য' ভকত ধন্য, 'প্রসাদ,' সাধক, কোথা বা অন্য,
কোথা সেই যুগ, ফুটিত যাহায়,
ভক্তি-আকৃতি মোহন কায়ায়।

১২।— দরিদ্র বাঙালা আপনা ভুলেছে—
আপন রঙ্গে, পরের যত্নে, ল'য়ে তুলে' দিতে মোহের স্বপ্নে,
শিখেছে! তা' বলে' নাহি হারায়েছে
কভু ধর্ম্মভাব, বিমুখ হ'য়েছে।

১৩।— বাজুক বঙ্গে সে ভেরী আবার !
শান্ত নিস্বন, ব্যক্ত গগন, আমাদের মন ভক্তিপ্রবণ,
চিরকাল তরে বাজুক আবার,
হউক সাধের ভক্তি প্রচার !!

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।)

অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যানা যে, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এমনই ভাবোন্মাদকর এক পবিত্র সময় বিরাজমান ছিল, যে সময় ভারতীয় মনীষিমণ্ডলীর মানসাকাশে বৈদিক-ধর্ম্মময় শারদীয় পূর্ণ শশধরের বিমল স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে নিরন্তর সমুদ্ভাসিত ছিল ; কখনও তাহার অবসান ছিল না। সংশয়-কুজ্ঝটিকায় দিগন্ত আবৃত ছিল না ; বিতর্ক-বাত্যার বিষম বিবর্ত্তে প্রখর রজঃ-পসর ছিল না ; বিতণ্ডা বাদরূপ মহামেঘের গভীর গর্জ্জনে গগনতল প্রকম্পিত হইত না ; প্রবল প্রতিপক্ষরূপ ভীষণ অশনি নিপাতেরও আশঙ্কা ছিল না। পক্ষান্তরে ঈশ্বরে ভক্তি, বেদে বিশ্বাস, জন্মান্তরে দৃঢ় প্রত্যয় এবং গুরু-বাক্যে অচলা শ্রদ্ধা দৃঢ়বদ্ধ ছিল। সেই স্মরণীয় পবিত্র সময়ে ভারতের বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলেই অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার এবং ধর্ম্মরত্নের অপূর্ব্ব-আকর বেদরূপ কল্পতরুর স্নিগ্ধ শীতলচ্ছায়ায় বসিয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে নিজ নিজ অভীষ্ট ফল লাভে পরিতুষ্ট ও কৃতার্থ হইত। কাহারো প্রতি তর্করূপ কর্কশ কষাঘাতের আবশ্যক হইত না। কিন্তু দুরন্ত কাল কাহারো মুখাপেক্ষা করে না ; সেই দুর্নিবার দুরন্ত কাল-চক্রের অমোঘ আবর্ত্তনে ভারতবাসীর সে সুখের দিন ফুরাইল, সে সুখের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল : একে একে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সংশয়ের সূক্ষ্ম রেখা দেখা দিল ; আবার তাহাই প্রবল জলদজালে পরিণত হইয়া বিষম দুর্দ্দিনের সঞ্চার করিল। প্রশান্ত সাধু-হৃদয়ও কুতর্ক কালিমায় মলিন হইতে লাগিল। অবশেষে বিতণ্ডাবাদরূপ প্রবল ঝটিকা সম্পাতে, দিন দিন, নিত্য নূতন নাস্তিকতার সৃষ্টি করিয়া চিরাচরিত সরল ধর্ম্মপথ পঙ্কিল ও দুর্গম করিয়া তুলিল, এবং খরতর বেগে দেহাত্মবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বেদ-তরুর শাখা সমূহ ছিন্ন ভিন্ন, বিপর্য্যস্ত ও শ্রীহীন হইল। তাহারই ফলে প্রশান্ত বারিধির ন্যায় স্বভাব, শান্ত, দূরদর্শী ঋষি-সমাজ নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা প্রাণপ্রিয় সনাতন ধর্ম্ম সংরক্ষণে বদ্ধ পরিকর হইয়া, আগন্তুক নাস্তিক্য-ব্যাধি বিনাশের উপায়োদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। রোগ বুঝিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে কোন ফল হয় না। তা'ই সুনিপুণ চিকিৎসককে অগ্রে তদ্বিষয়ে যত্নপর হইতে হয়। ঋষিগণও যখন বুঝিতে পারিলেন যে, এখন দেশে গুরুশিষ্য-ভাবের অভাব উপস্থিত হইয়াছে, সরল সত্যকথায় কাহারো হৃদয়

অধিকার করা সম্ভব নহে, তখন গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণ রোগের উপযুক্ত ঔষধ বোধে, যুক্তি-তর্ক-সমন্বিত বিবিধ দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে

দর্শনের প্রাচীনতা

বলা আবশ্যক যে, দর্শনশাস্ত্রগুলি গৌতমাদি ঋষির অভিনব সৃষ্টি হইলেও, দার্শনিক তত্ত্ব বা দার্শনিক বিচার-প্রণালী এদেশের চিরন্তন সামগ্রী। অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ—জীব, ব্রহ্ম, বন্ধ, মোক্ষ এবং জন্ম-জন্মান্তর চিন্তা—বিশেষতঃ জীবের আত্যন্তিক দুঃখ বিমোচনের উপায় উদ্ভাবনই বর্ত্তমান দর্শন সমূহের জীবন বা প্রধান উদ্দেশ্য। বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে, অনাদি-সিদ্ধ বেদের উপনিষদ্ ভাগের মধ্যে আমরা সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত দার্শনিক তত্ত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হই। দেখিতে পাই, প্রায় অধিকাংশ উপনিষদের মধ্যেই দর্শনের সূক্ষ্ম সূত্রগুলি অল্লাধিক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। এ কথার অনুকুলে ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠক আমরা বিশেষ উদাহরণরূপে উল্লেখ-যোগ্য বলিয়া মনে করি। তবে এই মাত্র বিশেষ যে, সময় ও সমাজের অবস্থানুসারে তৎকালে নিত্য সত্য তত্ত্ব-রত্ন গুলিকে অকারণ কর্কশ তর্কজালে জড়িত করা আবশ্যক ছিল না; তাহার পর যখন দেশে ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল, শান্তশীল ঋষি সমাজেও উদ্বেগ বহ্নির তীব্র তাপ অনুভূত হইতে লাগিল, তখন—স্বভাব-সুন্দর সুবর্ণ পিণ্ডকে যেমন উত্তাপ সহযোগে গালাইয়া নয়ন মনোহর নানাবিধ অলঙ্কারে পরিণত করা হয়, তেমনি দুরদর্শী ঋষিগণও উত্তেজনাবশে উপনিষদের সেই দার্শনিক তত্ত্ব গুলিকে নানা ছাঁচে ঢালিয়া আবশ্যক মত নানাকারে পরিণত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ছয়খানি দর্শনের সৃষ্টি করিলেন। আমাদের কথা ঋষি-সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি মাত্র; তাহারা বলিয়াছেন—"শ্রোতব্যঃ শ্রুতি বাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বাচ সতত ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ," অর্থাৎ বেদোপদিষ্ট বিষয়ে যখন শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে সংশয় সমুদ্ধিত হয়, তখন সেই সংশয় অপনোদনের জন্য মননের আবশ্যক হইয়া পড়ে। মনন অর্থে অনুকুল তর্কদ্বারা প্রতিকুল তর্ক খণ্ডন করা; যতক্ষণ প্রতিকুল তর্ক নিচয় খণ্ডিত না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই উপদিষ্ট বিষয়ে কাহারো দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। সেই শ্রুতার্থে দৃঢ় বিশ্বাস সমুৎপাদন করাও দর্শন শাস্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, দর্শন শাস্ত্র ছয়খানি হইলেও মূলতঃ তিনখানির অধিক নহে;—( ) ন্যায়দর্শন দুই—গোতম কৃত ও কণাদ কৃত। (২) সাংখ্য-দর্শন দুই—কপিল কৃত নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন, ও পতঞ্জলি কৃত যোগ-

দর্শন। (৩) মীমাংসা দর্শন দুই—জৈমিনি কৃত পূর্ব্বমীমাংসা, ও ব্যাস কৃত উত্তর মীমাংসা। উক্ত তিন শ্রেণীর দর্শনের মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, তাহার দ্বারা, উহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণের পথও অনেকটা সুগম হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা নিজ নিজ দর্শনে লোকের অধিকারানুসারে ক্রমশঃ স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম তত্ত্বের উপদেশ দ্বারা লোককে আত্মদর্শনে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, রোগ ও রোগীর অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়; দর্শন-কর্ত্তা ঋষিগণও তাহাই করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম

দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ

দেখিলেন,—দেহাত্ম-বাদ ও স্বভাব-কারণতা-বাদের উপরেই নাস্তিকতা রূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠিত; সেই দুইটি ভিত্তি বিনষ্ট করিলেই নাস্তিকতা নিরস্ত হইতে পারে; অথচ প্রথমেই অতি সূক্ষ্ম পরতত্ত্বোপদেশে লোকের হৃদয় আকর্ষণ করা সম্ভবপর হইবে না। তা'ই তিনি ন্যায়-দর্শনে প্রধানতঃ দেহাত্মবাদ খণ্ডনে এবং তদনুকুল তর্ক-বিন্যাসে অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম এইমাত্র বুঝাইয়াই নিরস্ত হইলেন যে, দেহ, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অচেতন জড় পদার্থ সমূহ আত্মার ভোগ্য ও ভোগ-সাধন মাত্র,—আত্মা নহে; আত্মা স্বয়ং নিত্য চেতন, কর্ত্তা, ভোক্তা, ইহলোক পরলোকগামী এবং দেহ ভেদে-ভিন্ন ভিন্ন; দেহ নাশেও তাহার নাশ হয় না, ইত্যাদি। তিনি আপনার প্রতিজ্ঞাত বিষয় সমূহ সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণের সাহায্যে বিপক্ষ পক্ষ পরাস্ত করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন।

অতঃপর, মহামুনি কণাদ দেখিলেন মহর্ষি গোতমের কথায় দেহাত্ম-বাদ বিধ্বস্ত হইলেও নাস্তিক-নন্দনগণের অভিনন্দিত স্বভাব-কারণতাবাদ খণ্ডিত হইল না। তাই তিনি গৌতমের অনুক্তাংশ পরিপুরণের জন্য পরমাণু-কারণ-বাদ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন,—একমাত্র বস্তু-স্বভাব কখনই এই জগৎ সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। স্বভাব নিজে অচেতন, ভাল মন্দ বিচারশক্তি তাহার নাই; সুতরাং দেশ কাল নির্ব্বিশেষে সর্ব্বদাই একাকার কার্য্য হইতে পারে; কিন্তু জগতে ত' তাহা কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ পরমাণু পুঞ্জের স্বভাবটী, সংযোগ না বিয়োগ? অথবা উভয়ই? কেবল সংযোগ-সাধন করাই পরমাণুর স্বাভাব হইলে কস্মিন্‌কালেও তাহার বিয়োগ-কার্য্য ধ্বংস হইতে পারে না; কারণ বস্তু কখনও

নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকে না; আর বিয়োগ স্বভাব বলিলে ত' আদৌ সৃষ্টিরই উপপত্তি হয় না। তাহার পর সংযোগ-বিয়োগ উভয় স্বভাব বলিলেও, পরস্পর বিবাদের ফলে উহাদের আত্মরক্ষা করাই দুর্ঘট; কার্য্য সম্পাদন করা ত' দূরের কথা। সুতরাং স্বভাব-কারণতা বাদ কেবল কৌতূহলমাত্র।

অতএব জীবের অদৃষ্ট-সহচর, ঈশ্বর-প্রেরণাধীন, পরমাণু পুঞ্জই জগতের আদি উপাদান কারণ; এবং পরমাণুগত 'বিশেষ' নামে যে এক প্রকার পদার্থ আছে, তাহা দ্বারাই পরমাণুর কার্য্য-বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। আত্মার নিত্যত্ব ও দেহাতিরিক্তত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গোতমের মতে মত দিয়া, মহামুনি কণাদও বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর মহর্ষি কপিল যখন দেখিলেন, মহর্ষি গোতম ও কণাদ প্রণীত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের প্রভাবে লোকের নাস্তিকতা হ্রাস পাইয়াছে, দেহাত্ম বুদ্ধি বিদূরিত হইয়াছে, এবং আধ্যাত্ম চিন্তারও প্রবৃত্তি আসিয়াছে, তখন তিনি সময় ও সুযোগ বুঝিয়া আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। তখন তিনি বিবেক-জ্ঞানোপযোগী আত্মতত্ত্বের উপদেশে মনোযোগী হইলেন; স্বপ্রণীত সাংখ্য-দর্শনে বুঝাইয়া দিলেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত আত্মাকে নিত্য, চেতন, কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া জানিলেই, প্রকৃত আত্মতত্ত্ব জানা যায় না। আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত সত্য, কিন্তু চৈতন্যবান্ নহে—চৈতন্যস্বরূপ, এবং কর্ত্তা ও ভোক্তা নহে—উদাসীন নিষ্ক্রিয়; কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি প্রকৃতির ধর্ম্মগুলি অজ্ঞানবশতঃ আত্মাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র। এই অজ্ঞান বা অবিবেকই জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখের মূল। এই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে প্রকৃতি হইতে আত্মার পার্থক্য বা বিবেক সাক্ষাৎকার উপলব্ধি করিতে হইবে; আর সত্ত্ব-রজস্তমো গুণাত্মিকা পরিণামশীলা নিত্যা প্রকৃতিকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বৈশেষিক পরিভাষিত পরমাণু পুঞ্জ বস্তুর তন্মাত্র স্থানীয় অনিত্য পদার্থ; সুতরাং মূল কারণ নহে। অধিকন্তু আপাতঃ রমণীয় নাস্তিক্য-বাদে বিমুগ্ধ মানব মণ্ডলীর মনস্তুষ্টির জন্য, তাহাদেরই মতানুসারে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত বাদ দিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু বিবেক-জ্ঞানের একান্ত উপযোগী আত্মার নিত্যত্ব, বিভুত্ব ও জন্মান্তর বাদ প্রভৃতি বিষয়গুলি কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না। সে সমুদয় বিষয়গুলি তিনি অতি উত্তমরূপে সংস্থাপিত করিলেন। কপিল এখানে অবসর গ্রহণ করিলেন।

এইবার মহামুনি পতঞ্জলির পালা। তিনি দেখিলেন এখন কপিলের সিদ্ধান্তে

কাহারো সন্দেহ নাই; সকলেই তাহার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিতেছে। এখন কপিলের অনুক্ত বা সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই কারণে প্রথমেই তিনি বিবেক-জ্ঞানোপযোগী যোগসিদ্ধির অন্যতম উপায়রূপে ঈশ্বরের অবতারণা করিলেন। তখনও একেবারে পরতত্ত্বোপদেশের উপযুক্ত সময় হয় নাই, মনে করিয়া ইতরজীব-সাধারণ ক্লেশকর্ম্মাদিদোষ-সংস্পর্শ-শূন্য ঈশ্বরকে 'পুরুষ বিশেষ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, এবং বিস্তৃতভাবে যোগ, যোগসাধন ও যোগফল নিরূপণ করিয়া যোগদর্শন শেষ করিলেন।

এইরূপে ন্যায়াদি দর্শনের প্রচার বাহুল্যে দেশে যে সময় নাস্তিকতার খর-স্রোতঃ ক্রমে ক্রমে মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল; শনৈঃ শনৈঃ জন্মান্তর চিন্তা আসিয়া লোকের হৃদয়কে অধিকতর কাতর করিতে লাগিল, এবং দেহাত্মবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া গেল; সেই সুসময়ে মহামুনি জৈমিনি মীমাংসা-দর্শন প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মীমাংসামাত্রই সংশয় সাপেক্ষ; যেখানে সংশয়, সেখানেই মীমাংসার আবশ্যক হয়। জনসাধারণ অন্যান্য বিষয়ে বিশ্বাসবান্ হইলেও বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে তখনও সন্দিহান্ ছিল; তখনও "একমেবাদ্বিতীয়ং" "সর্ব্বংখল্বিদং" প্রভৃতি বেদবাক্যের গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসামর্থ্য নিবন্ধন, বিশেষতঃ গুরু শিষ্য সম্প্রদায়ের বিরলতা বা বিচ্ছিন্নতা নিবন্ধন, বেদবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে মন্দোৎসাহ ছিল। তাই তিনি মন্দমতি লোকদিগকে ক্রিয়ানিরত করিবার ইচ্ছায় তাহাদের মনোবৃত্তি অনুসারে বুঝাইলেন যে, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বা দানর্থক্যমতদর্থানাম্" অর্থাৎ প্রচুর ফলপ্রদ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদের অভিপ্রেত। যে সমস্ত বাক্যে কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার উল্লেখ নাই, যেমন "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "একমেবাদ্বিতীয়ং" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি. সে সমস্ত বাক্য নিরর্থক,—বেদের অনভিপ্রেত। সুতরাং সে সমুদয় অনর্থক কথার অর্থ চিন্তায় ব্যাকুল হইবার আবশ্যক নাই; "তোমরা "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বুঝিয়া তদনুযায়ী ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহাতেই তোমরা পরকালের পরম কল্যাণময় ফললাভে কৃতার্থ হইবে।" জৈমিনির অভিপ্রায় এই যে বীতশ্রদ্ধ লোকদিগকে অগ্রে বেদের উপর শ্রদ্ধাবান্ করিতে হইবে, এবং বিহিত কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। কর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর লোকসমূহ যখন অল্প ও অনিত্য কর্ম্ম ফল অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যার ফলোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখন তাহারা আপনা হইতেই ব্রহ্মজ্ঞানে—ব্রহ্মবিদ্যালাভে সমুৎসুক হইয়া সদ্গুরুর শরণাপন্ন হইয়া কৃতার্থ

হইবে। মহামুনি জৈমিনি এই রূপ অভিপ্রায়ের বশেই স্ব-প্রণীত পূর্ব্ব-মীমাংসা গ্রন্থে কর্ম্ম সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম-কাণ্ডের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরস্ত হইলেন।

কিন্তু তখনও জন সমাজে জীব নিস্তারের এক মাত্র উপায় এবং বেদের চরম লক্ষ্য, ব্রহ্মবিদ্যা, গভীর অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া রহিল। এমনই দুঃসময়ে বিশ্ববিধাতা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইলেন। তিনি অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, যে, কর্ম্ম যোগানুষ্ঠানের মহিমায়, এবং বিবেক-বিজ্ঞানের প্রভাবে, ব্রহ্মবিদ্যা-সিদ্ধির অন্তরায় অনেক পরিমাণে অপনীত হইয়াছে বটে, কিন্তু, তখনও জীব-গণের অশান্তির উদ্বেগ অপসৃত হয় নাই। অথচ ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, বীজ বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া, বেদসার বেদান্ত ভাগের অর্থ ব্যবস্থাপক উত্তর-মীমাংসা প্রণয়নে সমুৎসুক হইলেন। উত্তর-মীমাংসার অপর নাম বেদান্ত-দর্শন ও ব্রহ্মসূত্র। তিনি বেদান্ত বাক্যরূপ মনোরম কুসুমরাশি সমাহরণপূর্ব্বক এই সূত্রে গ্রথিত করিলেন, এবং উপনিষদের মধ্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে যে সমস্ত বিরোধ বা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়, সে সমস্ত বিরোধ ভঞ্জনপূর্ব্বক তাৎপর্য্য নির্ণয়ের প্রণালী পরম্পরা অতি বিশদ্‌ভাবে নির্ণীত করিলেন। তখন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা যেরূপ তৈল-সেক সহযোগে পুনরুদ্দীপিত হয়, তদ্রূপ ক্ষয়োন্মুখ ব্রহ্মবিদ্যাও ইহার সাহায্যে আপন অধিকার বিস্তারে সমর্থ হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

ভাষা-তত্ত্ব।

মানবের হৃদয়গত-ভাবের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক ধ্বনি বিশেষকে (রব) 'ভাষা' বলা যায়। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে প্রাণী মাত্রেরই ঐরূপ মনোগত ভাব প্রকাশক একরূপ ভাষা আছে; কিন্তু মানব জাতির ভাষা ভিন্ন অপর পশু পক্ষীর ভাষা (রব) প্রায়ই অবোধ্য। পশু পক্ষিগণের মধ্যে শুক-শারিকা প্রভৃ-তির ভাষা মনুষ্যের অনুকরণে শিক্ষা হয় বলিয়া, তাহা সহজবোধ্য, সকল পক্ষীর বা পশুর ভাষা নয়। শুক শারিকারা যে মানবের ন্যায় শব্দোচ্চারণ করিয়া হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করে, তাহা তাঁহাদের নৈমিত্তিক, কিন্তু স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক হইলে, সকল পশুরই ঐরূপ মানবোচিত শব্দ করিবার শক্তি থাকিত।

মানুষের সন্তরণ শিক্ষা যেরূপ নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক নয়; মৎস্য মকরাদির প্রাকৃ-তিক; তদ্রূপ শুকাদিরও মানবোচিত শব্দ শিক্ষা অপ্রাকৃতিক। শুক প্রভৃতি কতিপয় পক্ষীর মানবীয় শব্দের শক্তি গ্রহণে ও ভাষণে অনুকূল সামর্থ্য আছে বলিয়া, তাহাতে কৃতকার্য্য হয়। কাক প্রভৃতি অন্য পক্ষীরা তাদৃশ শক্তির অভাবে তাহা পারে না।

প্রাণিগণ যে উপায় দ্বারা নিজের মনোগত ভাব অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি প্রকাশ করেন, তাহাকেই সাধারণে 'ভাষা' নামে অভিহিত করা হয়। যেরূপ কোন কোন দার্শনিক মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়াবস্থা ছিল, পরেও তাহাই হইবে; সেইরূপ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভাষারও উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা এবং পরে লয়াবস্থা থাকা সম্ভব। প্রাচীন ত্রিকালবিদ্ মহর্ষিগণ 'স্ফোটবাদ' প্রভৃতিতে ভাষাকে নাদ-মূলক বা নাদ-প্রভব * বলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম (শব্দব্রহ্ম) বা নাদ একই পর্য্যায় শব্দ। "সর্ব্বশক্তিমান্ এক সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর তত্ত্ব হইতে জগদ্বীজ-শক্তি মহামায়ার প্রাদুর্ভাব হয়; সেই চিন্ময়ী পরমা শক্তি হইতে নাদের সৃষ্টি হয়; এই নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয়॥"

"সেই চিতের শক্তিই নাদ, বিন্দু, বীজ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। সেই ভিদ্যমান বিন্দু হইতে নাদ ও বীজাত্মক 'রবে'র উৎপত্তি হয়। সেই রবই শ্রুতি-সম্পন্ন হইয়া (শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া) শব্দব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়"। শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ সেই নাদাত্মক ব্রহ্মকে দুইভাবে ব্যক্ত করিয়া-ছেন, প্রথম রূপ ব্যক্ত', দ্বিতীয় রূপ অব্যক্ত। তাহার মধ্যে প্রণবাত্মক ব্রহ্মনাদকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। এই অব্যক্ত নাদের পুনঃ পরা, পশ্যন্তী, বৈখরী, প্রভৃতি† সজ্ঞা ও প্রকার-ভেদ আছে। অর্থ বোধ জন্মাইতে সক্ষম ভাষাকে (বাক্য, পদ,

---

* সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততোনাদস্তস্মাদ্বিন্দু-সমুদ্ভবঃ॥
নাদোবিন্দুশ্চ বীজঞ্চ স এব ত্রিবিধোমতঃ।
ভিদ্যমানাৎ পরাৎ বিন্দোরুভয়াত্মা রবোভবেৎ।
স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ শব্দোব্রহ্মাহভবৎ পুনঃ॥

(†) নাগেশের শব্দেন্দু শেখর ক্রম, প্রকরণে। সিদ্ধান্তকৌমুদী। লঘুমঞ্জুষা। মহাভাষ্যে
"বৈখরীশব্দনিষ্পত্তি মধ্যমা শ্রুতিগোচরঃ।
আন্তরার্থাচপশ্যন্তী সূক্ষ্মাবাগনপায়িনী॥"
প্রণবএবব্যাশেদানাভ্যাং সহ বৈখরীরূপং প্রতিপদ্যতে।"
"পরাখ্যমেব নাভিপর্য্যন্তরাগচ্ছতা তেনবায়ুনাহভিব্যক্তং মনোবিষয়ঃ পশ্যন্তি বাগিত্যর্থঃ॥
বাগেবার্থং পশ্যন্তী বাগজীবীতি বাগর্থংনিহিতং সন্তনোতি।' ইত্যাদি (শ্রুতিঃ)

শব্দাদিকে) ব্যক্ত বলা হইয়াছে। এই স্ফোটবাদী শব্দ-তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রণব ও পরব্রহ্মকে একই তত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবশেষে এইরূপ লক্ষণ বলা যাইতে পারে যে, যে ধ্বনি দ্বারা নিজের হৃদ্‌গত ভাব সুব্যক্তরূপে অপরকে বুঝাইতে সমর্থ হয়, তাহাকেই ভাষা শব্দে শব্দিত করা হয়। এইরূপ আত্ম-ভাব প্রকাশের ভাষা কীটাদিরও আছে, তাহা আমরা তাহাদের বাহিরের ব্যবহার দ্বারা অনুমান করিতে পারি পাশ্চত্য দেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা উদ্ভিদাদির এ ভাষা স্বীকার করিয়া থাকেন।

জগতে সকল প্রাণীরই স্বীয় মনের ভাব, সুখ, দুঃখ, রোগ, শোকাদির বার্ত্তা স্ব স্ব জাতির অনাদি সংঙ্কেত দ্বারা (ভাষা) প্রকাশ করিবার স্বাভাবিক শক্তি বিদ্যমান আছে। যে কোন উপায়, সঙ্কেত কিম্বা ইঙ্গিত দ্বারা হউক, স্বজাতির নিকটে আত্মাভিপ্রায় প্রকাশ করিবার শক্তি, প্রাণী মাত্রেরই বিদ্যমান আছে—ইহা এক প্রকার অবধারিত। তাহার হেতু এই যে, বিভিন্ন প্রাণীর স্বর যন্ত্রের নানারূপ, সংস্থান নানা প্রকার থাকাতে নানারূপ শব্দের অভিব্যক্তি হয়। তাহাতে নানা শব্দ দ্বারা নানাবিধ অর্থের অববোধ হয়। গো-বৎসের হম্বা রব শুনিয় তাহার জননী (ধেনু) বৎসের অনুসরণ করিয়া থাকে ; এবং বৃক্ষ-কোটরস্থিত পিতামাতার আগমন প্রতীক্ষাকারী কলরব-পরায়ণ পক্ষী-শাবকগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সুদূরাবস্থিত পক্ষিগন স্বীয় সন্তান-রক্ষণের জন্য অতি বেগে ধাবিত হইতে দেখা যায়। বিহঙ্গম-শাবককুলের কলকল ধ্বনিতে তাহাদের পিতামাতা কলরবের অনুযায়ী সম্পদ্‌ ও বিপদের বার্ত্তা অনুভব করিয়া থাকে। কেবল যে এক জাতীয় জীবের মধ্যে পরস্পরের ভাষা বুঝিবার সামর্থ্য আছে এমন নয় ; এক জাতীয় জীব অপর শ্রেণীর প্রাণীর নিকট স্বীয় ভাষা দ্বারা মনের ভাব বুঝাইয়া থাকে, এবং ভাষা দ্বারা পরস্পরের শত্রুতা ও মৈত্রেয় ভাব জানিতে পারে। পশুগণকে স্বীয় ভাষা দ্বারা মানবদিগকে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে দেখা যায়। মদমত্ত সিংহের ভীষণ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া অপর বন্য পশুগণ পরস্পর শব্দ দ্বারা আত্ম-ভীতি জ্ঞাপন করে। তাহাদের ধ্বনির মধ্যেও হর্ষ-ব্যঞ্জক ও দুঃখ-সূচক ভাব বিদ্যমান থাকে। হর্ষ-সূচক শব্দ শ্রবণ করিয়া স্বীয় বন্ধুজনকে স্বাগত সম্বোধন জ্ঞাপন করে। অতএব প্রাণিজগতের মধ্যে ভাষাই, যে সর্ব্ববিধ-মনোগত ভাবাদির প্রকাশের হেতু, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রাণী-নিবহ যেরূপ অসংখ্য, তদ্রূপ তাহাদের ভাষাও বহু ; এক

একটী ভাষার মধ্যে অনেক প্রকার অবান্তর ভেদ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। পশুগণের ভাষা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জ্ঞানগুরু ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ব্যবহার কালে জ্ঞানী মানবগণ পশুদিগের সহিত সমান ; শব্দাদির সহিত শ্রোত্রাদির সম্বন্ধ হইলে পশু প্রভৃতিরা যেমন শব্দাদি জানিতে এবং জানিবার পর তাহারা অনুকুল দেখিলে প্রবৃত্ত হয়—প্রতিকুল দেখিলে নিবৃত্ত হয় ; জ্ঞানীগণও তদ্রূপ ঐ ভাবে শব্দাদি অবগত হইবার পর তাহারাও প্রতিকুল দেখিলে নিবৃত্ত হন ও অনুকুল দেখিলে প্রবৃত্ত হন।" * পশুগণ যেরূপ দণ্ডোদ্যত-হস্ত মনুষ্যকে স্বীয় অভিমুখে আসিতে দেখিয়া 'ইনি আমাকে মারিতে আসিতেছেন' এইরূপ ভাবিয়া পলায়ন করে এবং শ্যামল তৃণপূর্ণ হস্তে আগমন করিতে দেখিলে তাহার অভিমুখীন হয় ; সেইরূপ জ্ঞানী লোকেরাও আপনার সম্মুখে হুঙ্কার চণ্ডরবে রোষ-কষায়িত নেত্রে খড়্গ-হস্ত পুরুষ আসিতেছে দেখিলে পলায়ন করেন এবং তাহার বিপরীত দেখিলে তাঁহার অভিমুখী হন। যেরূপ মানবের ভাষা অপর প্রাণীর ভাষা হইতে ভিন্ন সেইরূপ মানবগণের ভাষাও দেশ, প্রদেশ, জাতিভেদে বিভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানবগণের ভাষা দেশভেদে বিভিন্ন হইলেও মাধুর্য্য ওজঃ প্রভৃতি গুণে এবং অপর প্রাণীকে বিজ্ঞাপনে ও সংস্কার দ্বারা উৎকর্ষ সাধনের যোগ্য। ভাষাবলে মানব যেরূপ অশেষ কার্য্য সাধন করিতে পারে, তাহা অন্য প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রীক দেশীয় কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন,—যে "ভাষা দ্বারাই মানবগণ ন্যায়, অন্যায় সত্য অসত্য, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয় বুঝাইয়া থাকে, এবং হিতাহিত বিবেক করিতে সমর্থ হয়। অন্য প্রাণী হইতে ভাষার উৎকর্ষ সাধনপূর্ব্বক জ্ঞান দ্বারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া উচ্চ ভাষা ব্যবহার করে"। ভাষার উৎপত্তি কিরূপে হয়, এই বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ বলেন, ভাষা ঐশী-শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কোন মানব ইহার ব্যবহর্ত্তা ভিন্ন স্রষ্টা নয়। পাশ্চাত্য বুধগণ বলেন,—বিশ্ব সৃষ্টির পর সকল বস্তুই বাক্‌শক্তি রহিত ছিল, তাহারা স্বীয় স্বীয় অঙ্গভঙ্গী ও সঙ্কেত দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিত। যে সময় হইতে অঙ্গভঙ্গী ও সঙ্কেত দ্বারা নিজের মনোভাব সকল ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইল, সে সময়ে তাঁহাদিগের হৃদয়জাত মনের ভাব-ব্যঞ্জক কোন একটী ধ্বনির উৎপত্তি হইল ; সেই ধ্বনি দ্বারা

* "যথাহি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি শব্দাদি বিজ্ঞানে প্রতিকুলেজাতে ততো নিবর্ত্তন্তে অনুকুলেব প্রবর্ত্তন্তে। শাঙ্করভাষ্য, অধ্যাসপ্রকরণ। ১।১।১।

তাঁহারা কোনরূপে মনের ভাব প্রকাশ করিত। তখন তাঁহাদের প্রযুজ্য শব্দ পরস্পর সংবদ্ধ ছিল; দুঃখ শোকের প্রকাশক 'অঃ', 'উঃ', ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিত; এবং সুখ হর্ষের পরিব্যঞ্জক 'বাঃ' 'আহা' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতে ভালবাসিত। এখন এই সকল শব্দকে শাব্দিকগণ নিপাত ও অব্যয় বলিয়া উল্লেখ করেন। এই প্রণালীতে তাঁহারা যখন সমস্ত মনের ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না, তখন পুনঃ ঐরূপ দুইটী বা তিনটী শব্দ এক সঙ্গে যোগ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে যত্ন করিল। এইরূপ বারবার শব্দ সংযোজনে ও প্রয়োগে যত্ন ও ব্যবহার করিতে করিতে, এক অপূর্ব্ব মনোহারিণী, সকল ব্যবহার নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী ভাষার বিস্তার ও [illegible]শ হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও সকল পণ্ডিতের এই মত স্বীকৃত নয়; যেহেতু "নানা মুনির নানামত"। অপর একদল বলেন,—ভাষা ঈশ্বরের সৃষ্ট; এই ভাষা দ্বারা সকল বস্তুরই নামকরণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ ভাষা-সূত্রে নাম-প্রসূনাবলী যেন গাঁথাই ছিল। তাঁহাদের 'আদম' বা আদি মনু প্রথমে ভাষার অধ্যয়ন করেন, তৎপরবর্ত্তী সৃষ্ট মানবগণ ভাষা শিক্ষা করেন। ইহাকে কোন কোন পণ্ডিত প্রাচ্য ভাষা-তত্ত্ববিদের মত বলিয়া স্বীকার করেন। অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিত উক্ত উভয় প্রকার মতের মধ্যে কোন মতই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—স্বভাবতঃই মানবের ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে; ভাষার উৎপত্তিতে কোন মানবের চেষ্টার প্রয়োজন হয় নাই। কিম্বা ঈশ্বর মানবগণকে ভাষা শিক্ষা দেন নাই। প্রাণীগণের মন ও শরীরের সংস্থান এবং গঠন অনুসারে স্বতঃই ভাষার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মানব যেরূপ স্বাভাবিক শরীরাদির সঞ্চালন দ্বারা পরিভ্রমণ, শিক্ষা, অশন, শয়ন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপ ভাষাও তাঁহাদের মুখ-কুহর হইতে বিনির্গত হইয়া থাকে। যেরূপ মানবের শারীরিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য কোন যত্ন করিতে হয় না; কিন্তু স্বতঃই যেন বাল্যকালের পর কৈশোর, তৎপর যৌবন অবস্থার বিকাশ হয়, সেই-রূপ ভাষার নিত্যবস্তু দর্শনাদিতেও শারীরিক সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদুর্ভাব হয়। আরো দেখা যায় যে, সামাজিক অবস্থার নিত্য নানারূপ পরিবর্ত্তনে মানবের মনে ভাষাঙ্কুরের বিকাশ হয়। আত্মীয়জনগণের নিকটে মনের ভাব প্রকাশের নিমিত্ত বাহিরের প্রস্তাবিত বিষয় বুঝাইবার জন্য সকলেরই চিত্ত সমুৎসুক হইয়া থাকে। মূক ও বাক্-যন্ত্র-বিকৃত ব্যক্তির ভাষা-বিকাশের মূল-শক্তির ব্যাঘাত ঘটাতে ভাষার প্রকাশ হয় না। ইহাকেই লোকে ভাষার উৎপত্তির প্রথম

কারণ বলিয়া থাকে। আত্মা শরীরের সহিত সম্বন্ধ আছেন, যে ভাবে আত্মাতে ঈষৎ প্রযত্ন (ব্যাপার বা ক্রিয়া) হইলে, তৎপর শরীরে, স্বরযন্ত্রে, ও বাগ্‌যন্ত্রে তাহা প্রতিফলিত হয়; সেইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ তন্ত্রী সমূহের মধ্যে একটীতে আঘাত পড়িলে অপর তন্ত্রীগুলি স্বতঃই বাজিয়া উঠে ও স্পন্দিত হয়। এ বিষয়ে পাণিনীর শিক্ষা উক্ত হইয়াছে যে, "আত্মার সঙ্গে বুদ্ধির (বোধনাবৃত্তির) যোগ হইলে, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সহযোগ বিষয়ের সম্বন্ধ হয়; তাহার পর কথনেচ্ছায় মন নাভিদেশে উদান বায়ু ও জঠরানলে আঘাত করে, তৎপর সেই বায়ু হৃদয় যন্ত্রে বিচরণ করিয়া 'মন্ত্র' নামক স্বরের প্রাদুর্ভাব জন্মায়"। * অতএব বুঝা যায় যে, আত্ম 'সমুন্মেষে মনে অভিঘাত হয়, মনে অভিঘাত হইলে বাগেন্দ্রিয়ে অভিঘাত সম্পন্ন হয়, তাহাই ভাষা শব্দের চরমার্থ।

এই বসুধা মণ্ডলে ভাষা ইয়ত্তা করা খুব কঠিন কথা। কেবল আমাদের এই ভারতবর্ষেই যে কত ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহার নির্দ্দেশ হইয়া উঠে না। ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত। এক লেখ্য ভাষা, অপর কথ্য ভাষা। লেখ্য ভাষারও অনেক প্রভেদ বা অবান্তর ভেদ আছে। আর কথ্য ভাষা প্রতি ব্যক্তিতেই নিত্য নূতন আকার ধারণ করিয়া, বিষয় ভেদে ও বক্তার অভিপ্রায় ভেদে দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাড়ায়। এখানে আমরা কথ্য ভাষার অনেকত্বেও বহু হেতু দেখিতেছি। কাল ভেদে, সামাজিক অবস্থা ভেদে, লোক-সংস্থানের পরিবর্ত্তনে ভাষা মূর্ত্তি, নানা আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই ভারতে পূর্ব্বকালে যে ভাষা ছিল, এখন তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। সে ভাষা যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু সেই ভাষাই কাল পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান ভাষারূপে দাড়াইয়াছে। এই বর্ত্তমানের ব্যবহার্য্য ভাষাও কালান্তরে অন্য আকার ধারণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি অতএব কথ্য ভাষার ইতিহাস এখনও আর সমুদয় পাওয়া সম্ভবপর নয়, এবং সেই প্রাচীন কালের সকল ভাষা আলোচনার বিষয়ীভূত হওয়া অসম্ভব। লেখ্য ভাষার বিষয়ে শাস্ত্রে নানা প্রমাণ দেখিতেছি,—যথা বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে, "তাহার পর বিধাতা সৃষ্টি প্রথমে শব্দ-ব্রহ্মময়ী ভাষা সৃষ্টি করিলেন, এবং আকার প্রভৃতি স্বরবর্ণ, ককারাদি হল্ বা ব্যঞ্জনবর্ণ ও পরস্পর সংযুক্ত বর্ণের সর্জ্জন করিলেন। তাহার পর ভাষা পঞ্চাশ

---

* "আত্মাবুদ্ধ্যাসমেত্যার্থান্ মনোযুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতং।
মারুতস্তূরষি চরণ্‌ মন্দ্রং জনয়তি স্বয়ং॥" পাণিনীর শিক্ষা।

ও ছয় অথবা ষট্ পঞ্চাশ সংখ্যায় বিভক্ত করিয়া উদ্ভাবন করিলেন। বালকদিগের উক্ত ভাষার ও বর্ণের জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ সমূহ,—পদ জ্ঞান ব্যাকরণ দ্বারা ও অর্থ জ্ঞান দর্শনের দ্বারা সৃষ্টি করিলেন।”

উল্লিখিত পুরাণে উক্ত ভাষার লক্ষণ, উদাহরণ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে; এখানে তাহার উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন নাই। প্রাকৃত লঙ্কেশ্বর ব্যাকরণে উক্ত ব্যাকরণ প্রণেতা আঠার প্রকার ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—সংস্কৃত, প্রাকৃত, ঔদীচী, মহারাষ্ট্রী মাগধী, মিশ্রার্দ্ধমাগধী, শাকভীরা, শ্রাবন্তী, দ্রাবিড়ী, উৎকলা (ওড়িয়া), পঞ্চালী, প্রজ্ঞাবাহ্লিকা, রক্তিকা দাক্ষিণাত্য, পৈশাচী, আবন্তী, শৌরসেনী।

ললিতবিস্তর নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থের দশম অধ্যায়ে বুদ্ধদেবের অধীত লিপির কথা উদাহৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বহু কথা বর্ণিত আছে। ভগবান্ বুদ্ধদেবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যখন আচার্য্য বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বেই তিনি চতুঃষষ্ঠি বর্ণমালা অভ্যাস করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, এই গ্রন্থ (ললিতবিস্তর) খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে এই সকল—শাক্য সিংহের অধীত লিপি; ব্রাহ্মী, খরোষ্ট্রী, পুস্করসারী, অঙ্গলিপি, মাগধ লিপি, মাঙ্গল্য লিপি, মনুষ্য লিপি, অঙ্গুলীয় লিপি, শকারি লিপি, ব্রহ্মবল্লী লিপি, কিনারি লিপি, দক্ষিণ লিপি, মুগ্র লিপি, মনুলোম লিপি, অর্দ্ধধনু লিপি, দরদ লিপি, সাম্পলিপি, চীনলিপি, হূণলিপি, মধ্যাক্ষর বিস্তর লিপি, পুষ্পলিপি, নাগলিপি, যক্ষলিপি, কিন্নরলিপি, মহোরগলিপি, মস্থুরলিপি, গরুড়লিপি মৃগচক্র লিপি, বায়ুমরু লিপি, ভৌমদেব লিপি, উত্তর কুরুদ্বীপ লিপি, অপর গোড়াদিলিপি, পূর্ব্ববিদেহ লিপি, উৎক্ষেপলিপি, নিক্ষেপলিপি, বিক্ষেপলিপি, প্রক্ষেপলিপি, সাগরলিপি, ব্রজলিপি, লেখ প্রতিলেখ-লিখিত নিক্ষেপাবর্ত্তলিপি, পদলিখিতলিপি, দ্বিরুত্তর পদসন্ধি লিপি, যাবদ্দেশোত্তর পত্রসন্ধিলিপি, অধ্যাহারিণী লিপি, সর্ব্বমরুত সংগ্রহণী লিপি, বিদ্যানুলোম লিপি, বিমিশ্র লিপি, ঋষি তপস্তপ্ত রোচমান ধরণী প্রেক্ষণ লিপি, সর্ব্বৌষধি নিষ্পন্দা, সর্ব্বসার সংগ্রহণী। হে গুরুদেব! এই চতুঃষষ্ঠি লিপির মধ্যে কোন লিপি আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন? এই কথা বুদ্ধদেব আচার্য্য বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এইরূপ বহুবিধ লিপি-ভেদ দ্বারা ভাষারও অনেক অনুমান করা যাইতে পারে। জৈনগণের প্রজ্ঞাপনা সূত্র ও সমবায় সূত্রে অষ্টাদশ প্রকার লিপির উল্লেখ

দেখা যায়; যথা,—বম্ভী, যবনালীয়া, দাস উড়িয়া, খরোষ্ট্রী, পুক্খর সরিয়া, পহাড়াইয়া, উচ্চতুরিয়া, অক্ষর প্রখিয়া, ভোগবপত্তা, দেষণত্তিষা, নিরাহইয়া, অঙ্কলিপি, গন্ধর্ব্ব লিপি, আদর্শলিপি, মাহেসরা লিপি, দামিলী লিপি, পোলিন্দি লিপি, এই সকল সমবায় সূত্রোক্ত বম্ভী, যবনালীয়া, দাসপুরীয়া, খরোষ্ট্রী, পুক্খর সারিয়া ভোগবইয়া, উপঅন্তর কারিয়া, অক্ষর পুরিয়া, বৈনৃনিয়া, নিহইয়া, অঙ্কলিপি, গণিতলিপি, গন্ধর্ব্বলিপি, আদর্শলিপি, মাহেশ্বরী, দামিনী, পোলিন্দা, - এই সমস্ত লিপির কথা প্রজ্ঞাপনা সূত্রে আছে। বম্ভী - শব্দের অর্থ ব্রাহ্মী, দামিনী শব্দের দ্রাবিড়ী, এই জৈন শাস্ত্রোক্ত লিপি ও বুদ্ধ দেবোক্ত লিপির মধ্যে কতিপয় লিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহা মহারাজ অশোকের উৎকীর্ণ শিলা লিপির পরিচয়ে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ট্রী বিদ্যমান আছে; অপর লিপিগুলি নামে মাত্র পর্য্যবসিত। জৈনগণের অপর নান্দীসূত্র নামক একখানি গ্রন্থেই ষট্‌ত্রিংশৎ লিপির কথা উল্লিখিত আছে। সেগুলি এইরূপ,—হংসলিপি, যক্ষ লিপি, রাক্ষসলিপি, উড্রলিপি, যাবনী লিপি, তুরস্কী লিপি, কীরী লিপি, দ্রাবিড়ী লিপি, সৈন্ধবী লিপি, মালবী লিপি, নাড়লিপি। নাগরী লিপি, পারসী লিপি, লাটীলিপি, অনমিত্র লিপি, চানক্যী লিপি, মৌলদেবী লিপি, লাটী, চৌড়ী, ডাহলী, কামড়ী, গুর্জ্জরী, সৌরটী, মরহটী, কোঙ্কণী, খরাসানী, মাগধী, জোহলী, হারী, হাম্বিরী, পরতিরি, মসী, মালবী, মহাযোধী। এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থেও বিবিধ লিপির কথা সন্নিবদ্ধ দেখা যায়। দক্ষিণাপথের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক-নিচয় হইতে জানা যায় যে, ছয়টী ভাষা ও সাতাইশটী উপভাষা পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। প্রাকৃত চন্দ্রিকায় লিখিত আছে, মহারাষ্ট্রী, আবন্তী, সৌরসেনী অর্দ্ধ মাগধী বাহ্লিকী, মাগধী, এই কয়টী ভাষা দক্ষিণাত্য প্রসূত''। ব্রাচন্তী, লাটী, বৈদর্ভী, উপনাগরী, নাগরী, বর্ব্বরী, আবন্তী, পাঞ্চালী, টাক্কী মালবী, কৈকেয়ী, গৌড়ী, ঔড্র, দেবপাঞ্চালী, পাণ্ডলিপি, কৌন্তলী, সিংহলী, কালিঙ্গী, প্রাচী, কর্ণাটী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়ী, গুর্জ্জরী, মধ্যদেশীয়া, এই সকল সূক্ষ্ম অবান্তর ভেদে বৈড়ালী প্রভৃতি সাতাইশ প্রকার অপভ্রংশ ভাষার (প্রাকৃত ভাষা) উল্লেখ দেখা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রেও অনেক প্রকার দৃষ্ট হয়। মুদ্রালিপি, যন্ত্রলিপি, লেখনী লিপি, গুপ্তিকা, গুণলিপি এই পাঁচ প্রকার লিপি। প্রাচীন বৃহৎ পরাশরীয় শিল্পশাস্ত্রে এবং অপরাপর প্রাচীন শিল্প গ্রন্থে লিপি ও বর্ণের (রঙ এর) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রেও নানাবিধ ভাষার (মহারাষ্ট্রী

প্রভৃতির) উল্লেখ দেখা যায়। ভারতবর্ষের ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, কেন যে তাহাতে নানা প্রভেদ দেখা যাইতেছে, তাহা ঠিক নির্ব্বিবাদে বলা খুব কঠিন। তবে আমাদের ধারণা হয় যে, সংস্কৃত ভাষা বা গীর্ব্বাণ ভাষাই সকল ভাষার জননী। এই বিষয়ে রা, রা, ৺অপ্পা শাস্ত্রী রাশিবড়েকর বিদ্যা-বাচস্পতি মহোদয় তাঁহার সংস্কৃত চন্দ্রিকার প্রবন্ধে বহু গবেষণা পূর্ব্বক স্থির করিয়া গিয়াছেন; এবং অন্যান্য ভাষাতত্ত্বালোচকগণও তাহাই বলিয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃত নামে পরিচিত অনেক ভাষা দেখা যায়। বৈদিক সংস্কৃত, ব্রাহ্মণারণ্যক সংস্কৃত, উপনিষদ্ সংস্কৃত, সূত্র সংস্কৃত, স্মৃতি সংস্কৃত, প্রভৃতি নানা প্রকারে প্রভিন্ন সংস্কৃত দেখিতে পাওয়া যায়। যে প্রণালীতে ভাষার প্রভেদ ব্যবস্থিত হয়, তদ্দ্বারা এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, এক সংস্কৃত ভাষার অপর ভাষাগুলি উত্তরবর্ত্তী বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান আছে। বিদেশীয় পণ্ডিতও তাঁহার 'ভাষা বিজ্ঞান' পুস্তকে সংস্কৃত ভাষাই সকল ভাষার স্রষ্ট্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দেশে এখনও বিদ্বৎ সমাজে প্রচলিত আছে যে, "ভাষা সুসংস্কৃতং ভাষা"। এক সময়ে দক্ষিণাপথের আঢ়্যরাজের শাশন কালে তিনি প্রাকৃত ভাষায় কথন নিপুণ কোন ব্যক্তির অন্বেষণ করিয়াছিলেন, যে 'আমার রাজ্য মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিতে পারে এমন কেহ আছেন কিনা।" সম্প্রতি ভারতের অপরাপর দেশ অপেক্ষা দক্ষিণাপথের জনগণ সংস্কৃত ভাষায় কথনে ও লিখনে অধিক নিপুণ। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ আরও বলিয়াছেন যে, ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা ইটালীয় ভাষার তুল্য। সাহিত্যের ভাষার পরিপুষ্টি ও তাহার পরিণতির পূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষা, ইটালীর পূর্ব্ব-ভাষার অনুরূপ ছিল ইহাই তাহাদের মত। ভারতের দৃশ্য কাব্যে বা নাটকে প্রাকৃত ভাষার বাহুল্য আছে। নাটকে রাজ-সচিব পুরোহিতাদির সংস্কৃত ভাষায় বলিবার নিয়ম আছে। তাহাতে নায়িকা, রাজমহিষী, পরিচারিকা, সখী, ভৃত্যগণ প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিলে, সহজে তাঁহাদের মনের ভাবের অভিব্যক্তি ও কথার মাধুর্য্য প্রকাশ পায়।

সেই প্রাকৃত ভাষাও কালে ও সংস্কারে সংস্কৃত ভাষার স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইতে পুনঃ বহু ভাষার আবির্ভাব হইয়াছে। সে সকল ভাষা এখন ভারত প্রান্তে ও বন্য প্রদেশে বিকৃতরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। একই

ভাষার আকার দুই প্রকার, কোমল স্বভাব ও কঠোর প্রকৃতি। যাহার ব্যঞ্জনবর্ণ বহুল আকার গঠিত তাহা কঠিন। যাহাতে স্বরের বাহুল্য আছে তাহা শ্রুতি মধুর। যাহারা বলেন,—প্রকৃতি বা মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহাকে প্রাকৃত ভাষা বলা হয়, সংস্কার হইতে প্রাদুর্ভূত বলিয়া তাহাকে সংস্কৃত বলা হয়; এই সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ দোষশূন্য যুক্তি দেখিতে পাই না। আমরাও এই কথা স্বীকার করি যে, সংস্কার হইতে অর্থাৎ সুপ্রাচীন বৈদিক ভাষার সংস্কার হইয়াই সংস্কৃত হইয়াছে। কেবল মানসিক সংস্কার হইতে নয়, কিম্বা নাটকীয় ভাষার সংস্কার হইয়া সংস্কৃত ভাষার আবির্ভাব হয় নাই। অতএব এই ভাষাকে 'গীর্ব্বাণ বাণী' বা দেবভাষা বলা হয়। যেহেতু "প্রাকৃতস্তু পৃথক্ জনঃ" এই অভিযুক্তের উক্তি দ্বারা ও প্রাকৃত জনসাধারণের ভাষাই প্রাকৃত ভাষা। দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাশয়ও আঠারটী ভাষা বারবিলাসিনীকে মানস-শায়িনী করিয়াছিলেন বলিয়া স্বগ্রন্থে দর্প প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সন্ধ্যাবন্দন, যাগ-শ্রাদ্ধাদিতে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার ব্যবহার করিতে নাই। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "নাসংস্কৃতং প্রযুঞ্জীত নাপভাষিতবৈ" ইহা দ্বারা অপভাষার অপ্রশংসা করিয়াছেন। ব্যাকরণের বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধন দ্বারা বিক্ষিপ্ত ভাষার সম্বন্ধ, সংস্কার, সুপ্রয়োগ, ও প্রণালী বদ্ধ করা হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যারত্ন সংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

অর্থ]

মহামায়ার খেলা।

(গত চৈত্র সংখ্যার পর।)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—হেমলতার স্বামী নির্ম্মলকুমার যোগাভ্যাস করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে, তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। পরে নবকুমার নামক একটী যুবক হেমলতার প্রণয়াকৃষ্ট হইয়া কৌশলক্রমে তাহাকে গ্রামান্তরে লইয়া যায়। মহামায়ার কৃপায় হেমলতা সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া এক সন্ন্যাসিনীর শরণাপন্ন হয়। এদিকে নবকুমার হেমলতার কোনরূপ অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করে। পরে একজন সন্ন্যাসী তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়া নবকুমারকে তাহার এক শিষ্যের আলয়ে রাখিয়া দেন। তথায় কিছুদিন আধ্যাত্মিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, নবকুমার তাঁহার উপদেশানুযায়ী গৃহে প্রত্যাগত হয়। কিছুদিন পরে হেমলতা যোগ ও জীবহিত ব্রতে দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসিনীর গুরুর উপদেশানুযায়ী কাশী অঞ্চলে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের সেবার জন্য গমন করেন।

তখন উমাপদ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক যুবক সন্ন্যাসী নির্ম্মলকুমারের পিতার উৎসাহে এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ধনী ও রাজপুরুষদিগের সাহায্যে কাশীতে একটী সেবাশ্রম স্থাপন করেন। পরে বিনোদিনী নাম্নী একটী গৃহস্থ কন্যাকে তাহার স্বামীর উদ্দেশে কাশী যাইবার সময় পথে প্লেগাক্রান্তা হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, হেমলতা তাহার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হয়েন।]

সে বৎসর পশ্চিমাঞ্চলে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ এক সঙ্গে উভয়ে উভয়কে পরাজয়ের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল! রাজপুরুষগণ এবং দেশের দয়ালু ধনকুবেরগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও দুর্ভিক্ষের সেই বিভীষিকা মূর্ত্তি কিছুতেই হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একে দারুণ অন্নাভাব, তদুপরি রোগের যন্ত্রণা এবং আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের মৃত্যু জনিত শোকে গ্রামকে গ্রাম উৎসন্ন যাইতে চলিল। জীর্ণ শীর্ণ নরকঙ্কালগুলির অন্নের জন্য ব্যাকুলতা, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী! মৃতদেহের স্তূপ- দুর্গন্ধ: কে কাহার সৎকার করে। দুর্ভিক্ষের জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, উমাপদ ব্রহ্মচারী ও তাঁহার অনুচরবর্গ অক্লান্ত পরিশ্রমে জীবন উৎসর্গ করিয়া—জীবনের অনুমাত্র আশা পরিত্যাগ করিয়া, রোগীর সেবা—দরিদ্রের সেবায় নিযুক্ত। রাজপুরুষগণ এই সকল স্বেচ্ছাসেবকদিগের সেবানুরাগ ও পরিচর্য্যা দেখিয়া ইঁহাদের উপরেই সমস্ত ভার ন্যস্ত করিলেন। অর্থব্যয়ের জন্য কোন চিন্তা নাই, উমাপদ ব্রহ্মচারী সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যেখানে যাহা প্রয়োজন, তিনি আশ্রমে বসিয়াই তাহার সুব্যবস্থা করিতেছেন। দরিদ্রেরা ছত্রে ছত্রে আসিয়া আহার্য্য লইয়া যাইতেছে; মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ যতদিন পারেন আপনার জিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়া অন্ন সংস্থান করিয়াছেন, কিন্তু এখন আর কিছুই নাই; অথচ ছত্রে গিয়াও আনিতে পারেন না। ব্রহ্মচারী এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহাদের বাটীতে সাহায্য পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু কেহ কেহ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাও শ্রেয় মনে করিল, তথাপি ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে চাহেন না। তাঁহাদিগকে তিনি কর্জ্জ স্বরূপ দিয়া জীবন রক্ষা করিলেন।

ইঁহাদের সাহায্য ভিন্ন এই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত সাহায্য,—পীড়িতের সেবা কিছুতেই সম্ভব হইত না, রাজপুরুষগণ ইহা বেশ বুঝিলেন। সমগ্র ভারত জুড়িয়া ইহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিত হইল। ক্রমে ক্রমে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের বেগ কমিয়া আসিল; ধনীদিগের উৎসাহে—রাজপুরুষের সহায়তায় সেবাশ্রম

নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা উত্থাপিত হইল। ব্রহ্মচারীর সে চিন্তা, সে উদ্বেগ এখন আর নাই; অনেক ধনী ব্যক্তি ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসিয়া তাঁহাদের এই মহৎ কার্য্যে সহানুভূতি জানাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী সবিনয়ে বলিলেন, এই ভীষণ সংহার বা ধ্বংসের মূল মহামায়ার ইচ্ছা! দেখুন একদিকে বরাভয়—আর একদিকে অসি ও মুণ্ড। তিনিই সকল ব্যাপারের মূল, তাঁহার ইচ্ছাতেই এই দারুণ দুর্ঘটনা; আবার তাঁহার ইচ্ছাতেই শান্তি! সুতরাং এই কার্য্যে আমাদের কোনরূপ প্রশংসা করা বৃথা, ইহা মহামায়ারই কার্য্য।

তখনও তাঁহাদের কার্য্যের নিবৃত্তি হয় নাই। সকল সেবক তখনও কার্য্যক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হয় নাই। এক দিন অন্ধকারে একটী যুবতী বৃক্ষতলে শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, চক্ষু রক্তবর্ণ; গাত্রের উত্তাপ এত তীব্র যে হাত দেওয়া যায় না! সময়ে সময়ে "মাগো" "বাবাগো" শব্দ করিতেছে! এই ধ্বনি সহসা একটী সন্ন্যাসিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসিনীও কাশী যাত্রা করিয়াছেন, এই মহামারীতে তাঁহার বদনেও কোনরূপ ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই; সদাই সহাস্য বদন! শব্দ শুনিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে এ স্বর রমনী-কণ্ঠ-নিঃসৃত। শব্দ অনুসরণ করিয়া সন্ন্যাসিনী গিয়া দেখিলেন যে, একটী রুগ্না স্ত্রীলোক রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। করুণায় তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল, কাশী যাওয়া তাঁহার বন্ধ হইল। রোগিণীর পার্শ্বে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় উপবেশন করিয়া রহিলেন। রোগিণী এই জনশূন্য শ্মশান মধ্যে মানব সমাবেশ দেখিয়া বলিয়া উঠিল "কে তুমি! একটু জল—প্রাণ যায়"! সন্ন্যাসিনী দ্বিরুক্তি না করিয়া জলের অনুসন্ধানে চলিলেন। অদূরে একটী সরোবর হইতে জল আনিয়া রোগিণীর মুখে প্রদান করিলেন।

"আঃ বাঁচিলাম" বলিয়া রুগ্না দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। "কে তুমি মা"! এমন সময়ে আমার এই উপকার করিলে! আমার শেষ অবস্থা"—পিপাসায় প্রাণ বাহির হইতেছিল, তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করিতে পারিব না।"

"ঋণ কি মা! আমাদের কর্ত্তব্যই ত' এই"; পীড়িতের সেবা করাই ত' সেবিকার ধর্ম্ম। তোমার দেখ্‌ছি প্লেগ হয়েছে, আমার মনে হয় যে নিকটস্থ গ্রামে রাত্রে আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় রাত্রিতে হিম লাগাইলে জীবনের আশা থাকিবে না।

"জীবনের আশা! এখনও জীবনের আশা! না—না, এখন মরিলেই ভাল, আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ কর যম যেন আমায় কৃপা করে গ্রহণ করেন।"

"সে সব কথা ভাব্‌বার প্রয়োজন দেখি না; তবে এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, তোমার সেবার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিলাম। তোমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি গ্রামে যাই—একটু দুধের চেষ্টা দেখি এবং দুই একজন লোক সংগ্রহ করিয়া আনি—তোমায় গ্রামে লইয়া যাইতেই হইবে।"

"না—না, আমার জন্য এত কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। উঃ—বড় পিপাসা"! সন্ন্যাসিনী জল দিলেন, রোগিণী আবার বলিতে লাগিল,—গ্রামে লোকজন নাই—আমি আর বাঁচিব না; এমন দুঃখিনীর মরণই মঙ্গল"।

"দুঃখিনী হইবে কেন মা? তোমার হাতে শাঁখা ও লোহা,—দেখিতেছি তোমার স্বামী আছে, স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব। স্বামী থাকিতে স্ত্রীলোক দুঃখিনী হবে কেন?"

স্বামীর কথা শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তখন বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে বলিল,—"স্বামী আছে বলিয়াই ত' বিশ্বাস করি; তা'ই হাতের শাঁখা ও লোহা, এখনও পরিত্যাগ করি নাই; জানি না তিনি আছেন কিনা।"

"যাক্‌ এখন সে সব কথা আলোচনা করিয়া বৃথা শোক করার প্রয়োজন নাই। তুমি চুপ করিয়া একটু থাক দেখি, আমি আঁচল দিয়া একটু বাতাস করি; একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

উঃ বড় যাতনা। মৃত্যু বোধ হয় এর চেয়ে সুখের! একটু জল—বড় পিপাসা!"

জল পান করিয়া যেন একটু সুস্থ বোধ করিল, সন্ন্যাসিনী নিজ হাঁটুতে তাঁহার মস্তক রাখিয়া অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে একটু নিদ্রা আসিল। সন্ন্যাসিনীর ক্লান্তি নাই; নিদ্রাভঙ্গে রুগ্না দেখিল যে, তিনি ঠিক সেইরূপ ভাবেই উপবিষ্টা। কাতর ভাবে বলিল,—"মা! তুমি এখনও বসিয়া আছ—এমন উচ্চ হৃদয় আমি চক্ষে দেখি নাই।

"তোমার এখন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই—কথা বল্লে শরীর আরও খারাপ হবে। তোমার জ্বর এখন কমে এসেছে, বোধ হয় মহামায়া তোমায় এ যাত্রা রক্ষা ক'র্‌বেন। প্রাতঃকাল হ'য়ে এল, পূর্ব্বদিক একটু পরিষ্কার হয়েছে,—আমি এইবার গ্রামের দিকে গিয়ে একটু দুধের চেষ্টা করিগে।

"মা, তুমি দেবী কি মানবী, আমি তা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা! যাক্‌ দু'দিন হ'তে এইরূপ অবস্থায় প'ড়ে আছি, এখন যেন একটু সুস্থ বোধ কচ্ছি; যন্ত্রণা

যেন কম পড়েছে, তোমার স্পর্শে বোধ হয় এমনটা হল। বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু গ্রামে ত' লোকজন নাই—আমি আস্‌বার দিন দেখে এসেছি।"

"দেখা ত' যাক্‌; মায়ের ইচ্ছা!" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসিনী যাত্রা করিল। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গ্রাম বাস্তবিকই প্রায় জনশূন্য—কয়েকজন মাত্র অবশিষ্ট আছে। একজন পীড়িত লোকের সেবার্থ চারিজন যুবক সন্ন্যাসী নিযুক্ত; রোগীর আহারের জন্য দুগ্ধ দোহন করিতেছে। সন্ন্যাসিনী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন;—"আমি বড় বিপদে পড়িয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত, গ্রামের বাহিরে একটী অসহায়া রমণী প্লেগাক্রান্তা হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার জন্য কিঞ্চিৎ দুধের প্রয়োজন।"

তাঁহারা সন্ন্যাসিনীর কথায় বুঝিলেন যে ইনি সেবাব্রত ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা সেই ব্রহ্মচারিণীর পবিত্র বদনমণ্ডলে মাতৃমূর্ত্তির আভাষ পাইলেন; কারণ তাঁহারাও সকলে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হৃদয়ে একটী নবভাবের ইঙ্গিৎ পাইয়াছেন। তাই তাঁহারা ব্যগ্রভাবে বলিলেন;—"কোথায় সে রমণী পড়িয়া আছে,—আপনি কিরূপে সে সন্ধান জানিলেন? আমাদের লোক ত' সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করিতেছে; কিন্তু তাহার সন্ধান ত' পাওয়া যায় নাই; যাক্‌ উঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য মা আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। চলুন—যাহা প্রয়োজন আমরা তাহারই ব্যবস্থা করিব। উঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—"কালীপদ! তোমার যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন, কারণ কিরূপ অবস্থায় সে আছে—জীবনের আশা কতদূর, এ সকলও জানা আবশ্যক।"

"বেশ" বলিয়া কালীপদ একটী পাত্রে গরম দুধ লইয়া সন্ন্যাসিনীর সহগামী হইল। পথে যাইতে যাইতে কালীপদ বলিল—"মা! আপনি এই মহামারীর কথা শুনিয়া এ পথে আসিলেন কেন?"

"কোন্‌ পথে যাইব? পীড়িতের সেবাব্রত যাঁহার ধর্ম্ম, সে অন্য পথে গেলে সে কার্য্য হইবে কেন?" এইরূপ নানা কথা বলিতে বলিতে ক্রমে তাঁহারা সেই রমণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দুধ খাইয়া রোগিণী কিঞ্চিৎ আরাম বোধ করিল; দুই দিনের অনাহার—তা'ই সে যেন নব জীবন পাইল বলিয়া মনে করিল।" সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা?"

"আমরা সেবক। আপনার নাড়ী দেখিয়া এবং সাধারণ জ্ঞানে বেশ মনে হইতেছে যে, বাঁচিবার আশা আছে; তবে আমার মনে হইতেছে যে, আপনাকে গ্রামে লইয়া গিয়া চিকিৎসা ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। আমাদের আশ্রম

কাশীধাম ; তথা হইতে প্রত্যহই লোকজন যাতায়াত করিতেছে। আমাদিগকে অপর ভাবিবেন না, আমরা আপনার সন্তান। সর্ব্বতোভাবে মাতৃসেবাই সন্তানের কর্ত্তব্য।

"আমার উঠিবার কিঞ্চিৎ মাত্রও শক্তি নাই, অতদূর যাইব কিরূপে ? আর অন্য উপায়ই বা কি হইতে পারে ?"

"সে ব্যবস্থা আমি করিতেছি।" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনীকে তাঁহার নিকট থাকিতে বলিয়া কালীপদ ব্রহ্মচারী গ্রামের দিকে চলিলেন। তিনি গ্রাম হইতে অপর তিন জনকে লইয়া একখানি পাল্কী আনিয়া বলিলেন,—"মা ! আসুন, আমরা ধরিয়া আপনাকে পাল্কীতে উঠাইয়া দিই ; আমরাই লইয়া যাইব, কোন চিন্তা নাই।

রমণী তাঁহাদের এই দেবোপম ব্যবহার দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিল না। কাতর ভাবে বলিল,—"আপনারা দেবতা ! আমি আপনাদের কে, যে আমার জন্য আপনারা এরূপ কষ্ট পাইতেছেন ? আপনার লোকও এমন করে না।"

"একি বলিতেছেন ! আমি ত' পূর্ব্বেই বলিয়াছি আপনি আমাদের মা ! সন্তান মায়ের পর নয় – নিতান্ত আপন ; আপনি আমাদের পর ভাবিবেন না !

ক্রমে তাঁহারা সেই পাল্কী বহন করিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। একটী কুটিরীতে বেশ পরিষ্কার বিছানায় তাহাকে শয়ন করাইয়া ঔষধের ও পথ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কয়েক দিনের মধেই তাহার জীবনের আশার সঞ্চার হইলে, সন্ন্যাসিনী তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় চাহিল। এই কয়-দিনের ব্যবহারে ইঁহারা যেন কত আপন হইয়া গিয়াছেন ; তাই রোগিণী কাঁদিতে লাগিল। সেই জন্য এ অবস্থায় তাঁহারা সন্ন্যাসিনীকে কিছুতেই যাইতে দিলেন না ; কারণ এই দুর্ব্বল অবস্থায় হঠাৎ দুঃখের সঞ্চার হইলে পীড়ার বৃদ্ধি হইতে পারে। তাই কালীপদ ব্রহ্মচারী বলিলেন,—"আপনার কাশী যাওয়াই ত' অভিপ্রেত, কাশী আর বেশী দূর নহে। এতদূর যখন আসিয়াছেন, তখন আর ভয় নাই।"

সন্ন্যাসিনী। ভয়ের জন্য নয় ; এখানে আমার আর কোন আবশ্যক নাই। "কর্ত্তব্য ত' সম্মুখে পড়িয়া আছে, তাহার সমাধান না করিয়া বৃথা বসিয়া থাকি কেন ?" ভিতর হইতে এই কথাই শুনিতেছি।

"সে কথা সত্য, কিন্তু যখন স্ত্রীলোকটী এত কাঁদিতেছে, তখন অন্ন পথ্য

পর্য্যন্ত আপনার থাকা প্রয়োজন। পরে "কাশী গিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের আশ্রমে একবার যাইবেন।"

"আপনাদের আশ্রম কোন্ স্থানে ?"

কালী। "ঠিক দশাশ্বমেধ ঘাটের সম্মুখে ; বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "মায়ের মন্দির।" ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিবেন, 'মায়ের মুর্ত্তি।' পার্শ্বে একটু দূরেই রোগীগণের থাকিবার স্থান। আপনি কাশীতে গেলেই চক্ষের সম্মুখে পড়িবে। আমরা সেবক সম্প্রদায় সকলেই উমাপদ ব্রহ্মচারীর আদেশে কার্য্য করিতেছি। তিনিও কোন মহাপুরুষের আদেশে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এই স্থানের এই কয়জন রোগী আরোগ্য লাভ করিলেই আমরাও কাশী ফিরিয়া যাইব। আপনি কতদিন তথায় থাকিবেন।

"আমার কিছুই স্থিরতা নাই এবং আমি তাহা জানি না ; ঘটনা স্রোতে চলিয়া যাইতেছি মাত্র। এখানে অবস্থিতি করিতে হইবে ইহাও ত' ভাবি নাই ! পিতা বলিয়া দিয়াছেন যে কর্ম্ম করিয়া যাও, ফলাফলের দিকে দৃক্‌পাত করিও না। যদি কাশী যাওয়া ঘটে, তবে আপনাদের মন্দিরে গিয়া মায়ের দর্শনে চরিতার্থ হইব। আর ব্রহ্মচারী যদি দর্শন দেন, তাঁহারও চরণ বন্দন করিব। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে সেই রমণী কাতর স্বরে বলিল, আপনারা সকলেই কাশী যাইতেছেন এবং যাইবেন ; আমারও কাশী যাওয়া প্রয়োজন। শুনিয়াছি আমার স্বামী কাশীতেই আছেন ; তাঁহাকে একবার খুঁজিয়া দেখিবেন। বেশী কথা যাহাতে না বলে সেইজন্য তাঁহারা বলিলেন,— বেশ কথা ! আমরা আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব ও আমাদেরই আশ্রমে রাখিয়া দিব। আর আমরা বহু পুত্র বর্ত্তমানে একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিব, তাহা আর বিচিত্র কথা কি ?

যাহা হউক কয়েকদিন পরে সে রমণী অন্ন পথ্য করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, সন্ন্যাসিনী তথা হইতে যাত্রা করিলেন। কাশীর পথ আলোকিত করিয়া তিনি চলিলেন, গ্রামের অবশিষ্ট যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা ভাবিলেন যে, আমাদের দুঃখ দুর করিবার জন্যই মহামায়া আবির্ভূতা। (ক্রমশঃ)

বাঞ্ছারামের খবর।

বৃদ্ধ বাঞ্ছারাম রাখাল ডাক্তারের পুরাতন ভৃত্য। যতদিন হইতে ডিস্‌পেন্সারী, বাঞ্ছারামও ততদিনের চাকর। ডাক্তারের পশার, নাম, যশ, ভাগ্যলক্ষ্মী ও ডাক্তারখানার সঙ্গে বাঞ্ছারামের জীবন একই সূত্রে জড়িত। বাঞ্ছারামের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে নূতনত্ব ও বিশেষত্ব বর্জ্জিত--একঘেয়ে জীবন। প্রাতঃকালে উঠিয়া ডাক্তারখানা পরিষ্কার, জল তোলা, প্রাতে ও অপরাহ্নে বিলের তাগাদা, সন্ধ্যা সমাগমে আলো জ্বালা ও আমাদের মুহুর্ম্মুহুঃ তামাকু সাজিয়া দেওয়া তাহার নিত্যকর্ম্ম। বৎসরের পর বৎসর এমনি ভাবে কাটাইয়া বাঞ্ছারাম একদিন এই নশ্বর পৃথিবীর সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিল।

ডাক্তারের সহিত আমার কেবল সামান্য ভাবের বন্ধুত্ব নয়; বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবেই মিশিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর যথারীতি গল্প গুজব, তাস, পাশা, দাবা, পরচর্চ্চা, মুহুর্ম্মুহুঃ তামাকু সেবন। বহুদিনের চাকর বলিয়া বাঞ্ছারামের অভাব অনেকদিন পর্য্যন্ত আমরা বিশেষরূপেই অনুভব করিতাম। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী অথবা কাহারও মৃত্যু ঘটিলে, সম্মুখে শবযাত্রা দেখিলে কিম্বা হরিবোল ধ্বনি শুনিলে মানুষের মনটা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও কেমন উদাস হইয়া পড়ে। হউক না শ্মশান বা মর্কট-বৈরাগ্য; কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যও চিত্ত মধ্যে সংসারের সুদৃঢ় ছাপের উপরে ইহলোকের নশ্বরত্ব ও পরলোকের আভাসে একটা সূক্ষ্ম স্তর জাগিয়া উঠে। মনে হয় এই ত' সংসার অনিত্য, শুধু ভোজবাজীর খেলা, সব ফাঁকা—আজ আছে, কাল নাই; কে কার পিতা, কে কার পুত্র, তবে কেন মিছা ছুটাছুটি ক'রে মরি। বাঞ্ছারামের মৃত্যুতে আমাদের মনে ঐরূপ একটা চিন্তা, কথায় বার্ত্তায় ঐরূপ গতি কিছু দিনের জন্য বহিয়া যাইত, কথায় কথায় পরলোকের কথা আসিয়া পড়িত। সেটা স্বাভাবিক—চিরকালই মানুষের মনে পরলোক সম্বন্ধে জানিবার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান। তবে আমাদের সকল বিষয়েরই জ্ঞান যেরূপ স্বল্প, ধারণা যেরূপ ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট এবং বিচার যেরূপ ফাঁকা ফাঁকা, এক্ষেত্রেও তাহাই হইত। তবে একটা বিষয়ে ডাক্তারে ও আমাতে স্থির হইয়াছিল যে আমাদের মধ্যে যাহার অগ্রে মৃত্যু হইবে, সেই অপরকে পরলোকের সংবাদ দিবে।

২

ডাক্তারের ডাক আগে আসিল। প্রবল কলেরায় রোগী দেখিতে দেখিতে বার ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার ইহলীলা শেষ হইল। অবশ্য চেষ্টা বা চিকিৎসার

কোনই ত্রুটী হয় নাই; কিন্তু অনিবার্য্য নিয়তির বশে অথবা দৈব সহায় না থাকিলে, যেমন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষীণ চেষ্টা বিফল হইয়া যায়, তেমনি আমাদের সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ করিয়া ডাক্তারের প্রাণবায়ু সূক্ষ্মভূতে বিলীন হইয়া গেল। চিতা প্রস্তুত; বিপিন হঠাৎ বলিয়া উঠিল 'ডাক্তারের বুকটা যেন নড়্‌ছে।' আমরা প্রথমে বলিলাম,—"না না, কিছু না!" শেষে দেখি, সত্যই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতি মৃদুভাবে বিদ্যমান! তবে কি আমাদের ভুল হইয়াছিল! কখনই নয়। শ্মশান লোকে লোকারণ্য; চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন, "বোধ হয় re-action, স্থায়ী হইলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।"

রাখে কৃষ্ণ মারে কে? ডাক্তার সে যাত্রা সজ্জিত চিতার সম্মুখে পুনরায় পূর্ব্বদেহে প্রতি-প্রবেশ করিলেন। একটু সুস্থ হইলে, ডাক্তার বলিল "ভাই, সে বড় আশ্চর্য্য কথা। যদি আমার খেয়াল, কল্পনা বা দৃষ্টি বিভ্রম না হয়, তাহা হইলে বলিব যমরাজ, যমপুরী, চিত্রগুপ্ত, যমদূত প্রভৃতি সকলই সত্য।" ঠিক যেন স্বপ্নাবস্থা, কে বা কাহারা যেন আমাকে বাঁধিয়া—ইন্দ্রিয়াদির বাহ্য বিকাশ স্তম্ভিত করিয়া আকাশমার্গে হু হু করিয়া লইয়া গেল। বহু তোরণ-সম্বলিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ, নানা লোক সমাগমে এবং কলরবে ও আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, আমার বাহকগণের মধ্যে বাঞ্ছারাম।" আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত দেখিয়া বাঞ্ছারাম বলিল, "বাবু! আমি যে মরিয়া যমদূত হয়েছি।

চিত্রগুপ্ত আমাকে দেখিয়াই ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, বাঞ্ছারাম করেছিস কি? এ রাখাল ডাক্তারের এখনো সময় হয়নি, তুই কাকে আন্‌তে কাকে এনেছিস্; যা এখনি ফিরিয়ে দিয়ে আয়। বাঞ্ছারাম রাখাল ডাক্তার অর্থে আমাকেই বুঝিয়াছিল, সুতরাং সে তাহার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমি বলিলাম, বাঞ্ছারাম একটা কাজ করিও, আমার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে আমাকে খবর দিও, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হইতে পারিব। বাঞ্ছারাম সানন্দে স্বীকৃত হইল। জ্ঞান সঞ্চার হইলে দেখিলাম চিতার সম্মুখে তোমরা সোৎসুক নেত্রে আমার চারি পার্শ্বে বসিয়া আছ।

৩

ডাক্তার এবার নিশ্চিন্ত, পাকা চুলে কলপ দিয়া বেশ স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটাইতে লাগিল। আমি বলিলাম ডাক্তার বুড়া বয়সে এতটা স্ফূর্ত্তি ভাল নয়। ডাক্তার উত্তর দিল কিছু ভয় নাই দাদা, বাঞ্ছারাম আমাকে ঠিক খবর দিয়া যাবে।

ডাক্তারের আবার ডাক পড়িল। এবার আমরা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন

যোগাড় করি নাই। একদিন স্বপ্নে দেখি ডাক্তার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া। আশ্চর্য্য হইলাম! ডাক্তার বলিল যে, আমাদের মধ্যে কথা ছিল, যে আগে মরিবে, সে-ই আগে আসিয়া পরলোকের খবর দিবে, তাহা কি ভুলে গেছ? তাই তোমাকে সেই সম্বাদ দিতে এসেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, বাঞ্ছারাম ত' তোমাকে খবর দেয় নি।

ডাঃ। হঁ্যা, সে জন্য বাঞ্ছারামকে ভর্ৎসনা করেছি; কিন্তু সে নিরপরাধ, সে বল্লে সে অশরীরী, সুতরাং আমি তাহাকে দেখিতে বা তাহার কথা শুনিতে পাইব না বলিয়া, সে প্রকারান্তরে খবর দিয়া গিয়াছে। সে বল্লে "কখন এসে চুল পাকাইয়া দিয়াছি, কখন দাঁত নড়াইয়া, গাত্র চর্ম্ম লোল করাইয়া দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মাইয়া বার বার আপনাকে খবর দিয়াছি যে বিলম্ব নাই; কিন্তু তাহাতেও আপনার চৈতন্য হয় নি, দোষ ত' আমার নয়।"

৪

ভাই, বাঞ্ছারাম প্রত্যহ আমাদেরও জীবনে ঐরূপে সংবাদ দিয়া যাইতেছে। এস আমরা যেন ডাক্তারের ন্যায় ইহকাল সর্ব্বস্ব হইয়া পরিণামে না অনুতাপগ্রস্থ হই।

বাঞ্ছারামের কোন অপরাধ নাই, আমরা যদি চক্ষু বুজিয়া জেগে ঘুমাই ত' সে কি করিবে; তাহার কার্য্য সে ঠিক করিয়া যাইতেছে। বাঞ্ছারাম ত' সকলকেই খবর দিতেছে, কিন্তু কই কাহারো ত' চৈতন্য হয় না। লালাবাবুর মত কাহারো ত' বৈরাগ্যের উদয় দেখি না। যথারীতি ঘৃণিত জীবন, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত, রিপুর বশ, মোহের দাস, মায়ার সাগরে নিমজ্জিত, লোক সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া মনকে চোখ ঠারিয়া, নিজের কাছে নিজে প্রতারক হইয়া মুষ্টিমেয় রজত খণ্ড বা তুচ্ছ নাম যশের প্রলোভনে চোখ ঢাকা বলদের মত আজীবন ঘুরিতেছি। বাঞ্ছারাম ঘুরিয়া ফিরিয়া জানান দিতেছে, তবু ভাবিতেছি বুঝি অজরামরবৎ ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিব? এ টুকুই সংসারের বৈচিত্র্য, ইহাই কি মাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

এস ভাই, এখনো সময় আছে—এখনো ইচ্ছা করিলে গোবিন্দের কৃপাভিখারী হইতে পারি; তাঁহার কৃপা হইলেই গুরু মিলিবে—"যব্ গোবিন্দ কৃপা করে,তব্ গুরু মিল্ যাই।" তাই বলি বিলম্ব করিও না; এস গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সংযম অভ্যাস করিতে শিখি। কর্ম্মফল শ্রীভগবানে সমর্পন করিয়া তাঁহার চরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করি এবং তাঁহারই নাম গুণগানে বিগত-কলুষ-ধন্য ও কৃতার্থ হই; নহিলে একদিন নেশা না ছুটিলেই অনুতপ্ত হইবে; কিন্তু তখন আর সময় নাই—উপায় নাই; কেবল মনে হইবে,—

মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি রইল পড়ে, আবাদ করলে ফল্‌ত' সোনা।

শ্রীঅরূপচাঁদ গোস্বামী।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। ২য় সংখ্যা।

মোক্ষ]

সর্ব্বাত্মিকা।

একটি রতি চোখের জল,
একটি কণা হাসি;—
একটুখানি মান অভিমান,
ভালবাসা বাসি।
তা'ই নিয়ে কর্‌তেছি বাস,
সংসারে ঘর বেঁধে;
কা'র আদরে হেঁসে উঠি,
কা'র শাসনে কেঁদে?
কাহার অগাধ স্নেহের ছায়া,
মাতৃ-বক্ষে দেখ্‌তে পাই?
কা'র করুণা বাবার বুকে?
কা'র পীরিতি বিলায় ভাই?
ভগ্নী, জায়া, কন্যা, বল,
কাহার আদর থেকে;
দুঃখের ক্ষত দূর করে দেয়,
সেবার মলম মেখে?
আততায়ীর বুকের মাঝে,
কাহার দ্বেষের বিষ;
কা'র অনাদর ব্যাধিরূপে,
জ্বালায় অহর্নিশ?
আমার তোমার সবার যাহা,
সব যে দেখি একই মত;
কেমন করে, বল তাহা,
করি 'আমার' সংজ্ঞাগত?
পশু, পাখী, সাপের মায়ের,
বুকের মাঝের স্নেহ-কণা,
তোমার আমার মায়ের স্নেহে,
হয় নাকি ভাই তার তুলনা?
দিবার কোলে রাত্রি যাঁহার,
আলোর কোলে শোভে আঁধার;
সুখের কোলে দুঃখও তাহার,
'সর্ব্ব' আধার, সেই মা আমার।
তাঁরি 'গুণে'র রূপের কণা,
সকল জগৎ জুড়ে আছে;
'দ্রব্য' 'ক্রিয়া' 'ভাব' রূপেতে,
তিনিই রাজেন জগত মাঝে।
তাঁ'র সোহাগে তিনিই তাঁ'রে,
আদর ক'রে তোলে কোলে;
বিরাগ ভরে তাঁ'রেই তিনি,
দলেন আপন চরণ তলে।
তুমি আমি তাঁ'র বিভূতির,
তুচ্ছ কণার কণা সব;
তাঁরি ধ্বনি 'আমি' রবে—
তুল্‌ছে তাঁ'রি কল-রব।

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক-চৌধুরী।

মোক্ষ] মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।—রাধাভাব।

ভাগবতে অমোঘলীল শ্রীভগবানের রাসলীলার বর্ণনা কালে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী প্রথমেই বলিয়াছেন,—"তস্মাদ্রাসক্রীড়া বিড়ম্বনং কামজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বং কিঞ্চ শৃঙ্গার কথোপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তিকরিষ্যামঃ॥'" অর্থাৎ কাম জয়ের জন্যই রাসলীলা; ইহারই তত্ত্বকথা শৃঙ্গার কথার ছলে বিশেষরূপে এই পঞ্চাধ্যায় নিবৃত্তি-পরায়ণ। ইহার সার কথা গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন। এই মিলন মানব মানবীর দেহাসক্তি নহে; কামপ্রণোদিত আত্ম-সুখেচ্ছা-পরায়ণ নরনারীর প্রাকৃত বিলাস-চিত্র নহে; ইহা সেই অপ্রাকৃত মদনমোহনের সহিত চিন্ময়ী পরা প্রকৃতির প্রেম-বিলাস বৈচিত্র। শ্রীমতি রাধিকা এই গোপীগণের অগ্রণী। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।"

এই মহামিলন বৈষ্ণবের ধ্যানের বস্তু, ভক্তির চরম আদর্শ, রাগানুগা ভজনপরায়ণদিগের উপজীব্য। বিরহ, মিলন, অন্তর্দ্ধান যাহা কিছু, তাহা কেবল রসপুষ্টির জন্য—ভক্তগণকে শিক্ষা দিবার জন্য—প্রেমভক্তিরূপ ক্ষুরধারবৎ শাণিত মার্গ জীবকে দেখাইবার জন্য।

মানব-মানবীর মিলনে কাম আছে; কিন্তু মন্মথ-মন্মথের সহিত তাঁহার নিজ প্রকৃতির মিলনে কাম থাকিবে কিরূপে? শক্তি ও শক্তিমানের মিলন নিত্য মিলন, অবিচ্ছিন্ন মিলন রস-সমুদ্রের সহিত ভাবতরঙ্গের নব নব উচ্ছ্বাস। যাহা নিত্য তাহা সর্ব্বকালে সত্য; সর্ব্বজনের ভিতর দিয়া সেই লীলারস প্রবাহিত হইতে পারে। মায়াসমুদ্রে ভাসমান জীবের ইহা দুরাশার কথা হইলেও নিরাশার কথা নয়। কারণ জীবও তাঁহার প্রকৃতির বাহিরে নয়; বস্তুতঃ সর্ব্বাত্মার সহিত সর্ব্বের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। তবে যে সে লীলা আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার হেতু লীলার অনস্তিত্ব নহে; পরন্তু সেই লীলা-দর্শনোপযোগী মানসিক চক্ষুর অভাবই ইহার কারণ। মহাপ্রভু রঘুনাথকে এই মানসিক সেবার উপদেশ দিয়াছেন—"ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।" মনের বহির্ম্মুখী ভাবনিচয়কে সম্যক্‌ভাবে একমুখী করিয়া, দেহাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সেই নিত্য মিলন দেখিতে চেষ্টা করিলে, তিনি নিশ্চয়ই প্রকট হইবেন। তিনি যে গোপীদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই সত্য-সংকল্প সত্য-ব্রতের সংকল্প যে অচল অটল। তাঁহারই বাণী—

মষ্যেব মনঃ কৃৎস্নং যিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ ১০।৪৭।৩৬ *

এই অনুস্মরণ বা মানসিক চিন্তা রাগানুগা ভজনের প্রাণ। মহাপ্রভু এই অনুস্মরণ প্রণালী দেখাইবার জন্যই অবতীর্ণ। এই অনুস্মরণ তীব্রতা প্রাপ্ত হইলে, সেই ধ্যেয় বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তু চিত্তে স্থান পায় না। জীব গোস্বামী এই স্মরণের স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মন দ্বারা শ্রীভগবানের যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম 'সামান্য স্মরণ'। মন তখন বহির্ম্মুখী বটে, কিন্তু অন্তর্ম্মুখী হইবার প্রবণতা জাগিয়াছে। যখন মন বহু বিষয় হইতে 'এক' বিষয়ে আবদ্ধ থাকে, তখনই ধারণা। গীতায় ইহা 'ধৃতি' নামে কথিত হইয়াছে,—"শনৈঃ শনৈরুপরমেদ বুদ্ধ্যাধৃতি গৃহীতয়া।" তৎপরে 'ধ্যান'—এই ধ্যান অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইলেই, 'ধ্রুবানুস্মৃতি'। কেবল ধ্যেয় বস্তুর স্ফুরণের নাম 'সমাধি'। সে অবস্থায় 'আমি' 'তুমি' জ্ঞান থাকিতে পারে না; থাকে কেবল কি এক রূপের স্রোত। সে রূপ প্রাকৃত রূপ নহে, কারণ সে রূপ চির নূতন—চিরসুন্দর, চিরমধুর। সে রূপ যে দেখিয়াছে, সেই বলিয়াছে,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
তখন— আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥

এই অনুস্মরণ বা অনুধ্যান রাগানুগাভজনের প্রধান ভিত্তি। ইহাই নরোত্তমের "সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পাব তাহা"। ইহা কল্পনা নহে, প্ররোচনা নহে; বাস্তব সত্য।

কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি ইহার নিত্যতা
অদ্ভুত ইহাতে নাহি দুর্ভাবনা ব্যথা॥

যাহাতে এই নিত্য মিলনের স্রোত জীব-হৃদয়ে সহজে প্রবাহিত হয়, প্রেমের এই মিলন-চিত্র জগতের জীবকুলের বুদ্ধি-দর্পণে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়, জীব-প্রকৃতি ভগবানের স্বরূপ-প্রকৃতি হ্লাদিনী শক্তিতে পরিণত হইয়া যাহাতে ভক্তের পরিপোষণে সমর্থ হয়, তজ্জন্যই রসিক-শেখরের এই মানুষী ক্রীড়া।

---

* অশেষ বৃত্তি হইতে বিমুক্ত মন অর্থাৎ যখন মনের শেষ হয়, তখন সম্যক্‌ভাবে আমাতে আবিষ্ট করিয়া নিত্য আমাকে স্মরণ করিলে অচিরাৎ আমি উপস্থিত হইব।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যং শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥

ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশই এই লীলার মুখ্য তাৎপর্য্য। তবে যে তাহাতে আমরা কামচিত্র দেখিতে পাই, ইহার কারণ আমাদের আত্মগত জন্ম-জন্মান্তরীন কামের অভিব্যক্তি। যদি সেই লীলা দর্শনের ইচ্ছা থাকে, তবে গোপীদিগের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহারা এখনও লিঙ্গদেহ ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বৃন্দাবন মধ্যে নিত্য বিরাজিত। এ উক্তি সেই সর্ব্বভূত-হৃদয় শুকদেবের—

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্ত-জীবকোশাস্তমধ্যগন্ ॥১০।৮২।৪৭

সেই গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি ভাগবতে বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। সেই গোপবালাদিগের আত্মোৎসর্গ দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত; দেবকুল, ঋষিকুল, স্তব্ধ;—মহর্ষি দেবর্ষি সেই গোপীভাবে আত্মহারা। সর্ব্ব সমর্পণ করিয়া "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণব্রজ" এই বাক্যের সার্থকতা করিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। এ মিলনে গোপীদিগের আত্মচিন্তা নাই, আপনাদের সুখ কামনা নাই; আছে কেবল কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যমূলক ফলানু-সন্ধান-রহিত অহেতুকী মনোগতি। কিন্তু এ প্রেমেও অভিমানের সঞ্চার হইয়া, এ মিলনেও কৈতব আসিয়া জুটিল।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণালব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীনাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভুবি। ১০।২৯।৪৭

ভাবিলেন "আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই; ভগবান আজ মনুষ্য রূপে আমাদের সহিত রমন করিলেন! আমরা আজ জগতের মধ্যে ধন্য হইলাম।" গোপীগণ! সত্যই তোমরা ধন্য—তোমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জগতে যে আদর্শ রাখিয়া দিলে, তাহা অতীব অপূর্ব্ব! তোমরা জগতে আজ ত্যাগের গুরু;—জগত তোমাদিগকে সেইভাবে দেখুক। তোমরা আপনাকে সেইভাবে দেখিতে গেলে কেন? যেই আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিলে, অমনি একটু অহংকার জাগিয়া উঠিল; অমনি ভগবান অন্তর্হিত হইলেন।

ভক্তগণ! ভাল করিয়া দেখুন এ অভিমানটুকুও সেই প্রেমময়কে দূরে লইয়া গেল। আর মান-গর্ব্বিত ভিন্নদর্শী বিশিষ্টতার মোহে আচ্ছন্ন 'আমি' আপনাকে ভক্তজ্ঞান করিয়া, ভেদ ভাবে সেই অখিল রসমূর্ত্তির সহিত মিলনের

আশায় বসিয়া আছি। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, দুর্জ্জয় গৃহ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, কৃষ্ণ-সঙ্গম-সৌভাগ্য-অভিমানে আজ গোপীরা যাঁহার সঙ্গমে বঞ্চিত হইল, পূর্ণ আমিত্বের অভিমান লইয়া সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশা বাতুলতা। ভগবানের যাঁহারা হ্লাদিনী শক্তি হইবেন, তাঁহাদের এই আমিত্বাভিমান লোপ হওয়া চাই; অবিদ্যার লেশ থাকিলে চলিবে না। তা'ই বিরহাগ্নি দ্বারা সেই অহমিকার নাশ করিবার জন্য ভগবানের অন্তর্দ্ধান। সেই অঙ্গ সঙ্গে শ্রীমতীর এ অভিমান হয় নাই; তা'ই অন্তর্দ্ধান-সময়ে শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এখানেও সেই ভ্রম—"সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্টং সর্ব্বযোষিতাং"। এ ত' হইবার কথা; কারণ তিনি দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই ভাব মনে আসিতেই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান। অভিমানের মূল ভেদাত্মক বিশিষ্টতা; যেখানে বিশিষ্টতা, সেখানে কৃষ্ণ নাই। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিলে, হয়ত' শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়; বাহিরে প্রেমিক সাজিয়া বৈষ্ণবাভিমানী বা ধর্ম্মাভিমানী হইয়া, কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া আমরা শ্রীকৃষ্ণকে বস্তুতঃ চাই না; চাই ধন, মান, যশ, কামিনী-কাঞ্চন। যদি কখনও চাই, তা'ও ঐ বিষয়ের জন্য। তা'ই অন্তর্য্যামী আমাদের প্রার্থিত বস্তু অবিরত যোগাইতেছেন। আমাদের বিরহ হইবে কোথা হইতে? মিলনের পর না বিরহ? মিলনের সঙ্গে যাহার খোঁজ নাই তাহার বিরহ? গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল, তাই তাঁহার অন্তর্দ্ধানে তাহাদের বিরহ গীত। বিরহের পর যে মিলন, সে মিলনে কেবলই অমৃত ক্ষরণ। ভক্তের বৃত্তি তখন ভগবানে পূর্ণরূপে লীন। তাহাতে অন্য চিন্তা স্থান পায় না। ঐ দেখুন,

প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া তা'র গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কহে হা হা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল হইল চপল।

রত্নলাভ করিয়া ধনবান ব্যক্তি সেই বহুমূল্য রত্ন হারাইলে, তাহার আর অন্য চিন্তা থাকে না; ক্ষুৎপিপাসা পর্য্যন্ত লোপ পায়; কেবল সেই রত্নের গুণ-স্মরণ এবং তজ্জনিত সন্তাপ, তখন প্রধান অবলম্বন। গোপীগণের প্রেম অতীব অদ্ভুত;

আত্ম সুখ দুঃখ গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে সব ব্যবহার ॥

ইহার ধারণা আমরা করিতে পারি না; ভজন সাধন ত' দূরের কথা। আমাদের সকল ব্যবহার বিশিষ্ট 'আমির' সুখের জন্য। বিশিষ্ট 'আমির' প্রীতির জন্য ব্যবহার, গোপীভাবের সাধনার প্রতিকুল। দেহাভিমানী 'আমি' এ পথের পথিক হইতে পারে না; মমত্বাভিমানী 'আমি' এ ভজন পথ হইতে বহুদূরে। গোপীদের যে নিজ দেহে প্রীতি ছিল না এমত নহে, তবে সে প্রীতি কৃষ্ণের জন্য, তাঁহাকে অর্পিত এবং তাঁহার সম্ভোগ-সাধন বলিয়া গোপীদিগের সকল সুখ কৃষ্ণ-সুখে পর্য্যবসিত। যখনই গোপীগণ আপনাকে আপনার জন্য ভাবিলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত। যখন গোপীগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্য, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। গোপীবল্লভ আপ্তকামের এই প্রেমের ভজনে হাসিতে হাসিতে তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

আর বাকী থাকিল না 'অহং' এবং ধর্ম্মাভিমান 'স'এ ন্যস্ত করিয়া শ্রীমতী রাধিকার সহিত গোপীগণ এক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। জীবন্মুক্ত গোপীগণ রাসমণ্ডলে আত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে মিশিয়া গেলেন। মধুর লীলার ইহা শারদীয় পূর্ণিমা—ভক্তগণের চরম আদর্শ—মানুষের সহিত ভগবানের চরম একত্ব। এই নূতন ভাবের শুভ্র আলোক-রশ্মি দেবতাদিগকেও মুগ্ধ করিল; ভক্তগণ সেই লীলার অপূর্ব্ব চিত্র মানস-চিত্রে দেখিবার জন্য পিপাসিত হইয়া উঠিল। ধন্য গোপীগণ! আজ তোমরা জগতের শীর্য-স্থান অধিকার করিলে; তোমাদের অকৈতব প্রেমে শাস্ত্রযুক্তি ভাসিয়া গেল; ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে সর্ব্বেশ্বর বাঁধা পড়িলেন। যদিও শ্রীভগবান তাহাদিগকে পরিতপ্ত করিবার জন্য অন্তর্হিত হন নাই, তথাপি তিনি অভূতপূর্ব্ব এই প্রেমের ত্যাগ ধর্ম্মে মুগ্ধ হইলেন। যাহারা ইহলোক, পরলোক, বেদধর্ম্ম, স্বজন, পরিজন ত্যাগ করিয়া এই ঘোররূপা ঘোর-সত্ত্বনিষেবিতা রজনীতে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের ঋণে তিনি আবদ্ধ হইলেন; তাই বলিলেন,—

ন পারযেঽহং নিরবদ্য সংযুজাং, স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ
যামাভজন দুর্জ্জর গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥১০।৩২।২২

গোপীগণ! শ্রীভগবান আজ তোমাদের সাধু ব্যবহারে মুগ্ধ। বাস্তবিক তোমরা যেমন দুর্জ্জয় গৃহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছ! তিনি ত' সেরূপ করেন নাই। তোমরা একনিষ্ঠ; তিনি ত' "সে বহুবল্লভ কান।" "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য" বাক্যের ষোল আনা তোমরা পূণ করিয়াছ; তাহার বাক্‌চাতুর্য্যে তোমরা ভুলিও না। তিনি যে বলিতেছেন 'দেবতার পরমায়ুকাল

পর্য্যন্ত তোমাদের সহিত সাধু ব্যবহার করিলেও ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না'; ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু তিনি ত' প্রতিজ্ঞা-বদ্ধই আছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং,—

তাহার কি হইবে? তাঁ'র প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করুন! জগৎ বুঝুক যে ভগবান ভক্তের বশ; ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে কত আপন করিতে পারা যায়। তোমাদের সুশীলতা দ্বারাই যে তোমাদের সাধু ব্যবহার প্রতিকৃত হউক বলিতেছেন, ইহা ত' ভালই। ঋণ পরিশোধের পন্থা জানা থাকিলে, সেই পন্থা অবলম্বন করিলেই ত' হইল। ভাল কথা, তিনি নিজে অঋণী হইতে পারিবেন না; পারিবেন কেন? বহু-নিষ্ঠায় কখনও এক-নিষ্ঠার ঋণ শোধ হয় না। হে সত্য-সংকল্প ভক্তের প্রাণধন—ভক্তের মহিমা কীর্ত্তনে পটু শ্রীকৃষ্ণ! ভক্তকে তুমি ভালরূপে জান! ভক্ত তোমার হৃদয়; এ ত' তোমারই কথা। তোমার আবার ঋণ অঋণ কি? এও সেই ভক্তের মহিমা ব্যঞ্জনা। তুমি গোপীদিগের নিকট ঋণী হও বা না হও, জগৎ একশ'বার গোপীদিগের নিকট ঋণী। হে জগন্নাথ! জগতের এই ঋণেই ত' তোমার ঋণ। সেই ঋণ পরিশোধ চিন্তাই তোমার কাল-অঙ্গ গৌর করিয়াছে। চিন্তার দ্বারা রূপের পরিবর্ত্তন বাস্তব সত্য। যেমন—

কীট পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাংন্তেত প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎস্বরূপতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপম্ সংত্যজন ॥

শ্রীমতীর কান্তি চিন্তায়, কাল-অঙ্গ গৌর হইয়া গেল; সুশীলতার ঋণ শোধের জন্যই ত' শ্রীমতীর ভাব অবলম্বন! গোপীদিগের ঋণ শ্রীমতীর ভাব অবলম্বনেই শোধ হইতে পারে; কারণ গোপীগণ সেই কল্পলতিকার কিশলয় ও পত্র-পুষ্প—

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥

এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। চিন্তার প্রাবল্যে দুই তনু এক হইয়া গেল। দ্বৈত-ভাব অদ্বৈতে পরিণত লইল! ভক্ত দেখিতে পাইল—"রাই কানু দুঁহু তনু, এক হৈয়া আছে"। নরোত্তম ঠাকুর ধ্যানে এই চিত্র দেখিতে পাইলেন,—

রাই অঙ্গ ছটায়, উদিত ভেল দশ দিশি,
শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখীগণ, গৌর নিকুঞ্জ বন,
রাইরূপে চৌদিগে পাথার।

গৌর অবনী হৈল, গৌরময় সব ভেল,
রাইরূপে চৌদিগ ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয়, অপরূপ রূপ নয়,
দুঁহু তনু একই মিলিত ॥

বৃন্দাবনের এই চিত্র,—নবদ্বীপে প্রকট গৌরাঙ্গ। বৃন্দাবনে যুগলে এক ; নবদ্বীপে তাহা একে যুগল বা একে দুই ; তিনি একাধারে রাধাকৃষ্ণ। ইহা রূপ গোস্বামীর ধ্যানের বস্তু ; "অন্ত কৃষ্ণ বহির্গৌর"। ভাব ও কান্তি অবলম্বন সেই ঋণ পরিশোধ জন্য ;—আর জগতের জীবকে বুঝাইবার জন্য,—"হে জগতের জীব যদি আমাকে পাইতে চাও, তবে গোপীভাব অবলম্বন করিতে হইবে। আমার মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য, আমাকেই শ্রীমতীর ভাব অবলম্বনে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে" বলিয়া কাঁদিতে হইতেছে।" এই ভাব ভিন্ন অন্যভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না। গোপীর আনুগত্য ভিন্ন রাগানুগা মার্গের অন্য সাধনা নাই—

সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী-ভাবে যেই তা'রে করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবায় সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥

এই সাধনার পন্থা দেখাইবার জন্যই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ। এই দিব্যোন্মাদে বিশিষ্ট ভেদাত্মক আমিত্বের পূর্ণ লোপ ; শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি ইহার মূল ভিত্তি। এ প্রেমে মান অভিমান নাই ; আদর অনাদরে হ্রাস বৃদ্ধি নাই ; সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়া সেই প্রাণনাথের প্রেমমূর্ত্তি। তাই মহাপ্রভু ভাবাবেশে বলিলেন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু সএব নাপর ॥*

এই গোপাভাবের বিরহ উচ্ছ্বাসে তাঁহার লীলাচলে বাস ; বঁধুর, কৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠা ও তীব্র অনুরাগই তাহাকে সমুদ্রের বেলাভূমিতে আনয়ন করিয়াছে।

---

* প্রেমাবেশে বাহুপাশে বান্ধিয়া সে জোরে।
পেষণ করুক এই পদারতা মোরে ॥
অথবা দর্শন দান না করিয়া হায়।
পরম মর্ম্মহতা করুক্ আমায় ॥
সে লম্পট যা 'খুসি তা' করুক বিধান।
আমারই সে প্রাণনাথ কভু নহে আন।

ভাই সব, যদি মহাপ্রভুকে বুঝিতে চাও, তবে সেই বৃন্দাবনের লীলা স্মরণ কর ; সেই আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগলমূর্ত্তি ধ্যান সহায়ে দেখিতে চেষ্টা কর ; দেখিবে সেই নিকুঞ্জ কাননে—

শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতল,
মদন-মদালসে ভোর।
ভুজে ভুজ বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন,
যেন কাঞ্চন মণি যোড় ॥

আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগল মূর্ত্তি, আজ মানস-কুঞ্জে এক হইয়া গিয়াছে। বাস্তব কথা এই যে, কেবল লীলা-রস পুষ্টির জন্যই দেহ-ভেদ ; নতুবা এক প্রাণ এক মন—

দুঁহু তনু এক মন, নিবিড় আলিঙ্গন,
দুঁহু জন একই পরাণ।

সে চিত্র ভক্তের বড় লোভনীয় ; যেন ত্রিভঙ্গিম তমাল-তনু প্রেম-লতিকায় বেষ্টিত ; যেন নব জলধরের কোলে স্থির বিদ্যুতের আভা। সে মিলনে—এক টুকুও বিচ্ছেদ নাই—

ভুজে ভুজে দোঁহে দোঁহা বাঁধি।
পবন পশিতে নাহি সন্ধি ॥

এই যুগল-মূর্ত্তি নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ। যে এই গৌরাঙ্গ দর্শন করিয়াছে সে নিশ্চয়ই বলিবে—

এ তিন ভুবনে যার, তুলনা দিবার নাই,
গোরা মোর পরাণ পুতলী।

তাহার জানা চাই—গোরা মোর পরাণ পুতলা। নতুবা গৌরাঙ্গ দর্শন হইবে না ; সেই প্রেমাবতার প্রেমের প্রকট চিত্র দেখাইবার জন্য ভক্ত-বেশে,—

না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে,
যাচিয়া দেওল প্রেমধন ॥

ভিতরের কথা,—গোপীদিগের ঋণশোধের জন্য রাগাত্মিক-ভাবে স্বীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন। এ কথা অতিশয় গূঢ় ;—কেবল "দামোদর স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার।"

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুরায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥

তা'ই স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন।—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশোবানষৈবা।
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশোবা মদীয়ঃ॥
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ।
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী গর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ *

কৃষ্ণ মাধূর্য্যের এমনই শক্তি! আজ শ্রীকৃষ্ণ সেই মাধুর্য্যের আকর্ষণে রাধা ভাব অবলম্বন করিলেন! জগৎ একবার ভাবিয়া দেখ, সেরূপই কিরূপ আর সে প্রেমইবা কিরূপ? সে প্রেমে স্মৃতিতে বিস্মৃতি, দিবসে রজনী জ্ঞান; সে প্রেম অদ্ভুত—সে প্রেম অপ্রাকৃত—সে প্রেম নিরুপাধি—কে তাহার বর্ণনা করিবে?

সজনি প্রেমকো কো কহ বিশেষ।
কানু ক' কোরে কলাবতী কাতর
কহত 'কানু পর দেশ'।

সেই প্রেমের ভাব লইয়া অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-সত্ত্বা বিদ্যমান থাকিলেও রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ যেন রাধিকার ভাষায় বলিতেছেন,—

কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
এ যেন,— হেম আঁচলে রহু যৈছন খোঁজি
ফিরত আনহি ঠাঁই॥

এই প্রেমের চিত্র অভিনয় করিতে করিতে, মহাপ্রভু এখনও ভক্তের সম্মুখে প্রকট। কারণ সে লীলার নায়ক ভক্তের পরাণ পুতলি গোরা; সে লীলার আবির্ভাব তিরোভাব কেবল ভাষার কথা। কে আছ প্রেমিক! হাত পাতিয়া সেই প্রেম ফল গ্রহণ কর। সময় যেন বহিয়া না যায়? (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

\+ শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ? তিনি সে প্রেম কিরূপে আস্বাদন করেন, আমার অদ্ভুত মধুরিমাই বা কিরূপ, আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধাই বা কিরূপ আনন্দলাভ করেন, এইরূপ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভরূপ সমুদ্র মধ্যে রাধাভাব সমন্বিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

মুখস্ পরা।

মেঘের মত উদাস ভরা, মূর্ত্তি কা'র ও হেরি।
অগ্নি জ্বলে আঁখির পরে, দেখলে ভয়ে মরি॥
বিমুখ হয়ে রয়েছ বসে, শুষ্ক পাংশু মুখে।
জিজ্ঞাসিলে শ্বাসটি ফেল গভীর দুঃখ শোকে!
চিনেছি এবার তোমায় বন্ধু! আর কি কভু ডরি!
মুখটি গুঁজে মধুর হেঁসে, যাচ্চ কোথায় সরি?
এস ওগো শ্রান্তি-হর, এস আমার মিতা।
মুখস্খানি খুলে এস, ঘুচুক ব্যাকুলতা॥

——০——

ঔপনিষদিক দর্শন ও যোগমায়া।

সর্ব্বাত্মভাবই আবার সর্ব্বেশ্বর আত্মার যে সর্ব্বস্ব তাহা নহে। সেই অপার অনধিগম্য পুরুষকে কে কবে বাক্য ও মনের দ্বারা গোচর করিতে পারিয়াছে? তিনি যে চিরদিনই পিছাইয়া যান্। "It is unattainable because it for ever recedes· You can enter the light, but you can never touch the flame."

—Light on the Path,

তুমি যতই যাইবে ততই আরও যাইতে হইবে—এ যাত্রার শেষ নাই, পরিসমাপ্তি নাই। ক্ষুদ্র জীব আমরা—অহঙ্কারের দাস —বিশিষ্টতার মোহে বদ্ধ। তা'ই আমরা অপার অনন্ত অসীম: গতির দিকে চাহিতে ভয় করি—পিছাইয়া যাই, ভাবি পাছে আমার নামরূপের এত সাধের পোষা 'আমি'টী হারাইয়া যায়। তা'ই আকাশ বাতাস অন্তরেন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয় সকলেই তাঁ'র কথা—তাঁ'রি গান—তাঁ'রি সৌন্দর্য্য দেখাইলে ও শুনাইলে আমরা আমাদের 'আমিটাকে' ছাড়িতে চাহি না। আমাদের—

"সব সখি মেলি শুতায়ল পাশ, চমকি চমকি ধনী ছোড়য়ে নিশ্বাস।
করইতে কোড়ে মোড়ই সব অঙ্গ, মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল ভুজঙ্গ"

(বিদ্যাপতি)।

তিনি পরাগতি। তাঁর যে ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছায়া—এই 'অহম্'টা,—তার দিকে তাকাইয়া দেখ ত' ভাই ; সেও কি পরাগতি নহে—সেও কি সমস্ত দ্বন্দ্বের প্রতিঘাত সহিয়া সহিয়া প্রস্ফুটিত হইতে হইতে কোন এক অনির্দ্দেশ্য পথে চলিতেছে না ? সেও কি শব্দের ভাষায় "অ" হইতে "হ" পর্য্যন্ত—আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত—অ-ক্ষরের ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়া অতিক্রম করিয়া অনির্দ্দেশ্য অবোধ "ম্"কারের দিকে চলিতেছে না ? তাই আমরা বস্তুর কোনটাতেই আটকাইয়া থাকি না ; কোন বিশিষ্ট বস্তুই আমাদিগকে চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে পারে না ; কিয়ৎক্ষণ ভোগের পর আবার মন অন্য পদার্থ সম্ভোগের জন্য ব্যস্ত হয়।

উপনিষদে এজন্য আত্মতত্ত্বের বা ভগবৎ তত্ত্বের দুইটী বিভাবই (aspects) বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছে। উপনিষদে ব্রহ্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ং"ও বলিয়াছে, "সর্ব্বং খল্বিদং"ও বলিয়াছে। ঐ "একমেবাদ্বিতীয়ং" তাঁর পর ভাবের (transcendent aspect) ইঙ্গিত করে ; ও "সর্ব্বং খল্বিদং" তাঁর 'সর্ব্ব'ভাবের পরিচায়ক। স্বরূপে যিনি পর, বিবর্ত্তে তিনিই সর্ব্ব। সেই পর-পুরুষ এমন যে,—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

তাঁহা হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রতি মূহুর্ত্তে উদ্ভূত ও মূহূর্ত্তেই তাঁহাতে লীন হইতেছে ; কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে শেষ (exhaust) করিতে পারে না। তিনি চিরদিনই অক্ষররূপে বিরাজিত ও সর্ব্বে অধিষ্ঠিত আছেন। যেমন কোটি কোটি বস্তু তাঁহা হইতে গ্রহণ করিলে তাঁহার ক্ষয় হয় না—তেমনি কোটি কোটি বস্তু যোগ করিয়াও তাঁহার ইয়ত্তা বা পরিমাণ করা যাইতে পারে না। উপনিষদের অনেক স্থলেই আকাশের সঙ্গে ব্রহ্মের তুলনা করা হইয়াছে। যেমন ঘটাকাশ বা পটাকাশ, আকাশকে কমাইতে পারে না, কেবল কাল ও স্থান (time and space) রূপ মৌলিক একটী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিজ্ঞাপনের ভাব দেখাইয়া থাকে ; তদ্রূপ ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব কোটি কোটি জগতেও পরিমাপিত করিতে পারে না।

চন্দ্র তাঁ'র জ্যোতি আঁকে, সূর্য্য তাঁ'র প্রভা ও প্রাণ আঁকে ; আকাশ মহাশূন্য তাঁর শব্দ ও পরিসর আঁকে—বায়ু তাঁর স্পর্শ আঁকে ও "সর্ব্ব" শরীরের ভিতরে ও বাহিরে সুরধুনীর প্রেমধারা বহাইয়া দিয়া যায়। শ্রীভগবানের মহারাসে

প্রত্যেক গোপিকাই স্ব স্ব ভাবানুযায়ী তাঁর রূপ, পার্শ্বে,—অন্তরে, বাহিরে নিরীক্ষণ করে। কিন্তু তিনি মানের অতীত ;—তিনি গোপিকাবর্য্যা মহাভাব-স্বরূপিণী ব্রজরমণী-মণি তাঁর হ্লাদিনীকেও বিষাদের আঁধারে ডুবাইয়া অন্তর্দ্ধান হইয়া যান্। তিনি নিম্নে প্রদত্ত অনন্ত রাশির (infinite series).

A (জাতি) = a_1(ব্যক্তি) + a_2 (ব্যক্তি) + a_3 (ব্যক্তি + a_4 (ব্যক্তি,) + &c.

বড় Aটার ন্যায় ভাবাভাব অগ্রাহ্য করিয়া "সর্ব্বান অতিরিচ্য বর্ত্ততে"। এই পরভাবে তখন তাহাতে কোন বিশেষণই প্রযুক্ত হইতে পারে না। তখন তিনি নিষেধ মুখে—

"তদ্বা এতক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্র বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" (বৃহদারণ্যক, অধ্যায়—৮ম ব্রাহ্মণ) এইরূপে উক্ত হয়েন। এই সর্ব্বের তাঁহাতেই উদ্ভব—তাঁহাতেই লয় হয়। তিনি "সর্ব্বেশ্বর" "পর পুরুষ", ও তাঁর চিদ্বিভাব তখন "সর্ব্ব-নাশিনী"।

একটী সামান্য মৃৎপিণ্ড লইয়া দেখুন, ঐ সামান্য বা অণুর মধ্যে তিনি অনীয়ান্ হইয়াও তবু যে কি অপার অনন্ত মহিমায় প্রকাশিত হইতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে ? বস্তু সত্ত্বার শক্য বা দ্যোত্য (denotation or connotation) সম্পূর্ণ কে কবে দিতে পারিয়াছে ? কে কবে কোন জিনিষকে পূরাভাবে সংজ্ঞা দিতে পারে ? তাই তিনি আমাদের কাছে বড় হইয়াও যেরূপ পূরাপূরি, ছোট হইয়াও ঠিক সেইরূপ পূরাপূরি হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন !

God is as perfect in an atom as in the whole universe" মানুষ কবে তাহার চিত্তকে এক জায়গায় বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছে ?—সে যে আজ কত দিন থেকে "পর" পুরুষের অভিসারে চলিয়াছে। তাই "সর্ব্ব" তা'কে "পূর্ণের"—"পরের" বিভ্রম দেখাইয়াও ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে অবিরাম ছুটে ; অবিরাম গতিতে "বহুর" দিকে ছুটিয়াও, সেই মায়ার অতীত পুরুষেরই পাছে পাছে—বিরজার পরপারের দিকেই ছুটিতেছে। সর্ব্ব তাকে ব্যক্ত বহুত্বের মধ্যে ছুটাইয়া পরভাবের ইঙ্গিত দেখাইতেছে।

তাই সর্ব্বের সর্ব্বত্রই পরিণাম। সর্ব্বের মাপ-কাটি জীবের কল্যাণার্থ প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন,—"জীব ! তুমি ত' প্রত্যহই ধন, জন, পুত্র, পরিবার, বিষয়, বৈভব সকলের দাসত্ব স্বীকার করিতেছ। তোমার 'আমি'টাকে অনুক্ষণই ক্ষুদ্র বিশিষ্ট ভাবের সহিত জড়াইয়া ফেলিতেছ ও তাহার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে নিজে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছ ; তোমার ত'

দাসগিরি করাটা সহিয়া গিয়াছে,—অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছে। তবে একবার ভাব ত' জীব! তুমি "কৃষ্ণদাস"। তোমার অভিমানটা একটু উচ্চ সুরে চড়াইয়া বাঁধ। যদি জলই খাইতে হয়, পচা ডোবার পচা জল না খাইয়া হ্রদের বা গঙ্গার সুনির্ম্মল বারি পান কর, তবে ত' আনন্দের অমৃতের অধিকারী হইবে।" এই রূপে সর্ব্বের সর্ব্বময়কে উপলব্ধি বা আপন করাইতে "সর্ব্ব" সর্ব্বদাই আমাদের আমিটাকে একটু একটু ক'রে উচ্চ সুরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। জীব জগৎ সবাই এই মহাযাত্রার পথে পথিক; কাহারও বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নাই। সর্ব্বের 'আমি'টা যেন ব্যাকুল হইয়া, জীবের 'আমিটা'কে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে। অথবা 'সর্ব্ব' ক্রমেই "পর"কে প্রকাশিত করিতে করিতে—পরের ছবি দেখাইতে দেখাইতে চলিয়াছে। কিন্তু 'পর' যে অসীম—পর যে সর্ব্বদাই ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়—"ব্যতিরিচ্যতে"; তা'ই সর্ব্বাত্মিকা প্রকৃতি, পর-পুরুষকে কেবল ছবি, কেবল ইঙ্গিত, কেবল ইসারা করিয়া যাইতেছে। প্রকৃতি তা'ই নর্ত্তকী।

দর্শনের পরিভাষায় এই 'সর্ব্ব'ও পরের খেলাকে অন্বয় (immanence) ও ব্যতিরেক (transcendence) বলে। অন্বয় কেমন? যেন একটা ঢাকনি আছে,—কিন্তু ঢাকনিটার বা উপাধিটার অন্ধি-সন্ধিতে অরূপ রূপ ছাপাইয়া উঠিতেছে; যেন একটা মহারাসের নৃত্য চলিতেছে। কত রঙ, কত ছবি, কত ভঙ্গী, যেন নটবরকে নাট্য দেখাইয়া যাইতেছে। ইহাই তাঁহার সর্ব্বাত্মকতা! আর ব্যতিরেক?—সর্ব্বদাই কি যেন একটা ভাব সকল বিশিষ্টতাকে (trans-cedo-) অথবা বি-অতি-রিচ্যতে) ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া চলিতেছে। "নেতি-নেতি"—কোনটীই 'এই' 'এই' করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ধরিয়া, তাঁহার সবটাকে দেখাইতে পারিতেছে না,—'আরও কিছু, আরও' আরও, তাঁহার এই মহিমা ব্যঞ্জিত করিরেছে। ব্যতিরেক মুখে তিনি পরপুরুষ, আর অন্বয়মুখে তিনি সর্ব্বময়; তাঁর চিতিশক্তি সর্ব্বময়ী প্রকৃতি। এই কথাই পরমভাগবত শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের নয়ন সমক্ষে ধরিয়া দিতেছেন; যথা—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা

যে পদার্থ অন্বয় ব্যতিরেক রূপে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই বিষয়েরই জিজ্ঞাসা করিবেন। এই সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বেশ্বরের

'ঘোমটা পরা ছায়া'ই অমর-কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাণ ভুলাইয়া "কাজ ভাঙানো গান" গাহিয়া দিয়া গিয়াছে। উহারই ভাষা "কাণের ভিতর দিয়া" বৈষ্ণব কবির "মরমে পশিয়া" প্রাণ আকুল করিয়াছিল, এবং তাঁর "প্রতি অঙ্গকে" "প্রতি অঙ্গের" জন্য কাঁদাইয়াছিল, যথা—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥"

কিন্তু এই ভাব বুঝিতে হইলে সর্ব্বাত্মিকা "বিদ্যার" শরণাপন্ন হইতে হইবে। "বিদ্যয়াঅমৃতমশ্নুতে"। যিনি যোগেশ্বরের যোগমায়ার শরণাপন্ন হন নাই, তাঁ'র পক্ষে ভাবের দুয়ার রুদ্ধ। দেখুন গোপিকাগণ—যাঁরা কৃষ্ণ প্রেমের একমাত্র মহাজন, তাঁরা কি করিয়াছিলেন? মহারাসের অধিকারী হইবার জন্য তাঁরা কাত্যায়নীর মহাবিদ্যার শরণাপন্ন হইয়া অনন্যহৃদয়ে ডাকিতেছেন;—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরী।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

"হে কাত্যায়নি! মহামায়ে! মহাযোগিনি! মহাযোগ-বিধায়িনি! কারণ তুমি ছাড়া আর কেউ তাঁর কাছে পৌছাইয়া দিতে পারে না, তাঁর সহিত নিত্যযুক্ত করিয়া দিতে পারে না। হে অধিশ্বরি! হে দেবি! নন্দ-গোপের পুত্রকে আমাদের স্বামী করিয়া দাও—তোমাকে নমস্কার করি।" তাই আমাদের শত সহস্র উপাসক সম্প্রদায়ে সর্ব্বত্রই "গায়ত্রী" উপাসনা বিহিত হইয়াছে; সকলেরই স্ব স্ব সাধনানুকুলা গায়ত্রী আছে। মায়ার—অঘটন-ঘটন পটীয়সী শক্তির বিভ্রম দূর করিতে—'আমি আমার' ইত্যাকার ছিন্নস্থান সংহার করিতে, তাই রাম প্রসাদ প্রাণ ভরিয়া সেই "তিমিরে তিমির হরা"কে ডাকিয়াছিলেন। তা'ই খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের উপাসকবর্গের God the Son বা যীশু খৃষ্টকে বিশ্বাস না করিলে পরিত্রাণের দ্বিতীয় উপায় নাই। কারণ সেই শক্তিই একমাত্র "পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।" কোথায় সে মহানের ঐ মহীয়সী শক্তি—ভাই! হৃদয়ের অন্তঃস্থলে "অনু"-সন্ধান করিয়া দেখ কোথায় তিনি! তিনি সেই 'এভ্যঃ পরং অব্যয়ং" কে (গীতা ৭।১৩) দেখাইতে

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ূ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা"॥ গীতা—৭।৪

বাহিরে,—জীবের বাহিরে, অষ্টধা বিভক্তি। আর অন্তরে "মায়াশক্তি বিলাস

কল্পিত "মহাব্যোমোহসংহারিণী" রূপে, জীবরূপে (জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ) আমরা যাকে Consciousness বলি সেইরূপে প্রতিষ্ঠিতা। যে দিন আমরা "অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া conscionsness বা চিচ্ছক্তির দৈবী প্রকৃতি (divinity of consciousness) দেখিতে পাইব—সে দিন হইতেই "ঘটে ঘটে" সর্ব্বময় ও পরাৎপরের পরমজ্যোতিঃ নয়ন গোচর হইবে। আসুন আমরা আজ তাঁহারই উপাসনা করি, সমস্বরে আমাদের ধীকে প্রেরণা কর্ত্তে কর্ত্তে তাঁহাকেই আবাহন করি :—

আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোহস্তুতে। (ক্রমশঃ

শ্রীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোক্ষ] উপনিষদ প্রতিপাদ্য ভূমা।

আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রবল চর্চ্চা হেতু বেদান্ত শাস্ত্রের প্রকৃ মর্ম্ম গ্রহণ ও বিদ্বান শাস্ত্রজ্ঞ সম্প্রদায়ের হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা সংস্কৃত ও উপনিষদ চর্চ্চা দ্বারা শাস্ত্রনিপুণ, তাঁহারাও প্রবৃত্তিমার্গে থাক এবং পাশ্চত্য বিজ্ঞান অধিক আগ্রহ সহকারে অনুশীলন এবং শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর অভাব বশতঃ বেদান্তের যথার্থ মর্ম্ম করামলকের ন্যায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উভয় নৌকায় পা দিয়া বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা চর্চ্চা তাহাদের পক্ষে প্রলাপবৎ হয়। উপনিষদের গম্ভীর মর্ম্ম এতদূর গুহ্য, যে উহা সাধারণ বিদ্বানের জিনিস নহে। সমস্ত বেদান্ত প্রতিপাদ্য "ভূমা" উপলব্ধির বিষয়, বৃত্তি জ্ঞানের বিষয় নহে। পৃথিবীর ইতর সাধারণ জাতি প্রবৃত্তি মার্গে থাকা প্রযুক্ত তাঁহাদের বিজ্ঞানও তদনুসারে গঠিত। কেবল একমাত্র বেদান্ত শাস্ত্র নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ দেন; সুতরাং উভয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? সকাম কর্ম্ম জগৎ জ্ঞান: নিষ্কাম কর্ম্ম ভূমা-জ্ঞান; অতীব বৈরাগ্য, একাগ্রতা এবং কাম ক্রোধাদির সমূলে উন্মূলন দ্বারা যাঁহারা নিবৃত্তি মার্গে স্থিত ও নিষ্কাম কর্ম্মে রত থাকিয়া, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি এবং গুরু ও ভগবানের কৃপা নিবন্ধন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মগত ও একাগ্রচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহস্র সহস্রের মধ্যেও কদাচ দুই একজন "ভূমার" প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হন। আমি অতি হীনমতি। ছান্দোগ্য

উপনিষদে ভগবান সনৎকুমার যেরূপ নারদ মুনিকে "ভূমার" উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে নিরপেক্ষ ভাবে ব্রহ্ম জ্ঞানেচ্ছু পাঠক মণ্ডলীর বোধ সৌকর্য্যার্থে, যতদূর সুগম রীতিতে লেখা যাইতে পারে, তাহা লিখিলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম বলিতে পারি না। ইহা পাঠ করিয়া মুমুক্ষু পাঠকবৃন্দের মধ্যে সুকৃতিশালী ও ভগবৎ কৃপা-পরায়ণ দুই এক জনেরও ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অল্পমাত্র উপকার হইলে, শ্রম সফল বিবেচনা করিব।

নারদ, সনৎকুমার সংবাদ।

'তন্তৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।'

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ভগবন্! আপনি বলিয়াছিলেন উদ্দালক মুনি শ্বেতকেতু পুত্রকে বুদ্ধিমান জানিয়াও জিজ্ঞাসিত না হইলে, তাঁহাকে আত্মার সুখরূপতা বর্ণন করেন নাই। কিন্তু পূর্ব্বে ভগবান সনৎকুমার ত' নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা বিনা আত্মার সুখরূপতা কথন করিয়াছিলেন। ভগবান সনৎকুমার নারদ মুনিকে যে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি; আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে উপদেশ করুন। এই প্রকার শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, শ্রীগুরু কহিলেন,—হে শিষ্য পূর্ব্বে কোন কালে অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত এই ত্রিতাপে তাপিত হইয়া নারদ মুনি একান্ত দেশস্থিত ভগবান সনৎকুমারের সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, "হে ভগবন্, যে ব্রহ্ম এই জগতের অধিষ্ঠান এবং যে ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিদ্বান পুরুষ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদির অধ্যাসরূপ সর্ব্বলোক হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ আপনি উত্তম রূপে জানেন; অতএব হে ভগবন্, যে ব্রহ্মজ্ঞান 'সর্ব্ব' লোক নিবৃত্তির কারণ, সেই ব্রহ্মজ্ঞান আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ করুন।" হে শিষ্য, নারদ মুনি যখন সনৎকুমারকে এইরূপ বলিলেন, তখন সনৎকুমার মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া, নারদের অজ্ঞান নিবৃত্তি করিবার জন্য কহিলেন,—"হে নারদ, তুমি সর্ব্ব লোকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং তোমার যত প্রকার বিদ্যা জানা আছে, সেই সমস্ত বিদ্যা তুমি আমাকে বল; পশ্চাৎ আমি তোমাকে ব্রহ্ম জ্ঞানের উপদেশ দিব।" অনন্তর নারদ সনৎকুমারকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে ভগবন্, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, এই দুই রূপে দুই দুই প্রকারের যে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্বণ এই চারি বেদ; ইতিহাস পুরাণ বা পঞ্চম বেদ, বেদম্ (ব্যাকরণ); পিতৃগণ সম্বন্ধীয় পৈত্রবিদ্যা,

রাশি বা গণিত শাস্ত্র; জীবের উৎপাতাদির স্বরূপ নির্ণয়কারী যে দৈবশাস্ত্র নিধিশাস্ত্র, তর্ক প্রধান অক্ষপাদ প্রণীত ন্যায়শাস্ত্র এবং বেদস্থিত প্রশ্নোত্তর ভাগ, যাহাকে শ্রুতি বাকোবাক্যম কহিয়াছেন। নীতিশাস্ত্র বা একায়ন নিরুক্ত শাস্ত্র এবং সেই নিরুক্ত শাস্ত্রের যে ভাগে সর্ব্ব দেবতাকে সর্ব্বাত্ম রূপে কথিত হইয়াছে, যাহার নাম বেদবিদ্যা; তদ্ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট যে নিরুক্ত শাস্ত্র, শিক্ষা কল্প এই তিনকে শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে, তাহা শুশ্রূতাদি বৈদক গ্রন্থ সহিত আয়ুর্ব্বেদ, যাহা ভূতবিদ্যা নামে কথিত হয়. তাহা এবং শান্তি পুষ্টি আদি ফল প্রাপ্তিকারী যে নানা প্রকার মন্ত্র, অস্ত্রবিদ্যা সহিত ধনুর্বিদ্যা, যাহাকে ক্ষত্রবিদ্যা কহে, নক্ষত্র-বিদ্যা (জ্যোতিষ) সর্পের যে দেব-শরীর তাহাকে বশীভূত করিবার সাধন যে গাড়ূর বিদ্যা (সর্পদেব বিদ্যা)। জন বিদ্যা (গীতাদি দ্বারা সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জনকারী গান্ধর্ব্ববিদ্যা।) এই পুর্ব্বোক্ত সমস্ত বিদ্যা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি। পরন্তু বেদের তাৎপর্য্যের বিষয়রূপ যে মোক্ষের সাধন তাহা আমি জানি না। হে ভগবন্! যদ্যপি সামান্য বেদের অর্থ আমি জানি, তথাপি বেদে তাৎপর্য্যের বিষয়ভূত যে অদ্বিতীয় আত্মা, সেই আত্মাদেবকে আমি জানি না। আমি কেবল বেদমন্ত্রের পাঠ মাত্র অবগত আছি; মন্ত্রের যথার্থ অর্থ জানি না। হে ভগবন্ পূর্ব্বে আপনাদের ন্যায় মহাত্মা পুরুষের মুখে শুনিয়াছি, আত্মাকে জানিলে, মূল কারণ সহিত সর্ব্বলোক হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। হে ভগবন্, যেরূপ ইহলোকে তিন কোণ বিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত পঙ্গু পুরুষের মহান্ লোক প্রাপ্তি হয়,' সেইরূপ অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত দুঃখ দ্বারা আমি সর্ব্বদা সন্তপ্ত হইতেছি, দুস্তর শোক-সাগরে মগ্ন আছি এবং সেই অগাধ লোক-সমুদ্রের অপর পারে যাইবার জন্য আমি সর্ব্বদা ইচ্ছা করিতেছি। অতএব হে দীন দয়ালু সনৎকুমার, আপনি আমাকে কৃপা করিয়া এই লোকরূপ সমুদ্র হইতে পার করুন।"

হে শিষ্য, নারদ মুনির এই প্রকার দীনতা পূর্ব্বক বচন শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহাকে 'অরুন্ধতী ন্যায়' দ্বারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বোধ করাইবার জন্য বলিলেন, "হে নারদ, পূর্ব্বোক্ত যত প্রকার শাস্ত্র তুমি অধ্যায়ন করিয়াছ, সেই সমস্ত শাস্ত্র বাক্ বা শব্দরূপ। যদি কদাচিৎ ইহলোকে শব্দরূপ নাম না থাকে, তবে কোন পুরুষ কোনও বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না। নাম দ্বারাই সকল বস্তুর ব্যবহার হয়; সুতরাং এই নাম সর্ব্ব বস্তুরূপ হইয়া থাকে। এরূপ সর্ব্ব বস্তুরূপ বাক্‌কে তুমি ব্রহ্মরূপে চিন্তা কর। হে নারদ, তোমার চিত্ত দ্বৈত বাসনা দ্বারা

কুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। যখন তুমি সেই পূর্ব্ব-অভ্যস্ত বস্তু বা নাম বিষয়ে ব্রহ্ম ভাবনা করিবে, তখন তোমার চিত্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে জানিবার উপযুক্ত হইবে। ইহলোকে যে পুরুষ সমস্ত শব্দরূপ নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, সেই পুরুষের নাম দ্বারা সম্বদ্ধ সর্ব্ব জগতে স্বতন্ত্রতা রূপ ফলপ্রাপ্তি হয়।" নারদ বলিলেন,—"হে ভগবন্, এই শব্দরূপ নামে ব্রহ্ম-দৃষ্টি মাত্রে জীবের শোক নিবৃত্তি হইবে না; সুতরাং যে বস্তু সেই নাম অপেক্ষা অধিক, সেই বস্তু আমাকে বলুন।" নারদ দ্বারা এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ সনৎ-কুমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তর উত্তর সূক্ষ্মতর নিরূপণ করতঃ, বাগেন্দ্রিয় হইতে আশা পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ তত্ত্বের বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং সেই ত্রয়োদশ তত্ত্বের বিষয়ে এক এক তত্ত্বের ব্রহ্মরূপে উপাসনা—কথন করিতে লাগিলেন; এবং যেরূপ নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনাকারী পুরুষ সেই নাম দ্বারা সম্বদ্ধ সমস্ত জগতে স্বতন্ত্রতা রূপ ফল প্রাপ্ত হন, সেইরূপ বাসনাদি ইন্দ্রিয়কে ব্রহ্মরূপে উপাসনাকারী পুরুষ সেই বাগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্বদ্ধ সর্ব্ব জগতে স্বতন্ত্রতা রূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন। এই প্রকার বাগাদি ইন্দ্রিয়ের উপাসনার ফল বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণে সেই বাগাদি ত্রয়োদশ তত্ত্বের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে। (১) হে নারদ, এই শব্দ রূপ নাম বাগেন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং এই শব্দরূপ কার্য্য হইতে সেই বাক্ রূপ কারণ অধিক। (২) বাগেন্দ্রিয়কে আপনার কার্য্যে ইচ্ছারূপ মনই প্রেরণ করে; সুতরাং বাগিন্দ্রেয় হইতে ইচ্ছা রূপ মন অধিক। (৩) এই কার্য্য আমার করিবার যোগ্য বা অযোগ্য, এই প্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য রূপ দুই বিকল্পকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিষয় করিতে সমর্থ যে সঙ্কল্প রূপ অন্তঃকরণের বৃত্তি; সেই সঙ্কল্প-রূপ বৃত্তিই ইচ্ছা-রূপ মনকে উৎপন্ন করে; সুতরাং সেই ইচ্ছা রূপ মন হইতে সঙ্কল্প অধিক। এক্ষণে মন হইতে সঙ্কল্পের অধিকতা বিষয়ে যুক্তি নিরূপণ করা যাইতেছে। হে নারদ, যে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্পযুক্ত হন, সেই সঙ্কল্পবান্ পুরুষই এই সমস্ত মানস ব্যাপার করিয়া থাকেন; সেই মানস ব্যাপারের পর তিনি বাগেন্দ্রিয়ের ব্যাপার করেন; বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারের পর নামরূপ শব্দের ব্যাপার করেন; শব্দের ব্যাপার বিষয়ে সমস্ত বেদাদি শব্দসমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে। সেই শব্দসমূহ বিষয়ে, সুখ প্রাপ্তিকারী সর্ব্ব কর্ম্ম স্থিত হয়। এই প্রকার পরম্পরারূপে সেই সঙ্কল্পই সর্ব্ব কর্ম্মের হেতু সিদ্ধ হয়; কারণ যজ্ঞাদি সর্ব্ব কর্ম্ম উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার করণ বিষয়ে এই সঙ্কল্পই কুশল। আর

স্বর্গাদি লোক এবং পৃথ্বী আদিভূত যাহা চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন করে, সেই বিশ্বের উৎপত্তি, সঙ্কল্পরূপ নিমিত্ত বিদ্যমান হইলে 'পর' হইয়া থাকে। সঙ্কল্প বিনা এই জগতের উৎপত্তি হইবে না; কারণ লোকের ও ভূতের সঙ্কল্প দ্বারাই ত' বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এবং সেই বৃষ্টির সঙ্কল্প দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নের সঙ্কল্প দ্বারা এই ভূতের ইন্দ্রিয় সহিত প্রাণ উৎপন্ন, প্রাণের সঙ্কল্পদ্বারা মন্ত্র উৎপন্ন, মন্ত্রের সঙ্কল্প দ্বারা কর্ম্ম উৎপন্ন, সেই কর্ম্মের সঙ্কল্প দ্বারা ধর্ম্মরূপ অপূর্ব্ব উৎপন্ন, সেই ধর্ম্মরূপ অপূর্ব্বের সঙ্কল্প দ্বারা স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে লোক, ভূত, বৃষ্টি, অন্ন, প্রাণ, মন্ত্র, কর্ম্ম, অপূর্ব্ব এই সমস্ত শব্দ দ্বারা সেই লোকাদির অভিমানী দেবতা গ্রহণ করিতে হইবে। সেই চেতন দেবতা বিনা জড় লোকাদি বিষয়ে সেই সঙ্কল্প সম্ভব নহে। এই প্রকারে সঙ্কল্পই সর্ব্ব জগতের কারণ; সুতরাং সঙ্কল্প মন হইতে অধিক।

এক্ষণে সেই সঙ্কল্প হইতে সামান্য জ্ঞানরূপ চিত্তের অধিকতা বিষয়ে বর্ণন করা যাইতেছে। (৪) হে নারদ, এই সর্ব্ব জগতের কারণরূপে কথিত যে সঙ্কল্প, সেই সঙ্কল্পও তখন হইবে, যখন পূর্ব্বোক্ত সামান্য জ্ঞানরূপ চিত্ত হইবে। সেই চিত্ত বিনা সঙ্কল্প হইবে না। এই প্রকার অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা এই চিত্তই সেই সঙ্কল্পের কারণ সিদ্ধ হয় এই চিত্তের অধিকতা লোকেও প্রসিদ্ধ আছে; কারণ ইহলোকে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষও যখন অনুসন্ধান রূপ চিত্ত-রহিত হন, তখন সকলে তাঁহাকে অনাদর করে। ইহলোকে যে পুরুষ অনুসন্ধান-রূপ চিত্ত বিশিষ্ট হয়, সেই পুরুষের মুখ হইতে সকলে লৌকিক বচন ও বৈদিক বচন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করে, এবং তিনি যে ধর্ম্ম বিধান করেন, তাহা লোকে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক অঙ্গীকার করে। এই অনুসন্ধান রূপ চিত্ত যখন সুখ সাধনতা রূপে এবং দুঃখ সাধনতা রূপে পূর্ব্বানুভূত পদার্থের সাদৃশ্যতা সম্মুখ দেশবর্ত্তী পদার্থকে বিষয় করে, তখনই সেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় সঙ্কল্প হয়। সুতরাং সেই অনুসন্ধান রূপ চিত্ত সেই সঙ্কল্প হইতে অধিক। (৫) বৃত্তি জ্ঞানের প্রবাহরূপ যে চিন্তা, সেই চিন্তারূপ ধ্যান পূর্ব্ব সংস্কারের উদ্বোধ দ্বারা সেই স্মৃতিরূপ অনুসন্ধানের জনক হয়, এজন্য সেই চিন্তা রূপ ধ্যান সেই অনুসন্ধান রূপ চিত্ত হইতে অধিক।*

* হে নারদ, স্বর্গ-লোক, অন্তরীক্ষ-লোক, ভূমিলোক, এই তিন লোক এবং আকাশাদি পঞ্চভূত এবং হিমাচলাদি পর্ব্বত এবং, দেবতাদিগের সমান শমদমাদি সম্পন্ন মনুষ্য এই সমস্ত নিশ্চলতা রূপে স্থিত হইয়া, ধ্যানকারী পুরুষের ন্যায় প্রতীত হয়। এই কারণে ধ্যান অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। আর ইহলোকে আপনার শমদমাদি গুণ দ্বারা যে পুরুষ মনুষ্যের মধ্যে পুজ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পুরুষ ধ্যানের যৎকিঞ্চিৎ ফল পাইয়াছেন মাত্র জানিবে। এই ধ্যান বিনা এবং জন্মান্তরে মহানতা রূপ ফল লাভ হইবে না। পরনিন্দুক অধম পুরুষের চিত্ত সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত থাকে। এরূপ চিত্তের বিক্ষেপ ধ্যানযুক্ত মহান্ পুরুষ প্রাপ্ত হন না; কিন্তু তিনি মহামান্য হন। এই কারণে ধ্যান চিত্ত হইতে অধিক। ৫।

(৬) ইহলোকে যে বস্তুর সামান্য জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিশেষ জ্ঞান বিষয় করে, সেই বস্তুর ধ্যান করা যায়, এবং সামান্য জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিশেষ জ্ঞান এই পুরুষ বিজ্ঞান দ্বারাই জ্ঞাত হয়। এই কারণে সেই বিশেষ জ্ঞানরূপ বিজ্ঞান, সেই ধ্যান হইতে অধিক।* (৭) অন্ন গ্রহণ দ্বারা উৎপন্ন যে অবয়বের বৃদ্ধি রূপ বল, যে বল হইতে সর্ব্ব শত্রু ভয় প্রাপ্ত হয়, এরূপ বলযুক্ত মন দ্বারাই সেই বিজ্ঞান সিদ্ধ হয়; এইজন্য বল বিজ্ঞান হইতে অধিক। (৮) সেই বল ভূমি রূপ অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং সেই ভূমি রূপ অন্ন সেই বল হইতে অধিক। (৯) সেই ভূমি রূপ অন্ন, বৃষ্টিরূপ জল হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং সেই জল সেই ভূমি-রূপ অন্ন হইতে অধিক। (১০) ইহলোকে যখন উষ্ণতা রূপ তেজের অধিকতা হয়, তখনই এই জলে বৃষ্টি হয়; সুতরাং সেই তেজ সেই জল হইতে অধিক। (১) এই আকাশ সেই তেজের আধার রূপ; (১১) সুতরাং সেই আকাশ তেজ হইতে অধিক। (১) এখানে যদ্যপি তেজ হইতে বায়ুর অধিকতা বলা উচিত ছিল, তথাপি যেরূপ উষ্ণতা রূপ তেজ জলের বৃষ্টির কারণ, সেইরূপ এই বাহ্য বায়ুও সেই জলের বৃষ্টির কারণ। এইজন্য সেই বায়ুর তেজ বিষয়ে অন্তর্ভাব করিয়া, সেই বায়ু যুক্ত তেজ হইতে আকাশের অধিকতা কথিত হইয়াছে। আর সুষুপ্তির শেষভাগে যে পূর্ব্ব দৃষ্ট আকাশের স্মরণ হয় সেই স্মরণই সেই আকাশের উৎপত্তির কারণ; সুতরাং সেই স্মরণরূপ কারণ সেই আকাশরূপ কার্য্য হইতে অধিক। (১৩) এই কার্য্য এই প্রকার হইবে, এই প্রকার যে আশা, সেই আশাই সেই স্মরণের কারণ হইয়া থাকে। হে নারদ, ইহলোকে যে পুরুষ কামনা-রূপ আশাযুক্ত হয়, সেই আশাবান্ পুরুষই সেই স্মরণ দ্বারা সর্ব্ব পুণ্য পাপ কর্ম্ম করেন, এবং সেই পুণ্য পাপ কর্ম্মের সুখ দুঃখ রূপ ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত উভয় লোকে ভ্রমণ করেন। যে পুরুষ সেই আশা রহিত হন, সেই নিষ্কাম পুরুষ সেই স্মরণও করেন না এবং অন্য কোন ব্যাপারও করেন না। এই কারণে

* এক্ষণে ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞানের অধিকতা যুক্তি দ্বারা বর্ণন করা যাইতেছে। হে নারদ, ঋগ্বেদ হইতে অভ্যুদয় যজ্ঞ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বাগেন্দ্রিয়ের বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত পদার্থ এবং তাহা হইতে অধিক পদার্থ এই পুরুষ বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়। কারণ ভক্ষণ করিবার যোগ্য যে নানা প্রকার অন্ন, সেই অন্নস্থিত মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত এই ছয় রস, সেই ছয় প্রকার বলকেও এই পুরুষ বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়; এবং ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্ব ব্যবহারও এই পুরুষ বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়, এই কারণে বিজ্ঞান' ধ্যান হইতে অধিক।

আশা স্মরণ অপেক্ষা অধিক। এরূপ আশাকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, সেই পুরুষ সর্ব্ব মনোবাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্ত হন এবং সত্য সঙ্কল্প হন। হে শিষ্য, এই প্রকার ভগবান্ সনৎকুমার নারদ মুনিকে বাক্, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, মন, জল, তেজ, আকাশ, স্মরণ, আশা, এই ত্রয়োদশ তত্ত্ববিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব তত্ত্বের অপেক্ষা উত্তর উত্তর তত্ত্বের অধিকতা যুক্তিসহ বর্ণন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে সর্ব্বত্র যুক্তি দেওয়া গেল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র (৺কাশীধাম)।

ধর্ম্ম)

প্রণব-রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

আমরা গত বৎসরে প্রণব তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া, মাত্রা ও পাদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম যে, মাত্রা শব্দে শাস্ত্র আত্মগত ও বীজরূপে স্থিত বিশেষ ভাবের জ্ঞাপক পদার্থ বুঝায়। ইংরাজীতে যাহাকে exponent বলে, 'মাত্রা'ও কতকটা সেইরূপ। যেমন $(a+b)^x = a^n + a^{n-1}b + a^{n-2}b^2 + a^{n-3}b^3 \ldots b^x$। এখানে আমরা ভেদ-বুদ্ধির দায়ে পড়িয়া একটী দ্বৈত-মূলক উদাহরণ লইলাম। "n" টী মাত্রা স্বরূপ, "a+b" টী ব্রহ্ম বা ভগবৎ চৈতন্যের অহং ভাবের স্বরূপ। আর অপরদিকে অভিব্যক্ত পর্য্যায় বা 'Series"টী পাদের স্বরূপ। যেমন সম্মোহন বিদ্যার দ্বারা মুগ্ধ রামকে "তুমি স্ত্রীলোক" এই কথা বলিয়া 'স্ত্রী মাত্রা' বা ভাব গ্রহণ করান হইলে, যেমন তাহার 'আমি'জ্ঞান স্ত্রীলোক বুদ্ধির দ্বারা রঞ্জিত হয়, এবং স্ত্রীলোকের মত হাবভাব ঘোমটা টানা, সন্তান-পালন প্রভৃতি এক অনন্ত ব্যক্ত পর্য্যায়ের সৃষ্টি হইয়া যায়। সহজে বুঝিবার জন্য ভগবৎ মাত্রাকেও এইরূপে দেখিলে চলিতে পারে। ভগবান যখন তাঁহার ঘন পরাৎপর ভাব পরিত্যাগ করিয়া, আপনার লীলারস আপনিই অনুভুতি করিবার জন্য যেন একদিকে "স" বা অহম্ রূপে 'একোহম্' ভাবে অবস্থিত হইলেন, অমনি তাঁহার সর্ব্বভাব অপরদিকে বিশিষ্ট "সর্ব্ব" বা "বহু" রূপে প্রত্যুপস্থাপিত হইল, এবং অমনি 'বহুস্যাম প্রজায়েয়ম্' বাণী নিঃসৃত হইল। অমনি নানা রংয়ের, নানা ভাবের, বহুত্ব লইয়া অনন্ত প্রজার

সৃষ্টি হইল; ঘন সর্ব্বাত্মিকা ভাবের "সর্ব্ব" জ্ঞানটী দেশ ও কাল (Space and Time) এই দুই মহাভাবের সাহায্যে ছিন্ন বিশ্লিষ্ট বহুভাবে numerical infinity ব্যবস্থিত হইল। পর শুদ্ধ সূর্য্য যেমন ঘন একরস সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গে তরঙ্গে, প্রত্যেক অনুগুলিতে, আপনাকে প্রতিবিম্বিত করিয়া নানারূপে প্রতীয়মান হয়েন, সেইরূপে স্থির ঘন ভগবানের অহম্টী প্রাকৃতিক তত্ত্বগুলি প্রত্যেক অনুতে অনুতে জীবরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া,—কোথায় কোন তরঙ্গে দেবতা সৃষ্টি, কোথায় পিতৃগণের সৃষ্টি, কোথায় বা মানবের সৃষ্টি প্রভৃতি অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত সৃষ্টিতে অহম্রূপে ব্যবস্থিত হইয়া বিশিষ্ট বিধা বা বিবিধ ভাবে আপনাকে 'রটন্তি' বা প্রকাশ করিয়া বিরাটরূপে প্রতীয়মান হইলেন। এই বিরাট অবয়বের কথা ভাগবতে 'মহাপুরুষ সংস্থান' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। এই বিরাটের বিশ্বব্যাপী মহান্ দেহে, প্রত্যেক অনুতে এক তিনিই প্রতিভাত হইতেছেন। "পাদস্য বিশ্বভুতানি ত্রিপাদমমৃতম্ ভুবি"। "He is the every drop of this ocean of immortality"—Secret Doctrine.

পুরাণে কি আশ্চর্য্য কৌশলে এই মাত্রা-তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে!! ভগবান মহাদেব দক্ষালয়ে তাঁহার সদ্ভাব Existence and Being বা সতীদেহ ত্যাগ রূপে যখন জগতের জন্য ত্যাগ করিলেন তখন সেই সৎ মাত্রায় তখনকার মানসিক সৃষ্টির সকল ভাবই অনুপ্রাণিত হইয়া গেল। তারপর দেবাদিদেব সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যাভাবকে পরিত্যাগ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া আপনাতে আপনি রহিলেন, তাঁহার 'অহম্' ভাব "সর্ব্ব" ভাব হইতে সরিয়া যাইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। কাজে কাজেই ব্যক্ত ভাবের 'অহম্' গুলিও লীন হইতে চলিল; সৃষ্টি ধ্বংস হইতে লাগিল। তারপর দেবতারা আনন্দময়ীকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য কামকে পাঠাইলেন। এইবার আনন্দময়ীর ক্ষেত্রে ভগবানের স্বরূপ ভাব বা কুমারের সৃষ্টি হইল। ধ্যানভঙ্গ কালে কোন কোন পুরাণে বর্ণিত আছে যে, যেমন দেবি চৈতন্যময়ী মহাদেবের সম্মুখে এক এক ভাবে উপস্থিত হইলেন, অমনি মহাদেবও "রে সতি রে সতি কান্দিল পশুপতি, পাগার শিব পরমেশ"—উন্মত্তের মত মহাদেব, মহামায়ার সেই ভাবে আপনার অহম্‌কে স্থাপিত করিলেন; অমনি এক জাতীয় জীবের সৃষ্টি হইল। মহামায়ার এই দশবিধা ভাবকে দশমহাবিদ্যা রূপে অভিহিত করা হয়; এবং এক এক মহাভাবের সহিত এক এক গ্রহের সম্বন্ধ আছে। জীবের যে গ্রহ, তাহা হইতে বুঝা যায়, সে কোন মহাভাব হইতে উৎপন্ন। এইরূপ দশ জাতীয়

জীবকে Monad বলে। কেহ কেহ এই সৃষ্টিকে একাদশ ভাবে ব্যবস্থিত বলিয়া প্রসূত ভাবগুলিকে একাদশ ‘রুদ্র’ নামে অভিহিত করেন। যে যাহা হউক মুল মহাভাব গুলিকে মাত্রা রূপে আমরা দেখিতে পারি। যেমন যেমন মাত্রা, তেমনি ভাবের সৃষ্টি।

তারপর আমাদের ব্রহ্মার সৃষ্টিতে বা ইংরাজী বাইবেলের Genesis নামক অধ্যায়ে এই ‘মাত্রার’ খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সৃষ্টির নাম অবিদ্যা সৃষ্টি; এবং ইহার গতি বাহিরের দিকে, ভেদ বিশেষের অভিমুখে; কিন্তু তাহা হইলেও মাত্রার মূল তত্ত্বটী সমানই রহিয়া যায়। ব্রহ্মা হাসিলেন অমনি জ্যোৎস্নাময়ী এক তনু উৎপন্ন হইল। সেই তনুকে আশ্রয় করিয়া গন্ধর্ব্বাদি জীব সকল রহিল। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইলেন, অমনি দৈত্যরূপ তামসীতনু উৎপন্ন হইল। ওদিকে বাইবেলের ঈশ্বর বলিলেন “Let there be light and there was light ; Let there be water and there was water” অর্থাৎ সৃষ্টি কর্ত্তা যেমন অগ্নি-তত্ত্বের কথা মনে করিলেন, অমনি বাহ্য জগতে আলোক ও অগ্নি-তত্ত্বের সৃষ্টি হইল। যেমন তিনি জল-তত্ত্বের কথা মনে করিলেন, অমনি বাহ্য জগতে জল এবং বাসনার সৃষ্টি হইল। সৃষ্টি কর্ত্তা তাঁহার আপনার ‘আমি’তে যে মাত্রা আরোপ করিলেন, অমনি বাহিরের ‘সর্ব্বভাবে’ সেই মাত্রা ব্যাকৃত হইয়া অনুরূপ প্রজা ও তত্ত্ব সৃষ্টি করিল।

অভিব্যক্ত ভাবগুলির ভিতর দিয়া মৌলিক তত্ত্বের স্থাপনা বা ব্যঞ্জনাকে পাদ বলে॥ Libraryতে অনেকগুলি পুস্তক দেখিয়া, তাহা হইতে পুস্তক ভাবের অভিব্যক্তি ‘পাদ’; পদ্যত ইতি পাদঃ। ইহাই পাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ। তারপর এক আধারে অবস্থিত বিভিন্ন অভিব্যক্তির সমষ্টিকেও পাদ বলে। সন্নেহিত রামের স্ত্রীত্ব “বুদ্ধি” বা “মাত্রা”টী, স্ত্রীলোকসুলভ ব্যক্ত ক্রিয়াদি ব্যাপারের মধ্য দিয়া আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে। মাত্রা অহং ভাবের মূলে বলিয়া মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়া বুঝিতে পারা বড় দুরূহ; কিন্তু প্রকাশিত সর্ব্বভাবের মধ্য দিয়া ঐ ভাব সহজে বুঝিতে পারা যায়। মাত্রা নাম-শক্তি; ‘পাদ রূপ’ শক্তি। অ’কার’ উ’কার’ ম-কার ও অর্দ্ধমাত্রা ইহা প্রণবের মাত্রা বা অহং ভাবের বিকাশ॥ বৈশ্বানর তৈজস প্রাজ্ঞাদি প্রণবের পাদ বা সর্ব্বাত্মিক ভাবের বিকাশ॥ অকাররূপ প্রথম মাত্রায় আপ্তি ব ব্যাপ্তি ভাবই মূলভাষা’ সেইজন্য কি জীব, কি শিব উভয়েই, অহম্ বা আত্মতত্ত্ব অকার মাত্রায় তাঁহার সর্ব্ব ব্যাপিত্বতে all pervasiveness অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। এই অকার

মাত্রাকে আমরা ‘অহমের’ আপ্তি রূপে বর্ণিত করিতে পারি। এই মাত্রাটী পাদরূপে ব্যবস্থিত হইলে, উহা বহিঃপ্রজ্ঞ, সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতি মুখ স্থূল-ভুক্ ও বৈশ্বানররূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহাকে পাদ বলে; যেমন রামরূপ জীব মনুষ্যরূপ মাত্রার সাহায্যে, মনুষ্যত্ব রূপ ভাবে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং “পাদ” ‘সর্ব্ব’ ভাবের বিকাশ ও সর্ব্বাত্মক তত্ত্বের আভাস দেয়।

যাহা পাদ,—তাহাই মাত্রা; অর্থাৎ পাদ ও মাত্রায় প্রভেদটী কেবল ভাষার প্রভেদ মাত্র; কেবল অবস্থার বিভিন্নতা মাত্র সূচিত করে,। ‘মাত্রাশ্চ পাদাঃ পাদাশ্চ মাত্রাঃ’ ইহাই মাণ্ডুক্যোপনিষদের উপদেশ। এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে, পরে শাস্ত্রোপদিষ্ট অনেক তত্ত্বের অবভাস সহজেই হইতে পারে। সেইজন্য আমরা ইহা বিশদ্ভাবে বুঝিবার জন্য স্থূল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। প্রত্যেকেই জানেন যে আমাদের ‘অবিশেষ আমি’রূপ কল্প-কল্পান্ত-স্থায়ী একটি জীব ভাব আছে। ঐ জীবটী বিভিন্ন জন্মেও বিভিন্ন কর্ম্মের বশে ‘রাম’, ‘কেরাতুল্লা’, ‘টমাস’ প্রভৃতি মানবরূপে প্রকাশিত হয়। শুদ্ধ ‘অহং’ বা জীবে যেরূপ কর্ম্মমাত্রা পড়ে, তদ্রূপ ব্যক্ত মনুষ্য ভাবের ‘আমি’ প্রকাশিত হয়। যেমন আমরা প্রয়োজন অনুসারে হস্ত পদাদি ব্যবহার করি, সেইরূপ আমাদের জীবটীও কর্ম্মবশে ও ভগবানের ইচ্ছায় স্থূল জগতে নানারূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়া কার্য্য করে। Amœba নামক কোষাণুর (cell) কথা অনেকেই জানেন, এই কোষাণুর হস্ত পদাদি নাই, উহার সমস্ত শরীরটীই হস্ত, পদ, উদর প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে প্রযুক্ত হয়। আমাদের শরীরে যেমন বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন বুদ্ধি আছে, Amœbaর তদ্রূপ নহে; উহার সমস্ত শরীরটীই এক একটী ক্রিয়াতে প্রয়োজিত হয়। খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইলে, সমস্ত দেহটী লম্বা হইয়া হস্তে পরিণত হয়, এবং খাদ্য গ্রহণের পর সমস্ত দেহটী কুঞ্চিত হইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। চলিতে হইলে সমস্ত অঙ্গটীই পদরূপে চলে; খাদ্য দ্রব্য পরিপাক করিতে হইলে সমস্ত শরীরটীই উদররূপে পরিণত হইয়া পরিপাক করে। সুতরাং সমস্ত শরীরে এবং প্রত্যেক ক্রিয়াতে Amœbaর ক্ষুদ্র ‘অহম্‌টী’ এক রূপেই থাকে। আমরা যেমন ‘আমার হস্ত’ ‘আমার পদ’ এইরূপ শব্দ-ব্যবহার করি, Amœba যেন ‘আমিই হস্ত’ ‘আমিই পদ’ এইরূপ ভাষায় আত্ম প্রকাশ করে। তবে আমাদের চৈতন্য জাগ্রত অবস্থায় থাকে, আর ঐ Amœba চৈতন্য সুষুপ্তি অবস্থায়, যেন ঘুমের ঘোরে, এই সমস্ত কার্য্য করে।

আমাদের জীবটীও Amœbaর ন্যায় বিভিন্ন মাত্রার বশে, বিভিন্ন মানব বুদ্ধিতে তাঁহার 'আমি'টীকে প্রলম্বিত করিয়া, এক এক জন্মে, এক এক রূপে, মানব ভাবে, স্থূল জগতে অবতীর্ণ হইয়া, উপযোগী খাদ্য সঞ্চয়ের পর, মৃত্যুর পর, পুনরায় স্বরূপ ভাবে আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া লয়। জীবের শুদ্ধ 'আমি'টী 'আমি রাম ও ব্রাহ্মণ' এই মাত্রাতে রামের 'আমি' হইয়া প্রকাশিত হয়; ইহাই মাত্রা শক্তির খেলা। 'আমিটী' আমিই থাকিয়া যায়, কেবল তাহার উপর ব্রাহ্মণত্ব, রামত্ব প্রভৃতি মাত্রা বা exponent আরোপিত হয়। তারপর সংসারে সর্ব্ব বস্তুর সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে রামের 'আমি'টী হাসি-কান্না, পাপ-পুণ্য, সুখ দুঃখ, প্রভৃতি ভাবের সাহায্যেই নানা ভাবে, নানা কার্য্যে, আপনাকে বিতন্বত করে। এই অভিব্যক্তির প্রত্যেক ভাবটীকে সাধারণ মানব বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট করিয়া দেখে; তাহার পক্ষে প্রত্যেকটী যেন একটী বিভিন্ন ও অসংশ্লিষ্ট আত্ম-প্রকাশ। আজিকার হাসির সহিত কল্যকার ক্রন্দনের সম্বন্ধ নাই; অদ্যকার সুখের সহিত পর মুহূর্ত্তের দুঃখ অসংশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। এইরূপে মানব পাপ, মোহ, অবিদ্যা, ও ভেদ-বুদ্ধির সহিত তাহার জীবনে তরঙ্গায়িত, জাতি, আয়ু, ভোগ, প্রভৃতি সামান্য ভাবেও বিয়োগ, দুঃখ, উল্লাস, উন্মত্ততা রূপ বিশিষ্ট বিকাশগুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ দেখিতে না পাইয়া স্রোতের সহিত ভাসিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যখন সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যে জীবনের সমস্ত ব্যাপারগুলিকে এক করিয়া দেখিতে শিখে, তখন বুঝিতে পারে যে, জীবন ব্যাপী অনন্ত ভাব রাশির মধ্যে একই 'আমি' সমরূপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। ঐ 'আমিতে' জীবনের ঘটনার ক্রিয়া, আশা, প্রযত্ন প্রভৃতি সকল ব্যাপারই সূত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। তখন সে বুঝিতে পারে যে ঐ আমিটী বাস্তবিক রাম নহে, যে উহাতে জড় ও জীব প্রভৃতির প্রভেদ নাই। যদি এই 'আমি'টী কেবল রাম হইত, তাহা হইলে রাম দেহপাত করিয়া প্রিয়জনের জন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিত কি? রামরূপ মাত্রার ভিতর দিয়া ঐ 'আমি'র প্রকাশ আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু পরে সমগ্র জীব ও সমগ্র জগত,—দেশ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি অনন্ত মহত্তর ভাবরাশির মধ্য দিয়া এই 'আমি' অভিব্যক্ত হইয়া কি মহান্ ভাবের দিকে প্রধাবিত হইয়া ছুটিতেছে। যদি এই 'আমি'টী অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক হইত, তাহা হইলে কামনার সাহায্যে ও কামের ভাষায় অনন্ত জগত বস্তুকে তাহার আপন করিবার জন্য যাইত কি? ঐ 'আমি'টী মৃত্যুকেও

আলিঙ্গন করিয়া—মৃত্যুর পরপারে গিয়া 'আমি আছি' বলিয়া ফুটিয়া উঠে। এই আমি' মন ও বুদ্ধির ভাষায় জগদ্বস্তুকে আপনার জ্ঞানরূপে পরিণত করিয়া, আমি ও জগত উভয় ভাবের আপাতঃ প্রভেদ যে মিথ্যাভুত, ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে। বলিতে পার, ভাই! কোন্ "আমির" বশে 'আমি 'রাম' জ্ঞানের বাহিরে স্থিত প্রিয়জনকে বক্ষে ধারণ করিলে, এক মহান্ আনন্দে 'রাম' ভাব ও প্রিয়বস্তু ভাব, দুইটীই ডুবিয়া যায়? বলিতে পার কোন্ ভাবে জ্ঞানের মুহূর্ত্তে 'আমি রাম' ও জ্ঞানের বস্তুটী মিশিয়া গিয়া এক অখণ্ড জ্ঞান-রূপে প্রতীত হয়। এই 'আমি'কে বৈশ্বানর বা প্রথম পাদ বলে; উহাতে বিশ্ব ও নরভাব উভয় ভাবই মিশিয়া যায়। উহা একদিকে রামের 'আমি' ও অপরদিকে 'সর্ব্ব' ভাবে বিশ্ব রূপে বিতন্বত হইয়া আছে। উহা দ্বারা রামের 'আমি' ও বিশ্ব অনন্তরূপে, নানা রঙ্গে ও নানা ভাবে মিশিয়া গিয়া, কি আমাদের বুঝাইয়া দিতেছে না, যে নানাত্বের উপরে,—রসের রসরূপ—ভাবের ভাবরূপ, কি এক মহান্ আমি আপনাকে অনন্তরূপে প্রতিস্থাপিত করিয়াও অনন্ত মাধুর্য্য ও অনন্ত কল্যাণ গুণের আধাররূপে আপনাকে আপনি উদ্ভাসিত করিতেছে। ইহাই বৈশ্বানর শব্দের প্রকৃত অর্থ; তাই আচার্য্য বলিলেন,—বিশ্বেষাং নরাণামনেকধা সুখাদিনয়নাৎ বিশ্বানরঃ; যদ্বা বিশ্বাশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ, বিশ্বানর এব বিশ্বানরঃ, সর্ব্বপিণ্ডাত্মানন্যত্বাৎ, স প্রথমঃ পাদঃ," "অর্থাৎ সমস্ত নরগণের অনন্ত প্রকারের সুখাদি আনয়ন করেন বলিয়াই শ্রীভগবানের এই আত্ম-প্রকাশকে বিশ্বানর বলে। কিম্বা যে মহান্ আমি বিশ্ব ও নর এই উভয় ভাবেই একরূপে—সমরূপে বর্ত্তমান, যিনি সমস্ত পিণ্ডাত্ম হইতে অভিন্ন, যিনি তাঁহার লীলাবতারে তাঁহার এই সমরূপী প্রথম অভিব্যক্তি বা পাদ বুঝাইবার জন্য এক কণা তণ্ডুল ও শাক ভোজন করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিশ্ব তৃপ্ত হইয়া গেল, সেই পরাৎপর ভগবানের সমরূপ ও সামবেদের ভাষায় ইঙ্গিত বা ঘন সর্ব্বাত্মক ভাবকেই বৈশ্বানর বলে। "পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি" তাঁহার এই পাদ বা মহাভাবে বিশ্ব-ভুত রহিয়াছে।

যে মহান্ গতির বশে মাত্রা বা অহমের দিকে সমস্ত ভাবগুলি একে একে মিশিয়া গিয়া 'অহম্' এই প্রত্যয়ের মধ্যে শ্রীভগবানের ব্যঞ্জনা হয়, যে মহান্ গতির বশে, বৈশ্বানর বা সামবেদের ভাষার মধ্য দিয়া, 'উৎকর্ষ' বা ঋক্‌বেদের ভাষার মধ্য দিয়া ভগবানের স্বরূপ ভাব ফুটিয়া উঠে,—যে চৈতন্যের ঘনরস ইঙ্গিতে এই ব্যক্ত মহাভাষা বা ভাবগুলি নিঃশেষে শ্রীভগবানে মিলিয়া যায়,

সেই পরাগতি প্রবৃত্তি বা চৈতন্যের মূল প্রবণতাকে প্রণব বলে। এই গতিই বাস্তবিক শ্রীভগবানের একমাত্র আত্মপ্রকাশ। ইহাই জীবের এক মাত্র আকর্ষণ, গতি ও পথ। সেই জন্য মুণ্ডক উপনিষদে প্রণবকে ধনু বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন জ্যা-আরোপিত ধনুর ভিতর এক মহান্ শক্তি প্রসুপ্ত প্রায় "latent" হইয়া থাকে ও ঐ শক্তির বশেই শরটী লক্ষ্যের দিকে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ কি জগদ্ভাবে, কি জীবের বিকাশের মধ্যে একটি আশ্চর্য্যময়ী প্রবণতা বা পরাভিসারিণী, "Transcendent" গতি আছে, যাহাকে বুঝিতে পারিলে 'জীব' ও 'জগত' 'আমি' ও 'সর্ব্ব' এই উভয় ভাবের প্রকাশগুলি ঘন হইয়া মিশিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে উপনীত হয়। যিনি ব্যক্ত, বিচ্ছিন্ন, ভাবরাশির মধ্যে এই সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তি দেখিতে পান, যে সুরসিকের চক্ষে সমস্ত জগদ্ব্যাপার ঘন হইয়া শ্রীভগবানকে বা 'আত্মাকে' দেখাইতে সক্ষম হয়, তাঁহারই প্রণব-ধনু লাভ হইয়াছে। যিনি ইন্দ্রিয়ে, কামে, মনে ও বুদ্ধির খেলার মধ্যে এই পরাভিসারিনী, পর পুরুষাভিমুখিনী, কুলনাশিনী, চৈতন্যময়ীকে দেখিতে পাইয়াছেন, যে সুরসিক জগতের সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে ব্যক্ত হইতে অব্যক্তাভিমুখী এক মহান্ গতি দেখিতে পাইয়াছেন, তিনিই প্রণব-ধনু ব্যবহার করিতে পারিবেন। যিনি "সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু" হইয়াও গুরুর অজ্ঞ্রীপদ্মে প্রাণ সমর্পন নিবন্ধন, শ্রীগুরুদেবের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কামিনীর আলিঙ্গনকেও সেই নিত্য ঘন, সুখ-স্বরূপ আত্মাকে দেখিতে পাইয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ে শ্রীগুরুদেব আপনার ভগবৎ স্বরূপত্বে বীর্য্য দান করিয়াছেন, যিনি সেইজন্য অখণ্ড মণ্ডলাকার বিশ্বে বিকাশের মধ্যে পরম মহাভাব বা পদ দর্শণ করিতে পারিয়াছেন, যিনি সেই মহান্ একের জন্য মন বুদ্ধি প্রভৃতি সকলই ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই প্রণব-তত্ত্ব বেত্তা। 'সর্ব্ব' আর তখন বিচ্ছিন্ন বহু নহে। মহাবিদ্যা মহামায়া, বিদ্যাভাবে এই আত্মার অভেদত্ব রূপ ভাষার সাহায্যে তখন 'সর্ব্ব' 'আত্ম' স্বরূপে মিশিয়া গিয়া, সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যারূপ পরম লোকে তাঁহাকে লইয়া যায়। তখন শ্রোত ও শ্রোতব্যের মোহ পড়িয়া গিয়া তিনি দেখেন যে—

> "যাহা পশে কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
> কালী পঞ্চাশত বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে উঠে ফুটে॥

তখন তিনি দেখেন যে, বাস্তবিকই "নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে"

আর একটু বাঙ্গালা করিয়া বলিতে গেলে, প্রণবের ভাষা যিনি বুঝিতে চাহিবেন, তাঁহাকে ভেদ-বিশেষ বিবক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি আপনার পুত্রের প্রতি স্নেহটীকে এমন করিয়া দেখিতে শিখিবেন, যাহাতে পুত্র ভাবের ভিতর দিয়া সেই অবিরাম আত্মার আকর্ষণ চিনিতে পারেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে নিজে নিঃসন্তান হইলেও অপরের পুত্রস্নেহ দেখিয়া সেই পরমাকর্ষক আত্মতত্ত্বের অভ্যাস সুগম্য হইবে। কিন্তু যে পুত্র স্নেহে মুগ্ধ ও বিশিষ্ট পুত্রজ্ঞানে আবদ্ধ, সে ত' কখনও বুঝিতে পারে না যে,

> "নরে পুত্রকামঃ পুত্রপ্রিয় ভবতি, আত্মকামঃ পুত্রপ্রিয় ভবতি।"

এই জ্ঞান ফুটীতে গেলে, তোমার আপন পুত্রটীকে তুমি যেমন ভালবাস, অপরের পুত্রস্নেহেও যে সেই এক আকর্ষণেরই ফল, ইহা বুঝিয়া আর আপন পুত্রের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবেনা। তখন সকলের পুত্র কিসে ভাল থাকে—তাহাদের কিসে মঙ্গল হয়, এইরূপ প্রবৃত্তি আপনা আপনি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে। বিশিষ্ট পুত্র ও বিশিষ্ট পুত্রের স্নেহ মায়িক হইলেও, যতক্ষণ বিশিষ্টতা বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই মহামায়া অবিদ্যারূপে খেলেন। কিন্তু যাই সার্ব্বজনীন জ্ঞানের সাহায্যে সকল জীবের অপত্যস্নেহ এক বলিয়া বুঝিয়া, সেই জ্ঞানের মধ্যে আত্মার খেলা বা আকর্ষণ দেখিতে পাইলে, যখন সার্ব্বজনীনতা সর্ব্বত্বতায় পরিণত হইবে, তখন বাস্তবিকই দেখিতে পাইবে যে প্রত্যেক বালক শরীরে শ্রীভগবানই আকর্ষক রূপে খেলেন। তখন মহামতি যীশুর ন্যায় বলিতে পারিবে, "Suffer the little chilren to come to me, for theirs the kingdom of Heaven"। সুকুমার মতি—সুকুমার বালকদিগের ভিতর যে আকর্ষণ তত্ত্ব দেখিতে পাইতেছ, সেটীকে 'আমির' সহিত মিশাইয়া দাও, দেখিবে যে শিশু ও বালকরূপে সেই ভগবানই খেলিতেছেন। সার্ব্বজনীন বুদ্ধি "Universality" বড়ই দুর্লভ। ক্ষুদ্র অহঙ্কারের বশে আমরা উহা শিখিতে চাহিনা। চাহিলে কি ভুত সকলের প্রত্যহ মৃত্যু দেখিয়াও দেহাত্ম বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকিতাম? চাহিলে কি হিন্দু সন্তান হইয়া বিশিষ্ট অহংঙ্কারের ভোগসিদ্ধি করিয়া জীবন ব্যয়িত করিতাম? তারপর সার্ব্বজনীন জ্ঞান ভগবানে মিশাইয়া দিয়া সর্ব্বাত্মিকা মহাবিদ্যার আরাধনা আরও দুর্লভ। তাহা হইলে কি নিজের ভিতর, কি ভক্তভাবে—কি বৈদান্তিক ভাবে, শ্রীভগবানের বিকাশ আকাঙ্ক্ষা করিয়া অন্য শরীরে ও ভুতগ্রামে সেই ভগবানকে কর্ষণ করিতাম? অন্য শরীরে প্রকাশিত ভগবানকে নিত্য অবমাননা করিতাম?

আগামীবারে প্রণব-ধনু বা সর্ব্বাত্মিকা দেবীর স্বরূপ এবং আত্মার কথা বলিতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধ-বেদান্ত।

কাম]

বাসহীন ফুল

করে কে যতন বাসহীন ফুলে,জগত মাঝারে হায় ?
কেহ না আদরে নরনারীগণ, (তুমি) আদরে ধরগো তায়।
ধুতুরা আকন্দে কেবা ভালবাসে, কে লয় আদরে তুলি ?
তুমি দয়াময় ! স্থান দাও সবে, দিতে লাগে পুষ্পাঞ্জলি।
যদিও গো বটে নাহিক সুবাস জবা ও অপরাজিতা।
তাহারাও স্থান পায় ও চরণে, তুমি কাঙ্গালের পিতা।
পরশে তাদের (ও) মলয় সমীর, হেলে দুলে করে খেলা।
তাহারাও লাগে পূজা উপচারে হোক্ সকলের ফেলা।
চন্দ্রমা তাদের (ও) বিলায় কিরণ, সুরস (ও) ত' করে স্নেহ।
(শুধু) সুবাস তাহার ছোটে না চৌদিকে, (তাই) করেনা যতন কেহ।
নাহি কাজ প্রভু যশ অপযশে, কি কাজ মান অপমানে ?
(যেন) নীরবে ফুটিয়া নীরবে রহিয়া, থাকিগো নীরব ধ্যানে।
সমভাবে তব কৃপা বিতরিছ, ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান,
(আমি) কানন মাঝারে বিশুষ্ক কুসুম, পাব কি চরণে স্থান ?
প্রেম ভক্তিহীন জানিনা সাধন, দিবে কি চরণ দীনে ?
(তব) কৃপা কণাবিন্দু বরষিয়া প্রভু, তারিবে কি ভাগ্যহীনে ?
দয়া ধর্ম্ম যত দেহের সুবাস, আবরিয়া আছে পাপে।
চঞ্চল যে মন হয় নাকো বশ, দহি সদা সেই তাপে।
(তব) প্রেমের সাগরে দাওহে ভাসায়ে, দেখাও তোমার জ্যোতি।
চির ব্রহ্মানন্দে করহে মগন, স্থির ক'রে দাও মতি।
(সদা) কাম ক্রোধ আদি যত শত্রুগণ, পাপের সাগরে টানে।
বাঁরেক স্মরিতে দেয় না তোমায়, সদাই কুপথে আনে।

তুমি দয়াময় দেহ পদাশ্রয়, মধু গন্ধ হীন ফুলে।
নীরবে শুকায়ে যেন ঝরে পড়ি, তোমার চরণ মূলে।
উঁকি দিতে গিয়া দেখি হৃদি মাঝে, জ্বলে ঘোর পাপানল।
আমি বাসহীন ফুল কাজে কি লাগিবে,—পাব কি চরণে স্থান ?

শ্রীমতী মানময়ী দেবী।

কাম]

সংযম ও চিত্তশুদ্ধি।

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে ভাগ্যোদয় হইলে সাধু সঙ্গ লাভ হয়, এবং সেই সাধুসঙ্গ লাভ হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়।" এই সাধুক্তির মধ্যে সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পরিলে যে, ভগবানকে পাওয়া যায়, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একটী ক্ষুদ্র নদী কোন বৃহৎ নদীর সহিত মিলিত হইয়া যেমন অনায়াসে সাগর সঙ্গম লাভে সমর্থ হয় ; তদ্রূপ জীব ভাগ্যোদয় বশতঃ সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারিলে, ক্রমে তৎ-সহবাসে জ্ঞান লাভ করতঃ ভক্তি ও ভগবৎ-সেবা জনিত প্রেমানন্দ অনুভব করিতে থাকে। কিন্তু ভ্রমণ করিতে হইলে, জীব কোন্ ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিবে ? উন্মার্গগামী হইয়া কলুষিত ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিলে, সেই সাধুসঙ্গ লাভোচিত ভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা আছে কি ? যেমন সেই ক্ষুদ্র নদী কোন বৃহৎ নদীর অভিমুখে ধাবিত না হইয়া কোন কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলময় সমঃল ক্ষেত্রে গমন করিলে, তাহার পরিণাম অতি শোচনীয় হয়, ক্রমে স্রোতবেগ রুদ্ধ হইয়া, গলিত পত্রাদি দ্বারা কলুষিত-সলিলা হইয়া, পুতিগন্ধ বিস্তার করতঃ স্বাস্থের হানিজনক হইয়া পড়ে, তদ্রূপ জীব উৎপথগামী হইলে, প্রলোভন বিতাড়িত, উন্নত ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বদা পরবশ হয় ; মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় অবিরত কামনা দ্বারা প্রলোভিত হইয়া অসৎকে সৎ বলিয়া জ্ঞান করে, এবং অবিদ্যা ও মায়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে নাচাইতে থাকে ; পরিশেষে বিশ্ব জীবের শান্তি নাশের কারণ হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে এরূপ জীবের সাধু সঙ্গোপযোগী ভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব যে জ্ঞানের সুপক্ক ফল, ভক্তি, ভগবৎ-প্রীতি ও ভগবৎ-সেবা জনিত প্রেমানন্দ লাভ এবং যে কর্ম্মের পরিসমাপ্তি সেই জ্ঞান,—সেই কর্ম্মক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে

করিতে সাধুসঙ্গ লাভ হইতে পারে। কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইলে, কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। যথাবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে পারে না। কর্ম্ম দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি কখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এতৎ সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩ ॥৪। ভাঃ গীঃ

কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু এটী তাহার ভ্রম; কেননা কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে, তথায় জ্ঞানোদ্ভেদের কোনই আশা নাই। এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান নিজ প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময় জ্ঞানোপদেষ্টাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন;—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ৩.২৬। ভাঃ

এস্থলে 'কর্ম্মসঙ্গী' অর্থে যাহার কর্ম্মে আশক্তি আছে তাহাকেই বুঝিতে হইবে। এরূপ কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞ পুরুষের প্রথমত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে, জ্ঞান লাভের আশা কিরূপে ফলবতী হইতে পারে? অতএব তাহাকে সহসা কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ না দিয়া, বিদ্বান্ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সহ নিজ কর্ম্মাচরণ করতঃ তাহাকে কর্ম্মের উপদেশ দিবেন।

বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে হইবে। কর্ম্মানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয় সংযমের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। যেহেতু উদ্ধত ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্মের দ্বারা কোন রূপেই চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আবার কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের বিষয় হইতে বিরত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে তাহাদিগকে না ফিরাইতে পারিলে, কিরূপে ভগবানের ধ্যান সম্ভবপর হয়? অনেকেই 'সংযম' অর্থে 'নিগ্রহ' মনে করেন, এবং হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোন কর্ম্ম না করিয়া কেবল ভগবদ্ধ্যান করিবার প্রয়াস করেন। এটা মূঢ়তার কার্য্য, কেননা যখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হইতে মন না ফিরিল, তখন কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে বিরত করিয়া তাহাদিগকে নিস্তেজ করার লাভ কি? এতৎ সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন;—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৩।৬। ভাঃ।

কোন প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতির পক্ষে একজন প্রবল শত্রুকে কারাবদ্ধ করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করা অপেক্ষা, তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার দ্বারা তাহাকে আয়ত্তাধীন করিয়া অন্তরঙ্গ করাই শ্রেয়স্কর। কেননা এরূপ করিলে তাহার সাহায্যে অন্য শত্রুরও সেইরূপ আয়ত্তাধীন ও অন্তরঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সেইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ না করিয়া, নিয়ত সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলেই, চিত্তশুদ্ধির প্রত্যবায়গুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইবে। চিত্তশুদ্ধি জন্মিলেই জ্ঞানালোক প্রাপ্তির আর বিলম্ব রহিল কৈ? উদ্ধত স্বভাব—অশিক্ষিত তেজোবান্ তুরঙ্গমের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, বিপথগামী হইয়া, আরোহীর প্রতিক্ষণেই বিপদের আশঙ্কা; কিন্তু সেই অশ্ব সুশিক্ষিত হইয়া আয়ত্তাধীন হইলে, সহজেই তৎ সহায়ে সুখে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারা যায়। তাহাকে সুশিক্ষার দ্বারা আয়ত্তাধীন না করিয়া, তাহার ঔদ্ধত্য নিবারণার্থ পদচ্ছেদন করিয়া খঞ্জ করিলে, আরোহীর কি লাভ হয়? তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আয়ত্তাধীন করিতে পারিলেই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ করিয়া আর কি ফল? এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়গণ কাহার অধীন হইবে? ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি; মন হইতে শ্রেষ্ঠ; এবং যিনি বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ভগবান বলিয়াছেন;—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধিবুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৩। ৪২। ভাঃ।

অতএব ইন্দ্রিয়গণকে বিবেক-বুদ্ধি পরিচালিত মনের অধীন করিতে হইবে; ইহারই নাম ইন্দ্রিয় সংযম। একটী সুশৃঙ্খলা বিশিষ্ট শান্তিময় গৃহস্থের বাটীতে ক্ষুদ্র নফরটি হইতে প্রধানতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত কে কার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে, তাহার নিয়ম নিরূপিত থাকে। কিন্তু পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ আজ্ঞাকর্ত্তার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলেও, সমস্ত কার্য্যেই তাহার আজ্ঞাপালনের সঙ্গে গৃহকর্ত্তার সন্তোষ সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়া থাকে। সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে বিবেক-বুদ্ধি পরিচালিত মনের অধীন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে; কিন্তু ভগবৎ প্রীতিই যেন সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কর্ম্ম সকলের পরিসমাপ্তিই জ্ঞান এবং চিত্তশুদ্ধির উপায়ই কর্ম্ম। দ্রব্যময়ী ও জ্ঞানময়ী ভেদে কর্ম্মের দুইটী অবস্থা। ভগবান বলিয়াছেন ;—

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৪। ৩৩। ভাঃ ॥

কর্ম্মের দ্রব্যময়ী অবস্থায় বিভিন্ন দ্রব্যের দিকে চিত্ত অর্পিত হয়। মনের মধ্যে দ্রব্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতিকৃতি জাগরূক থাকে ; ক্রমে কর্ম্ম করিতে করিতে সেই প্রতিকৃতিগুলি স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়া জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—কোন ছাত্রকে একটী গল্প পড়িতে দিলে, প্রথমে তদন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির প্রতি এবং জীব জন্তুর বিশেষ বিশেষ আকৃতির প্রতি তাহার মনোনিবেশ হয়। পরে অনেকবার পড়িতে পড়িতে তাহার আর সেইরূপ মনোনিবেশ থাকে না, কেবল সেই গল্পের সার উপদেশটীর দিকেই তাহার চিত্ত ধাবিত হয়।

কর্ম্ম সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—নিষিদ্ধ কর্ম্ম, কাম্য কর্ম্ম, নিত্য কর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম। হিংসা দ্বেষাদি দ্বারায় প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম,—নিষিদ্ধ কর্ম্ম। চিত্তশুদ্ধ্যর্থী ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। স্বর্গাদি সুখভোগের কামনায় যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা কাম্য কর্ম্ম। এ কর্ম্মও তাহার পক্ষে হিতকারী নয়। তবে সেইরূপ সুখপ্রাপ্তির আশায় যদি ভগবৎ প্রীতি উৎপাদনে প্রয়াস পায়, তবে ভগবৎ কৃপা প্রাপ্তির সময় তাহার হৃদয়ে ভগবৎ-সেবা-সুখ পূর্ব্বাকাঙ্ক্ষিত সুখ অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করে। ধ্রুব স্বীয় জননীর নিকট "বৎস! অন্যভাব পরিত্যাগ করিয়া, নিজ ধর্ম্ম দ্বারা শোধিত চিত্তে সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীভগবানের উপাসনা কর। তিনি ভিন্ন অন্য কেহই তোমার দুঃখ দূর করিতে পারিবে না" এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনের দ্বারা মনকে সংযত করিয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বিবিধ বিধি বিধানে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ; পরে শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়া আকাঙ্ক্ষিত বর প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু শ্রীহরি গমন করিলে তিনি বিলাপ করিয়াছিলেন।

"স্বারাজ্যং সচ্ছতো মৌঢ্যান্মনো মে ভিক্ষিতোবত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেণ ফলীকারা নিবাধনঃ ॥৪।৯।৩৫। ভাঃ।

অর্থাৎ "আমি এমন ক্ষীণপুণ্য এবং এরূপ মূঢ় যে, মোহবশতঃ শ্রীহরির নিকট 'অভিমান' ভিক্ষা চাহিলাম। যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তি রাজার নিকট সতুঁষ তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, আমার প্রার্থনা ঠিক সেইরূপই হইয়াছে।" তবেই দেখা যাইতেছে যে, ফলাভিলাষী হইয়া ভগবৎ প্রীতিলাভ করিলে, দিব্য-জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা থাকে। এখন নিত্যকর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্কামভাবে আশক্তি রহিত হইয়া উদ্‌যাপন করিলে, অনায়াসে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। অনাশক্তি অর্থে স্পৃহা-শূন্যতা এবং অভাবানুভব-রাহিত্য বুঝায়। এই বস্তু আমাদের আছে, এই জ্ঞানে তাহার প্রতি স্পৃহা এবং যাহা আমাদের নাই তজ্জনিত অভাবের অনুভব এই দুইটীই আশক্তির লক্ষণ। আমার একটী উত্তম পরিচ্ছদ আছে ; সেইটী পরিয়া বেড়াইতে যাই। যদি কখন সেটী না পরিয়া বেড়াইতে গিয়া তাহার অভাব অনুভব না হয়, অর্থাৎ আমি আজ পোষাকটী পরিয়া আসি নাই, পরিয়া না আসাটা ভাল হয় নাই, ইত্যাকার ভাব যদি আমার মনে উদয় না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি আমার অনাশক্তি জানিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত অনিত্য বস্তুতে অনাশক্তি জন্মিলেই দিব্যজ্ঞান লাভ হইবে।

অতএব সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অবিরত অনাশক্ত ভাবে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও স্থির হয়, এবং চিত্ত স্থির হইলেই ভগবানের স্বরূপ দর্শন লাভ হয়। একখানি দ্রুতগামী বাষ্পীয় যানের আরোহী বহির্দৃষ্টি করিলে, দেখিতে পায় যে বৃক্ষাদির মধ্যে কোন কোনটা সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, আর কতকগুলি পশ্চাদাভিমুখে ধাবিত হইতেছে ; কিন্তু গাড়ী থামিলেই দেখিতে পায় যে বৃক্ষ সচল নয়—অচল। তখন তাহার পূর্ণাবয়ব দৃষ্টি গোচর হয়। সেইরূপ চিত্ত চঞ্চল থাকিলে ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু সেই চিত্ত স্থির হইলে সেই হৃদয়স্থ সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ ভগবানের স্বরূপ দর্শন লাভ হয় ; ভক্তি-পূর্ণ প্রেমানন্দের উদয় হয়।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস।

গঙ্গাস্নানে।

করি তীর্থস্নান,—
লভিতে অনন্ত পুণ্য অক্ষয় অম্লান।
দূর দূরান্তর হ'তে এসেছে ছুটিয়া।
ধর্ম্ম-লুব্ধ অগণিত মুক্তিকামী হিয়া॥
ভীমক্রুদ্ধ রাহুগ্রস্ত ক্ষীণ চন্দ্রালোকে।
প্রকৃতির রৌপ্যকান্তি মূহ্যমান শোকে॥
প্রকাশিছে হৃদয়ের বেদনা অপার;
হেন কালে অদমিত প্রলুব্ধ হিয়ার।
সুমহিম তাড়নায় লক্ষ নরনারী,
উন্মত্ত হৃদয়াবেগে দু'বাহু প্রসারি';—
ভকতির সুধামাখা করি হরিগান;
পবিত্র জাহ্নবী জলে করে তীর্থস্নান।
কাতারে কাতারে,—
ছুটিছে অসংখ্য যাত্রী এপারে ওপারে,
সর্ব্বপাপ বিনাশিনী পূত জাহ্নবীর;
আঁখি হ'তে বিন্দু বিন্দু ঝরে প্রেমনীর
অটল বিশ্বাসে পূর্ণ, চির মোক্ষকামী
কোটী হিন্দু সন্তানের।
দাঁড়াইয়া আমি,
অসংখ্য যাত্রীর মাঝে ভাবিতেছি হায়;
কে বলিছে হিন্দুধর্ম্ম আজি লুপ্ত প্রায়!
শতবর্ষ অতীতের কোন্ শুভক্ষণে,
কখন কি বলেছিল প্রশান্ত নিঃসনে;
ভারতীয় সভ্যতার বিমল উষায়,
বসিয়া গম্ভীর চিত্তে তপোবনচ্ছায়,—
ভারতের ত্রিকালজ্ঞ যোগীশ্বরগণ,
বর্ষে বর্ষে যোগে যোগে তাহারি স্পন্দন—
আজ(ও) জাগে ত্রিংশ কোটী হিন্দু চিত্ত
ভরি পরাণে অপরিমেয় পুলক বিতরি।
তা'ই পুনঃ আজ—
তেয়াগিয়া সংসারের শত লক্ষ কাজ,—
ছুটি এরা আসিয়াছে জাহ্নবীর তীরে;
স্থবির, যুবক, শিশু, পরস্পরে ঘিরে।
প্রত্যেক হৃদয় ভরি' উঠে উছলিয়া।
দেবতার শান্ত গীতি কি মধু অমিয়া।
আজি রাজপথ,—
অযুত তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সিন্ধু-বক্ষঃ মত,
অগণিত মানুষের কলকণ্ঠ স্বরে;
মুখরিত হ'য়ে উঠে নৈশ বিশ্বপুরে—
তালহীন, সুরহীন বিমিশ্র ভাষায়।
নাহি ক্লান্তি, নাহি শ্রম, সব ছুটে যায়
তাপ-দগ্ধ হৃদি ল'য়ে বক্ষে জননীর;
কি যেন ত্রিদিব-হর্ষে সকলে অধীর।
কহিছে সবাই যেন বিশ্ব মাঝবেরে,
'কোথা কে আছিস্ তোরা আজ
বেঁটে নে'রে
জননীর স্নেহাশীষ পবিত্র নির্ম্মল;
হৃদয়-সরসী হ'তে শান্ত শতদল।
আহরিয়া, আয় সবে আয় আয় ছুটে,
জননীর স্নেহভাণ্ড নিয়ে যা'রে লুটে।
বিশ্বভরা প্রেম, পূণ্য, হাসি, গান মাঝে
মায়ের মঙ্গল হাসি হের ওই রাজে।

তীর্থের সলিল স্পর্শে কেরে পুণ্যবান্!
লভে যা লভে যা ওরে স্বর্গের সন্ধান।

*   *   *

মধুময় কি যেন কি আহ্বান শুনিয়া;
ছাড়ি মোর ক্ষুদ্র নাড় এসেছি ছুটিয়া।
পাপী আমি, দীন হীন হৃদি খানি ল'য়ে
তোমার কোলের কাছে, রয়েছি দাঁড়ায়ে।
হে জননী, পরাণের হে চিরনন্দিনি!
হে আরাধ্য দেবী মোর ত্রিলোক বন্দিনি!
তোমার ও অতুলন স্নেহ বিন্দু লেশ,
আমারে করিয়া দান সর্ব্ব অবশেষ;
অনন্ত আলোক রশ্মি দাও দেখাইয়া;—
তোমারি সঙ্গীতে মুগ্ধ মোর ক্ষুদ্র হিয়া।
শুনিতে পাইবে যবে মৃত্যুর আহ্বান।
স্বরগ-আশীস-পূত পবিত্র কল্যাণ
বরষিত হবে মোর দীর্ণ শিরোপরি;
আর আমি স্থির নেত্রে ও চরণ স্মরি,—
অচেনা সে দেশ পানে করিব প্রয়াণ
যেথা না পশিতে পারে পৃথ্বীর সন্ধান।
তুমি তব স্নেহ-বক্ষে নিও মোরে টানি;
আমার আরাধ্যা অয়ি, হে দেবী কল্যাণি!

শ্রীহরিকৃপা চৌধুরী।

মৃত্যুপথ।

(গত বৎসর ফাল্গুন সংখ্যার পর।)

তৃতীয় অধ্যায়।

সূক্ষ্ম শরীর বিচার।

কারণ স্বরূপিণী আনন্দময়ী প্রকৃতি হইতে তাবন্ত জগতের সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়, যথা শ্রুতি—"আনন্দ ময়োঽভ্যাসাৎ"। ১২। বেদান্ত-১অঃ ১ পাদ।

ব্রহ্ম আনন্দময় ও তৎ প্রকৃতি আনন্দময়ী। আনন্দময় ও আনন্দময়ীর মহা আনন্দ উচ্ছ্বাসে এই বিবর্ত্তন। যথা—

সচ্চিদানন্দের মহা আনন্দ উচ্ছ্বাসে, ছুটে মহা বিবর্ত্তন প্রবাহ যখন।
অব্যক্তির মহাব্যক্তি আলোক বিকাশ, বিদ্যুতের, হয় ব্যক্ত বিশ্বের কারণ।
ক্রমে সূক্ষ্ম বিশ্ব, ক্রমে বিশ্ব স্থূলতর, —গ্রহ, উপগ্রহ, জীব, হয়-বিবর্ত্তিত।
ক্রমে স্থূল সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম কারণে অমর, কারণ সচ্চিদানন্দে, হয় নিবর্ত্তিত॥

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানিভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্ত্যানন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি"। শ্রুতি। তৈত্তিরীয়।

এক মহানন্দ, এই অনন্ত কোটি বিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও হন্তা। এই আনন্দ-

সাগরে কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, কত নক্ষত্র বিকশিত হইতেছে এবং লয় পাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আনন্দাদ্ব্যেব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ।
আনন্দে এব লীনং চেতুক্তানন্দাৎ কথং পৃথক ॥ শ্রুতি।

বিশ্ব আনন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারা জীবিত রহে, এবং অন্তকালে আনন্দে বিলীন হয়। অতএব আনন্দ হইতে জগৎ কি প্রকারে পৃথক হইতে পারে?

কোন্ পদার্থের নাম আনন্দ? শুক্রই আনন্দ—আনন্দই শুক্র। শুক্রমূর্ত্তি যে কাম, তাহার স্মরণে আনন্দ—ব্যবহারে আনন্দ—রক্ষণে আনন্দ—ত্যাগে আনন্দ। যে পদার্থ শরীর হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আনন্দ দিতে বিরত হইতেছে না,—যাহার স্মরণ হইতে ত্যাগ পর্য্যন্ত আনন্দ জন্মায়, তাহা আনন্দময়।

আনন্দের সহিত শুক্রের কি সম্বন্ধ? আনন্দ না হইলে শুক্রের উৎপত্তি হয় না।

শুক্রের সহিত সূক্ষ্ম শরীরের কি সম্বন্ধ? একই সম্বন্ধ। শুক্রই সূক্ষ্ম শরীর। অস্মদাদির সূক্ষ্ম শরীর শুক্র, জগতের সূক্ষ্ম শরীর সূর্য্য; একটি ব্যষ্টি, আর একটি সমষ্টি; একটি ক্ষুদ্র, একটি বৃহৎ, একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতি পুরুষ হইতে, আর একটি মহান্ প্রকৃতি পুরুষ হইতে উৎপন্ন। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে সূক্ষ্ম শরীর দুই প্রকার যথা।—

দ্বেধা সূক্ষ্ম শরীরং স্যাৎ সমষ্টি ব্যষ্টি ভেদতঃ।
সমস্তৈঞ্চৈক বুদ্ধিস্থং সমষ্টিঃ স্যাদরণ্যবৎ ॥ ১৯ ॥
ভেদবুদ্ধিকৃতাব্যষ্টির্ব্বিজ্ঞেয়া বৃক্ষবত্তথা।
সমষ্টিঃ সূক্ষ্ম দেহানামুপাধিঃ পদ্মজন্মনঃ ॥ ২০। বেদান্ত সংজ্ঞা।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে সূক্ষ্ম শরীর দুই প্রকার,—প্রত্যেক জীবদেহে ব্যষ্টিরূপে, সমস্ত জগতে সমষ্টিরূপে বিরাজমান। সমষ্টি সূক্ষ্ম দেহের উপাধি হিরণ্যগর্ভ বা মহত্তত্ত্ব। সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠাতৃত্ব উপলক্ষে ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা কহে। যে নিয়মে, যে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি; সেই নিয়মে, সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাসে জগতের সূক্ষ্ম শরীর উৎপত্তি। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

নানাপ্রকার শৃঙ্গারং, শৃঙ্গারো মূর্ত্তি মানিব
চকার সুখ সম্ভোগং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণোবয়ঃ ॥
ততঃ স চ পরিশ্রান্তরস্তস্যাযোনৌ জগৎপিতা।
চকার বীর্য্যাধানশ্চ নিত্যানন্দঃ শুভক্ষণে ॥

*   *   *   *   *   *

অথ সা কৃষ্ণশক্তিশ্চ কৃষ্ণাংগর্ভং দধারহ।
শত মন্বন্তরং যাবজ্জ্বলন্তি ব্রহ্মতেজসা ॥

*   *   *   *   *   *

শত মন্বন্তরাতীত কালেঽতীতেঽপি সুন্দরী।
সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরং ॥ প্রকৃ-২অঃ ॥

অপিচ—অন্তর্গর্ত্ত প্রজাপতিরপশ্যৎ প্রকৃতিং পরাং।
সাস্থুয়তহৈমমণ্ডং যদ্রূপং চাক্ষুষং ভবেৎ ॥ শ্রুতি

অপিচ—দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌপরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সা ভূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং ॥ ভাগবত ৩।২৬ ॥

অপিচ—মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্মতস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত ॥ গীতা ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহৎযোনিরহংবীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪। ১৪অঃ ॥
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর জঙ্গমং। দাশু
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥ ১৩অঃ।

স্ত্রী পুরুষ সংসর্গে যেমন আমাদের সন্তানের সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ একই নিয়মে মহান্ পুরুষ ও মহান্ প্রকৃতি সংসর্গে চিজ্জড়ত্ব-প্রমুখ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের সূক্ষ্ম শরীর বা মহত্তত্ত্ব আবির্ভাব হয়। যে কিছু বস্তু উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলনে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতি তাহাদের কারণ অর্থাৎ জননী স্বরূপা এবং মহান্ পুরুষই বীজাধানকারী পিতৃ স্বরূপ। পিতা যেমন সন্তান লাভের কামনায় পত্নীর যোনিদ্বার পথে গর্ভে রেতঃ সেক করিয়া থাকেন, পরব্রহ্মও তদ্রূপ প্রকৃতির যোনিপথে চিদাভাস রেতঃ সেক দ্বারা এই সৃষ্ট পদার্থ সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পিতার শরীরে পুত্রের সূক্ষ্ম অংশ সমূহ যেরূপ সংযুক্ত থাকে এবং পিতা যেমন রেতঃরূপে স্বয়ংই রূপান্তর ধারণ করিয়া পত্নীগর্ভে প্রবিষ্ট

হন ও যথাকালে পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই পরব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপে এই সৃষ্ট পদার্থ পুঞ্জে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বয়ংই বিরাজমান রহিয়াছেন। প্রলয়ে ভূত সমূহ অতি সূক্ষ্মরূপে পরব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে। তিনি যখন "আমি বহু হইব" যেন এইরূপ বাসনা-পরতন্ত্র হইয়া চিদাভাসরূপে প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন, তখনই হিরণ্যগর্ভ বা মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। ইহাই জগতের সূক্ষ্ম শরীর। যেরূপ যৌন সংসর্গ প্রণালী অবলম্বনে জীব-প্রবাহ অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, সৃষ্টির আদি ক্রমও তদনুরূপ; ইহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যোনি পথের উল্লেখ হইয়াছে।*

জন্মকালে অস্মদাদির পিতা হইতে যেমন একাধিক সূক্ষ্ম শরীর নির্গত হয়, তদ্রূপ সৃষ্টি সময়ে পরম পিতা হইতেও অসংখ্য সূক্ষ্ম শরীর প্রাদুর্ভূত হয়; যথা—

সৃষ্টি কালে পুনঃ পুর্ব্ব বাসনা মানসৈঃ সহ।
জায়তে জীব এবং হি যাবদাহূত সংপ্লব ॥ ভাগবত গীতা ॥

অপিচ—অসংখ্যা মূর্ত্তয়স্তস্যনিস্পতন্তি শরীরতঃ।
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ ॥ মনু ১৫॥১২ অঃ ॥

অপিচ—বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জয়ন্তেঽক্ষরস্তথা।
বিবিধাশ্চিজ্জড়াভাবা ইত্যাথর্ব্বণিকীশ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥ পঞ্চদশী-৪পরি ॥

অপিচ—নিঃসরন্তি যথালোহপিণ্ডাতপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মনস্তদ্বদাত্মানঃ প্রভবন্তিহি ॥ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ॥

অপিচ—যথা বাতবশাৎ সিন্ধু বুৎপন্নাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ।
তথাত্মনি সমুদ্ভূতঃ সংসারঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ ॥

সৃষ্টিকালে জীবাত্মা পূর্ব্বের অভিলষিত বাসনার সহিত পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। এই সূক্ষ্ম শরীর পরমাত্মার দেহ হইতে অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিনিঃসৃত হইয়া উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনিতে স্থিতি করতঃ চিজ্জড়াত্মক নানা দেহকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণ করেন। যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল নিঃসৃত হয়, অথচ বস্তুতঃ এক বস্তু হইলেও 'ইহা লৌহপিণ্ড' 'এই সকল স্ফুলিঙ্গ' এইরূপ পৃথক্ ভাবে ব্যবহার হয়; সেইরূপ পরমাত্মার সকাশ হইতে এই সকল সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা সকল নিঃসৃত হইয়াছে, অথচ ফলতঃ এক বস্তু হইলেও পৃথক পৃথক ব্যবহারাপন্ন হইতেছে। এই প্রকার সৃষ্টি হইতে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত জীবাত্মা বার বার দেহ আশ্রয় করিয়া, জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারে বারংবার যাতায়াত করিয়া থাকে। সৃষ্টিকালে কারণ-শরীর স্বরূপিণী জৈবিক ও ভৌতিক

* জগতের আদি সৃষ্টি ক্রম "সবিতা" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। পং সং।

ধর্ম্মিণী প্রকৃতি হইতে ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম অবয়ব বিশিষ্ট ভৌতিক সূক্ষ্ম শরীর অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে আশ্রয় করে, এবং যেমন অদৃষ্ট, জীবকে তদনুযায়ী স্থূল-দেহ রচনা করিয়া দেয়।

শুক্রও তেজ, সূর্য্যও তেজ। বিশেষ এই যে, আমাদের শরীরোত্থিত তেজে জলীয়াংশ বহুলতা প্রযুক্ত শুক্র তরল ভাবাপন্ন। পক্ষান্তরে তেজোময় পুরুষের শরীরোত্থিত তেজ শুক্র বা সূর্য্য তেজ ভাবাপন্ন। প্রত্যুত ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, এই সূর্য্যে জল নাই। একটী ক্ষুদ্র তেজ হইতে উদ্ভূত, অন্যটি মহাতেজ হইতে নির্গত; সুতরাং ব্যষ্টি এবং সমষ্টি উভয়বিধ সূক্ষ্ম শরীরই তৈজসাত্মক। যথা—

তৈজসানিন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ।
প্রাণস্যহি ক্রিয়াশক্তি বুদ্ধে বিজ্ঞানশক্তিতা ॥ ভাঃ-৩।২৬।৩০॥

ক্রিয়া ও জ্ঞান রূপ বিভাগ হেতু ইন্দ্রিয় দুই প্রকার হয়; যথা কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ই তৈজস অর্থাৎ তেজ বা রজো প্রধান অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন; যেহেতু প্রাণের ক্রিয়া-শক্তি ও বুদ্ধির জ্ঞান-শক্তি আছে। সুতরাং প্রাণ তৈজস হওয়াতে তদীয় ক্রিয়া-শক্তি বিশিষ্ট কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলও তৈজস; এবং বুদ্ধির তৈজসত্ব হেতু তদীয় জ্ঞান-শক্তিযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের তৈজসত্ব আছে জানিবে। সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চভূতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তেজোময় ধাতু সমূহের দ্বারা বিরচিত; এ নিমিত্ত তাহা তৈজস। সূক্ষ্ম দেহের ভৌতিকত্ব অতি সূক্ষ্ম। ভূতগণের আদ্য উপাদান ও অন্তিম সংশোধিত পরিণাম স্বরূপ যে তেজ-শক্তি সমূহ, তাহাই সূক্ষ্ম দেহের উপাদান। সে শক্তি মহত্তত্ব সম্পন্ন প্রকৃতি স্বরূপিণী।

সূক্ষ্ম-শরীর সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত, তাহা মহা সূক্ষ্ম দ্রব্য ধাতু বিশিষ্ট; পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ তাহাতে বিদ্যমান আছে। ঐ সূক্ষ্ম ভূতগুলি তন্মাত্রাত্মক। তন্মাত্র সকল কেবল পঞ্চভূতের অনুমান-সিদ্ধ সূক্ষ্ম অবয়ব, তাহা চক্ষু গ্রাহ্য নহে। স্থূল চক্ষু যেমন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ, চক্ষুর দর্শন শক্তিটি সেরূপ নহে; তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তথাপি তাহা আছে ইহা সকলেই মানে; সুতরাং তাহা অনুমান-সিদ্ধ হইল। পরমাণু অর্থাৎ তন্মাত্র সকল ঐরূপ অনুমান-সিদ্ধ। জ্যোতি পদার্থটী স্থূল হইলেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়; কিন্তু সেই স্থূল জ্যোতির বীজরূপী তৈজস শক্তি, যাহা সর্ব্বপদার্থে আগ্নেয় ধাতু-রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছে,—যাহাকে দেখা যায় না, অথচ যাহা উপযুক্ত

আশ্রয়রূপ ও উত্তর সাধকরূপ উপাধি লাভ করিবামাত্র ব্যক্ত হয়, তাহাকে রূপ-তন্মাত্র বা তৈজস-পরমাণু বলে। তাহার সে রূপ কেবল অনুমান-সিদ্ধ। প্রত্যেক জাতীয় তন্মাত্রই অতি সূক্ষ্ম ভূত পদার্থ। প্রকৃত প্রস্তাবে তৎসমূহ ভৌতিক শক্তির আদিম বিশুদ্ধ অবয়ব। তাহাই জগদুৎপত্তির পক্ষে সূক্ষ্ম উপাদান স্বরূপ। প্রাকৃতিক প্রলয়ের অন্তে যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন ঐ সকল উপাদানে জীবের সূক্ষ্ম দেহ বিরচিত হইয়া থাকে। ঐ সকল তন্মাত্র, সৃষ্টি কার্য্যোন্মুখী ঐশী-শক্তি স্বরূপিণী প্রকৃতিরই স্ফুরণ মাত্র। তৎসমূহ জীবের অনাদি ভোগশক্তি ও তদীয় উত্তর-সাধকরূপ ভোগ্য পদার্থীয় শক্তির ধর্ম্মবিশিষ্ট। জীবের ভোক্তৃত্ব শক্তি ও বাহ্য সৃষ্টির ভোগ-দানের শক্তি, এ উভয় শক্তির মূলে একই প্রকৃতি-শক্তি। সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রকাশন কালে সেই প্রকৃতি ভোক্তৃ-মাত্রা ও ভোগ্য-মাত্রায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। উহার মধ্যে এক ভাগ জীবরূপ ভোক্তা-কেন্দ্র ধর্ম্মকে রচনা করে, অন্য ভাগ সেই ভোগ প্রার্থনা পূরণার্থে ভোগ্য-পদার্থকে বিন্যাস করিয়া থাকে। যথা,—রস-তন্মাত্র রূপশক্তি জীবের রসনেন্দ্রিয়কে রচনা করে, পক্ষান্তরে তাহারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি জলীয় পরমাণু সেই রসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য জল রূপে পরিণত হয়। এইরূপে সমস্তই তন্মাত্র শক্তির কার্য্য, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ তাহাদেরই রচনা। প্রাণ উহাদের সমষ্টি-প্রবণ রাজসিক শক্তি এবং মন তাহাদের সমষ্টি-প্রবণ সাত্বিক শক্তি এবং কূর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধারণের ন্যায় ঐ সকল বিশিষ্ট সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আপনার মধ্যেই ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে সকল ইচ্ছা-সূত্রে মন স্বীয় সূক্ষ্ম দেহকে পরিচালন ও বিস্তৃত করে, তাহা প্রকৃতিরই সূক্ষ্ম-দেহগত শক্তি মাত্র। এই সমস্ত ব্যাপার সাধারণতঃ কেবল অনুমান-সিদ্ধ। মন, ইন্দ্রিয় এবং ভোগ্য দ্রব্যের সূক্ষ্ম শক্তি, এ সকল কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর নহে। এই অনির্ব্বচনীয় অত্যদ্ভুত সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে অসংস্কৃত বুদ্ধির প্রবেশ অসাধ্য, কিন্তু যোগবলে উহা প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই সাংখ্য বলিয়াছেন —"ইত্যেষ প্রকৃতে সর্গ" ; ইহা অবুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি। এই সৃষ্টি-রহস্য বুদ্ধির ভেদভাব মূলক তামসিকতার মূল।

কারণরূপী বীজ ও তাহার অঙ্কুর স্বরূপ সূক্ষ্ম দেহ, উহাই স্থূল দেহের বীজ। তথা প্রকৃতির ভৌতিক ধর্ম্মই উপাদান, পরিণামী ও সমবায়ী কারণ, এবং অদৃষ্ট তাহাকে অঙ্কুরিত করণার্থ জলসেক স্বরূপ। বটকণিকাতে যেমন অদৃশ্যভাবে ভাবী প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাদনের বীজশক্তি বিলীন থাকে,

অর্থাৎ তদন্তর্গত সেই অদৃশ্য শক্তি যেমন মৃত্তিকা ও জল সহযোগে ক্রমে উত্তুঙ্গ তরুবর রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ঐ সূক্ষ্ম দেহরূপ অদৃশ্য বীজ-শক্তি, অদৃষ্ট রূপ ভূমি এবং অনাদি তৃষ্ণারূপিণী জলসেক সহকারে অঙ্কুরিত ও ভাবী স্থূল দেহরূপে উদয় হয়। অতএব স্থূল উৎপাদনের বীজত্ব ঐ সূক্ষ্মেই আছে।

জীব পরলোক গমন সময়ে দেহারম্ভক বা দেহ ভাবের প্রবণতাযুক্ত পঞ্চ সূক্ষ্ম-ভূত সঙ্গে লইয়া যায়। তাহাই তাহার ভাবীদেহের অপ্রকট বীজ স্বরূপ। "তস্মাৎ বীজৈর্বেষ্টিত এব পরলোকং গচ্ছতীতি" ॥ জীব স্বীয় ভাবী জন্মের স্থূল শরীরের বীজের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পরলোক গমন করে। তাহা অদৃষ্ট স্বরূপ, প্রকৃতি-নিষ্পন্ন ও কর্ম্মপালিত এবং বাহ্য প্রবণতা পূর্ণ বীজ ; সুতরাং পরলোকে তাহা দুর্লভ নহে ও সেইজন্য তাহা সঙ্গে সঙ্গেই গিয়া থাকে। সূক্ষ্ম দেহ সেই বীজের দ্বারা অনুস্যূত। ভাবার্থ এই যে মৃত্যুর পর বীজ যে কোন লোকে যে কোনরূপ শরীর ধারণ করে, তাহা বস্তু-তন্ত্র নহে ; তাহা কেবল তাহার স্বীয় কর্ত্তৃ-তন্ত্র। মৃত্যু সময়ে স্থূল দেহ পড়িয়া থাকে, সূক্ষ্মদেহ জীবের সঙ্গে সঙ্গে পরলোকে গিয়া জীবের অদৃষ্টানুযায়ী অন্য স্থূল দেহ সম্পাদন করে।

সূক্ষ্মদেহ যেন প্রতি জন্মের স্থূল দেহের মেরুদণ্ড ও পঞ্জর স্বরূপ। জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে ঐ সূক্ষ্ম দেহের আধ্যাত্মিক আকার যেরূপ বিরচিত হয়, স্থূল পঞ্চভূত সেই মুল আকৃতির উপর তদনুযায়ী স্থূল দেহ বিন্যস্ত করিয়া থাকে। জীব শুভাদৃষ্ট জন্য যদি স্বর্গবাসী হন, তবে তাহার সূক্ষ্ম দেহের পবিত্রতা অনুসারে উৎকৃষ্ট তেজোময় এবং স্বচ্ছ শরীর লাভ হইয়া থাকে। যদি দুরদৃষ্ট বশতঃ নরকে পাতিত হয়, তবে তাহার তদবস্থাপন্ন সূক্ষ্ম দেহের মালিন্যানুরূপ যাতনা ভোগের উপযোগী কোনরূপ দেহ জন্মে।

কারণ শরীর হইতে সৃষ্টিকালে যে সমস্ত শারীরিক সূক্ষ্ম শক্তি অঙ্কুরিত হয় এবং জন্ম-জন্মান্তর ও লোক-লোকান্তর ব্যাপিয়া যাহা জীবের সঙ্গে থাকিয়া প্রয়োজনীয় দেহাদির বিধান করে, অর্থাৎ যাহার আশ্রয়ে স্থূল দেহ, স্বর্গীয় কলেবর, নারকী দেহ, স্বপ্ন দেহ ও সঙ্কল্পিত ইচ্ছাময় দেহ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সূক্ষ্ম দেহ। তাহা তন্মাত্রা নামক, কেবলমাত্র অনুমান দ্বারা সিদ্ধ অতি সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত ভূতমাত্রা দ্বারা বিরচিত। সুতরাং তাহা অস্মদাদির ইন্দ্রিয় গোচর নহে ; তাহা কেবলমাত্র তত্ত্বদর্শী ইন্দ্রিয় দ্বারাই দৃষ্টিগম্য হয় ; অথবা ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে যাঁর দৃষ্টিশক্তি পরমাণু দর্শন যোগ্য হইয়াছে, সেই মহাপুরুষই উহা দেখিতে পান।

স্বষ্টিকালে প্রকৃতিরূপ বীজ হইতে একদিকে জীবের বাসনা ও কর্ম্ম উদ্ভব হয়, অন্যদিকে দশবিধ ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্ম শক্তিযুক্ত অঙ্গ ও তত্তদঙ্গে স্থূলাবির্ভাব স্বরূপ স্থূল দেহ সংঘটিত হয়; অপরদিকে তাহাদের ভোগ্য বাহ্য বস্তু সকল যথোপযুক্তরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। বাহ্যতঃ স্থূল দেহ সংলগ্ন যে চক্ষু ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দ্রিয় নহে, এবং তাহাকে সূক্ষ্ম অঙ্গ বলাও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তত্তদিন্দ্রিয়ের গোলোকে দীপ্তিমান শব্দ স্পর্শাদি গ্রহণের যে সূক্ষ্ম শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহাকে ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মাঙ্গ বলাই উদ্দেশ্য। মন বুদ্ধ্যাদিরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি বিরচিত আভ্যন্তরিক তেজোময় দেহকে সূক্ষ্ম শরীর কহে।

সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশাঙ্গ বিশিষ্ট। ১১ ইন্দ্রিয় + ৫ তন্মাত্রা + ১ বুদ্ধি = ১৭। কেহ কেহ পঞ্চ-তন্মাত্র স্থানে পঞ্চ-প্রাণ গ্রহণ করেন। ফলিতার্থ একই, পঞ্চ প্রাণ বায়বীয় তন্মাত্রারই অন্তর্গত।

মহর্ষি কপিলোক্ত সূক্ষ্ম শরীর বর্ণন যথা;—পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎ কার্যত্বং ভোগাদেকস্যনেতরস্য।৮। সাংখ্যদর্শন-৩অঃ। পূর্ব্বে অর্থাৎ স্বষ্টিকালে লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। তখন স্থূল শরীর সৃষ্টি হয় নাই; সুতরাং সুখ ও দুঃখ, লিঙ্গ-শরীরেরই কার্য্য, স্থূল শরীরের নহে। সুখ দুঃখভোগ লিঙ্গ-শরীরেই হয়, ইতর শরীরে অর্থাং স্থূল শরীরে নহে। আগে লিঙ্গ-শরীর, পরে তদুপরি স্থূল শরীর। যখন স্থূল শরীর সৃষ্টি হয় নাই, তখন লিঙ্গ-শরীরেই ভোগ প্রবর্ত্তমান ছিল; এবং এখনও সেই নিয়ম চলিতেছে। সেই কারণে মৃত দেহ লিঙ্গ পরিশূন্য হওয়ায় সে দেহ সুখ-দুঃখ বর্জ্জিত হয়।

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্। ৯—সাং দঃ লিঙ্গ শরীর সপ্তদশাবয়ব, অর্থাৎ একাদশেন্দ্রিয় বুদ্ধি ও পঞ্চ-তন্মাত্র, এই সপ্তদশ অবয়ব যুক্ত একটি দেহের নাম সূক্ষ্ম শরীর। অহঙ্কার বুদ্ধিরই অন্তর্গত, প্রথমে ইহা একই ছিল। প্রথমে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ জন্মেন। ব্রহ্ম সেই এক অখণ্ড লিঙ্গের সমষ্টি-শরীরে অহমভিমানী। লিঙ্গ-দেহ বুদ্ধি প্রধান; সেই জন্য লিঙ্গ-দেহে ভোগ হয়। জীব সাধারণের—কর্ম্ম সাধারণের প্রভাবে প্রথম সমষ্টি সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে তাহাদের বিশেষ কর্ম্ম জন্য ব্যষ্টি সৃষ্টি হইয়াছে। লিঙ্গ-শরীরী জীবের অন্য নাম কর্ম্মাত্মা, কর্ম্ম পুরুষ বা কামদেহী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবকুমার যখন স্বীয় বাসস্থান বনগ্রামে প্রবেশ করিতেছিল, তখন তাহার হৃদয় বড় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। বহুদিনের স্মৃতি-সিন্ধু মথিত করিয়া অব্যক্ত যাতনা তাহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিতে লাগিল। অক্ষয়চন্দ্রের উপদেশ হৃদয়ে জাগরূক থাকিলেও তাহার পরাজয় হইল; গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। অগত্যা হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য, বনগ্রাম—নিম্ন-প্রবাহী জয়দেবের মধুর গীতের প্রধান শ্রোতা অজয় তটে গ্রামের বাহিরে একান্তে উপবেশন করিয়া রহিল। তখন মরীচিমালী স্বীয় কর সঙ্কোচন পূর্ব্বক বিশ্ববাসীকে স্নিগ্ধ করিয়া বিশ্রামার্থ অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। যেদিকে তিনি বসিয়া আছেন, সেদিকে লোকের বড় গমনাগমন নাই; নিবিড় বৃক্ষরাজি তখন তাঁহার একমাত্র অনুসঙ্গী। সায়ংকালের আরতির বাদ্য বাজিয়া গেল,—তাঁহার সেদিকে লক্ষ্য নাই। মনে হইতেছে তিনি অজয়ের উছলিত তরঙ্গ নৃত্য দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া আছেন,—কিন্তু তাহা নহে। নিকটে ফেরুপাল প্রহর জানাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু সে সেই একভাবে। কচ্ছপাদি জলজন্তু মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইতেছে; কিন্তু নবকুমারের দৃষ্টি, শ্রুতি কিছুই বাহিরের দিকেই নাই। দারুণ চিন্তা-সাগরে ভাসমান, সময়ে সময়ে এক একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাহার সজীবত্বের প্রমান দিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, যদি বাড়ী গিয়া দেখি মা আমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন—যদি গিয়া দেখি যে, আমার পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী স্বামীর নিরুদ্দেশে উদ্বন্ধনে ইহলোক ত্যাগ করিয়া অনন্তের কোন এক নিভৃত কন্দরে লুকাইয়া আছে, তখন আমি কি করিব? অনুতাপের জলন্ত অনলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। মনে পড়িল একদিন বিনোদিনী তাহার পদযুগল ধরিয়া বলিয়াছিল, "একদিন আমার অনুরোধ রক্ষা কর,—একদিন একটু মিষ্ট কথা বলিয়া আমার প্রাণ শীতল কর,—জন্মের সাধ একদিন মিটাও"। উঃ ভয়ানক কথা! আমি

তাহার বিনিময়ে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে নবকুমার স্ত্রীর মুখ দর্শন করিতে পারিত না, আজ তাহারই জন্য তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।

সহসা বৃক্ষান্তরাল হইতে কে যেন বলিয়া দিল,—"তোমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, তোমার পত্নী জীবিত।" একি, মোহ না প্রহেলিকা! না বনদেবী কৃপা-বশে হৃদয়ের যন্ত্রণা আর দেখিতে পারিতেছেন না! কিম্বা তাহার মাতাই দেহান্তর হইতে সন্তানের এই অসীম যন্ত্রণায় কাতর হইয়া, বৃক্ষান্তরাল হইতে এই কথা জ্ঞাপন করিলেন! নবকুমার এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত, তাই মনে মনে বলিতে লাগিল,—বিনোদিনী! আমি তোমার নিকট বড়ই অপরাধী; এ অপরাধ আমার জ্ঞানকৃত, তাই এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পবিত্র ভাগীরথী তরঙ্গে জীবন ত্যাগ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া, গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিয়াছিলাম; কিন্তু সন্ন্যাসীর করুণায় অন্যরূপ বুঝিলাম। এখন তোমার নিকট আমার এই কৃত পাপের ক্ষমা চাই। অজ্ঞানান্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বাত্যাবিতাড়িত পত্রের ন্যায় কতদিক ঘুরিলাম, কিন্তু এখন বেশ স্পষ্ট বুঝিতেছি, তুমি যদি সরল অন্তঃকরণে আমায় সেইভাবে গ্রহণ কর, তবে চিত্তের এই অনুতাপ কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইতে পারে। সত্যই তুমি যদি জীবিত থাক, তোমার ন্যায় সতীর দেহস্পর্শে এই পাপ পঙ্কিল দেহ পবিত্র হইতে পারে। হেমলতার জন্য যন্ত্রণা এখন তিরোহিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত শক্তিতে জানিতে পারিয়াছি যে. সে এক্ষণে ভাল আছে, তাহার কোনই কষ্ট নাই। কিন্তু এ যন্ত্রণা যে কিছুতেই হৃদয় হইতে অপনীত হইতে চায় না। যদি তোমায় না পাই, তবে তোমার রূপ ধ্যান করিতে করিতে ইহ জীবনের অবসান করিব। অক্ষয় দাদা বলিয়াছিল,—সংসারে এখনও আমার অনেক কর্ম্ম বাকী! যদি বিনোদিনীকে না পাই, তবে আমার কিসের সংসার! সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিজন বনে আশ্রয় গ্রহণ করিব। সেখানে বনের বিহঙ্গমগণ আমার দুঃখে দুঃখিত হইবে -বৃক্ষরাজি শন্ শন্ শব্দে আমায় সান্ত্বনা প্রদান করিবে—ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি আমার চরিত্র শ্রবণ করিয়া ভাবিবে, যে নরকুলে এমন অধর্ম্মাচারী পশুরও সত্ত্বা আছে। দাদা বলিয়া দিয়াছে, নিতান্ত হৃদয় ব্যাকুল হইলে ভগবানকে চিন্তা করিবে; কিন্তু চিন্তা কিরূপে করিব,—হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে! এখন একটু শান্তি চাই! ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা যতদূর সম্ভব, তাহা আমার বাকী নাই। পাপ সাগরে যতদূর ডুবিতে পারা যায়, আমার তাহা হইয়া গিয়াছে—এখন চাই একটু শান্তি!

চাহিয়া দেখিল রাত্রি অনেকটা হইয়াছে; তাহার কিন্তু কিছুই বোধ নাই। তখন সেখান হইতে উঠিয়া নিঃশব্দে গৃহের নিকট উপস্থিত হইল। গ্রামবাসী-গণ তখন দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে, গ্রাম্য কুক্কুরাদি জন্তু নিচয় মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছে। দুই একটী বাড়ী মাত্র এখনও লোকের অস্তিত্ব জানাইতেছে; কোথাও বা আলোক-রশ্মি দেখা যাইতেছে। নবকুমার স্বীয় গৃহের সম্মুখে গিয়া দেখিল, বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ। তখন নবকুমারের হৃদয় দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, মর্ম্মের ভিতর যেন অব্যক্ত যাতনা—প্রাণের গ্রন্থি নিচয় যেন শত ছিন্ন হইতে লাগিল; আর স্থির থাকিতে পারিল না। সন্ন্যাসীর উপদেশ—অক্ষয় দাদার উপদেশ, কোথায় ভাসিয়া গেল; নবকুমার মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।

কতক্ষণ নবকুমার এই ভাবে ছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। তবে মূর্চ্ছাভঙ্গের পর হৃদয়ে একটু বল আসিলে, সন্ন্যাসীর কণ্ঠ-নিঃসৃত বাণী তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু কিছুই সে দেখিতে পাইল না; ধীরে ধীরে সুবদনির গৃহে প্রবেশ করিল। সেদিন সুবদনির স্বামী কার্য্যান্তরে ভিন্ন গ্রামে গিয়াছেন, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই; তাই সুবদনি এখনও বসিয়া আছে। সহসা অন্ধকার মধ্যে একটী মনুষ্য মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সুবদনি বলিল—"কে"?

নবকুমার কম্পিত কণ্ঠে বলিল "একজন হতভাগা"। এ কণ্ঠস্বর সুবদনির পরিচিত হইলেও, সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। যেন খুব পরিচিত বলিয়াই বোধ হইল, কিন্তু তবুও কে,ইহা স্থির করিতে না পারিয়া পুনরায় বলিল, "চিনিতে পারিলাম না,—আপনি কে"?

নবকুমার ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইলে, সুবদনি আলোক আনয়ন করিয়া দেখিতে পাইল যে "নবকুমার"। তখন সুবদনি কি বলিবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! তাহার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে জড়িত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তাহাদের সংসারের সমস্ত দুর্দ্দশার কথা—বিনো-দিনীর কথা সব মনে পড়িল; নবকুমারকে দেখিয়াও যেন নয়ন বিশ্বাস করিতে চায়না। যাহা হউক সুবদনি অতি শীঘ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া, "আসুন আসুন" বলিয়া বসিবার জন্য আসন ও পদ-ধৌতের জল আনিয়া দিল। নবকুমার পদ প্রক্ষালন করিয়া নিস্তব্ধে আসন গ্রহণ করিল। এমন সময় সুবদনির স্বামী গৃহে ফিরিলেন; তিনিও নবকুমারকে দেখিয়া অবাক্! তিনি বলিলেন "তারপর ভায়া, কতক্ষণ আসিয়াছ"?

নবকুমার বলিল "এইমাত্র"। সুবদনি বলিল—"এতদিন কোথায় ছিলেন?"

নবকুমারের তখন কথা বলিবার শক্তি নাই—হৃদয় যেন বোধ-শক্তি বিরহিত; কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পায় না। অতি কষ্টে বলিল,—"কোথায় আর থাকিব,—আমার থাকিবার স্থান এখনও তৈয়ার হয় নাই; ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমাদিগকে দেখিতে আসিলাম"। কথা বলিতে বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তখন সকলেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিল। ইতিমধ্যে সুবদনি কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিলে, বহু অনুরোধে নবকুমার সামান্য মাত্র গ্রহণ করিল; কিন্তু সে বিনোদিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ইহারাও কিছুই বলিতে পারেন না; কাজেই কিছুক্ষণ ঐরূপ ভাবেই চলিল। দুই একটী কথার পর সুবদনির স্বামী বলিলেন,—"কি করিবে ভাই! সবই অদৃষ্টের ফল,—নইলে কি সোনার সংসার ছারখার হয়?"

নবকুমার। অদৃষ্ট নয় ভাই—আমার কর্ম্মফল! জান ত' ভাই, আমি কি পাপ কার্য্যই না করিয়াছি! আমি হেমলতাকে পথের ভিখারী করিয়া কত বিপদেই না ফেলিয়াছি! আমার এরূপ না হইলে, পাপের যে একজন দণ্ড দাতা আছেন, ইহা লোকে জানিবে কিরূপে? আর না জানিলে জগতে পাপের স্রোত ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। আমার ঠিকই হইয়াছে! এখন বল ত' ভাই, বিনোদিনী বাঁচিয়া আছে কিনা? মা ত' মারা গিয়াছেন আমি বুঝিতেই পারিতেছি।"

"মায়ের মৃত্যু সংবাদ কে তোমাকে দিয়াছে?"

"সংবাদ কেহই দেয় নাই, মনের বিশ্বাস জানাইলাম"।

"তোমার মাতার পরলোক গমনের পর বিনোদিনী আমাদের বাটীতেই থাকিত। সহসা আজ কয়দিন হইল সে আমাদিগকে না বলিয়া পলায়ন করিয়াছে; অনেক অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ পাওয়া গেল না। আজও সেই উদ্দেশ্যে এক জায়গায় গিয়াছিলাম, সেখানে শুনিলাম, যে কিরূপে সে শুনিয়াছে যে, তুমি কাশীতে আছ, তাই সে কাশীযাত্রা করিয়াছে।"

নবকুমার মনে মনে বলিল, ধন্য বিনোদিনী—তুমি ধন্য! আমি নরকের কীট, তুমি স্বর্গের পারিজাত! আমার ন্যায় মর্কটের কণ্ঠে তোমার ন্যায় মতির হার শোভা পাইবে কেন? এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত্তের অবস্থা যেন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; আবার যেন আশার ক্ষীণ আলোক মর্ম্মপ্রান্তে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। মানুষের হৃদয়ে আশা না থাকিলে মনুষ্য জীবন নিতান্ত দুঃখের হইত। এইমাত্র নবকুমার সকল আশা বিসর্জ্জন দিয়া

অরণ্যে গমন করিবার সঙ্কল্প করিতেছিল, আবার এখনি কি এক আশার কুহকে যেন স্বপ্নময় রাজ্যে নীত। তাহার মন যেন বিনোদিনীর নিকট চলিয়া গিয়াছে, সে যেন সত্য সত্যই তাহার সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া দুঃখের কথা জানাইতেছে। দুঃখ, নৈরাশ্য, ভীতি তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল; যখন সে জীবিত আছে, তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেই—হইবে, এই অপার আনন্দে হৃদয় মত্ত হইয়া উঠিল। বিনোদিনীর সরলতা আর তাহার দুর্ব্ব্যবহার,—দেখা হইলে কত কথাই বলিবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া নবকুমার বলিল, সুবদনি! বিনোদিনীর ঘরে আমাকে রাখিয়া আইস, আমি আজ সেইখানেই রাত্রি কাটাইব! হৃদয়ের অবস্থা বুঝিয়া তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া, আলোক ও বিছানা লইয়া সেই ঘরে তাহাকে রাখিয়া আসিলেন। বিনোদিনীর কাতর ক্রন্দনে যে ঘরে নবকুমার প্রবেশ করিত না, আজ সেই ঘরে মহা আনন্দে সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। নবকুমার ভাবিল, এই গৃহে বিনোদিনী শয়ন করিত, এই ঘরে বিনোদিনী তাহার জন্য বসিয়া বসিয়া অশ্রুপাত করিত। এই ঘরে বিনোদিনীর স্মৃতি মিশ্রিত! এই আমার নন্দন কানন, ইহাই আমার তপ-নিকুঞ্জ! নানা চিন্তায় কখন হর্ষ, কখন বিষাদ, কখন আশা, কখন নৈরাশ্যের মধ্যে পড়িয়া তাহার নিদ্রা আসিল না। বহুক্ষণ পরে নবকুমার তন্দ্রাভিভূত হইয়া তন্দ্রাঘোরে যেন দেখিতেছে,—বিনোদিনী পার্শ্বে বসিয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতেছে, এবং নবকুমার যেন কাতর ভাবে বলিতেছে—"বল বিনোদিনী আমাকে ক্ষমা ক্ষমা করিলে কিনা? আমি বড়ই অপরাধী, আমার পাপের ক্ষমা নাই! আমি তোমাকে কত কষ্টই দিয়াছি! তুমি ক্ষমা না করিলে, আবার এ জীবন গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিব? এই কথা বলিতে বলিতে যেন তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; বিনোদিনী যেন তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া বলিতে লাগিল,—একি কথা বলিতেছ? তুমি আমার স্বামী, এ দেহ—এ মন তোমার; ইহাতে যদি দুঃখ বা সুখ কিছু হইয়া থাকে, সে ত' তোমারই হইয়াছে, তজ্জন্য আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছ কেন? আমি যে চিরকালই তোমার শ্রীচরণের দাসী।" এই বীণাধ্বনিবৎ কণ্ঠস্বর যেন তাঁহার কণ্ঠে অমৃত ঢালিয়া দিল। এ স্বর যেন মধু হইতেও মধুর, যেন সুধার ক্ষরণ। তাহার স্পর্শ যেন কতই মিষ্ট, এ বিনোদিনী যেন সে বিনোদিনী নয়।

সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নবকুমার উঠিয়া বসিল; কিন্তু বিনোদিনীকে স্বপ্ন দর্শনে তাহার চিত্ত যেন কিরূপ হইয়া গেল। বিনোদিনী আমার

অপরাধ গ্রহণ করে নাই। বিনোদিনী মানবী নহে—দেবী! গৃহের এক পার্শ্বে একখানি পত্রিকা পড়িয়াছিল, কুড়াইয়া দেখিল বিনোদিনীর হস্তলিপি। সাদরে গ্রহণ করিয়া দেখিল উপরে তাঁহারি নাম লেখা। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিল।—

জীবন-সর্ব্বস্ব!

জানিনা তুমি কোথায়; জানিনা তুমি আমার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছ কিনা? কিন্তু আমার হৃদয় মন তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানে না। তুমি আমার ধ্যান, তুমি আমার জ্ঞান, তুমি আমার চিন্তা, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন। আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন দেবদেবীর আরাধনা করি নাই; তোমার ভিতরেই ভগবানের প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য প্রার্থনা করি।

হৃদয় দেবতা! যদি কখনও এই পত্রিকা তোমার হস্তগত হয়, একবার পড়িও! আমার হৃদয়ের ভাষা মুখে ব্যক্ত করিয়া কখন তোমাকে শুনাইতে পারি নাই, তোমার আমোদ আহ্লাদের কখন অবসর পাই নাই; অধর পল্লবের সুধারাশি কখন উপভোগ করি নাই। কিন্তু তবুও তোমার চরণ-সেবিকা হইবার আশা এখনও পরিত্যাগ করি নাই। শুনিলাম তুমি কাশীধামে আছ, তা'ই কাশী যাত্রা করিলাম। জানিনা কাশীধাম কতদূর,—জানিনা তথায় যাইতে পারিব কিনা, জানিনা তুমি সত্য সত্যই কাশীধামে আছ কি না,—থাকিলেও দর্শন দিয়া আমার প্রাণের তীব্র পিপাসা মিটাইবে কি না? তবুও আমি কাশী যাইবার জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। বুঝিতেছি যে ইহা বড়ই কঠিন ব্যাপার, এ পথে বিপদের সম্ভাবনা; কিন্তু তবুও সাহসে বুক বাঁধিয়া তোমার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে যাত্রা করিলাম। তোমার স্মৃতি আমার পথশ্রম শান্ত করিবে,—হৃদয়ের জ্বালা দূর করিবে,—অবসন্নতা বিতাড়িত করিবে। আর যদি জীবন যায়, তবে তোমার চিন্তায় জীবন হারাইয়া পরজন্মে তোমাকেই লাভ করিয়া এ জন্মের সাধ মিটাইব।

তোমার রূপ উপভোগ করিতে চাহিনা—গুণ অগুণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চাহিনা,—ধন, মান, যশ, প্রণয়, ভালবাসা কিছুই তোমার নিকট আশা করি না; চাহি কেবল তোমার চরণের দাসী হইতে। প্রাণেশ্বর! যে দিন তুমি আমাকে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাও, সে দিন ব্যতীত তোমার অঙ্গ স্পর্শের সুখ কখনও উপভোগ করি নাই। কেন তুমি গৃহত্যাগ করিলে? প্রত্যহ পদাঘাত করিয়া গৃহে থাকিলেও ত' কোন ক্ষতি ছিল না! আমি ত'

তোমায় অনর্থক বিরক্ত করিতাম না। যখনই তুমি আমার অলঙ্কার চাহিয়াছ, মাতার অজ্ঞাতসারে তখনই তোমাকে অর্পণ করিয়াছি; কখন তাহার কারণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে তুমি কোন্ অপরাধে দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে?

অবশ্য বিধাতা যাহাকে কষ্ট দিবেন, তাহা কেহই খণ্ডাইতে পারে না; কিন্তু ইহাতে যে তোমারই কষ্ট হইল। তোমার হয়ত' কোন দিন আহার হয় না—কোন দিন পথশ্রমে ক্লান্ত, পদ-সেবার জন্য দাসীকে সঙ্গে লইলেই ত' চলিত। কতজন কতরূপ কথা বলে বটে, কিন্তু আমার বেশ মনে হয় যে, তুমি খুব কষ্টেই সময় অতিবাহিত করিতেছ। আমি নিয়ত মহামায়ার নিকট তোমার মঙ্গলের জন্য মাথা খুঁড়িতেছি;—কিন্তু প্রাণে শান্তি নাই, আহারে রুচি নাই। মায়ের পরলোক প্রাপ্তি হইয়া গিয়াছে, আমার একটী দায়ের অবসান হইল; কারণ তোমার অবর্ত্তমানে মায়ের সেবা না করিলে প্রত্যবায় ঘটিত। যদি নিতান্তই ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল, তবে তুমি বাটীতে থাকিলেনা কেন? আমি যেখানে হয় চলিয়া যাইতাম। যাহা হউক এখন শুনিলাম তুমি কাশীতে আছ। আমি এখানে বসিয়া সুখে গ্রাসাচ্ছাদন করিব, তাহা হইতেই পারেনা; আমিও তোমার ন্যায় এক বসনে একাকিনী দেশ পর্য্যটন করিব, তোমার অনুসন্ধানে জীবনের অবশিষ্ট দিন যাপন করিব।

আরাধ্য দেবতা! হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া বিবাহের পর যখন তোমাকে স্বামীরূপে পাইলাম, সেই বালিকা বয়সে আমার কোন আবেগ ছিল না। স্বামীর মর্ম্ম বুঝিতাম না, বিবাহে তোমায় আমায় যে অচ্ছেদ্য বন্ধন হইয়া গেল, ইহা বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু যখন বুঝিলাম যে স্বামী স্ত্রীলোকের আরাধ্য দেবতা,—স্বামী দুঃশীল দুর্ভগ হউন, স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি; সেইদিন হইতেই স্বামীর আরাধনায় মন দিয়াছি;—স্বেচ্ছায় তোমার করে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি; ইহাই জীবনের মহাব্রত মনে করিয়া তোমারই অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছি।

কেহ কেহ বলে তুমি হেমলতাকে লইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছ, কিন্তু আমার ইহা বিশ্বাস হয় না; কারণ হেমলতাকে আমি জানি, সে স্বর্গের দেবী! তাহার স্বভাব কখন জঘন্য হইতে পারে না। আর যদি তাহাই হইয়া থাকে, আমি তাহাতে বাধা দিতে চাহি না; চাহি কেবল তোমাকে দেখিতে, তাহাতে যদি বাধা থাকে, তবে শুনিতে চাহি তুমি সুখে আছ।

তোমার চরণ-সেবিকা—

বিনোদিনী।

চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া নবকুমারের চক্ষু দিয়া দরদর ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভাবিলেন, এমন স্বার্থহীনা নারী-জীবন কিরূপ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে! যাক্ আমিও বিনোদিনীর অনুসরণে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিব। বিনোদিনী একাকিনী অসহায়া; বেশ যেখানে অসহায়া রমণী দেখিতে পাইব, তাহাকেই মাতৃজ্ঞানে মনে মনে পূজা করিব, এবং যথাসাধ্য তাহার অভাব মোচনের চেষ্টা করিব। যেখানেই পতি পুত্রহীনা আমার চক্ষে পড়িবে, তাহার যতটুকু পারি ক্লেশোপনোদনের চেষ্টা পাইব, তাহা হইলে বোধ হয় এই স্ত্রীহত্যার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। হে ভগবন্! যদি বিনোদিনী বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার মঙ্গল কর।

প্রাতে উঠিয়া সুবদনি ও তাহার স্বামী আর নবকুমারের সন্ধান পাইল না।

(ক্রমশঃ)

অর্থ]

হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহামুনি বেদব্যাসের অমৃতময় লেখনী-মুখ-নিঃসৃত বেদান্ত দর্শন সুধী সমাজে সুপরিচিত এবং বিশেষরূপে সমাদৃত; সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। তবে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, এই বেদান্ত দর্শনই দর্শনরাজ্যের সম্রাট্। প্রায় সকলেই ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। অধিক কি, সৌর, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকগণও বেদান্ত দর্শনকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুযায়ী করিতে অথবা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে বেদান্ত দর্শনের অনুমোদিত করিতে অল্পাধিক পরিমাণে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং সকলেই আপন আপন সিদ্ধান্তকে ইহার অনুমোদিত মনে করিয়া ছেন, পরিতুষ্ট হইয়াছেন। এতদ্দর্শনে মহাকবি কালিদাসের "অহমেবমতো মহীভূজঃ ইতি সর্ব্বঃ প্রকৃতিস্বচিন্তয়ৎ" কথাটী মনে পড়ে। বলা বাহুল্য যে, এরূপ অপূর্ব্ব গৌরব সম্পৎ অন্য কাহারো ভাগ্যে ঘটে নাই।

মহর্ষি-গোতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও বেদব্যাস এইরূপে সনাতন ধর্ম্ম-সেতুর সুব্যবস্থিত ও দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলে পর, নাস্তিকতা নিরস্ত হইল; ধর্ম্মরাজ্যের অনর্থকর কোলাহল অন্তর্হিত হইল। প্রকৃতিপুঞ্জ পুনর্ব্বার

বেদ বিধি শিরোধারণ পূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং শান্তশীল সাধু হৃদয় নিরুদ্বেগ হইল। এইরূপে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ নিস্তব্ধতাময় শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, তদ্রূপ ভারতের ধর্ম্ম জগৎও কিয়ৎকালের জন্য প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল বটে, কিন্তু সেই প্রশান্ততাই আবার অচিরে প্রবল প্রভঞ্জনাকারে পরিণত হইয়া বিষম ধর্ম্ম বিপ্লবের সূত্রপাত করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে বেদ বিরুদ্ধ প্রবল বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল। তাহার তীব্র তাড়নায় বেদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়া গেল। বেদ বিরোধী বিষম বিপ্লব বন্যার প্রবল বেগে ঋষি প্রতিষ্ঠিত সেই পুরাতন ধর্ম্ম-সেতুর দৃঢ় বন্ধনগুলি একে একে খসিয়া যাইতে লাগিল। সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা পিশাচীর প্রচণ্ড তাণ্ডবে ধর্ম্মপ্রাণ সাধুহৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, এবং কাতর কণ্ঠে ভক্তবৎসল ভগবানের স্তুতি গান করিতে লাগিল।

এমনই বিষম সময়ে—সম্ভবতঃ ৮ম শতাব্দীতে শিবাবতার স্বামী শঙ্করাচার্য্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। শঙ্করের শিশু জীবন অতি বৈচিত্র্যময়, কিন্তু তাহার আলোচন এখানে অসম্ভব ও অনাবশ্যক। তিনি পূজ্যপাদ গোবিন্দপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শৈশবের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতেই, শাস্ত্র শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণে সমুৎসুক হইলেন।

কথিত আছে যে, গোবিন্দপাদের গুরু আচার্য্য গৌড়পাদের নিকটে তিনি প্রথমে বিদ্যা শিক্ষা মানসে গমন করেন; কিন্তু বার্দ্ধক্য জনিত অপটুতা নিবন্ধন গৌড়পাদ স্বয়ং অধ্যাপনে অসম্মত হন এবং গোবিন্দপাদের নিকট প্রেরণ করেন। অধিকন্তু তাঁহাকে দুর্জ্জয় বৌদ্ধ বিজয়ের জন্য সচেষ্ট হইবার উপদেশ প্রদান করেন। সৎক্ষেত্রে পতিত বীজ যেমন যথাকালে অঙ্কুরিত হয়, তেমনি শঙ্করের হৃদয়-নিহিত গৌড়পাদের সেই উপদেশ-বীজ উপযুক্ত সময় পাইয়া কার্য্যোন্মুখী হইল। তিনি বৌদ্ধ বিজয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি প্রধানতঃ বৌদ্ধেরই অভিমত লোকপ্রিয় বিজ্ঞান-বাদ অবলম্বন করিলেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে, বৌদ্ধ বলেন—প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-বিনাশশীল বুদ্ধি-বিজ্ঞানই আত্মা। শঙ্কর বলিলেন—বিজ্ঞান যে আত্মা, একথা সত্য, কিন্তু সে বিজ্ঞান ক্ষণিক বুদ্ধিবৃত্তি নহে; পরন্তু "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি কথিত নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বিজ্ঞান। বৌদ্ধ বলেন,—দৃশ্যমান বাহ্য জগৎ সত্য নহে, ইহা কেবল আন্তর বুদ্ধি বিজ্ঞানের বিলাস বা কল্পনা মাত্র।

শঙ্কর বলিলেন,—বাহ্য জগৎ—কেবল বাহ্য জগৎ কেন, ব্রহ্মেতর পদার্থ মাত্রই অসত্য বা মিথ্যা বটে; কিন্তু তা বলিয়া তোমার আমার কল্পনাপ্রসূত নহে। পরন্তু "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতি বোধিত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের সঙ্কল্প প্রসূত। বৌদ্ধ বলেন,—বুদ্ধি বিজ্ঞানের প্রবাহ বিচ্ছেদই জীবের মুক্তি। শঙ্কর বলিলেন,—মুক্তিতে বুদ্ধি-বৃত্তির বিচ্ছেদ ঘটে সত্য, কিন্তু তোমার মতে বুদ্ধি বিজ্ঞানই যখন আত্মা এবং বিজ্ঞানের প্রবাহ বিচ্ছেদে যখন আত্মারও উচ্ছেদ বা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; অথচ আত্মোচ্ছেদ যখন কাহারো কাম্য বা প্রার্থনীয় হইতে পারে না বা হয় না, তখন বিজ্ঞান প্রবাহের বিচ্ছেদকে কখনই মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে পারে না। অতএব "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতি সম্মত ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই মুক্তি। এবম্বিধ যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য নিবন্ধন কেহ কেহ শঙ্করের মতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবচ" ইত্যাদি।

আচার্য্য শঙ্কর আপনার অভিমত অদ্বৈতবাদ দৃঢ়ী করণার্থ প্রসিদ্ধ ও সারগর্ভ কতিপয় উপনিষদের ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শনের এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর প্রসন্ন গভীর বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই সমস্ত ভাষ্য মধ্যে বিবিধ শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির সাহায্যে বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন।

অনেকের বিশ্বাস শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈতবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদের নাম গন্ধও ছিল না। বস্তুতঃ এরূপ ধারণা অমূলক ভিত্তিহীন। শঙ্করের বহুকাল পূর্ব্বেও অদ্বৈতবাদের যথেষ্ট প্রচার ও প্রতিপত্তি ছিল। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও স্বমত সমর্থনের জন্য ভগবান উপবর্ষের মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং শঙ্করের পরম গুরু গৌড়পাদ কৃত মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকায় অদ্বৈতবাদের বিশেষ সমর্থন রহিয়াছে। অধিক কি, অতি প্রাচীন যোগবাশিষ্ট ও মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থেও অদ্বৈতবাদ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর কেবল চির পরিচিত সেই সিদ্ধান্তটিকেই নূতন ছাঁদে ঢালিয়া পরিবেশন করিয়াছেন মাত্র।

আলোচ্য অদ্বৈতবাদের প্রধান বিষয় তিনটী (১) ব্রহ্ম সত্যং, (২) জগন্মিথ্যা, (৩) জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ। (১) ব্রহ্মের সত্যতা (২) জগতের মিথ্যাত্ব, (৩) ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নত্ব। এই তিনটী মাত্র বিষয় লইয়াই অদ্বৈতবাদ পরি-

সমাপ্ত হইয়াছে। অদ্বৈত মতে ব্রহ্মের লক্ষণ দুই প্রকার। (১) স্বরূপ লক্ষণ (২) তটস্থ লক্ষণ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি স্বরূপবোধক বাক্যগুলি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্ম নির্গুণ নির্ব্বিশেষে বাক্য ও মনের অতীত, তাঁহাকে কোন শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না এবং সাধারণ মনের দ্বারাও ধারণা করা যায় না। এইজন্য "নৈব বাচা ন মনসা দ্রষ্টুং শক্যো ন চক্ষুষা" "অস্থূলং অনণু" "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" ইত্যাদি শ্রুতিও কেবল নঞ্. ঘটিত শব্দ দ্বারা নিষেধ মুখে তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মের অপর লক্ষণটী তটস্থ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ লক্ষিত ব্রহ্ম সগুণ বা সবিশেষ। যেমন "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি। এই সবিশেষ ব্রহ্মই জগৎ কারণ ঈশ্বর। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, যদিও শ্রুতিতে ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয় ভাবই বর্ণিত আছে, তথাপি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদনই শ্রুতির তাৎপর্য্য। সবিশেষ ভাবটী মায়া কল্পিত, কেবল উপাসনার উপযোগী মাত্র, নির্ব্বিশেষ ভাবই সত্য।

জগৎ মিথ্যাত্ব

অগ্নির অন্তর্নিহিত দাহিকা শক্তির ন্যায় সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মেরও অন্তর্নিহিত একটী শক্তি আছে, সেই শক্তির নাম মায়া। অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রকৃতি প্রভৃতি ইহারই নামান্তর মাত্র। বেদান্তের মায়া আর সাংখ্যের প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। সাংখ্যের প্রকৃতি জড় পদার্থ হইলেও নিত্য সত্য ও স্বতন্ত্র; কিন্তু বেদান্তের মায়া অনাদি হইলেও অসত্য তুচ্ছ পদার্থ এবং পরতন্ত্র বা ঈশ্বরাধীন। অদ্বৈতবাদীর মায়া সৎ বা অসৎ নহে, তবে জ্ঞান বিরোধী বটে। কিন্তু জ্ঞানের অভাব নহে এমন কোন এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। এই মায়া শক্তির সহযোগেই ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব—ঈশ্বরত্ব উপস্থিত হয়। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন,—"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্," মায়াকে প্রকৃতি আর মায়োপহিতকে ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। কথিত মায়ার আবার দুই প্রকার শক্তি আছে। একটীর নাম আবরণ শক্তি, অপরটির নাম বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ শক্তি দ্বারা প্রথমে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সমাবৃত হয়, অনন্তর বিক্ষেপ শক্তি তদুপরি অপর একটী অবস্তুভূত বস্তু সৃষ্টি করিয়া দেয়। প্রথমে সম্মুখস্থ রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপটী অজ্ঞানে আবৃত হয়, দৃষ্টি গোচর হয় না; পশ্চাৎ সেই রজ্জুতে অপর একটী বস্তুর সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়, তখন রজ্জুই সর্প হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ শক্তিদ্বয় সমন্বিত মায়া স্বীয় শক্তি প্রভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ সমাবৃত করিয়া

ঈশ্বরত্ব বা সবিশেষ ভাব সমুৎপাদন করে। লূতা (মাকড়সা) যেমন অপর কোনও বাহ্য বস্তুর সাহায্য না পাইয়া আপনার শরীর হইতে সূত্র নিষ্কাশিত করিয়া বিচিত্র জাল প্রস্তুত করিয়া থাকে, তেমনি শক্তিদ্বয় সমন্বিত মায়োপহিত ঈশ্বরও এই বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দৃশ্যমান জগৎ মায়ার পরিণাম হইলেও ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র, সুতরাং নিজে অসত্য অবস্তু হইলেও পরমার্থ সত্য ব্রহ্মের সত্ত্বায় সত্ত্বাবান্ হইয়া লোক ব্যবহারে উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। জীব যতদিন ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎ না করিবে, ততদিন তাহার পক্ষে এই জগৎ সত্যবৎ প্রতিভাত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ।

অর্থ]

ব্রাহ্মণ।

হে ব্রাহ্মণ! হিমাদ্রি-শিখরসম ভারতের দীপ্ত শিরোমণি!
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির চেয়ে দেখ, আজিকার পঙ্কিল ধরণী।
কাতরে তোমারি পানে চেয়ে আছে, অপমানে মৌন নতশির।
আজিকার এ দুর্দ্দিনে, তুমি তারে স্বচ্ছ শান্ত উদার গম্ভীর।
বেদ মন্ত্র গাহি, পঙ্ক হ'তে তুলি ধর, মুছে দাও সব ব্যথা।
অকলঙ্ক দৃষ্টি দিয়ে ধৌত কর আজন্মের মৌন আবিলতা।
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে। হে ব্রাহ্মণ! মনে পড়ে সেই লগ্ন বেলা;—
যেদিন প্রথম সেই ঊষাখানি জেগেছিল, নিতান্ত একেলা।
উচ্চ হিমাচল শিরে, চরণে শিহরেছিল প্রণমিতা মূক।
বসুমতী, তুমি সেথা সদ্যঃস্নাত সৌম্যকান্তি অকলঙ্ক-মুখ।
বিপুল সে ঊষালোকে গেয়েছিলে কি প্রশান্ত—কি উদাত্ত গান!
অমনি চরণ তলে পঞ্চনদে জেগেছিল কি বিপুল প্রাণ!
মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন ঈশাণ কোণে প্রথম সে মেঘ;—
উঠেছিল পুঞ্জীভূত জলভারানত, তোমার পুলকাবেগ।
সেদিন আপনাহারা হৃদয়ের দ্বার খুলি, অনন্তের সাথে,—
ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছিল কি বিপুল গান! আজিও সে কল্পনাতে।

হৃদয় মূরছি পড়ে,—ভক্তি-নত, সেদিনের চরণের তলে।
মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন এ নিখিলের অনন্ত কল্লোলে।
তোমার সৌন্দর্য্য-গীতি,—অনন্তের পূর্ণ অনুভূতি সগৌরবে,—
মিশেছিল, তোমার অমর-গীতে অমরতা পেয়েছিল সবে।
সেইদিন জলে, স্থলে, সরোবর-পদ্মাকরে, সূর্য্য চন্দ্রালোকে,
ওষধিতে, দেবতা প্রত্যক্ষ করি, উঠেছিল শিহরি পুলকে।
আজিও এ দুর্দ্দিনের অশ্রুধারা মাঝে, সগৌরবে, হে ব্রাহ্মণ!
দাঁড়াও আসিয়া, বিশ্বাসে অটল, প্রেমপূর্ণ, ভক্তি-নত মন।
অন্তরে বাহিরে মাখি' ধৌত পবিত্রতা, চন্দন চর্চ্চিত-কান্তি,—
শিরে জটাভার, হৃদয়ে পূরিয়া ল'য়ে কর্ম্মের পরম শান্তি।
ভুবনে রচিয়া তুল আবার সে শান্ত তপোবন, সামগানে,—
পূর্ণ করি নভস্তল, সঞ্চারিয়া প্রেমধারা নিখিলের প্রাণে।
আজিকার ধরণীতে পঞ্চনদ কলকণ্ঠে গেয়ে যাবে ধীরে।
প্রথম সে ঊষাখানি দেখা দিবে আজিকার গগনের শিরে।
তোমার চরণতলে লুটিয়া পড়িবে সবে ভক্তি-অবনত।
তোমার চরণধূলি মাথিয়া অমর হবে দেবতার মত।

শ্রীজগত্তারণ দাস।

অর্থ]

ঊর্দ্ধবাহু।

সে সময়ে মনটা বড়ই অস্থির। একটা অন্তর্দ্দাহ যাতনা ও শূণ্যতাব্যঞ্জক ব্যাকুলতায় জীবনটা তখন একরূপ ধর্ম্মহীন, উদ্দেশ্য বিহীন ও অবলম্বনশূন্য ছিল। হইবারই কথা, হাল ফ্যাসান অনুযায়ী যত কিছু অনাচার, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অগম্যা-গমন, পরচর্চ্চা, কুৎসা ও কুৎসিৎ আমোদ প্রভৃতি সকলেই যেমন করিয়া থাকে, আমিও তদ্রূপই করিয়াছি। সকলেরই মত ঐরূপ কার্য্যাবলীর জন্য যেরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি করা উচিত, তার কোনটাই করি নাই; তাহার ফলে এই অনির্দ্দেশ্য আকুলতা, অন্তর্দ্দাহ ও মানসিক প্রদাহ। চিত্তভার কথঞ্চিৎ লাঘবের নিমিত্ত সায়ং সন্ধ্যায় নদীতীরে বসিয়া থাকিতাম। পার্শ্বেই শিবমন্দির ও

সম্মুখে স্নানের ঘাট। ঘাটে বসিয়া প্রাচীনেরা অনেকে সন্ধ্যা-বন্দনা ও শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া মধ্যে মধ্যে শান্তিও পাইতাম।

ঘাটে মধ্যে মধ্যে দু'একটী সাধু আসিয়া থাকিতেন। কেহ কেহ দু'একমাসও থাকিতেন। সেই সময়ে একজন উর্দ্ধবাহু অবস্থান করিতেছিলেন। সাধুদের ন্যায় যথারীতি ধূনা, ভস্ম, আশা, চিম্‌টী প্রভৃতি জাঁকজমকের কোনই অপ্রতুল ছিল না। লোকও জুটিত, তবে অধিকাংশই গঞ্জিকার প্রত্যাশায়; সুতরাং আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের পক্ষে নিকট বা দূর হইতে দর্শন করা ছাড়া আর কোন উপকারিতা আশা করা বাতুলতা মাত্র। বিশেষতঃ এই সকল উর্দ্ধবাহু প্রভৃতি সাধুর দলকে কখনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিতাম না। পূর্ব্বকথিত উর্দ্ধবাহুটী মৌনী; কিন্তু কি জানি কেন এই সাধুটীর প্রতি কতকটা আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম! তাঁহার মুখে কেমন একটা পূর্ণ প্রসন্নতা, সৌম্য, শান্তি ও সৌন্দর্য্য ছিল। চোখে এমন একটা উদাস লালিত্যমাখা ভাব ছিল, যাহাতে সহজেই বোধ হইত যেন ইনি এমন একটা কিছু স্বর্গীয় বা অপার্থিব বস্তু বা ভাব পাইয়াছেন,—যাহাতে এই শোক-দুঃখময় সংসারের সমস্ত জ্বালা-মালা ও অভাব অভিযোগ বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

তাঁহার সহিত একটু ঘনিষ্ঠ ভাবেই মিশিয়া পড়িলাম। মধ্যে মধ্যে বহু বিষয় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ও আলাপ হইত। কথাবার্ত্তা শব্দটা ঠিক হইল না, কেননা তিনি মৌনী। আমাদের যা কিছু মনো-বিনিময় চোখে চোখেই হইত। ইহাতে কোন অসুবিধাই ঘটিত না; কেননা বৈখরী বাকের মধ্যস্থতা আশ্রয় না করিয়াও, আলাপ অনেক সময়েই অধিকতর দ্রুত ও স্পষ্টভাবেই নিষ্পন্ন হইত। যাঁহাদের মূক বধির আত্মীয় স্বজন আছেন, তাঁহারাই বুঝেন যে বিনা বৈখরী বাক্-সাহায্যে কিরূপে স্পষ্ট ও দ্রুতভাবে সকল বিষয়ক কথাবার্ত্তাই কহিতে পারা যায়। একদিন নিভৃতে তাঁহাকে আমার চিত্ত-বৈকল্যের কথা জানাইলাম। সাধু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে উপদেশ লিখিয়া দিবেন। তৎক্ষণাৎ কাগজ কলম সংগ্রহ করিয়া দিলাম, সময় পাইলেই একাগ্র চিত্তে অনর্গল লিখিয়া যাইতেন। দুই তিন দিন পরে লেখা শেষ হইলে, আমাকে সেইটা বাড়ীতে লইয়া গিয়া পড়িবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

"আমার নিবাস বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার মধ্যবর্ত্তী দামোদর তীরস্থ তিলুটী গ্রামে। আমি পল্লীগ্রামের স্বচ্ছল সংসার-ভুক্ত অর্দ্ধশিক্ষিত নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণ

যুবক; কাজেই দৈনিক ও সাধারণ জীবন কিরূপভাবে অতিবাহিত করিতাম, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমি গল্প বা উপন্যাস লিখিতে বসি নাই; অথবা আমার গত জীবনের কলঙ্কিত কাহিনীর পুনরুল্লেখ করিয়া কাহাকেও চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধ করিবার প্রবৃত্তি নাই; তবে যতটুকু উল্লেখ করা আবশ্যক, এস্থলে কেবল ততটুকুই অতি সংক্ষেপে বলিয়া যাইতেছি।

ললিতার নিবাস আমাদেরই গ্রামে; সে আমার দূর সম্পর্কে আত্মীয়া। তাহার স্বামী বিনোদ পশ্চিমে কন্‌ট্রাক্টরী করিত। তাহার বাটীতে অন্য অভিভাবক বা লোকজন না থাকায়, আমাদেরই উপর তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল। ললিতা যুবতী ও সুন্দরী; সুতরাং অগ্নি ও ঘৃতের একত্র সংযোগে যে ফল হয়, তাহাই ঘটিল। উভয়েই দ্রুত পাপের পিচ্ছিল পথে নামিয়া গভীর পঙ্কে পড়িলাম। গুপ্ত প্রণয়—নবীন কামজ অনুরাগ; অতৃপ্তি নাই—বাধা বিপত্তি নাই। কিন্তু এ সকল বিষয়ে লোক যতই বুদ্ধিমত্তার সহিত সাবধানতা অবলম্বন করুক না কেন, তাহা প্রকাশ হইয়াই পড়ে। লোকে এ বিষয় লইয়া কাণাকাণি ও সমালোচনা আরম্ভ করিল, প্রকারান্তরে স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে আমাদেরও দু'চার কথা শুনাইতে লাগিল; তাহাতে কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করিলাম না।

সংবাদ আসিল বিনোদ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে এবং শীঘ্র আসিয়া ললিতাকে তাহার কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবে। এই সংবাদ আমাদের মস্তকে আকস্মিক বজ্রাঘাতের ন্যায় হানিয়া পড়িল। এখন উপায়! আমি ললিতাকে—অথবা ললিতা আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে কি না? আমি ললিতাকে প্রাণের সহিত চাই, অথবা জগৎ সংসার বন্ধু-বান্ধব চাই? ললিতা আমাকে চায়, কিম্বা স্বামী চায়। বিচারে সাব্যস্ত হইল, আমাদের উভয়ের বিচ্ছেদ অসম্ভব, অসহ্য ও মৃত্যুবৎ; সুতরাং যেরূপে হউক, নিষ্কৃতিই বাঞ্ছনীয়। এক উপায়, বিনোদ আসিবার পূর্ব্বেই দূরদেশে গোপনে পলায়ন এবং দম্পতির ন্যায় বসবাস। তাহাতেও কিন্তু অনেক গোলযোগ, ভবিষ্যতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা,—অর্থাভাব ও লোক-লাঞ্ছনা।

আর একটা গুরুতর সঙ্কল্প. মস্তিষ্কে গজাইয়া উঠিল। এটী যেমন ভীষণ, তেমনি কদর্য্য! যদি বিনোদের আগমন-বার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, আসিবার রাত্রেই তাহাকে ইহজগত হইতে সরাইয়া ফেলিতে পারা যায়, তাহা

হইলে একেবারেই নিষ্কণ্টক। কতকগুলি সুবিধাজনক যোগাযোগও ঘটিল; কেননা ঘটনাক্রমে বিনোদ যখন গ্রামে আসিবে, তখন রাত্রি গভীর! আর তার আগমন সংবাদ গোপন রাখাও সম্পূর্ণরূপে ললিতার আয়ত্তাধীন। সঙ্কল্প যেমন উদ্ভট ও দুরূহ, কার্য্যে পরিণত করাও ততোধিক বিষম ও ভয়-সঙ্কুল।

ভয়, উদ্বেগ, উৎসাহ, আশা, পরিণাম, ভবিষ্যৎ, সন্দেহ ও বিবেকে বারম্বার বিচলিত হইতে লাগিলাম। কামান্ধ আমরা, তাই ইহার অপর বা কুফলের দিক্ মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠিল না। সঙ্কল্প স্থির হইলে ব্রতী হইবার জন্য আবশ্যকানুযায়ী পুরশ্চরণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কুহকিনী আশা মরীচিকার জাল বিস্তার করিয়া কর্ণে বিষরাশি ঢালিয়া দিয়া উৎসাহ দিল,—ইহাই প্রকৃত পন্থা; একেবারে নিষ্কণ্টক হইয়া সমাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অর্থবলে সকল লালসায় অজরামরবৎ তৃপ্তি সাধন ঘটিবে। স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! ললিতাও ইহাতে সায় দিল এবং সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি অগ্রগামী হইয়া রাণীগঞ্জ ষ্টেসন হইতে বিনোদকে অর্ভ্যথনা করিয়া, একখানা গোশকটে আরোহণপূর্ব্বক গভীর রাত্রে গ্রামে পৌঁছিলাম। পথে আসিতে আসিতে তখনো সন্দেহদোলায় দুলিতেছিলাম; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সঙ্কল্প ও মন স্থির হইয়াছিল। সন্দেহে স্তিমিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও দৃঢ়ভাবে মনোমধ্যে বসিয়া গেল। ভগবানের কৃপায় এখনো পর্য্যন্ত বাধা ঘটিল না, গ্রামের কেহই তার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিল না। বিস্তারিত বলিবার কোন প্রয়োজন নাই; সঙ্কেত মত ললিতা দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিবামাত্র, তুচ্ছ উদ্দাম এবং যৌবনের প্রলোভনে ও কামজ-মোহের তাড়নায় মুহূর্ত্ত মধ্যে নিরপরাধ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্ত নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ও আত্মীয় নাশ করিলাম। যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের সহিত বিনোদের মৃতদেহ উদ্যান মধ্যে গভীর গহ্বরে প্রোথিত করিয়া, রক্তাক্ত বস্ত্র কতক ধৌত—কতক বা নদীবক্ষে পুঁতিয়া ফেলিলাম।

সাময়িক উত্তেজনার প্রশমন হইবামাত্র, সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ, ভয়, লজ্জা ও পরিণাম আশঙ্কায় ঘেরিয়া ফেলিল। চক্ষুদ্বয় রক্তিম ও কি যেন একটা অবসন্ন ও মত্তভাব। দুই তিন দিবস দিনের বেলায় বাহির হইতে বা লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলাম না। এইরূপ পাপ সঙ্কল্প ও কার্য্যে চির-অনভ্যস্ত—আমার অত্যন্ত অনুতাপ জাগিল। সম্মুখে লোক আসিলেই ভয় হইত, বুঝিবা জানিতে পারিয়াছে, তাই ধরিতে আসিতেছে; ক্রমে নিশ্চিন্ত হইলাম।

কোথা হইতে ধর্ম্মের ঢাক অলক্ষ্যে বাজিয়া উঠিল। বুঝিলাম এইবার বুঝি পরিত্রাণ নাই, পাপের সাজা হাতে হাতে ফলিবার উপক্রম। রাণীগঞ্জের পথে বিদেশাগত গো-শকট দেখিয়া একটা চোর আমাদের পাছু লইয়া বাটীর ভিতরে আসিয়া লুকাইয়াছিল। সে বেচারা চুরি করিবে কি, আমাদের বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া তার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। ভয়ে ভয়ে, তিন লম্ফে একেবারে গ্রাম ছাড়া। কি জানি কি ভাবিয়া, সম্ভবতঃ পুরস্কারের লোভে থানায় গিয়া এই সুসম্বাদ প্রদান করে! দারোগাবাবু মামুলী প্রথায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া মন্থর গতিতে—নবাবী চালে তদন্ত আরম্ভ করিলেন। লাস বাহির হইল,—আট দশ খানা গ্রাম জুড়িয়া হুলস্থূল, সমালোচনা, মন্তব্য, হৈ চৈ পড়িয়া গেল। লোকে চকিতে ব্যাপারখানা আদ্যোপান্ত বুঝিয়া লইল। গ্রামের মধ্যে আমাদের পোড়ার মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল। তবে একটা নূতন কথা শুনা গেল যে, গ্রামের প্রায় সকল জ্ঞান-বৃদ্ধই এইরূপ প্রণয়ের যে এইরূপ পরিণাম ঘটিবে, তাহা নিশ্চিতরূপেই জানিয়া ও বুঝিয়াছিলেন। তবে প্রকাশ করিলে হঠাৎ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নাম জাহির হইবার আশঙ্কায় কেহই ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করেন নাই। ভরসার মধ্যে আমাদের যথেষ্ট অর্থবল ও লোকবল ছিল; সুতরাং সকলকেই কদলী প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

প্রবল তদ্বিরের জোরে ললিতা আসামী না হইয়া কেবল সাক্ষী শ্রেণীভুক্তা হইল; কিন্তু অন্য উপসর্গ আসিয়া আমাকেও অবশেষ জড়াইয়া ধরিল। নদীবক্ষে যে কাপড়গুলি পুঁতিয়াছিলাম, তাহারই একখানা কোনক্রমে ভাসিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পুলিশের হাতে গিয়া পৌঁছায়; তাহারই রক্ত চিহ্ন ও ধোপার দাগে আমিও গ্রেপ্তার হইলাম। মোকদ্দমা দাঁড়াইল—ইচ্ছাকৃত নরহত্যা; আমি মূল আসামী এবং সেই চোর সহায়ক। বিপুল অর্থব্যয়ে ও তদ্বিরের জোরে দায়রার বিচারে প্রমাণাভাবে আমি খালাস পাইলাম; কিন্তু চোরটার দ্বীপান্তর হইল।

দীর্ঘ হাজত বাসের পর মুক্তি পাইয়া দুই চারি দিন মুখ দেখাইতে পারিলাম না। তখন সর্ব্বস্বান্ত; সুতরাং মান, সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও চাটুকারের দল সরিয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট শুধু সমাজে লাঞ্ছনা ও অপমান। কিন্তু ললিতার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক লাগিল। অবসর ক্রমে দুই চারিটী নাগর জুটিয়াছে; তাহার মন হইতে আমার স্থান মুছিয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ক্রোধ

অপমান ও ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। কি,—এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার কার্য্যের এই ব্যবহার—এইরূপ প্রতিদান? যার জন্য আমি নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইলাম, কারাযন্ত্রণা, লোকগঞ্জনা, সমাজে কলঙ্কভাগী ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িলাম, তার কি না এই প্রতিফল? কথায় কথায় একদিন ললিতার সঙ্গে প্রবল কলহ ঘটিল। রাগের মুখে সেও আমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল;—বলিল আমিই ত' তাহার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছি! তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া কুলে কালি দিয়াছি, স্বামীর অপঘাত মৃত্যু ঘটাইয়া, অকালে বিধবা ও সমাজে কলঙ্কিনী করিয়াছি! আমার জন্যই ত' তাহার এই দুর্দ্দশা।

বিষম ক্রোধ ও প্রতিহিংসা চাপিল। রোষভরে ভাবিলাম,—"যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর!" আচ্ছা, ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূরে দেখি। আমি সর্ব্বস্বান্ত ও চরম লাঞ্ছিত হইয়াছি; একটা খুন করিয়াছি, না হয় আর একটা খুন করিয়া ফাঁসি যাইব। এ অপমানের প্রতিশোধ লইবই—লইব!

কুলটা স্ত্রীলোক অসাধারণ বুদ্ধিমতী! আমার ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, গতিক ভাল নয়; সেইজন্য বোধ হয় সেও প্রস্তুত ও সতর্ক হইয়াছিল। একদিন এ বিষয়ের একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছি; এমন সময় হঠাৎ দুই তিন জন লোক নিমেষে আমার মুখ চোখ বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া গেল। তারপর প্রহার—বিষম নির্দ্দয় প্রহার! একবার ভাবিলাম ঠিকই হইতেছে; যেমন কর্ম্ম—তেমনি ফল! আমারই পাপের সাজা হইতেছে! প্রহারের গুরুত্বে পড়িয়া গেলাম; যন্ত্রণা অসহ্য হইলে ইচ্ছা হইল তাহাদের পায়ে ধরিয়া বলি ক্ষমা কর, আর আমি দেশে থাকিব না বা তোমাদের সুখের পথে কণ্টক হইব না; কিন্তু মুখ বন্ধ মনের ভাষা মনেই রহিল। অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, তারপর কি ঘটিয়াছিল জানি না।

যখন জ্ঞান হইল, তখন বর্দ্ধমানের হাঁসপাতালে। সর্ব্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; শরীরের নানাস্থান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। পরম্পরায় শুনিলাম, নদীজলে আমাকে মৃতবৎ অবস্থায় দেখিয়া, কয়েকজন ইতর ব্যক্তি অনুকম্পা পরবশ হইয়া হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

চিকিৎসায় প্রাণ পাইলাম; কিন্তু মনে হইল যেন প্রাণ না পাইলেই ভাল ছিল। একেবারে সকল চিন্তার কারণ ও স্মৃতি হইতে মুক্তি পাইতাম। তখনও শরীর বিকলাঙ্গ—দেহের নানাস্থানে ব্যথা ও বক্রতা। কি করি, কোথায় যাই, আকুল দুর্ভাবনায় পড়িলাম! আর দেশে ফিরিতে প্রবৃত্তি হইল না; রোগ ভোগ এবং যন্ত্রণায় শরীর ও মন এত দুর্ব্বল যে, প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছাও জাগিল না। একবার ভাবিলাম আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই, কিন্তু সম্ভবতঃ প্রাণের মায়ার জন্যই সে ইচ্ছা একবার জাগিয়া তখনই নিবিয়া গেল।

বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই আশ্রয় চাই, আহার্য্য চাই;—তাহাই বা কিরূপে

জুটে! দীঘির পাড়ে বসিয়া অনাহারে এক মনে সমস্ত দিন নানা প্রকার চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম যে, দেশে যাইব না; গঙ্গাতীরে কোন স্থানে সাধুসঙ্গে সাধন ভজন করিয়া ভিক্ষান্নে দিন যাপন করিব। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। সহজভাবে চলিবার শক্তি নাই, কোনরূপে বসিয়া বসিয়া—গড়াইয়া গড়াইয়া যাইতে লাগিলাম। সে ভ্রমণ যে কি কষ্টকর, তাহা বলিতে পারি না! ভাবিলাম আর না,—এরূপ করিয়া অনাহারে চলিতে পারিব না। একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া গ্রামে চলিয়া যাই; কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইবে। সৌভাগ্যক্রমে কাল্‌নাযাত্রী জনৈক ব্যবসায়ী দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার গরুর গাড়ীতে আশ্রয় প্রদান করিলে নিরাপদে কাল্‌নায় পৌছিলাম।

পাপের ভোগ ও যন্ত্রণা আরম্ভ হইল! অনভ্যস্ত শারীরিক ক্লেশ ও অনাবৃত স্থানে জীবন-যাপনের জন্য, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, দেহের ব্যথা ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গীন বাতে পরিণত হইল, সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠিল;—চলৎশক্তি বিহীন হইলাম। রুগ্ন দেখিয়া ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনা হইতে দূর করিয়া দিল, পার্শ্বস্থ একটা ভগ্ন গৃহে আশ্রয় লইলাম। শরীরের দু'এক স্থানে কাটিয়া ক্ষত হইল, কিন্তু সে ক্ষত না সারিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পচিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে বুঝিলাম, সাধারণ ক্ষত নহে, ভীষণ কুষ্ঠব্যাধি।

যন্ত্রণা চরমে উঠিল, সে যন্ত্রণা অব্যক্ত; ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! কি ভীষণ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে দিনের পর দিন, রাত্রের পর রাত্রি কাটাইয়াছি, তাহা ভাবিতে গেলে এখনও হৃৎকম্প হয়। লোকে নিকটে আসিত না, দেখিবামাত্র দূরে সরিয়া যাইত। চলচ্ছক্তি বিহীন! প্রখর সূর্য্যতাপে অসহ্য কষ্ট হইলে, কোনরূপে এক আধবার পাশ ফিরিতাম। বস্ত্রাভাবে শীতের কম্পনে যন্ত্রণা ভীষণতর হইত! কখনও কখনও আপনার মনে চীৎকার করিতাম,—কাঁদিতাম; কখনও বা লোক দেখিলে কাতর দৃষ্টিতে তারস্বরে তাহাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতাম। কেহ বা বিরক্ত হইয়া ঘৃণাভরে চলিয়া যাইত, কেহবা দু'একটা পয়সা, কখনও কিছু খাদ্যদ্রব্য বা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য গঙ্গাজল দিয়া যাইত। কখনও কখনও লোকেরা বলাবলি করিত, এ বেটা নিশ্চয়ই মহাপাপী! নহিলে এত কষ্ট পাবে কেন? কখনও তাহাদের মন্তব্য শুনিতাম, কখনও বা শুনিতাম না।

অবস্থা-বিপাকে সেই স্থানেই মল মূত্র ত্যাগ করিতে হইত। ক্রমশঃ দুর্গন্ধে সে স্থান দিয়া লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া উঠিল; এমন কি আমার নিজেরই তিষ্ঠান অসম্ভব হইল! কিন্তু উপায় নাই, নিজের অদৃষ্ট ও কর্ম্মফলকে ধিক্কার দিতাম! বুঝিতাম আমিই আমার এই দুরবস্থার কারণ। পাপের জন্য পাপীর যথোচিত সাজা হইতেছে, নহিলে জগৎ সংসার টিকিবে কেন? ভগবানের অ-পক্ষপাত বিচারে শ্রদ্ধান্বিত হইতাম; আবার কখনও ভগবানের উপর মহা ক্রোধ হইত, উদ্দেশে গালি পাড়িতাম। সত্য কি জগতে আমিই একা পাপী?—আমার ন্যায় কি আর পাপী নাই? তাই বা কেন, আমার ন্যায়—আমাপেক্ষাও

মহা মহা পাপী সকল রহিয়াছে, কৈ তাহাদের বেলা তং সাজার নামও দেখি না। চার্ব্বাকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, হাসিয়া-খেলিয়া, নাচিয়া-কুঁদিয়া বেড়াইতেছে! ক্রমে যথার্থই অসহ্য হইল! প্রার্থনা করিলাম, ভগবান্ মুক্তি দাও! হয় উপশম কর, না হয় শেষ করিয়া দাও! যদি সেই মুহূর্ত্তে বজ্র বা সর্পাঘাত হইত, তাহা হইলেও আনন্দিত হইতাম!

ইচ্ছা হইল গড়াইয়া গড়াইয়া কোনরূপে নদীতে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিই; কিন্তু প্রাণের মমতা—মহা মমতা! এত দুর্ব্বিপাকেও প্রাণের মমতা, কাল্পনিক আশা এবং আমার 'আমিত্ব' জনিত সুখ লোপ পায় নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, আত্মীয়, স্বজন, নাম, যশ, সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্য-সম্পদ্ যাহা কিছুই চাহি না কেন, সবই আমার অন্তরস্থ 'আমিটীর' তৃপ্তির জন্য। আমার সেই প্রচ্ছন্ন 'আমি'টীকে যত চাই ও ভালবাসি, এত আর কাহাকেও নহে—কিছুর জন্যও নহে। বলা বাহুল্য ভবিষ্যতের জন্য মধ্যে মধ্যে ভিক্ষালব্ধ পয়সাগুলিও জমাইয়া রাখিতাম।

অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, যে কারণে মঙ্গলময়ের রাজ্যে এত ক্লেশ, দুঃখ ও যন্ত্রণার বিধান, তাহা আমার পক্ষে নিরর্থক হয় নাই। যন্ত্রণা আমারও পক্ষে বহু মঙ্গলপ্রসূ হইয়াছিল। উদ্দেশে তাঁহার নাম লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া সময় কাটাইতাম। চক্ষুজলে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার নাম ধরিয়া বারম্বার সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে প্রণিপাত করিতাম বা লুটাইয়া পড়িতাম। রোগে, শোকে, তাপে নর যখন ক্লিষ্ট, শীর্ণ, বিবর্ণ, হতাশ বা অসহায় হইয়া উঠে, সমস্ত পার্থিব অবলম্বন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া হৃদয়ে এক শুষ্ক শূন্যতা অনুভব হয়, তখন সেই অজ্ঞাত-কুলশীল, অজানা, অচেনা ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নাম গুণগানে বা তাঁহারই নামাশ্রয়রূপ অবলম্বনে শান্তি ও সন্তোষ পাইবার চেষ্টা করে। একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিকলচিত্ত বা বিকৃতমস্তিষ্ক না হইলে, কিছু না কিছু পাইয়াও থাকে এবং যত পায় ততই হৃদয়ের শূন্যতা; ভক্তিরসে ততই শুষ্কতা দূর হইতে থাকে। ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া করযোড়ে কায়মনোবাক্যে দিবারাত্রে—অনেক সময়েই উদ্দেশে প্রার্থনা করিতাম,—"হে ভগবান্! মুক্তি দাও, শান্তি দাও, সান্ত্বনা দাও! যে কামজ তাড়নায়,—যে পাপ প্রবৃত্তির বশে,—যে মোহে অন্ধ হইয়া এই সকল দুষ্কার্য্য করিয়াছিলাম, শপথ করিতেছি আর কখন এরূপ করিব না! কখন না,—কখন না।

যদি কখন মুক্তি পাই,—সুস্থ হই ত' আর নয়! আর কখন পাপের ফাঁদে পা বাড়াইব না,—পিচ্ছিল পথে নামিব না। তোমার নাম করিয়া, তোমাকে অবলম্বন করিয়াই পবিত্রভাবে ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিব। বারম্বার এইরূপ কায়-মনোবাক্যে শপথ করাতে, বুঝিলাম চিত্ত দৃঢ় হইয়াছে; আর ভয় নাই। ভবিষ্যৎ প্রলোভন হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ্। আবার হতাশা জাগিত, আবার কাঁদিতাম,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

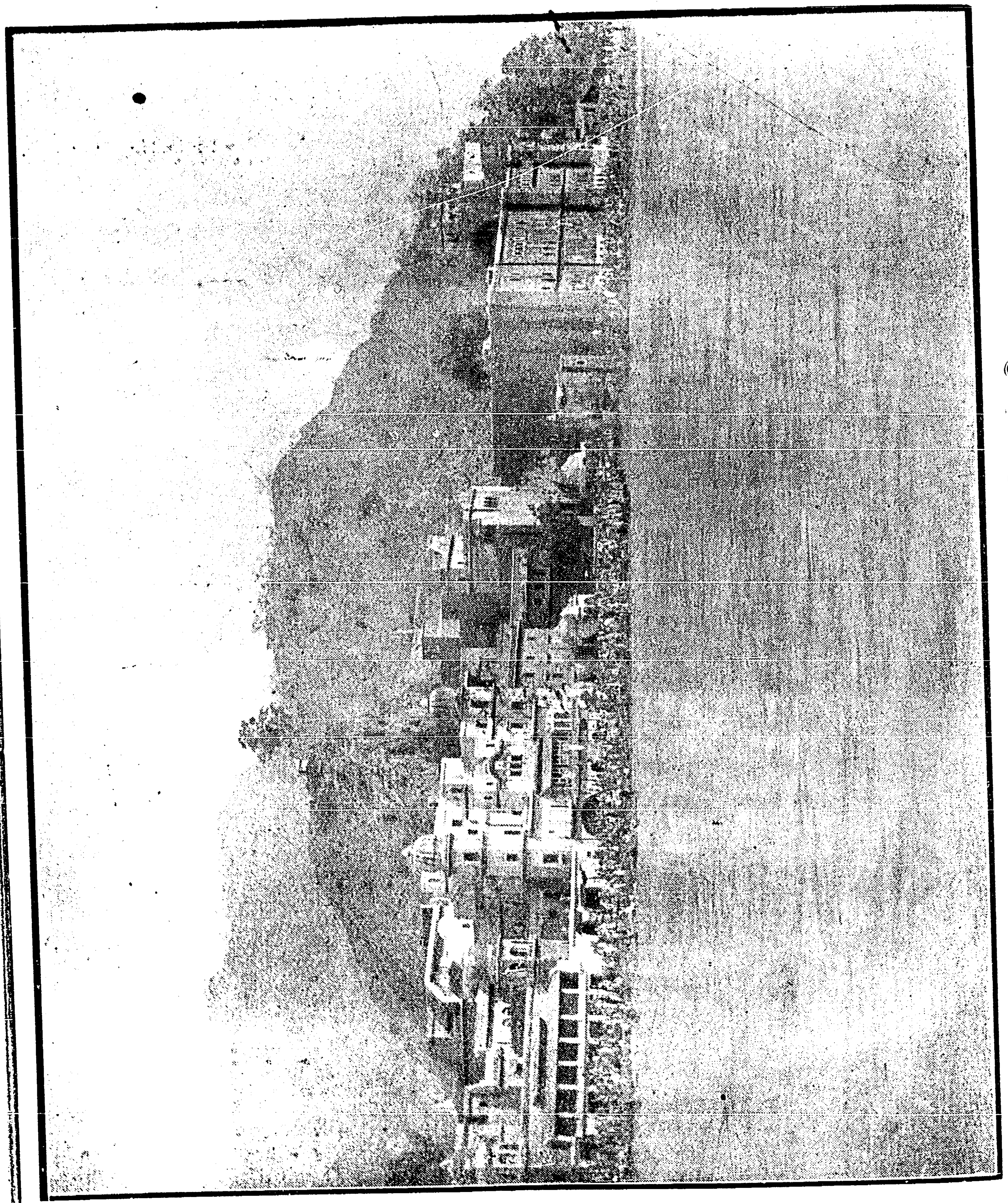

হরিদ্বার দৃশ্য (৩) গঙ্গাতীরে হরিদ্বার নগরী।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স.

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

'য় ভাগ। আষাঢ়, ১৩২১। ৩য় সংখ্যা।

মোক্ষ]

বিপ্রলব্ধা।

[গীত গোবিন্দ।]

১।— ক্ষণপর চেতন পাওল নাহ।
চমকিত নয়ানে সখী-মুখ চাহ॥
লোচন ইঙ্গিতে মাধব সাথ।
কহতহি সজনী রাইক বাত॥

২।— "নিন্দই চন্দন, ইন্দু-কিরণ অনুবিন্দই খেদ-অধীরা,
ভুজঙ্গ-আকর চন্দন-তরুচর বিথ জনু মলয়-সমীরা,—
বোধই সো তুঝ বিরহ-বিকারে।
মদন-বিশিখ ডরি,' তুহার ধ্যান ধরি,' মাধব! প্রেম গভীরা;
নিমজই রসময়ী প্রেম-পাথারে॥

৩।—"তুহার বাস-ভূমি 'তা'কর মরমে মদন বরথে শরজাল।
তুয়া দুঃখ শঙ্কয়ি' উর' পর থাপই জল-ভর কমল-মৃণাল॥

৪।—"অলপ বিলাসময় কুসুম-শয়ন তছু অব যনি স্মর সর-সজ্জা।
তুহার পরশ লাগি' বরত ধরল ধনী তঁহি পর বিগলিত-লজ্জা॥

৫।—বদন-কমলে তছু লোচন-লোতক গলতহি অবিরল ধারে।
চাঁদকি অনু অনু ঝরত সুধা জনু রাহু'ক দশন-প্রহারে॥

৬।—"কুরঙ্গ-মদ রসে লিখতহি কামিনী তুয়া তনু মদন সমান।
দেওত কর'পর অভিনব চুত-শর, পদ-মূলে মকর-নিধান॥
৭।—"লুটয়ি চিত্র-পদ কহতহি প্রতিপদ:— 'হাম তুয়া চরণ-ভিখারী।
তুঁহু যব বিমুখসি, কাহে দহব নহি সুধানিধি শরীর হমারি॥
৮।—"জগতি দুলহ অতি মাধব মূরতি মনমে করত ধিয়ান।
খেণে খেণে রোঅই, প্রলপই, বিলপই"— ভুজঙ্গধর পরমাণ॥

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী॥

নাহ—নাথ;
চাহ—চাহে,
কহতহি—কহিতে;
রাইক—রাধার
বাত—বার্ত্তা;
নিন্দই—নিন্দিছে;
অনুবিন্দই—ভৎ'সিতেছে
চন্দন-তরুচর—চন্দন তরুচারী
বিখ জনু—বিষবৎ;
সমীরা—সমীরকে,
বোধই—বোধ করিতেছে,
সো—সেই (রাধা);
তুঝ—তোমার;
মিমজই—নির্ম্মাণিত হইতেছে
তাকর—তাহার;
বরখে—বর্ষে;
শঙ্কয়ি—শঙ্কা করিয়া;
থাপই—স্থাপিতেছে;
জল-ভর—জলভরা;
তছু—তাহার;
অবযনি—এখন যেন;
শজ্জা—শয্যা;
বরত—ব্রত;
তঁহিপর—তাহাতে;
জনু—যেন;
চিত্র-পদ—চিত্রপাদ;
লুটয়ি—লুটিয়া;
প্রতিপদ—পদে পদে;
বিমুখসি—বিমুখী হইলে;
দুলহ—দুর্ল'ভ;
রোঅই—কাঁদিছে,
পরমাণ—প্রমাণ।

———

মোক্ষ]

সাধনার পথে।

(পঞ্চমানুবৃত্তি)

আজ আমার নিজের কথা তোমাকে কিছু বলিতে চাই। অবশ্য আমার প্রকৃত 'আমি'র কথা বলিতেছি না; উ—ব নামে পরিচিত ব্যক্তির ভিতর সেই 'আমি'র যেরূপ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহারই কথা বলিব। পরমাত্মা হইতে বিবিক্ত করিয়া, মর্ত্ত্যভাবে দেখিলে, সে তোমার ভক্তির অযোগ্য পাত্র, এবং তোমারই মত একজন দুর্ব্বল জীব মাত্র। ভাগবতেই ত' আছে—

যস্য সাক্ষাৎ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য কুঞ্জরশৌচবৎ॥ (ভাগবত ৭।১৫।২৬)

তোমাকে সে পুনঃপুনঃ তাহার ব্যক্তিগত ও মর্ত্ত্যভাবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইতে নিষেধ করিয়াছে; কারণ তাহা হইলে তুমি তাহার কতকগুলি দৌর্ব্বল্য অজ্ঞাতসারে নিজের হৃদয়ে সংক্রামিত করিয়া স্বকীয় বিকাশের পথে বাধা জন্মাইবে। সত্য বটে, সে তাহার সমজাতীয় জনসাধারণের অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুত

পূর্ব্ব লোকসমূহ হইতে কিছু আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু সে সব শুধু যাহারা তাহার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু এবং তাহার বর্ত্তমান জীবনের আকাঙ্ক্ষিত পরিসমাপ্তি, সেই পূজ্যপাদ ঋষিগণের অপার করুণাবশতঃ। এই করুণা যে তাহার উপর বর্ষিত হইয়াছে, তাহার এইমাত্র কারণ যে তাহার হৃদয় প্রেম-প্রবণও কিয়ৎ পরিমাণে ত্যাগোন্মুখ। ইহাই তাহার তথা কথিত আধিকতা; এবং এতদতিরিক্ত সম্মান সে কাহারও নিকট প্রত্যাশা করে না। প্রকৃত তাহার সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কিছু বলা হইলে তাহাতে ক্ষতি আছে। মনে রাখিও ভাই, আমি তোমার সহিত খেলা করিতেছি না, অথবা অন্তঃসারহীন বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত বিনয়ধ্বজিতার ভাব হইতে বলিতেছি না; যাহা সরল সত্য কথা, তাহাই প্রকাশ করিতেছি। তাহা হইলেই তুমি সুপথে চালিত হইবে ও কোন প্রকার আপৎসঙ্কুল ভ্রমে পতিত হইবে না।

***

ধ্যানের বস্তু একটীমাত্র থাকা বিধেয়। এতৎ সম্বন্ধে 'ল' যাহা বলিতেছে তাহা সত্য; কিন্তু তোমার পক্ষে ইহাতে বিশেষ কিছুই আসে যায় না। প্রয়োজন শুধু "একাগ্রতার"—যাহা চিত্ত-বিক্ষেপের ঠিক বিপরীত ভাব—যাহাতে প্রত্যয়ের একতানতা আনে,—যাহাতে প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ "সর্ব্ব"ভাব ত্যাগ করিয়া একত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়,—তাহারই। বস্তুর বহুত্ব (ধ্যেয়ের বহুত্ব) অবশ্যই ঐ উদ্দেশ্যের পরিপন্থী; কিন্তু তুমি যে প্রণালী মতে চলিতেছ, তা'তে বাস্তবিক ধ্যেয়ের বহুত্ব নাই: একই বস্তুর ভাবময় বহু বিভাবমাত্র। তাহাতে সদৃশ-প্রবাহই জন্মায়।

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে তুমি নিজের অবস্থা প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেছ। ধ্রুব জানিও প্রকৃত ভক্তের জন্য যাহাই বিহিত হউক না কেন, তাহা তা'র মঙ্গলের জন্য; উহা তাহার স্বকীয় প্রকৃত উন্নতি সাধনেরই অবসর প্রদান করে। আমরা যে বস্তুতে ইষ্টেতরত্ব বা অমঙ্গল ভাব দেখি ও আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিবশে উহাদিগকে প্রতিবন্ধক ও অভিলষিতের বাধক বলিয়া মনে করি, তাহা আমাদের দৃষ্টির অল্পাবগাহিত্ব এবং বিশ্বাসহীনতা বা অশ্রদ্ধা হইতেই প্রসূত। কারণ যাহা কিছু আসে, সবই কি সেই সর্ব্বমঙ্গলালয়ের নিকট হইতে নহে? প্রত্যেক প্রত্যয়ের ভিতর দিয়া কি সেই "সমরস" তত্ত্বের অবভাস হয় না?

* * *

বৎস! আবেগের বশে বিমুগ্ধ ও বিচলিত হইও না এবং আমার বাক্যে যে অর্থ নাই তাহা আরোপিত করিও না। 'আমি কখনও আমাকে প্রত্যাখ্যান বা

পরিত্যাগ করিতে তোমাকে পরামর্শ দিই নাই। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সাধনার পথে অকৃতজ্ঞতার অপেক্ষা মারাত্মক পাপ আর কিছুই নাই, এবং আধ্যাত্মিক জীবনে যাহাতে অহঙ্কারের তামসিকতা ও পরার্থপরতার অভাব ও ভাবের অপ্রবাহ (Stagnation) অতি সূক্ষ্মরূপেও আনয়ন করে, এরূপ কোনও ভাবকে আমি কখনও অনুমোদন করিব না। কিন্তু পক্ষান্তরে তোমারও সত্যের দিকে নয়ন মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য নহে। শত হইলেও আমার ন্যায় একটী দুর্ব্বল জীব যে বহু বিক্ষেপ ও বহু আবর্ত্তের ভিতর দিয়া অতি কষ্টে উপনিষদোক্ত "উৎ" বা পরা ভাবের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করিতেছে এবং সে পথে যাইতে মুহুর্মুহুঃ উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, (হোঁচট্ খাইতেছে) তাহার সহিত অন্ধের ন্যায় বিচার বিবেক বর্জ্জিত হইয়া সংশ্লিষ্ট হওয়া অনুচিত। সর্ব্বতোভাবে তাহার সত্য ও মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু দিবার আছে তাহা লইও ; এবং তজ্জন্য তাহাকে ভালবাস ও তাহার উপর কৃতজ্ঞ হও। কিন্তু তুমি যদি সর্ব্বতোভাবে তাহাতে আত্মসমর্পণ কর, তবে তাহার দোষরাশি কিছু কিছু হয়ত তোমাতে সংক্রামিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা তোমার আত্মবিকাশের পথে বিলম্ব ও বাধা আনয়ন করিবে। কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাও অনুভূতি করিতে চেষ্টা করিও যে, যিনি তোমাকে এই 'আমির' পোষাক পরিয়া এত আকর্ষণ করেন, তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণই,—ক্ষণভঙ্গুর ব্যক্তিত্ব নহে।

প্রাণাধিক! বিশিষ্টতার সহিত সংগ্রামে তুমি যে কতকটা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছ, তাহা আমরা দেখি না ;—পরন্তু তুমি কীদৃশ অকৈতব ও আগ্রহান্বিত হইয়া উদ্ব্যক্ত হও এবং যুদ্ধকালে তোমাকে কি ভাবে অনুপ্রাণিত করে, তাহাই আমরা দেখি। কারণ সাধন-সমর অনেকভাবে সংসাধিত হইতে পারে ; যিনি 'নিমিত্ত মাত্র' রূপে দাসের ন্যায় যুদ্ধ করেন, তিনিই উত্তম ভক্ত। নিয়ম বা ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে ন্যায় ও মঙ্গলময় শ্রীভগবানের বিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত ও তাহারই ব্যঞ্জক। অতএব যদি কেহ অকৃতকার্য্য হয় অথবা এতাবৎ অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত কোনও দোষ নিজের ভিতর খুজিয়া পায়, তাহাতে তাহার বিকলচিত্ত ও নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমাদের দোষগুলি যে কি, তাহা আমাদের সর্ব্বতোভাবে জানা শ্রেয়ঃ ; কারণ দোষ মাত্রেই ভগবানের সর্ব্বাত্মক 'পর'ভাবের সম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞানের ফল। উহা দেখাইয়া দেয় যে কেন আমরা সেই ভগবৎ সত্ত্বা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। শুধু ঐরূপেই উহাদিগকে আমরা অতিক্রম করিতে সক্ষম হই। এই জন্যই প্রবর্ত্ত-সাধক যদি বাস্তবিকই তীব্র সংবেগ যুক্ত হয়, তবে

তাহার জীবনে,—প্রথমেই জল স্থির হইলে কর্দ্দম যেরূপ পাত্রের নিম্নদেশে পড়িয়া গিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চৈতন্য-সলিলে তাহার অজ্ঞাতসারে যে সব ভেদবুদ্ধির কলুষ-কলঙ্ক বিমিশ্রিত থাকে, তাহা "থিতাইয়া পড়ে।" নিশ্চয় জানিও, যোগীর জীবনে বিভিন্ন কালে যাহা ঘটে, তাহা কখনও 'অন্বয়-মুখে' কখনও, 'ব্যতিরেক মুখে' তাহার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় অপ্রমত্ত হইয়া বাহ্য অবস্থার মধ্যে একেরই ইঙ্গিত দেখিতে শিখিবে।

* * *

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে আমিও কি সেভাবে শিক্ষিত হইয়াছি। আমার মনে হয় আমি তোমায় বলিয়া'ছি যে, আমার বর্ত্তমান জন্মে সাধারণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াবহুল প্রণালীতে আমি প্রায় কোনও শিক্ষাই প্রাপ্ত হই নাই। আমার যাহা কিছু শিক্ষা, তাহা উচ্চতর ক্ষেত্রে মহত্তর বুদ্ধির সাহায্যে হইয়াছে। উহা হয় সুষুপ্তি নতুবা ধ্যানের সময়, অধিকাংশ তত্ত্বই চিত্রের দ্বারা ধী-ক্ষেত্রে প্রচোদিত হইয়াছে। আমি যাহা জানি, তাহা বাক্য দ্বারা অন্যে সংক্রামিত করিতে যে কষ্ট অনুভব করি, উহা তাহার একটী কারণ। আমি যতদূর জানি, প্রকৃত দীক্ষার পর লোকে ঐ প্রকার বুদ্ধিগত শিক্ষাই প্রাপ্ত হয়! যতদিন সে সময় না আসে, ততদিন অবশ্যই ধীরভাবে তাহার অপেক্ষা করিতে হইবে। তখন সাধকের 'সর্ব্ব' মানবের নিঃস্বার্থ সেবা ও ইষ্টদেবে প্রাণের অকপট শ্রদ্ধা করিয়া কালের প্রতীক্ষা করা উচিত। ইহাই ত' বৈষ্ণব শাস্ত্রে 'জীবে দয়া' ও 'নামে রুচি' নামে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

* * *

তোমার যাহা কল্যাণকর, তাহা তুমি পাইতেছ ; এবং তুমি যদি এই ভাবে অবিচলিত হইয়া থাকিতে পার, তবে আর যাহা পাইবার তাহাও পাইবে। বীজ-গণিতের মূল সূত্র গুলিতে যতক্ষণ সম্পুর্ণ অধিকার না জন্মিবে, তখন সমীকরণাধ্যায় (Theory of Equations) লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি? প্রগল্ভতা যেরূপ মন্দ, অযথা কৌতূহলও তাদৃশ ; উহারা প্রবর্ত্তের অনধিকারিত্ব প্রমাণিত করে। কৌতূহলের আর একটু দোষ আছে, উহা নিত্য নূতন চায় ; সুতরাং উহাতে সেই চির পুরাতন পুরুষের বুদ্ধি ফুটে না। স্থির ও অটলভাবে সেবা করিয়া যাও, তাহা হইলে সবই শ্রেয়োঽভিমুখী হইবে। সেবাতেই (দাস্যে) যেন তোমার আনন্দ হয়, অধিকারে (প্রভুত্বে) নহে ; দানেই যেন তোমার পরিতৃপ্তি হয়, গ্রহণে নহে। তাহা হইলেই তুমি এখন যাহা ধারণা

করিতে পার না, এমন অনেক জিনিস পাইবে। তুমি অবশ্যই জানিতে পারিয়াছ যে ব্যক্তিগত 'বিশিষ্ট' অধিকার ও উন্নতি সাধন অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যার মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে একটী কৈতবশূন্য সেবাভাবেই পরিতৃপ্ত; সাধক-মণ্ডলী সঙ্গত ও শিক্ষিত করিবার জন্যই আধুনিক তত্ত্ব-সভার ভিতরে Eastern School নামক সাধন প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব যাহারা বিশিষ্ট 'আমির' জন্য লালায়িত, তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার ইহাতে কিছুই নাই।

উপরোক্ত কথাগুলি হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, সাধনার পথ পুষ্প-সমাকীর্ণ ত' নহেই ; বরং যে যাত্রীর হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে নিজের অজ্ঞাতসারে স্বার্থসাধনের কোনও অস্ফুট প্রেরণা, কাম-সঙ্কল্পের বিন্দু-মাত্রও গুপ্তবাসনা বা কৈতব থাকে, যিনি প্রাণে প্রাণে 'আমি কিছুই নহি' এই অকিঞ্চন বুদ্ধি গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহাকে বিপত্তি রাশিতে নিশ্চয়ই আকুল হইতে হইবে। অতএব Eastern School এর প্রত্যেক সাধকেরই স্বকীয় কামনা সমূহ অতি সূক্ষ্ম ও কঠোরভাবে পরীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত ; এবং তাহার অন্তরের নিভৃত স্থানে 'এষণা' সমূহের মধ্যে স্বার্থের কোনও অভিসন্ধি লুক্কায়িত থাকিলে, তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে মার্জ্জিত করিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় সংগ্রামে উদ্যুক্ত হইতে হইবে। কারণ সেই সাধন-সমরে তাহার জীবন ও ভেদভাবানুবিদ্ধ পরিচ্ছিন্ন সত্ত্বার যাহা কিছু প্রেয়, তাহার সমস্তই আহুতি দিতে হইবে।

* * *

বর্ত্তমান সমস্যায় আমি এইমাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, তুমি সানন্দ চিত্তে সম্পূর্ণভাবে কেবল কর্ত্তব্য করিয়া যাও ; তাহা হইলে অবশ্যই আনর্দ্দেশ্য ও অদ্ভুত-ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। অতএব উদ্বিগ্ন হইয়া নিজেকে যন্ত্রণা দিও না। প্রত্যহ প্রভাতে ধ্যানের পর যখন মন কতকটা শান্ত থাকিবে, তখন দেখিবে তোমার সে দিনের কি কর্ত্তব্য আছে ও তাহা কিরূপ করা আবশ্যক ; এবং তাহা সুসম্পন্ন করিবে। বাকী যাহা কিছু আছে, তাহা আপনা আপনি হইয়া যাইবে, ইহা শুনিতে অবশ্যই বড় আশ্চর্য্যজনক এবং অনেকটা 'উপকথার মত' বলিয়া বোধ হইতে পারে ; কিন্তু যাহারা সেই ভগবানের মহাবিধির কার্য্য প্রণালী অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে জীবনের অতি সামান্য ঘটনাগুলির ন্যায় ইহাতেও অবিশ্বাস্য বা অশ্রদ্ধেয় কিছুই নাই। Heaven helps those who help themselves "যে নিজে উদ্যুক্ত হয়, ভগবান তাহার সহায় হন" বা 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ'—এ বাক্যে যতটুকু অর্থের ধারণা হয়,

তদপেক্ষা ইহাতে অনেক গভীরতর নিগূঢ় অর্থ আছে ; এবং সর্ব্বলোকেই সর্ব্বদা উহা মূলতঃ এবং অক্ষরে অক্ষরে সর্ব্বাংশিক ভাবেও সত্য।

* * *

প্রিয় বৎস! মনে করিওনা যে আমি তোমাকে একক ও অসহায় অবস্থায় সংগ্রামের ভিতর ছাড়িয়া দিই, এবং তোমার আভ্যন্তরিক ক্লেশরাশির অংশ গ্রহণ করি না। আমারাও ভগবানের দাস ; এবং উপর হইতে অনুমতি পাইলেই আমি আসিয়া থাকি ও তোমার মঙ্গলের জন্য যাহা সর্ব্বোত্তম, তাহা অজ্ঞাতসারে সাধন করি। স্নেহবশে যদি নিজ প্রবৃত্তিকে অনুরঞ্জিত হইতে দিয়া আধ্যাত্মিক সাহায্য করিবার নিয়ম পালন না করি, তাহা হইলে আমার সার্ব্বভৌম বিধি লঙ্ঘন করা হইবে,—সেই পর ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাকে অতিক্রম করা হইবে ; এবং তাহার ফলে বর্ত্তমানে যতটুকু সাহায্য করিতে সমর্থ আছি, ততটা সাহায্য করিবার সামর্থ্যও অপহৃত হইবে। ভগবানের বিধির বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে নিজেরই সামর্থ্যের হানি হয়।

তোমার নিজের যন্ত্রণা যতই তীব্র হউক না কেন, তাহাতে যেন তোমার চতুঃপার্শ্বস্থ অসহায় জীব সমূহের কল্যাণের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তদভিমুখে তোমাকে দৃষ্টিহীন না করে। তাহাদের জীবন ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে, ঐ অন্ধ উন্মত্ত অহং-কেন্দ্রসমূহ এক প্রকার কিছুই জানেনা, এবং প্রত্যেক বাহ্য বাত্যাভিঘাতে ইতস্ততঃ ভ্রামিত হইয়া বেড়ায়।

তোমার চারিদিকে সেই মূঢ় অংশ (ব্যষ্টি) নিচয়ের যে কি বেদনা—কি যাতনা, সে বিষয়ে অবিরত ভাবিও। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, তোমার নিজের যাতনা ও বেদনা তাহার তুলনায় কত লঘু হইয়া দাড়ায়। অপরের দুঃখে সমবেদনা সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি প্রসব করিয়া, স্বকীয় দুঃখ কষ্টের লাঘব সম্পাদন করে ; এবং বিশ্ব প্রেমে বিশিষ্ট 'আমির' ভার এতই কমাইয়া দেয় যে, ব্যক্তিগত ক্লেশ সহজেই সহনীয় ও অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাড়ায়। কর্ত্তব্য সম্পাদনে গীতার এই শ্লোকটী মনে রাখিও,—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাৎ বিদ্বান্ তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং ॥

"আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ফলের আশায় যে প্রকার কর্ম্ম করে, জ্ঞানীগণ বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষার্থ বা লোক সকলকে এক করিবার বা লোকসংগ্রহের জন্য সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।" ঐ ভাবটি Light on

ধন্য হ'ক বিশ্ববাসী ব্রহ্মণ্যের ছায়ে।
আপন ক্ষুদ্রত্ব ঢালি মহত্বের পায়ে॥
উদ্ঘাটিয়া হিরণ্ময় পাত্র আবরণ।
দেখাও জগতে শুদ্ধ-সত্যের চরণ॥
অরুণ কিরণ-জালে বিশ্ববাসীগণ!
শাস্ত্র-পূত জ্ঞাননেত্র করি উন্মীলন ;—
দেখুক আনন্দ-রসে হইয়া মগন,—
বাহিরে, ভিতরে, 'সর্ব্বে', এক নারায়ণ॥

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক-চৌধুরী।

মোক্ষ]

আত্ম তত্ত্ব।

(গত বৎসর চৈত্র সংখ্যার পর।)

হে শিষ্য! এইরূপে সূর্য্য ভগবানের নিকট সমস্ত বেদের যথার্থ অর্থ অবগত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে বিরক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে বিরক্ত হইতে দেখিয়া সূর্য্য ভগবান্ বলিলেন "হে যাজ্ঞবল্ক্য! বিদ্যা অধ্যয়নান্তর শিষ্য অবশ্য গুরু-দক্ষিণা দিবে, ইহাই শাস্ত্রের আজ্ঞা ; সুতরাং তুমি আমাকে এক্ষণে গুরুদক্ষিণা দাও। আমি তোমার নিকট এই প্রকার গুরু-দক্ষিণা চাহিতেছি, যে তুমি এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিও না। আমি তোমাকে যে বেদ-বিদ্যা দিয়াছি, সেই বেদবিদ্যার অধিকারী ব্রাহ্মণ-দিগকে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে তুমি তাহা উপদেশ কর। আমার এই বিদ্যায় এই প্রকারে সম্প্রদায় প্রবর্ত্ত করিয়া, পশ্চাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, এই আমার আজ্ঞা। তুমি অঙ্গীকার কর ; ইহাই আমার গুরু-দক্ষিণা। হে যাজ্ঞবল্ক্য! সেই চারি বেদে উপনিষদ্ ভাগ রূপ যে ব্রহ্মবিদ্যা আমি তোমাকে উপদেশ দিয়াছি, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তুমি সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ব্বে অথবা পরে বিষয়-বাসনা-রহিত অধিকারী পুরুষকেই উপদেশ করিবে।"

হে শিষ্য, যখন সূর্য্য ভগবান্ এইরূপ আজ্ঞা করিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সূর্য্য ভগবানের আজ্ঞা স্বীয় মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম

করতঃ ভূমি-লোকে প্রতিগমন করিলেন। মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া মুনি আপনার যজ্ঞবল্ক্য নামক পিতার নিকট গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জনক রাজার নিকট ধন গ্রহণ করিয়া দুইটী বিবাহ করিলেন। তন্মধ্যে একটী কাত্যায়ন নামক ঋষির কন্যা 'কাত্যায়নী', আর দ্বিতীয়া মিত্রয়ু নামক ঋষির কন্যা 'মৈত্রেয়ী'। এইরূপে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি পূর্ব্বে যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদ অধ্যয়ন করিয়া ঋষি-ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ গৃহস্থাশ্রমে দেবঋণ এবং পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন। তথায় বহু দক্ষিণা-সাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেব-ঋণ এবং নিজের সমান গুণবান এবং শ্রদ্ধাবান্ পুত্র-কন্যা উৎপন্ন করিয়া পিতৃ-ঋণ নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। হে শিষ্য, যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বিরক্ত ; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে যদিও ঋণ-প্রাপ্তি সম্ভব নহে ; তথাপি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সম্বন্ধ এবং গৃহস্থাশ্রমের সম্বন্ধ বশতঃ ঋণ প্রাপ্তি সম্ভব। শ্রুতি যথা,—"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণৈর্ঋণবান জায়তে।" অর্থাৎ উপনয়ন, সংস্কার যুক্ত ব্রাহ্মণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ এই তিন ঋণ-যুক্ত হইয়া থাকেন।"

হে ভগবন্ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং গৃহস্থাশ্রম এই দুই আশ্রমই এই অধিকারী পুরুষকে যদি তিন ঋণ প্রাপ্ত করায়, তবে এই অধিকারী পুরুষ সেই দুই আশ্রমকে কি নিমিত্ত গ্রহণ করেন?

হে শিষ্য, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং গৃহস্থাশ্রম এই দুই আশ্রম গ্রহণ বিনা প্রথমে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নহে। কারণ স্মৃতিতে কথিত আছে, "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ ক্ষণমেকমপি দ্বিজঃ"। দ্বিজ কোন আশ্রম বিনা ক্ষণমাত্রও থাকিবে না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের মধ্যে কোন এক আশ্রম গ্রহণ করিয়াই লোকে অবস্থিতি করিবে। আর শাস্ত্রে ত' বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবার সময়ের নিয়ম কথিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহস্থ এই দুই আশ্রম গ্রহণ বিনা প্রথমেই বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ সম্ভব নহে। এক্ষণে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবার সময় নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে। মনু স্মৃতি আদি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, যে গৃহস্থাশ্রমী পুরুষ যে সময়ে আপনার শরীরে চর্ম্মের শিথিলতা দেখিবে, যখন আপনার কেশ শুক্লবর্ণ এবং নিজ পৌত্রমুখ দেখিবে, সেই সময়ে সেই গৃহস্থ পুরুষ পূর্ব্ব গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে বাসরূপ বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবে। সুতরাং

ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ না করিয়া, এই অধিকারী পুরুষ যদি বাল্য এবং যৌবনাবস্থায় বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বান প্রস্থ আশ্রমের সময় নির্দ্দেশকারী শাস্ত্রের বিরোধ হইবে। আর যদি এই অধিকারী পুরুষ বানপ্রস্থ আশ্রমের কাল পর্য্যন্ত কোন আশ্রমি করিয়া থাকেন ত' ''অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ ক্ষণমেকমপিদ্বিজঃ'' এই বচনের বিরোধ উপস্থিত হইবে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য এবং গৃহস্থাশ্রমের প্রথমেই বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ শ্রুতি-স্মৃতিরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। হে শিষ্য! তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে, শ্রুতি যেরূপ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম বিনা সন্ন্যাস আশ্রমের বিধান করিয়াছেন;—যথা, ''যদহবেব বিরজেৎ, তদহবেব প্রব্রজেৎ''; সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর বানপ্রস্থাশ্রমের কোনও বিধান কথন করেন নাই।

হে ভগবন্, এই অধিকারী পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, তারপর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, আপনি যে এই প্রকার নিয়ম কহিলেন, তাহা সম্ভব নহে; কারণ "ব্রহ্মচর্য্য পরিচয়েদাশরীর বিমোক্ষণাৎ।" অর্থাৎ স্থূল শরীরের নাশ পর্য্যন্ত এই অধিকারী পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করিবেন। বশিষ্ঠ ভগবানের বচন হইতেই এই নিয়মের বিরোধ আসিতেছে। হে শিষ্য! মরণ পর্য্যন্ত এই অধিকারী পুরুষ এক আশ্রম সেবন করিবে; বশিষ্ঠ ভগবানের বচনের এই প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে; সেই বচন পূর্ব্বোক্ত ক্রমের নিবারণ করিতেছে না; তদ্বিপরীতে উক্ত ক্রমকে সেই বচন দৃঢ় করিতেছে। হে শিষ্য! বশিষ্ঠ ভগবানের বচনের এই অভিপ্রায় যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম এবং বানপ্রস্থাশ্রমে যদি এই অধিকারী পুরুষের অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে, তাহা হইলে এই অধিকারী পুরুষ সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প না করিয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই আশ্রমেই অবস্থিতি করিবে। এই প্রকার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া যে পুরুষ এক আশ্রমেই অবস্থিতি করিবে, সেই পুরুষ উত্তরোত্তর আশ্রম গ্রহণ না করিলেও পাপরূপ দোষ প্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং এই ক্রম সিদ্ধ হইতেছে যে, এই অধিকারী পুরুষ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করিবে, তারপর গৃহস্থাশ্রম, পরে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবে। এই প্রকার ক্রমই অনেক শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; যথা,—''ব্রহ্মচর্য্যাৎ গৃহী ভবেৎ, গৃহাৎ বনী ভবেৎ।'' দক্ষ প্রজাপতির স্মৃতি শ্লোক ''ত্রয়ানামনুলোম্যং স্যাৎ, প্রতিলোমং ন বিদ্যতে, প্রাতিলোম্যেন যো যাতি ন তস্মাৎ পাপকৃত্তমঃ।" অর্থাৎ প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, তদনন্তর গৃহস্থাশ্রম, পরে বানপ্রস্থ আশ্রম, এই

প্রকারের নাম অনুলোম। আর প্রথম গৃহস্থাশ্রম, তদনন্তর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, তদনন্তর বানপ্রস্থাশ্রম অথবা প্রথম ব্রহ্মচর্য্য, তদনন্তর বানপ্রস্থ, তদনন্তর গৃহস্থাশ্রম, এই প্রকার বিপরীত ক্রমের নাম প্রতিলোম। তন্মধ্যে যে অধিকারী পুরুষ অনুলোম অনুসারে ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রম গ্রহণ করিবে, সেই পুরুষের মহান্ পুণ্যলাভ হইবে; আর যে পুরুষ প্রতিলোম অনুসারে সেই তিন আশ্রম গ্রহণ করিবে, সেই পুরুষের মহান্ পাপ ঘটিবে। সুতরাং অনুলোম অনুসারে এই অধিকারী পুরুষের সেই আশ্রম গ্রহণ করা উচিত।

আপনি যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রম বিষয়ের ক্রম বলিলেন, সেইরূপ চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রম বিষয়ের ক্রম বিবৃত করুন। হে শিষ্য, শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রম বিষয়ের যে প্রকার ক্রম বর্ণনা করিয়াছেন, সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে সেই প্রকারের কোন ক্রম বর্ণনা করেন নাই; সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ সম্বন্ধে কোন ক্রম নাই। কিন্তু যে সময়ে যে অধিকারী পুরুষের তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে সেই অধিকারী পুরুষ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। শ্রুতি যথা,— ''যদহবেব বিরজেৎ, তদহবেব প্রব্রজেৎ'' যদি চেতরেথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা।'' অর্থাৎ এই অধিকারী পুরুষের যে দিন তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেই দিন সেই অধিকারী পুরুষ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। সেখানে পূর্ব্ব পূণ্য কর্ম্ম বশে যদি কথন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই অধিকারী পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। আর গৃহস্থাশ্রমে তীব্র বৈরাগ্য প্রাপ্তি হয়ত' এই অধিকারী পুরুষ গৃহস্থাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। যদি কখনও বানপ্রস্থাশ্রমে তীব্র বৈরাগ্য প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। স্মৃতি প্রমাণ যথা,—''যদেব চাস্য বৈরাগ্য জায়তে সর্গ বস্তু। তদব সংন্যসেদ্বিদ্বান্ অন্যথা পতিতো ভবেৎ।'' অর্থাৎ যে সময়ে সর্ব্ব পদার্থে তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে, সেই সময়েই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে কোনও ক্রম নাই; পরন্তু সেই বৈরাগ্য বিনা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হইবে। হে শিষ্য, অনেক শ্রুতি স্মৃতিতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার জন্য এই প্রকার তীব্র বৈরাগ্যকে মুখ্য কারণ বলা হইয়াছে।

হে ভগবন্, শ্রুতি স্মৃতি যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের ক্রম নিরূপণ করিয়াছেন, সেইরূপ কোন কোন শ্রুতি ও স্মৃতি সন্ন্যাসাশ্রমেরও ক্রম কথন করিয়াছেন। যথা —''ব্রহ্মচর্য্যাৎ গৃহী ভবেৎ, গৃহাৎ বনী ভবেৎ, বনাৎ প্রব্রজেৎ।''

এই শ্রুতিতে বানপ্রস্থ আশ্রমের পরই সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান করা হইয়াছে। স্মৃতি শ্লোক যথা,—"ঋণত্রয়মপাকৃত্য নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেৎ গৃহাৎ" অর্থাৎ ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ, প্রভৃতি নিবৃত্তি করিয়া অহং অভিমান রহিত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য এই তিন বর্ণ সন্ন্যাসাশ্রমই গ্রহণ করিবে। স্মৃতিতেও তিন ঋণ নিবৃত্তির পর সন্ন্যাস আশ্রমের বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং সন্ন্যাসের অক্রম বোধনকারী শ্রুতি-স্মৃতি এবং ক্রম বোধনকারী শ্রুতিস্মৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইতেছে। হে শিষ্য, বিষয়ভোগ হইতে যে ব্যক্তির তীব্র বৈরাগ্য প্রাপ্তি না হইয়াছে, কিন্তু মন্দ বৈরাগ্য হইয়াছে, সেই মন্দ বৈরাগ্যবান্ পুরুষের প্রতি শ্রুতি স্মৃতিতে বানপ্রস্থাশ্রমের পর চতুর্থ অবস্থায় সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান কথিত হইয়াছে। আর যে ব্যক্তির তীব্র বৈরাগ্য প্রাপ্তি হইয়াছে, সেই তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষের প্রতি, শ্রুতিতে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের পর সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী পুরুষের ভেদ হওয়াতে শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ নাই। কিম্বা "ন্যাসো হি ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে সন্ন্যাসাশ্রমকেই ব্রহ্মরূপ বলা হইয়াছে। "তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমন পরং" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে পূর্ব্ব উত্তর-ভাগ রহিত বলা হইয়াছে। সুতরাং যেরূপ ব্রহ্মবিষয়ে পূর্ব্ব উত্তর ভাব নাই, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সন্ন্যাস বিষয়েও পূর্ব্ব উত্তর ভাব সম্ভব নহে।

হে ভগবন্, যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম, সেইরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের পর কোনও আশ্রম আছে বা নাই? হে শিষ্য! যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম এবং বানপ্রস্থাশ্রম, সেইরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের পর অন্য কোনও আশ্রম নাই। পরন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি সর্ব্ব আশ্রমের এই সন্ন্যাসাশ্রমই অবধি রূপ। এই বার্ত্তা শারীরক ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে "তদ্ভূতস্য তু ন তদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপা ভাবেভ্যঃ।" এই চল্লিশ সূত্রে শ্রীব্যাস ভগবান এবং সেই সূত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা শ্রীভাষ্যকার বিস্তারিতরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। সেই সূত্রের সংক্ষেপ অর্থ এই যে, সন্ন্যাস আশ্রমের পর কোন আশ্রম গ্রহণ করিবার অর্থ প্রকাশকারী কোন শ্রুতি বা স্মৃতি নাই, এবং শিষ্ট পুরুষের এরূপ আচারও দেখা যায় না; এই কারণে যে পুরুষ চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার শরীর নাশ পর্য্যন্ত সেই চতুর্থ আশ্রম হইতে উপর আরোহণ করিবার কিছু নাই। হে শিষ্য, চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রমের পর অন্য কোন আশ্রম গ্রহণ হইতে পারে না; এই বার্ত্তা যেরূপ সর্ব্বশাস্ত্র

প্রসিদ্ধ, সেইরূপ দ্বিজ কোন না কোন আশ্রম বিনা থাকিবে না এই বার্ত্তাও শ্রুতি স্মৃতি আদি সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ। তদ্বিষয়ে দক্ষ প্রজাপতির স্মৃতি শ্লোক যথা,—"অনাশ্রমী নৈব তিষ্ঠেদব্দমেকমপি দ্বিজঃ। আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রাচশ্চিত্তীয়তে হি সঃ।" অর্থাৎ ইহলোকে দ্বিজ আশ্রম বিনা এক বৎসর পর্যান্তও থাকিবে না; কোন এক আশ্রম অঙ্গীকার করিয়াই বাস করিবে। আর যে দ্বিজ একবর্ষ পর্য্যন্ত কোন আশ্রম বিনা থাকে, সেই দ্বিজকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তাৎপর্য্য এই, যে পর্য্যন্ত সেই দ্বিজের স্ত্রী জীবিত থাকে, সেই পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রম কহা যায়। আর স্ত্রীর মৃত্যুর পর সেই গৃহস্থাশ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়। সুতরাং এই দ্বিজ স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক বৎসরের মধ্যে কোন না কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিবেন অথবা বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। পরন্তু কোন আশ্রম গ্রহণ বিনা অনাশ্রমা হইয়া দ্বিজ কদাচিৎ থাকিবেন না। এক্ষণে সিদ্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে ঋষিঋণ নিবৃত্তি করিয়া এবং গৃহস্থাশ্রমে দেব ও পিতৃঋণ নিবৃত্তি করিয়া এই অধিকারী পুরুষ বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবেন; বানপ্রস্থাশ্রমে এই অধিকারী পুরুষ তিন ঋণ রহিত হইবেন। যেরূপ ব্রহ্মচারী দেবতা ও পিতৃঋণ রহিত হন, গৃহস্থাশ্রমী ঋষিঋণ রহিত হন এবং বানপ্রস্থাশ্রমী ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ এই তিন ঋণ রহিত হন, সেইরূপ এই চতুর্থ আশ্রমধারী সন্ন্যাসী লৌকিক, বৈদিক প্রভৃতি সর্ব্বঋণ রহিত হন।

হে শিষ্য! এই প্রকার শাস্ত্র ব্যবস্থা পরিজ্ঞাত সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনি অন্তরে সর্ব্ব ঋণ মুক্ত হইলেও গৃহস্থাশ্রমের সম্বন্ধ বশতঃ ঋণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি গৃহস্থাশ্রম অঙ্গীকার করিয়া দেবতা ও পিতৃদেবদিগের প্রসন্নতার নিমিত্ত বিচারপূর্ব্বক গো, সুবর্ণ ও অন্নাদি দান করিতে লাগিলেন; সেই বিচার তুমি শ্রবণ কর "আমি যাজ্ঞবল্ক্য মুনি, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বেদাধ্যয়ন করিয়া যে প্রকার ঋষিঋণ পরিশোধ কারিয়াছ, সেই প্রকার দেব-ঋণ এবং পিতৃঋণ প্রদান করিয়া পশ্চাৎ আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব। যদি কখনও ঋষিঋণের ন্যায় দেবঋণ ও পিতৃঋণ না দিই, তবে ঋষি দেবতা এবং পিতৃ দেবতা এই তিনের বিষম অচলরূপ পংক্তি ভেদ হইবে। সুতরাং ঋষিঋণের ন্যায় দেবতা ও পিতৃঋণ আমি উত্তম রূপে পরিশোধ করিব। এইরূপে তিন ঋণের নিবৃত্তি করিয়া আমি যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব, তখন আমার গুরু সূর্য্য ভগবান্ আমার প্রতি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই আজ্ঞা প্রতিপালন

আমার দ্বারা উত্তম রূপে সম্পন্ন হইবে। সূর্য্য ভগবানের বচন সত্য করিবার জন্য আমি স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তিকারী যে যজ্ঞাদি রূপ প্রবৃত্তি মার্গ এবং মোক্ষ প্রাপ্তিকারী যে আত্মজ্ঞানরূপ নিবৃত্ত মার্গ এই উভয় মার্গ প্রতিপালন করিব।" হে শিষ্য! এই প্রকার বিচার করিয়া দেবতা ও পিতৃলোকের প্রসন্নতার জন্য নানা প্রকার দান করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির গৃহস্থাশ্রম সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে। হে শিষ্য! দিবারাত্র সর্ব্ব জীবের উপকারী যাজ্ঞবল্ক্য মুনির গৃহস্থাশ্রম দেখিয়া সর্ব্বলোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিল। তথায় কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী উভয় ভার্য্যা এবং আজ্ঞাকারী পুত্রগণের সহিত যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যজ্ঞ ও হোমাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে পালন করিতে লাগিলেন, এবং প্রতিদিন বেদ পাঠ করিয়া ঋষিগণকে পালন করিতে লাগিলেন। পুত্রাদি উৎপন্ন ও পিণ্ডদানাদি করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি স্বর্গবাসী পিতৃলোককে পালন করিতে লাগিলেন। রাত্রিযাপন করিবার স্থান এবং নানা প্রকার অন্ন, বস্ত্র, স্ুবর্ণাদি ধন ও অনেক প্রকার পদার্থ দান করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি দরিদ্র মনুষ্যকে পালন করিতে লাগিলেন। তৃণাদি দিয়া গো অশ্বাদি পশু পালন করিতে লাগিলেন। রন্ধন ও ভোজন পাত্রে পরিশিষ্ট অন্ন এবং বলিদানাদি দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য মুনি শ্বান্ কীটাদি জন্তু পালন করিতে লাগিলেন, এবং যেরূপ ইহলোকে কোন ধনী লোকের গৃহে দুন্দুভি শব্দ দ্বারা অন্নার্থী জীবকে ডাকা যায়, সেইরূপ যাজ্ঞবল্ক্য মুনি গৃহে বেদবাণীরূপ ধেনুর স্বাহা বষট্ স্বধা হন্ত এই চারি স্তনরূপ শব্দ দ্বারা দেবতাদির আবাহন করিতে লাগিলেন। তথায় স্বাহা বষট্ এই দুই শব্দ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের আর স্বধা শব্দ দ্বারা পিতৃলোকের এবং হর্ষ প্রকাশকারী যে হন্ত পদ তাহা দ্বারা অন্নার্থী মনুষ্যকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে শিষ্য! যাজ্ঞবল্ক্য মুনি এই প্রকার অদ্ভূত গৃহস্থাশ্রম করিতে লাগিলেন। এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির কাত্যায়নী স্ত্রীর বিষয় নিরূপণ করা যাইতেছে। কাত্যায়নী গৃহকার্য্যে অত্যন্ত কুশল ছিলেন। তিনি আপনার গৃহের যে ভিত্তি, ভূমি এবং দ্বার এবং যজ্ঞশালার যে ভূমি, সমস্ত স্থানগুলি প্রতিদিন মার্জ্জনা করিয়া শুদ্ধ এবং চূণাদি শুক্ল মৃত্তিকা দ্বারা দুগ্ধের ন্যায় শুক্ল করিতেন। অন্ন পাক করিবার পাত্র এবং জলের ঘটি ও কমণ্ডলু এবং তাহা ঢাকিবার পাত্রটীকে ভস্মাদি দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া সর্ব্বদা শুদ্ধ রাখিতেন। এবং কাত্যায়নী রৌদ্রে এবং অগ্নিতে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য,

চোষ্য, এই চারি প্রকার অন্ন পাক করিতেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নানাদি নিত্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনার পতিকে পূজা করিতেন। পতির মাতা পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভগ্নী ইত্যাদি সমস্ত পরিবারবর্গকে কাত্যায়নী যথাযোগ্য পূজা করিতেন। এই প্রকার গৃহকার্য্যে অত্যন্ত কুশল কাত্যায়নীর সমান পূর্ব্বে কোন স্ত্রীলোকই হ'ন নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না এবং বর্ত্তমানেও কেহ নাই।

এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির দ্বিতীয় স্ত্রী মৈত্রেয়ীর বৃত্তান্ত নিরূপণ করা যাইতেছে। মৈত্রেয়ী সংসার সম্বন্ধীয় জন্ম-মরণাদি দুঃখ দেখিয়া উন্মত্ত পুরুষের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গাভী যেরূপ বৎসের মৃত্যুতে সর্ব্বদা শোকাতুরা থাকে, মৈত্রেয়ী সেইরূপ সর্ব্বদা শোকাতুরা থাকিতেন। এক্ষণে সেই বিচার নিরূপণ করা যাইতেছে। "আমি কে? দেহাদি-সংঘাত-রূপ 'আমি' অথবা দেহাদি সংঘাত হইতে 'আমি' ভিন্ন? দেহাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন হইলেও 'আমি' জড় অথবা চৈতন্যরূপ? এই মনুষ্য লোকে 'আমি' কি প্রয়োজনে আসিয়াছি? এই, শরীর উৎপত্তির পূর্ব্বে 'আমি' কোথায় ছিলাম? এখনই বা 'আমি' কোথায় আছি এবং মৃত্যুর পরই বা কোথায় যাইব? এই আমার পতির স্বরূপ কি? আমার পুত্র কন্যারই বা স্বরূপ কি? এই যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সিদ্ধ স্থূল শরীর, ইহারই নাম পতি পুত্রাদি, অথবা এই শরীর হইতে ভিন্ন কোনও বস্তুর নাম পতি পুত্রাদি? সেই ভিন্ন বস্তু জড় অথবা চেতন? আর প্রতিদিন যে আমার দুঃখ হইতেছে, সেই দুঃখেরই বা স্বরূপ কি? বিষয় সম্বন্ধ হইতে আমাদের যে সুখ হয়, সেই সুখের স্বরূপ কি? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমি যে রূপাদি বিষয় দর্শন করিতেছি, সেই ইন্দ্রিয়েরই বা স্বরূপ কি? যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীব আমি দর্শন করিতেছি, সেই জীবেরই বা স্বরূপ কি?" হে শিষ্য! মৈত্রেয়ী আপনার মনে সদা সর্ব্বদা এই প্রকার বিচার করিয়া শোকাতুরা হইতে লাগিলেন। মৈত্রেয়ীর চিত্তের সর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিলেও যাজ্ঞবল্ক্য মুনি আপনার গৃহস্থাশ্রম সিদ্ধির জন্য পূর্ব্বে মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন নাই; গৃহকার্য্যেই প্রবৃত্ত রাখিয়াছিলেন।

এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির বৃত্তান্ত নিরূপণ করা যাইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি গৃহস্থাশ্রমে বহুকাল থাকিয়া এক সময়ে একান্ত প্রদেশে বসিয়া এই প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন, "ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ইহলোকে সর্ব্ব দেহধারী জীবের অত্যন্ত প্রিয় যে প্রাণধারণ, সেই প্রাণধারণই পরম দুঃখরূপ। কারণ

এই জীব শরীররূপ বন্ধন গৃহ যে গ্রহণ করে, তাহা ত' প্রাণধারণ জন্যই গ্রহণ করে। এই শরীর কিরূপ? ত্বক্‌, রুধির, মাংস, মজ্জা, মেদ, অস্থি, বীর্য্য এই সপ্ত ধাতু দ্বারা পরিপূর্ণ; এবং বাত, পিত্ত, কফ এই তিন দোষ বিশিষ্ট ও পূঁয, বিষ্ঠা, মূত্র ইত্যাদি মল দ্বারা পূর্ণ। এই কারণেই এই শরীর অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট এবং নানা প্রকার ভয়প্রদ। পুনঃ এই শরীর কিরূপ? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, এবং আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখযুক্ত। তন্মধ্যে শিরোরোগ, অতিসার, প্লীহা, গণ্ডমালা ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাধি হইতে উৎপন্ন যে দুঃখ, এবং কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ, মোহাদি রূপ আধি হইতে উৎপন্ন যে সকল দুঃখ, তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। আর সিংহ, সর্প, বৃশ্চিক, শত্রু ইত্যাদি ভূতজন্য যে নানা প্রকার দুঃখ সেই দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ; শীত, আতপ, বর্ষা, অগ্নি, জল, বায়ু ইত্যাদি দেবতা দ্বারা উৎপন্ন যে নানা প্রকার দুঃখ, সেই দুঃখের নাম অধিদৈবিক দুঃখ। পুনঃ এই শরীর কিরূপ? বাল্য, যৌবন বৃদ্ধ এই তিন অবস্থায় রাগ, দ্বেষ, শোক, মোহ, আসক্তি ইত্যাদি বিকার দ্বারা নানা প্রকার দুঃখ পাইয়া থাকে। এই শরীরে প্রাণের প্রবেশ এবং এই শরীর হইতে প্রাণের নির্গমন, এই দুই স্মরণ করিয়া যে ভয় উৎপন্ন হয়, সেই ভয় সকল অবস্থায় আমাদের ন্যায় জীবের দুঃখ উৎপাদন করে। সেই ভয়-জন্য দুঃখ হইতে অধিক দুঃখ মাতার গর্ভে বা মরণ কালেও হয় না। এই যে নানা প্রকার দুঃখ জীব ইহলোকে এবং পরলোকে প্রাপ্ত হয়, তাহা কেবল শরীরের সম্বন্ধ বশতঃই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীরের সম্বন্ধ বিনা এই জীবের কখনও দুঃখ হইতে পারে না; সুতরাং এই শরীরের সম্বন্ধই সর্ব্ব দুঃখের কারণ। নির্জ্জন প্রদেশে যে জীবন্মুক্ত বিদ্বান পুরুষ বাস করেন, তাঁহার যখন এই শরীর দুঃখ উৎপাদন করে, তখন সংসারাসক্ত জীবের এই শরীর দুঃখ উৎপান করিবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? আপনার এক শরীরে যে অহং অভিমানরূপ সঙ্গ, সেই সঙ্গই যখন জীবকে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করে, তখন এই শরীর সম্বন্ধীয় যে স্ত্রী পুত্রাদি, কুটুম্ব, পরিবার, তাহাদের প্রতিও অহং অভিমান রূপ সঙ্গ যে এই জীবকে অনেক দুঃখ প্রদান করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র, (কাশীধাম।)

ভাগবতের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা দেখিয়াছি যে, ভাগবতের একমাত্র উদ্দেশ্য, গতি ও লক্ষ্য সর্ব্বাত্মক ভগবান্‌। ভাগবৎ অন্য শাস্ত্রের ন্যায় সার্ব্বজনীন আধ্যাত্মিক তত্ত্বাদি নির্ণয়ের জন্য রচিত নহে। ভাগবৎ এখনও ধর্ম্মের কথা কহিবে সত্য বটে, কারণ তাহা না বলিলে শুধু নিষ্কল ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলিলে সাংসারিক জীবের কোন উপকার সাধিত হইবে না; তবে 'ধর্ম্ম' অর্থের কেবল বৈজ্ঞানিক ভাবে সিদ্ধ 'অবয়বী ভাব' (Organising life) নহে। উহা বাহ্য জীবগণকে সংহত করিবার পর-পুরুষাভিমুখী ধর্ম্ম; সেইজন্য জলদ্‌গম্ভীর স্বরে সংসার-তপ্ত জীবের হৃদয়ে ঘোষিত হইল,—"সবৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুকী অপ্রতিহতা যয়াত্মা সংপ্রসীদতি।" ভাঃ—১-২-৬॥

সেই ত' পুরুষের ধর্ম্ম—সেই ত' পুরুষের 'পর' (Transcendent) ধর্ম্ম, যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি জন্মায়, এবং যদ্দ্বারা আত্মার সম্প্রসাদ সিদ্ধ হয়। অতএব বুঝা গেল যে, যতক্ষণ পুরুষবুদ্ধি বা ব্যক্ত বৃত্তিনিচয় ঘন ও পূর্ণ 'অহং'জ্ঞানে পরিসমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ এই ভাগবৎ ধর্ম্মে প্রকৃত কার্য্য হইবে না। সেইজন্য মহাপ্রভুও প্রকৃতির সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য কত উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহাদের চিত্তে এখনও বাহ্য বস্তুর অভিমুখী প্রকৃতির খেলা আছে,—যাঁহারা বৃত্তি, ভাব, প্রভৃতিকে বাহ্য, বস্তু ব্যক্তি প্রভৃতিতে 'নঙ্গর' করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহারা বস্তু হইতে সুখ, দুঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞান উদ্ভূত হয় বলিয়া মনে করেন,—যাঁহাদের ভিতর জগতের অতীত ও অতিগ স্থির-সত্ত্বার আভাস পান নাই, তাঁহারা এই ভক্তিযোগের অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। এই পরম পুরুষাভিমুখী স্বাভাবিক চিত্তের গতিকেই 'পরাভক্তি' বলে। এই ভক্তি ক্রিয়াবহুল সাধনামূলক অহঙ্কার প্রণোদিত কর্ম্ম নহে। যেমন আমরা যাহাই করি না কেন, আমাদের চিত্তবৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন ও অপ্রতিহত ভাবে সেই 'আমি' জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয় ও তাহাতেই স্থির হইয়া যায়; সেইরূপ যখন চিত্তের গতি 'আমি'-রূপ জীবভাবে সিদ্ধ হইয়া, তাহা হইতে 'বস্তু' প্রভৃতির অতিগ বুদ্ধি লাভ করিয়া ভগবানেই পরিসমাপ্ত হয়, তখনই এই 'পরাভক্তি'র স্রোত বহিতে থাকে। দেবহূতিকে উপদেশ কালে ভগবান এই তত্ত্বই বলিয়াছেন,—

"মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ ॥ ভাঃ—৩-২৯-১১
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যহ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥" ভাঃ—৩-২৯-১২

গঙ্গার যেরূপ সাগরাভিমুখী একটা স্বতঃ প্রবৃত্তি আছে, সেইরূপ জীব 'পুরুষ' ভাবে সিদ্ধ হইলে, "সর্ব্ব" পুরুষ ভাবের আধার পুরুষোত্তমের প্রতি স্বাভাবিক গতি জন্মায়। ঐ গতি অবিচ্ছিন্ন, উহাতে কোন প্রয়াস বা অহঙ্কারের কৃতিত্ব নাই; সেইজন্য উহা ভগবানের গুণ শ্রবণ মাত্রেই আপনা আপনি প্রধাবিত হয়। উহা সর্ব্বভূত-গুহাশয় বা সর্ব্বাত্মক শ্রীভগবানে পরিসমাপ্ত। কাজে কাজেই যাঁহারা বিভিন্নভাবে, সর্ব্বাত্মক ভাব হইতে পৃথক করিয়া, বিশিষ্ট মূর্ত্তি প্রভৃতিতে ভগবানের অর্চ্চনা করেন, যাঁহারা সর্ব্ব জীবে ভগবানের প্রকাশ দেখিতে সক্ষম নহে বলিয়া অন্য দেহে ভগবানকে দ্বেষ করেন, সেই ভেদদর্শী ব্যক্তিগণ এই স্রোতের কথা জানেন না ও তাহাতে কথন শান্তি প্রাপ্ত হন না।

"দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি।" ভাঃ—৩।২৯।২৩।

'অধোক্ষজ' শব্দে শাস্ত্র কি নিগূঢ় ভাবরাশি রাখিয়া গিয়াছেন!! আমাদের দেহে যোগশাস্ত্রোক্ত যে সকল পদ্ম বা চক্র আছে, তাহাদের মধ্যে হৃদয়স্থ পদ্মটী কামনার বশে নিম্নাভিমুখী হইয়া থাকে। যিনি সেই নিম্নাভিমুখী বৃত্তি সমন্বিত— সেই কামনার ক্ষেত্রে হৃদয়-পদ্মে প্রকাশিত হইয়া জীবকে উদ্ধার করেন, তাঁহাকে অধোক্ষজ বলে। আমাদের চিত্তের গতি স্বাভাবিক ভাবে কেবল 'দ্রব্য' 'ক্রিয়া' প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু ভোগের জন্য। কিন্তু এই ভোগাভিমুখিনী যমের সহোদরা যমুনা নাম্নী যে প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাঁহার ভিতরেও প্রকাশিত হইয়া জীবকে তুলিয়া লহেন, সেইজন্য করুণাময়কে অধোক্ষজ নামে অভিহিত করা হয়। এই গেল প্রাকৃতিক ভাবে তাঁহার নির্দ্দেশ। ভাই, পরাগতি বুঝিতে না পার ক্ষতি নাই, Sensation বা ভোগস্পৃহায় মত্ত হইয়া থাক, তাহাতে দুঃখ নাই। ঐ ভোগের মধ্যেই দেখ, "ভোক্তারম্ যুক্ততপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বরং" রহিয়াছেন,—ঐ দেখ ভোগের মধ্যে কি এক 'ঘন আনন্দ' বুদ্ধিতে এত চাঞ্চল্য—এত মানসিক কল্পনা—এত ইন্দ্রিয়গণের ছুটাছুটী পরিসমাপ্ত হইয়া— স্থির হইয়া ডুবিয়া যায়। ভোজনে ব্যগ্রতা ও বিভিন্ন রসাদি গ্রহণ, ঐ দেখ কি এক অভিনব পরিতৃপ্তিতে শান্ত হইয়া গেল। প্রেমের পাত্রকে কামনার বশে

পাইবার জন্য যে কত ছুটাছুটী করিয়াছিলে, কত আশা-নিরাশা, বিরহ-মিলন প্রভৃতি নানারূপে তরঙ্গায়িত কাম-সমুদ্রে উঠিতে ও পড়িতেছিলে; কিন্তু যেমন সেই প্রিয়বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলে, ঐ দেখ কোথা হইতে তোমার মনুষ্য বুদ্ধির মধ্য দিয়া সেই আলিঙ্গনে ইন্দ্রিয়গণ আপনাপনি স্তিমিত হইয়া গেল,—মন মুগ্ধ হইয়া তাহার খেলা বন্ধ করিল,—বুদ্ধি সুষুপ্তভাবে মিশাইয়া গেল। ঐ দেখ অধোক্ষজের বিকাশ। তারপর বুঝিতে পারিবে যে, 'অক্ষজ' বা ইন্দ্রিয় ও মন জন্য জ্ঞানগুলি সদাই তাঁহার 'অধে' বা নিম্নদেশে পড়িয়া থাকে। "অধঃ + অক্ষজম্ + ইন্দ্রিয়জম্ + জ্ঞানম্ — যস্মাৎ" (শ্রীধর)। ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানগুলি যাঁহাতে গিয়া আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলিয়া অশেষে মিশিয়া যায়, সেই আনন্দময়কেই অধোক্ষজ বলে। প্রথম অর্থে তাহার "সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসম্" আকর্ষণ ইঙ্গিত করে। দ্বিতীয় অর্থে তাঁহার "সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্" স্বরূপ তত্ত্বের আভাষ দেয়।

এই ভক্তি যে পরাগতি, এবং এই স্রোত হৃদয়ে জাগিলে 'পুরুষ' বা 'আমি' জ্ঞান অতিগ হইয়া শ্রীভগবানে মিশিয়া যায়; তাহাই বুঝাইবার জন্য ভাগবত নারদের আত্মকাহিনীরূপে বলিলেন,—

"তস্মিংস্তদালব্ধরুচের্মহামতে প্রিয়শ্রবস্য স্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে।" ভাঃ—১।৫।২৭

"যয়া মত্যা পরে প্রপঞ্চাতীতে ব্রহ্মরূপে ময়ি সদসৎ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ এতচ্ছরীরং স্বমায়া স্বাবিদ্যয়া কল্পিতং ন তু বস্তুতোঽস্তীতি তৎক্ষণমেব পশ্যে পশ্যামি।" শ্রীধর॥ "সেই অপ্রতিহত মতি উৎপন্ন হইবার পর তৎসাহায্যে 'আমি' পর প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মরূপে 'আমাকে' চিনিতে পারিলাম; এবং আমার শরীরাদিও যে আমাতেই আমার মায়া দ্বারা কল্পিত হইয়া আছে, ইহাও বুঝিলাম।"

ইহা হইতে 'পরাভক্তি'রূপ অনির্ব্বচনীয়া মতির ফলগুলি বুঝা গেল। প্রথমতঃ—ঐ মতি পরাভিসারিণী বা পরম পুরুষে আপনাপনি অভিসার করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ—উহা "আত্মনি আত্মনম্" বা আমাদের আত্মা বা 'পুরুষ' জ্ঞানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি উহার কাছে আসিতে পারে না। তৃতীয়তঃ উহা—

"ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়ামতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥" ভাঃ—১।৮।৪২।

"গঙ্গা যেরূপ কত শত প্রতিবন্ধক উৎক্রমণ করিয়া, নিজের প্রবাহকে সাগরেই

পরিসমাপ্ত করে, তদ্রূপ আমার মতি অনন্তবিষয়া হইয়া তোমাতেই অবিচ্ছিন্ন গতি উদ্বাহন করুক।” অর্থাৎ এই মতি উৎপন্ন হইলে বস্তু, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতি বুদ্ধি সকল আর আমাদের চিত্ত-স্রোতের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। সেই রসে এই বিশিষ্ট বুদ্ধিগুলি ডুবিয়া যায়, ও তাহাতে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা ও একতানতা উৎপন্ন হয়; এবং তদ্দ্বারা ভগবানের প্রতি রতি ‘উৎ’ বা পরাভিমুখী হইয়া যায়। আমাদের ‘আমি’ জ্ঞান বা ‘আমিটী’ তাহার আধারভূত পরম ‘আমিকে’ পাইয়া, আর ছোট ‘আমি’ স্থাপনে প্রবৃত্ত হয় না; প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মাতেই মিশিয়া যায়। এ ভক্তি ‘প্রত্যৈকতানতা’রূপ ধ্যানের পরিসমাপ্তি ও স্বাভাবিক গতি মাত্র। অভিসন্ধিশূন্য, ভোগাদি বুদ্ধির অতীত, এই স্রোত হৃদয়ে জাগ্রত হইলে ও সর্ব্বাত্মক বা বাসুদেব রূপ ভগবানের দিকে প্রধাবিত হইলে, আপনাপনি পরা-বৈরাগ্য ও অহৈতুকী স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয়।

“বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ ভাঃ—১।২।৭

এ বৈরাগ্য ফলের বৈরাগ্য নয়, ইহা কেবল ফলাকাঙ্ক্ষা—ত্যাগ নহে। ইহা পাতঞ্জলোক্ত গুণ-বিতৃষ্ণারূপ ‘পরা’ বৈরাগ্য। এ অহৈতুক জ্ঞান “শুষ্ক তর্কাদির অগোচর ঔপনিষদ্‌িক জ্ঞান। “শুষ্ক তর্কাত্তগোচরম্ উপনিষদমিত্যর্থ”। শ্রীধর॥ আর এ ভগবান বিশিষ্ট মানসিক তনু দ্বারা আবিষ্কৃত হইলেও বিশিষ্ট ব্যক্তি নহেন, তিনি সর্ব্ব গুহাশয়, সর্ব্বভূতে অধিশয় এবং সর্ব্বাত্মক শ্রীবাসুদেব। মূর্ত্তিতে বিশিষ্ট ভিন্ন ভাব দর্শন করিলে এ তত্ত্ব ফুটিবে না—এ আকর্ষণ জাগিবে না।

ইহাই ‘পুরুষের’ পরম ধর্ম্ম। যে সকল ধর্ম্ম—যে সকল অবয়বী ভাবের সিদ্ধি উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও, সেই পরম আকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বে জীবের রতি উৎপন্ন না করে,—যে ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াও আমরা ভগবানকে দেখিতে না যাইয়া, ‘আমি জ্ঞানী’, ‘আমি ভক্ত’, ‘আমি সাধক’ প্রভৃতি জ্ঞানে আমাদের ছোট ‘আমি’টীকেই দেখিয়া ফেলি, যাহার ফলে একত্ব বুদ্ধির আভাস পাইয়াও সাধকেরা আপনাপন ‘দল’ ‘মত’ প্রভৃতির স্থাপনা করিতে যায়; সে ধর্ম্ম—সে অনুষ্ঠান কেবল শ্রম বা খাটাখাটুনী মাত্র।

“ধর্ম্ম স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্। ভাঃ—১-২-৮॥

এই আপবর্গ ধর্ম্মের ফল কখনও বিশিষ্ট অর্থ হইতে পারে না। ইহার উদ্দেশ্য, গতি প্রয়োজন ও বস্তু, শ্রীভগবান ভিন্ন অন্য অর্থে পর্য্যবসিত হইতে পারে না;

কাজেই আর দ্বিতীয় ‘অর্থ’ও থাকে না। কেহ কেহ মনে করেন যে, ধর্ম্মের ফল অর্থ ও তাহার ফল কাম; তাহার ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি। কিন্তু একের প্রতি অব্যভিচারিণী অদ্বিতীয়া মতি কখনও বাহ্য বস্তু প্রসব করিতে পারে না। আর সেই পরম অবয়বীরূপ ধর্ম্মে,—এক অন্ত বা পরিসমাপ্ত রূপ পদার্থকে পাইয়া বা পাইতে গেলে, কাম আর বাহ্য বস্তু লাভে প্রবৃত্ত হয় না।

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হি স্মৃতঃ। ভাঃ—১।২।৯

তবে কামের আবশ্যকতা কি? কামের আকর্ষণ কেন জীবের হৃদয়ে সতত খেলিতে থাকে? যে কামের মূর্ত্তি এবং বিশিষ্ট ভাব ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সকল তত্ত্বগুলিকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা কি কেবল সাধকের যুদ্ধ করিবার উপযোগী বস্তুরূপে সৃজিত? সাধক কি কামের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক পেশী (Muscles) গুলিকে পুষ্ট করিবে? না কামের অন্য কোন ভাষা আছে? যতক্ষণ জীব, ‘জীব’ভাবে থাকে, যতক্ষণ জীব When waxing stronger thy soul glides from her safe retreat and seeing her image in space and says ‘This is I’ প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দর্শনে ‘অহম্ ইদমেব ইত্যভিমানেন’ (শ্রীধর) ‘আমি এই’ এইরূপ ভাবে আপনাকে ভেদ-বিশিষ্টতার বশে দেখিতে চায়, ততক্ষণই সেই পরম-পুরুষের প্রেমই জীবের নিকট কাম বা বাহ্য ভাবে স্বীয় সুখ স্বরূপের অনুসন্ধান-শক্তিরূপে খেলিতে থাকে। জীবের ‘আমি’ সেই পরমাত্মা সমুদ্রে তরঙ্গরূপে উৎপন্ন হইয়া, কেন বিশেষের দিকে কামবশে প্রধাবিত হয় বলিতে পার? উহা কি কেবল অবিদ্যারই খেলা? না অবিদ্যার ভিতর কিছু বিদ্যা ভাবের ব্যঞ্জনা আছে? একখণ্ড প্রস্তরকে আকাশের দিকে ছুড়িয়া দাও, সে যে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে তাহার কারণ কি তাহার ক্ষুদ্র শক্তির আকর্ষণ, না পৃথিবীর প্রেমময় অভেদ টান? পৃথিবী যেমন তাহার অংশভূত বস্তু নিচয়কে বাহিরে রাখিয়া স্থির থাকিতে পারে না, ক্রমশঃই বক্ষের দিকে টানে,—সেইরূপ জীবের জীবন স্বরূপ শ্রীভগবান, তাহাকে বাহিরে ‘জীব’রূপে বিশিষ্ট ভাবে বিসৃজন করিয়া কি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন? তাঁহার প্রেমময় স্বরূপানুভূতিই ত’ জীব হৃদয়ে কামরূপে খেলিয়া অংশভূত জীবকে তাঁহারই বাহ্যভাব জগদ্বস্তুর প্রতি আকর্ষিত করিতেছে। ঐ আকর্ষণের বশে আমরা বস্তু গুলিকে হৃদয়ে তুলিয়া লইলে, কি এক আনন্দের উৎস বহিয়া যায়; ও

এক ক্ষণের জন্যও আমাদের জৈবিক 'আত্ম-পর বুদ্ধি' সেই আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া যায়।

সেই আনন্দ সংপ্লবে আর 'উভয়' ভাব থাকে না। "আনন্দ সংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে।" (ভাঃ—১-১-১৮)। সেই জন্যই প্রতিবিম্ব স্বরূপী জীবকে পুনরায় স্ববক্ষে ধারণ করিবার জন্য ভগবানের—সেই পরমাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের,—প্রেমময় হস্ত-প্রসারণই ত' 'ক্লীং' বা কামবীজ। সুতরাং কামের ফল আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি কামরূপে নহে; যতক্ষণ জীব, জীবরূপে থাকে, ততক্ষণই ভগবান কামরূপে খেলেন। "কামস্যনেন্দ্রিয় প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা"। কামই জীবের মূল মন্ত্র ও একমাত্র প্রেরণাশক্তি। উহা বিশিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া, 'সর্ব্ব'ভাবের ভিতর দিয়া, শ্রীভগবানে পরিসমাপ্ত হয়। এই পরিসমাপ্তিই তত্ত্বজ্ঞান,—সেই তত্ত্ব, যাহা অদ্বয়জ্ঞান স্বরূপ ও যাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হইতেছে। যদি তিনি অনন্ত বস্তুরূপে 'আমিটীকে' আকর্ষণ না করিতেন, তাহা হইলে বস্তু, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি থাকিত না। এই সকল শাস্ত্র সেই আকর্ষণ-তত্ত্বের বিশেষ বিশেষ ভাব স্ফূরণের জন্য রহিয়াছে। তিনি 'সর্ব্ব'তে আছেন বলিয়াই জীব সর্ব্বাত্মক জ্ঞান লাভ করিতে পারে। আপাততঃ 'অহং' ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন বস্তুগুলিকে যখন আমরা হৃদয়ে গ্রহণ করি, তখনই ত' ছিন্ন 'আমি' ও ছিন্ন বস্তুর অতিগ কি এক সৎ চিৎ ও আনন্দ-ঘন 'আমির' আভাস পাওয়া যায়; এবং তদ্দ্বারা আমরা সেই আকর্ষণের মধ্যে আত্মভাব দেখিতে পাই; অনন্ত সুখ দুঃখ, 'আমির' ভিতর ডুবিয়া যায়। ফলে কি এক মহান্ 'আমিটী' রহিয়া যায়। 'সর্ব্ব'কে আমিতে' শেষ করিয়া দেওয়ার নামই সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা। অতএব বুঝা গেল ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চারি ভাবেই শ্রীভগবান আপনার স্বরূপের ব্যঞ্জনা করিতেছেন ও সেই মহাভাবময় শ্রীভগবানই ভাগবতের বেদ্য ও গতি। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

মোক্ষ]

উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য ভূমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভগবান সনৎকুমার নারদ মুনির চিত্তে মোহ উৎপাদন করিবার জন্য রাগাদি উপাসনার ফলও সেই সেই স্থানে করিয়াছিলেন। তদনন্তর নারদ সনৎকুমারকে পুনঃ প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—হে ভগবন্ এই কামনা রূপ আশা হইতে

কোন্‌টি অধিক? এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সনৎকুমার বলিলেন,—"হে নারদ! এই সর্ব্ব জীব আত্মারূপে যে প্রাণকে নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, সেই প্রাণ এই আশা অপেক্ষা অধিক। হে নারদ, রথচক্রের যেরূপ অরা আছে, সেই অরা যেমন চক্রের নাভির আশ্রিত; সেইরূপ সমস্ত বিশ্ব এই প্রাণের আশ্রিত। এই প্রাণই সর্ব্ব কারক রূপ। যত দেহধারী জীব আছে, সেই সমস্ত জীবই প্রাণরূপ। ইহলোকে সেই প্রাণ হইতে ভিন্ন কিছুই নাই।" হে শিষ্য, যখন সনৎকুমার নারদকে এই প্রকার প্রাণের অধিকতা কথন করিলেন, তখন নারদ মুনি প্রাণের পর তত্ত্ব কি জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া পুনঃ প্রশ্ন হইতে উপরত হইলেন। অনন্তর নারদ মুনিকে তুষ্ণী হইতে দেখিয়া ভগবান সনৎকুমার কৃপা পরবশ নিজেই প্রাণের পর তত্ত্বের উপদেশ করিতে লাগিলেন,—"হে নারদ! দু'টী বস্তু এই পিণ্ডে উপলব্ধ হইতেছে; এক আত্মা এই পিণ্ডের পদাগ্র হইতে পিণ্ডে প্রবেশ করিয়া থাকে, আর এক আত্মা এই পিণ্ডের কেশ বিন্যাসের সীমা বিদারণ করিয়া প্রবেশ করে। তাহার মধ্যে চক্ষু শ্রোত্রাদি অনেক ভেদ বিভিন্ন এক জাতীয় করণ যদ্দ্বারা উপলব্ধি হয়, সে আত্মা নহে। আর দ্বিতীয় যে একমাত্র উপলব্ধি করে সে বহু নহে,—এক; সেই আত্মা হইতে পারে। সুতরাং পুরুষের সকল প্রকার উপলব্ধি করিবার একমাত্র করণ—এই মন, সকল করণের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। কৌষিতকী উপনিষদে এবং বাজসনেয়কে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে "প্রজ্ঞা দ্বারা চক্ষুতে সমারূঢ় হইয়া চক্ষুদ্বারা সমস্ত রূপ দর্শন কর;" সুতরাং অন্তঃকরণই সমস্ত উপলব্ধির কারণ। প্রাণ আবার তদাত্মক; যে প্রজ্ঞা সেই প্রাণ, যে প্রাণ সেই প্রজ্ঞা; ব্রাহ্মণ ভাগে এইরূপই দেখা যায়। প্রাণ-সংবাদাদিতেও করণ সমুদায়ই প্রাণ। কৌষিতকী উপনিষদে প্রাণে প্রজ্ঞাদি সর্ব্বকরণের লয় সপ্রমাণিত হইতেছে; অতএব যিনি পদদ্বয় অবলম্বন করিয়া এই পিণ্ডে প্রবেশ করেন তিনিও ব্রহ্ম; তবে উপলব্ধার উপলব্ধির করণ বলিয়া তিনি গুণভূতও অপ্রধান, সুতরাং তিনি আত্মা হইতে পারেন না।

এখন দুটী আত্মার মধ্যে একটী অনাত্মা হইয়া গেল; আর একটী যিনি সীমাভেদ করিয়া প্রবেশ করেন, তিনিই সকলের উপাস্য। হে নারদ, পূর্ব্বোক্ত অনাত্ম প্রাণের জ্ঞান হইতে অতিবাদীপণা হইবে, ইহা তুমি নিশ্চয় করিও না। কারণ যদি সেই প্রাণের অধিক কোন বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে সেই প্রাণের জ্ঞান হইতেই অতিবাদীপণা সিদ্ধ হইত। পরন্তু

সেই প্রাণ হইতে সত্য বস্তু অধিক। সেই প্রাণের জ্ঞান হইতে অতিবাদীপণা হইবে না। কিন্তু যে পুরুষ নিরন্তর সেই সত্য বস্তুকেই কথন করে, সেই পুরুষকে তুমি মুখ্য অতিবাদী বলিয়া জানিও। হে শিষ্য, সত্য বস্তুর কথনকারী পুরুষই মুখ্য অতিবাদী। সনৎকুমারের এই প্রকার বচনের তাৎপর্য্য এই যে পরব্রহ্ম এই জগতের কারণ রূপে কথিত হইয়াছে, এবং যে পরব্রহ্ম সুখ রূপে এবং যে পরব্রহ্ম নাম হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত সর্ব্ব বিশ্বরূপে কথিত হইয়াছে, সেই পরব্রহ্মই এই সত্য শব্দের অর্থ। ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে পুনঃ এই প্রকার বচন কহিতে লাগিলেন যে; এই প্রাণের পরে যে সত্য বস্তু আছে, সেই সমস্ত সত্য বস্তুই তোমার জানিবার যোগ্য। সেই সত্য বস্তুর বিচার বিনা তুমি আপনাকে কৃতকৃত্য জানিয়া স্থির হইতে পারনা। নারদ বলিলেন, হে ভগবন্, আমি সেই সত্য বস্তুকে জানিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সেই সত্য বস্তুর উপদেশ করুন। হে শিষ্য! ভগবান্ সনৎকুমার নারদ মুনিকে যেরূপ সত্য বস্তুর কথন করেন, সেইরূপ বিজ্ঞান, মনন, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, কৃতি, সুখ, এই ছয় পদার্থের প্রশ্ন উৎপন্নকারী বচন কহিয়াছিলেন। সেই বচন শ্রবণ করিয়া নারদ সনৎকুমারকে ছয়বার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এখানে আনন্দ স্বরূপ সত্য বস্তু ত' উপেয়। আর অন্য বিজ্ঞানাদি ষট্ পদার্থ তো উপায় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্তির সাধন রূপ; সুতরাং পুনরুক্তি দোষ হয় নাই। হে নারদ, যে পুরুষ সেই সত্যরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জানেন, সেই পুরুষই সত্য বস্তুর স্পষ্টরূপে কথন করিতে সমর্থ। সেই সত্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানহীন পুরুষ কথন করিতে সমর্থ নহেন। অতএব এই জানা যাইতেছে যে, সেই সত্য বস্তুর কথন বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমানরূপ 'বিজ্ঞানই' তাহার কারণ। নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা সেই সত্য বস্তুর চিন্তন রূপ যে মনন, সেই মনন দ্বারা যখন সেই সত্য বস্তু বা প্রমেয়ের অসম্ভাবনা নিবৃত্তি হয়, তখনই সেই সত্য বস্তুর বিজ্ঞান হইয়া থাকে। মনন বিনা সেই সত্য বস্তুর বিজ্ঞান হয় না; সুতরাং জানা যাইতেছে যে, সেই 'মননই' বিজ্ঞানের কারণ। হে নারদ, গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে বিশ্বাস রূপ যে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই এই মনন করিতে প্রবৃত্ত হন। শ্রদ্ধারহিত ও নাস্তিক পুরুষ এই মননে প্রবৃত্ত হইবেন না। অতএব এই জানা যাইতেছে যে সেই 'শ্রদ্ধাই' মননের কারণ। এই বেদান্তশাস্ত্র জীব ও ব্রহ্মের অভেদ অথবা 'ভেদ কথন করে, এই প্রকার প্রমাণগত অসম্ভাবনা নিবৃত্তিকারিণী যে যুক্তি এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ে সমগ্র বেদান্তের তাৎপর্য্য নিশ্চয় করাইতে সমর্থ

যে সমস্ত যুক্তি, সেই যুক্তি চিন্তনের নাম নিষ্ঠা। এরূপ নিষ্ঠাবান্ পুরুষই শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হন। নিষ্ঠা রহিত পুরুষের শ্রদ্ধা হইবেনা। সুতরাং জানা যাইতেছে 'নিষ্ঠাই' শ্রদ্ধার কারণ। যজ্ঞাদি যে বহিরঙ্গ সাধন এবং শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন, এই দুই প্রকার সাধনের যে অনুষ্ঠান, তাহার নাম কৃতি। যে পুরুষ এই প্রকার কৃতি-যুক্ত, সেই পুরুষই অন্তঃকরণ শুদ্ধি এবং একাগ্রতা সম্পন্ন হইয়া নিষ্ঠাবান্ হইয়া থাকেন। কৃতি বিনা নিষ্ঠা হইবে না। অতএব এই জানা যাইতেছে যে, 'কৃতিই' নিষ্ঠার কারণ। ইহলোকে যে পুরুষ সুখরূপ পুরুষার্থ প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, সেই পুরুষই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন করেন। সুখের ইচ্ছা বিনা কোনও পুরুষ সেই সমস্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইবে না। যদ্যপি দুঃখের অভাবকে ইচ্ছা করিয়াও লোকের সেই সমস্ত সাধনে আবেগ হয়, তথাপি সেই দুঃখাভাব স্বতঃ পুরুষার্থরূপ নহে। কিন্তু সেই দুঃখাভাব সুখের অভিব্যক্তির সাধনরূপ হওয়াতে জীবের ইচ্ছার বিষয় হয়। তাহাতে এই জানা যাইতেছে যে 'সুখ' কৃতির কারণ।

হে শিষ্য, সনৎকুমারের এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া, সাংসারিক সুখে বিরক্ত নারদ মুনি সেই সাংসারিক সুখকে দুঃখ গণনা করিয়া মুখ্য সুখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্! 'আমার মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে', যে পুরুষের চিত্তে এই প্রকার কামনা আছে, সেই পুরুষ সেই সুখের বস্তুস্বরূপ অবশ্য জানিবার যোগ্য হ'ন। যে সুখের জ্ঞান হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, সেই সুখ এই সংসারে প্রসিদ্ধ নাই; কারণ এই সংসারে বিষয় হইতে জীব যে সুখ প্রাপ্ত হয়, সেই সুখ সুখ-রূপ নহে, তাহা দুঃখ-রূপই হয়। কারণ ইহলোকে যে বস্তুর যে স্বভাব, সেই বস্তুর সেই স্বভাব কখনও অন্যথা হইবে না। যেরূপ অগ্নির উষ্ণ স্বভাব কোন কালেও অন্যথা হইবে না, সেইরূপ এই বিষয় জন্য সুখও যদি সুখ-রূপ হইবে, তাহা হইলে এই সুখ কোন কালেও দুঃখ রূপ হওয়া উচিত নয়; কিন্তু এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিষয়-জন্য সুখ প্রাপ্তিকালে জীবকে দুঃখই প্রদান করে, এবং বিয়োগ কালেও জীবের অসীম দুঃখ হইয়া থাকে। এই প্রকার আদি অন্তে দুঃখ-দায়ক বিষয়-সুখ মধ্যকালে জীবের কি প্রকারে সুখদায়ক হইবে? কিন্তু আদি অন্তের ন্যায় মধ্যকালেও সেই বিষয়-জন্য সুখ দুঃখ-রূপই হয়। হে ভগবন্, এই দুঃখ-রূপ বিষয় সুখে যে জীবের সুখ-রূপতা প্রতীত হয়, তাহা কেবল অজ্ঞানের বশে হইয়া থাকে। শস্ত্র প্রহার যদিও দুঃখ-রূপ, তথাপি পরিপক্ক ব্রণে সেই শস্ত্র প্রহার সুখ-রূপই প্রতীত

হইয়া থাকে। সুতরাং হে ভগবন্, যাহাতে বাস্তবিক সুখ আছে, তাহা আমাকে বলুন।" ভগবান সনৎকুমার নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,—"হে নারদ, দেশ, কাল, বস্তু, পরিচ্ছেদ রহিত যে ব্যাপক বস্তু, সেই বস্তুকেই বিদ্বান পুরুষ সুখরূপে কথন করিয়াছেন। সেই 'সর্ব্ব' পরিচ্ছেদ রহিত হওয়াতে যে বস্তুকে ভগবতী শ্রুতি "ভূমা" এই শব্দে কথন করিয়াছেন, সেই ভূমাকেই তুমি সুখরূপ বলিয়া জান। সেই 'ভূমা' ভিন্ন সর্ব্ব পদার্থই দুঃখরূপ হয়। শ্রুতি যথা,—"যদ্বৈ ভূমাত্যসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" হে নারদ, যদি তোমার সেই বস্তুর সুখের স্বরূপ নির্ণয় করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি সেই 'ভূমা' পদার্থ জানিতে ইচ্ছা কর। অনন্তর নারদ মুনি সনৎকুমারকে সেই 'ভূমা' পদার্থ বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে নারদ, যে তত্ত্ব বিষয়স্থিত হইয়া এই বিদ্বান্ পুরুষ 'আপনা হইতে ভিন্ন রূপে' কোনও পদার্থকে নেত্রেন্দ্রিয় দ্বারা দেখেন না, শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করেন না, মন দ্বারা জানেন না; সেই তত্ত্বই 'ভূমা' শব্দের অর্থ এবং 'সুখ' শব্দের অর্থ। যে পদার্থ বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে এই পুরুষ আপনার আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থকে নেত্রেন্দ্রিয় দ্বারা দেখেন এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করেন ও মন দ্বারা জানেন, সেই পদার্থ অল্প এবং দুঃখ-রূপ। সেইজন্য শ্রুতি বলিলেন,—"দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি"; সুতরাং সেই 'ভূমা' অমৃত রূপ এবং সর্ব্ব বিকার রহিত। সেই সমস্ত অল্প পদার্থ মর্ত্ত্যলোক এবং সর্ব্ব বিকারবান্। হে নারদ, এই সুখরূপ আত্মাকে যখন অধিকারী পুরুষ গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে জানিতে পারেন, তখন তিনি মুখ্য অতিবাদী হ'ন। সেই 'ভূমা' হইতে ভিন্ন প্রাণাদির জ্ঞান হইতে এই পুরুষ মুখ্য অতিবাদী হইতে পারে না। সুতরাং মুখ্য অতিবাদীপণা প্রাপ্তির জন্য এই অধিকারী পুরুষ সেই সুখরূপ ভূমাকে অবশ্য জানিবেন। হে শিষ্য! যখন ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে এই প্রকার ভূমার উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন নারদ ভাবিলেন, ভগবান্ যে আমাকে সুখরূপ ভূমার উপদেশ দিলেন, সেই ভূমার কোন আধার আছে অথবা সেই ভূমা নিরাধার। যদি সেই ভূমা কোন আধারে আনা যায়, তাহা হইলে তাহা ঘটাদি পদার্থের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন হইবে। আর সেই ভূমাকে যদি নিরাধারে আনা যায়, তবে সেই নিরাধার 'ভূমা' আমার বুদ্ধিতে কিরূপে আরূঢ় হইবে? এই প্রকার চিন্তা করিয়া নারদ সনৎকুমারকে প্রশ্ন করিলেন,—হে ভগবন্, সেই সুখরূপ 'ভূমা' কোন আধারে স্থিতি প্রাপ্ত হ'ন, সেই আধার

আমাকে বলুন। সনৎকুমার বলিলেন হে নারদ, তুমি যে সেই ভূমার আধার জিজ্ঞাসা করিতেছ; তাহা ব্যবহারোপযোগী অথবা বাস্তবিক আধার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ? তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নকে যদি তুমি অঙ্গীকার কর, তবে মায়া আদি এই সর্ব্ব প্রপঞ্চ সেই ভূমার বিভূতি। সেই বিভূতি রূপ মহিমাতেই 'ভূমা' স্থির হ'ন। ইহা দেবীসুক্তে শেষ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে। সায়নাচার্য্য তাহার ভাষ্যে কহিয়াছেন, "এতদুপলক্ষিতাৎ সর্ব্বস্মাৎ বিকারজাতাৎ পরস্তাৎ বর্ত্তমানা অসঙ্গোদাসীন কুটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য রূপাহং মহিম্নে বেতাবতী সম্বভুব।" সুতরাং সেই বিভূতি রূপ মহিমাই সেই ভূমার আধার।

হে ভগবন্, ইহলোকে সেই বিভূতি রূপ মহিমার এবং সেই বিশিষ্টের পরস্পর ভেদই লক্ষিত হয়; এবং সেই 'ভূমা' ঘটাদির ন্যায় বস্তু পরিচ্ছেদ সম্পন্ন হইবে; সুতরাং অনিত্য। হে নারদ, যেরূপ ইহলোকে দেবদত্ত নামক পুরুষের গো, অশ্ব, হস্তি, হিরণ্য, দাস, ভার্য্যা, ক্ষেত্র, গৃহ ইত্যাদি যে বিভূতি আছে, সেই বিভূতি রূপ মহিমা যেরূপ সেই দেবদত্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন হইয়া প্রতীত হয়; আর সেই দেবদত্ত নামক পুরুষের সেই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি আশ্রিত হইয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ এখানে সেই মায়া সহিত প্রপঞ্চ রূপ মহিমা সেই সুখরূপ ভূমা হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু সেই মহিমা সেই 'ভূমা' হইতে অভিন্ন। সুতরাং সেই 'ভূমা' বিষয়ে ভেদরূপ বস্তু পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে না। হে ভগবন্, যদি কদাচিৎ সেই মহিমা 'ভূমা' হইতে অভিন্ন হয়, তবে সেই মহিমার ও ভূমার আধার ও আধেয় ভাব থাকিবে না। কারণ ইহলোকে পরস্পর ভিন্ন পদার্থেরই আধার ও আধেয় ভাব হয়। হে নারদ, যেরূপ "স্বয়ং দাসস্তপস্বিনঃ" অর্থাৎ তপস্বী পুরুষ নিজেই নিজের দাস। এস্থলে একই তপস্বী বিষয়ে স্বামী ও দাস ভাব হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সুখরূপ ভূমার সর্ব্ব পরিচ্ছেদ রহিত যে আপনার স্বরূপ, সেই আপনার স্বরূপই সেই ভূমার মহিমা। সেই স্বরূপ ভূত মহিমাতে সেই 'ভূমা' ব্যবহার দৃষ্টি অনুসারে স্থিত হ'ন। পরন্তু সেই ভূমার বাস্তবিক কোন আধার আছে; এই দ্বিতীয় পক্ষ যদি তুমি অঙ্গীকার কর, তাহা সম্ভব নহে। কারণ পূর্ব্বোক্ত মহিমার স্বরূপ (স্বরূপ ভূত মহিমা) হইতে ভিন্ন পদার্থ বিষয়ে তো সেই 'ভূমা' কখনই থাকিতে পারে না। স্বরূপ ভূত মহিমাতে যদি এই ভূমার স্থিতি কথন করা যায়, তাহাও ব্যবস্থার দৃষ্টি লইয়া বলিতে হইবে। সেই ব্যবহার দৃষ্টি পরিত্যাগ করিলে, সেই 'ভূমা' আধার রহিত নিরাধার বলিয়া কথিত হইবে। এক্ষণে সেই নিরাধার ভূমা কি প্রকারে বুদ্ধিতে আরূঢ় হইবে, তাহা নারদের

শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য প্রথমে সেই ভূমাকে তৎপদার্থরূপে বর্ণিত হইবে। হে নারদ, সেই তৎপদার্থরূপ ভূমাই দশ দিকে এবং তিন কালে স্থিত হন। আর যেরূপ নির্ম্মল আকাশে 'গন্ধর্ব্ব নগর' কল্পিত হয়, সেইরূপ সর্ব্ব ভেদ রহিত এই 'ভূমা' বিষয়ে দেশ, কাল, দিক, আদি সর্ব্ব স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ কল্পিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র (কাশীধাম)।

মোক্ষ]

প্রণব-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা গতবারে সামান্য ভাবে প্রণবের 'ধনু'রূপ ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি যে, যখন জীব সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা-ভাবে সমস্ত জগদ্বস্তুকে বুঝিতে চায়, তখন 'সর্ব্ব' বস্তুই সার্ব্বজনীন জ্ঞানের ভিতর দিয়া 'সর্ব্বাত্মতা' ভাবে পরমাত্মা বা শ্রীভগবানকেই লক্ষিত করিতে পারে। 'সার্ব্বজনীনতা' ও 'সর্ব্বাত্মতার' প্রভেদটী আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সার্ব্বজনীন জ্ঞান অনেক প্রকারে জগতে বিকীর্ণ হইতেছে। এখন আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই 'বস্তু' ও শক্তির প্রকাশ গুলিকে বিশেষ ভাবে দেখিয়া ক্ষান্ত হয়েন না, পরন্তু তাঁহারা ঐ সকল ব্যাপারের মূলে যে একটী সার্ব্বজনীন নিয়ম আছে, তাহা বুঝিবার প্রয়াস পান। কিন্তু আমাদের জ্ঞান যে সর্ব্বাত্মতা ভাবে উপনীত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক বিষয়ে আমরা সার্ব্বজনীন নিয়ম বা বিধি সকল দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ঐ বিধি বা নিয়ম যে 'আত্ম' ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য, তাহা প্রায়ই মানব বুঝিতে পারে না। আপাততঃ ভাবান্তর বলিয়া মনে হইলেও, আমরা বর্ত্তমানে দুই একটী উদাহরণ দ্বারা সার্ব্বজনীনতা ও সর্ব্বাত্মতার প্রভেদ বুঝিতে চেষ্টা করিব; তাহা হইলে বোধ হয় প্রণবের 'পরাগতিরূপ ভাব' হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

প্রথম উদাহরণটী আমরা প্রেততত্ত্ব হইতে লইব। স্থূলদেহ নাশের পর মানব বাস্তবিক মরিয়া যায় না, এবং মৃত্যুর পরও তাহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম-তর ক্রমাভিব্যক্তি হইতে থাকে; ইহা লইয়াই 'প্রেততত্ত্ব'। পাশ্চাত্য জগতে, এমন কি আমাদের দেশেও এমন দিন আসিয়াছিল, যে অনেকে জীবের এই গতি সম্বন্ধে সন্ধিহান হ'ন। এক্ষণে মানবের মৃত্যুর স্বরূপ ও মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম

ও সূক্ষ্মতর ভাবে অবস্থিতি, এবং তৎসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পরিজ্ঞাত হইলে, সেই 'সার্ব্বজনীন' জ্ঞানের ফলে আমাদের স্থূল জীবন একটু আশাপ্রদ হইতে পারে বটে। 'প্রেত' বিজ্ঞানের ফলে আমরা অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে পারি সত্য, কিন্তু ঐ জ্ঞানের সহিত শ্রীভগবানের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। উহাতে শ্রীভগবানের স্থানও নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই জীবের এই সূক্ষ্মগতি সম্পন্ন হয়; ভগবান থাকুন বা না থাকুন, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। ভগবদ্ভক্তির সাহায্যে হয়ত এই বিজ্ঞান সহজে লাভ হইতে পারে; কিন্তু ভগবানকে না মানিলেও যে তাহা হয় না, একথা বলা যায় না। 'প্রেততত্ত্ব'-বাদীরা প্রায়ই সূক্ষ্ম ভাবে স্থিত 'আমি'র সূক্ষ্মগতি দেখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। ইহা 'সার্ব্বজনীন' জ্ঞানের স্তর; এবং এই ভাবেই আজকাল অনেকে ধর্ম্মালোচনা করেন।

আর্য্যশাস্ত্রের গতি অন্য প্রকার। আর্য্যশাস্ত্র হয়ত দেহীর অবিনশ্বরত্ব প্রভৃতির উপদেশ দেন; কিন্তু ঐরূপ সূক্ষ্ম ও সার্ব্বজনীন তত্ত্বের উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি কেবল জীবকে ভেদ ভাবে আশ্বাস দিবার জন্য নহে। "দেহীনস্মিন্ যথাদেহে কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ ——"একথা যখন গীতা উপদেশ দেন, তখন হয়ত কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এতদ্দ্বারা পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্বের সমর্থনই করা হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; "ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি" শব্দে শ্রীভগবান এই 'সার্ব্বজনীন' জ্ঞানের ভিতর দিয়া বুদ্ধির 'একাধিকরণে অবসান' খেলার ভাষা শিক্ষা করিতে বলিলেন। তাঁহার মতে 'জীব মৃত্যুর পরও পুনরায় জন্মায়', এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, যখন মৃত্যু কিছুই নহে, তখন ইচ্ছামত ভেদবুদ্ধির সাহায্যে অহঙ্কারের বশে হাসিয়া খেলিয়া লও। জীবকে একটী মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। তিনি বাহ্য ও স্থূল ভাবে অবস্থিত জীবন ব্যাপারটী যে সূক্ষ্মতর জীবভাবেরই বিকাশ ও ঐ জীবভাবে স্থূল মানবের সমস্ত কর্ম্ম ইচ্ছা প্রযত্ন সকল নিঃশেষে মিশিয়া যায়, এই চঞ্চল জীবন ব্যাপারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, স্থূলাতীত, বৃত্তির অতিগ, অচল-প্রতিষ্ঠ তত্ত্বের আভাষ দিলেন; তিনি ত' দেহাত্মবুদ্ধির স্থাপনা করিলেন না। প্রেততত্ত্ববিদ্ রামের মতে 'আমি রাম' মৃত্যুর পরপারেও 'রাম' থাকিব, এই বুদ্ধি আছে। তাহার জ্ঞান সূক্ষ্ম লোকে যাইতেছে সত্য বটে, কিন্তু উহা ক্ষণিক 'আমি রাম' এই বুদ্ধির সাহায্যে। 'আমি রাম' এই জ্ঞানটীও যে থাকিবেনা, এবং তৎপরিবর্ত্তে যে এক মহত্তর, অনন্ত 'রাম' 'শ্যাম' আদি ব্যক্ত ভাবের সমন্বয়কারী

'আমিটী' থাকিবে, ইহা মনে করিতে গেলে রাম শিহরিয়া উঠে। সেইজন্য আমাদের দেশেও অনেক প্রেত-তত্ত্ববিদেরা মৃত্যুর পর 'রাম' থাকিবে, এইটুকু স্বীকার করেন; কিন্তু পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিতে ভয় পান। "তথা দেহান্তর প্রাপ্তি" এই শব্দে ভগবান বুঝাইয়া দিলেন যে 'রাম' 'শ্যাম' প্রভৃতি ব্যক্ত জীবগুলি প্রকৃত 'আমি' নহে; উহা 'আমির' এক জীবনের প্রকাশ। শুধু তাহাই নহে, 'সর্ব্ব'দেহে, 'সর্ব্ব'জীবেই যে ভগবানই একমাত্র 'আমি', ইহাই দেখাইবার জন্য শাস্ত্র জন্মান্তরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থিত জীবের অবতারণা করিলেন। যেমন 'কলেজ ষ্ট্রীট' এই নাম লেখা কাষ্ঠফলক খানি, কাষ্ঠফলকত্ব দেখাইবার জন্য নহে; কিন্তু তাহা হইতে অতিগ মহত্তর ও কাষ্ঠফলকের অনেক ঊর্দ্ধে স্থিত রাস্তাটীকে দেখাইবার জন্যই আছে;— তদ্রূপ গীতার শ্লোকে 'রাম' 'শ্যাম' প্রভৃতি ব্যক্ত ভাবগুলিকে দেখায় না। তদ্‌তীত জীব এবং পরে শ্রীভগবানকে দেখাইবার জন্যই ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রেত-তত্ত্ববিৎ, 'রাম'রূপ বিশিষ্ট ভাবটীকে সংরক্ষণের জন্য, প্রেততত্ত্ব লইয়া আছেন; সেইজন্য রাম-ভাবে প্রেতের আত্মীয় বন্ধু, রামের ক্ষুদ্র মনের গতি ও এমন কি তাহার পোষাক পরিচ্ছদও কল্পিত করিয়া দেখেন। তিনি সূক্ষ্ম লোকগুলিকেও স্থূলের ভাবে রঞ্জিত করিয়া বুঝেন। স্থূল ভাবটী যে সত্য, এইটী তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস; সেইজন্য প্রেতলোকে বিবাহ ও সন্তানাদি উৎপত্তি পর্য্যন্তও দেখিতে ছাড়েন না। প্রেত তত্ত্ববিদের ভাষা সার্ব্বজনীন ভাবে থাকিলেও, ঐ সার্ব্বজনীন জ্ঞানটী অনিত্য দেহাত্মজ্ঞান ও স্থূল বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রের গতি অন্যরূপ; শাস্ত্র স্থূলের ভাষায় 'আত্মা' বা 'ভগবানের' ব্যঞ্জনা করেন না; ভগবানের ভাষায় স্থূলকে দেখিতে শিখায়; কারণ উহা সর্ব্বাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত। তালগাছ হইতে একটী তাল পড়িল; যিনি এই পতন ব্যাপারটীতে তালরূপ বিশিষ্ট ভাবের প্রতিপত্তি দেখেন, তাঁহার স্থূলাতীত ও সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত শক্তিরূপ মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের জ্ঞান হইবে না। কিন্তু যিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি শুধু 'তাল' কেন, সমগ্র জগদ্‌বস্তুর ভিতর দিয়া জগদ্রূপ আধারের দিকে যে নিত্য আকর্ষণ শক্তি রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, গ্রহ নক্ষত্র ক্ষেত্রেও সেই শক্তির খেলা দেখিতে পান; পরে আত্মাই যে আধার, ইহা বুঝিতে পারিয়া 'সর্ব্ব' জগদ্‌বস্তুর আত্মাভিমুখিনী প্রবৃত্তির ইঙ্গিত— সামান্য 'তাল পড়া' ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারেন। সার্ব্বজনীনতা ও সর্ব্বাত্মতার ইহাই প্রভেদ।

প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, 'সর্ব্ব' 'আত্মা'ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, 'সর্ব্বের' ভিতর দিয়া একটী বিশেষ অদ্বিতীয় সত্ত্বা বা শক্তির বোধ না ফুটিলে, সার্ব্বজনীনতাও সিদ্ধ হয় না। আজ একটী 'তাল' পড়িতে দেখিয়া, কাল যে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি সকলই পড়িতে পারে, এ বোধ উৎপন্ন হইতে গেলে, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বিশিষ্ট নামরূপের অতীত সত্ত্বা বা শক্তির উপলব্ধি হওয়া আবশ্যক। এইরূপ ব্যক্তের অতীত একত্বের উপলব্ধি না হইলে, আমরা ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট ঘটনাগুলিকে সমানাধিকরণে আনিয়া 'নিয়ম' প্রভৃতির পরিজ্ঞান করিতে পারিতাম না। এই সর্ব্বাত্মতা বুদ্ধির বিকাশ হয় না বলিয়া, আমরা সংসারে এত ভুগিয়াও কাম, লোভ প্রভৃতির সার্ব্বজনীন নিয়মগুলি বুঝিতে পারি না। একজন কামের শক্তির মধ্যে পড়িয়া কিরূপে সেই আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাহা দেখিয়াও আমরা কামের খেলা বা গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না; এবং সেইজন্য নিজে এত দেখিয়াও সেই গর্ত্তে নিপতিত হই। শুধু তাহাই নহে, এক জন্মে অবৈধ প্রেমে পতিত হইয়া যে দুঃখ, মনকষ্ট ও মোহরূপ ফল অর্জ্জন করি, তাহা যে বিশিষ্ট ভেদ ভাবে অবস্থিত 'আমিটীর' আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিরূপ তৃষ্ণার ফল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, অন্য জন্মে পুনরায় সেই প্রকার মোহে পতিত হই। বালক যেরূপ ভূমে পতিত হইলে, সেই ব্যাপারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির খেলা বুঝিতে না পারিয়া, পতন ব্যাপারটীতে 'পৃথিবীর দ্বেষভাব' আরোপ করিয়া পৃথিবীকে পদাঘাত করিয়া তৃপ্ত হয়, আমরাও জীবনের সুখ দুঃখ ব্যাপারে স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু প্রভৃতির কর্ত্তব্য আরোপ করিয়া আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মগুলির কথা ভুলিয়া যাই। আমার দুঃখের যে আমিই কারণ,—আমার মোহ, ভেদবুদ্ধি ও তৃষ্ণাই যে আমার দুঃখের একমাত্র হেতু, তাহা না বুঝিয়া 'রাম' 'শ্যাম' প্রভৃতিকে কারণ বলিয়া মনে করি।

'সকল' নিয়ম, সকল ভাব ও কর্ম্ম যে আত্মগত, ইহা বুঝিতে না পারায় 'সার্ব্বজনীন' নিয়মেরও পরিজ্ঞান হয় না। 'সর্ব্ব' ব্যাপারের মধ্যে "আত্মা" বা "আমির" খেলা দেখাই সর্ব্বাত্মতার চিহ্ন। আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনে কর এমন একটী মানব আছে যে, 'আমিকে' দেখিতে পায় না; যাহার 'অহম্‌'প্রত্যয়-গম্য' দেহাদির অতীত পদার্থের বোধ নাই; কিন্তু মন বুদ্ধি প্রভৃতি শক্তিগুলি আছে ও এমন কি সার্ব্বজনীন বুদ্ধিও আছে। সে অসুস্থ হইয়া পড়িল, আপনি তাহার সেবা করিলেন। আপনার সেবাদি কার্য্য হইতে তাহার কি জ্ঞান লাভ হইল, একবার ভাবিয়া

দেখুন। আপনি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন, তাহার শারীরিক যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ উপশম হইল। সে ভাবিল মানব শরীরের এইরূপ স্বভাব বা প্রকৃতি, যে উহা আপনা আপনি কাতর ব্যক্তির গায়ে হাত বুলাইয়া দেয়। সে ক্ষুধা কাতর হইয়া পড়িল, আপনি আহার্য্য আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিলেন; সে ভাবিল, মানবের হস্ত বা অবয়বের এমনি একটী স্বাভাবিক গুণ আছে, যদ্দ্বারা ক্ষুধার্ত্তের মুখে আপনা আপনি অন্ন উত্থিত হয়। তাহার নিয়মের পরিজ্ঞান হইল বটে, কিন্তু সেই সার্ব্বজনীন নিয়মের মধ্যে যে আত্মার ভাব আছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। আমাদেরও অবস্থা বড় বেশী বিভিন্ন নহে। আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কতকগুলি খাইয়া ফেলিলাম, ভাল পরিপাক হইল না; এই ব্যাপারে কি আমরা আত্মার বৈশ্বানর-অগ্নি-রূপে ভুক্ত অন্নের পরিপাক শক্তি দেখিতে পাইলাম? আমরা দেখিলাম ঐ বস্তুটী বড় খারাপ বা খাওয়া উচিত নয়; অথবা দেখিলাম আমার পরিপাক শক্তিটী আর তেমন প্রখর নহে। মোটামুটী নিয়মের পরিজ্ঞান হইল বটে, কিন্তু আত্মাকে ত' দেখিতে পাইলাম না। একবারও ভাবিলাম না যে জঠরাগ্নির খেলার মধ্য দিয়া সেই পূর্ণস্বরূপ শ্রীভগবানই খেলিতেছেন; বুঝিলাম না যে কি আশ্চর্য্য কৌশলে সেই জড়-শক্তি সমন্বিত স্থূল অন্ন পরিপাক হইয়া, আমার 'আমি' রূপ চৈতন্যের অভিব্যক্তির উপযুক্ত হইয়া গেল ও কিরূপে সেই অনাত্ম অন্ন হইতে আমার 'আমি' ভাবটী সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। একবার সংশয়ও উদয় হইল না যে, স্থূল অন্নে কোন অপরিজ্ঞাত উপায়ে যদি 'আমির' ভাব নিহিত না থাকিত, তবে তদ্দ্বারা আমার বিশিষ্ট 'আমির' প্রতিষ্ঠা হইত না। একবার ভাবিলাম না যে, পরিপাক শক্তিটির কি মহিমা ও উহা কত বড় ও কিরূপ চৈতন্য-ঘন। বিভিন্ন মানব এই অন্ন পরিগ্রহণ করিলেও তাহারা ত' ইচ্ছা করিয়া ও বুদ্ধি পূর্ব্বক ভুক্তান্ন হইতে আপন আপন উপযোগী 'আমি' ভাব সংগ্রহ করে না। অথচ কে সে: চৈতন্যময় প্রেমময় শক্তিরূপে অবস্থিত আছেন, যিনি—কি আশ্চর্য্য বিবেক ও বুদ্ধির সাহায্যে একই জাতীয় ভুক্তান্ন হইতে কি কৌশলে বিভিন্ন জীবের উপযোগী 'আমি' ভাব সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পরিপুষ্টি সাধনা করিতেছেন। তাহা বুঝিলে কি অখাদ্য গ্রহণ, ও ক্ষুদ্র অহংকারে ব্যবস্থিত হইয়া আহার ও আহার্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বিধিগুলি লঙ্ঘন করিতে চাহিতাম।

এইরূপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, চক্ষু, কর্ণ, মন প্রভৃতির বিশ্লেষণ দ্বারা তাহাদের 'সার্ব্বজনীন' বিষয়গুলি বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু ঐ জ্ঞানে

চিদানন্দ-ঘন আত্মা বা ভগবানের খেলা দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া, জ্ঞানটী 'সার্ব্বজনীন' হইলেও সর্ব্বাত্মক নহে। হিন্দু শাস্ত্রের মহিমা এই যে, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তত্ত্বগুলি এমন করিয়া বর্ণিত হয় যে, তদ্দ্বারা 'পুরুষ' বা আত্মবুদ্ধি জাগিয়া উঠে। এমন কি সাংখ্যের প্রকৃতিও এই 'সর্ব্বাত্মতা' ভাবে ক্রিয়াশীল। উহাতে সার্ব্বজনীন নিয়ম বা তত্ত্ব সকল আছে বটে, কিন্তু উহার গতি শুধু সার্ব্বজনীনতার জন্য নহে। উহা 'পুরুষ' বুদ্ধি ও পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য খেলিতেছে। সার্ব্বজনীন ভাব হইতে 'তুরীয় বা 'পুরুষ' বুদ্ধি উৎপন্ন করে বলিয়া, প্রণব-তত্ত্বটীতে আচার্য্য এক পরাগতি বা 'অ'-'উ'-'ম' প্রভৃতি তিনটী মাত্রা ও পদের অতিগ পদার্থের উপপত্তি দেখিবার জন্য বলিলেন, ছিন্ন 'অ'-'উ'-'ম' বুঝিলে প্রণব জ্ঞান হয় না। প্রিয়জনের হস্ত পদাদির সাহায্যে ক্রিয়াগুলি যেমন তাহার ভিতরের প্রেমের অভিব্যক্তি মাত্র এবং অনন্ত ভাবে প্রকাশিত হইলেও তদ্দ্বারা আমরা প্রিয়জনেরই সত্ত্বা ও তাহার প্রেমই বুঝিতে পারি, ——প্রিয়জনের যে কোন অঙ্গ স্পর্শ—যে কোন বাক্য প্রয়োগ, যে কোন মনোভিলাষ হউক না কেন, তাহার মান ও গতি যেরূপ প্রিয়জনের জন্য ও তাহার স্বরূপ অভিব্যক্তির নিমিত্ত বলিয়া বুঝিয়া লই, সেইরূপ পত্নীর পতি-প্রেমে, পিতামাতার বাৎসল্যে, অপত্যের প্রতি অপত্যস্নেহে, এই সকল ব্যাপারেই উপনিষদ আমাদিগকে সেই পরম প্রিয়তম, চিদানন্দ-ঘন শ্রীভগবানের এক ও অদ্বিতীয় ব্যঞ্জনা দেখিতে উপদেশ দেন। ইহা যে তত্ত্ব ও পরাগতি ইঙ্গিত করে, তাহাই বুঝাইবার জন্য বলা হইল যে "অ"টী অবিচ্ছিন্ন ভাবে 'উ''এতে মিশিয়া, পরে সবটী "ম"রূপ ভাবে অন্তর্মুখী হইয়া ব্যক্ত শব্দের বা প্রকাশের অতীত তূরীয়' অর্দ্ধ মাত্রায় মিশিয়া যাইতেছে। এই শাশ্বত ও নিত্য প্রবৃত্তিই ত' প্রণবের গতি। তাই আচার্য্য বলিলেন,—"ত্রয়ানাং বিশ্বাদীনাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবিলাপনেন তূরীয়স্য প্রতিপত্তিরিতে করণসাধনঃ পাদশব্দঃ; তূরীয়স্য তু পদ্যতে ইতি কর্ম্মসাধনঃ পাদ শব্দঃ।" বিশ্বাদি তিনটী সর্ব্বাত্মক ভাব যে মহাগতিতে পড়িয়া এক একটী করিয়া লীন হইয়া সেই 'তূরীয়' ও নিষ্কল, সর্ব্বের' অতিগ ভাবের ব্যঞ্জনা করে, তাহাই 'প্রণব-ধনুর' আশ্চর্য্য শক্তি।"

আচার্য্যের উক্তিতে দুইটী স্তর নির্দ্দেশিত হইল; প্রথমটী 'করণ'-সাধন, দ্বিতীয়টী 'কর্ম্ম'-সাধন। এই দুইটী আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, কিন্তু দুইটীর মধ্যেই যে এক তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে আলোচনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সেই পরম তত্ত্বটীকে ভগবৎ-নিষ্ঠা ভগবৎ-বুদ্ধি বা পরাভিসারিণী

প্রবৃত্তি বলে। যতক্ষণ আমাদের চিত্ত বিশিষ্ট 'আমি' ও বিশিষ্ট বস্তু ভাবে সম্বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমরা 'অ'-'উ'-'ম' জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি,—অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, এই তিনের বিকাশগুলিকে কখনই এক করিতে পারিব না। যাহা দ্বারা এই একীকরণ ভাবটী সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত বুদ্ধি। যে স্ত্রীলোক স্বামীর ভিতরে কি এক 'পরম বিশেষ' ভাবের ছায়া দেখিতে পাইয়াছে ও যাহার প্রাণও সেই বিশেষ অথচ 'পর' ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, সে বিভিন্নভাবে নামরূপে অবস্থিত—পরিধেয়, বস্ত্র, পাদুকা, প্রভৃতি সামান্য বস্তুগুলি হইতেও এক স্বামী ভাবের পরিপুষ্টি,—ঐ সকল ভাবে স্বামীরূপে এক অধিকরণে পরিসমাপ্তি দেখিতে পায়। কিন্তু যতদিন সে বুদ্ধি হৃদয়ে না জাগে, ততদিন কষ্ট কল্পনা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন বস্তুগুলিকে এক করিতে পারা যায় না। সাবিত্রী দেবী মৃত্যু, যম, প্রভৃতি বিভিন্ন বাহ্য ভাবগুলিকে স্বামীরূপে মিশাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, যমও তাঁহার নিকট পরাভূত। যাঁহার এই প্রকার বুদ্ধি এখনও জন্মে নাই, তিনি যেন প্রণব 'উৎ-চারণে' চেষ্টা না করেন। তিনি মাত্রাগুলিকে বিভিন্ন দেখিয়া মৃত্যু হইতে মৃত্যুই প্রাপ্ত হন।

"তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ॥"

অর্থাৎ 'অ'কার, 'উ'কার, 'ম'কার. এই তিন মাত্রা গুলিকে পৃথক ভাবে প্রয়োগ বা ব্যবহার করিলে, তদ্দ্বারা বিভিন্ন লোক প্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু মৃত্যুর প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারা যায় না। 'সমম্ অঞ্চতি ইতি সম্যক্'—সম বা ঘন একরস ভাবে প্রয়োগকে সম্যক্ প্রয়োগ বলে। এইরূপ সম্যক্ ভাবে প্রয়োগ করিলে, বাহ্য, অভ্যন্তর ও মধ্যম বা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি স্থান, ও তাহার আশ্রয়রূপ 'পুরুষ'ভাবে, যোগ-ক্রিয়ার সাহায্যে, একই পুরুষের জন্য ব্যবহার করিলে, সেই তিনটী মাত্রা অন্যোন্যক্ত বা পরস্পর সংযুক্ত ও ঘন হইয়া যায় এবং অনবিপ্রযুক্ত হয়। 'বিপ্রযুক্ত' শব্দে এক একটী বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন ভাবের প্রয়োগ বলে। জাগ্রত অবস্থার 'আমি' জ্ঞানকে সার করিয়া বুদ্ধি প্রয়োগ করিলে, জাগ্রত ভাব বিশিষ্টরূপে সিদ্ধ হয়; কিন্তু তাহাতে সমরূপী ভাবটী আসিতে পারে না। কিন্তু যিনি সেই 'পর' ও 'পরম বিশেষ' ভগবানরূপ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণবের গতিটী আরব্ধ করেন, তিনি এক কালেই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ তিনটী ছিন্ন বিশেষভাবের মধ্য দিয়া সম অথচ পুরুষোত্তম পুরুষের ভাবে উপস্থাপিত হইয়া জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী ভাব অতিমক্র করেন। এইরূপ যোগী আর

কখনও কম্পিত হন না। যেমন একই স্বামী জ্ঞানে হস্ত পদাদি বিভিন্ন অঙ্গ, সুখ, দুঃখাদি বিভিন্ন ভোগ, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা, ঘন হইয়া একরূপে মিশিয়া যায়, সেইরূপ যিনি আপনার চৈতন্যের খেলার ভিতর সেই পর (Transcendent) ব্যক্ত বিশিষ্ট খেলার অতীত অথচ সম ও একরূপ, অথচ 'পুরুষ' ভাবে অবস্থিত শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে পাইবার জন্য মাত্রাগুলিকে প্রয়োগ করেন, তিনিই সেই 'পর' পুরুষকে পাইবার ইচ্ছা বা একমাত্র প্রযত্নে অনন্ত নামরূপাত্মক ভাবগুলিকে ঘন করিয়া মিশাইয়া দিয়া, ভিতরে ও বাহিরে সেই এককে দেখিতে পাইয়া তৃপ্ত হয়েন। সেইজন্য প্রণব 'ধনুতে' 'আত্মা' বা 'আমিকে' শররূপে বসাইয়া, সেই এক পরম পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলে, একই প্রযত্নে ছিন্ন 'সর্ব্ব' 'বহু'জ্ঞান সর্ব্বাত্মিকা 'বিদ্যা'ভাবে "আমিতে" মিশিয়া গিয়া পরে, "আমিটী" পরম লক্ষ্যে উপনীত হয়।

গত বৎসর আমরা এই 'একই প্রযত্নে' বহুগুলি মিশাইবার কথা বুঝিবার জন্য পরম করুণাময় ঋষিগণের রচিত পুরাণশাস্ত্র হইতে অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ ও ত্রিপুরনাশ নামক দুইটী দৃষ্টান্ত লইয়াছিলাম। এখানে সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিলে বোধ হয় উপকারই সাধিত হইবে।

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ আখ্যায়িকায় কি আশ্চর্য্য কৌশলে শাস্ত্র আত্মাকে শর করিয়া প্রণব ধনু হইতে ভগবানরূপ এক লক্ষ্যের দিকে প্রয়োগের রহস্যটী কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত করিলেন!! পুর-দাহন ব্যাপারে কিরূপে ভগবানকে লক্ষ্য না করিলে একই প্রযত্নে, নাম রূপাত্মক বিশ্বের প্রবিলাপন সাধিত করিতে পারা যায় না, তাহাই বিশিষ্ট রূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আগামীবারে এই কথাগুলি পুনরায় বুঝিবার চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধ-বেদান্ত।

কাম]

মিশামিশি।

হাসিয়া হাসিয়া চলেছে ওই যে তটিনী কাহার তরে?
সে কি জানে কোন্ দেশে কোন্ টানে বাঁধে সে জীবন ভ'রে?
চঞ্চল অই অঞ্চল নাচি মৃদুল মধুর বায়;
কাঁপায়ে প্রকৃতি আকৃতি মধুর কোথায় চলিয়া যায়।
মৃদু ফুলদল বহি' পরিমল মধুর মোহন ছাঁদে,
কাহার কীর্ত্তি বিথারে নিয়ত অলস-আবেশ ফাঁদে?

নীল অম্বর সম্বরি আধ, আধেক খুলিয়া শোভা,
কা'র হৃদিতলে দিতে উপহার অমল-হৃদয়-লোভা ?
নামিয়া, ভাসিয়া, লুকায়ে র'য়েছে অনন্ত সাগর তলে ;
ওই যে উজল জ্যোতিটী জিনিয়া জোনাকি জাগিয়া জ্বলে।
চাঁদিমার চির নব সভাসদে কেন সে প্রকাশে নভ',
মধুর অঁাখরে নাচিয়া আবেগ জড়িত কি গান নব ?
তুলে অনন্ত নীলিম প্রান্ত কাঁপায়ে মধুর তানে,
জাগায়ে জগতে কি নব তিয়াসা কি জানি কাহার পানে ?
আবেশ উৎসাহ 'সরবস'সাধা কাহার অপার ভিতে,
আপনা হারায়,—জান কি মানব ! জাগে কি সে ভাব চিতে ?
ভক্তির ধারা বহিয়া বহিয়া কাহার কোমল পায়,
শীতল বলিয়া আপনা ভুলিয়া শরণ মাগিতে চায় ?—
তোমাতে আমাতে মিলিবার 'তরে আভানে অবশ করি';
জীবে জীব মিলে অনন্ত নিখিলে অপরূপ রূপ ধরি।
নবীন নবীনে নব অঁাখি কোণে কি মধু চাহনি খেলে,
আশায় অশ্রু মিলায় প্রকৃতি, পুরুষ নিরখে হেলে।
খ'ণে খ'ণে সিত সুষমা পাবন সরল শিশুর হাসি,
জননীর প্রাণে স্বর্গের বাণী আনিয়া, বেদনারাশি।
মুছায় মরতে,—পরতে পরতে হৃদয়ের শত আশা ;
ভয়ে হয় সারা, সুখ দুঃখে হারা, ভাবের রহে না ভাষা।
অতীত অনন্তে, বিশ্ব অতীতে খেলিছে যে দিশিদিশি।
তাদেরো' কি সেই অনুরাগ ভরা গূঢ়মত মিশামিশি ?

শ্রীশিবপ্রসাদ কাব্যতীর্থ (ভট্টাচার্য্য)।

কাম]

সহজ-যোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

সম্পাদক মহাশয়,

আমরা গত বৎসর এ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। যদি বলেন ফলাকাঙ্ক্ষা কেন ? সেটা কেবল আপনাদের কাগজের দায়ে। গ্রাহকগণের মনস্তুষ্টি করিতে না

পারিলে, কাগজ চলিবে না ও আমার হস্ত-কণ্ডুয়ণের ক্ষেত্রটীও অপসৃত হইবে। তবে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। 'সহজ-যোগ' নাম-করণটী বড় সুবিধা জনক বলিয়া মনে হয় না। অনেকে মনে করিয়াছেন, যোগ-তত্ত্বগুলি এমন 'জল করিয়া' বুঝাইতে হইবে যে, আহারাদির পর আলবোলা সুন্দরীর অধর চুম্বনে, পান চিবাইতে চিবাইতে, অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায়, কোমল প্রকৃতির করস্পর্শে পরিতৃপ্ত-অঙ্গে, যদি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তা'র মর্ম্ম বুঝা না যায়, তবে আর সহজ-যোগ কোথায় ? আরও কেহ ভাবেন যে, অপরাহ্ণে আফিসের ফির্ত্তি বেলায়, রেল গাড়ীতে যাইবার সময়, দশ মিনিটেই প্রবন্ধটী পড়িয়া লইব, অমনি তত্ত্বগুলি হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যোগকে এত 'মোলায়েম' করিয়া অাঁটীশূণ্য সন্দেশের ন্যায় (কলিকাতার সন্দেশে অনেক সময় বাজভাব বর্ত্তমান থাকে) পাঠককে গলাধঃকরণ করাইতে আমার ক্ষমতা নাই। আপনারা কেহ যদি আমাকে ইঙ্গিতে সে বিষয় বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে হয়ত' চেষ্টা করিতে পারি।

'সহজ-যোগ' শব্দ ব্যবহার করিবার প্রধান কারণ এই যে, গভীর রাত্রে সুষুপ্তির মধ্যে সহসা উচ্চারিত "বলহরি হরিবোল" শব্দের ন্যায় হিন্দু জাতির মহা-সুষুপ্তি সময়ে, অনেকে 'যোগ' শব্দটীকে 'বাঘ' করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যোগ শব্দে অনেকটা ব্রহ্মচর্য্য, কতকগুলি ভীষন মুদ্রা পোয়াটাক্ প্রাণায়াম, সেরখানেক্ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে মনের সঙ্গে কুস্তি, আর বাকীটা—সেইটাই বেশী,—গেরুয়া কাপড়, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অন্ততঃ একটি রুদ্রাক্ষের মালা,—আর পাঠক মহাশয়ের চির-পরিচিত রবী বাবুর ভাষায় "কি জানি কিসের মত কোন্খানে চলে গেছে, কাহার প্রাণের কথা আধ প্রাণে বলে গেছে" গোচের "তোমরা এর তত্ত্ব বুঝিবে না" এই সুরে সস্মিত বাক্য-প্রয়োগ। গাঁজার কলকের আর পসার নাই ; কারণ লোকে এখন আব্কারীর সমর্থনা বড় একটা 'প্রকাশ্য' ভাবে করিতে চাহে না।

আমরা সেরূপ ভাবে সহজ-যোগ—'চাঁচাছোলা' সরল-যোগ শিখিতে পারি নাই। আমরা 'সহজ' অর্থে চিত্তের স্বাভাবিক ভাব বুঝি। ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিলেন,—"যোগঃ সমাধিঃ স চ সার্ব্বভৌম চিত্তস্য ধর্ম্মঃ" (১।১) অর্থাৎ যোগ সমাধি ও উহা সকল ভূমিগত চিত্তের ধর্ম্ম। কাজেই দায়ে পড়িয়া 'চিত্ত' শব্দটি বুঝিতে হইতেছে। চিত্ত শব্দে আমরা চৈতন্যের মৌলিক ধর্ম্ম গ্রহণশীলতা বা প্রকাশশীলতা বুঝি ; ইংরাজীতে ইহাকে—Receptivity or irritiitabity of

conciousness বলে। আমাদের চৈতন্য ভিতর দিকেই হউক আর বাহির দিকেই, কিছু না কিছু প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। আর একটি কথা 'চিত্ত সর্ব্বার্থ'। চিত্ত 'সর্ব্ব' ভিন্ন ছিন্ন ও বিশিষ্ট লইয়া থাকিতে পারে না। "দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরোক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্।" (পা ৪।২৩)

আমাদের চৈতন্যের গতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার খেলা, হয় অন্তর্মুখী হইয়া 'আমি' এই বোধগম্য পদার্থের দিকে যাইতে থাকে, নয় ত' বাহিরে আসিয়া সর্ব্বভাবে বস্তু, শক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতি প্রকাশ করে। এই বাহিরের প্রকাশটীকে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলতারূপে অভিহিত করা হয়। 'প্রকাশ' প্রবৃত্তিকে 'প্রখ্যা' বা প্রকৃষ্ট খ্যাতি বা বিশেষ জ্ঞান বলে; যেমন আম্র দেখিয়া আমটি যে একটি "টি" একটি বিশেষ বস্তু, এই বুদ্ধি বুঝায়। যাই একটি ভাব প্রকাশিত হয়, অমনি পাছে অন্যান্য বিশেষ ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে ভাবটি নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে বিশেষের সংরক্ষণের জন্য তাহার সহিত অন্য 'সর্ব্ব' বস্তুর ঘাত-প্রতিঘাত বা ক্রিয়া-সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে; তৎপরে অন্য সর্ব্ব' বস্তুর সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া, বিশেষ ভাবটিকে স্থির করিয়া, 'নঙ্গর করিয়া' রাখিতে একটী গতি প্রকাশিত হয়। সম্মোহন বিদ্যার ক্ষেত্রের একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা এই তিনটী গতি বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনে করুন রামকে সম্মোহিত করিয়া বলা হইল, 'তুমি স্ত্রীলোক'। রাম ত' সম্মোহিত; তাহার ভিতর তখন আর নানা ভাবে চিত্তবৃত্তির খেলা শান্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াদি সকলে প্রসুপ্ত; মন স্থির; 'আমি' ভাবটী মাত্র অস্পষ্ট ভাবে জাগিয়া আছে; এক কথায় তাহার চৈতন্য তখন 'আমি'তে উপরক্ত। 'আমি'টী যে কে বা কি, তাহা সে জানিতে পারে না। এই শান্ত ও নিস্তব্ধ-প্রায় চৈতন্য ক্ষেত্রে যাই 'স্ত্রী-বুদ্ধি' বা জ্ঞানটী প্রয়োগ করা হইল, অমনি রামের স্থির 'আমিটী' সেই ভাবে আপনাকে দেখিয়া ফেলিল। স্থির 'আমিতে' কি এক 'বিশেষ আমির' প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। কারণ 'আমি' বাস্তবিকই পরম বিশেষ পদার্থ;—উহার শেষ নাই। উহাকে কোন ছোটভাবে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না বলিয়াই, উহা বিগত-শেষ বা বিশেষ। সেইজন্য পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে স্ত্রীলোক এই সামান্য জ্ঞানটী লইয়া, 'আমিটী' তৃপ্ত হইতে পারিল না। পূর্ব্বে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট সংস্কার ছিল, তাহা জাগিয়া উঠিল; এবং তাহার বশে রাম আপনাকে বিশিষ্ট স্ত্রীলোক বা 'প্রভাবতী' নামে অবধারিত করিল। কিন্তু 'প্রভাবতী' এই বিশেষ নামটী গ্রহণ করিয়াই, তাহার চিত্ত ক্ষান্ত হইল না; কারণ তাহা হইলে

প্রকাশিত সর্ব্ব ভাবটী থাকে না। তাই সে 'প্রভাবতী' ভাবটীকে পিতা, মাতা, জাতি, আয়ু প্রভৃতি অনন্ত ভাবে বিন্যস্ত করিয়া দেখিতে চলিল। সামান্য স্ত্রীলোক ভাব হইতে 'প্রভাবতী' রূপ বিশিষ্ট খ্যাতি Idea উপলব্ধি চিত্তের প্রকাশাত্মক সত্ত্ব-গুণের কার্য্য।

বিশেষ প্রকাশ থাকিতে গেলে, তাহার নির্দ্দেশ চাই। যেমন ঘরের ভিতর একটী দ্রব্য পড়িয়া আছে, তাহা দেখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঘরটী, তাহার দেওয়াল ও সেই ঘরস্থিত অন্যান্য বস্তু ও সেই বস্তু সকলের সহিত পদার্থটীর নৈকট্য প্রভৃতি সম্বন্ধ নির্দ্দেশ না করিয়া থাকিতে পারি না। বৃত্তের (circumference) সহিত প্রযুক্ত করিয়া দেখিবার শক্তির নাম প্র-বৃত্তি। কোন বস্তুর 'গুণ' বা 'স্বভাব' বলিতে গেলে অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্কিত করিয়া সেই সম্পূর্ণ রাশি (relation) গুলির সমষ্টি করিয়া বুঝি; যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, আলোক দান করিবার শক্তি, উষ্ণতাশক্তি, রং প্রভৃতি বাদ দিলে প্রাকৃতিক ভাষায় অগ্নির অগ্নিত্ব বলিয়া কিছুই থাকে না; তাহা বলিয়া অগ্নির অগ্নিত্ববাচক বিশেষ ভাব বা 'প্রখ্যা' নাই একথা বলা যায় না। শিশু অগ্নির দাহিকা প্রভৃতি ভাব হয়ত বুঝিতে পারে না; কিন্তু অগ্নিটী যে একটী বিশিষ্ট বস্তু, এ জ্ঞান না থাকিলে সে কেন আগুন ধরিতে যাইবে?, তাহার কোন এক প্রকার 'প্রখ্যা' আছে। হয়ত সে খ্যাতিটী অধিকাংশই ভ্রমাত্মক; কিন্তু ঐ খ্যাতিটীকে স্থির করিয়া বুঝিতে গেলে কেন্দ্রের চারিদিকে বৃত্তের ন্যায়, অন্যান্য সকল বস্তুর সহিত সম্পর্কিত করিয়া না দেখিলে চলে না; এই গতিটির নাম রজঃ গুণ। তারপর যখন অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্কগুলি স্থির করা হইল, তখনই সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পর্ক রাশিকে এক করিয়া, তাহার মধ্যে প্রখ্যাটীকে বসাইয়া 'প্রখ্যা' বা স্থিতি-শীলতা সিদ্ধ করা হইল। সেইজন্য রামে 'তুমি স্ত্রীলোক' এই সামান্য বোধটী প্রয়োগ করিবার পর রামের 'আমি' সামান্য স্ত্রী বোধে তৃপ্ত না হইয়া তাহার সংস্কারের সাহায্যে আপনাকে প্রভাবতী-রূপ প্রখ্যা দ্বারা বিষেশিত করিয়া দেখিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিলে আপনারই ভিতর হইতে প্রভাবতীর পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র, বয়স ইত্যাদি সম্পর্ক-জ্ঞান সকলের সাহায্যে 'প্রভাবতী' রূপ প্রখ্যায় বিশেষ ক্ষেত্র বা বৃত্তভাবে উদ্ভাসিত করিল। তারপর তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সন্তানকে স্তন্য দান প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্ত ক্রিয়ার সাহায্যে 'প্রভাবতী' জ্ঞানটিকে স্থির করিবার চেষ্টা করিল। এই তিনটী গতিকে গুণ বলে।

'গুণ' শব্দে অনেকে একটা পদার্থ বুঝেন; কেহ বা অহংজ্ঞানকে বদ্ধ করিবার

জন্য রজ্জুর ন্যায় ভাবেন। কিন্তু চৈতন্য বিজ্ঞান বা যোগ-দর্শনে গুণ গুলিকে শীলতা বা প্রবণতা (tendency) বলিয়া বর্ণিত করা হয়। উহা বস্তুও নহে শক্তিও নহে। চৈতন্যের সর্ব্বাভিমুখী যে স্রোত আছে, উহা সেই স্রোতের বিভিন্ন ভাব মাত্র। মনে একটী ভাব প্রস্ফুরিত হইলে যে প্রবণতার প্রভাবে বিশিষ্ট বস্তু ভাব বিশিষ্ট ক্রিয়ারূপে পরিণত হয়, যৎ সাহায্যে আমরা ক্রিয়া গুলির সহিত পুটিত করিয়া বস্তুর সত্বা স্থাপিত করি, তাহা তমোগুণ বা স্থিতিশীলতা। অধুনিক শাস্ত্র ব্যাখ্যয়িতৃগণের সে বিষয়ে যে কি পরিমাণে অধিকার জন্মিয়াছে, এই সকল সূক্ষ্ম ভাবের ব্যাখ্যানেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অনুষ্ঠান-বিরহিত ব্যক্তিগণ কেবল কথার শ্রাদ্ধ করিয়া বাক্য-বিন্যাস কৌশলে স্ব স্ব অনুভূতির অভাবটিকে আচ্ছাদিত করিতে চাহেন। আবার ইংরাজি শিক্ষিতগণ পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অস্পষ্টালোকে হিন্দুদর্শনের তথ্যগুলিকে কিম্ভূত কিমাকার দেখিয়া, কিম্ভুত-কিমাকার রূপেই তাহার স্থাপনা করিতে প্রয়াস করেন। তমোগুণে কেহবা আবরক ভাব, কেহবা জড় বস্তু সকল দেখিয়া থাকেন। সাংখ্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও এই জাতির পণ্ডিতগণ বিস্মৃত হয়েন যে, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি পুরুষের সহিত সম্পর্ক-শূন্য পদার্থ নহে। পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন, "অয়ন্তু খলু ত্রিষু গুণেষু কর্ত্তৃষু অকর্ত্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়াসাক্ষিনি উপনীয়মানান্ সর্ব্বভাবানুপপন্নাননুপশ্যন্নদর্শনমন্যচ্ছঙ্কতে।" অর্থাৎ কর্ত্তার স্বরূপ তিন গুণ, ও অকর্ত্তা পুরুষ যিনি চতুর্থ বা পরাভাবে অবস্থিত আছেন, সেই পুরুষ তুল্যাতুল্য (তুল্য + অতুল্য) জাতীয়। পুরুষ গুণ সকলের ক্রিয়ার সাক্ষী বা দ্রষ্টা, এবং তাহাতে সর্ব্বভাব সকল বা সর্ব্বাত্মিকা প্রকৃতি যেন মিশিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে অজ্ঞ লোকেরা মনে করে যে, পুরুষের বুঝি সর্ব্বভাবের অতীত, গুণত্রয়ের অতিগ ভাব নাই। অতএব বুঝা গেল যে গুণত্রয় ও পুরুষ উভয়ের ভিতর একটা সম-জাতীয়তা আছে; আবার আর এক ভাবে দেখিতে গেলে, পুরুষ গুণত্রয়ের অতিগ। আর এক কথা সর্ব্ববুদ্ধি না আসিলে, পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, প্রকৃতি যে পুরুষ হইতে একান্ত বিজাতীয় পদার্থ, তাহা বলা সাংখ্যেরও উদ্দেশ্য নহে। এই দুইটী ভাব একটু ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক।

'সর্ব্ব'-গ্রহণশীলতা প্রকৃতির ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের ভিতর দিয়া অন্বেষণ করিলে আমরা দুই একটী বিস্ময়কর তথ্যে উপনীত হইতে পারিব। বাহ্য জগতের

অনন্ততা প্রত্যক্ষ্যগম্য। কিন্তু দেহ বা অবয়ব নির্ম্মাণ করিতে গেলে, সেই অনন্ত ভাবের অনুগুলিকে এমন করিয়া বিন্যস্ত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় যে, অনুগুলি অনন্ত ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তাহাদিগের অভ্যন্তরে এক আশ্চর্য্য একাভিমুখী গতি থাকা চাই। চক্ষের অনু রূপ-ভাবে দেখে; কর্ণের অনু শব্দভাবে শুনে; এইরূপে শরীর মধ্যস্থ অনন্ত অনুগুলি স্ব স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যতক্ষণ তাহাদের বাহিরের সহিত সম্পর্ক বা তদভিমুখী প্রবণতা থাকে, ততক্ষণ তাহারা আপন আপন পার্থক্যতা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারে। তাহারা যে শুধু স্থূল-ভাবে স্বজাতীয় ভাব সকল গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে পারে, এমত নহে; কর্ণের অনুগুলি যে কেবল স্থূল শব্দই শুনিতে পারে ইহা বলা যায় না। শব্দ তত্ত্বের সূক্ষ্ম ভাব সকলও তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে। এই প্রকাশের নাম (clairaudience) দূর-শ্রবণ। মনকে স্থির করিয়া ১০০মাইল দূরস্থ বন্ধুর বাক্য শ্রবণের জন্য কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রয়োগ কর, প্রথমে দেখিবে যে আপনা আপনি তোমার জীবনে শ্রুত স্থূল শব্দগুলি চিত্তে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এমন কি তুমি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তোমার জননী কি বলিয়াছিলেন, সেই শব্দটী পর্য্যন্ত পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে। যাঁহারা শব্দ-তত্ত্বের সাহায্যে জপাদি করেন, তাঁহারা জানেন যে প্রথমে মনস্থির করিবার পর কাণের কাছে যেন একটা হাট বসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই কোলাহলটীর নিবৃত্তি হওয়া চাই। তা'র পর শ্রবণেন্দ্রিয়কে যেভাবে প্রয়োগ করিবে, সেই ভাবের শব্দ ও ভাষা তাহাতে প্রতিফলিত হইবে। সুতরাং বুঝা গেল যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র ও শক্তি 'সর্ব্ব' শব্দ গ্রহণের জন্য; কিন্তু ঐ গ্রহণ বা সর্ব্বাত্মিকা ভাব প্রকাশের শক্তি বাহিরের খেলায় তৃপ্ত না হইয়া অন্তর্ম্মুখী হইয়া থাকিতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক অনুর এই সর্ব্বাত্মিকা ভাবরাশি প্রাণশক্তি দ্বারা এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে যে, সেই খেলার ফলে রাম সর্ব্বদাই 'আমি রাম' এই বোধে স্থির থাকিতে পারে। এইরূপে বিভিন্ন অসংখ্য অনুগুলি এক মহান্ শক্তির সাহায্যে আপন আপন স্বভাব ও ক্রিয়া ত্যাগ না করিয়া, এক মহান্ 'আমির' স্রোতে,—এক মহত্তর 'আমির' দিকে ছুটিতেছে। এই দেখ শরীর-তত্ত্বে প্রকৃতির পুরুষাভিমুখী খেলা। এই পুরুষাভিমুখী খেলার কতকগুলি স্তর আছে। বাহ্য প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গত প্রকৃতিতে মিশিয়া যাইতেছে; ইন্দ্রিয় প্রকৃতির অনন্তত্ব প্রিয় ও সুখ ভাবমূলক কামে পরিসমাপ্ত হইতেছে। রূপ হিসাবে অগ্নিরও সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য আমাদের অবয়বী ভাবের বিরোধী; উহাতে 'আমির' সুখময় ভাব নষ্ট হয়। সেইজন্য জাতিগত কাম বা

instinct বশে পশু ও মানব অগ্নির রূপে আকৃষ্ট হইলেও, অগ্নির সমীপবর্ত্তী হইলে আপনা আপনি পিছাইয়া যায়। ঐ দেখ কাম ইন্দ্রিয়ের বিষয় গুলিকে কিরূপে আর একটু ঘন করিয়া, আর একটু অন্তর্মুখী করিয়া পুরুষের দিকে লইয়া যাইতেছে। এই কাম শক্তিকেই ডারউইন্ জাতিগত-ভাব-সংরক্ষিণী (preservation of species) শক্তিনামে বিজ্ঞানের পোষাকে সজ্জিত করিয়াছেন। তিক্ত রস প্রিয় নহে, ইহা কামের ভাষা। কিন্তু শরীরে জ্বরাদি জন্মিলে তিক্ত রস ভালও লাগে—উপকারও হয়। মিষ্ট রস প্রিয় ও তিক্তের বিরোধী; কিন্তু কখনও কখনও মিষ্টরসে অজীর্ণতা আনয়ন করে। কামই যদি মানবের শেষ ভাষা হইত, তাহা হইলে মানব তিক্ত বর্জ্জন করতঃ কেবল মিষ্ট রসাস্বাদনেই তৎপর হইত; যেমন অনেকে জ্ঞানের নামেই চমকিত হন্। মন বলিল যে তিক্ত রসটী জ্বর প্রভৃতি বিকারের সহিত মিলাইয়া উহার ব্যাধি নাশক বিশেষ ভাবটী দেখ ও জ্বরাধিকারে উহা প্রয়োগ করিও। মন তিক্তকে পরিত্যাগ করিল না; অন্য বস্তুর সহিত সঙ্কলিত করিয়া উহার উপকারিতা বুঝিতে পারিল। সুতরাং মনের সাহায্যে বাসনার প্রিয় ও অপ্রিয় এই উভয় ভাবের অনন্ত প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হইয়া, সূক্ষ্মভাবে আর একটু পুরুষের অভিমুখী হইল। মনের অনন্ত বৃত্তি আছে। যে ধন উপার্জ্জনে বুদ্ধি স্থির করিয়াছে, সে সেই অনন্ত বৃত্তিগুলির মধ্যে যেগুলি তাহার উপকারী সেইগুলি বাছিয়া লইল। এইরূপে আমরা স্ব স্ব বুদ্ধির উপযোগী মনের অনন্ত বৃত্তিরাশিকে সূক্ষ্মভাবে পুরুষের অভিমুখী করিতেছি। তারপর বুদ্ধির একতানতা বা একাভিমুখী প্রবণতাটী একটী বিশিষ্ট অহংজ্ঞানে মিশিয়া যাইতেছে; ইহাই অহঙ্কার। শুদ্ধ 'অহং'এর গতি লক্ষিত করে বলিয়াই, বুদ্ধির একাভিমুখী গতিটী যে কেবল একের জন্য নহে, সে 'একটী অহং-জাতীয়; এবং রাম 'আমি', 'শ্যাম আমি' প্রভৃতি অনেক রকমের বিশিষ্ট 'আমি' ভাব ফুটাইয়া অবশেষে 'আমিটী' যে এক, অথচ রাম, শ্যাম ভাবের অতীত, ইহাই দেখাইবার জন্য অহঙ্কার-তত্ত্ব। বালক রাঙ্গা বহি পাইয়া মনে করে এইটিই বুঝি একমাত্র বহি, আমরাও তদ্রূপ বিশিষ্ট 'আমিকে' দেখিয়া মনে করি 'আমিটী' রাম ভিন্ন কেহই নহে। তারপর বালক যেমন লেখা পড়া শিখিতে শিখিতে নানা প্রকারের নানা জাতীয় ও নানা ভাষায় লিখিত বহি সকল দেখিতে দেখিতে বুঝিতে পারে যে, 'বহি' শব্দটী ব্যক্ত-নির্ব্বিশেষে একটি সূক্ষ্মতর জাতিরূপ পদার্থ; আমরাও তদ্রূপ জন্ম জন্মান্তরে বিভিন্ন 'আমির' খেলা করিয়া অবশেষে বুঝিতে পারি যে, বিশিষ্ট 'আমি' জ্ঞানটী

(Individuality) প্রকৃত 'আমির' ব্যক্ত ক্ষেত্রের প্রকাশের জন্য হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় একটী যন্ত্র মাত্র। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া Light on the Path নামক গ্রন্থ বলেন ঃ—grasping his individuality firmly realises it to be but an instrument for grave experiment and experience which he has with pain created for his own use and through which he proposes to reach the life beyond individuality, আজ কাল এই কথাটী একটু বিশেষ ভাবে বুঝা আবশ্যক। কলির প্রতাপে ভক্তগণ ভেদভাবের অহং লইয়া ব্যস্ত; সে কালের 'গোবিন্দ অধিকারীর' যাত্রায় অধিকারী মহাশয় যেমন গুম্ফ-শ্মশ্রু বিভূষিত বদনে, দোদুল্যমান-কোঁচা পরিহিত বসনে বৃন্দা সাজিয়া—"রাই ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং গচ্ছাম মথুরায় এ" বলেন তদ্রূপ ষোল আনার উপর আঠার আনা, ভেদজ্ঞান রাখিয়াই ভক্তগণ ভগবানের অপ্রাকৃত লীলায় যোগদান করিতে বড়ই ব্যস্ত। অধিকারী মহাশয়ের প্রাণ ও ভাব ছিল, কাজেই লোকে তাঁহার বহিরাকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিত না; অথচ বৃন্দাবন চন্দ্রের মধুর লীলারসে নিমজ্জিত হইত। কিন্তু আধুনিক ভক্তগণের ভাবও নাই, রসও নাই; তাঁহারা ভগবানকে ভোগ করিবার জন্যই ব্যস্ত। অপর দিকে নবীন জ্ঞানীগণ 'অহং' শব্দে 'অহঙ্কার' বুঝিয়া 'সোহং' শব্দে বিশিষ্ট অহঙ্কারের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। যাহা হউক তত্ত্বগুলির সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর পরিণতি যে সেই এক 'অহং'এর জন্য; এ বিষয়ে ভুক্ত অন্নের পরিপাক ও পরিণতির দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করিলে, কথাটা একটু বিশদ্ভাবে বোধগম্য হইতে পারে। ভুক্ত অন্ন প্রথমে স্থূল ভাবে পরিপাক হইয়া রসরূপে শরীরে থাকে। অন্নের যে অংশটুকু পরিপাক করা যাইল না, উহাই মল মূত্ররূপে নিঃসৃত হইয়া যায়। জ্ঞানের পরিণতিও ঐরূপ। স্থূলভাবে জ্ঞান হইতে রস বা কামনাতত্ত্ব জাগিয়া উঠে; এবং যতটুকু রসরূপে পরিণত না হইল, তাহাই বাহ্য জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তারপর স্থূলান্ন হইতে উদ্ভূত রস পরিপাক হইয়া মাংসরূপে স্থির ভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানক্ষেত্রেও বাসনার অপরিণত অংশগুলি অহং জ্ঞানের আকার হইয়া রহিয়া যায়। রস সূক্ষ্মভাবে অস্থি ভাবে উঠিয়া যায়। এই অস্থিটীই আমাদের জ্ঞান ক্ষেত্রের প্রাকৃত রাম, শ্যাম আদি বোধ। তারপর মজ্জা (nervous matter) বা মনস্তত্ত্ব, পরে মেদ বা সর্ব্বভাবে অবস্থিত বুদ্ধিতত্ত্ব, সর্ব্বশেষে বীর্য্য বা 'অহং'এর আত্ম প্রকাশের শক্তি। অন্ন ক্রমে এই কয় প্রকারের পরিণতি প্রাপ্ত হয়।

এইবার একটী দুরূহ তত্ত্বের অবতারণা করিব। সত্য বটে, সাধারণ জীবে

রস, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মেদ, বীর্য্য,—বা আধ্যাত্মিকভাবে দেখিতে গেলে কাম, মন, বিশিষ্ট জীবভাব, বিশুদ্ধ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার তত্ত্বের ক্রম পরিণতি ও অভিব্যক্তি হইতে থাকে ; কিন্তু ঐ পরিণতি ত' স্পর্দ্ধার কথা নহে। ঐ পরিণতি আমাদের ভিতর আত্মা বা ভগবৎ ভাবের অভাবেরই সূচনা করে। যে যোগী আপনার স্থূল দেহ-ভাব সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে—শ্রীভগবানের বৈশ্বানর মূর্ত্তিতে মিলিত করিতে পারিয়াছেন, যে কি স্থূল কি আধ্যাত্মিক ভাবে 'ন পচন্তে আত্মকারণাৎ" শুধু বিশিষ্ট 'আমির' জন্য অন্ন পাক করেন না, যিনি এই প্রকার পরিপাক ব্যাপারে দেখিতে পান যে ভগবানেরই অহং, বৈশ্বানর রূপে প্রাণীগণের দেহে অবস্থিত থাকিয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ স্থূল বা ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ রূপ আধ্যাত্মিক যজ্ঞফল "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বর"রূপে আপনি আহার করিতেছেন, তাঁহাকে আর ঐরূপ পরিণতির ভিতর দিয়া যাইতে হয় না। ঐ পরিণতিগুলিই ক্রমমুক্তির সোপান। সেইজন্য স্বেদ, মূত্র, মলাদি বিসর্গের স্বল্পতা ও শরীরের লঘুতা প্রভৃতি যোগীর যোগসাধনের প্রথম ফল বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি 'সর্ব্ব' ভাবটীকে আমরা সম্পূর্ণ হজম বা আত্মসাৎ করিতে পারি, যদি শরীর হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সকল ভাবেই পূর্ণ ভগবানকে দেখিতে পাই এবং ভগবৎ তত্ত্ব ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থের উপলব্ধি না হয়,——যদি আমরা ছিন্ন তত্ত্বগুলিকে সর্ব্বাত্মিকা বিত্তারূপিনী মহামায়ার সাহায্যে বিদ্যাভাবে পরিণত করিতে পারি, এবং সর্ব্বাত্মিকা দেবী যে কেবল ভগবানের ব্যঞ্জনার জন্য খেলেন ইহা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে চিত্তের সর্ব্বার্থতা ধর্ম্ম, সর্ব্ব ব্যাপারেই সেই পরমার্থ ভগবানে নিঃশেষে পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু আর অপরিপাক বা অজীর্ণের চিহ্ন স্বরূপ জগদ্ভাব প্রসব করিবে না। যতক্ষণ আমরা পূর্ব্বের সংস্কারজাত 'আমি'টীকে লইয়া থাকি, ততক্ষণই কর্ম্ম। আমার 'রাম' ভাবটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার রাশির ফল মাত্র। গত জন্মে যাহা করিয়াছিলাম, সে সকল কার্য্য 'আমির' বাহিরে বীজরূপে বপন করিয়াছিলাম, সেই প্রকৃত 'আমি' হইতে বিশ্লিষ্ট, মল মূত্রাদির ন্যায় বাহিরে পরিত্যক্ত,—সুতরাং মৃত ভাবগুলি অবলম্বন করিয়া 'আমি রাম' বলিতেছি। আমি 'রাম' এই ভাব পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; উহা অতীতের কথা, স্বপনের কথা। উহা প্রকৃত 'আমির' পরিত্যক্ত খোলস মাত্র। অথচ সেই ভাবটীকে লইয়াই ইহ জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্মের নিরূপণ করি। এই জন্যই বুঝি ভগবান বলিলেন,—"ভূত ভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সঞ্জিত"

যাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা ভূত বা মৃত, যাহা প্রেতভাবে অবস্থিত, যাহা স্বভাবগত, যাহা আমাদের প্রকৃত 'আমি" বুঝিয়া সুঝিয়া তাহার 'আমি' নহে জানিয়া প্রকৃতি বা স্বভাবকে দান করিয়াছে, অপ্রাকৃত মদনমোহনের অংশভূত সেই 'আমির' চিদ্বিলাসকেই ত' কর্ম্ম বলে। উহা আমাদের মৃত 'আমির' ভাষা লইয়া খেলে। অমৃতত্ত্বের খনি যে 'আমি' আছে তাহার ভাষা নহে। সে যে সদা স্থির, সর্ব্বভাবে সমরূপে স্বপ্রকাশ ; এ যে সদাই চঞ্চল, সদাই বাহ্যবিলাসের মধ্যে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় বিপরীত দিকে আপনাকে সিদ্ধ করিতে প্রয়াস করিতেছে। সে বলে 'অস্তি' আর এ সে অস্তির স্থির ভাষাটি ভুলিয়া গিয়া দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিতে প্রতিবিম্বটি সেই 'স' এর চিদ্বিলাস যোগ বিয়োগ করিয়া, বাহ্যগুলিকে জোর পূর্ব্বক একত্রিত করিয়া অপেক্ষাকৃত পরিণামী স্থৈর্য্য ভাবের সিদ্ধ করিয়াই পরিতৃপ্ত। সে বলে 'ভাতি' ও সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্ব-বস্তু প্রকাশ করিয়াও নিত্যই স্বপ্রকাশিত হইতেছেন ; আর এ ব্যাচারা "দুই আর দুয়ে চার" বলিয়া "সংকল্পাত্মক মন প্রভৃতির তথ্য অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বভূত চিদ্ঘন কালশশীর পরিমান করিতে যাইতেছে। সেই পর পুরুষে আর 'সর্ব্ব' নাই, কারণ তাহা চিদানন্দময়ী পরা-প্রকৃতি যে সর্ব্বনাশী। সে যে সর্ব্বের খেলা সহ্য করিতে পারে না, ও জ্ঞান ও আনন্দরূপে 'সর্ব্ব'কে ঘন করিয়া ভগবানেই মিশাইয়া দিতেছে। সর্ব্বার্থতার মধ্যে তাঁহাকেই অর্থ করিয়া সেই 'সর্ব্ব'নাশী 'সর্ব্ব'ভাবগুলি ভস্ম করতঃ শিবসুন্দরের শ্রীঅঙ্গের বিভূতি করিয়া দিতেছেন। পাঠক দগ্ধ বস্ত্র কি কখনও দর্শন করিয়াছেন ! যতক্ষণ হস্ত স্পর্শ না করিবেন, ততক্ষণ উহা অটুট বলিয়াই মনে হইবে। মুদ্রিত পুস্তকের একখানি পৃষ্ঠাতে অগ্নি সংযোগ করুন, উহা সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ হইয়া গেলেও, পূর্ব্বের লেখা বা সঙ্কেতগুলি ঠিক পাঠ করা যায় ও এমন কি পৃষ্ঠাটি স্বরূপ ভাবে আছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে ; কিন্তু স্পর্শ করিলেই দেখিবেন যে উহা ভস্ম মাত্র। যাহা বিশেষ ছিল, তাহা নিঃশেষে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ সেই সর্ব্বনাশী যখন তোমার হৃদয়ে ক্রীড়া করিবেন, তখন এই স্বতঃসিদ্ধ-প্রায় জীব ও জগতের নাম রূপের খেলারাশি একেবারে ভস্ম হইয়া যাইবে। তখন দেখিবে যে চিহ্নরূপে উহার অস্তিত্ব থাকিলেও, সে অস্তিত্ব বিভূতিরূপে শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্দ্ধক মাত্র। উহা বাস্তবিক নাই ও ছিল না। উহার ভূতভাব বিগত হইয়া এখন উহা বিভূতি রূপে আছে। যেমন যাই আপনি calculus নামক অঙ্কের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইলেন, অমনি সেই জাতীয় অঙ্কের যে শত শত বিশিষ্ট উদাহরণগুলি

ইতিপুর্ব্বে কত কষ্টে কষিয়াছিলেন, সেই বিশিষ্ট উদাহরণগুলি নাম ও রূপ ত্যাগ করতঃ অঙ্ক কষিবার অবিশেষ জ্ঞান বা শক্তিরূপে আপনাতেই মিশিয়া গেল। তখন জগত হইতে সমস্ত অঙ্কশাস্ত্র অপসারিত হইলেও ক্ষতি নাই; কারণ সেই 'সর্ব্ব' বা 'বহু'রূপে অখিলভাবে বিতন্বত ছিন্ন বিশেষগুলি,—জ্ঞানরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া 'আমি'তে ঘন হইয়া আছে। ঐ জ্ঞান কি তখন আপনার ভিতর সর্ব্বদা সকল বিষয়ে 'গজ্‌গজ্‌ করিতে থাকে? না; উহা কি মহান্‌ শক্তির বশে আমিতে 'অনু'রূপে 'সঞ্চিত'হইয়া গিয়াছে? আবশ্যক না হইলে, কেহ যদি তোমার'আমির' ভিতর 'বোমা' মারে, তাহা হইলেও প্রকাশ পাইবে না। এইরূপ কতশত ব্রহ্মা সেই ভগবানের 'আমির' ভিতর নিঃশেষে মিশিয়া আছে; তাঁহার 'অনুসন্ধান' স্বরূপা চৈতন্যময়ী মহামায়া সেই 'স-কল'কে ঘন করিয়া তাঁহাতেই ডুবাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যেমন তোমার আবশ্যক হইলে, তখনই সেই অনুসন্ধান-স্বরূপা দেবী তোমার ভিতর হইতে সেই ইঙ্গিতমাত্র রূপে অবস্থিত calculus জ্ঞান আবার প্রকট করিয়া, পুনরায় কোটী কোটী উদাহরণের ভিতর দিয়া সেই জ্ঞান প্রকট করিয়া দেন,—তদ্রূপ ভগবান যখন আপনার স্বরূপ চিদানন্দ ঘন স্বত্বা বিশেষরূপে জানিতে চাহিবেন, যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বীয় পদাঙ্গুলি লেহনের ন্যায় আপনার মাধুর্য্য আস্বাদনে আপন শক্তি দ্বারা সৃজিত বহু ভাবে ভোগ করিতে চাহিবেন, অমনি চিদানন্দময়ী তদীয় অনুসন্ধানরূপ শক্তির সাহায্যে সেই এক-রস প্রলয় কালস্থিত, জ্ঞানার্ণবের মধ্যে 'দংষ্ট্রোদ্ধৃত বসুন্ধরে' সেই পৃথিবীর ভস্মীভূত ইঙ্গিত মহাবারাহীরূপিণী রূপে আবার সেই দগ্ধবস্ত্রাবভাসং জগতের প্রতিষ্ঠা করিবেন। মহামায়ার এই খেলাকেই শাস্ত্রে 'কলা'রূপে ইঙ্গিত করা হয়। যে বাহু মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রে চন্দ্ররূপে নির্ণীত হয়, সেই মনস্তত্ত্ব কলারূপে দেবাদিদেবের শ্রীঅঙ্গে বাহু প্রকটরূপিণী শক্তিমাত্রা ও জ্ঞান মাত্রারূপে শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। যোগ অর্থে মোটা কথায় পরিপাক শক্তিই বুঝায়। উহাতে সর্ব্বাত্মিকা—সর্ব্বার্থসাধিকে—মহামায়া 'সর্ব্ব' লইয়া খেলা করিলেও সেই ভগবানরূপ পরমার্থ-সাধন-তত্ত্বই বুঝায়। সুতরাং এই যোগে শ্রীভগবানই আদি, অন্ত ও মধ্য, সর্ব্বাত্মিকা চৈতন্যময়ীই ইহার শক্তি,—নিষ্কল ব্রহ্মই দেবতা বা স্বপ্রকাশ তত্ত্ব,—সর্ব্বভূত-হৃদয় শুকাদি প্রমুখ ইহার ঋষি,—"বাসুদেব সর্ব্বমিতি" এই মহাভাবই ইহার কীলক,—"সর্ব্বধর্ম্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইহাই মন্ত্র; 'সর্ব্ব'তে যাহার

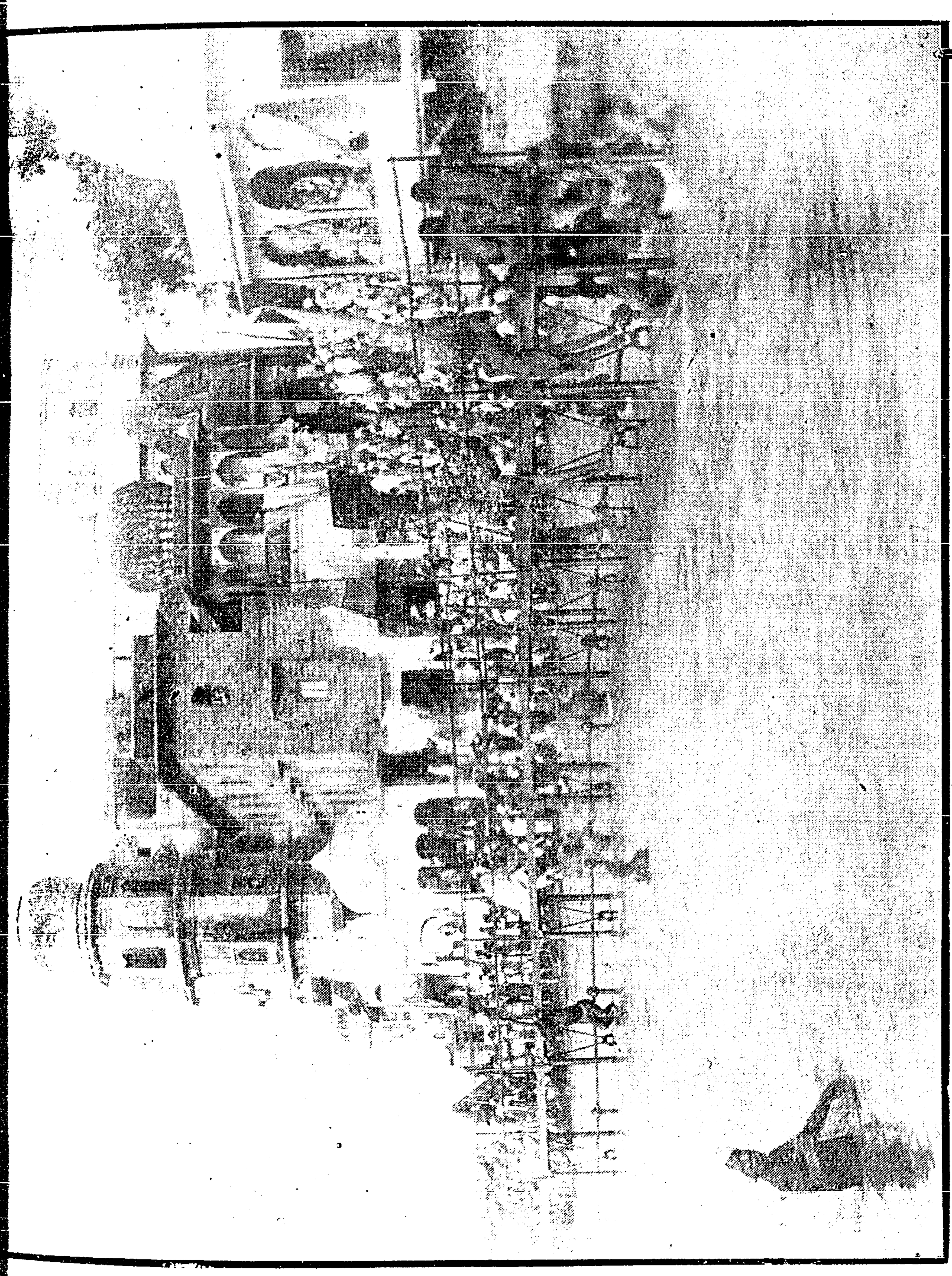

হরিদ্বার দৃশ্য (৪) ব্রহ্মকুণ্ডের উপরিস্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু।
ইহার উপর যাত্রীগণ সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া থাকেন।

আর অভিসন্ধি নাই, যিনি শ্রীরাধার ন্যায় "রূপ্যতে ইতি রূপম" বা সদা স্বপ্রকাশ সাগরোপম শ্রীভগবানের রূপসাগরে নির্ব্বিশেষে ডুবে যাওয়াই যাহার একমাত্র ইচ্ছা, এমন জীবই ইহার ক্ষেত্র বা আসন-তত্ত্ব। প্রাণের সমস্ত গতিকে 'যৎকরোসি যদশ্নাসি, মন্ত্রে শ্রীভগবানে মিশাইয়া দেওয়াই ইহার প্রণায়াম। ইহাই 'সহজ যোগ'; কারণ ইহা জীবভাবের উৎপত্তির মূলেও বর্ত্তমান (সহ-জ)। ইহা সহ-জাত বলিয়াই সুসুখ ও 'সহ-জ'। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

কাম]

অতৃপ্ত তৃষা।

তব বিরহ দহনে দহিছে হৃদয়,
　　রাখ সখা পদে রাখ হে!
ওই শান্তি মধুর করুণা-বরষা,
　　বরিষ এ মোর হৃদয়ে ॥
ওগো! ও বরষা বিনা এ বহ্নি যে সখা,
　　চাহেনা বারেক নিবিতে।
দাও হে, দাও হে, প্রাণ! পরাণে—
　　করুণা-আলোক ভাতিতে !!
সংসার-পবন লহরে যে সখা,
　　পাবক দ্বিগুণ জ্বলিছে।
শত বৃশ্চিক দংশনে যে গো--
　　চরম যাতনা দিতেছে ॥
সখা! তোমারই ভরসা করিহে,
　　ওই পদতল ছায়ে রাখিও।
ওগো! তোমার বীণা-ঝঙ্কারে যেন;
　　প্রেম-নীরে হৃদি নাচে গো !!
তব করুণা-বারিধে অমল বিম্ব,—
　　ঝলমল সদা করিছে।
ওই যে রাজীব চরণ-কমলে,—
　　শত শশধর ভাতিছে ॥
ওগো, যত ধাই সখা! তব চরণ তরে,
　　তব পদরেণু মাথে ধরিতে।
তব ও করুণা-নীর মরীচিকা প্রায়,
　　খেলে খেলা মোর হৃদি সাথে ॥
ওগো, শতেক যতন করিল এ প্রাণ,
　　ও নীরে স্নান করিতে,
শেষে—অনুসারি সখা! ক্ষিন্ন এ তনু,
　　নারিল পরশ করিতে ॥
এস প্রাণ সখা—এস হৃদয়েশ!
　　হৃদি-দ্বার খুলে রেখেছি।
বারেক দাওহে ও চরণ সখা;
　　শূন্য হৃদয় ক'রেছি ॥
ওগো! তোমার তরে লালায়িত মন,
　　হু হু রবে সদা জ্বলিছে।
হৃদে নাহি প্রাণ, করেছে প্রয়াণ;
　　তব পদ অন্বেষণে গিয়েছে ॥

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র।

হরিদ্বার।

(গত বৎসর ফাল্গুন সংখ্যার পর।)

পঞ্চতীর্থ।

পৌরাণিক বর্ণনানুসারে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত মায়াপুরীতে বহু তীর্থ। পুরাণে এমন অনেক তীর্থের কথা আছে, যাহা কাল প্রভাবে লুপ্ত। বহু তীর্থ বর্ত্তমান থাকিলেও যাত্রীগণ তাহা দর্শনের সুযোগ পান না এবং পাণ্ডাগণও সকল তীর্থের অবস্থান (position) অবগত নহেন। মায়াপুরী কেন, অনেক তীর্থেরই এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। শাস্ত্রোল্লিখিত সকল তীর্থের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ তীর্থমাত্রেই শাস্ত্রানুসারে পঞ্চতীর্থের ব্যবস্থা আছে; তীর্থ যাত্রীর পঞ্চতীর্থের সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত বিল্লকেশ্বর, নীলপর্ব্বত ও কন্‌খল—হরিদ্বারের পঞ্চতীর্থ।

গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্লকে নীলপর্ব্বতে।
তথা কণখলে স্নাত্বা ধূতপাপ্মা দিবং ব্রজেৎ ॥ ম-ভাঃ অনুশাসন ২৫ অঃ।
সর্ব্বে দেবা সগন্ধর্ব্বা যক্ষকিন্নর তাপসঃ।
তিষ্ঠন্তি যত্র তীর্থেহি সর্ব্বেতে মুক্তিলালসা ॥
চণ্ডীকা তীর্থরাজেহি সকৃতস্নাতো মহামুনে।
সঃধন্য পুরুষোলোকে সফলং তস্য জীবিতম্ ॥
দক্ষেশ্বরং মহাদেবং দৃষ্টা বৈ ভক্তি তৎপরঃ।
কৃতকৃত্যো ভবেৎ মর্ত্তো ধন্যতাং যাতি সত্বরম্॥ স্কন্দ-পুঃ কেঃ খণ্ড।

গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিল্লকেশ্বর, নীলপর্ব্বত ও কণখল তীর্থে স্নান করিলে পাপমুক্ত হইয়া মনুষ্যের স্বর্গবাস হয়। সর্ব্বদেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও তাপসগণ মুক্তিকামী হইয়া এই সকল তীর্থে বাস করিয়া থাকেন। চণ্ডিকা তীর্থে যে ব্যক্তি একবার স্নান করেন, তাঁহার জীবন ধন্য। ভক্তি তৎপর হইয়া দক্ষেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হ'ন।

১। গঙ্গাদ্বার।—(ব্রহ্মকুণ্ড)—হরিদ্বার নগরীর পশ্চাতে একটী পর্ব্বত আছে, যাহার শিখরে মনসাদেবীর মন্দির ও সূর্য্যকুণ্ড বিরাজমান। গঙ্গার অপর পারে প্রসিদ্ধ চণ্ডীর পাহাড়। "গঙ্গাদ্বার" নামের সার্থকতা বুঝিতে হইলে ও হরিদ্বারের মনোরম দৃশ্য-বৈচিত্র্য অবলোকন করিতে হইলে, এই পর্ব্বত-

দ্বয়ের কোন একটীতে আরোহণ করিতে হয়। পর্ব্বত চূড়া হইতে উত্তরে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত দিগন্ত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গার রজত ধারা কলকল নাদে স্বর্গ সদৃশ হিমালয় হইতে পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ উপত্যকা বা দ্বার দিয়া সমতল ভূমিতে অবতরণ করিতেছেন। পর্ব্বতদ্বয়ের উপত্যকা মধ্যেই গঙ্গার ত্রিধারা এবং নগরী বিরাজমান। এই পর্ব্বতদ্বয়ই হিমালয়ের শেষ পর্ব্বত (last spurs of the Himalaya) ইহার নাম শিবালিক পর্ব্বত। তাহার পরই ভারতের শস্যশ্যামলা সমতল ক্ষেত্র আরম্ভ হইয়াছে। উভয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ উপত্যকা—যাহার মধ্য দিয়া গঙ্গার ধারা ভূমিতে অবতরণ করিতেছে, তাহা ঠিক দ্বারের ন্যায়ই দেখায়। গঙ্গাদ্বার হরিদ্বারেরই নামান্তর, কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটেই সকলে গঙ্গাদ্বারের তীর্থকৃত্য ও স্নান দানাদি করিয়া থাকেন। এই ঘাটে পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুগণ তাঁহাদের মৃত আত্মীয়গণের অস্থি ও ভস্মাবশেষ গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। কাশীর মণিকর্ণিকার ন্যায় এই ঘাটও পবিত্রতম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হরিদ্বারে গঙ্গাতীরের শোভা অতি মনোরম। গঙ্গাতীরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বারাণসী এবং যমুনাতটে মথুরা নগরীর শোভা ভুবনে অতি দুর্লভ; যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত উপল-প্রতিহতা ঝঙ্কারকারিণী গঙ্গাতটশোভিনী হরিদ্বারের সৌন্দর্য্য আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বোধ হইয়াছিল। সৌধকিরীটিনী বারাণসী অপেক্ষা হরিদ্বার আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, ভাগীরথী সলিলের প্রখর প্রবাহ এবং পার্ব্বত্য ও হরিৎ কানন-শোভায় ইহার সৌন্দর্য্য অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। গঙ্গাতীরে ঘাট ও ঘাটের সম্মুখে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত চত্বর (platform) প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। মাতা ভাগীরথী নিত্য নির্ম্মল শীতল প্রখর প্রবাহে সোপানশ্রেণী প্রক্ষালিত করিয়া কলকুল রবে দিবসযামিনী প্রধাবিতা হইতেছেন। চত্বরের পশ্চাদ্‌ভাগে শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, উচ্চ চূড়া সমন্বিত মঠ ও মন্দিরসমূহ এই পবিত্র তীর্থের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিতেছে। হরিদ্বারের এই প্রশস্ত তটভাগের রমণীয়তার তুলনা অন্য কোথাও আছে কি না জানিনা। হরিদ্বারে গঙ্গার শোভা বড় মনোহর। জল প্রবাহ দেখিলে মনে হয়, যেন প্রাণময়ী—চিন্ময়ি—তেজোময়ী—অমৃতময়ী—শুভ্রা ব্রহ্মময়ী * মাতা জাহ্নবী

* "গঙ্গা"র এই সকল নামের অর্থ "গো গঙ্গা গায়ত্রী" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

এখানে চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। আমরা মায়াচ্ছন্ন, চর্ম্ম-চক্ষুতে তাঁহার চিন্ময়ী দিব্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু হৃদয়ে যেন একটা অপূর্ব্ব ভাবের অনুভব হইতেছে। কাশী প্রয়াগ গঙ্গাসাগর প্রভৃতি নানাতীর্থে গঙ্গার বিভিন্নরূপ দেখিয়াছি, কিন্তু প্রবাহের এরূপ অপূর্ব্ব শোভা হরিদ্বার ভিন্ন কোথাও আমাদের নয়ন গোচর হয় নাই।

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের প্রাচীরের গায়ে একটী কুলুঙ্গীতে বিষ্ণুর চরণপদ্ম খোদিত আছে। সুতরাং এই ঘাট "বিষ্ণুপদী" নামেও খ্যাত। হিন্দুস্থানীরা বলেন,—"হরি কি চরণ পৈরী।" কথিত আছে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার এই ঘাটে যজ্ঞকালে সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি এইস্থানে আবির্ভূত হন; সেইজন্য উক্ত পদচিহ্ন খোদিত। ব্রহ্মকুণ্ডের সম্মুখ ভাগে গঙ্গার প্রবাহ মধ্যে একটী দ্বীপাকার প্রস্তর চত্বর বাঁধান আছে। ঘাটের সহিত উক্ত ক্ষুদ্র দ্বীপ সেতু দ্বারা সংযোজিত।* ক্ষুদ্র দ্বীপ ও ঘাটের মধ্যবর্ত্তী কুণ্ডাকৃতি জল প্রবাহই ব্রহ্মকুণ্ড নামে খ্যাত। উপরেই কাষ্ঠনির্ম্মিত আর একটী সেতু আছে। ইহার উপর যাত্রী ও নাগরিকগণ বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, মৎস্যকে আহার্য্য দান † ও বিচরণ করিয়া থাকেন। এই সেতুর উপর বসিয়া গঙ্গার সান্ধ্য আরত্রিক দেখিতে অতি মনোরম।

ব্রহ্মকুণ্ড নিত্যোৎসব সমন্বিত। প্রত্যুষ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অবিরাম জনসমাগম, তীর্থকৃত্য ও স্নানদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান চলিতেছে। যতবার হরিদ্বারে ট্রেণ আসিতেছে, দলে দলে ভারতের বিভিন্ন দেশবাসী বিচিত্র বেশভূষাধারী নূতন নূতন যাত্রী আসিয়া প্রথমেই এই ঘাটে ভক্তিভরে স্নানাদি করিতেছেন। ব্রহ্মমুহূর্ত্তে দলে দলে নরনারীগণ স্নানাহ্নিক, জপ ও পূজা করিতেছেন। দ্বীপটীর উপর কত ভক্ত গৃহী সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন ও পূজানিরত। ঘাটের পার্শ্বেই কত দেবালয়; কোন কোন মন্দিরে শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিতা "চন্দ্রাযুত সমপ্রভা" গঙ্গার সুন্দর প্রতিমা; কোন মন্দিরে মহাদেব; কোন মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ। ভিক্ষুকগণ নানারূপ বেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে। ঘাটের

* এই সেতু ও ব্রহ্মকুণ্ডের আংশিক চিত্র গত পৌষ মাসের "পন্থায়" প্রকাশিত হইয়াছে।

† ব্রহ্মকুণ্ডের হরিদ্রাভ সুবৃহৎ মৎস্যগুলির নির্ভয়ে নির্ম্মলজলে বিচরণ, ক্রীড়াভঙ্গী এবং যাত্রী প্রদত্ত খাদ্য বস্তুর ভোজন ব্যাপার একটী কৌতুককর দৃশ্য। এখানে জীবহিংসা না থাকায়, মৎস্যগণ ভয় কাহাকে বলে জানে না বা মনুষ্য দেখিয়া পলায়ন করে না বরং আহার পাইবার প্রত্যাশায় সাগ্রহে জলের উপর সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। যাত্রীগণ সেতুর উপর হইতে খই, মুড়ি, ময়দার গুলি প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া মৎস্যের কৌতুককর ক্রীড়া দেখিয়া থাকেন।

উপরেই দুইটী বালক রাম সীতা সাজিয়া সম্মুখে ভিক্ষার থালা সাজাইয়া বসিয়া আছে। মহিলা যাত্রীগণ ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করতঃ প্রণামী দিতেছেন। মন্দির গুলিতে পূজা ও আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। সমস্ত দিনই এইরূপ আনন্দ-কোলাহল এবং মনোরম দৃশ্য-বৈচিত্র। কিন্তু সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মকুণ্ডের শোভা সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম; সে শোভা অনির্ব্বচনীয়—অতুলনীয়, অন্য তীর্থে দুর্লভ! ব্রহ্মকুণ্ডের অর্দ্ধ বৃত্তাকার ঘাটের নিম্নতম সোপানের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান পূজক বৃহৎ একটী আরত্রিক হস্তে গঙ্গাদেবীর আরত্রিক করিতেছেন; জল, স্থল, ব্যোম, শঙ্খ-ঘণ্টারবে মুখরিত। পশ্চাতে ভারতের নানাদেশের তীর্থ যাত্রীগণ জয়ধ্বনি করিতেছেন; কুণ্ডের সম্মুখবর্ত্তী সেতু ও দ্বীপে কত সন্ন্যাসী, গৃহস্থ সন্ধ্যাহ্নিক ও ধ্যান-ধারণায় আত্মহারা। কেহবা উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রপাঠ করিতেছেন। বহু বিদ্যার্থী বৈদিক সুরতাল সহযোগে গঙ্গা-লহরী পাঠ করিতেছেন। ভক্ত কণ্ঠোচ্চারিত মনোরম স্তোত্রধ্বনি লহরে লহরে সেই অনন্ত লীলাময়ের শ্রীচরণে ভাসিয়া চলিয়াছে। জাহ্নবীর কুলুকুলু ধ্বনি তাহার সহিত মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মধুরতার সৃষ্টি করিতেছে। অপর পারে চাহিয়া দেখ, হরিৎবৃক্ষলতা মণ্ডিত দ্বীপ এবং পর্ব্বতমালা ধ্যানে নিমগ্ন। প্রদোষ কালে এই মনোরম শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে একবার ধ্যানস্থ হও, দেখিবে তীর্থ-মাহাত্ম্যে তোমার চিত্ত-মল ধুইয়া গিয়াছে এবং এক অদ্বিতীয় আনন্দ মাত্রা চিত্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন বুঝিবে হরিদ্বার সত্যই "হরেস্তৎ প্রাপ্তে দ্বারমিব"—হরি বা হরের প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ। ক্রমে সন্ধ্যান্ধকারে জল, স্থল, পর্ব্বতশৃঙ্গ আচ্ছাদিত হইলে, দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। মহিলাগণ ঘাটের ধারে অসংখ্য দীপাবলী সাজাইয়া দিতেছেন—কেহ বা প্রজ্বলিত দীপাবলী গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দিতেছেন, সে দৃশ্যও অতি মনোরম। তাই বলিতেছিলাম, ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট প্রত্যহ প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই উৎসব-সমন্বিত যাত্রীগণের আনন্দ কোলাহলে ও শঙ্খ ঘণ্টারবে মুখরিত। যে কয়দিন হরিদ্বারে ছিলাম, আমাদের বাসার প্রকোষ্ঠ হইতেই এই আনন্দ দিবারাত্রি উপভোগ করিতাম।

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের ৩৯টি সোপান আছে।* প্রথম ধাপ ২২॥০ হাত এবং নিম্নতম ধাপ ৬০ হাত লম্বা। পূর্ব্বে ঘাট আরও ছোট ছিল, উহা আকবর সেনাপতি অম্বর রাজ মানসিংহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কালক্রমে উহা ভগ্ন হইয়া

* গত ফাল্গুন সংখ্যার চিত্র দেখুন।

যাওয়ায় এরূপ দুর্গম হইয়াছিল যে, স্নানকালে বহু সংখ্যক লোক একটু অসাবধান হইলেই, ভাগীরথীর প্রবল প্রবাহে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় রাজন্য ও ধনীগণের সাহায্যে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। কুম্ভমেলার সময় হরিদ্বারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক সমাগম হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে যে কুম্ভমেলার সময় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এ সময় এখানে ২০।২৫ লক্ষ ব্যক্তি একত্রিত হ'ন। কুম্ভযোগ কয়েক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হয়। ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও মহান্তগণ তখন নিজ নিজ দলবলসহ এখানে একত্রিত হয়েন। কোন্ সম্প্রদায় অগ্রে স্নান করিবেন, ইহা লইয়া পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণের মধ্যে বিষম বিবাদ এবং লাঠালাঠি হইত। Gazeteer পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের কুম্ভমেলায় শৈব, গোস্বামী ও বৈরাগী সম্প্রদায় মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া ১৮০০ ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে নানক সম্প্রদায়ী শিখেরা ৫ শত গোস্বামীকে হত্যা করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকালে কুম্ভমেলার ন্যায় পবিত্র যোগের সময় ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের মুনি, উদার-হৃদয় সন্ন্যাসীগণ এবং ধর্ম্মপ্রাণ গৃহীগণ তীর্থসমূহে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম-মীমাংসা, শাস্ত্রার্থ বিচার এবং যুগধর্ম্ম নির্ণয় করিতেন। কালক্রমে কলির প্রভাবে সন্ন্যাসীগণের কি অধঃপতন হইল! সর্ব্বভূতে ভগবানকে দর্শন যাঁহাদের সন্ন্যাস গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—যাঁহারা সমস্ত তাঁহাতেই ন্যস্ত করিয়া সমদৃষ্টি হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিতেন, তাঁহাদের কি ঘোরতর অধঃপতন! তাঁহারা স্বকীয় সম্প্রদায়ের "বিশিষ্ট" "আমি" প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া আসুরিক হিংসায় প্রবৃত্ত! যাহা হউক সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজন্যবর্গ ও সুধীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন্ সম্প্রদায় অগ্রে করিবেন, তাহার একটী ক্রম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে আর ইহা লইয়া বিবাদ হয় না। তবে অল্প সময়ের মধ্যে (যোগের স্থিতি কাল) স্নান করিতে হইবে বলিয়া, যাত্রীগণের মধ্যে একটা কোলাহল ও বিষম হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ নানারূপ চেষ্টা করিয়াও সম্যক্‌রূপ শান্তিরক্ষা করিতে পারেন না। কত যাত্রী ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া গিয়া পদদলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা ঠিক থাকে না। কুম্ভের সময় গঙ্গার উপর নৌকা দ্বারা দুইটী সেতু প্রস্তুত হয়, একটী ব্রহ্মকুণ্ডের সম্মুখে, আর একটী প্রায় ১॥০

মাইল দক্ষিণে। প্রথমে শেষোক্ত সেতুদ্বারা দ্বীপে যাইতে হয়, ক্রমে উত্তরাভিমুখে ১॥০ মাইল চলিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের সম্মুখবর্ত্তী সেতু পার হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া স্নান করিতে হয়। তৎপর হরিদ্বারের পথ দিয়া স্নানকারিগণ স্বীয় আবাস স্থানে ফিরিয়া যান; ইহাই দলবদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গণের স্নানের নিয়ম। কুম্ভমেলার দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। যদি ভারতবর্ষের বিশালত্ব অনুভব করিতে চাহেন, যদি একস্থানে ভারতের সকল উপাসক সম্প্রদায়কে দেখিতে চাহেন, তবে কুম্ভমেলা দেখিতে ভুলিবেন না।* এক একটী সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীগণ, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, ধ্বজপতাকা, মল্ল, লাঠি, খেলোয়াড়, বাদ্যকর, পাল্কী প্রভৃতি দলবল ও মহান্ত সহ গমন করিয়া থাকেন। ইহাকে সাধুদের জমায়েত বলে। হস্তী পৃষ্ঠে প্রধান মহান্ত এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ইষ্টদেব মূর্ত্তি ছত্র ও চামর যুক্ত হইয়া অগ্রে অগ্রে চলেন। সন্ন্যাসীগণ দলে দলে ইষ্টদেব মূর্ত্তি ও গুরুদেবের পার্শ্বে স্বসম্প্রদায়ানুরূপ জয়ধ্বনি করিতে করিতে গমন করেন। প্রথমে ইষ্টদেব মুর্ত্তি ও পরে প্রধান মহান্তের স্নান হইলে, সন্ন্যাসীগণ স্নান করেন। নানক সম্প্রদায়ের উদাসীগণ ইষ্টমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে গুরু নানকের কাষ্ঠ পাদুকাকে প্রথম স্নান করাইয়া থাকেন। একদল হর হর বম্ বম্ বলিতে বলিতে গিয়া জলে পড়েন। তারপর একদল হরে নারায়ণ, হরে নারায়ণ বলিতে বলিতে অগ্রসর হ'ন। আর একদল হর শিব শম্ভো, জয় শিব শম্ভো বলিতে বলিতে স্নান করেন। এইরূপে সমস্ত দিন কুম্ভমেলার যোগের সময় ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে অপূর্ব্ব দৃশ্যের অভিনয় হয়।

২। **কুশাবর্ত্ত**।—ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি শেষ করিয়া কুশাবর্ত্ত ঘাটে পুনঃ স্নান করতঃ পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি এবং গোদান করা বিধেয়। কেদার খণ্ডে কুশাবর্ত্ত তীর্থের উৎপত্তি কাহিনা এইরূপ বর্ণিত আছে। যোগীশ্রেষ্ঠ দত্তাত্রেয় এইস্থানে সমাধিস্থ ছিলেন, সেই সময় গঙ্গা গিরিরাজ হিমাদ্রি হইতে অবতরণ করিতে করিতে স্রোতবেগে মহর্ষির কুশ, বস্ত্র ও দণ্ড প্রভৃতি ভাসাইয়া লইয়া যান। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি কুশাদি দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মহর্ষিকে নিষেধ করেন। গঙ্গাও ভয়ে স্রোত আবর্ত্তণ করিয়া কুশাদি প্রত্যর্পণ করেন। মহর্ষির তপঃ প্রভাবে ও দেবগণের সান্নিধ্যে কুশাবর্ত্ত তীর্থে পরিণত হইল। যে স্থলে কোন মহাত্মা তপস্যা করিয়া শক্তি সঞ্চারিত করেন, যে

* ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র বৈশাখে হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা হইবে।

স্থলে ঋষিগণের তপঃ প্রভাবে দেবগণের আবির্ভাব হয়, সেই স্থানই তীর্থে পরিণত হয়। এইরূপেই পুণ্যভূমি ভারতে অসংখ্য তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণদেবের তপস্যা ক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর তীর্থে পরিণত হইয়াছে। তাই পুরাণ বলিতেছেন,—

ক্ষেত্রাণি সরিতশ্চৈব পর্ব্বতাশ্চ নদস্তথা।
ঋষিণাং তপসো বীর্য্যাৎ মাহাত্ম্যং পরমং গতাঃ॥

ক্ষেত্র, সরিত পর্ব্বত, নদী ঋষিগণের তপস্যা প্রভাবে পরম মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তবীর্য্য গুরু মহর্ষি দত্তাত্রেয় ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন ;—

অত্রৈব ভবতাং স্থানং নিত্যং সাত্তীর্থকে বরে।
আবর্ত্তনাদ্যতো গঙ্গা কুশান্ ধৃতবতী মম॥
কুশাবর্ত্তমিতিখ্যাতং তীর্থমে তদ্ভবিষ্যতি।
ধন্যাঃ লোকাঃ করিষ্যন্তি স্নানং পিতৃসমর্চ্চনম্।
তৎ পিতৃনাং চ তস্যাপি ন স্যাজ্জন্ম পুনঃ ক্কচিৎ।
কুশাবর্ত্তে মহাতীর্থেদত্তং স্যাদ্‌কোটী সংখ্যকম্॥

হে ব্রহ্মাদিদেবগণ! আপনারা এই তীর্থে অবস্থান করুন। গঙ্গা আমার আকর্ষণে স্রোত আবর্ত্তিত করিয়া আমার কুশাদি প্রত্যার্পণ করিয়াছেন; অতএব এই তীর্থ কুশাবর্ত্ত নামে খ্যাত হইল। যে ব্যক্তি এই তীর্থে স্নান এবং পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন, তিনি ধন্য, তিনি এবং তাঁহার পিতৃগণ পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন। কুশাবর্ত্তে দান করিলে, তাহা কোটীগুণ ফলপ্রদ; তাই তীর্থযাত্রী মাত্রেই এখানে পিণ্ড দানাদি করিয়া থাকেন। গঙ্গার স্রোত এই ঘাটে অত্যন্ত প্রবল, ঘাটে লৌহ শৃঙ্খল সংযোজিত আছে। তাহা ধরিয়া অতি সাবধানতার সহিত স্নান করিতে হয়; হস্ত স্খলিত হইলে গঙ্গার প্রবল প্রবাহ কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। বহু বর্ষ পূর্ব্বে, ইন্দোরের মহারাজা একটী প্রস্তর নির্ম্মিত দালান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, সেই দালানেই সারি সারি লোক বসিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। একদল যাইতেছেন আর একদল আসিতেছেন, আবার তাঁহারাও কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। অবিরাম শ্রাদ্ধের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে ঐ স্থান মুখরিত এবং ভক্তির তরঙ্গে নিমজ্জিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিং।

ঊর্দ্ধবাহু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

"কাল্‌নার ঠাকুর বাটীতে মধ্যে মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া অবস্থান করেন। সেই সময়ে একজন সাধু সেইস্থানে ছিলেন। লোকটী অত্যন্ত স্বল্পভাষী, নির্জ্জন প্রিয় ও বিনয়ী। আপন মনে উদাস ভাবে বসিয়া থাকিতেন, কখনও বা ইষ্টদেবের পূজা করিতেন কিম্বা গুণ গুণ করিয়া ভজন গাহিতেন। আকৃতিটা কিন্তু আদৌ সাধুর মত ছিল না। দীর্ঘ শীর্ণকায়, এক চক্ষু বিহীন, বৈষ্ণবের মত মাথায় বড় বড় চুলে ঝুঁটী বাঁধা। কি জানি কেন এই কদাকার সাধুটীর আমার প্রতি করুণা হইল। একদিন একটী মৃৎপাত্র করিয়া কিছু চরণামৃত আনিয়া আমাকে বলিলেন,—

"অকাল মৃত্যু হরণম্ সর্ব্বব্যাধি বিনাশনম্।
বিষ্ণু পাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়োম্যহম্॥"

এই মন্ত্র মনে মনে ভক্তিভরে উচ্চারণ পূর্ব্বক চরণামৃত পান করিও। এবং নিজে তাঁহার কমণ্ডলু হইতে প্রত্যহ তিন বার করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে চরণামৃত ছিটাইয়া দিতেন। সেই সময় মনে হইত যেন সমস্ত শরীর জুড়াইয়া দিতেছে; শরীরের প্রদাহ ও ব্যথা অনেকটা উপশম বোধ হইত। একদিন করজোড়ে তাঁহার নিকটে ব্যাধি ও যন্ত্রণা হইতে মুক্তি ভিক্ষা করিলাম। সাধু কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে নীরবে চলিয়া গেলেন। পরদিবস এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী আমাকে দিয়া বলিলেন,—

"ত্রিভির্দিনে ত্রিভির্পক্ষে ত্রিভির্মাসে ত্রিভিবর্ষে।
অত্যুৎকট পাপপুণ্যং ইহৈব ফলমশ্নুতে॥"

আমি আজ এখান হইতে চলিয়া যাইব। তুমি দিবারাত্রে যতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে, একাগ্রচিত্তে এই শ্লোকটী পাঠ করিবে। মুখ শুকাইয়া গেলে ভাণ্ডস্থ চরণামৃত পান করিবে অথবা জিহ্বা আড়ষ্ট ভাবাপন্ন হইলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মনে মনে পাঠ করিব না উচ্চৈঃস্বরে?"

তিনি বলিলেন, মনে মনে এখন পাঠ করিতে পারিবে, না; চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িবে। তৎপরিবর্ত্তে অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে

বারম্বার পাঠ করিয়া যাইবে। আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অনুরূপ ব্যবস্থা হইবে।

পুনরায় বলিলাম "আমার রোগমুক্তির একটা উপায় করুন!"

সাধু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,— দেখ ভগবান, গুরু বা সাধু সন্ন্যাসীর নিকট পবিত্রতা বা ধর্ম্মে মতি ব্যতীত কখন কিছু প্রার্থনা করিও না; কেননা তোমার পক্ষে কি উচিৎ, অনুচিত বা আবশ্যক, অনাবশ্যক, তাহা তোমা অপেক্ষা তাঁহারা ভাল বুঝেন।" যখন একটু সুস্থ বোধ করিবে, তখন প্রত্যহ দুই তিনবার ভক্তিভাবে গঙ্গাস্নান করিবে ও উত্তম করিয়া সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গা মৃত্তিকা লেপন করিবে; ইহাতেই তোমার রোগমুক্তি হইবে। একমাত্র চরণামৃত ছাড়া কাহারও নিকট আহার্য্য বস্তু বা কোন কিছু প্রার্থনা করিও না। নিত্য প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উপস্থিত হইলে, তাহা স্পর্শ বা সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিও না। চরণামৃত না পাইলে তৎপরিবর্ত্তে গঙ্গাজল ব্যবহার করিও; কেন না ইহাও বিষ্ণু পাদোদকং। যথাসম্ভব অপরের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবে; এইরূপ ভাবে দিন কাটাইয়া যাও।

সাধু চলিয়া গেলেন; নিজে ঘৃণিত কুষ্ঠরোগী বলিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইবার সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিত হইলাম।

বৈশাখী পূর্ণিমা সমাগত; বহুদিন হইতে সাধুর প্রতীক্ষায় ছিলাম। সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, রাত্রি উপস্থিত হইল; তথাপি তিনি আসিলেন না। বহু দিনের আশায় বঞ্চিত হইলে প্রাণে যেমন একটা আঘাত লাগে, সেইরূপ ব্যথিত হইলাম। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, সেই সাধু আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া; প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি লইলাম। তিনি বলিলেন,—"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতম্ কর্ম্ম শুভাশুভম্" এই পদটী অদ্য হইতে অর্দ্ধস্ফুট ভাবে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিও, ইহা স্বপ্ন বা তোমার কল্পনা নহে; শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। অন্য প্রত্যাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কিছু অভ্যাসের পরিবর্ত্তন উচিৎ নহে। স্বপ্ন ভঙ্গে একবার মনে হইল ইহা বুঝি কল্পনা। কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন বাধা দিয়া বলিল,—"না ইহা কল্পনা নয়।" নবোৎসাহে নূতন মন্ত্রে ব্রতী হইলাম।

ইহার পর হইতেই শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। দেহের ব্যথা কমিতে ও ক্ষতস্থান শুকাইতে আরম্ভ করিল, শরীর নূতন ভাবে গঠিত হইতে লাগিল। মনে আবার উৎসাহ ও আশা জাগিয়া উঠিল।

নারিকেল ফল যখন বাহিরে সুন্দর হরিৎ-শোভা-মণ্ডিত ও পুষ্ট হয়, ভিতরেও তেমনি অলক্ষ্যে স্বাদু নীর ও শ্বেতশস্যে পূর্ণ হইতে থাকে। নদীস্রোত বহিয়া গেলে যেমন তলদেশে ধীরে ধীরে পলি পড়িয়া যায়, সেইরূপ দেহ ও মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরেও অজ্ঞাতসারে একটা সুন্দর স্তর পড়িয়া আসিতেছিল। কর্ম্মের ফলে ধীরে ধীরে জ্ঞান ও ভক্তি বিকশিত হইতে লাগিল। ভগবানকে পূর্ণ ও দয়াময় বলিয়া বোধ হইল। বুঝিলাম আমার কর্ম্মফল আমিই ভোগ করিতে বাধ্য! ইহার জন্য অন্য কেহ দায়ী নহে। আমারই দুষ্প্রবৃত্তি দমনের জন্য এই শাসনের ব্যবস্থা।

শরীর পুনরায় রোগ-বিমুক্ত, পুষ্ট ও লাবণ্যযুক্ত হওয়াতে, লোকেরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নানারূপ বলাবলি করিতে লাগিল। কিছুদিন পূর্ব্বে যাহারা মহাপাপী বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া দূরে চলিয়া যাইত, তাহারাও পরম সাধু জ্ঞানে শ্রদ্ধান্বিত চক্ষে দেখিয়া যাইত। ভারে ভারে খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্রাদি আসিয়া উপস্থিত হইত। দলে দলে লোকজনের আগমন, অজস্র প্রশ্ন ও উপদেশ এবং প্রার্থনায় আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

আষাঢ়ীয় পূর্ণিমা সমাগত; সেদিন দুই তিনটী সাধু আগমন করিলেন। কিন্তু আমার মুক্তি দাতার প্রতীক্ষায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। রাত্রি দু'দণ্ড থাকিতে নিদ্রাভঙ্গে ভাবিয়াছিলাম, হয়ত গতবারের ন্যায় স্বপ্নে দর্শন দিবেন, কিন্তু বঞ্চিত হওয়াতে বড়ই কাতর হইলাম। পরদিন নবাগত সাধুগণের মধ্যে একজন বলিলেন,—তুমি এখনি গঙ্গাস্নান করিয়া আইস।

আ। আপনি কে?

সা। সে পরিচয় তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই।

আ। তবে আপনার কথা শুনিব কেন?

সা। তুমি কি জান না যে, আজ হইতে তোমার নূতন ব্যবস্থা হইবার কথা আছে?

আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"হাঁ আছে বটে, তবে তিনি ত' অন্য লোক।

সা। তাঁহার সঙ্গে আমার জনকপুরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি তোমাকে অদ্য নূতন ব্যবস্থা দিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিয়াছেন। তুমি স্নান করিয়া আইস, এখনি এস্থান হইতে যাত্রা করিতে হইবে।

স্নান হইলে "অপবিত্র পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোহপিবা, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সঃ বাহ্যাভ্যন্তরেঃ শুচিঃ। এই শ্লোকটী মনে মনে ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে বলিলেন; এবার আর অর্দ্ধস্ফুটভাবে নহে। পরে দুইজনে সেথান হইতে যাত্রা করিলাম; চুঁচুড়া যণ্ডেশ্বর তলার ঘাটে আমাকে রাখিয়া সাধু দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেলেন। কেবল বলিয়া গেলেন যে শরীর ও মন যদি সুস্থ ও শ্রীসম্পন্ন রাখিতে চাও, ত' কদাচ অনাচারী হইও না, উচ্ছিষ্ট বা অভক্ষ্য ভক্ষণ করিও না।

শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, মন অতি প্রফুল্ল, হতাশা ও কাতরতা মিলাইয়া গিয়াছে; তথাপি জপে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। মন ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার দেশের ও ললিতার প্রতি ছুটিতেছে। মনে হইল দেশে থাকিয়া এখন হইতে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করি, এ কষ্টকর বৈরাগী জীবন আর ভাল লাগে না। আত্মীয়-স্বজন, গৃহ ও বিশেষতঃ ললিতাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বারম্বার জাগিয়া উঠিতেছিল। শঙ্কিত হইলাম, সে কি! যার জন্য এত ক্লেশ, অপমান ও জীবন-মৃতবৎ অবস্থা, তার প্রতি আবার অনুরাগ! মন বুঝাইয়া দিল, না—ললিতার বিশেষ কোন অপরাধ নাই; এ সমস্ত তাহার অনুগৃহীতগণের কারসাজীতেই হইয়াছে। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল, ভাবিলাম একি! যাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এত চেষ্টা, পরিশ্রম, আবার কি না সেই আবর্ত্তে ডুবিয়া মরিবার প্রয়াস। আমি যে কায়মনোবাক্যে শপথ করিয়াছি যে, পূর্ব্বজীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পবিত্র ধর্ম্ম জীবন যাপন করিব। বিশ্বাসঘাতক মন বুঝাইল,—তা কেন, দেশে থাকিয়া কি ধর্ম্ম জীবন যাপন করা যায় না? কেবল দূর হইতে ললিতাকে দেখিয়াই তৃপ্ত থাকিবে। বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম, হায় অকৃতজ্ঞ মানব! হায় বিশ্বাস ঘাতক মন! যথনই বিপত্তি—যন্ত্রণা—রোগ-ভোগ, তথনই শপথ, ভক্তি ও পবিত্র ভাব, কাতরতা, প্রার্থনা এবং ধর্ম্ম জীবনের প্রয়াস বা মর্কট বৈরাগ্য! আবার যথনই ব্যথা কমিয়া ক্ষত স্থান শুষ্ক হয়, তথনই সকলি ভুলিয়া যাও! এইজন্যই বোধ হয় কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, নারায়ণ বিপদ দিও, সম্পদ চাই না। জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী জটিল কর্ম্ম-সূত্রের বন্ধন বুঝিতে না পারিয়া, অজ্ঞ মানব বলিয়া থাকে যে, ভগবান পাপের পরিণাম যদি দুঃখ হয়, ত' হাতে হাতে তাহার ফল দাও না কেন? তা'হলে কোন্ কর্ম্মের কি ফল বুঝিয়া সাবধান হই। পূর্ব্ব জন্মগত কর্ম্মফল রহস্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

একদিন মধ্যাহ্নে এক দীর্ঘাকার হিন্দুস্থানী ব্রহ্মচারী ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উপস্থিত হইয়া এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,—চল, তোমাকে এখনি এস্থান হইতে যাইতে হইবে। আমি বলিলাম, কেন? সাধু কর্কশ স্বরে বলিল বাবাজীর আদেশ. অধিক বাক্যব্যয় করিওনা। অগত্যা তাহার সঙ্গে বেলুড় পর্য্যন্ত আসিলাম। সাধু অত্যন্ত স্বল্প ও কর্কশ ভাষী, একেবারে [illegible] বৈদান্তিক, সমস্ত নস্যাৎ। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও ধমক্ দিয়া উঠিতেন। এ স্থান অত্যন্ত নির্জ্জন, চতুর্দ্দিক পেয়ারা ও কণ্টক বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। সে জঙ্গলের ভিতর দিয়া স্বচ্ছন্দে গমনাগমন অত্যন্ত দুরূহ। চতুর্দ্দিকে নরমুণ্ড এবং অস্থিমালা বিক্ষিপ্ত। একত্রে এত নর অস্থির প্রচুর সমাবেশের কারণ বুঝিলাম না। আমার পক্ষে এই স্থানে বাস অতীব সঙ্কটময়। নির্জ্জনতা ও ভীষণতায় পুনরায় সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি হইল। সাধুটী অনেক সময়েই থাকিতেন না, যেন কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে আগ্রহের সহিত অন্বেষণ করিতেন।

শয্যা ছিল না, আহারও তদ্রূপ কদর্য্য, তদুপরি কঠিন বন্ধন। প্রাতঃকাল হইলেই হস্ত ও পদদ্বয় লতাগুল্ম দ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিতেন। হস্তদ্বয় সম্মুখ ভাবে প্রসারণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ন্যায় ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতাম; রৌদ্রের উত্তাপ বাড়িয়া উঠিলে উপুড় হইয়া পড়িতাম। ভয় হইল কাপালিক নাকি! পলাইবার উপায় নাই, অথচ কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলাইত না। লোকটা শক্তিমান নিশ্চয়ই, কেননা তাহাকে দেখিবামাত্র ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতাম। দিবাভাগে কাঁচালঙ্কা ও নিমপাতা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য, রাত্রে কোন দিন ছাতু, কোন দিন পুরী বা ফলমূল ইহাই আহার। ভয়ে, সন্দেহে ও অবস্থা বিপর্য্যয়ে শরীর ও মন দিন দিন শুকাইতে লাগিল। তিন দিন গত হইলে সাধু বলিলেন,—"ব্রহ্মচর্য্য বিহীনস্ত জীবনম্ বৃথা ধারণম্" এই মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিবে। আমি বলিলাম,—কেন?

সা। তোমার বাবাজীর আদেশ। আমি বলিলাম, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য জিনিষটা কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। সাধু কর্কশ ভাবে বলিলেন, তুমি এখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না; এখনো অধিকারী হও নাই। তবে এইটুকু জানিয়া রাখিও, যখন কাম ক্রোধাদি রিপু বর্জ্জন করিতে পারিবে, তখনই তুমি অল্পে অল্পে ব্রহ্মচর্য্য পালনের অধিকারী হইবে। আরও এক সপ্তাহ গত হইলে পদদ্বয়ের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। মনে করিলাম পলাইয়া যাই,

কিন্তু আপাততঃ আশঙ্কার কারণ নাই দেখিয়া পলাইলাম না। ভাবিলাম "রাখে কৃষ্ণ মারে কে?" দেখি না ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়!

এই সময়ে সাধু প্রচুর পানীয় ও ফলমূল রাখিয়া ৫।৭ দিনের জন্য কোথায় চলিয়া গেলেন। তখন অবশ্য অন্য কোন বিশেষ অসুবিধা ছিল না, তবে শরীর ও মন ক্রমশঃই দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। একদিন হঠাৎ আসিয়াই বলিলেন,—চল, এখান হইতে কালীঘাট যাইতে হইবে। ভাবিলাম, এইবার বলি দিবে নাকি? কিন্তু কালীঘাটের ন্যায় জনাকীর্ণ স্থানে কিসের ভয় সুতরাং যাত্রা করিলাম। কালীঘাটে আসিয়া গঙ্গা স্নানান্তে সাধু বলিলেন,—এখন তোমাকে এইস্থানেই থাকিতে হইবে; এবং এই মন্ত্রটী সর্ব্বদা আবৃত্তি করিবে; "যত্র নারী তত্র গৌরী।" আরো বলিলেন যে প্রত্যূষে ও সায়াহ্নে প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্য প্রণাম করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত পদদ্বয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার বা পথ চলিবার সময়—

"সমুদ্র মেখলে দেবী পর্ব্বত স্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণু পত্নী নমস্তভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥"

এই শ্লোকটী মনে মনে আবৃত্তি করিয়া ভাবিবে যে, এক জন পাপী হইয়াও তোমার ভার ধরিত্রী মাতাকে বহন করাইতেছ; এবং তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। সেই দিনই সাধু ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহার আর কোন সন্ধান পাইলাম না।

এখানে কিছুদিন বেশ আনন্দেই ছিলাম; বিশেষ কোন ক্লেশ বা অভাব ঘটে নাই। একদিন আসন তুলিতে গিয়া দেখিলাম, আসনের নিম্নে এক টুক্‌রা তুলট কাগজে লেখা আছে যে, এইবার উত্তর মুখে গমনপূর্ব্বক ঘোষপাড়া নামক স্থানে অবস্থান করিবে এবং

"সদা সত্য বচন অধীনতা উর পরস্ত্রী মাতৃসমান।
তিনোসে না হরি মিলে ত' তুলসী ঝুট্ জবান॥"

এই দোঁহাটী মনে মনে আবৃত্তি করিবে। হস্তাক্ষর বিশেষ পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। কাল্‌নায় অবস্থান কালে বিষম বিপত্তিকালে এই হস্তাক্ষর প্রথম দেখিয়াছিলাম। যাহা হউক ঘোষপাড়া যাত্রা করিলাম; তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর একজন বাবাজীর সহিত পরিচয় হইল। বাবাজীটী অতিশয় সরল, বিনয়ী, কোমলান্তকরণ ও প্রকৃত ভক্ত। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিয়া পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে বাবাজী

পুরুষোত্তম যাইবার সময় আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া গেলেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গাতীরে ব্রহ্মপুর নামক স্থানে এক মহা সাধু পীড়িত হইয়াছেন; আমি যেন তথায় যাইয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করি; তাহা হইলে ইহ-পরকালে মঙ্গল হইবে।

ব্রহ্মপুর যাত্রা করিলাম; আসিয়া দেখি আমার সেই মুক্তি দাতা এক চক্ষুহীন সাধু! এক বৃক্ষমূলে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় দারুণ রোগে এক প্রকার ভূ-শয্যায় শায়িত। যুগপৎ আনন্দ, দুঃখ, কৃতজ্ঞতা ও অভিমানে চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া গেল। যিনি আমায় ঘৃণিত কুষ্ঠ রোগের সময় নিকটে আসিয়া স্নেহে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার এই কষ্ট ও অসহায় অবস্থা! পায়ে ধরিয়া এই সকল কারণে কত অনুযোগ করিলাম। তিনি কেবল নিষ্প্রভ অস্তমিত চন্দ্রের ন্যায় ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"কাতর হয়ো না বাবা, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া থাকে, এ সমস্তই ইষ্টদেবের কৃপা।"

যাহা হউক প্রাণপণ চেষ্টা ও সেবা শুশ্রূষায় কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিলে, একদিন হঠাৎ সেই দীর্ঘাকার বৈদান্তিক ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত। নির্নিমেষ নয়নে উভয়ে উভয়ের দিকে কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বোধ হইল, বহুদিনের পর অভাবনীয় ভাবে পিতাপুত্রের মিলনে বা কেহ অকস্মাৎ কোন হারানিধি খুঁজিয়া পাইলে যেরূপ অবস্থা হয়, ইঁহাদেরও যেন সেই ভাব। আমরাও পরস্পরকে দেখিয়া একটু অবাক্ হইয়া গেলাম।

ব্রহ্মচারী কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, দরদর ধারায় নয়নাশ্রু ঝরিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী পদধূলি লইয়া স্নেহ-বিজড়িত স্বরে বলিলেন,—বাবা এমন করিয়া কি আমাদের কাঁদাইতে হয়? আমরা যে আজ কতদিন ধরিয়া কত স্থানে বৃথা অন্বেষণ করিতেছি, তাহা ভগবানই জানেন। সাধু কেবলমাত্র হাসিয়া স্নেহভরে মস্তকে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্রমে জানিলাম বাবাজী বিখ্যাত সাধু পওহারী বাবা এবং বৈদান্তিকের নাম ব্রহ্মচারী রামানন্দ।

বাবাজীর অনুমতি ক্রমে ব্রহ্মচারী রামানন্দজী সেই স্থানেই আমাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। সে দীক্ষা যে কি, তাহা তোমায় বলিব না; তোমারও জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। ব্রত লইয়া অবধি মৌনী ও ঊর্দ্ধবাহু। যে বাক্‌শক্তি ও দক্ষিণ বাহুর অপব্যবহারে আমি চরিত্রভ্রষ্ট,

কুপরামর্শ, মিথ্যা কথন ও নরহত্যায় লিপ্ত হইয়াছিলাম, সেই দুইটী প্রধান কর্ম্মেন্দ্রিয়কে ইহ জীবনের জন্য পরমাত্মার নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। আমার গভীর বিশ্বাস যে এই ত্যাগে পূর্ব্ব কর্ম্মগুলি ভবিষ্যৎ ফল দানের জন্য সঞ্চিত হইবে না। এখনো সেই আমি,—আমার প্রকৃত 'আমিত্বের' বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই; তবে অদ্ভুতরূপে সম্পূর্ণ নূতন ভাবের 'আমি'—না পাপী; না পুণ্যবান।

বৃথা কৌতুহল সৃজনের বা নূতন ধরণের গল্প পাঠের জন্য এ বৃত্তান্ত তোমাকে দিই নাই। ইহাতে তোমার চাঞ্চল্য দূর হইয়া শান্তি, সন্তোষ এবং জানিবার, শিখিবার, বুঝিবার ও পাইবার অনেক বস্তু আছে; এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই লিখিলাম।

আরো দুই একটী কথা আছে। আমার পূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া যেন ঘৃণা করিও না, তাহা হইলে তোমার প্রত্যবায় হইবে। দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাসী বা ঊর্দ্ধবাহু সম্প্রদায়ের প্রতি যেন মনে কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব পোষিত না হয়। লোকে কত ভাবে, কত বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া বন্ধন কাটাইয়া স্রোতে আসিয়া পড়ে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বরঞ্চ আমার মত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অতি অল্প; কেননা এরূপ ব্যক্তির বৈরাগ্য সচরাচর দৃঢ় বা স্থায়ী হয় না।"

আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পড়িলাম; পড়িয়া মনে এককালীন বহুবিধ ভাব ও চিন্তার সমাবেশ হইয়া, কখনো উৎফুল্ল, কখনো স্থির—বিস্মিত কখনো বা রোমাঞ্চিত হইলাম। একবার এই ঊর্দ্ধবাহু ও এইরূপ সাধুদের প্রতি ঘৃণার ভাব আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই সাম্‌লাইয়া ফেলিলাম। বরঞ্চ আমার প্রতি সাধুর অনুকম্পা ও সহৃদয়তা দেখিয়া মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ বোধ করিলাম।

পরদিন যথারীতি সাধুর নিকটে গিয়া দেখিলাম, স্থান শূন্য। শুনিলাম তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ধুনি সদ্য নির্ব্বাপিত, অঙ্গার ও ভস্মরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

য় ভাগ। শ্রাবণ, ১৩২১। ৪র্থ সংখ্যা।

[মোক্ষ]

পূজার ফুল।

আকাঙ্ক্ষা।

এই যে আমার শীর্ণ দেহ, এই যে আমার জীর্ণ গেহ;
তারি মাঝে ঢাল্‌ছ বসে উজল আলোর প্রভা রাশি।
এই যে দুঃখ তাপে মলিন, শীর্ণ হৃদয় শুষ্ক কঠিন;
তারি মাঝে মধুর স্বরে, বাজাও তোমার মোহন বাঁশী।
চাইনা তোমার দিকে ফিরে, আমায় তবু আছ ঘিরে;
সর্ব্ব দিকে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বরূপে রাজ-তপসি।
এমন ক'রে তোমার পানে, টান্‌ছ আমায় প্রাণে প্রাণে;
সেই তুমি কে? কেমন তুমি? দেখ্‌তে তোমায় ভালবাসি।

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক-চৌধুরী।

[মোক্ষ]

জ্ঞানই—অগ্নি।

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ॥

আগুনে কি করে তা' অবশ্যই জান; তবুও একবার বলি। কাঠ পেলে কাঠকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে, লোহা কি অন্য ধাতু দাও গলিয়ে জলের মত করে দিবে; মূল্যবান্ ধাতু—সোনা রূপার মধ্যে যদি কোন খাদ থাকে, তা বার করে দিয়ে ধাতুটিকে মলশূন্য উজ্জ্বল করে দিবে,—তা'র কত চাকৃচিক্য বাড়িয়ে

তুল্‌বে। ঘর বাড়ী পেলে তো কথাই নাই,—বেশ করে পুড়িয়ে তার চারিদিকের মানুষের হাত-গড়া ও মন-গড়া ব্যবধান গুলো নষ্ট করে ফেল্‌বে। খাদ্যদ্রব্য,—যদি নজর রাখ্‌তে পার, তবে পাক করে আহারের উপযোগী করে দিবে। একটা পাত্র ক'রে যদি আগুনের উপর জল চাপিয়ে দিতে পার, তবে জলকে বেশ্‌ ক'রে সিদ্ধ করে, তার মধ্যে দুষ্ট কীটানুদলকে ধ্বংস করে স্বাস্থ্যের অনুকূল পানীয়ে পরিণত ক'রে দিবে! তোমার গায়েতে এক টুক্‌রা রগ্‌রগে আগুন যদি ফেলে দেওয়া যায়, তুমি যত কুড়েই হও, আর স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে পার্‌বে না দু' হাত তুলে চারিদিকে নেচে বেড়াবে! সেকালে আবার এই অগ্নিদেবই জজ সাহেবের মত ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য বিচারের ভার লইতেন। আজকাল যে তিনি এ কাজ হতে পেন্সন লইয়াছেন, তাহা আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না! যাই হ'ক আগুনের এত গুণ—আগুন দেবতা নয় ত' কি? যা'রা জড়বুদ্ধি, তারাই অগ্নিকে জড় পদার্থ মধ্যে গণনা করে!

লোক হাহাকার করে উঠ্‌চে,—"ওরে আগুন লেগেছেরে, ঘর পুড়ে গেল, পাড়া পুড়ে গেল, দেশ জ্বলে গেল—বাপ্‌রে, মারে"—অগ্নির এই বিভীষণ করাল মুর্ত্তি দেখে লোকে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ে! কিন্তু বাপু এই আগুন লোকের সর্ব্বস্ব নষ্ট করে দিবার সময়েও লোকের যে উপকার করে, মানুষ উপকার কর্‌বে ব'লে কোমর বেঁধে এসেও ততখানি উপকার কর্‌তে পারে না। বায়ুর মধ্যে যে সব রোগ বীজাণু বিবিধ ভোগ্য পদার্থের মধ্যে বসত-স্থান পাবার জন্য অহরহঃ অন্বেষণ ক'রে ফির্‌চে, এই সকল দস্যুগুলিকে ঘর জ্বালাইবার অছিলায়, অগ্নি তাহাদের গলহস্ত দিয়া দেশের বার করে দিয়ে আসেন! মানুষের এমন বন্ধু আর কে? তাই আর্য্য ঋষিরা অগ্নিদেবকে আপনাদের যজ্ঞ-কর্ম্মের পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন!

এই অগ্নির রূপ অনেক; এবং সর্ব্বত্রই তিনি দহনকার্য্যে ব্যাপৃত! জঠরের মধ্যে ইনিই জঠরাগ্নি। প্রতিদিন চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ ভুক্তান্নকে পরিপাক কর্‌চেন এবং তাঁহার ভোগ-ভুক্ত অন্নই মনুষ্যের মধ্যে কান্তি, বল, ধী-রূপে পরিণাম লাভ করিতেছে; ইহাই মনুষ্য-সমাজে, পুষ্টি, আরোগ্য, শান্তি বিধান করিয়া সমাজকে এক অপূর্ব্ব শ্রী প্রদান করিতেছে। প্রাণের মধ্যে অগ্নি একটু কমিলেই চিকিৎসকের বাড়ী ছুটাছুটি করিতে হয়; দেশ-বিদেশে বায়ু পরিবর্ত্তনের ধুম লাগিয়া যায়! মনের মধ্যে আবার ইহার একছত্র রাজত্ব। কখন কামাগ্নি, কখন চিন্তাগ্নি, কখন ক্রোধাগ্নিরূপে থাকিয়া থাকিয়া আত্মপ্রকাশ

করেন। তখন এই বিশ্ব সংসারটাকে একটি কুম্ভকারের চক্র বলিয়া ভ্রম য়! সেখানে তখন শরীর ও শরীরস্থ ধাতুগুলিই কাষ্ঠের কার্য্য করে। এই অগ্নিরই আর এক মুর্ত্তি আছে, তাহার ন্যায় পবিত্র ও হিতকর বুঝি এ জগতে আর কছুই নাই। সত্ত্বগুণের ধীর বাতাসে এই মুর্ত্তি জাগিয়া উঠে, ইহারই নাম জ্ঞানাগ্নি। তখন মানুষের এই দেহখানি এবং তাহার কর্ম্ম ও প্রবৃত্তি নিচয় হার ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন অগ্নিতে যত কাষ্ঠ সংযোগ করিবে, অগ্নি তই 'দাউ দাউ' করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, একটি অপূর্ব্ব জ্যোতি দিক্ সকলকে দ্রাবিত করিয়া তুলিবে; তেমনি তপস্যা ও পুণ্য প্রভাবে জ্ঞানাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে, মস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া একটি অপূর্ব্ব জ্যোতি চিত্তকে অধিকার রিয়া বসিবে। সেই জ্যোতির সাহায্যেই আমরা শুক্ল দেবযান পন্থাকে চিনিয়া ইতে পারি—"তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ"। অগ্নি যতক্ষণ গুপ্তভাবে কাষ্ঠের মধ্যে বাস করেন, ততক্ষণ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, শুধু কাষ্ঠকেই দেখিতে পায়। আবার অগ্নি প্রকাশ পাইলে কাষ্ঠ আর কাষ্ঠ থাকে না; তখন তাহাও অগ্নি হইয়া যায়। তদ্রূপ আমার মধ্যে যে জ্ঞান গুপ্তভাবে বাস করিতেছেন, সাধু ও গুরু কৃপায় যখন তাহা প্রকাশিত হয়, তখন দেহটাকে র্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলে, শরীরটাকেও তখন যেন শুধু জ্যোতি বলিয়া নে হয়। কাষ্ঠ যখন অগ্নিতে পুড়িয়া ভষ্মাবশেষে পরিণত হয়, তখন শুধু অগ্নি-জ্যোতির একটা 'অরূপ' তেজঃ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। খন মানুষের অসংখ্য কর্ম্ম-কাষ্ঠ সেই জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ছাই হইয়া যায়, তখন জ্ঞানাগ্নি ফুটিয়া ধক্ ধক্ করিতে থাকে, তাহাতে মানুষের দুশ্চিন্তা, সঙ্কল্প, অহংকার প্রভৃতি কাম-শরীর—সেই প্রদীপ্ত অগ্নি-জ্বালার মধ্যে আত্ম-গোপন করে! এই আগুন তোমার আমার সকলের মধ্যেই আছে। "য্যায়সে গিরিস্থুত্ মে জ্যোতি"—এই জ্যোতিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই মনুষ্যের নিষ্কাম কর্ম্ম;—এই জন্যই তাহার জীবনব্যাপী সাধনা! প্রস্তরের মধ্যে অগ্নির প্রকাশ দেখিবার জন্য যেমন আর একখানি প্রস্তরের প্রয়োজন, তেমনি এখানেও জ্ঞানাগ্নি ছুটাইবার জন্য সদ্‌গুরুরূপী একখানি প্রস্তর খণ্ডের প্রয়োজন হয়। এই অগ্নির প্রকাশ হইবামাত্র, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার হওয়ার মত সমস্ত অজ্ঞানতা—মস্ত জড়তা ও কর্ম্ম-বন্ধন কোথায় মিলাইয়া যায়। তখন খালি আগুন! র্ব্বত্রই আগুন! কেবল প্রকাশ, কেবল জ্যোতি, কেবল আলোক! একেবারে মস্ত দিক্ ভরপূর হয়ে উঠে। আলোকসম্পাতে সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে এক অপরূপ

রূপ ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায় ;—তখন মনে হয় এক অখণ্ড ভাতি এই ভুবনত্রয়কে আচ্ছাদিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। জড়তাতে দেহকে বড় ভার করে; দেখনা কেন, আল্‌সেগুলো উঠ্‌তেই চায় না, সব কাজই তা'দের কাছে ভার বলে বোধ হয়! আগুনের কাছে থাকলে এই জড়তা ভাঙ্গে! শীতকালে ঠাণ্ডার সময় যখন সমস্ত শরীরটা জড়বৎ হ'য়ে উঠে, তখন অগ্নির কৃপাতেই আমরা কি জড়ত্বের কঠিন নিগড় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি না? অগ্নি শোক হরণ করে। শোক তো মোহেরই কাজ কি না, অগ্নি প্রকাশ স্বরূপ; তা'ই আগুনের প্রকাশময়ী সত্ত্ব শক্তির নিকট মোহের তামসিক শক্তি টিকিতে পারে না! অগ্নি যে শোকনাশক, তাহা শবদাহের সময় বেশ বুঝিতে পারা যায়! পূর্ব্বকালে তাই ব্রাহ্মণেরা অগ্নিকে জীবনের সাথী ক'রে রেখেছিলেন। তাঁহারা ভিতরে বাহিরে এই আগুনের ধুনি জ্বালিয়ে রেখে দিতেন। বাহিরে অগ্নি যা দেখ্‌ছ, তাই ভিতরের অগ্নি—জ্ঞান! তাহা আবার লৌকিক ভেদে দুই প্রকার। লৌকিক এই, যাহাতে ইন্দ্রিয়-সাধ্য বস্তুজ্ঞান হয়, অলৌকিক জ্ঞানে অতীন্দ্রিয় পরমার্থ জ্ঞান হয়। এই অগ্নির উপাসনা কর্‌তে কর্‌তে "যো দেব অগ্নের্হ" প্রকাশিত হ'য়ে পড়েন! সেই অগ্নিদেবই হচ্চেন তোমার "অপুত্রঃ জ্যোতিষাং জ্যোতি"; আত্মানুসন্ধানীরা তারই সন্ধান জেনে কাজ গুচিয়ে নেন, তখন এই পরমতত্ত্বকে লাভ করে, অন্য লাভকে তাঁরা লাভ বলেই মনে করেন না! আত্ম তত্ত্বানুসন্ধিৎসুরা তাঁরই জন্য সমস্ত জীবন ব্রহ্মচর্য্যে অটল-প্রতিষ্ঠ হ'য়ে থাকেন। এই জ্যোতি দেখেই অর্জ্জুন ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন ;—

"লেলিহ্যসে প্রথমান্ সমস্তাল্লোকান সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জগদ্ভি।
তেজোভিরা পূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।"

প্রথম প্রথম রোগ, শোক, অভাব, দুঃখের আগুনে মানুষ জ্বলে পুড়ে মরে: তবুও এই আগুনকে মাথায় থেকে কখন নামায় না--এই আগুনের প্রবাহের মধ্যেই সাঁতার দিয়ে বেড়ায়। কোন কিছুতেই যখন তার মনকে অবসন্ন করতে পারে না, সেই--পরে এই বিদ্যুজ্জ্বালাময়ী প্রকাশের অভ্যন্তরে কোটি সূর্য্যের প্রকাশ এবং তন্মধ্যে "চন্দ্রকোটি সুশীতলম্" অবস্থা দেখে আশ্বস্ত হয়! তাহার মনুষ্য-জীবন ধন্য হয়! যে এই পরম জ্যোতি না পায়, সে কেবল আগুনের জ্বালাই অনুভব করে; এর প্রকাশ শক্তিকে—জ্ঞানময়ী দিব্যশক্তিকে বুঝিবার অবসর পায় না! এস আমরা সেই প্রকাশমান শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের চরণ বন্দনা করি।

[মোক্ষ]

প্রত্যাবর্ত্তন।

১।— আমি পাতকিনী, তোমারে ভুলিয়া, দেহেরে স'পেছি প্রাণ,
নীচ সহবাসে, নারকিনী হ'য়ে, খোয়ানু তোমার মান!
ভালবেসে মোরে, যাহা দিয়েছিলে, সকলি স'পিনু তা'য়,
তবু তার মন, না উঠে কখন, দহে মোরে পায় পায়!

২।— কত না সোহাগে, ধরিনু চরণে, মরম দলিয়া গেল,
আদরে অধরে, সুধা বাঁটি দিতে, সকলি গরল ভেল!
কিন্তু নাথ! তুমি এত অযতনে পাসরিলে নাহি মোরে,
আড়ালে দাঁড়ায়ে আমার লাগিয়ে তিতিছ নয়ন-লোরে!

৩।— সে যে নিদারুণ, তুমি কি করুণ, ক্ষমার নাহিক ওর,
নাহি কর রোষ, নাহি ধর দোষ ভাঙ্গিল গরব মোর!
সাজায়ে পসরা, দিয়েছিলে ভরা, ভাসায়ে নদীর জলে,
আজি ভাঙ্গা তরী 'ডোব' 'ডোব' হ'য়ে, ফিরিল চরণ তলে!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

[মোক্ষ]

মোক্ষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে মোক্ষতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি জ্ঞান-ফলের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে এ বিষয় বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক; কারণ ধর্ম্মার্থকাম এই তিনটির পরিজ্ঞান না হইলে প্রকৃত ভাবে মোক্ষতত্ত্বের কথঞ্চিৎ উপলব্ধিও সম্ভবপর হয় না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজকাল লোকের বুদ্ধি ঐকদেশিক ভাবে সনাতন-শাস্ত্র-রূপ মহামহীরুহের শাখা-প্রশাখার তথ্য নিরূপণেই প্রযোজিত। মূল তত্ত্ব সমূহের কথঞ্চিৎ অবভাস না জন্মিলে, শাখা প্রশাখাদিরও প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। সেই জন্যই আমরা চৈতন্যের মূল ভাষা বুঝিয়া, তাহার পরে "ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলং জ্ঞানং" বুঝিবার চেষ্টা করিব। কি বৈজ্ঞানিক ভাবে বাহ্য 'বহু'র অনুশীলন দ্বারা, কি দার্শনিক ভাবে আমাদিগের নিজ চৈতন্যের অনুশীলন দ্বারা,—বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদিগের চৈতন্যের অভ্যন্তরে দুইটী

মৌলিক প্রবৃত্তি, গতি বা প্রবণতা (trend) আছে। একই চৈতন্য "উভয়ান্বিত আত্মানং" (polarised) হইয়া একদিকে কেন্দ্র-জ্ঞানে 'আমি' বা 'পুরুষ' প্রভৃতি ভাবে,—অপর দিকে 'সর্ব্ব,' 'বহু' বা 'জগৎ'ভাবে খেলিতে থাকে। একথা সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত গত বৎসরের "মায়া—বিদ্যা ও অবিদ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। রামকে সম্মোহিত করিয়া তাহার চিত্ত হইতে 'সে রাম' প্রভৃতি বুদ্ধি অপসারিত করিয়া দেওয়া হইল। তারপর তাহাকে একটী বালিশ প্রদান পূর্ব্বক বলা হইল যে, এইটী তাহার সন্তান; সে অমনি সংস্কার-বশে সেই বালিশটীকে অঙ্কে স্থাপন করতঃ সন্তান বোধে আদর করিতে লাগিল। সে স্ত্রী কি পুরুষ এরূপ কোনও কথাই তাহাকে বলা হয় নাই। তাহার পর তাহাকে একগাছি বালা পরিধান করিতে বলা হইল। অনেকেই অবগত আছেন যে, ধনবান্ নন্দনগণও শৈশবে বলয়াদি অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে; সুতরাং এই বলয় পরিধান ব্যাপারেও তাহার স্ত্রী কি পুরুষ বুদ্ধি উন্মেষের কোনও কারণ নাই। কিন্তু রাম, চৈতন্যের কি আশ্চর্য্য গতির বশে পূর্ব্বোক্ত সন্তান পালন ও বলয় ধারণ উভয় ব্যাপারই সমানুপাতী করিয়া, তাহার অভ্যন্তরে বিরাজমান, অথচ অনির্দ্দিষ্ট (undefined) 'আমি' ভাবটীর সহিত মিলিত করিয়া দেখিবে। ওরূপ ভাবে মিশাইলে কাজে কাজেই স্ত্রীবুদ্ধি জাগরিত হইবে। তাহার পর তাহাকে বস্ত্র পরিধান করিতে আদেশ করিলে, সে স্ত্রীলোকের মত করিয়াই বস্ত্র পরিধান করিবে। এ প্রকার স্ত্রীজন-সুলভ বস্ত্র পরিধানের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে, সে বলিবে 'সে স্ত্রীলোক, তাহার নাম সরোজিনী'। তদনন্তর তাহার সরোজিনী ভাবের পিতা, মাতা, পতি প্রভৃতি সর্ব্ব' ভাব আপনা আপনি প্রকটিত হইতে থাকিবে। এস্থলে বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি বৃত্তিগুলির জ্ঞান হইয়াই চৈতন্যের খেলার শেষ হইল না। অপিচ ঐ সকল বৃত্তি হইতে,—প্রতি বা বিপরীত ভাবে বিম্বিত হইয়া,—প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন 'আমি'র অভিমুখী একটী গতি প্রকাশিত হইল। ঐ গতির বশেই সন্তান পালন, বলয় ও বস্ত্রাদি পরিধান নানা 'বাহ্য' ভাবের সমানুপাতী, অথচ অতিগ একটি 'আমি' বোধ জাগরিত হইল। এই গতিটিকে শাস্ত্রে 'প্রতি' (বিপরীত ভাবে) অঞ্চতি (মিশিয়া যাওয়া) অর্থাৎ বিপরীত ভাবে মিশিয়া যাওয়া বা 'প্রত্যয়', 'প্রত্যভিজ্ঞতা', প্রত্যগ্‌জ্যোতি প্রভৃতি শব্দে ইঙ্গিত করা হইয়া থাকে। 'উপনিষৎ' এই গতিকেই "সা কাষ্ঠা সা পরাগতি" বাক্যে অভিহিত করেন।

এই গতিটির বিষয় আর একটু বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক। ইহা

বৃত্তি সমূহের সমানুপাতী হইলেও বৃত্তির বিরুদ্ধ ধর্ম্মী। বৃত্তিগুলি বাহিরে আসিয়া পড়িতে চায়; আর এই গতি অন্তর্ম্মুখী হইয়া মিশিয়া যায়; ইহা কেন্দ্র বা একত্ব অভিমুখী; বৃত্তি নিচয় 'বৃত্ত' বা 'সর্ব্ব' অভিমুখী। ইহা বৃত্তি সমূহের সংযোগ বা জন্য-ফল নহে; বৃত্তিসমূহ হইতে (উৎ-স্থিত) উত্থিত হইলেও এই আমি'টি বিশিষ্ট বৃত্তিরাশিতে পরিসমাপ্ত নহে; কারণ তাহা হইলে সম্মোহিত রাম কেবল সন্তান পালন ও বস্ত্র পরিধানের ভাণ মাত্র করিতে সমর্থ হইত, অপর কিছুই করিতে পারিত না। 'আমি সরোজিনী' এই বোধে সমস্ত বৃত্তি, ক্রিয়া, স্মৃতি ও ভাবরাশির দ্রষ্টা হইয়া খেলিতে পারিত না। রামের স্মৃতিতে পুরুষ ভাবেরই আধিক্য ও প্রাবল্য আছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য কৌশলে তাহার স্মৃতি-ক্ষেত্র হইতে স্ত্রীবুদ্ধির উপযোগী ভাবগুলি সংগৃহীত (Select) হইয়াও সেইগুলিকে সংমিশ্রিত (co-ordinated) করিয়া 'আমি' জ্ঞানটী স্বপ্রকাশিত হইতেছে। এই সংগ্রাহক শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। এক অধিকরণের সমানুপাতী বৃত্তিসমূহকে অবসান বা লীন করিয়া দেওয়া বা অধ্যবসায়ই বুদ্ধির ক্রিয়া। তাহা হইতে চিত্ত 'আমি' সরোজিনী রূপ খ্যাতি বা বিশিষ্ট জ্ঞান উৎপাদন করিল। এই খ্যাতি 'পুরুষ' বা 'আমি' নহে; কারণ 'আমি সরোজিনী' না হইয়া সরলা, কমলা, মেরি বা লুৎফুন্নিসা অনেকই হইতে পারিত। এই 'আমি' অভিমুখী গতিটিকে 'পুরুষ' তত্ত্ব বলে।

'পুরুষ' বলে কেন? 'পুরী শয়নাৎ পরিপূর্ণত্বাৎ বা'; ইহাই আচার্য্যের উক্তি। বৃত্তির পুরাভ্যন্তরে সমানুপাতী হইয়া বৃত্তিসমূহের অন্ত বা অবশেষামৃতং রূপে আছেন বলিয়া ইনি 'পুরুষ'; অথচ 'পুর' হইতে পর বা অতিগ; কতকটা যেমন "হাতে আছে হাতে নাই, হাত বাড়া'লে পেতে নাই" গোছের। তাঁহাকে ধরিতে যাও, সে মহা-লম্পট—পলাইয়া উপরে উঠিয়া বসিবে। যদি বল তাহা কি প্রকার? যেমন centre of gravity বা meta-centre এর ন্যায়। জড়ের অবয়ব (volume) ও আয়তন (mass) বৃত্তির ন্যায় 'বিশিষ্ট' অণু সমূহে সংগঠিত। অণুগুলিকে 'সর্ব্ব' ভাবে মিশাইয়াই বস্তুর অবয়ব স্থির রহিয়াছে; কিন্তু উহার কেন্দ্রটি (centre of gravity) কি বিশিষ্ট অণুজাতীয়? বস্তুটিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতঃ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও কেন্দ্র বলিয়া কোনও অণুজাতীয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না; কেবল 'বহু' ভাবের অণু সমূহ পাইবে। কিন্তু এই কেন্দ্রের অস্তিত্ব কি অলীক? উহা কি মিথ্যা জ্ঞান মাত্র? উহা অলীক হইলে ব্যবহারে আসিতে পারিত না। বস্তুর যে অংশে ঐ কেন্দ্রের

স্থিতি, তাহার সহিত ভূ-কেন্দ্রের প্রতি রেখাপাত করিলে, সেই রেখা স্থানে একটী সূচ্যগ্র মাত্র সাহায্যে সমগ্র বস্তুটিকে ধারণ করিতে পারিবে। যাত্রিগণ সমারূঢ় তরণী যখন প্রবল ঝটিকাবেগে আন্দোলিত হইতে থাকে ও আরোহিগণ নৌকার নিমজ্জনাশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠে, সে অবস্থায় আরোহিগণ নৌকাগহ্বরে নামিয়া বসিলে, নৌকার meta-centre বা কেন্দ্রটীকে একটু নীচে নামাইয়া আনা হয় ও তন্নিবন্ধন নৌকার আন্দোলন ও বিপর্য্যস্ত হইবার আশঙ্কা কিয়ৎ পরিমাণে উপশমিত হইয়া থাকে। বস্তুর কেন্দ্রটী (centre) অবয়বকে ধারণ করিয়া থাকিলেও উহা অণুসমূহের সমজাতীয় নহে। উহা স্থূল—জড় নহে। পরন্তু শক্তিমাত্রা জাতীয় ও জড় ভাবের অতিগ কি এক প্রকারের। অথচ দেখ, ঐ শক্তিকেন্দ্রে অণুগুলির সমস্ত আকর্ষণ (attraction) ও বিশ্লেষণ repulsion) ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে। ঐ কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া জড়ের সমষ্টিভূত অণুগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে (inter space) বা আকাশে এমন ভাবে স্পন্দিত হইতেছে যে, সেই স্পন্দন সমূহ সমানুপাতী হইয়া কেন্দ্রে পঁহুছিবামাত্রই স্থির হইয়া যায় ; আর গতি বা স্পন্দন থাকে না। সেইজন্যই ঐ কেন্দ্রকে আমরা পুরি—শয় (পুরি—শেতে যঃ) 'পুরুষ' বলিতে পারি। আবার দেখ, ঐ কেন্দ্রের শক্তিবিলাস আছে বলিয়াই, বিশিষ্ট অণুসমূহের অসংশ্লিষ্ট স্পন্দনরাশি ঘন বা পরিপূর্ণ হইয়া বস্তুর একত্বে পর্য্যবসিত হইতেছে। জলের অণুসমূহের ক্ষেত্র (inter space) বরফরূপে প্রসারিত হইয়া গেলেও, উহার কেন্দ্র যেমন তেমনই রহিয়া গেল।

আমাদিগের বৃত্তি সমূহ দৃষ্টান্তের অণু-জাতীয়। উহাদের স্বকীয় ক্ষেত্রে 'অবকাশ' 'গুণ' প্রভৃতি আছে। বৃত্তিগুলির এই খেলাকে প্রাকৃতিক খেলা বলে। কাম-প্রবৃত্তির খেলা এক প্রকার, ক্রোধের অন্য প্রকার। দৃষ্টির একরূপ, শ্রুতির অন্যরূপ, মনের একরূপ, বুদ্ধির অন্যরূপ। ঐ বৃত্তি নিচয় ও তাহাদের প্রাকৃতিক বিলাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তবে কেন ভাই সংসারি! ধন, মান, পুত্রাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া 'আমিকে' খুঁজিতে যাইতেছ? তবে কেন ভাই 'থিয়সফিষ্ট'! দেহ, প্রাণ, মন প্রভৃতি প্রাকৃতিক তত্ত্বে, পিতৃ-দেবতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি খেলার বিশ্লেষণে সেই 'পর' অতিগ পুরুষকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছ? বৃত্তিসমূহের অভ্যন্তরে যে সমানুপাতী গতির সত্ত্বা বিরাজমান, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে আপাতঃ প্রতীয়মান ক্ষুদ্রতা, মোহ, অধর্ম্ম ও পক্ষান্তরে কর্ম্ম বিকাশ, জ্ঞান

প্রভৃতির ভিতর দিয়া কে এক মহান্ পুরুষ এই বৃত্তি সমূহকে আকর্ষণ করতঃ তাহাদের ক্রীড়া-ক্ষেত্রে স্বপ্রকাশিত হইতেছেন। সে যে 'অজাতি'—মাণ্ডুক্য-কারিকার অজাতি—তাঁহারই জন্য ঐ সমুদয় অণু সমূহের জাতি, কুল, মান, গতি উৎসর্গিত হইতেছে। অজ্ঞ লোকেরা যেমন জলের কেন্দ্রকে তারল্য-ধর্ম্ম বিশিষ্ট, ও বরফের কেন্দ্রকে নিশ্চয়ই স্থিতিশীল ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে, ঠিক সেই প্রকার মানব দেহের 'আমিটীকে' মানুষ, দেবদেহের 'আমি'টিকে দেবতা ও পশু দেহের 'আমিটি'কে পশু বলিয়া আমাদিগের ভ্রান্তি হয়। বস্তুর অন্তর্গত অনুসমুহের বিশিষ্ট গতি ও ধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে গুণ, স্বভাব, প্রকৃতি প্রভৃতি ভাবে যেমন করিয়াই যোগ কর না কেন, তাহাতে যেমন কেন্দ্রের কোন জ্ঞানই উপপন্ন হয় না, তদ্রূপ তত্ত্বগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এবং যে কোনও প্রাকৃতিক ভাবে উহাদের যোগ করিলে, পুরুষের সম্বন্ধেও জ্ঞান জন্মিবে না। কিন্তু যাই পরাভিসারিণী গতি (transendent trend) তোমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে, যাই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মোহ অতিক্রম করতঃ রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি ভাবের ধর্ম্ম-অর্জ্জন বা মোক্ষ-সাধন করিবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবে, অমনি সেই পুরুষের কাল-রূপের আভাস হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে। যখন বাহ্যবস্তু ও তত্ত্বের মধ্যে আর বিশিষ্ট গুণ, ধর্ম্ম প্রভৃতি দেখিতে রুচি থাকিবে না,—যখন পর পুরুষের বীর্য্য বা আভাস হৃদয়ে পতিত হইয়া তোমার বহিঃস্বত্ব ভাব ঘুচিয়া তোমাকে অন্তঃস্বত্ত্বা করিয়া বাহ্য-বিলাসে তোমার অরুচি জন্মিবে, যখন ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশিত আকর্ষণ অনুভব করতঃ, সেই আকর্ষণের জন্যই সাধের ব্যক্তিত্বের ব্যবহার করিতে পারিবে, তখনই ত' পুরুষের বংশীরব তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে।

দেখ ভাই, সকলেই 'আমির' প্রয়াসী ; সকলেই 'আমি' 'আমি' করিয়া কোথায় ছুটিতেছি। 'আমি রাম' বলিয়া, রাম এই সংজ্ঞার অন্তরালে অনন্ত ভাবরাশি, জন্ম কর্ম্ম প্রভৃতি অনন্ত বৃত্তি-সমূহকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। ধন চাই, মান চাই, পুত্র চাই, অপরদিকে ধর্ম্ম চাই, যোগও চাই ; অথচ এত বিরুদ্ধ ভাবগুলি রামে কি প্রকারে মিশিয়া যাইবে, তাহা জানো না। এই প্রকারে রাম বাহ্য ভাব-রাশিকে ধরিয়া রহিয়াছে ; সে ত' সেগুলিকে ঘন করিয়া মিশাইতে সমর্থ হইয়াছে না ; সেই সমুদয় সংগ্রহ করতঃ যক্ষের মত বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। রাম যদি উহাকে 'আমিতে' মিশাইতে পারিত, যদি সব আত্মসাৎ করিতে পারিত, যদি অবয়বীভূত বিভিন্ন অঙ্গের ঘন রস বা 'আঙ্গিরস'

তত্ত্বের বোধ হইত, তাহা হইলে কি সে সুখ দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের দোলারোহণ করতঃ এই মুহূর্ত্তে হৃষ্ট ও পুলকিত এবং পরক্ষণেই দ্বেষের কূপে নিপতিত হইয়া দারুণ মূহ্যমান হইত? 'তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যতঃ'। কাজেই দেখা যাইতেছে যে ব্যক্তিত্বের স্রোতে পতিত 'রাম' বাহ্য ভাবে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া জল ও বরফ-কেন্দ্রের পার্থক্যানুভব করিয়া সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণতত্ত্বের ভাষা বুঝিতে পারিতেছে না। সেই পরমাকর্ষক যে প্রেমভরে আকুল হইয়া প্রতি জীবহৃদয়ে 'রাধা' 'রাধা' ভাবে আপনার জগত-বিধ্বংসকারিণী আকুল পিয়াসার ভাষা জাগরিত করিতেছেন!! তাঁহার আকুল পিয়াসার বশে অনুপ্রাণিত হইয়াই ত' তাঁহাকে 'পরা' ভাবে দর্শনে অসমর্থ জীব বাহিরের 'সর্ব্ব' ভাবে সেই পিপাসা মিটাইতে চেষ্টিত ও ধাবিত হইতেছে। সত্য বটে ভাই, তোমার হৃদয়ে সুখের তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল, কিন্তু যে সুখে সেই তৃষ্ণার পরিতৃপ্ত হইবে, যে সুখে আর চাঞ্চল্য নাই, আর অস্থিরতা নাই; সেই সুখের টানটি যে দারা-পুত্রাদিতে শেষ বা পরিসমাপ্ত হইবে, তাহা কে বলিয়া দিল? কিন্তু যখন জীব রসিক হইয়া ঐ তৃষ্ণার গতি বুঝিতে পারে, তখন দেখিতে পায় যে ঐ তৃষ্ণা 'সর্ব্ব'ভাব হইতে (উৎ-স্থিত) উত্থিত হইতেছে বটে, কিন্তু 'সর্ব্ব' ভাবে মিশিতেছে না। তখন সে দেখিতে পায় যে উহা 'সর্ব্ব' ভাবে (প্রতিকূলে তিষ্ঠতি) প্রতিষ্ঠিত। এক নয়নে 'সর্ব্ব' ভাবের দিকে থাকিলেও উহা জগন্মাতা চৈতন্যময়ীর 'পর'-অধিষ্ঠান ও 'পরাগতি' প্রদর্শন করতঃ জীবকে তাঁহারই পাদপীঠ-সমীপে আনয়ন করিবার জন্য বিরাজমান রহিয়াছে। এইরূপে জীব যখন 'আমির খেলার' অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া বুঝিতে পারে যে,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিণু
নয়ন না তিরপিত ভেল;
ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে কে আর আমার আছে,
রাধা বলে আর জুড়াইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে।

তখন 'কর্ম্মচিত লোক' সুখ প্রভৃতি পরীক্ষা করতঃ—"বিবিচ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ পরীক্ষ্য"—আমির পরিসমাপ্তিরূপ 'পর' পুরুষের শরণ গ্রহণ করে। সকলেই যখন 'আমি' 'আমি' বলে, তখন নিশ্চয়ই এক নিষ্কাম 'আমি' আছে, যাঁহাতে এই সকলের পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা। স্রোতস্বিনীর গতি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তীরস্থ স্থান ও প্রতিষ্ঠানাদির যতটুকু আবশ্যকতা, পুরুষের পরিপূর্ণতা দেখাইবার জন্য আমাদিগের ব্যক্তিত্বেরও ততটুকু আবশ্যক। সেই

পুরুষের ভাষা একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, জলপ্লাবনে সর্ব্বদেশ প্লাবিত হইয়া গেলে বিশিষ্ট কূপ তড়াগাদির যতটুকু আবশ্যকতা, বেদাদি অনন্ত শাস্ত্রেরও ততটুকু আবশ্যকতা থাকে;—

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥"

কিন্তু যদি 'পর'-পুরুষাভিসারিণী বুদ্ধির আবির্ভাব না হয়, তবে—

শরীরং সুরূপং ততো বা কলত্রং,
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরু তুল্যং।
ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা;
সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু—
ততঃ তিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং॥

মোক্ষ]

উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য ভূমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এইবার বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। দেশ কালাদি জগৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত। কারণ শ্রুতি প্রথম বলিতেছেন যে আত্মা একই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলেন "বহুস্যাম; এই ইচ্ছা দ্বারা তিনি প্রপঞ্চাকারে বহু হইলেন। সে অবস্থায় তিনি যে একই আছেন, ইহাও উপনিষদ দেখাইতেছেন। আবার দেখাইতেছেন,—প্রপঞ্চতঃ আকার দেখিতে পাইলেও আত্মার কোনরূপ বিকৃতি ঘটে নাই। তাঁহার যেরূপ থাকা উচিত, সেইরূপ পূর্ব্বে ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও থাকিবেন। ইহা দ্বারা কি বুঝিবে? দর্পন-স্থানীয় মায়ায় আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িয়া এক আত্মাই বহু আকারে প্রতিভাসিত হইয়াছেন। বস্তুর প্রতিবিম্ব কিছুই নহে—মিথ্যা, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহা অন্য স্থানে সবিশেষ বর্ণিত হইবে। এইরূপে যে প্রপঞ্চের উপপত্তি করা যায়, তাহাকে 'বিবর্ত্তবাদ' কহে। যাহা যাহা নহে, তাহাকে যে তাহাই দেখা, সেই হইল বিবর্ত্ত। "অতত্ত্বতোঽন্যথা এবং বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ। যে যাহা সে তাহাই থাকিবে, অথচ তাহাকে অন্যরূপে যে দেখা, সেই অন্যথা প্রকাশকে বিবর্ত্ত বলে। একই আত্মার অজ্ঞান-দোষে বহুরূপে প্রকাশই বিবর্ত্ত, এটি কি করিয়া বুঝাইতে পারা যাইবে? না, যদি সৃষ্টিকে

মিথ্যা প্রমাণ করা যায়। সকলেই বলে এ জগত সত্য; শ্রুতি দেখাইতেছেন—এ জগৎ যাহা হইতে হয়, আবার তাহাতেই যাইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তবেই দেখ এ সৃষ্টি কিরূপ? আত্মা হইতে হয়, কিন্তু আত্মায় থাকে না; তবেই এ সৃষ্টি কিছুই নহে, মিথ্যা। দর্পণ-গৃহে শত সহস্র দর্পণ আছে, তুমি সে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যে দিকে দেখিবে, দেখিবে সেই দিকেই তুমি;—তুমি তখন শত সহস্র বিম্ব হইতে বিম্বরূপে প্রতিভাসিত। সেই শত সহস্রে তুমি,—স্বয়ং তুমিই কি? সেই শত সহস্রই তুমি; অথচ তুমি ব্যতীত ঐ শত সহস্র "তুমি" হইতে পার না। এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যাহা হইতে যাহা হয়, তাহাতে যদি তাহা না থাকে, তবে তাহা সত্য নহে। আত্মা হইতে জগৎ হইয়াছে, অথচ আত্মায় জগৎ স্বভবতঃ কখনই নাই; সুতরাং জগৎ সত্য নহে। সৃষ্টি বাক্যের এইটীই প্রয়োজন। "ওঁ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনং"; সুতরাং এই নিমিত্ত বিবর্ত্তবাদকেই দৃঢ় করা আবশ্যক।

শ্রুতি আরও কহিতেছেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না এবং মহাপ্রলয়ের পরেও জগৎ থাকিবে না; সুতরাং মধ্যে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা মিথ্যা। মাণ্ডুক্য যথা—"মায়ামযমিদং দ্বৈতং" "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা"। সুতরাং জগৎ মিথ্যা।

ঋগ্বেদ কহিতেছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে "অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়হমগ্রে"; তৎপরে কহিতেছেন "তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ" অর্থ অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। সুতরাং যে তম হইতে জগতের উৎপত্তি, তাহা যখন নিজেই তুচ্ছ, তখন জগৎ যে তুচ্ছ হইবে তদ্বিষয়ে বক্তব্য কি আছে? ঋগ্বেদ আরও কহিতেছেন যে, কেই বা জানে, কেই বা বর্ণন করিবে—কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল 'নানা' সৃষ্টি হইল?

"কো অদ্ধা বেদ কঃ ইহ প্ররোচৎ, কুত অজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।"

"চকিত অভিধত্তে শ্রুতিরপি"।

ঋগ্বেদ পুনঃ কহিতেছেন,—"কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভু-স্বরূপ পরমাকাশে আছেন; তিনি না জানিলে কে জানিবে?

"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব, যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ত্সো অঙ্গ বেদঃ যদি বা ন বেদঃ।"

শ্রুতিতে প্রথমে জগতের অধ্যারোপ করিয়া, তৎপরে 'নেতি নেতি' ইত্যাদি দ্বারা দৃশ্য-প্রপঞ্চের বাদ করিয়া অপবাদ করাতে জগতের মিথ্যাত্বই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

"অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চতে"।

"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং" "এবং তত্ত্বমসি" প্রভৃতি চারি বেদের চারি মহাবাক্য স্পষ্টাক্ষরে জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রমাণ করাতে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য। ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "না সতো বিদ্যতে ভাবঃ, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইত্যাদি বহু স্থলে অর্জ্জুনকে জগতের মিথ্যাত্বই উপদেশ দিয়াছেন। তাহা উত্তম অধিকারীর অনুভব-সিদ্ধ।

পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য দেবীসুক্তের ব্যাখ্যাতে লিখিয়াছেন,—"ময়ি হি সর্ব্বং জগৎ, শুক্তৌ রজতমিবাধ্যস্তং সৎ দৃশ্যতে, মায়া চ জগদাকাররূপেণ বিবর্ত্ততে। তাদৃশ্যা মায়য়া আধারত্বেঽহমেমসঙ্গস্যাপি ব্রহ্মণ উক্তস্য সর্ব্বস্যোৎপত্তিঃ"। সুতরাং জগৎ বিদ্যা মায়ার বা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত এবং অবিদ্যা মায়ার পরিণাম। মায়া মিথ্যা সুতরাং জগৎ মিথ্যা।

চণ্ডীতেও ঐরূপ কথিত হইয়াছে "আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি। অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায়তে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে।" ইহা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে জগৎ অপের বা কারণ-বারির বিবর্ত্ত এবং মায়ার পরিণাম।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য যতিপঞ্চকে লিখিয়াছেন,—"যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভবতি মনোবিলাসং"। সচ্চিৎ সুখৈকং জগদাত্মরূপং, সা কাশীকাহং নিজ বোধরূপং॥' ইহা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে জগৎ সর্ব্বাত্মক মনের পরিণাম মাত্র; এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত; সুতরাং সম্পূর্ণ মিথ্যা। অনুভব দ্বারা প্রতীয়মান হয়, জগৎ অপ্‌ তেজ অন্নের পরিণাম এবং সচ্চিদানন্দের বিবর্ত্ত। চণ্ডীর অন্য স্থানে লিখিত হইয়াছে "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা, পশ্যৈতা দুষ্টময্যেব বিশন্ত্যো মাত্মভূতয়ঃ॥" ইহা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মায়া ছিলেন, পরেও সেই মায়া থাকিবেন। মধ্যে এই সমস্ত প্রকাশ; সুতরাং মিথ্যা।

সমগ্র যোগবাশিষ্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, 'জগৎ কোনকালে হয় নাই, এখনও নাই এবং পরে কোন কালে হইবেও না। ইহা বেদমূলক, সুতরাং নিঃসংশয়িত ভাবে প্রামাণ্য।"

দেবীসূক্তে "অহমেববাত ইব প্রবাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা। পরোদিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সম্বভূব॥" জগৎ মায়ামূলক। সম্বিত্তো সম্বেদনকে পৃথক্‌রূপে সৃষ্টি করাতে জগতের কল্পিত সত্যত্ব। এ সমস্ত প্রমাণ এবং আরও অনেক শ্রুতিস্মৃতি সম্মত প্রমাণ সত্ত্বেও যে সকল বিদ্যাভিমানী শ্রুতি অভিজ্ঞ পণ্ডিত বেদ প্রতিপাদ্য বিবর্ত্তবাদ বুদ্ধিতে না আনিয়া বৃথা কুতর্ক করেন, তাঁহাদের নিতান্ত দুর্ম্মতি এবং তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ অত্যন্ত অনুগ্রহের বিষয়; কারণ তাঁহাদের উপর ভগবানের একান্ত নিগ্রহ জানিবে।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে যাওয়া যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দিক, কাল, দেশ, চিত্ত, অহং, অনুভব, চেতন, স্পন্দন প্রভৃতি 'সর্ব্ব' স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত বা অধ্যস্ত! ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রসম্মত যে, কল্পিত বস্তু অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে। যেরূপ কল্পিত সর্প রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে। এই কারণে সেই ভূমাই সর্ব্ব জগৎরূপ। এইরূপে হে নারদ, এই সর্ব্ব জগতের অধিষ্ঠানরূপে তুমি সেই ভূমাকে প্রথমে আপনার বুদ্ধিতে আরূঢ় কর। তদনন্তর সেই ভূমার তটস্থ রূপতা নিবৃত্তি করিবার জন্য, সেই সর্ব্বত্র ব্যাপক ভূমাকে অহং অস্মি এই প্রকারে আপনার আত্মারূপে জ্ঞান।

হে ভগবন্! পরিচ্ছিন্ন অহঙ্কার বিশিষ্টের বাচক যে অহং শব্দ, সেই অহং শব্দকে ব্যাপক ভূমা বিষয়ে প্রয়োগ করা অত্যন্ত অসঙ্গত; সুতরাং সম্ভব নহে। হে নারদ! যদ্যপি অহং এই শব্দ দ্বারা অহঙ্কার প্রতীতি হয়, তথাপি সেই অহঙ্কারের সেই ভূমা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়া সেই অহং শব্দ গৌণী লক্ষণা দ্বারা সেই ভূমারই ইঙ্গিত করে। এক্ষণে সেই অহঙ্কার এবং ভূমা আত্মার সাদৃশ্য নিরূপণ করা যাইতেছে। পূর্ব্বাদি দশ দিক বিষয়ে এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালে স্থিত যত প্রকার দেহধারী জীব আছে, সেই সমস্ত জীব প্রথমে অহং এই প্রকার অনুভব করিতে থাকিয়া পশ্চাৎ বচন উচ্চারণাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই অহং অনুভব বিনা কোন ব্যবহার সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং এই জানা যাইতেছে যে, এই অহঙ্কারই জীবের সর্ব্ব ব্যবহারের কারণ। এরূপ সর্ব্ব ব্যবহারের মূল কারণভূত অহঙ্কার যেরূপ সর্ব্ব দিককে এবং সর্ব্বভূত প্রাণীকে ব্যাপিয়া স্থিত হইয়া আছে, সেইরূপ এই অহঙ্কারের আশ্রয়রূপ এই জীবাত্মাও সেই সর্ব্ব দিককে এবং সর্ব্বভূত

প্রাণীকে ব্যাপিয়া স্থিত হইয়া আছে। এই প্রকার অহঙ্কারের এবং ভূমা আত্মার সর্ব্বত্র ব্যাপকতা রূপ সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্য অঙ্গীকার করিয়া সেই অহং শব্দ লক্ষণাবৃত্তি রূপে সর্ব্ব উপাধি রহিত কূটস্থ আত্মাকেই বোধন করে। সেই কূটস্থ আত্মার তৎপদার্থ রূপ ভূমার সহিত অভেদ তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য প্রতিপাদন করিতেছে। এক্ষণে সেই অভেদ জ্ঞানের জীবন্মুক্তি রূপ ফল নিরূপণ করা যাইতেছে। হে নারদ, ইহলোকে অজ্ঞানী পুরুষ নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং মন দ্বারা সর্ব্ব ব্যবহার করিয়াও আপনার মনুষ্যভাব বিস্মৃত হয় না; কিন্তু আপনার মনুষ্যভাবকে সংশয়-বিপর্য্যয় রহিত হইয়া সর্ব্বদা অনুভব করে। সেইরূপ যে পুরুষ গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে সেই অহঙ্কারাদি উপাধি বিস্মরণ করিয়া 'আমি' আত্মা ভূমারূপ এই প্রকার সংশয়-বিপর্য্যয় রহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, সেই বিদ্বান্ পুরুষ বেদান্ত শাস্ত্রের চিন্তন কালে আনন্দ স্বরূপ আত্মাতেই ক্রীড়া করতঃ স্থিত হইয়া থাকেন। যেরূপ বালক, বালক সমুদায়ের মধ্যে ক্রীড়া করতঃ স্থিত হয়। সেই বিদ্বান্ পুরুষ স্নান ভোজনাদি কালেও সেই আনন্দ স্বরূপ আত্মাতেই চিত্তের শক্তিরূপ রতি ধারণ করতঃ স্থিত হন; যেরূপ কামী পুরুষ বিদেশে অবস্থিত করিয়াও চিত্তের শক্তিরূপ রতি সর্ব্বদা আপন স্ত্রীর উপর রাখেন। ইহা দ্বারা এই অর্থ প্রকাশিত হইল যে, জীবন্মুক্ত পুরুষের দুই প্রকার দশা থাকে। এক সমাধি দশা এবং দ্বিতীয় সমাধি হইতে উত্থান দশা। তন্মধ্যে সমাধি হইতে উত্থান দশাও আবার দুই প্রকার হইয়া থাকে; এক বেদান্ত শাস্ত্রের চিন্তনরূপ উত্থান দশা, দ্বিতীয় স্নান ভোজনাদি ব্যবহার রূপ উত্থান দশা। তন্মধ্যে প্রথম উত্থান দশাতে বিদ্বান্ পুরুষ যে আত্মার চিন্তন করে, তাহাকে শ্রুতি ক্রীড়া শব্দে বর্ণন করিয়াছেন; আর দ্বিতীয় উত্থান দশাতে বিদ্বান্ পুরুষ যে আত্ম চিন্তন করে, তাহাকে শ্রুতি রতি শব্দে কথন করিয়াছেন। আর যেরূপ সেই ব্যুত্থান দশা দুই প্রকার, সেইরূপ সেই সমাধি দশাও দুই প্রকার হইয়া থাকে। এক সবিকল্প সমাধি, দ্বিতীয় নির্ব্বিকল্প সমাধি। তন্মধ্যে সবিকল্প সমাধিতে এই বিদ্বান্ যে আত্মার চিন্তন করে, সেই আত্ম-চিন্তনকে শ্রুতি 'মিথুন' শব্দে কথন করিয়াছেন। আর নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সেই বিদ্বান্ পুরুষ যে আত্ম-ভাবে সমাপ্ত হ'ন, সেই আত্ম-ভাবকে আনন্দ শব্দে কথন করিয়াছেন ক্রীড়া ও রতি এই দুই শব্দের অর্থ নিরূপিত হইল। এক্ষণে মিথুন ও আনন্দ এই দুই শব্দের অর্থ নিরূপণ করা যাইতেছে।

হে নারদ, যেরূপ ইহলোকে গৃহের সর্ব্ব ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া একান্ত দেশস্থিত স্ত্রী-পুরুষের উভয়ের যে পরস্পর মিথুনী ভাব, সেই মিথুনী ভাবই উভয়ের বিষয়ানন্দের হেতু। সেইরূপ এই বিদ্বান্ পুরুষের ধ্যাতা ধ্যেয় ভাবে যে আত্ম বিষয়ে মিথুনী ভাব, সেই মিথুনী ভাবই এই বিদ্বান পুরুষের সবিকল্প সমাধিকালে আনন্দের হেতু হইয়া থাকে। আর হে নারদ, যেরূপ ইহলোকে গন্ধর্ব্বাদি বিষয় প্রাপ্তির পর পরীক্ষক পুরুষের তদ্বিষয়ে যে আনন্দরূপ ফল অনুভূত হয়, সেই আনন্দানুভব নির্ব্বিকল্পই হয়। সেইরূপ এই বিদ্বান পুরুষের নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে যে নিরতিশয় আনন্দানুভব হয়, সেই আনন্দের অনুভবই ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় ইত্যাদি ত্রিপুটীরূপ বিকল্প রহিত হইয়া থাকে। হে নারদ, সেই বিদ্বান্ পুরুষের যে আত্ম বিষয়েই আনন্দ হয়, তাহার এই কারণ। অদ্বিতীয় আত্মাকে সাক্ষাৎ অনুভব করিতে করিতে এই বিদ্বান্ পুরুষ জন্মমরণাদি সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি বিষয়ে অন্যের অপেক্ষা করেন না। এই কারণে সেই বিদ্বান পুরুষ বিরাট্ ভগবানের ন্যায় স্বরাট্ এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হ'ন। আর তিনি ব্রহ্মরূপ হওয়াতে সর্ব্ব জীবের আত্মারূপ হ'ন। এই কারণে সেই বিদ্বান্ পুরুষ সমস্ত শ্রেষ্ঠ লোকে কামাচার হ'ন। এখানে প্রতিবন্ধ রহিত সেই সর্ব্বলোক প্রাপ্তির নাম কামাচার। যে পুরুষের সেই ভূমা আত্মার সাক্ষাৎকার হইয়াছে, সেই পুরুষের এই সমস্ত জন্মমরণাদি দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। এই যে আমি তোমাকে আত্ম জ্ঞানের ফল কথন করিলাম, তদ্বিষয়ে বেদবেত্তা পুরুষ এই প্রকার শ্লোক কথন করিয়াছেন। "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোতদুঃখতাং। সর্ব্বং পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ।"

এক্ষণে সেই আত্মজ্ঞানীর আহার, শুদ্ধি আদি সাধন সংক্ষেপে নিরূপণ করা যাইতেছে। যে পুরুষ বাহ্যতঃ সর্ব্বদা পুণ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, পরন্তু যাঁহার মনে সর্ব্বদা পাপ বাসনা থাকে; এরূপ পুরুষের শত কোটী জন্মেও এই সর্ব্বাত্মজ্ঞান অত্যন্ত দুর্লভ। যখন অন্তরে পাপ বাসনাযুক্ত পুণ্যবান পুরুষেরও এই আত্মজ্ঞান দুর্লভ হইল; তখন যে পুরুষের বাহ্য অন্তর সর্ব্বদা পাপ কর্ম্ম আচরণ করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহার আত্মজ্ঞান দুর্লভ হইবে এ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে! সুতরাং যে অধিকারী পুরুষের এই আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা হইবে, সেই অধিকারী পুরুষ প্রথমে আপনার চিত্ত শুদ্ধ করিবেন।

হে ভগবন্, চিত্তশুদ্ধি কি প্রকারে হইবে? হে নারদ, আপন আপন বর্ণাশ্রম অনুসারে যে অন্নপানাদি বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বিষয় গ্রহণের নাম আহার। সেই আহার যে পুরুষের রাগ দ্বেষ রহিত বুদ্ধি দ্বারা পাপ রহিত ও শুদ্ধ হইয়াছে, সেই পুরুষের চিত্তশুদ্ধি হয়। এই আহার শুদ্ধি বিনা চিত্তশুদ্ধি কদাচ হইবে না। হে নারদ, যেরূপ আহার শুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষের পাপ কর্ম্মে প্রীতি হয় না, সেইরূপ যে পুরুষ বীজ, যোনি, ব্যবহার এই তিন শুদ্ধি সম্পন্ন হইবেন, সেই পুরুষের বিপদ কালেও পাপ কর্ম্মে প্রীতি হইবে না। পিতৃকুলের নাম বীজ; মাতৃকুলের নাম যোনি; আর পদার্থ গ্রহণ ও ত্যাগের নাম ব্যবহার। হে নারদ, এই প্রকার আহার, ব্যবহার, বীজ, যোনি এই চারি শুদ্ধি দ্বারা যে পুরুষের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, সেই পুরুষের কখনও পাপ কর্ম্মে প্রীতি হইবেনা। পরন্তু পাপ কর্ম্মই চিত্তের একাগ্রতার প্রতিবন্ধক হয়। যখন আহারাদি শুদ্ধি দ্বারা এই পুরুষ পাপ কর্ম্ম হইতে রহিত হইবেন, তখন এই অধিকারী পুরুষ চিত্তের একাগ্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এরূপ শুদ্ধ-চিত্ত সম্পন্ন পুরুষ ব্রহ্মবেত্তা গুরুর উপদেশ হইতে শীঘ্রই আপনার ভূমা স্বরূপ 'আত্মাকে' সাক্ষাৎ লাভ করিবেন। যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ দ্বারা প্রতিপালিত কোন ক্ষত্রিয় রাজার পুত্র কোন মহাত্মা পুরুষের মুখ হইতে "তুমি ক্ষত্রিয় রাজার পুত্র" এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া শীঘ্রই আপনার ক্ষত্রিয় স্বরূপ স্মরণ করেন; সেইরূপ "তুমি ব্রহ্মরূপ" এই প্রকার ব্রহ্মবেত্তা গুরুর বচন শ্রবণ করিয়া শুদ্ধ-চিত্ত সম্পন্ন পুরুষ শীঘ্রই আপনার ব্রহ্মস্বরূপ স্মরণ করেন। হে নারদ, যে কোন পুরুষ পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য কর্ম্মের প্রভাবে ব্রহ্মবেত্তা গুরুর উপদেশ দ্বারা সেই ভূমা আত্মার স্মৃতিলাভ করেন, সেই পুরুষ সেই আত্মজ্ঞান রূপ খড়্গ দ্বারা কাম ক্রোধাদি গ্রন্থি শীঘ্রই ছেদন করেন। আত্মজ্ঞান বিনা কাম ক্রোধাদি গ্রন্থি সমূলে নিবৃত্ত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং এই অধিকারী পুরুষ সেই কাম ক্রোধাদি বন্ধ নিবৃত্তির জন্য সেই ভূমা 'আত্মার' জ্ঞান অবশ্য সম্পাদন করিবেন। যদিও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধান দ্বারা ও কাম ক্রোধাদি কায়া নিবৃত্ত হইয়া যায় বটে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বিনা উহা সমূলে উৎপাটিত হয় না। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

হে শিষ্য, যে সনৎকুমার ভগবান্ নারদ মুনিকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া

জন্ম মরণ দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সনৎকুমার ভগবান্ অন্য জ
কার্ত্তিকের অবতার ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র, (৺কাশীধাম।)

ধর্ম্ম]

কঃ পন্থা।

(গতবৎসর চৈত্র সংখ্যার পর।)

কাত্যায়ন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী কর্ত্তব্য প্রাতঃসন্ধ্যাদি য বিহিত সমাপন করিয়া গুরুদেব ভরদ্বাজের শ্রীচরণ বন্দনা করিল তা পর ধীরে ধীরে নিবেদন জানাইল, "গুরুদেব, অগ্নিকার্য্য, হোম সম্বন্ধে উপদে দিবেন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, অদ্য তাহাই হউক।

ভর। বৎস কাত্যায়ন, নিত্য ও নৈমিত্তিক হোম ব্রাহ্মণের অব কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

"নাজপ্তঃ সিদ্ধ্যতি মন্ত্র আহুতশ্চ ফলপ্রদঃ।
নানিষ্টো যচ্ছতে কামান্ তস্মাৎ ত্রিতয়মর্চ্চয়েৎ॥"

মন্ত্রের সার্থকতা আহুতি দ্বারাই ঘটে; সিদ্ধি জপের দ্বারাই লাভ হ হোম দৈব-যজ্ঞ। হোম দ্বারা যে পারত্রিক উন্নতি লাভ করা যায়, তা কেবল কথা দ্বারা বুঝান যায় না। মন্ত্রের মাহাত্ম্য সাধকই জানেন, হোমে ফল হোম কর্ত্তাই প্রাপ্ত হন। হোমের রশ্মি আকাশ মার্গে যাইয়া স্বর্গ সোপান প্রস্তুত করে, কারণ-শরীরী জীব সেই রশ্মি সোপান সাহা অনায়াসে স্বর্গ গমনে অধিকারী হ'ন। কথাটি অলঙ্কারের মত।—স্তুতির ম শুনাইল। বৎস, শ্রদ্ধা কর, বিশ্বাস কর, ফল শ্রীভগবৎ প্রসাদে হইবেই।

পূর্ব্বে যাগ যজ্ঞাদিতে অসংখ্য হোম করা হইত, হোমের গন্ধে সারা দে সুরভি ও পবিত্র হইয়া উঠিত। এক্ষণে দীক্ষা শ্রাদ্ধ পূজাদি কার্য্যে সামান্য হোম করা হয়। সামান্যেরও ফল অসীম। দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নি সমন্ত্রক ঘৃত আহুতি, আর সঘৃত বিল্বদল, সমিধ প্রভৃতি অর্পণ করার না হোম। অগ্নি মুখে যথাশাস্ত্র আহুতিই হোম।

কাত্যা। হোমের ঐহিক ফল কি? আর তাহা অগ্নিমুখেই করিতে হয় কে

ভর। অগ্নিই দেবতার মুখ। অগ্নিমুখ ভিন্ন দেবতারা আহুতি গ্র করেন না। যজ্ঞীয়াগ্নিতে মন্ত্রাহুত হবিই দেবতাদের অমৃত। আর এ অমৃত পানেই দেবগণের পুষ্টি। অগ্নি, বায়ু, জল ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার পুষ্টি

জগতের পুষ্টি, ইহাদের শুদ্ধিতে জগতের শুদ্ধি, ইহাদের দৌর্ব্বল্যে জগতের অনিষ্ট। জগতের রক্ষার জন্য, শান্তি স্থাপনার জন্য, দেবগণ অসুর ধ্বংস-কার্য্যে ব্রতী। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্পাদি আসুরিক উপদ্রব নিবারণ করিতে হইলে, অগ্নি বায়ু প্রভৃতির বিশুদ্ধ ও পুষ্টি কর্ত্তব্য, নচেৎ অসুরগণ মাথা চাড়া দিবে, সারা পৃথিবী অশান্তির দাহে দগ্ধ হইবে! এই বিশুদ্ধি, এই পুষ্টি, হোম দ্বারাই সাধ্য। অগ্নিমুখে হুত দ্রব্য যত সহজে অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি দেবতারা গ্রহণ করিতে পারেন, অন্য কোনরূপে তত সহজে পারেন না। অগ্নিমুখে আহুতি ধূমাকারে অতিদ্রুত প্রকৃতির সর্ব্বত্রই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ধূপগন্ধি, হবিঃকণাময় হোমের পবিত্র বায়ু সমস্ত দেশ হইতে রোগের বীজ, পাপের অঙ্কুর সমূলে উৎপাটিত করে। এই বাতাসের স্পর্শে রবিকরোদয়ে কুয়াসার মত পাপরাশি উড়িয়া যায়, এই বাতাসের গন্ধে মালিন্য নষ্ট হয়। হোম্য অনলশিখা যে গৃহে প্রজ্জলিত হয়, সে গৃহ সত্ত্বময়, রোগশূন্য, পুণ্যস্নিগ্ধ ও আনন্দদীপ্ত হইয়া থাকে। দূষিত বাষ্প ও কলুষিত বাতাস নষ্ট করিতে এমন মহৌষধ আর নাই। হোম্য হবির্গন্ধে ক্ষুধার বৃদ্ধি, সত্ত্বগুণ উপচিত, শরীর ধাতুর সমীকরণ আর রসের সমন্বয় ঘটে! হোমের ভস্ম চক্ষুতে দিলে চক্ষুরোগ জন্মে না, ললাটে দিলে ললাট স্নিগ্ধ থাকে, সন্ধিস্থলে দিলে বাতাদি আক্রমণের সম্ভবনা থাকে না। প্রাত্যহিক হোম গৃহস্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারীর অবশ্য করণীয় কার্য্য। হোমের অগ্নি যে স্থানে রক্ষা করা হয়, তাহার নাম অগ্নিগৃহ। অগ্নি গৃহ, উপনয়ন হইতে অগ্নির রক্ষা এক্ষণে শাস্ত্রের সীমানা মধ্যেই অবস্থিত। তবে একেবারে উঠিয়া যায় নাই, ইহাই মঙ্গল। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আর ত' দৃষ্টই হয় না। ইহাই ক্ষুদ্র যজ্ঞ।

কাত্যা। নিত্য হোম ক্ষুদ্র যজ্ঞ। নৈমিত্তিক হোম কি?

নিত্য হোম ত' শুনিলে! নৈমিত্তিক হোম যাগ-যজ্ঞেই বিহিত। শ্রাদ্ধ, দীক্ষা, পূজাদি কার্য্যে সামান্যরূপ হোম বিহিত; এ কারণে উহা ক্ষুদ্র যজ্ঞ বিশেষ। অসংখ্য হোমের ফলও তদ্রূপ। হোম দ্বারা যে বাষ্প জন্মে, সে বাষ্প বিশুদ্ধ, পবিত্র, নির্দ্দোষ ও শক্তিময়। এই যজ্ঞীয় তপ্ত হোমশিখা উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধ-তম প্রদেশে উত্থিত হইয়া মেঘগুলিকে উত্তপ্ত করে ও বিশৃঙ্খল মেঘগুলিকে জমাট বাধাইয়া দেয়, এবং মেঘগুলির নিম্নে মৃদু মৃদু আঘাত দেয়, ফলে পরিমিত বৃষ্টিপাত ঘটে। আর এই হোমোত্থিত বাষ্পরাশিকে মেঘরূপে পরিণত করান্ যায় বলিয়া অতি বৃষ্টি বা অল্প বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না। কেবলই যে মেঘরূপে পরিণত হয়,

তাহা নহে, উপরোক্ত ত্রিবিধ উপকার সাধন করে।

বৎস কাত্যায়ন, তপোবনের তরুগণ যে অপর্য্যাপ্ত ফলভারে নম্র হয়, পুষ্পরাশি যে থরে থরে ফুটিয়া উঠে, ক্ষেত্রে যে অজস্র নীবার শস্য প্রদান করে,—তাহার কারণ ঐ হোম। যজ্ঞীয় অগ্নি শিখা তরুগুলিকে সতেজ রাখে, পত্রাবলীকে শ্যামল ও চিক্কণ করে এবং উৎপাদিকাশক্তি সত্বরই জন্মাইয়া দেয়।

"অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ শশ্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ"॥

অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যে উপস্থাপিত হয়, আদিত্য আবার ঐ গৃহীত আহুতি বৃষ্টিরূপে প্রদান করেন; বৃষ্টি হইতে শস্যাদি দ্বারাই জীব রক্ষা। হোমের ফল শুনিলে ত'?

কাত্যা। তাহা হইলে আমি কোন্ পথ আমার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট বুঝিব?

ভর। বৎস, তুমি এক্ষণে শিক্ষার্থী! কঠোর সন্ন্যাসমার্গ ও গভীর আত্মতত্ত্ব উপদেশের পাত্র তুমি এখন নহ। বর্ত্তমানে তোমার মুখ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন প্রথম কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য ব্রহ্মচারীর নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মগুলি পালন;—যথা ভিক্ষাচর্য্যা, বেদাধ্যয়ন, গুরুসেবা প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রদ্ধাসহ জপ তপাদি কর্ম্মকরণ। চতুর্থ শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ পালন। পঞ্চম নিত্য সন্ধ্যা, পূজাদি হোম কার্য্য যথাযথ সম্পাদন। এই সকলগুলি এক্ষণে তোমার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট পথ।

কাত্যা। একটি পথ ত' হইল না? এই অনেকগুলি পথই কি অবলম্বন করিতে হইবে?

ভরদ্বা। এই অনেকগুলি পদ্ধতি ধরিতে গেলে একই পথ। ভেদ অবান্তর,—মুলতঃ এক। ঈশ্বরে বিশ্বাস, সর্ব্বজীবে করুণা, দীন দরিদ্রের উপকার, গুরুসেবা, গো-শুশ্রূষা, বেদাধ্যয়ন, সন্ধ্যাহ্নিকাদি নিত্যকর্ম্ম—সমস্তই যথাসাধ্য অবহিতমনা হইয়া পালন করিয়া যাইতে হইবে। বিলাস, আলস্য, জড়তা, ক্রোধ, রাগ, কাম, মোহ, হিংসা যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে। মন থাকিলে,—শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, থাকিলে,—ঐকান্তিক যত্ন থাকিলে, সাধনা কখনই বিফল হইবে না! আশ্বস্ত হও বৎস, এক্ষণে ইহাই তোমার নির্দ্দিষ্ট পথ। পরে চিত্ত-শুদ্ধির সহিত,—আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত—যখন নিত্যদৃষ্টি তোমার দুর প্রসারিণী হইবে, তখন দেখিতে পাইবে—সরল, দীর্ঘ, প্রশস্ত একই পথ অনন্তাভিমুখে ছুটিয়াছে। তখন আর অবান্তর ভেদ নাই, "একমেবাদ্বিতীয়ং।"

কাত্যা। গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য। বীজ ত' পুঁতিলাম! প্রাণপণে জল

সেচন করিব—দেখি বৃক্ষ হয় কিনা? দেখি ফল হয় কিনা আর আপনার আনুকূল্য, কৃপা ও আশীর্ব্বাদের জল বাতাস পাইলে, এ বীজ ব্যর্থ হইবে না—ইহা আমার আশা, ভরসা ও বিশ্বাস!

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

[মোক্ষ।

পন্থা।

সমাগত সন্ধ্যা বেলা,
সাঙ্গ করি ভবের লেখা,—
কালের কোলে সকল ফেলে,—
লুকায় ভানু চরমে।
সুখের আশা, বাঞ্ছা কত,
কতই ছবি মনের মত;
মনের মাঝে উদয় হ'য়ে,—
মনেই মরে মরমে॥
(কতই খেলা উষার সনে,
কতই খেলা কমল-বনে;
কতই আশা রাজ্য-শাসা,—
কতই প্রতাপ ভুবনে!!)
এখন হের, প্রবীন রবি,
আঁকিয়া সুদূর অতীত ছবি,
দেখায় জীবে—চিত্রপটে,—
শৈশবেই সুখ জীবনে।
গেছে যা, তা' আর কি ফিরে?
নিরাশ-আঁধার আসে ধীরে;
মনের দুঃখে আপন বিলয়,
কালের গভীর কোলে রে?
একই পথে চল্‌ছি মোরা,
বিষয়-ভাবে মত্ত-ভোরা;
চাইনা ফিরে পিছন পানে,—

শিশু ছিনু, যুবক এবে,
অন্ধ, বিষয়-ভ্রান্তি সেবে;
শেষের বেলা কর্‌তে খেলা,
ইচ্ছা আবার হবে কি?
আবার কি সেই রবির মত,
শিশুর ছবি আঁকৃতে রত;
রইব' তখন সন্ধ্যা-আগে—
বাঞ্ছা তখন রবে কি?,
কি-ই বা জানি—কেমন ধারা
আস্‌বে নিশা অন্ধকারা;
কিম্বা সাধের জ্যোতির্ম্ময়ী,—
ইন্দু-কিরণ পরশে?
পথের সীমা—আকাশ কোলে,
তার পরে কি, দেখ্‌তে হ'লে;
কেমন ক'রে দেখ্‌বে জীবে?
নাইক' নগ বরষে।
থাকৃতো যদি, উঠ্‌তো কিরে,
অভ্রভেদী ভূধর শিরে;
দেখ্‌তো বুঝি নাইক' সীমা,—
গগন সীমা করেছে?
'পন্থা' অশেষ,—পান্থ মোরা,
চল্‌ছি এমন আগাগোড়া;
নাইক' বিরাম, নাইক' থিতি,—

কি ভাব হবে ম'লে রে ?
নয়ক' মরণ,—বিরাম বুঝি ?
তাই কি ক্ষণেক আঁখি মুদি ;
নূতন তেজে—নবীন সেজে,—
আবার ছুটে প্রাণী রে ?
নূতন যখন, নবীন সবি,
ভ্রান্ত শিশু মধুর ছবি,
মত্ত হেরে ;—শ্রবণ করে,
মায়ার আশার বাণী রে !
সকাল বেলা হৃদয়-মাঝে,
আশার বাণী মধুর বাজে ;
"আবার চল !—আবার চল
দেখ্‌বে কত নয়নে !"
চলবে কত ? নাইক' সীমা,
শ্রান্তি নাশে মধুরীমা ;
শ্রান্ত রত, ক্লান্ত দেহে,—
আবার পড়ে শয়নে।
চল্‌তে কত মরেছে।
'পন্থা' অশেষ,—পান্থ মোরা,
চল্‌তে হবে আগাগোড়া :
শ্রান্ত বড়, তিক্ত লাগে,—
তা'ই দেছ কি সাথি[illegible] ?
জীবন-সাথী পত্নী মম,
শান্তিদায়ী সুধার সম ;
কিন্তু কেন ক্ষণিক তাহা,—
তারো বিরাম-রাত্রিটী ?
আস্‌বে যবে শান্তমতি,
তখন হবে কি মোর গতি ?
চাইনা সখা, বন্ধু কোনও !
দাও গো প্রভু কহি[illegible] !
বিরাগ বড়, চল্‌তে নারি,
দাও গো বলে ত্রিতাপহারি !
কে-ই বা আমি, যাই বা কোথা ?
সময় যে যায় ব[illegible] !

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কাম]

অরুচি।

রোগ হলে কারো কারো বড় অরুচি হয় ; দুনিয়ার কোন জিনিষ তার মুখে ভাল লাগে না। সুস্থাবস্থায় মিষ্ট দ্রব্যের প্রতি রসনার কখনো কখনো অন্যায় পক্ষপাতও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু ব্যাধিগ্রস্তের নিকট উহা আদৌ উপাদেয় বলিয়াই মনে হয় না। শুধু ইন্দ্রিয়গুলি কেন, ইন্দ্রিয়দের রাজা মনও দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিলে কেমন খিট্‌খিটে হয়ে যায় ! রোগ হলে খাওয়া, পরা, আমোদ, আহ্লাদ সবই মাথায় উঠে ; পুত্র, পরিজন, ধন, ঐশ্বর্য্য এ সমস্তই যেন বিরস ঠ্যাকে। আবার এই রোগীই যখন সার্‌তে আরম্ভ করে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ দেখা দেয় ; হৃদয়ের সরস ভাবগুলি যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। তখনি বোঝা যায় সে সেরে উঠ্‌চে। পরিজনের

অক্লান্ত শুশ্রূষায়, চিকিৎসকের গভীর নিপুণতায় এবং ভেষজের গুণে রোগী রোগমুক্ত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির অভাব ঘটিলে, রোগীর রক্ষা পাওয়া প্রায়ই অসম্ভব। কিন্তু আমাদের যে দুঃসাধ্য ভবব্যাধি আক্রমণ করেছে, যার প্রভাবে আমাদের মন দুর্ব্বল হয়ে যাচ্চে—বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়্‌চে,—সুমিষ্ট সদ্ভাবরাশিতে ক্রমশঃই অরুচি বেড়ে উঠ্‌চে—তার উপায় কি ? ইহার ভেষজ, কি ইহার চিকিৎসক কে ? এ দীনহীন রোগাতুরদের শুশ্রূষাকারীই বা কাহারা ? শুনি বটে, এ ভবরোগের একমাত্র ঔষধ ভগবত নামকীর্ত্তন ; কিন্তু তাহাতে রুচি নাই যে ! দীর্ঘকাল ধরিয়া ভবব্যাধিতে পীড়িত, অবসাদগ্রস্থ ; উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই, কোন জিনিষেই রুচি নাই—শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই—নামে রতি নাই ; আমার গতি কি হইবে ? কোথায় তুমি ওগো ভবরোগের চিকিৎসক, দীনহীন কাঙ্গালের বন্ধু, অশরণ জনের আশ্রয় স্থল ! কোথা তুমি ভবপারের কাণ্ডারী, আমার সদ্‌গুরু ! তুমি সহায় হও দেব—নচেৎ এ ব্যাধির আর প্রতীকার কে করিবে ? আর কোথায় আমার সাধু সজ্জন মহাত্মা, সৎপথের সহায়, ভবব্যাধির শুশ্রূষাকারী দীন দয়ালেরা ! একবার এই ব্যাধিগ্রস্ত—পীড়িত দুর্ব্বলের প্রতি করুণ নেত্রে চাহ ! একবার তোমরা এস, তোমাদের শুশ্রূষার গুণে এই ভবরোগ হইতে মুক্তিলাভ করি ! ব্যাধিগ্রস্ত দেহ, রোগাতুর মন, ক্ষীণবুদ্ধি, দুর্ব্বলেন্দ্রিয় —আমাকে তোমরা রক্ষা কর ! ঔষধের গুণে, তোমাদের সেবার গুণে, আমি যেন আমার স্বাস্থ্যকে ফিরিয়া পাই ; আমার রোগ বিকার যেন ঘুচিয়া যায়— অরুচি সারিয়া যায় ! তুমিই বল নাথ, তোমাকে কাতর কণ্ঠে ডাকিতেছি, কত-দিনে আমার এ রোগ সারিবে ? তুমি যে সকল আত্মার প্রিয়তম, সমস্ত রসের নিলয়, কবে তোমাকে স্বাদু বোধ হবে—প্রিয় বোধ হবে ? প্রভো ! এ অরুচি কি কিছুতেই সারিবে না—ইহার কি কোন ঔষধ নাই ?

অর্থ]

হরিদ্বার।

পঞ্চতীর্থ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩। বিল্বকেশ্বর ;—রাজপথ ছাড়িয়া রেলের রাস্তার নীচে দিয়া কিছুদূর যাইলেই শিবালক পর্ব্বতের একটী মনোরম উপত্যকায় এই পরম পবিত্র

শিবলিঙ্গের দর্শনলাভ হয়। স্থানটী নিরবতার নির্জ্জন-নিকেতন, পবিত্র ও সুন্দর। সাধন ভজনের সম্পূর্ণ উপযোগী একটী তপোবন। এই স্থানেই ঋচিক মুনির আশ্রম ছিল। মন্দিরের অদূরেই গৌরীকুণ্ড। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই মনোরম উপত্যকার শোভা দেখিতে দেখিতে গৌরীকুণ্ডের ধারে গিয়া বসিতাম। দুই দিকে উন্নত পর্ব্বত, হিমালয়ের নানাবিধ নূতন নূতন বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত। বিল্ব বৃক্ষেরও অভাব নাই; বিল্বগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। স্থানটী নিরব ও নির্জ্জন; মধ্যে মধ্যে কেবল ময়ুরের কেকারব এবং পক্ষীর মধুর কূজন এই মধুর গম্ভীর পার্ব্বত্য-নিরবতা ভঙ্গ করিতেছে। এই পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র গিরি নদী-প্রবাহের খাত। তাহার মধ্যে একটী বাঁধান জলপূর্ণ কূপ; ইহাই গৌরীকুণ্ড। নদীটী শিবধারা নামে খ্যাত; আমরা জলপান করিয়া কূপের পার্শ্বে বসিয়া এই অপূর্ব্ব স্থানের মহিমা অনুভব করিতাম। শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে প্রাণ কি এক উদাসভাবে পূর্ণ হইয়া।—চিত্ত কেমন ভগবৎ অভিমুখী হইয়া যাইত। প্রসিদ্ধ মুনি ঋষির আশ্রমের এবং দেবস্থানের এমনই অদ্ভুত প্রভাব যে, আমাদের সংসার-পরায়ণ বিষয়-বিমুগ্ধ বিক্ষিপ্ত-চিত্ত স্থান মাহাত্ম্যে কি এক অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সেই বিশ্বপতির চরণ পাণে ছুটিত। আমাদের সহচর বরদা বাবু—ভক্তি বিগলিত প্রাণে গান ধরিতেন;—

"মন চল নিজ নিকেতনে,—
সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয় পঞ্চক, আর ভূতগণ,
সকলি ত' পর, কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলেছ আপন জনে॥
সত্য পথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ;
সঙ্গেতে সম্বল রেখ পুণ্যধন—গোপনে অতি যতনে॥
পথে দেখ যদি ভয়েরি আকার,
প্রাণপণে দিও দেহাই রাজার;
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ—শমন ডরে যার শাসনে"—

গান শুনিতে শুনিতে এবং শোভা দেখিতে দেখিতে ক্রমেই অন্ধকার ঘনীভূত হইত; সুতরাং আমরা আর এই বন মধ্যে বিলম্ব না করিয়া

তথা হইতেই বিল্বপত্র এবং গৌরীকুণ্ডের জল সংগ্রহ করিয়া বিল্বকেশ্বর—অর্চ্চনা করিলাম। আর প্রার্থনা করিলাম—

"ক্ষন্তব্যো মেহপরাধ শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো !!"

বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখস্থ অঙ্গনে নিম্ব-বৃক্ষতলে কুণ্ডলিনী বেষ্ঠিত আর একটী শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। একজন ভক্ত একটী ইন্দারা ও পূজারীগণের বাসার্থ একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চাৎভাগ দিয়াই 'শিবধারা' প্রবাহিতা; এ সময় নদীর জল শুষ্কপ্রায়। অপর পারে একটী পর্ব্বতগাত্রস্থ গুহায় অন্নপূর্ণা গণেশ প্রভৃতি চারিটী দেব দেবীমুর্ত্তি দর্শন করিলাম। বিল্বকেশ্বরেই আমরা হিমালয়ের কয়েক প্রকার অপরিচিত বৃক্ষাদি অবলোকন করিয়া বুঝিলাম, হিমালয়-দৃশ্য আরম্ভ হইয়াছে। বিল্বকেশ্বর প্রভৃতি প্রত্যেক তীর্থেরই মাহাত্ম্য সূচক নানা উপাখ্যান পুরাণে বর্ণিত আছে; তাহা লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। কৌতুহলী পাঠক 'মায়াপুরী মাহাত্ম্যে' তাহা পাঠ করিতে পারেন।—

"শিবধারা সমাখ্যাতা শিবদা তত্র পর্ব্বতে।
তস্যাং নরঃ সকৃৎ স্নাত্বা শিবেন সদৃশঃ ভবেৎ॥
তত্রৈকা বিল্ববৃক্ষস্তু তস্যাধ্যঃ শিবলিঙ্গকম্।
যস্য দর্শনমাত্রেন শিবতাং যাতি মানবঃ" ॥ কেদার খণ্ড ১০৭ অঃ।
তত্র বিল্বেশ্বরোঃ নাম মহাদেব বিমুক্তিদঃ।
যস্তত্র নিয়তাহারঃ সপ্তরাত্রং জিতেন্দ্রিয়ঃ
জপতে শিবমন্ত্রং চ রুদ্র চাগম তৎপরঃ
পরাং সিদ্ধিমবাপ্নোতি যা সুরৈরপি দুর্ল্ভা।
বিল্বপত্রৈ সমভ্যর্চ্চ ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ॥ কেঃ খণ্ড—১১৫ অঃ।

ফিরিবার সময় অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রকাণ্ড ভৈরব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। প্রস্তর-নির্ম্মিত উপবিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি ভিত্তি সংলগ্ন। মূর্ত্তিটী ভীষণ।

৪। নীল পর্ব্বতের চণ্ডীকা তীর্থ বা চণ্ডীকা পাহাড়।—

হরিদ্বারের অপর পারে যে বৃক্ষলতাচ্ছাদিত, নবীন জলদ-বর্ণাভ মনোরম অভ্রভেদী পর্ব্বত ধ্যানমগ্ন ঋষির ন্যায় প্রতীমান হয়, তাহাই 'নীল পর্ব্বত।' ইহার শিখরে শিখরে চণ্ডীকাদেবীর শুভ্র মন্দির, হরিদ্বার হইতেই দেখা যায়। এই পর্ব্বতের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া 'নীলধারা'—কণখলের সম্মুখে গঙ্গার মূলধরার সহিত সম্মিলিতা হইতেছেন। চণ্ডী পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে

শিবলিঙ্গের দর্শনলাভ হয়। স্থানটী নিরবতার নির্জ্জন-নিকেতন, পবিত্র ও সুন্দর। সাধন ভজনের সম্পূর্ণ উপযোগী একটী তপোবন। এই স্থানেই ঋচিক মুনির আশ্রম ছিল। মন্দিরের অদূরেই গৌরীকুণ্ড। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই মনোরম উপত্যকার শোভা দেখিতে দেখিতে গৌরীকুণ্ডের ধারে গিয়া বসিতাম। দুই দিকে উন্নত পর্ব্বত, হিমালয়ের নানাবিধ নূতন নূতন বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত। বিল্ব বৃক্ষেরও অভাব নাই; বিল্বগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। স্থানটী নিরব ও নির্জ্জন; মধ্যে মধ্যে কেবল ময়ুরের কেকারব এবং পক্ষীর মধুর কূজন এই মধুর গম্ভীর পার্ব্বত্য-নিরবতা ভঙ্গ করিতেছে। এই পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র গিরি নদী-প্রবাহের খাত। তাহার মধ্যে একটী বাধান জলপূর্ণ কূপ; ইহাই গৌরীকুণ্ড। নদীটী শিবধারা নামে খ্যাত; আমরা জলপান করিয়া কূপের পার্শ্বে বসিয়া এই অপূর্ব্ব স্থানের মহিমা অনুভব করিতাম। শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে প্রাণ কি এক উদাসভাবে পূর্ণ হইয়া।—চিত্ত কেমন ভগবৎ অভিমুখী হইয়া যাইত। প্রসিদ্ধ মুনি ঋষির আশ্রমের এবং দেবস্থানের এমনই অদ্ভুত প্রভাব যে, আমাদের সংসার-পরায়ণ বিষয়-বিমুগ্ধ বিক্ষিপ্ত-চিত্ত স্থান মাহাত্ম্যে কি এক অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সেই বিশ্বপতির চরণ পাণে ছুটিত। আমাদের সহচর বরদা বাবু—ভক্তি বিগলিত প্রাণে গান ধরিতেন;—

"মন চল নিজ নিকেতনে,—
সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয় পঞ্চক, আর ভুতগণ,
সকলি ত' পর, কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলেছ আপন জনে ॥
সত্য পথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ;
সঙ্গেতে সম্বল রেখ পুণ্যধন—গোপনে অতি যতনে ॥
পথে দেখ যদি ভয়েরি আকার,
প্রাণপণে দিও দেহাই রাজার;
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ—শমন ডরে যার শাসনে"—

গান শুনিতে শুনিতে এবং শোভা দেখিতে দেখিতে ক্রমেই অন্ধকার ঘনীভূত হইত; সুতরাং আমরা আর এই বন মধ্যে বিলম্ব না করিয়া

তথা হইতেই বিল্বপত্র এবং গৌরীকুণ্ডেস্থ জল সংগ্রহ করিয়া বিল্বকেশ্বর—অর্চ্চনা করিলাম। আর প্রার্থনা করিলাম—

"ক্ষন্তব্যো মেহপরাধ শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো !!"

বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখস্থ অঙ্গনে নিম্ব-বৃক্ষতলে কুণ্ডলিনী বেষ্টিত আর একটী শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। একজন ভক্ত একটী ইন্দারা ও পূজারীগণের বাসার্থ একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চাৎভাগ দিয়াই 'শিবধারা' প্রবাহিতা; এ সময় নদীর জল শুষ্কপ্রায়। অপর পারে একটী পর্ব্বতগাত্রস্থ গুহায় অন্নপূর্ণা গণেশ প্রভৃতি চারিটী দেব দেবীমুর্ত্তি দর্শন করিলাম। বিল্বকেশ্বরেই আমরা হিমালয়ের কয়েক প্রকার অপরিচিত বৃক্ষাদি অবলোকন করিয়া বুঝিলাম, হিমালয়-দৃশ্য আরম্ভ হইয়াছে। বিল্বকেশ্বর প্রভৃতি প্রত্যেক তীর্থেরই মাহাত্ম্য সূচক নানা উপাখ্যান পুরাণে বর্ণিত আছে; তাহা লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। কৌতুহলী পাঠক 'মায়াপুরী মাহাত্ম্যে' তাহা পাঠ করিতে পারেন।—

"শিবধারা সমাখ্যাতা শিবদা তত্র পর্ব্বতে।
তস্যাং নরঃ সকৃৎ স্নাত্বা শিবেন সদৃশঃ ভবেৎ ॥
তত্রৈকা বিল্ববৃক্ষস্ত তস্যাধ্যঃ শিবলিঙ্গকম্।
যস্য দর্শনমাত্রেন শিবতাং যাতি মানবঃ" ॥ কেদার খণ্ড ১০৭ অঃ।
তত্র বিল্বেশ্বরোঃ নাম মহাদেব বিমুক্তিদঃ।
যস্তত্র নিয়তাহারঃ সপ্তরাত্রং জিতেন্দ্রিয়ঃ
জপতে শিবমন্ত্রং চ রুদ্র চাগম তৎপরঃ
পরাং সিদ্ধিমবাপ্নোতি যা সুরৈরপি দুর্লভা।
বিল্বপত্রৈ সমভ্যর্চ্চ ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ ॥ কেঃ খণ্ড—১১৫ অঃ।

ফিরিবার সময় অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রকাণ্ড ভৈরব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। প্রস্তর-নির্ম্মিত উপবিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি ভিত্তি সংলগ্ন। মূর্ত্তিটী ভীষণ।

৪। নীল পর্ব্বতের চণ্ডীকা তীর্থ বা চণ্ডীকা পাহাড়।—হরিদ্বারের অপর পারে যে বৃক্ষলতাচ্ছাদিত, নবীন জলদ-বর্ণাভ মনোরম অভ্রভেদী পর্ব্বত ধ্যানমগ্ন ঋষির ন্যায় প্রতীমান হয়, তাহাই 'নীল পর্ব্বত।' ইহার শিখরে শিখরে চণ্ডীকাদেবীর শুভ্র মন্দির, হরিদ্বার হইতেই দেখা যায়। এই পর্ব্বতের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া 'নীলধারা'—কণখলের সম্মুখে গঙ্গার মূলধরার সহিত সম্মিলিতা হইতেছেন। চণ্ডী পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে

ও কিঞ্চিৎ নিম্নে পর্ব্বতের গাত্রেই নীল্লোকেশ্বর বা নীলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। নীল্লোকেশ্বর মহাদেবের মন্দির হইতে প্রায় ২ বা ২॥০ মাইল উর্দ্ধে চণ্ডীর মন্দীর।

"চণ্ডীকা তীর্থ রাজেহি সকৃৎ স্নাতঃ মহামুনে। *
স ধন্যঃ পুরুষো লোকে সফলং তস্য জীবিতম্॥"

চণ্ডীকা তীর্থে যিনি একবার স্নান করিয়াছেন, তাঁহার জীবন ধন্য।

নীল পর্ব্বত ইতি বৈ স্মরণাৎ শিবদায়কঃ।
তং পর্ব্বতং সকৃৎ দৃষ্টা সর্ব্বপাপৈ প্রমুচ্যতে॥
অত্র বৈ নিবসিস্যামী ত্বয়া সহ গণেশ্বর।
নীলেশ্বর ইতি খ্যাতো ভক্তানাং প্রীতিবর্দ্ধনম্।

নীলপর্ব্বত স্মরণ মাত্রই মঙ্গলদায়ক; দর্শন ত' দূরের কথা। এই পর্ব্বত একবার দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। মহাদেব বলিয়াছেন 'যে, গণেশ্বর আমি তোমার সহিত এই নীল-পর্ব্বতে 'নীলেশ্বর' এই নামে খ্যাত হইয়া ভক্তগণের প্রীতিবর্দ্ধক হইয়া সর্ব্বদা নিবাস করিব।'

নীলপর্ব্বত হরিদ্বার যাত্রীর অবশ্য দর্শনীয়; কারণ ইহা পঞ্চতীর্থের অন্যতম। কিন্তু ইহা প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত এবং পথও অতি দুর্গম। যানাদিরও বিশেষ সুবিধা নাই; সুতরাং অতি অল্প যাত্রীই তথায় গমন করেন। কিন্তু যিনি কষ্ট করিয়া চণ্ডীর পাহাড় দর্শন করিবেন, তিনি হিমালয়ের বৃক্ষলতা-মণ্ডিত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা, নানা বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরখণ্ড সমাচ্ছাদিত নীলধারার মনোরম শোভা এবং উপল-প্রতিহত প্রখর-প্রবাহ এবং পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশ হইতে হরিদ্বার কণখলের মনোহর দৃশ্য ত্রিধারায় প্রবাহিতা গঙ্গার শোভা, দূরে পর্ব্বত গাত্রে ঘন অরণ্যানীর শ্যামল শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। তাঁহার সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে। যাঁহারা কেদার ও বদ্রীনারায়ণ যাইবেন না, তাঁহারা যেন হরিদ্বারে আসিয়া চণ্ডীপর্ব্বত দর্শন করিতে না ভুলেন। চণ্ডীর পাহাড় ভ্রমণ করিলে তাঁহারা নগাধিরাজ হিমালয়ের উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া নির্ম্মল আনন্দ পাইবেন। যাঁহারা হাঁটিয়া যাইতে অক্ষম, তাঁহারা চেষ্টা করিলে ডুলীর সাহায্যে পর্ব্বতারোহণ

* পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন স্নান ষড়্‌বিধ যথা—১। ব্রাহ্ম্য ২। আগ্নেয় ৩। বায়ব্য ৪। দিব্য ৫। বারুণ ও ৬। যৌগিক। ঈশ্বরে আত্ম-নিবেদন বা চিত্ত সমর্পণকে যৌগিক স্নান বলে। এস্থলে যৌগিক স্নানেরই কথা বলা হইতেছে। কারণ চণ্ডীতীর্থে বারুণ স্নান সম্ভব নহে,—তথায় জলের একান্ত অভাব।

করিতে পারেন। হরিদ্বার অবস্থানের শেষ দিন (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) চণ্ডীকা-তীর্থ দর্শন করিলাম। যাত্রার পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে একদল বলিলেন, বদ্রী-নারায়ণ যাত্রার পূর্ব্বদিন এই বার মাইল হাঁটা ও পাহাড়ে চড়িয়া শক্তির অপচয় না করিয়া, হরিদ্বারেই বিশ্রাম করা উচিত। আমরা বলিলাম 'ইহা পঞ্চতীর্থের অন্যতম, সুতরাং অবশ্য দর্শনীয়। "যা দেবী সর্ব্বভুতেযু শক্তিরূপেন সংস্থিতা" তাঁহাকে পূজা করিয়া যাত্রার পূর্ব্বে শক্তি ভিক্ষা করা উচিত। আর সম্ভবতঃ নীল পর্ব্বতস্থ ভৈরবই নীল ভৈরব! বদরীকাশ্রম মহাত্ম্যে আছে, "হরিদ্বারে স্নানাদি করিয়া নীল ভৈরবের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কেদার বদ্রী-নাথ যাত্রা করা কর্ত্তব্য।" সুতরাং নীল ভৈরবের নিকট প্রার্থনা না করিয়া যাত্রা করা অসঙ্গত।' যাহা হউক আমরা প্রভাতেই কিঞ্চিৎ খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পদব্রজেই পর্ব্বতারোহণ মানসে সদ্য সংগৃহীত পার্ব্বত্য যষ্টী লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমতঃ এক্কারোহণে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মায়াপুরের দক্ষিণে গঙ্গার উপর যে একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতু আছে, তাহা পার হইলাম। এখান হইতে গঙ্গার তীরে তীরে প্রায় ১॥০ মাইল পদব্রজে উত্তরাভিমুখে হাটিয়া আসিয়া নীল-ধারার নৌকা পারানীর ঘাটে পৌছিতে হয়। এই দেড় মাইল পথ প্রস্তরাকীর্ণ নদীরই শুষ্ক গর্ভ। বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে, হাঁটা কিছু কষ্ট কর। নৌকা পার হইয়া আমরা নীল-ধারায় স্নান করিলাম পারের মাশুল ৫ পয়সা হিসাবে লাগে। অদ্য অষ্টমী তিথি; সুতরাং অনধ্যায়। "ঋষিকুল" বিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারী-ছাত্রবৃন্দ তাঁহাদের আচার্য্যসহ অদ্য চণ্ডীদেবীর দর্শনার্থ যাইতেছেন। তাঁহারা স্নান করিয়া সমবেত ঐক্যতানে সুমধুর বৈদিক ছন্দে গঙ্গালহরী পাঠ করিতে লাগিলেন। চণ্ডীকা দেবীকে দর্শন পূজন করিয়া এবং তথায় চণ্ডীপাঠ করতঃ তাঁহারা ফিরিবেন। আমরাও স্নানাদি করিতে করিতে ব্রহ্মচারীদের দর্শন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলাম। নীলধারার উভয় তটে হরিৎ, নীল, পীত, প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সুন্দর প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে। বিধাতার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। আরও প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিলাম। পর্ব্বতের উপর কোন স্থানে 'চড়াই,' কোন স্থানে কিছু 'উৎরাই,' এইরূপে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত শৃঙ্গে চণ্ডীর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। পথে নানাবিধ বৃক্ষ লতার সুন্দর শ্যামল শোভা প্রস্ফুটিত কুসুম সমূহের মধুর সৌরভ এবং পক্ষিগণের

কল-কূজন আমাদের চিত্ত বিমোহিত করিয়াছিল। আর যখনই একটু ক্লান্তি বোধ করিয়াছি, তখন পর্ব্বত গাত্রে বসিয়া হরিদ্বারের বিমল শোভা বিলোকন করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়াছিলাম। মন্দির মধ্যে চণ্ডীকা দেবীর সিন্দূর লেপিত মূর্ত্তি। অদূরে একটী বাঁধান প্রস্তর-চত্তরে ভৈরব মূর্ত্তি। অনতিদূরে একটি শিখরস্থ মন্দিরে আঞ্জনেয় মন্দিব। উক্ত মন্দিরের বহিঃ চত্বরে গণেশ, হনুমানজী প্রভৃতি মূর্ত্তি আছে।

চণ্ডীমাতার দর্শনাদি করিয়া মন্দিরের চত্বরে বসিয়া আমরা বিশ্রামান্তে জল-যোগ করিলাম। পর্ব্বত শিখরে জলের বড়ই অভাব; কোন ঝরণা নাই। নীচে হইতে পার্ব্বত্য অশ্বের দ্বারা জল বহন করিয়া লইতে যাইতে হয়। একটী ছোট ঘটী, জলের মূল্য ৫ হিসাবে দিতে হয়। আমরা খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম; ৪।৫ জনে প্রায় দুই আনার জল খাইয়া ফেলিলাম। চণ্ডীদেবীর মন্দিরের পশ্চাৎ বসিয়া কিছুক্ষণ আমরা চতুর্দ্দিকের মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দৃশ্য বড়ই মনোরম; সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে গঙ্গা নানা ধারায় বিভক্তা হইয়া পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্ঠিত উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। মধ্যে মধ্যে সাদা বালীর চর পড়িয়াছে; কোথাও বা তাহা হরিৎ বৃক্ষ রাজিতে পরিপূর্ণ। উত্তর পশ্চিম দিকে দিগন্ত বিস্তৃত গভীর অরণ্যানী নদীর অপর পারে—অতি দূরে কখন ও হরিদ্বারের শ্রেণীবদ্ধ শুভ্র মন্দির ও সৌধাবলী গঙ্গাতীরে কি মনোহর শোভাই বিস্তার করিয়া একটী মনোরম আলেখ্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্তরে স্তরে জলদ-বর্ণাভ অগণ্য পর্ব্বত শ্রেণী দিগন্ত বিস্তৃত। বেলা অধিক হওয়ায় দুই মাইল নিম্নে নামিয়া নীলেশ্বর দর্শন করিতে আসক্ত হইলাম: কারণ যে দিক দিয়া আসিয়াছি, তাহার অপর দিক দিয়া নামিয়া নীলেশ্বর দর্শন করিতে হয়। অতঃপর পূর্ব্ব পথে অবরোহণ করিয়া বেলা প্রায় ১ টায় নিতান্ত ক্লান্ত শরীরে হরিদ্বার ফিরিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

ভারতে লিঙ্গ পূজা।

(১)

অনেকের বিশ্বাস, কেবল ভারতবর্ষের লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল; এবং পৃথিবীর অন্য কোনও সভ্য বা অসভ্য দেশে তাহা প্রচলিত ছিল না। কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, লিঙ্গপূজা একটী অনার্য্য-সম্মত প্রথা। প্রাচীনকালে আর্য্যেরা অনার্য্যদের সংসর্গে আসিয়া, উহা অনার্য্যগণের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনার্য্য দ্রবিড়গণ লিঙ্গপূজার আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত হ'ন। এই সকল বিভিন্ন মতের সমালোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। প্রবন্ধান্তরে তাহাদের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন কালে পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশে, এমন কি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপেরও বহু প্রদেশে কোনও না কোনও আকারে লিঙ্গ পূজা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন এসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি দেশে লিঙ্গ পূজা যে প্রচলিত ছিল, তাহার ভূরি প্রমাণ আছে। খৃষ্টের জন্মেয় বহু পূর্ব্বে এবং পরেও এই সমস্ত দেশে লিঙ্গ পূজার সমাদর ছিল। আধুনিক অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত এই যে, খৃষ্টিয়ান্‌গণের পবিত্র ক্রুশ (†) চিহ্ন লিঙ্গ পূজার নিদর্শন। এই পবিত্র চিহ্ন যীশু খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই য়িহুদী ও অন্যান্য জাতিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও পূজিত হইয়া আসিতেছিল। পরে খৃষ্টিয়ানগণ তহা তাঁহা-দের ধর্ম্মের জ্ঞাপক বিশিষ্ট পবিত্র চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করেন। এই সমস্ত কথা সত্য হইলে বুঝা যাইতেছে যে লিঙ্গ পূজা এক সময়ে পৃথিবী ব্যাপিনী এবং আর্য্যা-নার্য্য জাতি নির্ব্বিশেষে প্রায় সকল সভ্য জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। কোন্ জাতি এই লিঙ্গ পূজার আদি প্রবর্ত্তক, তাহা এখন নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন বটে; কিন্তু প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে যদি লিঙ্গ পূজার উল্লেখ বা আভাস থাকে, তাহা হইলে ইহাকে একটী অনার্য্য সম্মত প্রথা বলিবার কোনও কারণ নাই। বরং আর্য্যেরাই এই প্রথার আদি প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। হিন্দু আর্য্যগণ যে প্রাচীন কালে পারস্য, এসিরিয়া ব্যাবিলন, আরব ও মিশর প্রভৃতি দেশে নানা কার্য্য-ব্যপদেশে, গতায়াত করিতেন, তাহা এখন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহাদের দ্বারা

উক্ত দেশ সমূহে লিঙ্গ পূজা প্রবর্ত্তিত হওয়া বিচিত্র নহে। লিঙ্গপূজায় জন্মস্থান ভারতবর্ষে অদ্যাপি তাহা পবিত্র আকারেই বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু কাল-ক্রমে এই প্রথা ভারতবর্ষীয় পবিত্র প্রথার সহিত বিযুক্ত হইয়া একটী নীতি-বিগর্হিত ও দূষিত প্রথায় পরিণত লিঙ্গপূজা হইয়াছিল। ভারতে এখনও ব্রহ্মোপাসনারই অঙ্গ রহিয়াছে; কিন্তু পুণ্যভূমি ভারতে বাহিরে গিয়া তাহ জঘন্য Bacchanial festival অর্থাৎ কদর্য্য ও জুগুপ্সিত ইন্দ্রিয় পূজায় পরিণত হইয়াছিল। প্রবন্ধান্তরেবিস্তারিত ভাবে এই সমস্ত কথার আলোচনা করিব। এক্ষণে লিঙ্গ পূজা সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে কিরূপ উক্তি আছে, তাহা দেখা যাউক।

প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি তাহ হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা Active ও passive অথবা Positive ও Negtive নামক যে দুইটী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা এই প্রকৃতি ও পুরুষেরই রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। ব্রহ্ম স্বয়ং নিষ্ক্রিয়; কিন্তু ব্রহ্মশক্তি ক্রিয়াশালিনী। এই শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা এবং গুণভেদে সৃষ্টি-লয়-পালন কর্ত্রী। আদ্যাশক্তি মহামায়া রূপে তিনি বিশ্বের পালনকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী, এবং করালবদনাং কালী বা চামুণ্ডারূপে তিনি সংহারকর্ত্রী। মায়ের এই ত্রিবিধা মূর্ত্তি সর্ব্বস্ব ও সর্ব্ব সময়েই দৃষ্টিগোচর হয়। স্থাবর, জঙ্গম ও উদ্ভিদ সর্ব্বত্রই মায়ের এই ত্রিবিধা মূর্ত্তি প্রকটিত। ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত এবং নিষ্ক্রিয় হইলেও, তিনিই এই মহাশক্তির একমাত্র আশ্রয়-স্থল; এবং তাঁহার সংযোগ ব্যতীত মহাশক্তির স্ফুরণ ও ক্রিয়া একান্ত অসম্ভব। বৈদ্যুতিক প্রবাহের যেরূপ Positive ও Negative current একত্র মিলিত না হইলে, অগ্নির স্ফুরণ হয় না, ইহাও তদ্রূপ। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপিণী মহাশক্তির এই অদ্ভুত লীলা ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই হইতেছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-রহস্য বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির, পুরুষ ও প্রকৃতির, বা হর ও গৌরীর সংযোগ ও মিলন কাহিনী হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত এবং লিঙ্গপূজায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যিনি ব্রহ্ম, শিব বা মহাদেব, তিনিই পুরুষ বা প্রধান; এবং যিনি মহাশক্তি বা মহামায়া, তিনিই প্রকৃতি। এই পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতঃ এক ও অভিন্ন; একই দ্বিধা বিভক্ত, আবার পরস্পরে সংযুক্ত ও একীভূত হইয়া "অর্দ্ধ নারীশ্বর" রূপে বিচিত্র লীলার অভিনয় করিতেছেন। সেই আদি কারণ এককে বুঝিবার জন্য, একের দ্বিত্ব এবং দুইয়ের একত্ব হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত আবশ্যক।

লিঙ্গ পূজার দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির, অর্থাৎ বিশ্বের জনক জননী বা সেই একে দুই ও দুইয়ে একেরই পূজা করা হয়। লিঙ্গের মৌলিক অর্থ 'চিহ্ন' বা লক্ষণ। জনকের জনকত্ব এবং জননীর জননীত্ব লিঙ্গ নামে অভিহিত হয়। এই লিঙ্গপূজা সগুণ ব্রহ্মেরই পূজা বটে; কিন্তু এতদ্দ্বারা ভক্ত উপাসক বিদ্যুদা-ভাসের ন্যায় নিজ হৃদয়ে নির্গুণ ব্রহ্মেরও আভাস উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সাত্ত্বিক-ভাব-প্রবণ ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন ভক্ত উপাসকের নিকট জনকের জনকত্ব ও জননীর জননীত্ব চিরপূজ্য, চির পবিত্র ও চির গৌরবময়। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র, নীচ ও কুৎসিত ভাবের স্থান নাই। সেই প্রোজ্জ্বল মহাভাবের প্রদীপ্ত জ্যোতির মধ্যে অসৎ বা কুৎসিৎ ভাবের উদয়, সূর্য্যালোকের মধ্যে অন্ধকারের অবস্থানের ন্যায় একান্ত অসম্ভব। এই কারণে হিন্দু জাতির আবালবৃদ্ধবণিতা পবিত্র হৃদয়ে, নির্ব্বিকার চিত্তে ও ভক্তিপূর্ণ মনে সেই লিঙ্গরূপী ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের ও বেদী বা গৌরীপট্টরূপিনী সেই বিশ্বজননীর পূজা করিয়া আপনাদের জীবনকে সার্থক জ্ঞান করেন ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া থাকেন।

হিন্দু পুরাণে লিঙ্গের নির্দ্দেশ এইরূপ :—পণ্ডিতগণ নির্গুণ ব্রহ্মকে লিঙ্গের কারণ ও অবক্তকে লিঙ্গ বলিয়া থাকেন। মহাদেব সেই নির্গুণ কারণ; তাঁহা হইতে অব্যক্ত আবিষ্কৃত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধ। গন্ধ, রূপ, রস, শূন্য, শব্দ, স্পর্শাদি গুণ বর্জ্জিত, নির্গুণ সত্য সনাতন পরমব্রহ্ম শিবই অলিঙ্গ। তাহা হইতে গন্ধ বর্ণ ও রস শব্দ, স্পর্শাদিগুণ-ভূষিত জগতের উৎপত্তি কারণ, স্থূল সূক্ষ্ম ও মহা ভূতময় জগতের শরীরাত্মক লিঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছেন। পরম ব্রহ্মের মায়া দ্বারা সেই অব্যক্ত লিঙ্গ ষড়বিংশতি প্রকারে বিস্তৃত হইয়াছেন। * * * সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী সেই শৈবী মায়া প্রথমে পরমেশ্বর শিব কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া, স্বভাবতঃ ব্যক্ত ভাবে আবির্ভূত হইলেন। অব্যক্ত প্রভৃতি স্থূল ভূতচয় যাহার অন্ত, সেই জগত তাঁহা হইতেই প্রাকাশিত। সেই শৈবী-প্রকৃতি বিশ্ব-প্রসবিনী, সনাতনী বলিয়া বিখ্যাত। * * * পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সেই প্রকৃতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জননী। (লিঙ্গ পুরাণ, তৃতীয় অধ্যায়)।

উক্ত পুরাণের একাদশ অধ্যায়ে হর-গৌরীর এইরূপ বর্ণনা আছে :—"পণ্ডিতগণ পরমাত্মা শিবকে কল্যাণময় ও শিবাকে কল্যাণময়ী কহিয়া থাকেন। শিবকে ঈশ্বর ও গৌরীকে মায়া বলিয়া থাকেন। * * * পুরুষগণ,

শঙ্কর, স্ত্রীগণ মহেশ্বরী। এমন কি ব্রাহ্মাণ্ডে যে কিছু স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বাচ্য, তৎসমুদয়ই ভগবতী গৌরীর অংশ। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঐ উভয়ের বিভূতি। সমস্ত শদার্থ শক্তিই দেবী বিশ্বেশ্বরী, ও যে কিছু শক্তিমান্ পদার্থ, সকলই মহেশ্বর। জীবগণের, শরীরস্থিত অষ্ট প্রকৃতি ও বিকৃতি ঐ দেবীর মূর্ত্তিবিশেষ, এবং যেরূপ এক অগ্নিতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ একমাত্র যুগলরূপী ভগবান শিবই যাবৎ জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। শরীরীগণের শরীর হর-গৌরীর রূপমাত্র ও শরীরিগণ স্বয়ং শঙ্করের অংশ রূপে অবস্থিত। জগতে যে কিছু শ্রোতব্য, তৎ সকলই উমার রূপ এবং দেব মহেশ্বর শ্রোতারূপে অবস্থিত। জগতে যে ভগবান্ বিষয়ের ভোক্তা ও ভগবতী যাবদ্বিষয়রূপে অবস্থিতা। শঙ্কর-প্রিয়া যাবৎ স্রষ্টব্য বস্তু; ও সেই বিশ্বরূপ দেব চন্দ্রশেখর স্রষ্টা। জগদীশ্বরী প্রপঞ্চরূপ দৃশ্যবস্তু, কিন্তু সেই শশিশেখর দেব বিশ্বেশ্বরই একমাত্র দ্রষ্টা। যাবৎ রস ও যে কিছু ঘ্রাণযোগ্য পদার্থ সকলই উমার রূপ, এবং জগদীশ্বর শম্ভু রসাস্বাদক ও ঘ্রাতা। যাহা কিছু বিচার্য্য বস্তু, সকলই মহাদেবী বিশ্বেশ্বরী, ও ঐ বিশ্বরূপ মহাদেব একমাত্র বিচারক। বোদ্ধব্য যাবৎ বস্তু ভবানী ও সেই ভগবান্ চন্দ্রশেখরই একমাত্র বোদ্ধা। দেবী উমা বেদী-রূপিণী, ও শঙ্কর লিঙ্গস্বরূপ। সুরাসুরগণ সযত্নে বেদীতে লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করেন। যে যে পদার্থ পুরুষচিহ্নক তৎসমুদায় শিবের; ও যে যে পদার্থ স্ত্রীচিহ্নক, তৎসমুদায় গৌরীর অংশ। জ্ঞানের বিষয়ীভূত স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালস্বরূপ যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড উমাস্বরূপ, একমাত্র দেব মহেশ্বরই জ্ঞাতা।"

লিঙ্গ পুরাণের এই উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, লিঙ্গপূজা বিশ্বের আদিকরণ মহাদেব, বিশ্বেশ্বর ও তাঁহার মহাশক্তিরই পূজা। এই পূজার মধ্যে কোনও কুৎসিৎ ভাবের অবসর নাই; এবং ইহাতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিয়া ধন্য ও পবিত্র হইতে পারেন। তবে যাঁহাদের মন কুসংস্কারময়, সঙ্কীর্ণ ও অনুদার, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

পুরাণের উক্তি উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় কি উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥ (ত্রয়োদশ অধ্যায়)

অর্থাৎ "হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে; যিনি ইহাকে তত্ত্বতঃ জানেন, ক্ষেত্রবিদ্‌গণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। হে ভারত, সমুদায় ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই উভয়ের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান (মুক্তির হেতু বলিয়া) আমার অভিমত।"

যাঁহারা পুরাণোক্ত শিব ও উমার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ক্ষেত্রজ্ঞ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা মহেশ্বর এবং ক্ষেত্র স্বয়ং প্রকৃতি বা গৌরী। এই উভয়েরই যে জ্ঞান, তাহাই মুক্তির হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গীতায় উক্ত হইয়াছে ঃ—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্॥
কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণাম্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥
য এব বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানেঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ (ত্রয়োদশ অধ্যায়)

অর্থাৎ "প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি জানিবে। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে জাত। কার্য্য এবং কারণ ইহাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হ'ন; আর পুরুষ সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্বে হেতু বলিয়া কথিত হ'ন। যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণ সকল ভোগ করেন; কিন্তু এই পুরুষের সৎ এবং অসৎ যোনিতে যে জন্ম, তদ্বিষয়ে সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণের সংসর্গই কারণ। এই প্রকৃত কার্য্য স্বরূপ দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃত কার্য্য দেহ হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ তদ্‌গুণ যুক্ত নহেন। যেহেতু তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং অন্তর্যামি স্বরূপ, ইহাও উক্ত আছে। যিনি এই প্রকার পুরুষকে জানেন এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি যে কোনও প্রকারে অথবা যে কোন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলেও পুনরায় জন্মেন না, অর্থাৎ মুক্ত হ'ন।"

পুনশ্চ গীতায় অন্যত্র উক্ত হইয়াছে ঃ—

মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অর্থাৎ "হে কৌন্তেয়, মহদ্ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি) আমার যোনি (গর্ভাধান স্থান) এবং তাহাতেই আমি গর্ভক্ষেপণ করি। তাহা হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি হয়। হে কৌন্তেয়, মনুষ্যাদি যোনি সকলে স্থাবর জঙ্গম স্বরূপ যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, মহদ্ব্রহ্ম (প্রকৃতি) তাহাদের যোনি (মাতৃ স্থানীয়) এবং আমি বীজ-প্রদ (গর্ভাধান কর্ত্তা) পিতা।"*

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা যে মূলতঃ পৌরাণিক ভাব হইতে অভিন্ন; তাহা পাঠকবর্গ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

উপনিষদ বা বেদান্তেও এই ভাব দেখিতে পাইবেন। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া হইতে অভিন্ন। উপনিষদ সমূহের নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর মায়া প্রভাবে বহু রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। যথা :—

নেহনানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ। মাণ্ডুক্যকারিকা

অর্থাৎ "'ব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদ নাই' এবং ঈশ্বর মায়া দ্বারা (বহু রূপে প্রকাশ পান) এই শ্রুতি অনুসারেও (জানা যায়) যে, সেই পরমেশ্বর জাত না হইয়াও মায়া প্রভাবে বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।" †

কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্ত নিশ্চয়ঃ॥ (ঐ)

অর্থাৎ "স্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয় মায়া প্রভাবে আপনিই আপনাকে (বিভিন্ন পদার্থাকারে) কল্পিত করেন এবং তিনিই আবার সেই সকল পদার্থ অনুভব করেন। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।"

* গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউশনের প্রকাশিত গীতা হইতে গৃহীত হইল। লেখক।

† পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ কৃত অনুবাদ।

এই ব্রাহ্মী মায়াই ব্রহ্মশক্তি, দুর্গা, গৌরী বা উমা। ইঁহার সাহায্যেই ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর নানা আকারে প্রকটিত হইয়া থাকেন। উমার কৃপা ব্যতীত ইন্দ্রাদি দেবগণও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হ'ন নাই তাহাও উপনিষদে উক্ত হইয়াছে।* গীতাতে এই মায়া সম্বন্ধে যে উক্তি আছে, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। যথা :—

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভি সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে। (সপ্তম অধ্যায়)

অর্থাৎ "এই ত্রিবিধ গুণময় (সাত্ত্বিকাদি) ভাব সকল কর্ত্তৃক মোহিত এই সমুদায় জগৎ, এই সকল ভাবের অতীত এবং নির্ব্বিকার আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না। এই সত্ত্বাদি গুণবিকারময়ী অলৌকিক আমার মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা; যাঁহারা (কর্ম্মযোগ দ্বারা) আমারেই পান, তাঁহারা এই দুস্তরা মায়া অতিক্রম করেন।"

পুনশ্চ অন্যত্র এইরূপ উল্লেখ আছে :—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ (সপ্তম অধ্যায়)

অর্থাৎ "আমি যোগমায়াসমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশিত নহি। মূঢ় এই জীবলোক জন্ম-রহিত ও নিত্যস্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না।"

ব্রহ্ম ও মায়া, অর্থাৎ শিব ও শক্তির উল্লেখ যে বেদান্তশাস্ত্রেও আছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

অতঃপর বেদের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, বেদ পাঠের বিদ্যা বুদ্ধি, শক্তি বা অধিকার আমার নাই। আমি বেদের অনুবাদ পাঠ করিয়া ব্রহ্ম ও মায়া সম্বন্ধে যৎসামান্য যে আভাস উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিব।

ব্রহ্মের সঙ্কল্প হইতেই যে সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার উল্লেখ উপনিষদ্ এবং বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। সামবেদে সৃষ্টির উদ্ভব এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

"He (Brahma) experienced no bliss, being isolated

* কেনোপনিষদ্ পাঠ করুন।

alone. He ardently desired a companion, and immediately the desire was gratified. He caused his body to divide, and became male and female; they united, and human beings were made." (Quoted by Sellon in *Anthrop. Soc. Mem.*)

ইহার ভাবার্থ এই :—ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ হইয়া নিরানন্দ হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্গ কামনা করিবামাত্র, তাঁহার দেহ দ্বিধা বিভক্ত হইল; ইহার একাংশ পুরুষ, অপরাংশ নারী। পরে উভয়ে মিলিত হইয়া মানবের সৃষ্টি করিলেন।

বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মের এই দুইটী অংশের নাম, ব্রহ্ম ও মায়া, পুরুষ ও প্রকৃতি, শিব ও শক্তি, এবং হর ও গৌরী। এই দুই অংশের মিলনেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মিলিত ব্রহ্ম ও মায়াই পুরাণে "অর্দ্ধনারীশ্বর" রূপে উক্ত হইয়াছেন।

এই ভাব ঋগ্বেদেরও বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি ৺রমেশচন্দ্র মহাশয়ের ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ মাত্র অবলম্বন করিয়া তাহা দেখাইব। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৯ সূক্তের প্রথমাংশ এইরূপ :—

"তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না; যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা। সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিক্ জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল; তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল। (মূলে এই অংশটি এইরূপ আছে :—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ")। বুদ্ধিমান্‌গণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিলেন।"

"অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন" এবং "অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপিত হইল।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই "অবিদ্যমান বস্তুটি কি?" যাহা আছে, তাহাই সৎ বা সত্য। ব্রহ্মই

সত্য স্বরূপ; তিনি ব্যতীত আর সমস্তই অসৎ, অর্থাৎ "অবিদ্যমান" বা মায়া। সুতরাং "অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন" —এই বাক্যের অর্থ এই যে, সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম মায়া দ্বারা আবৃত ছিলেন। গীতার উক্তি এই স্থলে স্মরণ করুন, "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।" আর "এই অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপিত হইল," ইহার অর্থ এই যে, এই স্থূল প্রপঞ্চময় জগৎ, যাহা আমরা (মায়াপ্রভাবে) বিদ্যমান দেখিতেছি, তাহা ("অবিদ্যমান বস্তু) অর্থাৎ মায়া হইতে উৎপত্তি লাভ করিল। ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত সূক্তে "চতুর্দ্দিক্ জলময় ছিল" বলিয়া যে উক্তি আছে, সে জল ভৌতিক জল নহে; পরন্তু তাহা কারণ বারি বা Primal waters। "তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন" এই বাক্যের অর্থ এই যে, ব্রহ্মের সঙ্কল্প বা মনন (will) হইতে সৃষ্টির উদ্ভব হইল।

অবিদ্যমান বস্তু হইতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তির কথা ঋগ্বেদের অন্যত্রও আছে। যথাঃ—

"দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বকালে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেব (অর্থাৎ ব্রহ্ম) কর্ম্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্ম্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল।" (দশম মণ্ডল, ৭২ সূক্ত)। দশম মণ্ডলের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১২৯ সূক্তে আরও উক্ত হইয়াছে :—

"রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন। মহিমা সকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্দ্ধ দিকে বিস্তারিত হইল। নিম্নদিকে স্বধা রহিল; প্রয়তি ঊর্দ্ধদিকে রহিলেন।"

সায়নাচার্য্যের 'মতে' মহিমা অর্থে পঞ্চভূত, 'স্বধা' অর্থে অন্ন, আর 'প্রয়তি' অর্থে ভোক্তা পুরুষ। Muir বলেন, স্বধা ও প্রয়তির অর্থ "A self-supporting principle beneath, and Energy aloft," অর্থাৎ শিব ও শক্তি।

এই প্রয়তি ও স্বধাই দ্যাবা-পৃথিবী। দ্যাবার অর্থ আকাশ। আকাশকে পিতা বা দ্যুঃপিতা (Lat. Jupiter, Greek Zeus) এবং পৃথিবীকে মাতা বলা হয়। এই পিতা মাতার সংযোগেই যাবৎ সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তি। আকাশ হইতে বৃষ্টিরূপ রেতঃ পৃথিবীর গর্ভে নিপতিত হয়; তাহা হইতে উদ্ভিজ্জ ও ঔষধির জন্ম এবং উদ্ভিজ্জ ও ঔষধি হইতেই জীবের উৎপত্তি, পালন ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই দ্যাবা বা আকাশই মহাদেব ব্যোমকেশের এবং পৃথিবীই জগদ্ধাত্রী দুর্গার স্বরূপ। ঋগ্বেদের নিম্নোদ্ধৃত সূক্তটি পাঠ করুন :—

"আমি দ্রোহ রহিত পিতৃস্থানীয় দ্যুলোকের উদার এবং সদয় মন আহ্বান মন্ত্র দ্বারা জানিয়াছি। মাতৃস্থানীয়া পৃথিবীর মনও জানিয়াছি। পিতা মাতা দ্যাবা-পৃথিবী নিজ সামর্থ্য দ্বারা পুত্রগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করতঃ প্রভূত বিস্তীর্ণ অমৃত প্রদান করেন।'' (ঋগ্বেদ ১।১৫৯।২)।

পুনশ্চ নিম্নোদ্ধৃত ঋকের অনুবাদ পাঠ করুন ঃ—

বিস্তীর্ণা ও মহতী ও পরস্পর বিযুক্তা পিতা মাতা (দ্যাবা-পৃথিবী) ভূত সমূহকে রক্ষা করিতেছেন। দ্যাবা-পৃথিবী শরীরীদিগের মঙ্গলের জন্যই যেন সযত্না; কারণ পিতা সমুদয় পদার্থকে রূপ প্রদান করিতেছেন।" (ঋগ্বেদে ১।১৬০।২)।

হরগৌরীর শিব ও শিবা নাম কেন হইল, তাহা পাঠকবর্গ এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন।

পুনশ্চ নিম্নোদ্ধৃত ঋকের অনুবাদটি পাঠ করুণ ঃ—

"স্বর্গ আমার পিতা; যজ্ঞস্থান আমার বন্ধু; বিস্তীর্ণা পৃথিবী আমার মাতা। উত্তান পাত্রদ্বয়ের মধ্যে যোনি আছে; তথায় পিতা গর্ভ উৎপাদন করেন।" (ঋগ্বেদ ১।১৬৪ ৩৩)।

লিঙ্গপূজা আর্য্যপ্রথা কি না, এবং লিঙ্গপূজার অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা না করিলেও চলে। ঋগ্বেদেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-প্রথার বীজ নিহিত আছে। জগতের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, তাহাই বেদে প্রকটিত। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সেই সত্যকে দর্শন করিয়া নানা ভাবে ও নানা উপমা দ্বারা তাহা প্রচারিত করিয়াছেন। এই দ্যাবা-পৃথিবীই ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তির স্থূল প্রকাশ, তাহা বুদ্ধিমানগণ হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

ঋগ্বেদে আদিত্য বা সূর্য্যকে দ্যাবা-পৃথিবীর সন্তান বলা হইয়াছে। যথা ঃ— ''আদিত্য পিতামাতাস্বরূপ দ্যাবা-পৃথিবীর পুত্র।" (ঋগ্বেদ ১।১৬০।৩)।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। পরে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি বা মায়ার পারস্পরিক সংযোগ হইবেক, জ্যোতির্ম্ময় দেবগণের মধ্যে পরম জ্যোতির্ম্ময় আদিত্যই শ্রেষ্ঠ। এই কারণে "দ্যাবা-পৃথিবীর পুত্র" অর্থাৎ শিব ও শক্তির কুমার (স্কন্দ) দেব সেনাপতি; এবং ইনিই অন্ধকাররূপ অসুর বিনাশ করিয়া আদিত্য বা সূর্য্যরূপে প্রকটিত। এই সূর্য্যই সবিতা, এবং ইনিই কাল ও কার্য্য ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। (সন্ধ্যোপাসনার মন্ত্রগুলি পাঠ করুন)। যিনি আদিত্য, তিনিই অগ্নি। যথা ঃ—

''অগ্নি অসৎও বটেন, সৎও বটেন। তিনি পরমধামে আছেন। তিনি

আকাশের উপরে সূর্য্যরূপে জন্মিয়াছেন। অগ্নিই আমাদিগের অগ্রে জন্মিয়াছেন। তিনি যজ্ঞের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের উভয়রূপী।" * (ঋগ্বেদ ১০।৫।৭)।

এই অগ্নির উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের অন্যত্র এইরূপ উক্তি আছে ঃ—

''দুই অরণি যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ; তাহাদিগের কার্য্য অতি আশ্চর্য্য। তাহারা একত্র হইল এবং যথাসময়ে অগ্নিরূপী বালককে জন্মদান করিয়া লালন পালন করিল। (ঋগ্বেদ ১০।৫।৩)

পূর্ব্বে দ্যাবা-পৃথিবী সূর্য্যের জন্মদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পরে সূর্য্য ও অগ্নি অভিন্ন বলিয়া উক্ত হইলেন। অগ্নির জন্মদাতা হইলেন। দুইটি মিলিত অরণি। এই কারণে দ্যাবা-পৃথিবী, অর্থাৎ বিশ্বপিতা ও বিশ্বমাতা, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি বা লিঙ্গ ও যোনি অথবা পরস্পর মিলিত দুইটী অরণি-কাষ্ঠ (খৃষ্টিয়ানগণের, ক্রস + বা Crux Ansata) বিশ্বসৃষ্টির সাঙ্কেতিক কারণরূপে পরিগণিত হইত এবং এই সঙ্কেত জগতে এরূপ পূজ্য ও পবিত্র হইল। দুই প্রস্তরের পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারাও অগ্নির (ব্রহ্মা বা সৃষ্টিকর্ত্তার) উৎপত্তি হয়। এই কারণে প্রস্তররূপী লিঙ্গ ও যোনি (বেদী বা গৌরীপট্ট) বিশ্ব-সৃষ্টির তথা বিশ্বেশ্বর ও মহামায়ার সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে ভারতে সম্পূজিত হইতেছেন। এই পূজা কালক্রমে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি, এই পূজার উৎপত্তিস্থল পবিত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র ইহা জুগুপ্সিত আকার ধারণ করিয়াছিল। কেবল খৃষ্টীয়ানেরা ক্রসের নিদর্শন দ্বারা এখনও এই মহান্ তত্ত্বের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ইহার যে অর্থ করেন, তাহাতে উক্ত মহান্ তত্ত্বটি সূচিত হয় না। প্রবন্ধান্তরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস।

---

* ঋগ্বেদে অগ্নির অপর নাম রুদ্র। রুদ্র পুরাণে শিব নামে পরিচিত। অগ্নি "বৃষ বটেন, গাভীও বটেন"—ইহার অর্থ এই যে, তিনি স্ত্রী পুরুষ ও উভয় রূপী, অর্থাৎ "অর্দ্ধ নারীশ্বর।" বৃষ কেন শিবের বাহন হইয়াছেন; এবং গো বা গাভী কেন ভগবতীরূপে পূজিত হইতেছেন, তাহার কারণ উদ্ধৃত ঋকের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। লেখক

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাদ্রমাস। ভাগীরথী পূর্ণ কলেবরা হইয়া দুই কুল প্লাবিত করিয়া নদী-গর্ভস্থ নৌকাগুলিকে ঈষৎ দোলাইয়া উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত। অপূর্ব্ব প্রস্তর নির্ম্মিত আকাশ-চুম্বি হর্ম্ম্যরাজি গঙ্গার বাম পার্শ্বে শোভা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। পুণ্য সলিলা নদীর তরঙ্গগুলি মন্দ মন্দ বায়ু সংস্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালা সৃজন করিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানে আঘাত করিতেছে। সৌধ চূড়াগুলি অরুণোদয়ে বালার্করাগে রঞ্জিত হইয়া যেন কলধৌত বলিয়া বোধ হইতেছে। উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ মালার উপর ঈষৎ অরুণরাগ পতিত হইয়া যেন স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বদিকে নানাবিধ বৃক্ষরাজি সূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত! ঘাটে নবীনা, প্রবীনা, সাধু, সন্ন্যাসী সকলেই স্নান করিতেছে। কেহ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া 'ব্যোম ব্যোম' শব্দে গগণভেদ করিতেছে; কেহ বা অঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করিয়া অঙ্গে ভগবানের নাম লিখিতেছে। কেহ মালাহস্তে ধ্যানে নিযুক্ত। দণ্ডী ঊর্দ্ধবাহু গিরিপুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসীর দল একে একে ঘাটে স্নান করিয়া উপরে যাইতেছে। কেহবা 'মাতর্গঙ্গে তব জল মহিমানিগমে খ্যাতঃ।" বলিয়া গঙ্গার স্তোত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণু পাদোদ্ভূতা সুরেশ্বরী হরপ্রিয়ার আরাধনা করিতেছে। সন্তরণপটু বালকগণ সন্তরণ দিয়া এ ঘাট হইতে ও ঘাটে যাতায়াত করিতেছে। সর্ব্বদাই জন সমাগম; কত লোক ঘাট হইতে উপরে যাইতেছে; কিন্তু পথিপার্শ্বে ঐ যে এক ব্যক্তি পড়িয়া 'একটু জল দাও' শব্দে চীৎকার করিতেছে, এ কথা কি কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। সকলেই ত' বেশ চলিয়া যাইতেছে! তাহার কাতর প্রার্থনা কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিল না। লোকটী পীড়াগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়, নতুবা ঘাটের এত নিকটে থাকিয়া জলের জন্য ব্যাকুল হইবে কেন? আর অত মাছি বা ছিন্ন বস্ত্রের উপর বসিবে কেন? নিকটে যাইতে লোকেরা নাসিকা কুঞ্চিত করিবে কেন? বোধ হয় তাহার অঙ্গে দুর্গন্ধ মল সংযুক্ত থাকিবে।

অনেকক্ষণ পরে একটী ব্রহ্মচারীর হৃদয় সে আকর্ষণ করিয়াছে। সন্ন্যাসী স্নান করিয়া এক কমণ্ডলুপূর্ণ জল লইয়া আশ্রমে যাইতেছেন; মুখে বলিতেছেন—

"নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী।"

সহসা সম্মুখে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া তাঁহার স্তোত্র বন্ধ হইয়া গেল। সাগ্রহে তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ অবস্থায় পড়িয়া কেন?"

সে কিছুই বলে না; কেবল বলিল—"একটু জল"!

সন্ন্যাসী কমণ্ডলুর জল তাহার মুখে দিলেন; তখন তাহার কথা বাহির হইল। সে বলিল,—"মহাশয় কাল রাত্রি হইতে কয়েকবার দাস্ত হওয়ায় আমি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি! জল পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় এই ঘাটে জল খাইব বলিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু এত দুর্ব্বল—যে পড়িয়া গেলাম, আর উঠিতে পারি নাই; তাই এইখানেই পড়িয়া আছি। কতলোক এইখান দিয়া চলিয়া গেল, কেহই একটু জল দিল না। আপনি আমার প্রাণ বাঁচাইলেন।"

সন্ন্যাসী বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, তাহার চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কালিমা পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"বমি হইয়াছে?"

সে ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কয়েকবার বমিও হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী। তোমার প্রস্রাব হইয়াছে?

লোকটী। প্রথমে একবার হইয়াছিল; কিন্তু শেষে আর হয় নাই।

সন্ন্যাসী। মল কি খুব পাত্‌লা হইয়াছিল?

লোকটী। হাঁ পাত্‌লা জলের মত—একটু শাদা।

সন্ন্যাসী বেশ বুঝিলেন যে ইহার 'কলেরা' হইয়াছে। বলিলেন—"তোমার হাত দেখি?"

লোকটী। না—না, আমাকে ছুঁইবেন না। আমার কাপড়ে ময়লা লাগিয়া আছে।

সন্ন্যাসী। সেজন্য 'তোমায় ভাবিতে হইবে না।' হাত দেখিয়া সন্ন্যাসী নাড়ী পাইলেন বটে, তবে বড় ক্ষীণ। যাহা হউক সন্ন্যাসী ইহার সুব্যবস্থা না করিয়া আশ্রমে যাইতে পারিলেন না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি থাক কোথায়?"

লোকটী বলিল—"থাকিব আর কোথায়! বাবা বিশ্বনাথের সীমানার মধ্যে—এখন যেখানে দেখিতেছেন—সেইখানে।

সন্ন্যাসী। তোমার কেহ আছে কি?

লোকটী। আজ্ঞে এই একখানা গামছা, আর ছেঁড়া একখানা কাপড় ছা
আর আমার সঙ্গে কিছুই নাই।

সন্ন্যাসী। সংসারে তোমার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব কেহ আছে কি ?

একটু চিন্তা করিয়া লোকটী বলিল—"হাঁা আছে. আমার স্ত্রী নাকি
এই কাশীতেই আছে।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন—"তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এরূপ পীড়িতা
বস্থায় একাকী এখানে কেন ?"

লোকটী হাঁসিয়া বলিল—"ঠিক—ঠিক! আমি ত' তা'কে ত্যাগ করে
ছিলাম ; কিন্তু এখন তা'কে ত' খুঁজে পাচ্ছি না!"

সন্ন্যাসী। তবে কি তা'কে খুঁজতে এসে এই অবস্থায় পড়েছ ?

লোকটী। প্রথমটা তাই বটে, তবে এখন আর তা নয়। এখন বাবার কৃপায়
বেশ বুঝেছি ও সব খোঁজাখুঁজি মিছে।

সন্ন্যাসী। তোমার স্ত্রীর কোন খবর পাওনি বোধ হয়।

লোকটী। খবর পাই নাই—পাবার চেষ্টাও নাই। এখন বেশ দেখতে
পাচ্ছি যে, ভগবান তা'কে ঠিক আশ্রয় দিয়েছেন। দেখুন আমি কত লোককে
'জল—জল' বলে চীৎকার কল্লেম, কেউ দিলে না—শেষে চুপ করে রইলেম;
আর আপনি এসে পড়লেন।

সন্ন্যাসী। যাক্ এখন সে সব কথা। তোমাকে আমাদের আশ্রমে লইয়া
যাই, সেখানে সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ হইলে, যেথানে ইচ্ছা চলিয়া যাইও।

লোকটি। আমি এখানেই বেশ আছি! সম্মুখে ঐ যে ভাগীরথীর
পূতধারা—ঐ যে বিশ্বেশ্বরের মন্দির! আমার জীবনও বোধ হয় শেষ হয়ে
এসেছে! আর কেন—বেশ নিশ্চিন্ত মনে আনন্দ সহকারে চল্লেম! কিন্তু—

সন্ন্যাসী। কিন্তু কি—তোমার মৃত্যু লক্ষণ কিছুই দেখা যাইতেছে না; আর
তোমাকে বেশ বিবেক সম্পন্ন দেখছি!

লোকটী। ওহো ঠাকুর! ভুল বল্লেন—ভুল বল্লেন! আমি যে সব পাপ করেছি,
তার তালিকা তৈয়ার কল্লে খুব বড় হয়ে পড়বে! তবে এখন কোন কষ্ট নাই;
কেবল ঐ পাপের কথাগুলো মনে মনে জেগে উঠে,তখন বড় জ্বালাতন হয়ে পড়ি।

সন্ন্যাসী। বেশ কথা এখন তোমার সঙ্গে বচসা কর্ত্তে ইচ্ছে নাই ;—চল
তোমায় নিয়ে যাই ; তুমি নিশ্চয়ই আরোগ্য হবে।

লোকটী। আমার এখন সব জায়গায় সমান! লোকের দয়ার উপর আমার

জীবন নির্ভর। আপনি দয়া করে নিয়ে যান ভালই ; কিন্তু উঠ্‌বার যে
শক্তি নাই।

সন্ন্যাসী। সেজন্য তোমার চিন্তা নাই ; আমি তোমাকে কোলে ক'রে নিয়ে
যাব। ঐ দেখ আমাদের আশ্রম দেখা যাচ্ছে।

তখন তিনি একজনকে ডাকিলেন ; এবং স্বহস্তে তাহার বমি ও বিষ্ঠা
পরিষ্কার করিয়া দুইজনে তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন।

আশ্রমে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে অবাক্। অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার
জন্য ধৌত বস্ত্র আনীত হইল ; অতি সুন্দর পরিষ্কার বিছানা। তৎক্ষণাৎ ঔষধের
ব্যবস্থা ও একটী নবীন সন্ন্যাসী তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। সে যেন তাহাদের
একান্ত আপন! লোকটী মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল ও হাসিয়া
ফেলিল।

পরিচর্য্যাকারী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাসিতেছেন কেন"? আগন্তুক বলিল—
"আমার হাসির একটু কারণ আছে। আমি মহাপাপী,—কোথায় পূতিগন্ধময়
নরক আমার জন্য নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা না হইয়া ভুলক্রমে স্বর্গে আসিয়া
পৌঁছিয়াছি ;—সেই জন্য হাসি পাইতেছে"।

পরিচর্য্যাকারী বলিলেন—"আপনি এখন কথা বলিবেন না ; এখন কথা
বলা নিষেধ।" পাঠক বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন যে, ইনিই আমাদের পূর্ব্ব-
পরিচিত উমাপদ ব্রহ্মচারী। এইটীই ইঁহার প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রম।

যাহা হউক তাঁহাদের যত্ন ও শুশ্রূষায় সে ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিল। কিছুদিন
তথায় অবস্থান করার পর লোকটী ভাবিল যে, 'এখন ইহাদের এখানে থাকিয়া
অনর্থক কষ্ট দিই কেন।' তা'ই কৃতজ্ঞতার আবেগে সে উমাপদ ব্রহ্মচারীর নিকট
গমন করিল। উপস্থিত হইবামাত্র সন্ন্যাসী বলিলেন,—"কেমন, এখন বেশ সুস্থ
বোধ হইতেছে ত' ?" "আজ্ঞে হাঁা, আপনার কৃপায় এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম ;
আর একবার এক সন্ন্যাসীর কৃপায় বাঁচিয়া গিয়াছি। যাহা হউক আপনি যে
বিরাট ব্যাপার করিয়াছেন, তাহাতে যে জগতের কতদূর উপকার হইতেছে,
তাহা আর কি বলিব ? আপনি ধন্য!"

"আমায় ধন্যবাদ দিবার প্রয়োজন নাই ; সকলি মায়ের ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী তারার-
ইচ্ছায় জগত চালিত। লোকে মিছে 'আমি করি' রবে মত্ত হয় মাত্র।"

"তবুও নিমিত্ত হওয়া চাই। মা ত' নিজের হাতে করেন না!"

"কে বলিল তিনি নিজের হাতে করেন না ? তিনি যে, —"সর্ব্বতঃ পাণি

পাদং সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং”—মায়ের হাত সর্ব্বত্র—তিনিই কার্য্য করিতেছেন। যেদিন যে কার্য্যের শেষ করা আবশ্যক হইবে, সেদিন অমনি হাত গুটাইয়া লইবেন। আমরাও তখন আর এ কার্য্যে ব্রতী থাকিব না। আমরা ত’ যন্ত্র; যন্ত্রী না বাজাইলে যন্ত্র বাজিবে না। ভাই, ক্ষমা করিও! এতদিন তোমার নাম জিজ্ঞাসা করা হয় নাই—তোমার নাম কি ভাই?

“আমার নাম নবকুমার দেবশর্ম্মা। কিন্তু আমি কেবল বংশগত ব্রাহ্মণ—কার্য্যতঃ কিন্তু অতি নীচ প্রকৃতির—মহাপাপী—অতি জঘন্য!

ব্রহ্মচারী। তুমি ওসব কথা বল্‌ছ কেন? তোমার কথায় বোধ হয় যে তুমি জীবনে কোনরূপ গুরুতর বেদনা পাইয়াছ;—সেদিনও ঐরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলে। তোমার নিবাস কোথায়?

নবকুমার। আমার নিবাস বীরভূম জেলার একটী পল্লীগ্রামে।

ব্রহ্মচারী! গ্রামের নাম।

নবকুমার। গ্রামের নাম বনগ্রাম।

ব্রহ্মচারী। দেশে তোমার কে কে আছে।

নবকুমার। আজ্ঞে কেহই নাই।

ব্রহ্মচারী। সেদিন বল্লে যে তোমার স্ত্রী এইখানেই আছে। তা’র নাম বল্লে খোঁজ ক’রে দেখা যেতে পারে। আমাদের ত’ লোকের অভাব নেই।

নবকুমার। বোধ হয় আমার স্ত্রী বাঁচিয়া নাই। আমি কাশী এসে অনেক অনুসন্ধান কল্লেম, কিন্তু কোন সন্ধান কর্ত্তে পারি নাই। তবে রাস্তায় কোথাও কোথাও জান্‌তে পেরেছি যে সে এই কাশীধামে এসেছে।

ব্রহ্মচারী। যদি এখানে এসে থাকে, তবে তুমি খোঁজ নাও পেতে পার। কারণ স্ত্রীলোক হয়ত কোন ভদ্রঘরে আশ্রয় নিয়েছে। সে যাহোক তুমি এমন মলিন মুখে বসে রইলে কেন?

নবকুমার নীরব, কোন কথা বলিল না; একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। ব্রহ্মচারী তখন সান্ত্বনাবাক্যে বলিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই, যাহা হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া কোন লাভ নাই। আমাদের এই আশ্রমের সেবকদিগকে অদ্যই একথা জানাইয়া দিব। তাহারা সমস্ত কাশী অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে।

নবকুমার এই দেবতুল্য আশ্রয়দাতার বাক্যে হৃদয়ে যে কি আনন্দ অনুভব করিল—কথায় তাহা প্রকাশ করিতে না পারিয়া প্রাণের আবেগে বলিল,—

“আপনি সন্ন্যাসী—নারায়ণ! আমার কথা একটু শুনুন—আপনি আমার কথা একটু শুনুন। আমি অতি হতভাগ্য! বাল্যকালেই পিতৃহীন,—অভিভাবক অভাবে কুসঙ্গে পড়িয়া নানাবিধ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হই। আমার পাপের কথা শুনিলেও পাপ!”

ব্রহ্মচারী। তোমার গভীর অনুতাপে সে পাপ অনেকটা ধ্বংস হইয়াছে।

নবকুমার। না—না, আমার এখনও বলা হয় নাই। আমার স্বগ্রামে একটী রূপবতী কামিনীর পানি গ্রহণে আমি উন্মত্ত হইয়া পড়ি; পরে সেই স্ত্রীলোকটী বিধবা হইলে প্রকারান্তরে তাহাকে ঘরের বাহির করি, সেইদিন হইতে চির প্রবাসী—পরান্নদাস—ভিক্ষায় জীবন নির্ব্বাহ।

ব্রহ্মচারী। অবশ্য কর্ম্মের ফল মানুষকে কোন না কোন সময়ে ভোগ করিতে হইবেই হইবে; তবে এ পাপ অতি উৎকট বলিয়া এত শীঘ্র তোমায় ফল ভোগ করিতে হইয়াছে। এখন যখন অনুতাপ হইয়াছে, তখন তোমার চিত্ত-শুদ্ধির বিলম্ব নাই। তবে সে স্ত্রীলোকটীকে পরিত্যাগ করিলে কেন?

নবকুমার। আমি পরিত্যাগ করিব কেন! সে সতী রমণী আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না;—আমি কেবল পুড়িয়া মরিলাম!

ব্রহ্মচার্য্য। তবে এ পাপ গুরুতর আকার ধারণ করে নাই; এ ভোগাশা কেবল প্রবৃত্তি জনিত; শীঘ্রই ইহা শেষ হইবে। এখনও তাহাকে পাইবার আশা রাখ?

নবকুমার। না—না, এখন তাহাকে আমি মাতৃজ্ঞানে পূজা করি। আমি এক মহাত্মার উপদেশে এখন সে ভাব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহার কথামত বাটী গিয়াছিলাম; গিয়া দেখিলাম আমার বৃদ্ধা মাতা মারা গিয়াছেন,—স্ত্রীটী আমার অনুসন্ধানে কাশী যাত্রা করিয়াছে; তাই আমিও কাশী আসিলাম। অনেক দিন খুঁজিলাম, তারপর ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া আপনার সঙ্গলাভ। অবশ্য এখন হৃদয়ে অনেক শান্তি পাইয়াছি। প্রার্থনা করি পরজন্মে সেই স্ত্রীকে পুনরায় পাইয়া আমার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করি।

ব্রহ্মচারী। তোমার চিত্ত অনেক সবল হইয়াছে। তুমি এই আশ্রমে সেবাকার্য্যে মন দাও—তোমার চিত্ত জীবের সেবায় সংযুক্ত করিলে, তুমি হৃদয়ে শান্তি পাইবে। আর যদি তাহাতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে এই সেবাশ্রমের কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হও। তোমার অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা তোমার স্ত্রীর নাম কি এবং সেই স্ত্রীলোকটীরই বা সংবাদ কি?

নবকুমার। আমার স্ত্রীর নাম বিনোদিনী এবং সেই স্ত্রীলোকটীর নাম হেমলতা। তাঁহার সংবাদ কিছুই অবগত নহি। তাঁহার মুখে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি আমি দেখিতে পাই, তাহাতেই আমি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ি; সেও কোথায় চলিয়া যায়। আর কোন সংবাদ পাই নাই।

ব্রহ্মচারী। তাহার স্বামীর নাম তোমার জানা আছে কি?

নবকুমার। তাঁহার স্বামীর নাম নির্ম্মলকুমার। তিনি ধনীর সন্তান; তাঁহার পিতার নাম বীরেন্দ্র বাবু। বাটী ঐ জেলায় প্রায় ১২।১৪ ক্রোশ দূরে হইবে।

ব্রহ্মচারী। তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ও তোমার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমার বেশ মনে হইতেছে যে, তোমার চিত্ত এখন বেশ নির্ম্মল হইয়াছে। তুমি আমার কথা শোন। এই সেবাশ্রম হইতে যাইও না। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, চেষ্টা করিলে শীঘ্রই তোমার হৃদয়স্থ লুপ্তপ্রায় ধর্ম্ম-বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে। তুমি বলিয়াছ যে, একবার এক সন্ন্যাসীর দ্বারা তোমার জীবন রক্ষিত হইয়াছে, এবং তাঁহার অনুগ্রহে ভ্রান্তি ঘুচিয়াছে। এ অবস্থায় তুমি সেবা কার্য্যে মন দিলে, নিশ্চয়ই ভগবান তোমায় কৃপা করিবেন সন্দেহ নাই।

নবকুমার। এমন সৌভাগ্য কি আমার হইবে। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য! আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; আমায় যাহা আদেশ করিবেন, তাই সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালনের চেষ্টা করিব। তবে আপনার নিকট হইতে দূরে না যাইতে হইলেই ভাল হয়। এমন সময়ে মন্দিরের বাহিরে—"জয় কালী মায়ীকী জয়"—"জয় কাশী বিশ্বনাথজী কি জয়" ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। কয়েক জন ব্রহ্মচারী ভিতরে প্রবেশ করিয়া মায়ের সম্মুখে প্রণামান্তর উমাপদ ব্রহ্মচারীর সন্নিকটে গমন করিয়া প্রণাম করিতেই—ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কি ভাই কালীপদ! সংবাদ কি বল।"

কালীপদ। "সংবাদ আর নূতন কি বলিব দাদা—গ্রাম ত' উৎসন্ন প্রায়! সর্ব্বত্রই মায়ের সংহার মূর্ত্তি! তবে অন্যভাবে এ সকল গ্রামে একটীরও মৃত্যু হয় নাই,—কেবল প্লেগ রোগেই মৃত্যু। অবশ্য অনেক লোক রক্ষা পাইয়াছে: সকলি মায়ের ইচ্ছা।

উমাপদ। তোমরা সকলেই কুশলে ফিরিয়াছ ত'—তোমাদের আরো দুই একজন সহগামীদিগকে দেখ্‌ছি না কেন?

কালীপদ। না দাদা, তাহারা কয়েকজন এখনও আসে নাই। একটী স্ত্রীলোকের সন্ধানে তাহারা গিয়াছে। কল্যাণপুর গ্রামে অবস্থান কালীন একটী

সেবিকা ব্রহ্মচারিণী—কিন্তু বিবাহিতা, আমাদিগকে সংবাদ দেয় যে, একটী স্ত্রীলোক নিকটেই মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া আছে। সংবাদ পাইবামাত্র আমরা তাহাকে লইয়া আসি। সেবা শুশ্রূষায় সে কথঞ্চিৎ আরোগ্য হয় এবং অন্ন পথ্য করার পর সেই সেবিকা সে স্থান হইতে চলিয়া যান। সেই স্ত্রীলোকটীও আমাদিগকে সংবাদ না দিয়া পলায়ন করে। কিন্তু সে অবস্থায় তাহার যাওয়া ভাল হয় নাই; এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় পুনরায় বিপদ আশঙ্কায় ঐ দুইজনকে প্রেরণ করি। কিন্তু তাহারা এখনও ফিরিল না। আমার আর কোন কার্য্য অবশিষ্ট না থাকায় চলিয়া আসিলাম।

উমাপদ। সেবিকাটী কে, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর নাই?

কালীপদ। জিজ্ঞাসা করি নাই এমন নয়, তবে বিশেষ সদুত্তর পাই নাই।

কালীপদ। এই সেবাকার্য্যে গিয়া যে কি আনন্দ পাইলাম, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। দাদা যখন এই কার্য্যে যাইলাম, তখন প্রথমে বড় ভয় হয়েছিল। প্লেগের সংক্রামকতা স্মরণ করিয়া মনে মনে কি এক শঙ্কা উপস্থিত হ'ত। মনে হ'ত, পরের জন্য বুঝি প্রাণটা যায়, কিন্তু কি বল্‌ব, শেষে দেখলেম্ যে সকলেই আমার আপন—ভাই ভগ্নী। তখন কিসের শঙ্কা—কিসের ভয়! থাক্ দাদা—যে জ্ঞান ভিতরে ফুটেছে, বোধ হয় শত জন্ম তপস্যা দ্বারা তাহা হয় কি না জানি না।

উমাপদ। আচ্ছা সেই স্ত্রীলোকটী ঐরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় একাকী গেল কেন?

কালীপদ। একাকী গেল কেন? তার একটু কারণ আছে। তার স্বামী কাশীতে আছে; তাহার স্বামীর কাছে যাবার জন্য সে খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল। আমরা তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব বলেছিলাম; তবুও শুন্‌লে না। এতটা দূর এসে নিশ্চয়ই ব্যারাম হ'য়ে পড়্‌বে।

নবকুমার এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল;—এই ঘটনাটী শুনিয়া সে বলিল,—"ঠাকুর! তাহার নাম জানেন কি?"

কালীপদ। "তাহার নাম বিনোদিনী"

নবকুমার। "সেই বটে ঠাকুর।—সেই বটে"; বলিয়া নবকুমার কাঁদিয়া ফেলিল।

কালীপদ। আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? সে কাশী থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে আনিয়া দিব।

নবকুমার। কি বলিব ঠাকুর! এতদিন আমি কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করিয়াছি—আমার... ... ...

উমাপদ! দেখ ভাই, ভগবানের সংঘটন। উতলা হইও না—মায়ের ইচ্ছায় সে সতীর সহিত তোমার পুনরায় দেখা হইবে। ব্যস্ত হইও না।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সুখ-দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণার ঘাত প্রতিঘাতে মানবের বিষয়াসক্ত চিত্ত কখন কখন এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে, যে তখন চিত্ত আর ভোগ-বিয়োগ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। প্রাণ আকুল হইয়া কি জানি কোন অনাস্বাদিত অব্যক্ত সুখের আশায় এতদিনের আকর্ষণীয় বস্তুকে জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। বীরেন্দ্র বাবুরও সেই অবস্থা; তিনি আজীবন বিষয়কে বরণ করিয়া তাহাকেই সার সর্ব্বস্ব মনে করিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন। কাশীতে আসিয়াও বিষয় সেবা পরিত্যাগ করিয়াও কামনার হাত হইতে এড়াইতে পারেন নাই; তাহার প্রায়ই মনে হইত, এত দিন তাহার কত সম্পত্তি বেদখল হইয়া গেল - কত জমি কম হারে বিলি হইল; তিনি তথায় থাকিলে হয়ত' কত উন্নতি সাধিত হইত। বাস্তবিক বিষয় ছাড়িলেই কামনার হাত এড়ান যায় না। এমন মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে আসিয়া বীরেন্দ্র বাবুর এ চিন্তা কেন? তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তনের কথা পাঠক অবগত আছেন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি সেবাশ্রমের জন্য দান করিয়া এখন বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাল যাপন করিতেছেন। উমাপদ ব্রহ্মচারীর উপদেশে এবং ব্যবহার সন্দর্শনে মা কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণার কথা তাহার হৃদয়ে ফুটিয়াছে। তা'ই তিনি তাহার পত্নীর সহিত অপরাহ্ণে বসিয়া পরমার্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"দেখ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এই ব্রহ্মচারীর সহিত সম্বন্ধ! তাঁহার কৃপাতেই বুঝিলাম যে এতদিন ঠিক রাস্তাতে চলি নাই। যাঁহার স্তন্য পানে বর্দ্ধিত, যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমরা বর্ত্তমান, সেই জগজ্জননীর কথা ভুলিয়া গিয়া কি ভুলই করিতেছিলাম! এতদিন সেই মাকে ভুলিয়া গিয়া কেবল হাসিলাম কাঁদিলাম, খেলিলাম, বেড়াইলাম, মায়ায় মজিলাম; মহামায়ার দিকে তাকাইলাম না।

রাস্তা দিয়া কত জন কত রকম বেশ ধরিয়া—নানা সাজে সাজিয়া চলিয়া যাইতেছে; সেই সঙ্গে একটী লাবণ্যময়ী রমণীও পথ আলো করিয়া চলিয়া যাইতেছে। গৈরিক বসনপরিহিতা ত্রিশূলধারিণীর অপূর্ব্ব ছটা যেন বীরেন্দ্র

বাবুকে মুগ্ধ করিল। পূর্ব্বে হয়ত এরূপ রমণী চক্ষে পড়িলেও ভিক্ষুক ভিন্ন অন্য ভাব মনে আসিত না; কিন্তু চিত্তের গতি যখন এইরূপ, মন যখন ভগবদ্ অভিমুখী, বিষয়-বাসনা যখন অন্তর্হিত, বৈরাগ্য যখন হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তখন সেই সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, যেন কৈলাসবাসিনীর কোন সহচরী জীবের কল্যাণ কল্পে আজ কাশীর পথে প্রকট মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা! সেই দিব্যরূপ ভস্মে কথঞ্চিৎ আবৃত হইলেও তাহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে যেন স্বর্গীয় তান ধ্বনিত হইতেছে। সন্ন্যাসিনী গাহিতেছেন—

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তে পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ, তথাপি নমুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।
অগ্রে বহ্নি পৃষ্ঠে ভানু, রাত্রৌ চুবুকসমর্পিত জানুঃ।
করতল ভিক্ষা তরুতল বাস, তদপি নমুঞ্চত্যাশাপাশঃ।

গান শুনিয়া বীরেন্দ্র বাবুর মনে ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। "বাস্তবিক দিনের পর দিন চলিয়া গেল, কিন্তু আশার নিবৃত্তি কোথায়! হায়! হায়! কি লইয়া এতদিন সময় নষ্ট করিলাম! আশার চাদরে মুখ ঢাকা দিয়া, কামনা স্বরূপা কামিনীকে বাহু পাশে বেষ্টন করিয়া কি নিদ্রাই গিয়াছিলাম! আপনাকে ভুলিয়া কি ভ্রান্তিই করিয়াছি! সময় ত' একেবারে চলিয়া গেল, এ ঘুম ত' কেহই ভাঙ্গাইতে পারে নাই!" বীরেন্দ্র বাবু এই ভাব-নিবহের মধ্যে যেন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গানর ইঙ্গিত দেখিতে পাইলেন। যেন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গানর জন্য মহামায়া আজ তাঁহার সহচরীকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ছাদের উপর হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া করযোড়ে বলিলেন,—

'মা! তোমার সুমধুর গীতে বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছি! বল মা, একটু স্থির হইয়া দাঁড়া মা! তোমার বীণা নিন্দিত কণ্ঠে এই সুমধুর শঙ্কর বাণী আমার প্রাণে যে কি অমৃত-স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, তোকে আর কি বলিব!

সন্ন্যাসিনী গাহিতে লাগিলেন,—

যাবৎ বিত্তোপার্জ্জন সক্তঃ, তাবন্নিজ পরিবারোরক্ত।
তদনু জরয়া জর্জ্জিত দেহে, বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোপিনগেহে॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশন বিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং, তথাপি নমুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডং॥

বীরেন্দ্র। "ঠিক কথা মা! আশা এমনই কুহকিনী বটে! আমি এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রহারা! বংশহীন অবস্থায় বহু সম্পত্তির বন্দোবস্তে এবং চিন্তায় কাল

কাটাইলাম! কাহার জন্য—কাহার জন্য! জীবনের অমূল্য সময় ভগবানের দিকে না চাহিয়া কি করিলাম! আশা—কুহকিনী আশা! বল্ মা, আবার বল—তোর সুমধুর কণ্ঠে আবার বল! সন্ন্যাসিনী গাহিলেন,—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত, স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্ত।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন, পরমে ব্রহ্মণি কৌপিন লগ্ন।
কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ, কা তে জননী কো বা তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্ব্ব সংসারং, বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্ন বিচারং॥

বীরেন্দ্র বাবু মনে মনে বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসিনীর কথায় কি অদ্ভুত ভাবের বিকাশ! আজ কি এক দৈবী শক্তির সমাবেশ! নতুবা এই কথা অনেক দিন শুনিয়াছি, কৈ প্রাণে ত' একদিনও ইহার আভাস জাগে নাই! কৈ এক দিনও ত' মনে হয় নাই—'আমি কে?' 'কোথা হইতে আসিলাম—আবার কোথায় যাইব?' আজ যেন সহসা মনে আঘাত লাগিল, যেন মুদ্রিত চক্ষু কে বলপ্রয়োগে খুলিয়া দিল—বীরেন্দ্র বাবু আজ সংসার যেন নূতন ভাবে দেখিতে লাগিলেন, আর সর্ব্বদাই কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—

"পরমে ব্রহ্মণি কোপিন লগ্ন"

সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলেন! বীরেন্দ্র বাবু কিছু ভিক্ষা প্রদান করিলেন এবং পুনরায় এই পথে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনী ভিক্ষায় যাহা সংগ্রহ করেন, অন্ধ খঞ্জ বিকলাঙ্গ দেখিলেই তাহা বিতরণ করেন। সন্ন্যাসিনী ক্রমে কাশীতে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই; যেদিন যেখানে ঘটনাচক্রে অবস্থিতি ঘটিয়া উঠে, সেদিন সেইখানেই অতিবাহিত করেন। মাতৃভাবের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকেই তাহাকে "মাতাজী" আখ্যা প্রদান করিয়াছে। তিনি ক্রমে ঐ নামে পরিচিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কার্য্য ভদ্রগৃহের অন্তপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া তরুতলাশ্রয়ী রুগ্নদেহের পরিচর্য্যা পর্য্যন্ত প্রসারিত। তাঁহার সেবাধাম কাশীর আদর্শ হইয়া পড়িল। এতদ্ব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম জীবনের শিক্ষা বিষয়েও তিনি ক্রমে অনেক গৃহে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইলেন। যে তাঁহার সহিত ক্ষণিক আলাপ করিয়াছে, সেই তাঁহার কথায় মুগ্ধ ও ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ সুন্দর সামঞ্জস্য দর্শনে আশ্চর্য্য! বীরেন্দ্র যেদিনই তাহার দর্শন পাইতেন, সেইদিন তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে সেই গীত শুনিতেন,—"পরমে ব্রহ্মণি কোপিন লগ্নঃ।" (ক্রমশঃ)

জানা!

আমার এ মর্ম্মব্যথা বাজে কি
তোমার প্রাণে,
হে মোর বন্ধু হে!
আমার করুণ গাথা, লাগে কি
মরমে তব,
হে কৃপাসিন্ধু হে!
পশে কি তোমার শ্রবণে হে নাথ!
আমার কাতর বাণী।
আমায় শ্রবণে, পশে না তো তব
অভয় অমর বাণী॥
সারা দিনমান তব এ ভবনে,
খেলাতে মত্ত তোমাকে চাহিনে;
নমিনি কখন যুগল চরণে—
ভাবিনি তোমাকে কভু,
কবে যে হঠাৎ নিকটে আসিলে,
কবে যে হৃদয় পরশিয়া গেলে;
কখন গোপনে আমায় জাগালে,—
মনে ত' পড়ে না প্রভু!
নবীন আলোক ফুটিল ঊষার,
সচকিত আঁখি চাহে পানে কার;
কারে নাহি হেরি বহে অশ্রুধার,—
যুগল নয়ন-কোণে।
রাত্রি তখনো প্রভাত হয়নি,
তখন সকল বিহগ জাগেনি;
কুসুম তখন সবটি ফোটেনি—
নিবিড় কুঞ্জবনে॥
হেরিয়া কাহারে হইনু মুগ্ধ,
চিনিলাম না তো তারে।
কে আমার প্রাণ, করিল চেতন,
মধুর বাঁশরী সুরে!
হে মোর বন্ধু তুমি!
তোমার পরশ জাগাল কি মোয়
ঘুমের ঘোরে।—
বুঝিনি তখনো আমি॥
তোমার পরশে আছিল এ প্রাণ,
করে হাহাকার নিশা দিনমান;
কে কোথায় আছ, করুণানিদান,—
টানিয়া লহগো তারে।
অযোগ্যতা হ'তে মূর্খতা হ'তে,
শোক, ভয়, দুঃখ, দৈন্য, হইতে;
তোমার অশোক অভয় জ্ঞানেতে,—
ডুবায়ে লওগো মোরে।
তুমি যে আমার নিকটেই আছ—
অন্তর মাঝে।
হে মোর বন্ধু হে।
তোমার বাহুর বাঁধন-বেদন;
হৃদয়ে বাজে—
জানাও তা মোরে হে!

হিন্দুদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জীব ও ব্রহ্মের অভেদ।

অতঃপর আমরা জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদ আলোচনা করিয়াই অদ্বৈতবাদের উপসংহার করিব। শ্রুতির পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। ব্রহ্ম যেমন সৎ, চিৎ, আনন্দ-স্বরূপ এবং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, জীবও তেমনি সৎ, চিৎ, আনন্দময় এবং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও মাহেশ্বরী মায়ার প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া থাকে ; এবং নিজে অনন্ত আনন্দের আকর হইয়াও সামান্য সাংসারিক আনন্দ-বিন্দু লাভ-লালসায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। স্বয়ং নিত্য নির্ম্মুক্ত থাকিয়াও অজ্ঞানবশে আপনাকে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তির প্রত্যাশায় পরের দ্বারস্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবের বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই ; বন্ধ-মোক্ষ ব্যবহার কাল্পনিক মাত্র। অবিদ্যা-বশবর্ত্তী জীব অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চবিধ কোষ দ্বারা আবৃত হইয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধিতে বঞ্চিত থাকে। অধিকন্তু সেই পঞ্চবিধ কোষকেই আপনার স্বরূপ বা অভিন্ন পদার্থ মনে করিয়া তাহাদেরই অবস্থা বিশেষ দ্বারা আপনাকে সুখী, দুঃখী ও বদ্ধ বিবেচনা করিয়া কাতর হইয়া থাকে। বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়াছেন—

"মাহেশ্বরী তুয়া মায়া তস্যা নির্ম্মাণশক্তিবৎ।
বিদ্যতে মোহনশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ॥
ন নিরোধো নবোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্নবৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥" (গৌড়পাদ)

অদ্বৈত মতে বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের নাম জীব ; কিন্তু জীব আভাস হইলেও অণু নহে—মহান্। দর্পণের কম্পনে যেমন তৎ প্রতিফলিত মুখাদিরও কম্পন অনুভূত হয়, তেমনি বুদ্ধিনিষ্ঠ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মগুলিও জীবে আরোপিত হয়। দর্পণাপসারণে যেমন প্রতিবিম্বিত মুখখানির আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না,—প্রকৃত মুখাকারে পরিণত হয়, তেমনি বুদ্ধি-দর্পণের অপগমেও জীবের আর জীবত্ব থাকে না, মায়া-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মভাব পরিস্ফুরিত হয়। ইহাই অদ্বৈতবাদের অভিমত প্রকৃত মুক্তি। এইরূপ মুক্তি লাভ

রিতে হইলে, অগ্রে ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারের আবশ্যক হয়। রজ্জুর রজ্জুত্ব ত্যক্ষ না হইলে, যেমন শত চেষ্টায়ও সম্মুখস্থ ভ্রান্ত সর্প পলায়ন করেনা, তেমনি বের যতদিন অজ্ঞানাধিষ্ঠান ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার না হইবে, ততদিন কিছুতেই জ্ঞান-কল্পিত জীবভাব অপনীত হইবে না। এইজন্য শঙ্কর বলিয়াছেন—নই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, কর্ম্মাদি উপায়গুলি কেবল তাহার সাহায্য রে মাত্র।

জ্ঞান লাভের প্রধান উপায় তিনটী ;—তত্ত্বমস্যাপী মহাবাক্য শ্রবণ, তদ্বিষয়ে নন এবং তদর্থ নিদিধ্যাসন। আত্মতত্ত্ব শ্রবণের জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিকে সদ্গুরুর াশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, মনন বা উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা গুরুপদিষ্ট বিষয়ে সমুৎপন্ন ংসার-জাল ছিন্ন করিতে হয়। উপদিষ্ট বিষয় নিঃসন্দিগ্ধ ও মনঃপ্রিয় হইলে সহজে তদ্বিষয়ে অনুধ্যানের প্রবৃত্তি হয়। নিরন্তর নিদিধ্যানের ফলে বিজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব াপনা হইতেই করামলকবৎ প্রতিভাত হয়। সুবর্ণ সহযোগে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ীসক যেমন সুবর্ণ মল বিধ্বস্ত করিয়া, সুবর্ণকে বিমল বিশুদ্ধ করিয়া আপনি বিনষ্ট হইয়া যায়, তেমনি উপরি কথিত নিদিধ্যাসনরূপ বুদ্ধিবৃত্তিও জীবের অজ্ঞানাবরণ অপনীত করিয়া ব্রহ্মভাব উন্মেষিত করিয়া দেয় ; জীব তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যার্থ প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। পূজ্যপাদ গৌড়পাদ বলিয়াছেন,—

"অনাদিমায়য়াসুপ্তো যদা জীবং প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥"

অনাদিকাল হইতে মায়া নিদ্রায় অভিভূত জীব একবার প্রবোধিত হইলে, আপনি আপনার অদ্বৈত স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিতে থাকে। তখন আর ঔপাধিক দুঃখে অভিভূত হয় না। সুবর্ণ সহযোগে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত শীসক যেমন সুবর্ণ মল বিনষ্ট করিয়া, সুবর্ণকে প্রকৃত সুবর্ণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনি বিনষ্ট হইয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মাকারাকারির বুদ্ধিবৃত্তিও তখন আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া জীবের অব্রহ্ম-ভাব অপনীত করিয়া নিজে বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন ঘটভঙ্গে ঘটাকাশের ন্যায় বুদ্ধিরূপ-উপাধিনাশে জীবও ব্রহ্মাকাশে মিশিয়া যায়। স্বভাব-বিমুক্ত জীবও বিমুক্তি লাভ করে ; অশেষ শোক-তাপ সঙ্কুল অনর্থময় সংসারে আর ফিরিয়া আইসে না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ন স পুনরাবর্ত্ততে, বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।" ইহাই শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত।

অতঃপর আচার্য্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানময় কর্কশ কশাঘাতে বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধবিপ্লব বিদূরিত হইল সত্য, কিন্তু তাহাতেও ভক্ত ভাবুকের প্রাণ শীতল হইল না; তখনও ভক্তের হৃদয়-রত্ন, ভাবুকের কণ্ঠহার, প্রেমিকের প্রীতি-নিকেতন বিমল ভক্তিমার্গ অজ্ঞানের অন্ধকূপে নিহিত ছিল। তখনও বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক-মালা ভক্ত ভাবুকের হৃদয়-কন্দর সমুদ্ভাসিত করিতে পারে নাই। এমন সময়ে ভক্তের বাঞ্ছা কল্পতরু ভগবানের অমোঘ প্রেরণাবশেই চির-পিপাসু জীবগণকে বিমল ভক্তিরস বিতরণের নিমিত্ত, ভক্ত শ্রেষ্ঠ ভাবুক চূড়ামণি আচার্য্য রামানুজ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, তিনি সাক্ষাৎ অনন্তদেবের অবতার। সম্ভবতঃ ৯৭০ শকাব্দে কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাতে রামানুজাচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করেন, শঙ্করের ন্যায় রামানুজের বাল্যজীবনও অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক—বৈচিত্রময়। তিনি যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন; কিন্তু তিনি নামতঃ যাদবপ্রকাশ পণ্ডিতের শিষ্য হইলেও কার্য্যতঃ কাঞ্চীপূর্ণ নামক অপর একজন ভক্তের অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। কাঞ্চীপূর্ণই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন, কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের শৈশব-সুলভ কোমলতাময় হৃদয়-ক্ষেত্রে যে পবিত্র ভক্তি-বীজ বপন করিয়াছিলেন, কালে তাহাই মহান্ মহীরুহে পরিণত হইয়া শত শত নরনারীর সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তির শীতল ছায়া বিতরণ করিয়াছিল।

রামানুজের বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ।

রামানুজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইবেন, তখন তাঁহার মনে হইল যে, জ্ঞানগুরু শঙ্কর বিশুদ্ধ 'অদ্বৈতবাদ' প্রচার দেশে বৈদিক ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেও তাহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার হইতেছে না। বিশেষতঃ যাহারা ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ, তাহাদের পক্ষে ত' এ পথ অতীব দুর্গম এবং নিতান্ত অনুপাদেয়। তাই তিনি আলো ও অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তী উষারুণের ন্যায় দ্বৈত ও অদ্বৈতের মধ্যবর্ত্তী একটি বিচিত্র পথ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই পথের নাম 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'।

অনেকের ধারণা যে, আচার্য্য রামানুজই এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক ও ব্যবস্থাপক; বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের সে ধারণা ভিত্তিহীন। রামানুজের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্বেও ইহার অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে ঐ মতের পরিপোষক বহুতর কথা রহিয়াছে। ভগবান্ বোধায়ন ঋষি বহু পূর্ব্বে এই

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শনের উপর এক বিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এ কথা স্বয়ং রামানুজও স্বকৃত 'শ্রীভাষ্যের' প্রারম্ভে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সেই ব্যাখ্যাবলম্বনেই 'শ্রীভাষ্য' রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি সে কথা বলিতেও কিঞ্চিন্মাত্র সংস্কোচ বোধ করেন নাই। তাহার পর, উক্ত, গুহদেব ও দ্রবিড় প্রভৃতি আচার্য্যগণও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপর অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রামানুজ স্বীয় ভাষ্য মধ্যে তাহাদের কথা প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া আপনার সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। অধিকাকি রামানুজের পরম গুরু, (গুরুর গুরু); যামুন মুনিও এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুকূলে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তৎকৃত 'সিদ্ধিত্রয়' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এখনও প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে যে, রামানুজ সেই যামুন মুনির ইঙ্গিতানুসারেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, আচার্য্য শঙ্কর প্রধানতঃ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইয়া সমালোচনা পূর্ব্বক তাহাদের সিদ্ধান্ত সমূহ একে একে খণ্ডন করিয়াছিলেন; কিন্তু রামানুজকে সেরূপ কোনও বহিঃশত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই। তিনি আপনাদের মধ্যেই বিচার-মল্লতার প্রভূত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করকেই প্রবল প্রতিপক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ খণ্ডনেই অধিকাংশ শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন। এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

শঙ্কর বলিয়াছেন ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ এক অদ্বিতীয় ও নির্ব্বিশেষ। রামানুজ বলিলেন,—ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় সত্য, কিন্তু নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র স্বরূপ নহে। ব্রহ্ম সবিশেষ; আনন্দ ও চৈতন্যাদিই তাহার বিশেষ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। শঙ্কর বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নির্গুণ; রামানুজ বলিলেন—ব্রহ্ম নির্গুণ নহে—সগুণ; তিনি দয়া দাক্ষিণ্যাদি উৎকৃষ্ট গুণনিচয়ের আকর। শঙ্কর বলিয়াছেন—জীব ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব মাত্র; রামানুজ বলিলেন—জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্মেরই অংশ মাত্র। শঙ্কর বলিয়াছেন—জ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, তদ্ভিন্ন আর উপায় নাই। রামানুজ বলিলেন,—না, এ কথা সত্য নহে; ভক্তিলব্ধ ভগবৎ-প্রসাদার্থ মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়; জ্ঞান তাহার সহায় মাত্র। শঙ্কর বলিয়াছেন—জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই মুক্তি। রামানুজ বলিলেন,—না, ক্ষুদ্র অণুস্বরূপ জীব কখনই বিভু

ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ-লাভের চিন্তাও করিতে পারে না; তাহাতে তাহার অপরাধ হয়। শঙ্কর বলিয়াছেন,—এই জগৎ রজ্জুসর্পবৎ ব্রহ্ম বিবর্ত্তমাত্র; রামানুজ বলিলেন,—না এই জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর; সুতরাং জগৎ কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। ইত্যাদি কতিপয় বিষয় লইয়া রামানুচার্য্য শঙ্করের মত খণ্ডনে যত্নপর হইয়াছেন।

'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নাম হইতেই আমরা রামানুজের অভিমত সিদ্ধান্তের কতকটা আভাস পাইতে পারি। 'বিশিষ্টদ্বৈতবাদ' কথাটি তিনটি শব্দের সমবায়ে রচিত হইয়াছে—(১) 'বিশিষ্ট', (২) 'অদ্বৈত' (৩) বাদ। বিশিষ্ট অর্থ—স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বিশিষ্ট। 'অদ্বৈত' অর্থ—দ্বৈতের (ভেদের) অভাব—একত্ব। 'বাদ' অর্থ 'তত্ত্ব' নির্ণয়ানুকূল বিচার বা সিদ্ধান্ত। সুতরাং ইহার সমুদিত অর্থ—স্থূল-সূক্ষ্ম চেতনাচেতন-সমন্বিত ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব বা একত্বনির্ণায়ক সিদ্ধান্ত।

অভিপ্রায় এই যে, পরব্রহ্ম পরম পুরুষ নারায়ণ, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়, কোন কালেই চেতনাচেতনময় নিখিল পদার্থ বিরহিত হন না; পরন্তু তদ্বিশিষ্টই থাকেন, অথচ তাহা দ্বারাও তাঁহার অদ্বিতীয় ভাব বিনষ্ট হয় না। বিবিধ শাখা-প্রশাখাদি সমন্বিত বৃক্ষ ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা ও ফল পত্রাদি অবয়ব সমূহ আকৃতি প্রকৃতিতে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও যেমন তাহাদের সমষ্টিভূত অবয়বী বৃক্ষ কখনও ভিন্ন হয় না—একই থাকে; তেমনি ব্রহ্মের চেতনাচেতন অংশগুলি পরস্পর পৃথক্ হইলেও তৎসমষ্টিভূত অংশী ব্রহ্ম কখনও ভিন্ন বা দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হন না, তিনি এক অদ্বিতীয়ই থাকেন। চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগৎই তাঁহার শরীর, তিনি সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা শরীরী—'আত্মা'। শরীর দ্বারা যেমন শরীরীর ভেদ সিদ্ধ হয় না, তেমনি শরীর স্থানীয় চেতনাচেতনাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ দ্বারাও তাঁহার অদ্বৈত তত্ত্বের হানি হয় না। রামানুজ বলিয়াছেন—"তদানীং সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ সিদ্ধত্বেন বিশিষ্টস্যৈব অদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধম্।" এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করে বলিয়াই রামানুজের মতকে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ, অচিৎ, ও ঈশ্বর।

"ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ ত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ॥

অর্থাৎ পদার্থ তিনপ্রকার— (১) চিৎ, (২) অচিৎ, (৩) ঈশ্বর। এতদতিরিক্ত

কোন পদার্থ বা তত্ত্ব নাই, সমস্তই এই তিনের অন্তর্ভূত। জীবসমূহ চিৎ, দৃশ্য জড়বর্গ অচিৎ, আর পুরুষোত্তম নারায়ণ ঈশ্বর। এক হরিই এই চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে চিৎ জীবসমূহ ভোক্তা, অচিৎ জড় পদার্থ-সমূহ জীবের ভোগ্য, ঈশ্বর সকলের নিয়ামক এবং অন্তর্য্যামী। উক্ত তত্ত্বত্রয়ের মধ্যে ঈশ্বরই প্রধান তত্ত্ব; পরপুরুষ ভগবান্ পুরুষোত্তমই সেই ঈশ্বর পদবাচ্য। ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ নহে, সবিশেষ সগুণ, সচ্চিদানন্দময়; কখনই নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। আনন্দ ও চৈতন্যই তাঁহার সবিশেষ ভাব জ্ঞাপন করিতেছে। তিনি এক ও অসীম এবং কল্যাণময়, নিখিল গুণগণের আকর ও প্রাকৃত সত্ত্বাদি হেয়গুণ বিবর্জ্জিত পরম কল্যাণময়। মুনিগণও তাঁহার গুণের পরিগণনা করিয়া অন্ত পান না। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার কল্যাণময় গুণগণেরও প্রতিষেধ করেন নাই। পুরাণ শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতাগুণাঃ।
সগুণো নির্গুণো বিষ্ণু জ্ঞানগম্যোহ্যসৌ স্মৃতঃ॥
নহি তস্য গুণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈর্মুনিগণৈরপি।
বক্তুং শক্যা বিযুক্তস্য সত্ত্বাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ॥

অন্যত্র কথিত আছে যে—বাসুদেবঃ পরংব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ॥

নিখিল কল্যাণগুণময় ভগবান্ বাসুদেবই পরব্রহ্ম, তিনিই জীব নিবহের নিয়ামক, অন্তর্য্যামী ও মুক্তিদাতা; এবং এই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি' ইত্যাদি শ্রুতিও সেই ভগবান্ বাসুদেবকেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মের দুইটি অবস্থা—(১) কার্য্যবস্থা ও (২) কারণাবস্থা। যখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্থূল-সূক্ষ্ম চেতনাচেতনময় জগৎ তাঁহা হইতে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন নামরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাতেই অবস্থান করে, তাহা তাঁহার কার্য্যাবস্থা; তখনই তাঁহার দ্বৈতভাব সংঘটিত হয়। আর যখন কল্পান্তকালে স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎ সংহার পূর্ব্বক আপনাতে রক্ষা করেন, তাহাই তাঁহার কারণাবস্থা। এই কারণাবস্থা ব্রহ্মকেই শ্রুতিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে, আচার্য্য শঙ্কর যেরূপ

ব্রহ্মকে জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ এবং নিগুর্ণ নির্ব্বিশেষ বলিয়া স্বীকার করেন, রামানুজ সেরূপ স্বীকারে সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, গুণমাত্র। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানবান্ ও আনন্দবান্ বলিয়া ব্রহ্মের উল্লেখ রহিয়াছে; আর "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে কাম কর্ম্মাদির ন্যায় তাঁহার গন্ধরসাদি গুণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মের নিগুর্ণ ও নির্ব্বিশেষ ভাব অনুমোদন যোগ্য নহে।

রামানুজের মতে জীব সমূহ চেতন, কর্ম্মফলভোক্তা এবং অনন্ত অর্থাৎ প্রত্যেক দেহে পৃথক্ পৃথক্। দীপ্যমান অগ্নি হইতে যেরূপ শত সহস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতে অনন্ত জীব নির্গত হইয়াছে। উহারা ব্রহ্মেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইলেও, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং অত্যন্ত হীন। তাহার এই ন্যূনতা ও বিভাগ কস্মিন্ কালেও অপনীত হইবে না; চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। জ্ঞান, আনন্দ, শক্তি ও পরিমাণ সমস্তই তাহার অল্প। জীব মাত্রই কর্ম্ম-পরবশ, কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করে, আবার কর্ম্মশেষে চলিয়া যায়। কর্ম্মের মধ্যে ভগবদুপাসনাই তাহার প্রধান কর্ম্ম; উপাসনা অর্থে শুষ্ক জ্ঞান নহে,—ভগবানে দৃঢ় ভক্তি। তৈল-ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবর্ত্তিত ভগবানের অনুধ্যানই ভক্তির চরমাবস্থা। তাদৃশ ভক্তিযোগ দ্বারা লব্ধ ভগবৎ প্রসন্নতাই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়; কিন্তু ক্ষুদ্র ও ভৃত্য ভাবাপন্ন জীব কখনও জগৎপ্রভু পরমেশ্বরকে অহংভাবে অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' ভাবে চিন্তা করিতে পারে না; করিলে অত্যন্ত অপরাধী হয়। তাহার ফল পরমানন্দময় মুক্তি নহে,—দুঃসহ দুঃখ যাতনা ভোগ। অতএব জীব কখনও নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবে না। জীব মুক্তাবস্থায় যতই সমুন্নত হউক না কেন, কিছুতেই ব্রহ্ম-স্বরূপ হইবে না। তাঁহা হইতে পৃথক্ থাকিয়া নানা ভাবে পরমানন্দ উপভোগ করিবে মাত্র। ইহাই জীবের প্রকৃত শান্তির অবস্থা। উপাসনা পরিতুষ্ট ভগবান্ই জীবে সেই পরমানন্দ প্রদান করেন; তাহা পাইলে জীবকে আর সংসারে আসিতে হয় না,

"বাসুদেবোঽপি স্বংভক্তং সংপ্রাপ্যানন্দমক্ষয়ম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বীয়ং ধাম প্রযচ্ছতি॥

অর্থাৎ বাসুদেবও আপনার ভক্তকে পাইয়া পুনরাবৃত্তিরহিত অক্ষয় আনন্দময়

নিজের স্থান প্রদান করেন। জীব তখন সংসারের সমস্ত শোক তাপ অতিক্রম করিয়া পরমানন্দ উপভোগে কৃতার্থ হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন; তাহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না।

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

অর্থ]

বসন্তে কাতরা।

১।— ঘুচিল শীতের ক্লেশ, বসন্তের সমাবেশ,
শুকা'ল শিশির জল, রাঙ্গা মুকুতার ফল;
আর না হেরিগো সখি? তুষারে আঁধার ধরা,—
আর নাই "টুব্ টাব্, থেমেছে "নেহার, পড়া॥

২।— রাঙ্গা অশোকের গুচ্ছ, হাসিছে দোলায়ে পুচ্ছ,
বকুল আকুল হ'য়ে, ঝরিছে প্রভাতি বা'য়ে;
ঊষার লোহিত রাগে, পাতার আড়াল থেকে,—
না জানি পঞ্চমে পিক্, কি সুখে উঠিল ডেকে॥

৩।— শিলিমুখ গুঞ্জরিছে, কি সুখে ময়ূরী নাচে.
নগ্ন শুষ্ক তরুগণ, মুঞ্জরিল অগণন;
ধিক্ তোরে হে বসন্ত! এখন পড়েনি বাজ্।
বন হ'ল বৃন্দাবন আর কেন হেন সাজ?

৪।— "কালি" কালিন্দির কুলে, পোড়া অশোকের মুলে,
সর্ব্বনেশে জল-আনা, ফুরায়েছে আনাগোণা;
কি সুখে বলনা সখি হাসিছে বসন্তে ধরা.—
কি সুখে হাসিছে বিশ্ব, করিয়ে পাগল পারা॥

৫।— পথ চাওয়া সার হ'ল, সে ত' ফিরে নাহি এল,
সখি! তোর কথা শুনি, হারায়েছি গুণমণি;
যদি নাহি করিতাম, সেই "পোড়া" অভিমান?
বারেক মনেতে হ'লে, দুঃখেতে ফাটয়ে প্রাণ!

৬।— পুনঃ এল' হোরি খেলা, মধুর বাসন্তী লীলা,
এল পুনঃ বাসন্তীর, গন্ধবহ সুসমীর,
সব ফিরে এল শুধু, পিয়া ত' এলনা সখি।,
বলনা বলনা মোরে, কেমনে বাঁচিয়ে থাকি॥

৭।— সে যে সব ভুলে গেছে,
ফাগুণে ফাগুর খেলা,
আবির "লইয়া কালা"
সব ফিরে এল শুধু!
আর কিলো মনে আছে,
সে মধুর "দোললীলা"
শুদ্ধ হ'ত কামবারি।
নাই সেই বংশীধারী॥

৮।— হায় সখি! ছার এ প্রাণে,
আর কেন মিছে আশে,
যদি আসে, পীতবাসে,
যাবৎ না মুছাইবে
ধৈরয আর নহি মানে,
তাঁর জন্য থাকি বসে;
হেরিব না চক্ষু মেলি।
সে পীত নিচোল খুলি॥

শ্রীসারদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য]

জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি।

বেদাদি শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞাদির কাল নিরূপণ করাই জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজন। এজন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রকে বেদের অঙ্গ বলে। "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত উদিতে জুহোতি" ইত্যাদি বিধিবাক্যস্থ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সূর্য্যোদয় প্রভৃতি কাল জ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্র সাপেক্ষ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণের মধ্যে (প্রত্যক্ষানুমানোপমান শব্দাঃ প্রমাণানি ভবন্তি) শব্দ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা যাজাদি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা অবগত হওয়া যায় না। এজন্য যাজাদি কর্ম্ম বিধি বোধিত; (অজ্ঞাতার্থ জ্ঞাপকাব্দে ভাগোবিধিঃ) কিন্তু দর্শাদি কাল প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে; এজন্য উহা যাজের অঙ্গ। স্মৃতি নিবন্ধকার মহামতি রঘুনন্দন 'তিথিতত্ত্বে' লিখিয়াছেন,—

কর্ম্মা সন্নিহিতং নৈব বুদ্ধৌ বিপরিবর্ত্ততে।
শব্দাত্তু তদুপস্থানমুপাদেয়ে গুণো ভবেৎ॥

প্রমাণান্তরা সন্নিহিতং কর্ম্ম বুদ্ধৌ প্রথমঃ ন বিষয়ী ভবতি। প্রাথমিক শব্দ দেবতার্থ কর্ম্মণ উপস্থিতিরিতি উপাদেয়ে বিধেয়ে কর্ম্মণি পূজাদৌ চন্দ্রাদি ক্রিয়াত্বেন তদবচ্ছিন্ন কালত্বেন বা শুচি তৎকাল জীবিনঃ কর্ম্মাধিকারাৎ তস্মিন্ প্রমাণান্তর লভ্যাতে না বিধেয়ত্বাৎ তিথ্যাদিগুণ ইতি।

এই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের (যুক্তির) উপরেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। বেধাদি (অব্‌জারভেসন্) দ্বারা গ্রহগণের গতি প্রভৃতি নির্ণয় জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নলিকাদি নানা প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতেন এবং এইজন্যই কাশী প্রভৃতি নানা স্থানে মান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও যুক্তির

উপরে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত জন্যই পুরাণাদি শাস্ত্র বর্ণিত গ্রহগণের বিবরণ। যেগুলি যুক্তি ও প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য জ্যোতিষ সিদ্ধান্তকারগণ নিঃসঙ্কোচে যুক্তি প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ঋষিতুল্য ভক্তি-ভাজন মহাত্মা নল্লাচার্য্য স্বপ্রণীত শিষ্যধী-বৃদ্ধি নামক সিদ্ধান্ত গ্রন্থে মিথ্যা-জ্ঞানাধ্যায় নামক অধ্যায়ে পুরাণাদি বর্ণিত বহু মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থ হইতে কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

সংস্থানমশেষমীরিতং ব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তিনামিদং।
প্রতিবাদি বচাংসি শৃণ্বতো মনসি ভ্রান্তিরিবাবতিষ্ঠতে॥
অত এব মতঃ কুহেতুমদ্ বচনানি প্রথমং ব্রবীম্যহম্।
উপপত্তি সদাগমং ততো মনসঃ স্থৈর্য্য করং পরিস্ফুটম্॥
অসুরামর বাসরং ক্রমাদয়নং দক্ষিণমুত্তরং জগুঃ।
হিমদীধিতি তগ্মতেজসোগ্রহণং রাহুকৃতং তথাপরে॥
উপরীন্দুমধো দিবাকরং তমসা মেরু ভুবো বিভাবরীং।
প্রতিবাসরমিন্দু মণ্ডলং বিধুধৈঃ পীয়ত ইত্যতঃ কৃশম্॥
ককুভশ্চ সুমেরু ভূভৃতো যুগলং চন্দ্রমসোস্তথার্কয়োঃ।
পিতৃ বাসরমাদিতোঽসিতং সিতপক্ষঞ্চ বদন্তি শর্ব্বরীম্॥
অমিতামবনীং প্রচক্ষতে সুষমাং কেচন দর্পণোপমাং।
অপরে বহু যোজনামি মাং সলিলস্থামথ যান পাত্রবৎ॥
কমঠাহি বরাহ দিগ্‌গজৈঃ কুলশৈলৈর্বিধৃতামথাপরে।
জগুরূর্দ্ধমুপৈতি যাত্যধো রথচক্র ভ্রমবদ্ ভ্রমত্যপি॥

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডোদর বর্ত্তি গ্রহ পৃথিবী প্রভৃতির সংস্থান বিষয়ে পুরাণাদিতে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে মনে ভ্রান্তি জন্মে। অতএব সেই সকল যুক্তি বিরুদ্ধ বাক্যও কি প্রথমে লিপিবদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাহার খণ্ডনাদির জন্য যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। উত্তরায়ণ দেবতাগণের দিন ও দক্ষিণায়ন রাত্রি, রাহু নামক অসুর চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে। সূর্য্য মণ্ডলের বহু উপরে চন্দ্র মণ্ডল অবস্থিত, মেরু পর্ব্বত অন্তরালে সূর্য্য গমন করিলে রাত্রি হয়, কৃষ্ণপক্ষে প্রতি-দিন দেবতাগণ চন্দ্রের এক এক কলা পান করেন; এজন্য চন্দ্র ক্রমশঃ কৃশ হইয়া থাকে এবং শুক্ল পক্ষে দেবতাগণ পীত চন্দ্রকলা উদ্গীরণ করেন; এজন্য চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়। দুই চন্দ্র ও দুই সূর্য্য; কারণ বিপুলায়তন পৃথিবীকে একটী একটী চন্দ্র ও সূর্য্য একদিনে পরিভ্রমণ করিতে পারে না।

কৃষ্ণপক্ষ পিতৃলোকদিগের দিন ও শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। কেহ বলেন পৃথিবী অপরিমেয়া, কেহ বলেন দর্পণের ন্যায় সমতল, কেহ বলেন সলিলস্থ যান পাত্রবৎ জলের উপর ভাসমান। কচ্ছপ, সর্প, বরাহ ও দিগ্‌গজ সকল পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে; কেহ বলেন পৃথিবী সর্ব্বদাই উর্দ্ধে অথবা নীচে পড়িয়া যাইতেছে। নল্লাচার্য্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারত-গৌরব মহামতি ভাস্করাচার্য্য ও সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে এই সকল যুক্তি-বিরুদ্ধ পৌরাণিক বাক্যগুলি খণ্ডন করিয়াছেন; তাহার কতিপয়মাত্র যুক্তি উল্লিখিত হইতেছে। পৃথিবীর যদি আধার কল্পনা করা যায়, তাহারও অন্য আধার কল্পনা করিতে হইবে। তাহার ও অন্য আধার এইরূপ করিলে অনবস্থা দোষ হইয়া থাকে এবং এইরূপ করিলে নক্ষত্রপুঞ্জের ভ্রমণ হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, শেষের আধার নিজ শক্তিতেই শূন্যে অবস্থান করিতেছে; তবে পৃথিবীরই সেই শক্তি স্বীকার করা উচিত। বিশেষতঃ আকাশস্থ গুরু বস্তু পৃথিবীতে পতিত হওয়ায় পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে জানা যাইতেছে। এইজন্যই পৃথিবী চতুর্দ্দিকস্থ গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতিকে সমান বেগে আকর্ষণ করিয়া শূন্যে অবস্থান করিতে পারে। ভাস্করের উক্তি এই;—

মূর্ত্তো ধর্ত্তা চেদ্ ধরিত্র্যাস্ততোঽন্যস্তস্যাপ্যন্যোঽস্যৈবমত্রানবস্থা।
অন্ত্যে কল্পা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে কিং নো ভূমেঃ সাষ্ট মূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ॥
আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরুস্বাভিমতং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পতত্তীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ক পতত্বয়ং মে॥

চন্দ্র গ্রহণে চন্দ্রের পূর্ব্বদিক হইতে স্পর্শ ও সূর্য্য গ্রহণে সূর্য্যের পশ্চিম দিক হইতে স্পর্শারম্ভ হয়। দেশান্তর কাল তুল্য পূর্ব্বে বা পরে চন্দ্র গ্রহণ সর্ব্ব দেশেই দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু সূর্য্যগ্রহণ সর্ব্বদেশে দৃষ্ট হয় না। অর্দ্ধ গ্রস্ত সূর্য্যের শৃঙ্গদ্বয় তীক্ষ্ণ হয় ও সূর্য্য গ্রহণ অল্পকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। এই দিক্, দেশ, কাল ও আবরণ প্রভৃতির ভেদ হওয়ায়, চন্দ্র ও সূর্য্যের ছাদক এক নহে; ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন ছাদক আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

ছাদকঃ পৃথুতরস্ততো বিধোরর্দ্ধ খণ্ডিত তনোর্বিষাণয়োঃ।
কুণ্ঠতা চ মহতী স্থিতির্যতো লক্ষ্যতে হরিণ লক্ষণ গ্রহে॥
অর্দ্ধ খণ্ডিত তনোর্বিষাণয়োস্তীক্ষ্ণতা ভবতি তীক্ষ্ণদীধিতেঃ।
স্যাৎ স্থিতি লঘুরতো লঘুঃ পৃথক্ ছাদকো দিন কৃতোঽবগম্যতে॥
দিগ্‌দেশকালাবরণাদি ভেদান্নচ্ছাদকো রাহুরিতি ব্রুবন্তি। (জ্যোতির্ব্বিদঃ)

গ্রহণের কারণ সূর্য্য সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে। পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হওয়ায় চন্দ্র গ্রহণ এবং পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র আসিলে চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য আচ্ছন্ন হওয়ায় সূর্য্য গ্রহণ হইয়া থাকে।

ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধঃস্থাদ্ ঘনবদ্ ভবেৎ।
ভূচ্ছায়াং প্রাঙ্মুখশ্চন্দ্রো বিশত্যস্য ভবেদসৌ॥

এইরূপ জ্যোতিষ সিদ্ধান্তকারগণ পুরাণাদি বর্ণিত জ্যোতিষিক বিবরণ যুক্তি-বিরুদ্ধ হইলে, তাহা নানা প্রকার যুক্তিদ্বারা খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সবগুলি উল্লিখিত হইল না। প্রত্যক্ষ ও যুক্তির উপর জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি জন্যই যেরূপ গণনায় গ্রহগণ প্রত্যক্ষীভূত হন, সেইরূপ ভাবেই গ্রন্থকারগণ গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন। প্রত্যক্ষের সহিত গণনার মিল হইলে তাহাকে দৃক্ তুল্য গ্রহ বা দৃগ গণিতৈক্য বলিতেন। সূর্য্য সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে,—

তত্তদ্‌গতি বশান্নিত্যং যথা দৃক্‌তুল্যতাং গ্রহাঃ।
প্রযান্তি তৎ প্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণমাদরাৎ॥

ভাস্করাচার্য্য ও সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে এইরূপই বলিয়াছেন। যথাঃ—

যাত্রা বিবাহোৎসব জাতকাদৌ খেটৈঃ স্ফুটৈরেব ফলস্ফুটত্বম্।
স্যাৎ প্রোচ্যতে তেন নভশ্চারাণাং স্ফুটক্রিয়া দৃক্‌গণিতৈক্য কৃদ্ যা॥

যে গ্রন্থানুসারে গণনা করিলে গ্রহগণ প্রত্যক্ষ হন না, সে গ্রন্থ অগ্রাহ্য। এই জন্যই শাকল্য মুনি বলিয়াছেন,—

কিং তে নাপি সুবর্ণেন কর্ণঘাতং করোতি যৎ।
তথা কিং তেন শাস্ত্রেন যন্ন প্রত্যক্ষতঃ স্ফুটং॥

বরাহ-মিহির পঞ্চ সিদ্ধান্তকায় লিখিয়াছেন—পৌলিশকৃত সিদ্ধান্তের তিথি স্ফুট, অর্থাৎ বিশুদ্ধ (Accurate); রোমক সিদ্ধান্তের তিথি স্ফুটাসন্ন (প্রায় বিশুদ্ধ); সূর্য্য সিদ্ধান্তের তিথি সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ; ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও বশিষ্ঠ সিদ্ধান্তের তিথি অতি অশুদ্ধ।

পৌলিশতিথিঃ স্ফুটোঽসৌ তাথাসন্নস্তু রোমকঃ প্রোক্তঃ।
স্পষ্টতরং সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূর বিভ্রষ্টৌ॥

ব্রহ্ম সিদ্ধান্তের গণনার সহিত বেধের অনৈক্য হওয়ায় ব্রহ্মগুপ্ত তাহার সংস্কার দ্বারা এক সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন,—

ব্রহ্মোক্তং গ্রহ গণিতং মহতা কালেন যৎ খিলীভূতং।
অভিধীয়তে স্ফুটং তজ্‌জিষ্ণুসুত ব্রহ্মগুপ্তেন॥

এইরূপে পূর্ব্বকৃত সিদ্ধান্ত গ্রন্থানুসারে গণনায় গ্রহগণ প্রত্যক্ষীভূত না হইলে, জ্যোতির্ব্বিদগণ নূতন সিদ্ধান্ত গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেন। অথবা বীজ সংস্কার দ্বারা সেই গ্রন্থকেই শুদ্ধ করিয়া লইতেন। নৃসিংহ দৈবজ্ঞ বলিয়াছন;—"অতএব আর্য্যভট ব্রহ্মগুপ্তাদিভিঃ স্ব সত্ত্বা কালে অন্তরম্ উপলভ্য মুনিকৃত গ্রন্থেষু নিক্ষিপ্য গ্রন্থা রচিতাঃ"। সিদ্ধান্ত শিরোমণির মরীচি নামক প্রসিদ্ধ টীকাকার মুনীশ্বর দৈবজ্ঞ

লিখিয়াছেন,—"স্ব কালে যৎ সংস্কারেণ গণিতাগতো গ্রহ আকাশে প্রমাণ স্বতোভবতি তদ্ বীজম্।"

বীজ সংস্কার দ্বারা যে গ্রন্থ শুদ্ধ করা হইয়াছে, সেই গ্রন্থানুসারে তিথ্যাদি নির্ণয় করিবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় ব্রহ্ম সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে;—সংসাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদি যন্ত্রেভ্যঃ।

তৎ সংস্কৃত গ্রহেভ্যঃ কর্ত্তব্যৌ নির্ণয়াদেশৌ॥

বশিষ্টও বলিয়াছেন—যস্মিন্ পক্ষে যত্রকালে যেন দৃক্‌গণিতৈক্যকম্।

দৃশ্যতে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাৎ তিথ্যাদি নির্ণয়ম্॥

এই বচনে পক্ষ শব্দের অর্থ গ্রন্থ। শাব্দ প্রমাণস্থলে অনুর সহিত অন্য সংহিতাকারগণের মতভেদ হইলে মনুর প্রমাণই গ্রাহ্য হয়।

বেদার্থোপ নিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতং।

মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রকাশ্যতে।

কিন্তু যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থলে সেরূপ নহে। সে স্থলে যাহা যুক্তিযুক্ত তাহাই গ্রাহ্য। এইজন্যই বিষ্ণু বলিয়াছেন;—

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।

যুক্তিহীনং ন গৃহ্ণীয়াদপ্যুক্তং পদ্মযোনিনা।

প্রত্যক্ষ ও যুক্তি জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল ভিত্তি জন্যই প্রাচীন সিদ্ধান্তকারগণ যবনাদি প্রণীত গ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া তদনুসারে ধর্ম্ম কার্য্যোপযোগী তিথ্যাদি গণনা করিতেন। মহারাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ জগন্নাথ আরবীভাষার মিজাস্তী নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ সিদ্ধান্ত সম্রাজ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; ঐ গ্রন্থানুসারে বহুকাল রাজপূতনা প্রভৃতি স্থানে পঞ্জিকার গণনা হইত। জগন্নাথ বলিয়াছেন,—

গ্রন্থং সিদ্ধান্ত সম্রাজং সম্রাট্ রচয়তি স্ফুটম্।

তুষ্টৈ শ্রীজয়সিংহস্য জগন্নাথাহ্বয়ঃ কৃতী॥

অরবী ভাষয়াগ্রন্থো মিজাস্তী নামকঃ স্থিতঃ।

গণকানাং সুবোধায় গীর্ব্বাণ্যা প্রকটীকৃতঃ॥

এই সম্রাট সিদ্ধান্তেরই সার গ্রহণ করিয়া উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ৺মহামাহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সামন্ত সিদ্ধান্ত-দর্পণ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ হইতে গণিত পঞ্জিকাই উড়িষ্যার সর্ব্বত্র প্রচলিত। এইজন্যই মহামাহোপাধ্যায় ৺বাসুদেবশাস্ত্রী সি, আই, ই প্রমুখ মহোদয়গণ বর্ত্তমান কালীন ইউরোপীয় গণিতশাস্ত্রের সারগ্রহণ করিয়া পঞ্জিকা সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, প্রত্যক্ষ ও যুক্তির উপরই গণিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ।

———

গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ। ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২১। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মোক্ষ]

অভিসারিকা।

শ্যাম'ক প্রেম-যাবক-রসে,
রঞ্জিত লহু চরণ-পরশে,
কুসুমময়ি বন-বীথিকা ;
নিন্দি' মরাল-গমন রুচির,
মুখরয়ি' মৃদু মণি-মঞ্জীর,
ডারি' স্বপন দীরঘ দিঠির—
চল অব অভিসারিকা !
শুনহ সজনি ! শ্রুতি-রঞ্জন,
গাওত তুয়া বঁধু-বন্দন,
শিখি পিক শুক সারিকা ;
শুন গরবিনি ! কুঞ্জ-পবন,
মুরলী-সন করয়ি বহন,
কীরত তুয়া নাম-কীর্ত্তন
কলিত মধুর গীতিকা।

পেখ——তুঝকি গমন-লাগ’,
পল্লব-করে করি’ সোহাগ,
ঠারই তরু-বল্লরী ;
চললো সজনি ! না কর ব্যাজ,
তোড় মান, ছোড় লাজ,
নাহ-পিরিতি সিন্ধু মাঝ—
গাহন কর সুন্দরি !
ডরু ডরু গুরু হৃদি-কম্পন,
স্বেদ, পুলক, অশ্রু-পতন,
শ্রুতি-কুণ্ডল-দোলরি,
থর থর উর-লোল হার,
কান্ত-দরশ-পরশ সার,
সূচই ভাবি সুখ তুহার,—
ভুজঙ্গধর বোলরি।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়-চৌধুরী।

শ্যামক···শ্যামের। যাবক...অলক্ত। লহু···লঘু। কুসুময়ি···কুসুমিত করিয়া। ডারি’···ডারিয়া। অব···এক্ষণে। গাওত ··গাহিতেছে। তুয়া···তোমার। সন···স্বন। করয়ি .করিয়া। কীরত···বিকীর্ণ করিতেছে। পেখ···দেখ। তুঝকি···তোমার। লাগ’··· লাগিয়া। ঠারই···ঠারিতেছে অর্থাৎ ইসারা করিতেছে। নাহ···নাথ। দোলরি...দোল্। সূচই···সূচিত করিতেছে। ভাবি···ভবিষ্যতের। বোলরি···বলিতেছে।

মোক্ষ]

হিন্দোল লীলা।

হৃদয় নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝারে,
(আজ) প্রাণের দুলাল দুলিছে।
পরাণ কিশোরী লইয়া শ্রীহরি,
(মন) কদম্বেরি ডালে ঝুলিছে॥

তুঁহু মুখ শশী প্রেমানন্দে ভাসি,
মৃদু মন্দ হাসি হাসিছে।
বসি একাসনে তুঁহু দোঁহা পানে,
তৃষিত নয়নে চাহিছে॥
হেরি সে মাধুরি আপনা পাশরি,
সখীগণ সুখে ভাসিছে।
বিমোহিত প্রাণে সুমধুর তানে,
হিন্দোল রাগিণী গাহিছে।
তালে তালে তারা নাচে মাতোয়ারা,
মাঝে মাঝে বাঁশী বাজিছে।
বংশীধ্বনি শুনি সকলে অমনি,
শ্রীরাধাগোবিন্দ বলিছে॥

শ্রীগোবিনলাল—

মোক্ষ]

স্বামিজীর সংবাদ।

আজ জন্মাষ্টমী। গতরাত্রে মনে মনে স্বামিজীকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম যদি এবারেও স্বামিজী দেখা দিয়া কিছু বলিয়া যা’ন। গভীর রাত্রে একটী স্বপ্ন দেখিলাম ! পাঠক স্বপ্ন বলিয়া যেন উপেক্ষা করিও না। আমাদিগের সবই ত’ স্বপ্ন —ঘুমাইয়া স্বপ্ন, জাগিয়া স্বপ্ন, যোগে স্বপ্ন, যাগে স্বপ্ন— চারিদিকেই স্বপ্ন। স্বপ্ন তাহার উপর একটু ফাউ—এই মাত্র। যদি বল চারিদিকেই স্বপ্ন কিসে ? স্বপ্ন কি, তবে তাই দেখা যা’ক ! স্বপ্নের প্রধান লক্ষণ এই যে স্বপ্ন “প্রবিবিক্ত ভুক্।” স্বপ্নে প্রকৃষ্টরূপে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ভোগ হয় মাত্র। স্বপ্নের কথা সকলেই ত’ জান ; যখন যে রকম বাসনা, তখন বস্তুর সেই অংশটুকু মাত্র ভোগ হয়। স্বপ্নে কাম-ভাবে দৃষ্ট স্ত্রীলোকে কেবল কামেরই পরিসমাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীমূর্ত্তিতে যে অনন্ত ভাব আছে, তাহার মাতৃভাব, তাহার দেবীভাব, তাহার প্রকৃতির স্বরূপত্ব—এই সব হারাইয়া বাসনানুযায়ী একটী ভাব মাত্র ভুক্ত হয়। বস্তুর সর্ব্বভাব হারাইয়া বিশেষ ভাবে অবস্থিতি হয় বলিয়া, স্বপ্ন প্রকৃত সত্যের আভাস দিতে পারে না। কামুক

জাগ্রত অবস্থায় সুন্দরী রমণী দর্শন করিলে, সমাজের ভয়ে—ধর্ম্মের ভয়ে বা আইনের ভয়ে বস্তুর অন্যান্য ভাবগুলি স্মরণ করিয়া কামের বেগ রোধ করিতে পারে। কাম বা ক্রোধের বেগ রোধ করা অর্থে শুধু 'কুস্তি' করা নহে; উহা সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি বিকাশের চিহ্ন। এইজন্যই শ্রীভগবান বলিয়াছেন ;—

" সক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ গীতা ৫।২৩।

শরীর-ভাব ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কামের স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, পরে উহার রোধ সাধিত হয় না। আমরা জাগ্রতাবস্থায়ও প্রায়ই ঐ প্রকার আপন আপন খেয়ালের বশে উন্মত্ত হইয়া আছি। পরিপূর্ণ ভগবান কত আকার ধারণ করিয়া আমাদিগের সম্মুখীন হইতেছেন, আর আমরা কেবল কামনার বশে স্ব স্ব ক্ষুদ্রত্বের ঘট পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। নিত্যানন্দ ধাম হইতে ভগবানের মধুর মুরলী নিঃস্বন তরঙ্গায়িত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে; তাঁহারই চৈতন্য দ্রব হইয়া 'দ্রব্য'রূপে পরিণত। কিন্তু আমরা যে "গরগর বাজে বাঁশী নন্দের ভবনে" তাহাকে "যার মনে যা হৈছে সে তৈছে" শ্রবণ করিতেছি।

তাই বলি, আমাদের সবই স্বপ্ন। তবে আরও এক প্রকার স্বপ্ন আছে, উহা অপ্রাকৃত। উহাতে আর 'বহু' নাই, প্রকাশ নাই, বস্তু নাই; আছে কেবল পরমাদ্বিতীয়, মায়া ও জগদ্ভাবের নির্লেপ শূন্য; সুতরাং প্রবিবিক্ত ঘন আত্মস্বরূপ ও আত্মভাবে ভাবিত শ্রীভগবান। মহাপ্রভু এই প্রেমের কথাই বলিয়াছেন। তিনি কামনার ভাষায় উপদেশ দেন নাই। এই অপ্রাকৃত স্বপ্ন ক্ষেত্রে ভগবানই "প্রবিবিক্ত ভুক্।" প্রকৃষ্ট শাস্ত্রানুগত ভাবে পরিশুদ্ধবিবেকের সাহায্যে যিনি ভগবানকেই সত্য ও সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি প্রবিবিক্ত; সেই প্রবিবিক্ত ভক্তকে ভোগ করেন বলিয়াই শ্রীভগবান প্রবিবিক্ত-ভুক্। ভোগ অর্থে শরীরও বুঝায়। তাই এস, আজ সেই প্রবিবিক্ত মহাপুরুষের পদানুসরণ করতঃ তাঁহাদের মত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" মন্ত্র জপ করি।

কথায় বলে "স্বপ্নের গরু গাছে উঠে।" তাই বোধ হয় আমার 'গো' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি কি এক রকম আশ্চর্য্য ভাবে খেলিল। হঠাৎ দেখি যেন স্বামীজি অনন্তরাম সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। বড়ই আহ্লাদ হইল; তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া বলিলাম যে "এক বৎসর পরে আবার দেখা"।

স্বামি। তো'রা সব কেবল দেখা দেখা করেই পাগল হয়েছিস। ওরে ও দেখা যে দেখা নয় রে! দৃশ্য-ভাবে দেখার নামই ত' ভোগ; "দৃশ্যস্য যা উপলব্ধি

সা ভোগঃ।" বাহিরে সাপ ব্যাঙ দেখে কি লাভ? এমন কি টপ্পাওয়ালা নিধু বাবুও ত' বলে গেছেন ;—

"মনেরে না বুঝাইয়া নয়নেরে দোষ কেন?
আঁখি কি মজাতে পারে না হ'লে মনোমিলন!'

ওরে যাদের মন জন্মেছে—যাদের ভিতর ব্রহ্মা প্রকাশ হয়েছেন; তাঁরা আগে মনে দেখে; পরে হয় ত' চ'খে একবার মিলিয়ে নেয়। আর তোদের মনে নাই কিছু—কেবল ফাঁকা; তাই 'দেখা দেখি' নিয়েই অস্থির; দিনরাত কেবল গ্যাখা! গ্যাখা!! গ্যাখা!!! (Vision)। তেমনি যাদের ভিতর বুদ্ধিরূপা দেবীর প্রকাশ হয়েছেন, তারা সৃষ্টি ছাড়া হয়ে যায়; তাঁ'রা আর ব্রহ্মার ক্ষেত্রে মনে দেখে না; তাঁরা অর্জ্জুনের মত সবই শ্রীভগবানের শরীরে দেখেন। আবার যাদের ভিতর চৈতন্যময়ী দেবী পরিতৃপ্তা হয়ে উপরতা হ'ন ও বুদ্ধির খেলাটী বন্ধ করেন, তারাই সেই পূর্ণ ভগবানে একেবারে ডুবে যায়। তখন আর দেখাদেখি থাকে না। যখন সবটাই এক, তখন আর কে কাকে দেখেরে বাপু!! সে যা হউক; তোর মতলবটা কি?

আমি। এঁ্যা——ভগবানের সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন—যদি কিছু হৃদয়ে ফুটিয়ে দেন——

স্বামি। তোর দেখছি হোঁৎকামিটা কিছু কমেছে। 'বলেন' বলেই সামলে নিলি। হিন্দুরা 'বলাবলির' ধার ধারেনা। কারণ বলা ও শোনা দেহাত্মক বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। হিন্দুর আদর্শ শ্রোতব্য ও শ্রুতের উপরে যাওয়া। তাঁহারা জানেন যে শ্রুতিগুলি যাহাকে গ্রীকেরা memphian harp বলেছেন তাহা "উদুত্যং জাতবেদসং" "বৃশে বহন্তি কেতবঃ" জগতের আত্মা-সূর্য্য উদয় হ'লে, আপনা আপনি বেজে উঠে। এই শ্রুতিগুলিও ভাগবৎ বলেছেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানকে দেখাইতে পারে না; কেবল তটস্থ বৃত্তি বা ইঙ্গিতের সাহায্যে দেখায়।

যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিস্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ গীতা।

দেখা শুনা বন্ধ না হ'লে কিছুই হয় না। শাম্ভবী বিদ্যা শিখা চাই।

আমি। এ আবার কি বল্লেন। হচ্ছে এক কথা, আবার আপনি যোগের কি ক্রিয়া টি্য়ার কথা বল্লেন?

স্বামী। ওরে তুই যোগা! এখনও যোগ শিখ্তে পারিস্ নি। সাধারণ

যোগীরা ও ভক্তেরা যাহা বার থেকে অনেক কুস্তি কস্‌রৎ কোরে যাহা একটু একটু লাভ করে; সেটা যখন ভেতর থেকে একটু একটু ফুটে উঠে, তখনই প্রকৃত অবস্থা ঘটে। যেমন মেয়েদের পুতুল খেলা। পরে সত্যিকার যেটা করতে হবে, সেটা পুতুলের উপর দিয়ে শিখিয়ে লওয়ার নামই পুতুল খেলা। তাতে পুরো দুধের স্বাদ পাওয়া যায় না; তবে ঘোলের শাদাটে রং টুকুর মত একটু রং আছে মাত্র। শাম্ভবী বিদ্যা কাকে বলে জানিস্? এ সুধু জিব উল্টে ত্রাটক করা নয়। "দৃষ্টি স্থিরা যস্য বিনাবলোকনং মনঃস্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং।" কথাটা বুঝ্‌লি?

আমি। কিছুই ত' বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। আমার ত' মনে হয় কট্‌কটিয়ে Crystal gazingএর মত বা নখে এক ফোঁটা কালি রেখে তার দিকে দেখার মত একটা কিছু হবে। ঐ রকম ক'রে চাইতে চাইতে চক্ষের স্নায়ু (Optic nerve) বিকল (Parlized) হয়ে গেলে, যা' একটা কিছু হয়— তাই।

স্বামী। ওরে মুখ্‌খু তা' নয়। তোদের কাছে কোনও কথা বল্‌বার যো নাই। বল্লেই স্থূল ভাবে—কামনার ভাবে নাবিয়ে এনে বস্‌বি। ওরে বল্‌তে পারিস্, যখন—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" যখন জন্ম জন্ম ধরে চখের সামনে কত কি পড়েছে বটে, কিন্তু জানি না কোন্ শক্তিবলে ঐ সকল রূপ দেখে আর তৃপ্তি হয় না। যখন ঐ সকল বস্তু ও রূপের ভিতর দিয়ে যেন দু'ফাঁক করে দৃষ্টি কোথায় চলে যায়---যখন হাসি, খেলি, নাচি, কাঁদি, যাই করি না কেন, তারি মধ্য দিয়া দৃষ্টি কাহার দরশন পিয়াসে স্থির হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে থাকে, তখনই ত' বাস্তবিক দৃষ্টি স্থির হয়েছে। "পুরুষস্য যা উপলব্ধি সা অপবর্গ।"

আমি। আর মনের অবলম্বন শূণ্য তাটা কি? মনকে Vacant করা বুঝি?

স্বামী। তুই আর বুদ্ধির পরিচয় দিস্‌নে। সব জিনিসই বাহ্য ভাবে চর্চ্চা কর্‌বি আর বল্‌বি দেখ্‌তে পাচ্ছিনা - শুন্‌তে পাচ্ছিনা। ওরে নিধুবাবুর গানটাই মনে করে দেখ্‌না—

"আঁখি যত জন হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
মন যারে মনে করে সে হয় মনোরঞ্জন।"

তোরা ভারি বোকা! এমন গানটাকে একটা মাংসপিণ্ড শরীরের কাছে হাত মুখ নেড়ে গেয়েই ভাব্‌লি বড্ড কাজ করা হ'ল!! বল্‌তে পারিস্ মন কি চায়? মন

যদি বাস্তবিকই বাহ্যিক কিছু চাইতো, তাহ'লে তা পেয়েই মানুষ তৃপ্ত হ'ত; তা'তো হয় না; একটা পেয়ে আরও একটা চায়'! তা'তেও কি সন্দেহ হয় না যে বাস্তবিক মন কি চায়? মনকে চালায় কে? মনের পিয়াসা কিসের?

"যন্মসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধিনেদম্ যদিদমুপাসতে॥" কেনোপনিষৎ ১।৫।

ওরে মনকে প্রগ্রহ বলে। 'বুদ্ধিস্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।" প্রগ্রহ মানে কি জানিস্?

আমি। কেন লাগাম!

স্বামী। তা বই কি! আর সঙ্গের চাবুক গাছটী ফেলে দিলে চল্‌বে কেন? রামচন্দ্র! কেবল ভেদ ভাবেই সব মনে কর্‌বি? কাজেকাজেই রস পাস্ না। তোরা ভাবিস্ মন বুঝি কেবল ইন্দ্রিয়গুলিকে ধরেই আছে। "ইন্দ্রিয়তে (যারা ইঙ্গিত করে) ইতি ইন্দ্রিয়ম্।" ভূলোর দলের বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর মত ইসারা করেই পরম সুন্দর পর পুরুষের ইঙ্গিত বিদ্যাতত্ত্বের কাছে বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু এই দেখানটা সামান্য ভাবে হয়। এই ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান গুলিকে যে তত্ত্ব আশ্চর্য্য কৌশলে মিশাইয়া তাহা হইতে প্রকৃষ্ট বিশেষ ভাব ইঙ্গিত করে, তাহাকে মন প্রগ্রহ (প্র+গ্রহ) বলে। চোখ রূপ, কান মধুর ধ্বনি আনিল; কিন্তু মন না থাকলে ঐ সামান্য রূপ ও ধ্বনি প্রভৃতি একত্রিত করিয়া প্রণয়িনীর মনোরম মূর্ত্তি আঁকৃতে পার্ত্তনা! অন্য নারীতেও যাহা আছে, প্রণয়িনীতেও তাহা আছে বটে, কিন্তু কি একটা বিশেষ আছে যে তার জন্য মন এত আকুল হয়! ঐ প্রগ্রহ "গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং" বলিয়া শ্রীভগবানকে অভিহিত করা হয়। গোপীদিগের নয়নে যে ভাব আছে, সেই ভাব রাশির সাহায্যেই যেন ভগবানের তনু (অর্চ্চিত, অর্চ্চি=দ্যুতি যুত) গঠিত হয়। সেই জন্যই বুঝি যাই তাঁকে চ'খে দেখ্‌লে, তাই চ'খের সকল কাজ বন্ধ হয়ে—কোথায় কিরূপে মিশিয়ে গিয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অপ্রাকৃতের তনু প্রকট করে। রাধা যদি আকাশের নীল রঙ্গে কেবল রং দেখিয়াই আকাশকে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তাঁর আকাশ বুদ্ধিই জন্মাত। ঐ দেখ নীল রংও রইল না, আকাশও রইল না, বা নীল রঙ্গের মানুষ বুদ্ধিও ফুট্‌লো না. কোথা হইতে হঠাৎ সেই পরপুরুষের ভাষা হৃদয়ে জেগে উঠে তাকে ব্যাকুল করে দিলে। মানুষ যদি ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয় জেনে মনকে প্রগ্রহ বলে বুঝ্‌তে পারে, তা হ'লে আর এত দুঃখ থাকে না; তখন সবই ভরপুর হয়ে উঠে। বল্‌তে পারিস্,

অসূর্য্যম্পশ্যা লাবণ্যময়ী পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে বাবুরা সোনাগাছির কালপেঁচিতে কি দেখ্‌তে পান্‌ যে একেবারে ডুবে যান। ওরে! যে যেখানটাতে তাঁর আভাস দেখ্‌তে পায়, সে সেখানটাতেই মনে করে বুঝি তার পরিপূর্ণতা বিরাজমান—সে সেইখানটাই ভরপুর দেখে।

ইংরাজ প্রেমিক প্রণয়িনীর চখের ভিভর কি এক অগাধ গভীরতা (Unfathomable depth) দেখিয়া একেবারে মস্‌গুল হয়ে যায়। রসলোলুপ ব্যক্তিগণ এইরূপ আভাস লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু যাঁহারা রস-জ্ঞ, তাঁরা জানেন "নেদম্‌ যদিদমুপাসতে" ঘটিটা বাটীটার মত ছোট করে তাঁকে ধরা যায় না। তারা দেবকী চৈতন্যের শরণ গ্রহণ করেন। সর্ব্বত্র সর্ব্ব স্বরূপে দেদীপ্যমানকে খুঁজিতে যান।

আমি। আপনি কি বল্‌ছেন, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

স্বামী। ওরে আমি তোকে বেদের ভাষা বল্‌ছি। যে বেদগুলি নিয়ে সেই ভগবান "বেদিয়ার" বেশে ঘুরে ঘুরে খেলে বেড়াতেন। মনে কর একজন লোক আছে, সে কেবল নীচের দিকেই চাইতে পারে, উপরদিকে দেখ্‌তে পারে না। সূর্য্য উদয় হইল সে কি দেখিল? সে দেখিল অকস্মাৎ কোথা হইতে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানাবর্ণের বস্তু সকল স্বতঃই উৎপন্ন হইল। এইরূপে যাঁহারা কেবল স্থূল বা নীচের বস্তুর দিকে আবিষ্ট, তাঁহারা গম্ভীর-ভাবে জগতের আকস্মিক উৎপত্তি বাদ প্রচার করেন। কিছুদিন এই নানা বর্ণ ও বর্ণ সমন্বয় লইয়া খেলা করিতে করিতে মানব যখন বুঝিতে পারে যে বস্তুর রংটা তাহার চক্ষুর সহিত বিশিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ;—আলোকের এক রকম স্পন্দন কোণে (Angle) দেখিলে, যাহা লাল বলিয়া উপলব্ধি হয়, অন্য কোনে বা ভাবে দেখিলে তাহাই নীল হইয়া যায়। এইরূপে যখন মানব দেখে যে,—

"সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সায়রে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল॥"

তখন তাহার দৃষ্টি তাহার আপন প্রকৃতির উপর পড়ে; তখন সে বলে,—

সখি কি মোর করমে লেখি!
শীতল বলিয়া চন্দ্রমা সেবিনু; ভানুর কিরণ পেখি।"

তখন সে আপন অদৃষ্ট, কর্ম্ম, স্বভাব, প্রভৃতি খুঁজিতে আরম্ভ করে। ইহা দার্শনিকের ভাষায় Man know thyself অবস্থা। এখনও বেদ

আসে নাই। তাহার পর মানব দেখিতে পায় যে, বাহ্য বস্তুর সহিত আন্তর প্রকৃতির কি এক সম্বন্ধ আছে। বিকার-রোগে বিষ-প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। তখন সে বুঝিতে পারে যে ভিতরে আমি ও বাহিরে বস্তু উভয়ের মধ্যে একটা সাম্য আছে; ঐ সাম্য আনন্দ-ঘন ও বড় মধুর। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির নিকট জল যেরূপ মধুর, কামুকের নিকট কামিনী সঙ্গও যেইরূপ মধুর, আর ভক্তের নিকট ভজনও তদ্রূপ। তখন মানব বুঝিতে পারে যে কোথায় কি এক সাম্যরূপ অমিয়া-সাগর আছে; বাহিরের বস্তুগুলি সেই অচল-প্রতিষ্ঠ সাগরের উর্ম্মিমালার ন্যায়। উহা স্বভাবতঃই মধুময়; তবে ভেদজ্ঞানে বেশী করিয়া খাইয়া ফেলিলে, কখন কখন বুকজ্বালা করিলেও করিতে পারে। তখন সে বলিয়া উঠে,—

"মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্ণ সন্তোহষধী. মধুনক্তমুতোষসি।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্ন বনস্পাতি, মধুমাংহস্তুসূর্য্য, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ
ওঁ মধু ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ॥"

এই মধুবিদ্যার নামই সামবেদ। ছান্দোগ্যোপনিষদে এই মধু-বিদ্যা বর্ণিত আছে।

তারপর জীব আপনার সহিত সাম্য সম্বন্ধ স্থির করিয়া জগদ্ভাব অতিক্রম করে। "ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গ যেষাং সাম্যে স্থিতো মনঃ।" তারপর জীব যখন বুঝিতে পারে যে সূর্য্যরশ্মি যেমন বস্তুর উপরে যে (Angle of impingence) ভাবে প্রতিফলিত হয়, ঠিক সেই (Angle) ভাবেই আমাদিগের দৃষ্টির সহিত যোগ হয়। পক্ষান্তরে জগতের সর্ব্ব বস্তুর ভিতর দিয়া সাম্যের ভাষা (Angle) অবলম্বন করতঃ বিপরীত দিকে অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' এই বুদ্ধির বিপরীত সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি প্রয়োগ করে। তখন সেই বস্তুগুলি কেবল এক অবিশেষ আলোক তত্ত্বের—জ্যোতিষামপিতজ্জ্যোতি প্রকাশ ক্ষেত্র বলিয়া বুঝিতে পারে। তখন সে সকল বস্তুতে কেবল সাম্য স্থির করিয়াই নিবৃত্ত হয় না; তখন বস্তুগুলি এক মহান্‌ জ্যোতির আধার বলিয়া তাহার প্রতীয়মান হয়। তুমি বলিবে নীল পীতাদি বর্ণ সকল গ্রহণ করতঃ রক্তবর্ণ ত্যাগ করে বলিয়াই বস্তু রক্তবর্ণ দেখায়। 'বস্তু' প্রকৃতির অন্তর্গত চৈতন্যময়, যাহা ত্যাগ করেন তাহাই ত' আমাদের ভোগ্য—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা ... ... ॥ ঈশোপনিষদ। ১।

বৃক্ষটী আম্র ফল দেয় বলিয়া যদি গাছ শুদ্ধ হজম কর, তবে আর সুখ পাইবে না। অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করও বলেন,—"জ্ঞানও বস্তুতন্ত্র", বস্তুর অধীন; আমাদের খেয়ালের অধীন নহে। সে যাহা হউক, যখন সেই পরম বস্তু কর্তৃক প্রদত্ত কখনও দুঃখ, কখনও সুখ, কখনও জন্ম, কখনও মৃত্যু প্রভৃতি রূপে বিভিন্ন প্রায় ভাবগুলি সাম্যের ভাষায় ঘন করিয়া দেখিতে পারা যায়, তখনই ঋগ্বেদের ভাষা একটু একটু ফুটিয়া উঠে। কিন্তু এই ভাষা উন্মেষিত হইবার আগে ভগবানকে সদা স্বপ্রকাশ বা জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া উপলব্ধি হওয়া চাই, এবং সকল ভাবের প্রকাশের অন্তরালেই যে তাঁহারই খেলা হইতেছে, তাহা বুদ্ধিগত হওয়া চাই। তাহা হইলে জগতের যে কোনও বস্তু যে কোনও ভাবে তোমার নিকট উপস্থিত হউক না কেন, ঐ (Angle of reflection) ভাব বা বিম্বভাবটী ধরিয়া সেইটিকে ঘুরাইয়া সর্ব্বাত্মিক ভাবে প্রয়োগ করিলেই জ্যোতির্ম্ময়ের অবস্থান জানিতে পারিবে। সমুদ্রে অবগাহন করিতে যাইয়া অজ্ঞ ও ভীত ব্যক্তিগণ যেমন সমুদ্রের সহিত যুঝিতে যায় বলিয়া তরঙ্গ কর্তৃক বেলা ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বস্তু ও ব্যক্তিগত মোহের বশে ভগবানের সাম্য ও জ্যোতির ভাষা প্রত্যাখ্যান করিলে, সুখ দুঃখের তরঙ্গে বিধ্বস্ত হইয়া মানব জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়ে। পরন্তু রসিক যেমন আপনার স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করতঃ সমুদ্রে গা ভাসাইয়া তরঙ্গের উপরে উঠিয়া পড়িয়া তাহারই সাহায্যে তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তরে সু-সুখে নাচিতে নাচিতে ভাসিতে ভাসিতে গমন করে, সেইরূপ সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম না করিয়া তাহাতে গা ভাসাইয়া দিলে, এই চঞ্চল ভেদের মধ্যেও এক স্থির অভেদ সত্ত্বার আভাস পাওয়া যায়। রসিক এইরূপে জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারেই বিপরীত বিহার করিতে শিখিয়া বা বৈরাগ্য (বিগতরাগ বা বিপরীত রাগ ভাব) অভ্যাস করিয়া ক্ষুদ্র সাময়িক ব্যক্তিগত ভাবের ভিতরেও প্রতিক্ষণ প্রেমানন্দ ঘন ভগবানের মহারসে (রস + ভাবে ঘঞ্) লীলায় স্পর্শন, নর্ত্তন, আলিঙ্গনাদি ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন। তোমরা ভাব যে আমিটীকে এমন করিয়া কঠোর করিতে হইবে যে সুখ দুঃখাদি কিছুরই আর অনুভূতি হইবে না। বাপু! 'অনু'ভূত হইয়া যাহা আছে, তাহা ছাড়াবে কি ক'রে? আর তা হ'লে উপল ও উদ্ভিদাবস্থা ত্যাগ করিয়া মানব জন্ম ধারণ করিলে কেন? এই অবস্থাগুলি ত' চৈতন্যেরই বিভিন্ন ভাষার খেলা।

আমি। আপনি কি বলিতেছেন? আর একটু বুঝাইয়া বলুন; স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামী। তুমি একটী প্রধান রাসভ। নিজের জীবনে কি দেখ্‌লি তাহা মনে রাখিস্ নাই; কেবল সাময়িক ভাবে উন্মত্ত হয়েই বেড়ালি। ভেবে দ্যাখ, যখন বালক ছিলি, তখন কত যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা তোকে বুকে করিয়া কত আদর করিয়াছিল, সেই আদর তুই তখন কি ভাষায় বুঝেছিলি? আর যখন একদিন যৌবনের ভাষা তোর হৃদয়ে ফুটে উঠ্‌ল তখনই বা কি দেখ্‌লি? তুই যা' ছিলি তাই আছিস্; তবে শৈশবে এক ভাষায় রমণী সঙ্গ করেছিস্, আর যৌবনে কি এক অভিনব ভাষা ফুটে উঠে তোকে মাতিয়ে ছিল; আর এখনই বা কি এক ভাষার বশে রমণী মাত্রেই মহামায়ার প্রতিচ্ছায়া দেখ্‌তে পাচ্ছিস্? ওরে বেদগুলি "আত্মার ভাষা।" সে বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন ভাবে কথা কহে, বা—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে স্তাং তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ গীতা ৪।১১।

সেই ভাষাই সামবেদ ঘন সমরূপী সর্ব্বভূতস্থ "সমোহং সর্ব্বভূতেষু" ভাবের শিক্ষা দেয়। তাহাতে তাঁহাকে ভূতস্থ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে বলিয়াই ঋগ্বেদ আসিয়া উপদেশ দেন যে "ঐ সাম্য রূপই ভগবান," তিনি বস্তুগত নহেন। বস্তু হইতে আলোকের ন্যায় উপরে ফুটিয়া উঠিতেছেন। তারপর যখন পরাভাব বিকশিত হইয়া উঠে, যখন তাঁহার জ্যোতিরশ্মিকে ক্ষেত্রজ্ঞত্ব ভাবে (Angle of reflection) দেখিয়া বিপরীতক্রমে প্রকাশময় ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেই বিপরীত অথচ জীবের ভিতর প্রকাশিত অনুরূপ পথ (Angle) ধরিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ দেখিতে পাইবে যে, এত আলোক-রশ্মি বা কেতুগণ সেই জগতের অতিগ নিষ্কল, আকাশস্থ সূর্য্যস্বরূপ, নির্লেপ আত্মাই জ্যোতি সকলের পরিসমাপ্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই 'পশ্যন্তিবাক্' বা যজুর্ব্বেদের ভাষা। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—তখন আর সমরূপ ভাব ধরিয়া জ্যোতি ভাবের সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে হয় না। তখন মানব 'ঊর্দ্ধ' বা 'পর' কথাটীর মানে বুঝিয়া একেবারেই 'পরাভাবে' পরপুরুষ শ্রীভগবানকে দেখিতে পারে। ঋষিগণ ইহাই শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

* * * * *

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞান যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম। গীতা ১৩।২।

* * * *

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥১৩।৪।

এইটুকু বোঝ; পরে দেখা হইলে আবার বল্‌ব। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

মোক্ষ]

আমার মা।

(১)

আমার এমন মাকে, কে পর কহিতে চাহে, তাই বল শুনি ?
(যেমা)
ধরে আছেন বুকের মাঝে, তার চেয়ে কে আপন আছে,
পরাৎপরা, পরমা যে তিনি !!

(২)

আছি মায়ের গর্ভে শুয়ে, তাঁরি স্পর্শে বেঁচে রই,
তাঁরি ভাষায় তাঁরি কথায়, তাঁর সাথেই কথা কই,
মা যে আমার সর্ব্ব-বিধায়িনী।
তাঁরি আদর তাঁরি স্নেহে, আছি তাঁরই গর্ভ-গেহে,
'সর্ব্ব'ভাবে মা যে আমার হৃদি-বিহারিণী ॥

(৩)

ভেদের মূরতি তোরা কি জানিবি ভেদ বই,
সর্ব্বরূপে মা যে আমার দেখনা চাহিয়া ওই ;
মা যে আমার জগত রূপিনী !
নিশ্বাসে যে হাওয়ায় বহে, মেখে মধুর পরিমল,
পিপাসায় যে শুষ্ক কণ্ঠে, হ'য়ে আসে শীতল জল ;
প্রিয়জনের স্পর্শে যে মা, আনন্দ হিল্লোলে বহে,
জগতের কণ্ঠে যে মা, সঙ্গীত রূপেতে রহে ;
আমার প্রাণের মাঝে তুলে মধুর গীতধ্বনি।

(৪)

নয়ন কোণে বসে যে মা, গগন পটে দেখায় রবি,
বিশ্ব জুড়ে দেখায় ঘুরে, কত শত রঙ্গের ছবি ;
মা যে আমার সকল রঙ্গের খণি ;

মায়ের রূপের জ্যোতি দেখ, খেলে তারা তপনে,
তাঁরি আভা হাসায় চাঁদে, ভাসে তড়িৎ হুতাশনে ;
সাগর জলে বসে যে মা, শুক্তি গর্ভে মুক্তা ফলায়,
বসিয়া কানন কোলে, তৃণের ফুলে ডালি সাজায় ;
নানা বর্ণের তুলি ধরে, বিশ্বে খেলার গৃহ সাজায়,
অঙ্গুলি হেলনে পুনঃ, সেই খেলাঘর ভেঙ্গে ফেলায় ;
অনলে পতঙ্গ পোড়ায়, লুকায় মেঘে দামিনী ॥

(৫)

মায়ের বুকে স্তন্যে যে মা, পিতার বুকে স্নেহ-রাশি,
যাঁহার প্রীতির কণা তুলে, সংসারেতে মধুর হাসি ;
ইচ্ছাময়ি মা যে আমার প্রীতি-স্বরূপিণী।
পশু পাখী কীট পতঙ্গে, যা'র করুণা খেলে রঙ্গে,
স্থাবর জঙ্গমে যে মা, মিশে আছে অঙ্গে অঙ্গে ;
জগতে ঢালিয়া অঙ্গ, জগন্ময়ী সবার সনে,
সুখের হাসিতে হাসায়, কাঁদায় দুঃখের রোদনে ;
চিন্ময়ি রূপেতে যে মা, চিত্ত-গুহা পরকাশে,
'প্রদ্যুম্ন' রূপেতে যাঁহার, লীলা-লহর খেলে মানসে ;
কাত্যায়নী কামরূপা মা বাসনাতে খেলায় হাসি,
ইন্দ্রিয়েতে হৃষিকেশ মা, কালীরূপে 'সর্ব্বনাশী' ;
অবয়বী চিন্ময়ী তাই সেজেছে পাষাণী ॥

(৬)

বেদ, তন্ত্র, শাস্ত্র, পুরাণ, এক বাক্যে বলে সবাই,
আমার মা যে আমারই মা, তার বেশী আর কথাটী নাই ;
সে যে আমার পরমা জননী।
দুখের রোদন শুনে যে মা, কোলে তুলে ছুটে আসি,
যাঁ'র শাসনে কাঁদি হাসি তা'রেই আমি ভালবাসি ;
কালরূপিণী জগদম্বা, বিশ্বরূপা মুক্তকেশী,
আমি বুঝি আমার মা সেই ভদ্রকালী কপালিনী ॥

আর কি আসিবে না ?

আজ আবার আনন্দধ্বনি শুনা যাইতেছে কেন? নর-নারী, বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতীর আনন্দ কোলাহলে দেশ আবার মুখরিত হইয়া উঠিল কেন? কে আসিবে? ধনী-দরিদ্র, গৃহস্থ-ব্রহ্মচারী, সকলেই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আয়োজনে ব্যস্ত! আজ দেশে দেশে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, 'মা আসিতেছেন, মা আসিতেছেন'; তাই আজ ঘরে ঘরে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি ঘোষিত হইতেছে। বাস্তবিকই কি মা আসিতেছেন? আমার তো বিশ্বাস হয় না! কৈ হৃদয় তো নাচিয়া উঠিতেছে না! শরীর কৈ ত পুলক ভরে শিহরিয়া উঠিতেছে না! জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রী মা আমার আসিতেছেন, আর আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—এই কি সম্ভব! সত্য বল, অবিরাম বারিপাত নিবৃত্ত হইয়াছে, কামিনীর বিলম্বিত ঘনকৃষ্ণ চিকুর গুচ্ছের ন্যায় সে ঘন ঘোর ঘটা আর নাই; নিবিড় তিমির রাশি ভেদ করিয়া সৌদামিনীর ঘন ঘন চঞ্চল চমকিত ভাব আর নাই। পথ, মাঠ, ঘাট বিপর্য্যস্ত করিয়া বারি স্রোতের সে প্রবল বক্রগতি থামিয়া গিয়াছে বটে; মাঠে মাঠে সবুজ ধান্য নবীন মেঘের শোভাকে তিরস্কার করিতেছে; বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, সকলের মধ্যেই যেন একটা নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে তাহাও দেখিতেছি। পূর্ণ যৌবনের অবসান কাল আসন্ন হইলে যুবতীরা যেমন গতি, ভাব, ভঙ্গী সমস্তই চপলতা পরিহার করিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করে, এখন যেন প্রকৃতি রাণীও ঠিক সেইরূপ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছেন। পল্বল, পুষ্করিণী কানায় কানায় জলে পূর্ণ; কিন্তু তা'র সে কুল-ভাঙ্গা খর বেগ যেন হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। আকাশ মেঘশূন্য নির্ম্মল,—বাসনা-বিমুক্ত যোগীর চিত্তের মত শোভা ধারণ করিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে মেঘ খণ্ড সরিয়া যাইতেছে, রৌদ্র ফুটিয়া উঠিতেছে, আশান্বিত হইয়া লোকে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ বিশ্বস্ত হৃদয়কে চমকিত করিয়া কোথা হইতে খণ্ড খণ্ড মেঘমালা এক জোট হইয়া বারিপাতের একটু খেলা খেলিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া গেল। ঠিক যেন কিশোরীর স্ফুটোন্মুখ যৌবনের চপল রসিকতা সে আর সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। যোগী সমাধিস্থ হইলেও ব্যুত্থান অবস্থায় যেমন আবার পূর্ব্ব সংস্কার তাহার চিত্তকে আচ্ছাদন করিতে চেষ্টা করে, তেমনি নবীন মেঘমালা আপনাকে রিক্ত করিয়া ঢালিয়া

দিলেও, আবার প্রকৃতির মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের ব্যর্থ প্রয়াসে সচেষ্ট রহিয়াছে! নব মল্লিকা, মালতী, চম্পক, বক, সেফালিকা আবার কাহাকে দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে; স্থল কমলের অপূর্ব্ব সুষমায় এ কার সুধা হাস্যময়ী মুখখানি মনে পড়িয়া যাইতেছে! গ্রামে গ্রামে জন সমাগম, গৃহে গৃহে আনন্দোৎসব, আবার ধরাকে প্রাণময়ী করিয়া তুলিতেছে! তবে কি এ দুঃখের জগতে সুখের শরৎ আবার ফিরিয়া আসিল? ওই যে, শারদ-জ্যোৎস্নার বিমল কিরণে সমস্ত আকাশে আজ আর আনন্দ ধরিতেছে না;—আজ নক্ষত্র লোকে—চন্দ্র লোকে একি মহা মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে!! তবে কি জ্যোৎস্না প্লাবিত শারদ-রাত্রে শত শশধর-সুধা-বিড়ম্বিনী জগজ্জননী মা আমার শিব-সিমন্তিনী সাজে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন? নচেৎ এ শোক-রোগাচ্ছন্ন মৃত্যু-ত্রাসিত জগতে আবার এ সুখের লীলাভিনয় কেন? মা কি আসিয়াছেন! এ মৃত লোকে অমৃতের পরশ দিতে সত্যই আমার মা কি আবার আসিয়াছেন? হাঁ গো দীন দুঃখ-হরা, এতদিনে কি তোর সন্তানের প্রতি করুণার উদয় হইল? কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু অন্ধ হইতে বসিয়াছে যে মা! "আসি" বলে চলিয়া গেলি, যুগ-যুগান্তর বহিয়া গেল যে মা!! হাঁ মা দীন-বৎসলে! আবার তোর পদস্পর্শে কি এ বিষাদিত মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে মা? হাঁ মা অভয়ে! আবার কি ভব ভয়হরা তোর হাঁসি-ভরা প্রসন্ন মুখখানি দেখিয়া এ জগৎবাসী অভয় পাইবে? বড় জ্বালায় এ জগৎ জ্বলিতেছে মা! তোর সুরাসুর বন্দিত রক্ত কমল চরণ দু'খানি এ ধরণীতলকে স্পর্শ করুক—উহার তাপিত বক্ষ শীতল হ'ক। দুঃখী দীন হীনের 'দরদ' বুঝিতে তোমার মত তো আর কেউ নাই মা! তাই কি কাঙ্গালের ঘরে আবার ফিরিয়া আসিলে? আমি এ কি প্রলাপ বকিতেছি! কোথায় মা, যাহাকে প্রাণের ব্যথা শুনাইতেছি! না না এ স্বপ্ন! মা কি কখন এদেশে আবার আসিতে পারেন? এ যে অভিশপ্ত, এ যে দগ্ধ দেশ, এখানে কি মা চরণ রাখিতে পারেন? এ যে নরক! সর্ব্বত্র নরকের আগুন দাউ দাউ জ্বলিতেছে! এ যে সর্ব্বত্রই প্রলয়ের বিভীষিকা! এ যে রক্ত রাঙ্গা পদে, রক্তমাখা মুখে কোটি কোটি প্রেতিনী তাথেই-তাথেই করিয়া তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে। সকলেরই গলে নরমুণ্ড মালা, সকলেই নরহাড় ভূষণে ভূষিতা! তাহারা ক্রোধোন্মত্ত রক্ত আঁখি কটমট করিয়া যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, সেই দিক হইতে সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি ছাই হইয়া উড়িয়া যাইতেছে! একি উৎকট পূতিগন্ধে দিক সকল পরিপূর্ণ! একি

প্রলয়-বহ্নিধূমে আকাশ সমাচ্ছন্ন! তবু বলিতেছ মা আসিয়াছেন! আরে পাগল! মা আসিলে কি আর পৃথিবীর এ দুর্দ্দশা থাকে? না তাহার অঙ্কে নির্ভয়ে দানবকুল নৃত্য করিতে সাহস পায়? মার পদস্পর্শে এ নরকের দৃশ্য মুহূর্ত্ত কালও যে টিকিতে পারিত না! ঐ দেখ দলে দলে দানবকুল সৌভ্রাত্র বন্ধনকে—প্রীতি প্রেমকে পদদলিত করিয়া, এক ভাই আর এক ভাইকে বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত—মূষল হস্তে ধাবমান হইতেছে। কোটি কোটি নারী হৃদয়কে উন্মুলিত করিয়া মাতৃ হৃদয়ের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া পিশাচের দল অট্ট অট্ট হাস্যে হাস্য করিতেছে! না—না! মা আসিয়াছেন—এ কখনই নয়! দানব-দলনীর আবির্ভাব হইলে কি আর এই অসুর দল উৎপাত করিতে পারিত? সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন পলাইয়া যায়, তম-বিনাশিনী, শিব বিলাসিনী মার আগমনে এই অসুরকুলও তেমনি ত্রাসিত হইয়া কোন্ অদৃশ্য অন্ধকারের গভীর গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়া পড়িত; আর তাহাদের অস্তিত্বও কেহ অনুভব করিতে পারিত না! তা'তো হয় নাই—মা তো আসেন নাই; তাইতো এখন ঘনঘোর অন্ধকার দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া রহিয়াছে.—চতুর্দ্দিকে দানব শক্তির বিকট আস্ফালন শ্রুত হইতেছে!! না, না—মা তবে তুমি আস নাই!

সত্যই তবে তুমি আস নাই,—হাঁ মা আর কি কখন তবে আসিবে না? তোমার চরণ ধূলায় এ ধরণী বক্ষ কি আর শোভিত হইবে না? তোমার চরণ স্পর্শের সে সৌভাগ্য আমরা কোথায় হারাইলাম! কোন্ দুষ্কৃতি-রাহু আমাদের হৃদয়াকাশ হইতে তোমার দিব্য চরণ-জ্যোতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল! জগতের প্রতি অণু যে অমৃতস্পর্শে অমৃতোপম ছিল, আজ সে শুধু ধূলি মুষ্টিমাত্র হইয়া চক্ষুর জ্যোতিকে ম্লান করিয়া তুলিতেছে! তুমি যে ঘটে ঘটে প্রাণরূপিণী—চৈতন্যময়ী! তবে এ প্রাণহীন অচেতন ভাব কোথা হইতে আসিল মা? এ যে জগৎ জুড়িয়া অজ্ঞানতা; অবিদ্যানাশিনী! তুমিই মা বলিয়া দাও, আমরা এ অজ্ঞান রাক্ষসের কবল হইতে কিরূপে ত্রাণ পাইব? জগজ্জ্যোতি-রূপিণী! তুমি ভিন্ন এ অজ্ঞান-ধ্বান্তের কে উপশান্ত করিবে? আমাদের এ দুর্ণিবার মোহ আসক্তি তোমার জ্ঞান খড়্গে দ্বিখণ্ডিত হউক! একবার বরাভয় করে 'মাভৈঃ মাভৈঃ' রবে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া হাঁসির বিকাশ সূর্য্য চন্দ্রকে প্রভাহীন করিয়া দাঁড়াও মা! সন্তানেরা তোমার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হ'ক!

মা শিবে! আজ শিবকে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা সকল সম্পদ সকল

শোভাকে হারাইয়াছি? আজ তোমাকে ভুলিয়াছি;—তা'ই ধনধান্য ভরা এ শোভার ভারতে দুর্ভিক্ষের রোষাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে? হাঁ মা কণকবরণী গৌরী! আমাদের কুকার্য্য-কলঙ্কে আজ সমস্ত দিক ভরিয়া উঠিয়াছে;—তা'ই কি সন্তানের অপরাধ স্মরণ করিয়া তোমার লজ্জা-পীড়িত মাতৃবক্ষে ও তোমার সমস্ত মুখখানিতে কালিমা মাখাইয়া দিয়াছে। তা'ই কি তোমার সে শোভন-শ্রী আর জগৎকে আনন্দ রসে পূর্ণ করিতেছে না। তা'ই কি মা আমাদের ত্যাগ করিলে? অথবা আমরা সর্ব্বপ্রকারে দরিদ্র ও দীনাত্মা বলিয়া আসিবে না! তোমার পূজার আয়োজন কি আমরা করিতে পারিব না? তা'ই কি তুমি বিমুখ হ'লে মা! আমার সম্পদ বিভব নাই সত্য; কিন্তু তো'র ঐ রাঙ্গা চরণ দুটিই যে জীবের পরম সম্পদ!—সমস্ত ভুক্তি মুক্তির আশ্রয়। তুমি দয়া করে আসিলেই যে মা সমস্ত দারিদ্র্য ঘুরিয়া যাইবে। সিদ্ধি ঋদ্ধি সমস্তই তোমার পাদপদ্মের মহিমা বৈ ত' নয়। তুমি আসিলেই সর্ব্ব বিদ্যা, সর্ব্ব জ্ঞান, সর্ব্ব সম্পদ, সর্ব্ব সিদ্ধি, সর্ব্ব শক্তি, সবই আমরা ফিরিয়া পাইব যে? তবে কেন তুমি আসিবে না মা! আমরা ভক্ত নই—তা'ই? আমরা শুভকে পদদলিত করিয়াছি,—তা'ই? আমাদের ঘরে ঘরে নিরানন্দ, শোক, রোগ, হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ—তাই? গৃহে গৃহে কলহ, ভাইয়ে ভাইয়ে বিসম্বাদ, গুরুজনের প্রতি ভক্তি নাই, স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা নাই;—তা'ই তুমি আসিবে না? তা'ই কি তুমি দিগ্‌বসনা, উলাঙ্গিনী বেশে জগতের সমক্ষে বিভীষিকাময়ী হইয়া ভয় দেখাইতেছ? মা! এ দুর্গতি আমাদের হইয়াছে তা ঠিক; কিন্তু তুই যে দুর্গতিহরা, তুইও চরণে ঠেলিবি মা? মা একটা কথা আমার শুন! তুমি যে শ্মশানবাসিনী;—শ্মশান তোমার বড় প্রিয়,—তা' যে শুনিয়াছি; তবে মা, আমার হৃদয়ে তোর বেশ বসিবার ঠাঁই হইবে। আমার হৃদয়ের মত এমন মহাশ্মশান আর পাবে না মা! একবার আমার হৃদয় পানে চাহিয়া দেখ, সেখানে দয়া নাই, শ্রদ্ধা নাই, কোমলতা নাই, পূজ্য-পূজা নাই—সব অবিশ্বাসের অগ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে; সেখানে কেবল জ্বালা—প্রাণের জ্বালা, কামের জ্বালা, ক্ষুধার জ্বালা, রূপের জ্বালা, ধনের জ্বালা,—'দাউ দাউ' করিয়া দিবারাত্র জ্বলিতেছে। সেখানে আর কিছু শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া ষড়রিপুর বিকট চীৎকার—শ্মশানে ফেরুপালের অভিনয় করিয়া ফিরিতেছে!! শ্মশানে যেমন দগ্ধাস্থিখণ্ড স্থানে স্থানে বিকীর্ণ হইয়া থাকে এবং শবদাহের গন্ধে পূর্ণ থাকিয়া পথিকের ভীতি উৎপাদন করে, তেমনি আমার হৃদয়-শ্মশানে আজ আর কিছু নাই। সব

পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে ; কেবল পাপ-স্মৃতির কঙ্কালরাশি, বিকৃত অনুষ্ঠানের অস্থি-আবর্জ্জনা, আর অতীত গৌরবের অভিমান, স্পর্দ্ধার নরমুণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ! লোকে শ্মশান দেখিলে যেমন ভয় পায়, আমিও আমার হৃদয় পানে তাকাইয়া তদ্রূপ ভীত হইয়া পড়িয়াছি। মা! এমন ভয়ঙ্কর শ্মশান আর কোথায় ? এখানে প্রতিদিন শত শত শুভ বাসনা শুষ্ক কাষ্ঠের মত প্রবৃত্তির আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে !

আয় মা ! তবে একবার এই শ্মশান-হৃদয়েই তোমার আসন পরিগ্রহ কর! আমার হৃদয়ের করুণ বেদনা, রোগের ভয়াল আর্ত্তনাদ, মর্ম্ম ফাটা রোদনের অব্যক্ত ধ্বনি সেখানে সঙ্গীতের কাজ করিবে ! পত্র, পুষ্প, নৈবেদ্য আর কি আহরণ করিব মা ! আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র কোমল ভাবগুলি গন্ধহীন পুষ্পের কাজ করিবে। ভক্তেরা যে তোমার আকাশ-থালে সূর্য্য চন্দ্রের দীপ সাজাইয়া, মনকে অর্ঘ্য করিয়া, পঞ্চপ্রাণের পঞ্চপ্রদীপ জালাইয়া, সহস্রার-কমল-চয়িত সুধা-ধারাকে আচমনীয় ও পানীয় জল রূপে নিবেদন করেন ;—অভক্ত আমি, দীন কাঙাল আমি, সে কোথায় পাইব মা ? আমার শ্রদ্ধা-বিহীন—ভক্তিবিহীন শুষ্ক ভাব-কুসুমগুলি, এবং অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ের তপ্ত অশ্রুই আমার পূজার সম্বল। আমার প্রাণের অক্ষম শক্তির ব্যাকুলতা অর্ঘ্যরূপে প্রদান করিব। মা গো ! এ তো কৈলাস নয়, এ যে শ্মশানের পূজা ; এখানে এই দীন পূজার দীন আয়োজনেই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তারপর তোমার বলির কথা ভাব্‌ছি ! কি আছে আমার, তোমার চরণে কি বলি দিব ? ভক্তেরা যে আত্ম-বলি তোমার চরণে নিবেদন করেন, সে শক্তি তো আমার নাই ! তুমি জোর করিয়া আমার মোহ-আসক্তিকে বলিরূপে গ্রহণ কর ! আমি এত চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত আমাকে "আমার" করিয়া লইতে পারি নাই ; তবে তোমার পাদপদ্মে আর কি বলি দিব মা ? অসুর-নাশিনী ! একবার হুহুঙ্কারে দিগন্ত সংক্ষুব্ধ করিয়া রিপুকুলকে স্তম্ভিত করিয়া দাও ! তাহারা যেন স্বেচ্ছায় তোমার চরণে আপনাদিগকে বলি দেয়। একটা কথা তোমাকে বলিতে বড় ইচ্ছা হয় মা ! এ সমস্ত জগদ্‌ব্যাপার সবই তো তোমারই মায়া ! তুমি যেমন মুক্তিদাত্রী মাতৃমুর্ত্তি রূপে ভক্ত প্রাণকে সুশীতল কর, তেমনি তুমিই তো এই মহা-মোহ-রূপিনী অনাদ্যা অবিদ্যা ! হাঁ গো অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ! যদি মায়ার পরপারে না যাইলে মুক্তি, দিবেই না স্থির করিয়া থাক, তবে একবার তোমার পরম অনুরক্ত ঋষি-বাক্যের সার্থকতা কর।

"সং মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ।"

এই তো তাঁরা বলেছেন, তুমি প্রসন্না হলেই জীবের মুক্তি হয় ; তবে তোমার সেই ভক্তাভয়দায়িনী, প্রসন্না দক্ষিণা-মুর্ত্তিকে একবার প্রকটিত কর মা! আর কেন মা! যথেষ্ট হয়েছে ; এইবার একবার আবরণ উন্মোচন কর, চক্ষের ধন্দ—মনের সন্দ মিটিয়া যাক। তোমার ত্রিতাপহারিণী, শোক-তাপ নাশিনী, গণেশজননী মূর্ত্তি হেরিয়া আমাদের ভীতি-কম্পিত বক্ষ নির্ব্যাকুল হ'ক। একবার শরণাগত-জন অভয়-দায়িনী হইয়া অভয় নেত্রে চাহ মা ! সমস্ত ভয়, সমস্ত শোক, সমস্ত বিদ্বেষ, সমস্ত বিভেদ তোমার দৃষ্টিপাতে অমৃত হইয়া যাক্। তুমিই তো "শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণা" তবে আর কোথায় শরণ চাহিব মা ! সমস্ত জগতের আধারভূতা চৈতন্যরূপিনী যে মা তুমি ! সমস্ত বিদ্যা যে তোমারই বিভূতি ! একরার সেই বিদ্যার আলোক জ্বালাইয়া দাও মা ! যেন আমরা বুঝিতে পারি "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—এ তুমিই ! তোমার মাতৃ-মূর্ত্তির বরণীয় ভাবে যেন বুদ্ধিকে স্থির রাখিতে পারি এবং এইরূপে হৃদ্‌রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। আমরা যে হরিণ-নয়নীদের চঞ্চল কটাক্ষে ও কামাগ্নিতে প্রতিদিন জীবনকে বলি দিতেছি, একবার তোমার অপরূপ 'অরূপ' সত্ত্বায় 'সব' রূপ মিশাইয়া 'সর্ব্ব মঙ্গল-মঙ্গল্য' মাতৃমুর্ত্তিকে প্রকাশিত কর ; আমরা তোমার বরাভয়প্রদ মূর্ত্তি দেখিয়া বাঁচিয়া যাই। স্বর্গ অপবর্গ তুমি সবই দিতে পার তা জানি, লোকে তোমারই কৃপা-কটাক্ষে ঐশ্বর্য্যশক্তি লাভ করিতে পারে সত্য ; কিন্তু মা গো, আর মুগ্ধ করিওনা, আর ছেলেকে লইয়া ছেলেখেলা করিওনা। আমি, তুমি, পর, আপনার সহস্র ভেদ আছে ; স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, মুর্খ-জ্ঞানী, ধনী-দরিদ্রের শত পার্থক্য বর্ত্তমান আছে, একবার তোমার অভেদ ভাবে সব ভাবকে মিশাইয়া স্ব স্বরূপে দাড়াও মা ! রণরঙ্গিনী, কত যুগ ধরিয়া কত যুদ্ধ করিলে মা, এইবার তোমার অসি কোষবদ্ধ কর! অসির কি প্রয়োজন মা ! তুমিই তো সমস্ত জনগণের হৃদয়স্থিত বুদ্ধিরূপিনী ! একবার আমাদের বুদ্ধির মধ্যে তোমার আবির্ভাবকে সম্ভব কর মা ! তোমার স্পর্শে আমাদের সত্ত্ব-সংশুদ্ধি হইলে, তখন তোমাকে আর বিরক্ত করিব না। আমরা ভুল করিয়াছি, তাহাতে যে অপরাধ হইয়াছে তাহা মানি ; কিন্তু সে ভ্রান্তি কার ? সে মোহে আবদ্ধ করিতেও তুমি, সে মোহ-পাশ ছিন্ন করিতেও তুমি ! এই যে "আমি আমি" আর "আমার আমার" করিয়া কেবলই ঘুরপাক খাইতেছি ; একবার সেই মোহের নিদারুণ আবর্ত্ত থামাও মা ! সকল বিশ্বের আদি জননী ! সমস্ত বিশ্ব তোমারই

সন্তান, তবে আর আমাদের কে পর—কে আপনার? সকলেই যে আমরা এক,—এই একত্বকে বুঝিয়া যেন আমরা অভিমানকে খর্ব্ব করিতে পারি! গভীর মোহান্ধকারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, সমস্ত জগৎ আজ কুলাল-চক্রের মত বিঘুর্ণিত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। জন্ম-মৃত্যুর ভ্রম, সুখ-দুঃখের ভ্রম, স্ত্রী-পুরুষের ভ্রম আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এই মহোপসর্গ হইতে তুমি ভিন্ন আর কে পরিত্রাণ করিতে সমর্থা হইবে মা!

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং, বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশ বন্দ্যা ভবতী ভবায়, বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তি নম্রাঃ॥

একবার তোর চারু-চরণে আমাদিগকে লুটাইয়া দে মা, আমরা ইচ্ছা করিলেই আর তো তোমাকে প্রণাম করিতে পারি না। শত জন্মের কত জঞ্জাল যে এ মাথায় পূর্ণ হইয়া আছে, বোঝার মত ভার—সে ভার লইয়া কি নত হওয়া যায় মা!

সুদীর্ঘ পন্থা, বহু ভার স্কন্ধে এ ভব ভ্রমণ করিয়া বড় ক্লান্ত হয়েছি মা! একবার তোর শ্রান্তিহরা সুপ্তিভরা মুখখানি লইয়া আমার সম্মুখে দাড়াও মা! আমি তোমার অমল কমল মুখখানি দেখিতে দেখিতে যেন আমাকে ও জগৎকে ভুলিয়া যাইতে পারি! বোঝার ভারে মাথা ফাটিয়া গেল যে মা! সে ভার নামাইয়া লইবার ভার তুমি ছাড়া আর কে লইবে বল? তোমার স্তন্য-পীযূষ ধারায় এই বুভুক্ষিত তৃষ্ণা-পিড়ীত চিত্তকে ক্লেশ মুক্ত করিয়া তোমার পাদাভিবন্দনের অধিকার দাও মা! আমরা তখন সকল ভেদ ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিতে পারিব,—

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদাভব॥

অন্য বর নয় মা! শুধু এই বর দাও, যেন আমরা জ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পাই। "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ।

"ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমোনমঃ॥
চিতিরূপেন যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

———

কৃপাময়।

অসীম তোমার দয়া কে বুঝিতে পারে ওহে।
নানারূপে, নানা ছন্দে, অন্তরে বাহিরে বহে॥
কত ভাবে দয়াময় ঝরে পড়ে তব স্নেহ।
তোমারি ত' দেওয়া প্রভু এই প্রাণ মন দেহ॥
মঙ্গল আশীষ তুমি ঢালিতেছ অনিবার।
কভু বা সুখের মাঝে, কভু দিয়ে শোকভার॥
হে দয়াল ভাবি যত, দয়ার কাহিনী শত।
অবিরল আঁখিধার ঝ'রে প'ড়ে অগণিত॥
ভেসে যায় বুক মোর ওঠে হৃদি উথলিয়া।
তোমার প্রেমেতে নাথ সব বাধা ভাঙ্গি দিয়া॥

শ্রীমতী লীলা দেবী।

— — —

মোক্ষ]

মোক্ষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা গতবারে 'পুরুষ'-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। চৈতন্যের যে প্রবণতা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে খেলিয়া ও বিশিষ্ট ভাবে বস্তু প্রভৃতি ভোগ করিয়াও উহা সেই খেলার অতিগ ভাবে অবস্থান করে, সেই 'পরা'-গতিকেই 'পুরুষ'-তত্ত্ব বলে। 'পরা' শব্দের এই অর্থ না করিয়া অনেকেই পুরুষকে প্রাকৃতিক ভাষায় বুঝিয়া মোহে আবদ্ধ হন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে 'উৎকর্ষ' শব্দেও এই অতিগ অর্থ আছে। কিন্তু ভেদভাবে অবস্থিত জীব শাস্ত্র-চর্চ্চা করিয়াও ভেদভাব ত্যাগ করিতে পারে না। সেইজন্য 'উৎ' 'উৎকর্ষ' প্রভৃতি শব্দে ভেদাত্মক 'শ্রেষ্ঠত্ব' বুঝিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ও অপকৃষ্টত্ব আপেক্ষিক শব্দ। দুইটী বস্তু সমজাতীয় না হইলে, একটিকে অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে না। এই সমজাতীয়ত্ব বা সমানাধিকরণ-বুদ্ধি না থাকিলে, আমরা যোগ বিয়োগ প্রভৃতি কোন ক্রিয়াই করিতে পারি না। দুইটী ঘোড়া হইতে একটী গরুকে বাদ দেওয়া যায় না; কিম্বা পাঁচটী মহিষে তিনটী ছাগল যোগ করা যায় না। তবে স্থূল-শরীরের সমাধিকরণ জ্ঞান দ্বারা আমরা বিভিন্ন জীবের তুলনা ও পরস্পরে সম্পর্ক সিদ্ধ করিতে পারি।

এইরূপে শক্তি বা চৈতন্যাংশ অবলম্বন করতঃ গজ ও মানবের বুদ্ধির তারতম্য করিতে পারি। সুতরাং বুঝা গেল যে প্রত্যেক বিশেষ ভাবের অন্তরালেই সমানাধিকরণত্ব বা শক্তিমত্ত্বা বা অন্য কোনও প্রকার সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন 'আম্র বুদ্ধি';—ঐ বুদ্ধি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে উহা 'সামান্য, এবং 'বিশেষ' উভয় ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থ বা বস্তু মাত্রেই 'সামান্য ও বিশেষাত্মক'। 'সামান্য বিশেষাত্মনোহর্থস্য' (পাতঞ্জল ১। সূ ৭ ব্যাস ভাষ্য)। আম্রত্ব, ফলত্ব, বস্তুত্ব এইগুলি আম্রের অবিশেষ বা সামান্য ভাব। আর বিশিষ্ট-ফল বুদ্ধিটি উহার বিশেষভাব। উভয় ভাবই ঘনরূপে মিশিয়া আছে বলিয়াই ব্যবহার সিদ্ধ হয়। এই বিশেষ ও সামান্য ভাব আর একটু বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক।

'ফলত্ব' 'বস্তুত্ব' প্রভৃতি বুদ্ধি যদি কোনও কৌশলে বিশেষাবলম্বনে আমাদিগের বুদ্ধি হইতে অপসৃত করা হয়, তাহা হইলে একটী আম্র প্রত্যক্ষ করতঃ কি জ্ঞান হয়, পাঠক! বলিতে পার কি? উহাতে 'কি—একটা—কিছু' বুদ্ধি থাকিবে বটে; কিন্তু আর কিছু বলিবার সামর্থ্য থাকিবে না। ঐ 'টা' ভাব লইয়া দেখিলে ঘোড়াটা, গরুটা ও আম্রটা সকলই একভাবে থাকিয়া যাইবে, পার্থক্য থাকিবে না। আম্র দর্শনে যে বিশেষ বুদ্ধি জাগরিত হয়, একটী অশ্ব দর্শনেও সেই বুদ্ধিই জাগিবে। এইরূপে প্রত্যেক বস্তুই কি এক অভিনব বিশেষত্বের ইঙ্গিত প্রদর্শনের জন্যই আমাদিগের সমক্ষে 'টা'এর পরিচ্ছদে ক্রিয়া করিতেছে! এই বিশেষত্বে বিশেষ আছে—ভেদ নাই। ঐ বিশেষ ভাবটী কি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাত্মক ভাব হইতে পৃথক? না, এই বিশেষ ভাব আঁকিবার জন্যই ত' সর্ব্বাত্মক বা সামান্য ভাবগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আম্রটি মিষ্ট, সুগন্ধি। ফলরূপ জাতি-জ্ঞান দ্বারা আম্রটী সমগ্র ফলের সহিত এক হইয়াছে। 'বস্তুত্ব' বোধের দ্বারা সমস্ত জগৎ-বস্তুর সহিত এক হইয়াছে। এমন কি যে যতটা একত্ব জ্ঞান দেখিতে পায়, তাহাকে আমরা ততটা বিদ্বান বলিয়া মনে করি। অজ্ঞলোক আম্রের মিষ্টত্বকে ভেদজ্ঞানে উহার বিশেষ ভাব বলিয়া মনে করে; কিন্তু বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক উহার ভিতরে Saccharine 'সর্করা' তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে। এই তত্ত্বের জন্যই ত মিষ্টতা! 'অজ্ঞ' এই বিশেষ ভাবটীকে সর্ব্বদাই অন্য বিশেষ হইতে সাবধানে পৃথক করিয়া আগুলাইতে থাকে। 'তাহার' বোম্বাই আম গাছের ফল এত মিষ্ট, যে রাম, শ্যাম, ও হরির গাছের ফল তত মিষ্ট নহে। হরির ফলটী বোম্বাই বটে, কিন্তু একটু খোলা পুরু; রামের

ফলের আঁটি একটু বড়, নগেনের ফলে একটু আঁশ মোটা। এইরূপভাবে ভাবিয়া সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইয়া চেষ্টা করে, যেন 'তাহার' আম্রবুদ্ধিটী অন্য আম্রের সহিত সমান না হইয়া যায়। তাহার মৌলিক প্রবৃত্তি এই যে সেই মিষ্ট-রসটীকে সর্ব্বাত্মক করিতে গেলে, তাহার ভয় হয় বুঝি 'বিশেষ' সুখ-স্বরূপত্ব হারাইয়া যাইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দেখেন যে মিষ্ট রসটী ভেদভাবের নহে, উহা সর্ব্বাত্মক (Saccharine) শর্করা তত্ত্বের অস্তিত্বেরই প্রমাণ। ইহা দেখিয়াই তিনি পাথর ও কয়লা হইতে,—বিটপালম্ হইতে, এমন কি মানবের মূত্রাদি হইতে সমরস মিষ্টত্ব উদ্ধৃত করতঃ একত্ব বুদ্ধিতে পরিতৃপ্ত হন। তাঁহার বিশেষ-বুদ্ধি সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির সহিত ঘন হইয়া মিশিয়া আছে। আমরাও সেইরূপ নিজের সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে সর্ব্বদা ভেদভাবে স্থাপিত করিয়া আগুলিয়া রাখি। আমার পুত্রটি তোমার পুত্রের সহিত অনেকটা সমান হইলেও তবুও একটু বিশেষ আছে। আমার পুত্র-বিয়োগ তোমার পুত্র-বিয়োগের সমান হইলেও, আমার পুত্র-বিয়োগে তবুও একটু বিশেষ আছে। আমরা ভুলিয়া যাই যে সেই 'বিশেষ' ভাবটী বিগত শেষ অর্থাৎ যাহাতে শেষ বা অন্তভাবও মিশিয়া যায়,—যাহাতে 'আদি অন্ত মধ্য' অতলে মিশিয়া যায়, সেই পরম বিশেষ শ্রীভগবানেরই জন্য। তিনি যে সর্ব্বদাই 'উৎ' বা 'পুরুষ' ভাবে অবস্থিতরূপে অবস্থিত থাকেন! সুতরাং ভাই ভক্ত তোমার এই মোহ কেন? কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও মহাদেব-তত্ত্বকে এক করিয়া বলে যে উহা এক ঘন সমরসেরই ব্যঞ্জনা, তাহা হইলে ভাই বৈষ্ণব! তোমার ভয় হয় কেন, বুঝি ভগবানের বিশেষত্ব হারাইয়া গেল? কেন ব্যস্ত হইয়া শিব-তত্ত্ব হইতে কৃষ্ণ-তত্ত্বের পার্থক্য স্থাপনের জন্য বুদ্ধি ও শাস্ত্রের আস্বকৃত্যের আয়োজন কর? কেন ভুলিয়া যাও যে যতই সমরস বা একত্ব ভাব আসুক না কেন, পুরুষ যে সর্ব্বদা উৎ রূপে খেলিবেই খেলিবে। কেন ভ্রান্তি বশে ভাব যে পুরুষের এই উৎ বা 'পরা' ভাব আমাদের মানব-সুলভ ভেদ ভাব হইতে উৎপন্ন? তিনি মদন-মোহন ত' বটেনই; মদনের সর্ব্ব বিমোহন ও পরাভাবও তাঁহার পরাভাবে ডুবিয়া মিশিয়া যায়। কিন্তু তিনি যে অপ্রাকৃত মদন-মোহন; তাঁহার বিশেষত্ব ত' প্রাকৃত ভেদ-ভাবের দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। অপরপক্ষে সেই প্রাকৃতিক ভেদের ভিতর যে পরিমাণে সমতা বা একত্ব দেখিতে পাইবে—সর্ব্বজীবে তাহার সমরূপ অধিষ্ঠান যখনই দেখিতে পাইয়া তোমার ছিন্ন 'বহুজীব' জ্ঞানটী কৃষ্ণাধিষ্ঠান রূপ সমজ্ঞানে যখন মিশিয়া যাইবে, তখনই ত' বৈজ্ঞানিক শর্করাতত্ত্বের ন্যায় তাঁহার আনন্দময়ত্ব সপ্রমাণিত হইবে।

ভাই! তোমার ভগবানকে আগুলিবার আবশ্যক নাই। তিনি যে স্বপ্রকাশ ও স্বভাব-সিদ্ধ; তিনি সাধনায় প্রকাশিত হইলেও সাধনার জন্য-ফল নহেন। তোমার জন্ম-জ্ঞান এখনও দূর হয় নাই বলিয়াই, তোমায় সম্প্রদায়িক ভাবের সংস্কারগুলি উঠে। জন্ম-জ্ঞান দূর হইয়া গেলে, তখন তুমি 'সর্ব্ব' ও 'জ্ঞ' উভয় তত্ত্বেই একই রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তখন আর ভেদ ভাবে 'মহাপ্রভুর' বিশেষত্ব, 'খ্রীষ্টের' অমানুষত্ব, 'শঙ্করের' যোগ, প্রভৃতি স্থাপনা করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। প্রকৃতির 'বহু'গুলি এক না হইলেও 'রূপ' হয় না। ভাগবতে উক্ত 'ব্রহ্মার মোহ নাশ' অধ্যায়টী বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই তত্ত্বই দেখিতে পাইব।

ভাগবতে আছে যে, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, যাঁহাকে যোগবাশিষ্টে 'আকাশজ পুরুষ' বলে ও যিনি শুদ্ধ আকাশ-তত্ত্ব এবং তাহাতে অভিব্যক্ত 'অহং স'—'আমি সেই' —এই মহাভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন বলিয়া শাস্ত্রে হংস-বাহন রূপে অভিহিত হয়েন,—তিনি মায়াক্ষেত্রে অভিব্যক্ত ভগবানের মহিমা আর একটু বুঝিবার জন্য মায়ার বশে গোপ ও গো সকলকে অন্তহিত করিয়া লইলেন। এখানে ব্রহ্মার চৈতন্য এবং জ্ঞানী বা ভক্তের চৈতন্যের পার্থক্য একটু বুঝা আবশ্যক। ব্রহ্মার চৈতন্য শুদ্ধ স্বপ্রকাশ, ও সৃষ্ট বস্তু প্রভৃতির দ্বারা অবাধ্য 'অহং'-প্রত্যয় রূপ। সেই অহংটীকে অবস্থিত হইয়া তাহার পরাগতি রূপ 'স' ভাবের সহিত একীকরণ সমাধান করাই ব্রহ্মার প্রবৃত্তি। যেমন আজ কালের সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব অথচ দুর্দ্দশাগ্রস্থ ভদ্র সন্তান, সর্ব্বদাই 'আমি অমুকের পৌত্র' ইত্যাদি স্মৃতির সাহায্যে নিজের 'আমিটীকে' বংশগত ভাবের সহিত এক করিবার চেষ্টা করে, সেইরূপ ব্রহ্মাও আপনাকে শুদ্ধ ও বিশিষ্ট 'অহং' বলিয়া জানিয়া, সেই 'অহং'এর ভিতর ভগবানের 'পরা' ও 'সর্ব্বাত্মিকা' ভাবের ছায়া দেখিতে পান নাই। শুদ্ধ 'অহং' তত্ত্ব গীতার উক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় প্রকটিত হয়। উহা বৃত্তি প্রভাবের অতিগ, নিষ্কল ও স্বপ্রকাশ। কিন্তু উহাতে 'পরা' প্রবৃত্তি নাই বলিয়া উহাতে কোনরূপ ভাগবৎ-কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। অনেকে এই 'আমি' লাভকেই 'মোক্ষ' বলিয়া ভাবেন। কিন্তু উহা সত্য নহে; স্থিত-প্রজ্ঞের 'আমির' দৃশ্য বা ক্ষেত্র থাকে, তখনও বাহিরের খেলা এবং 'আমিটী' সেই খেলার দ্রষ্টারূপে থাকে। সেইজন্য ভাগবত বলেন, যে এইরূপে শুদ্ধ 'আমি' ভাবে সিদ্ধ বা 'আত্মারাম' এবং নির্ব্বিকারীও দ্রষ্টারূপে অবস্থিত,—সুতরাং 'মুনি'গণ অহঙ্কারের গ্রন্থি-শূণ্য হইলেও এবং বাহ্যভাবে বস্তু ক্রিয়া প্রভৃতিরূপে প্রকাশিত খেলার

দ্রষ্টা হইয়া অবস্থিত হইলেও, তাঁহারা ভগবৎ-তত্ত্বে অসিদ্ধ। কারণ তাঁহারা এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে 'আমি'রূপে 'পরা'গতিটী শ্রীভগবানেই পরিসমাপ্ত, 'সর্ব্ব'রূপে অবস্থিত বহিরের খেলাটীও ভগবানের 'সর্ব্বাত্মিকা' ভাব প্রকট করিবার জন্যই আছে। এইজন্য 'পুরুষ'-তত্ত্বের কিঞ্চিৎ অববোধ হইলেও, শ্রীভগবানই যে একমাত্র পুরুষ, এই বোধ না হওয়াতে সেই নির্গ্রন্থ মুনিগণও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

''আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাপি উরুক্রমেঃ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকী ভক্তিম্ ইত্থম্ভূত গুণঃ হরেঃ।।"

ব্রহ্মার 'আমি'টীও ঐরূপ। তাঁহার 'অহং' ভাব সিদ্ধ হইয়াছে; সেই জন্য সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহারই 'অহং' প্রকাশ-ক্ষেত্রে প্রথম ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু 'অহং'এ ভগবৎ-বোধ হয় নাই বলিয়া, ও 'সর্ব্ব'ভাব যে ভগবানেরই মায়া ইহারও অববোধ না হওয়াতে, সেই নির্ম্মল ব্রহ্মার 'আমি'টীও প্রকাশিত হইয়া 'আমি কে ও কেন সৃষ্ট হইয়াছি'; ইহা বুঝিতে পারিলেন না; এবং অবশেষে "তপস্যা কর" এই অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বাহ্য সৃষ্টির অভিমুখী প্রবৃত্তিগুলিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্দ, নবম অধ্যায়ে এই বিষয়টী উক্ত হইয়াছে। ভগবান তখন ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন,—

''জ্ঞানং পরম গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহানগদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যাহম॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥৩০।৩১।৩২।৩৩॥

ভগবান কহিলেন,—'ব্রহ্মন্! মদ্বিষয়ক জ্ঞান্, বিজ্ঞান ও ভক্তি অতি গুহ্য। তথাপি সাধনের সহিত সেই সমুদায় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। আমার যেরূপ স্বরূপ, স্বত্ত্ব, রূপ, গুণ এবং কর্ম্ম,—তুমি আমার অনুগ্রহে সে সমুদায়ই উত্তমরূপে জানিতে পারিবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম্। যাহা বাস্তব অর্থ বা বস্তু না হইলেও বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, এবং যাহা বাস্তব

হইলেও প্রতীত হয় না ; তাহাও আমার আত্মারূপ অধিষ্ঠানেই হইয়া থাকে; উহাই আমার মায়া বলিয়া জানিবে ! তাহাতে আভাস ও তমঃ এই দুই ভাবই আছে।'

ব্রহ্মার উপদেশে ভগবান দুইটী কথা বলিলেন ;--একটী 'যাবানহম্' বা আমি যেরূপ যেরূপ বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হই ; "যথাভাব" অর্থাৎ যেরূপ যেরূপ সত্ত্বাবান এবং "যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ" অর্থাৎ যেরূপ রূপ, গুণ, কর্ম্ম লইয়া প্রকাশিত হই ;—এইটীকে প্রকাশ-ভাব বলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন গুণ কর্ম্মে, ভগবান বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া আছেন। সমস্ত জগদ্বস্তুর ভিতর ভগবানের 'যাবান্' বা 'মাত্রা' অংশ ও তাঁহার গুণকর্ম্ম প্রভৃতি না বুঝিলে, ভগবৎ-অধিষ্ঠানেস্থিত হইয়া, ব্রহ্মা পুনরায় নাম রূপাত্মক জগতে সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। তারপর এই প্রকাশের মূলে যে একমাত্র স্বরূপ-তত্ত্বের প্রকাশ আছে ও তাঁহারই সেই শুদ্ধ 'অহম্' যে সকল বস্তু 'অগ্রে' বা কারণ রূপে, 'পশ্চাতে' বা কার্য্য রূপে এবং 'অবশেষে' বা শুদ্ধ স্বরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া আছেন, এই দ্বিতীয় তত্ত্বটী বুঝিতে বলিলেন। এই দুইটী তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই যেন দশম অধ্যায়ে গো ও গোপবালকগণের হরণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। (ক্রমশঃ)

কস্যচিৎ ভট্টাচার্য্যস্য

[মোক্ষ]

মহাপূজা।

ওঁ নমো শ্রীগুরবে। আমরা গত দুই বৎসরে মহামায়া দেবীর তিনটী লীলা সামান্য ভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এইবারে সেই লীলা আর একটু বিশেষ ভাবে বুঝিতে ইচ্ছা আছে। যে ভাবে বুঝিলে, তাঁহার কৃপা মানব-জীবনে প্রতিভাত হয়, এইবার আমরা সেই ভাবেই বুঝিতে চেষ্টা করিব। ওঁ তন্নোধীয়ো প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

অনেকেই মহিষাসুর-বধ চরিত্রটী জগতের ইতিহাসের একটী বহু পুরাতন ঘটনা বলিয়া জানেন। শাস্ত্রোক্ত ঘটনাগুলি যে কেবল শুষ্ক ইতিহাস নহে, শাস্ত্রও যে ঐ সকলের মধ্য দিয়া মানবের জীবনে নিত্য সংঘটিত, ঘটনা, শক্তি ও তত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহা ভুলিয়া আমাদের জীবনে মহাপূজার নিত্য আবশ্যকতাটী বিস্মৃত হই। ঐ ইতিহাস কথা বলিবার জন্য শাস্ত্রের আবশ্যকতা

নাই। শাস্ত্র কেবল স্থূল লইয়া খেলা করেন না, পরন্তু প্রতি-ছত্রে, যে সকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষের অতিগ ও যাহা না বুঝিলে মানবের পরমার্থ তত্ত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহারই ইঙ্গিত করিবার জন্য শাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

মহিষাসুর-বধে যে নিত্য সত্য তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়, ঐ তত্ত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে আজ বাঙ্গালা দেশের ঘরে ঘরে মহিষাসুর-বিনাশিনী দেবীর আবাহন কেন ? "শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে বাঁকা, থাকুন্ তিনি পটেই আঁকা" সেই রকম অতীতের একটী-চিত্রাঙ্কনের জন্যই কি বঙ্গদেশ আজ এত আনন্দের স্রোতে নিমজ্জিত ? সকলের প্রাণের অন্তরালে আশার অস্ফুটবাণী জাগিতেছে যে, যাহা একদিন কল্পারম্ভে সৃষ্টির প্রাক্কালে হইয়াছিল, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে হইতে পারে। সুধু স্মৃতি-বলে বলীয়ান্ হইয়াই সাধক এ পূজায় অগ্রসর হয় কি ? না, তাহার প্রাণে মহাপূজার অন্তরালস্থ চির-পুরাতন অথচ নিত্য-নূতন তত্ত্বের স্ফূরণ হয় বলিয়াই আজ তাহার এত আনন্দ !! ইতিহাসের ছবি লইয়াই কি হিন্দু-গৃহস্থ আজ মহামায়ার আবাহনে সচেষ্ট হইতেছে ? আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিতে ভাল লাগিতে পারে ; কিন্তু উহা ব্যাখ্যা মাত্র ; উহা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মহামায়া নিত্যা, তাহার লীলাও নিত্য—শাশ্বত।

পাঠক ! তোমার ভিতরে নিত্য প্রতিষ্ঠিত মহিষাসুরকে কি দেখিতে পাইয়াছ ? এমন কি তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি কখনও সন্ধিহান হইয়াছ ? যদি কখনও অনুসন্ধান করিয়া থাক, তবেই দ্বিতীয় চরিত্রের রহস্য সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে আমরা বলিয়াছি যে, সুষুম্না-ক্ষেত্রে বা পথে তিনটী গ্রন্থি আছে। ঐ তিনটী গ্রন্থি ভগবৎ-চৈতন্যের প্রকাশের তিনটী মূল ভাবের সহিত সম্বদ্ধ। ব্রহ্মার ভিতর দিয়া প্রকাশিত 'ব্রাহ্মী' চৈতন্যের, বিষ্ণু ভাবে প্রকাশিত 'বৈষ্ণবী' চৈতন্যের ও শিবভাবে প্রকাশিত 'শাম্ভবী' চৈতন্যের প্রকাশ, অহংকারের ক্ষেত্রে তিনটী গ্রন্থিযুক্ত হইয়া যায়। উহা ভেদাত্মক অহঙ্কারের আসুরী মায়ার ফল। ঐ গ্রন্থিগুলি ময়দানব নির্ম্মিত লৌহ, রৌপ্য ও সুবর্ণময় তিনটী পুর বলিয়া শাস্ত্রে অন্যত্র অভিহিত হয়। ব্রাহ্মী-ভাবের যে মোহ-গ্রন্থি আছে, তাহা মহাকালী ও বৈষ্ণব ভাবের মোহ, মহালক্ষ্মীর কৃপায় ছিন্ন করা যায়, ও তৃতীয় গ্রন্থিটী মহা-সরস্বতীর কৃপায় ধ্বংস হয়।

মোহ-গ্রন্থিগুলি কেন ? সে অনেক দূরের কথা। তবে আজ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উপনিষদে উক্ত আছে যে অসুরেরা একে একে প্রাণ

মন আদি সমস্ত তুষ্ট করিল ; কেবল মুখ্য প্রাণকে তুষ্ট করিতে পারিল না। বিশিষ্টতামূলক অহঙ্কারের প্রকৃত গতি না বুঝিতে পারিলে, এই মোহ-গ্রন্থিগুলি উৎপন্ন হইবেই হইবে।

মহিষাসুর বৈষ্ণব-গ্রন্থির মোহ। বিষ্ণু-শক্তিকে ভেদাত্মক বিশিষ্টতা বশে প্রয়োগ করিলে,—সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তিকে কামনার বশ করিলে,—সেই ভেদাত্মক কামনার ফলে প্রতিনিয়ত মহিষাসুরের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তত্ত্বটি বুঝিতে গেলে, বৈষ্ণবী শক্তির প্রধান ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তারপর সেই ভাবকে বিশিষ্টতা দ্বারা কবলিত করিলে কি মোহের উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত আছে যে, লোক সৃজনেচ্ছায় সৃষ্ট তত্ত্বগুলি পরস্পর মিশিতে পারিল না, ও অবশেষে তাহারা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল,—

তৎ তে বয়ং লোক সিসৃক্ষয়াদ্য ত্বয়ানুসৃষ্টাস্ত্রিভিরাত্মভিঃ স্ম।
সর্ব্বে বিযুক্তাঃ স্ববিহারতন্ত্রং ন শক্নুমস্তৎ প্রতিহর্ত্তবে তে॥
যাবদ্বলিং তেঽজ হরাম কালে, যথাবয়ঞ্চান্নমদাম যত্র।
যথোভয়েষাং ত ইমেহি লোকা বলিং হরন্তোঽন্নমদন্ত্যনূহাঃ॥৩।৫।৪৮।৪৯॥

'হে আদ্য' আমরা তোমারই, আমাদিগে তোমার 'আমি'ই প্রকাশিত হইবার কথা ; কিন্তু সত্ত্বাদি তিন স্বভাবে, তোমার ব্রহ্মা-মূর্ত্তি দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায়, আমরা প্রত্যেকে ছোট ছোট 'আমির' অভিব্যক্তির স্থান হইয়াছি। আকাশের 'আমিটী' বায়ুর 'আমির' সহিত মিশে না। চক্ষুর 'আমিটী' কর্ণের সহিত মিশে না। এই পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব নিবন্ধন আমরা কোনও প্রকারেই একীভূত হইতে পারিলাম না। ক্রমে ক্রমে উৎপাদিত হইয়াছি বলিয়াই মিশিতে পারি নাই ; "ক্রমেণোৎপাদিতাঃ ত্রিভিরাত্মভিঃ সত্ত্বাদিভিঃ স্বভাবৈঃ।" শ্রীধর। সুতরাং তোমার বিহারোপযোগী,—তোমার 'আমি'টী যাহাতে ফুটিয়া উঠে, এমন দেহটী গড়িতে পারিলাম না। অতএব "ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা"—তুমি তোমার স্বীয় জ্ঞান শক্তিসহ আমাদিগকে দেও। হে অজ! তাহা হইলে যাহাতে আমরা তোমাকে সমস্ত ভোগ্য সমর্পণ করিতে পারি ও তাহার সঙ্গে আমাদিগেরও অন্ন-ভোজনের সামর্থ্য হয় ; এবং যেখানে থাকিয়া জীব তোমার ও আমাদের ভোগ্যবস্তু আহরণ করতঃ আপন আপন অন্নে সিদ্ধ করিতে পারে, এমন জ্ঞান দেও।"

সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের শক্তি ও চক্ষুর আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে এই

বলা যাইতে পারে যে, এই বিশ্ব কেবল তাঁহাকেই দেখাইবার জন্য ; এবং তিনিই ইহার একমাত্র ভোক্তা, দ্রষ্টা, গতি ও সাক্ষী। সুতরাং তাঁহার ভাবে ভাবিত না হইলে, এই বিশ্ব দ্বারা তাঁহার লক্ষণারূপ কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। যাহার দেহ বা অভিব্যক্তি আবশ্যক, তদনুগত ভাবেই কার্য্য-ভূত তত্ত্বগুলি এক না করিলে, তত্ত্বগুলি মিশিতে পারে না। এইজন্য প্রেতাদির আবেশ-তত্ত্বে দেখা যায় যে, আবিষ্ট ব্যক্তির শরীরাদিও ক্ষুব্ধ করিয়া, তত্ত্বগুলিকে আবেশ-কর্ত্তার সহিত সমভাবে আনিতে না পারিলে, সেই দেহের সাহায্যে আবেশ-কর্ত্তার প্রকাশ হইতে পারে না। তত্ত্বগুলিকে এই প্রকারে অনুপ্রাণিত করাকে 'অনুগ্রহ' বলে। 'যদনুগ্রহতো যস্যানুপ্রবেশেন লব্ধ সামর্থ্যা সন্তঃ' ইতি শ্রীধরঃ। দ্বিতীয় কথা এই যে, তত্ত্বগুলি ক্রমে ক্রমে ও বিভিন্ন ভাবের বশে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া আছে। ব্রহ্মা সৃষ্ট হইয়া প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তৎপরে তপস্যা দ্বারা পূর্ব্ব-স্মৃতি লাভ করতঃ "যথাপুর্ব্বমকল্পয়ৎ" পূর্ব্বের ন্যায় সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে দুইটী দোষ উৎপন্ন হইল। তাঁহার জ্ঞানে 'অবশেষামৃতম্' ঘন, এক-রস ভগবদ্ভাব পরিস্ফুট ছিল না। কারণ তিনি বিশিষ্ট কর্ত্তা-বোধে ভাবিত হইয়া সৃষ্টি করিতে গিয়াছিলেন। সৃষ্টি ও লয়ের মূলে তত্ত্ব সমূহের ভিতরে যে এক পরম আনন্দ-ঘন তত্ত্ব বিরাজমান আছে, তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি সৃষ্টি করিতে উদ্যত হয়েন নাই। তাহার অভ্যন্তরে পূর্ব্ব-কল্পের পূর্ব্বভাবে পুনরায় প্রবুদ্ধ আকাশতত্ত্বের জ্ঞান ও স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইল ; এই স্মৃতি ইচ্ছা শক্তির সহিত মিলিত হইয়া বাহিরে আকাশ সৃষ্টি করিল। তাঁহার ভিতর বাহ্য বোধ আছে বলিয়াই, বাহিরে সৃষ্টি হইল। এই প্রকারে অগ্নি, বায়ু আদি তত্ত্বগুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট ভাবে উৎপন্ন হইল। কারণ ব্রহ্মা তত্ত্ব সকলের মূলভূত এক-ভাবে দিলেন না ও কালের ক্রমানুসারে সৃষ্টি করিলেন ; এই ব্রহ্মাই বাইবেল শাস্ত্রের পুরাতন-ভাগের পাশ্চাত্য ঈশ্বর। God said "let there be light" there was light ; God said "let there be water" and there was water. এই জন্য পুরাণ শাস্ত্রেও ব্রহ্মার সৃষ্টিকে অবিদ্যাসৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাঁহার সৃষ্ট তত্ত্বগুলির মধ্যে, তাঁহার বিশিষ্ট অহং-জ্ঞানের রস থাকিয়া যায় ; তত্ত্বনিচয় কেবলই তাহার পূর্ব্ব কল্পানুভূত ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় ; নূতন কল্পের, নূতন জীবের, নূতন ভাবের উপযোগিতা, এইরূপে সৃষ্ট তত্ত্বে আসিতে পারে না। ব্রহ্মার বিশিষ্ট 'আমির' রস-প্রবণতাকে 'মধু' বলে ; এবং পূর্ব্ব কল্পের বিশিষ্ট ভাবের সৃষ্টি-ক্রমের প্রতিষ্ঠাকে 'কৈটভ' বা 'কৈতব' বলে।' সেই জন্য

এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া দূরীভূত করিবার জন্য প্রথমে মহাকালীরূপা ভগবচ্চৈতন্যের অনুপ্রবেশ আবশ্যক।

কালসংজ্ঞাং তদা দেবীম্ বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥ ভাগ ৩।৬।২।

মহাকালীর কৃপা না হইলে কি ব্রহ্মায়,—কি জীবে তত্ত্ব-সমূহ পরস্পর মিশিতে পারে না। এই কথা আগামী বারে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কালশক্তির অনুপ্রবেশ হইলেই, উপাধি প্রস্তুত হয় না। কারণ মহাকালীর 'কলন ঘন একরূপ! সেই জন্য পুনরায় ভগবান বিষ্ণুরূপে অনু-প্রবেশ না করিলে, তত্ত্বগণের সুপ্ত কর্ম্ম সকল না জাগাইয়া দিলে, তদ্দ্বারা দেহ ও উপাধি প্রস্তুত হইতে পারে না। কালশক্তি বশে স্মৃতিগুলি আমাদিগের ভিতর জাগিয়া উঠিলে,. ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না। জীব শুদ্ধ দ্রষ্টা হইয়া স্মৃতিগুলিকে দেখিতে থাকেন। কালের ক্রমানুসারে আমরা বাল্যকালের ঘটনা-সমূহ দেখিতে পারি; কিন্তু তাহাতে কর্ম্ম-প্রবণতা জাগে না। ঘটনাগুলিকে পরস্পর সংহত করিলে, তাহারা মিশিয়া উপাধির সৃষ্টি করিতে পারে। স্মৃতি নিচয়ের মধ্যে কর্ম্মের প্রবণতা Co-ordination উদ্বুদ্ধ না হইলে, তদ্দ্বারা কর্ম্মের অধিষ্ঠান-ভূত দেহ প্রস্তুত হয় না। সে জন্য মহাকালী ও তাঁহার তনয় গণপতির অনুপ্রবেশ দ্বারা কথঞ্চিত একীকৃত গণনিচয়ে ভগবানের বৈষ্ণবী-শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইল। গণসমূহ স্ব স্ব ক্রিয়াশীলতা ও সংযোজন-শীলতা লাভ করিল। 'অংশ' বা মাত্রার সাহায্যে পরম পুরুষ পরাভাবে প্রবেশ করিবার পর, তত্ত্বগুলি কর্ম্মাংশেও পরস্পরের সহিত পরস্পরে মিলিয়া অণ্ড-সৃজনে সামর্থ্য লাভ করিল। তা'ই ভাগবৎ বলিলেন—

সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টা রূপেণ তৎ গণম।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্ ॥ ৩।
প্রবুদ্ধকর্ম্মা দৈবেন ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ।
প্রেরিতোঽজনয়ৎ স্বাভির্মাত্রাভিরধিপুরুষম্ ॥ ৪।
পরেণ বিশতা স্বস্মিণ মাত্রয়া বিশ্বসৃগ্‌গণঃ।
চুক্ষোভান্যোন্যমাসাদ্য যস্মিল্লোকাশ্চরাচরাং ॥ ৫। ভাগবৎ ৩।৬

ভগবান চেষ্টারূপে সেই গণসমুহে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন বা অংশ বলে ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট-তত্ত্বগুলি সংযুক্ত করিলেন ও তাহাদের সুপ্ত কর্ম্মগুলি অর্থাৎ পরস্পরে মিশিবার শক্তি সমূহ জাগরিত করিলেন। গণসমূহ এইরূপে প্রবুদ্ধ-কর্ম্মা হইয়া

দেব বা সদা স্বপ্রকাশ ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্ব স্ব মাত্রা সাহায্যে অধিপুরুষ বা বিরাট দেহ নির্ম্মাণ করিল। অগ্রে অকৃতকার্য্য হওয়ার কারণ এই যে, তাহারা ভিন্ন বা আংশিক অহং-ভাবে সমুৎপন্ন। এক্ষণে তাহারা সেই 'পর' (transcendent বিশ্বাতিগ অথচ বিশ্বাত্ম ও বিশ্ববীজ শ্রীভগবানের যোগিণী-শক্তি দ্বারা আবিষ্ট হওয়াতে প্রত্যেকেরই অভ্যন্তরে হিরণ্যগর্ত্ত ব্রহ্মার জ্ঞানের অতীত পরাভাবের বীজ সমূহ জাগ্রত হইয়া উঠিল ও তাহাতে তত্ত্বসমূহ ক্ষুব্ধ হইল। যেমন বিভিন্ন গাভীর বিভিন্ন স্বাদযুক্ত দুগ্ধ ক্ষোভিত হইয়া যে নবনীত উৎপাদিত হয়, উহা পরস্পরে অনায়াসে মিশ্রিত হইতে পারে,—তদ্রূপ ভিন্ন তত্ত্ব সমূহের অভ্যন্তরে পরাভাবের বীজ জাগ্রত হইয়া উঠিলে সেই তত্ত্বসমূহ মিশ্রিত হইবার সমর্থ লাভ করিল।

কথাটা আর একটু অনুধারণ পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে, কারণ ইহার উপরে শ্রীভগবানের মহালক্ষ্মী ভাববিলাস পরিস্থাপিত। অনেকেই মনে করেন যে দুইটী চক্ষু, দুটী কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র সমূহকে কোনও ক্রমে একত্রিত করিয়া,—এলোপ্যাথিক ডাক্তারের মত' Mft. Mix. Shake the bottle বলিলেই দেহ গঠিত হইল। এই ভ্রান্তি চিকিৎসা-শাস্ত্রেও রহিয়াছে। চক্ষুতে রোগ হইলে ঔষধ প্রলেপ করিলেই আরোগ্য হইবে, ইহা চিকিৎসকেরও বিশ্বাস। তাহা হইলে ত' মৃতদেহের চক্ষে প্রলেপ দিলেও, চক্ষু দৃষ্টি সম্পন্ন হইতে পারে। আধুনিক যোগী সম্প্রদায়ের শিক্ষাও এই ভ্রান্তি দ্বারা কলুষিত হইতেছে। তাঁহারাও খানিকটা প্রণায়াম, কতকটা ভূতশুদ্ধি, সামান্য জপ, বাকীটা আসনাদি ছিন্ন-ভাবে সাধন করিয়াই, সেই পরম একের আভাস পাইতে চাহেন। সে যাহা হউক তত্ত্ব সমূহের দুইটী ভাব আছে। উহারা অঙ্কশাস্ত্রোল্লিখিত ভগ্নাংশের ন্যায় 'বাচ্য' ও 'বাচক' (Numerator ও Dinominotor) লইয়া থাকে। আকাশ-তত্ত্ব শব্দের ইঙ্গিত করে; ইহা উহার বাচ্য বা numerator। আবার আকাশ-তত্ত্বে ভগবানের সর্ব্বাধিকরণ রূপ মহাভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; ইহা তাহার Dinominator বা 'বাচক'। প্রত্যেক মানবও এইরূপ একটী ভগ্নাংশ;—বাস্তবিকই "মমৈবাংশ"। তাহার প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তার ভিতর দিয়া যে ক্ষুদ্র অহং ভাবটী জাগিয়া উঠে, তাহার বাচ্য বা (numerator) ভাব। এই 'বাচ্য'ভাব ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি সামান্য সর্ব্বাত্মক (universal) ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব গুলি বিশিষ্টকে দেখায় না। উহার সর্ব্বদা অন্তরালাবস্থিত, সর্ব্বাত্মিকা মহাভাবে খেলে। রাম,শ্যাম, ও হরি তিনজনেই একটী সুন্দরী রমণীকে দর্শন করিল। রাম কামুক; সুতরাং এই দর্শনে তাহার ভিতরে তাহার বিশিষ্ট 'আমির' বিশিষ্ট ভোগলিপ্সা প্রবুদ্ধ হইয়া

উঠিল। হরি শিক্ষিত কবি ও ভাবুক ; হরি সেই রমণীর ভিতর দিয়া প্রতিভাত সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করতঃ সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া দেখিতে পাইল যে, চন্দ্রমা, মলয়ানিল প্রভৃতিতে পূর্ব্বে সে যে সৌন্দর্য্যের ভাব উপলব্ধি করিয়াছে, এই রমণী মূর্ত্তিতেও সেই সৌন্দর্য্যই বিকাশ হইতেছে। সে দেখিতে পাইল, যেন চন্দ্রমার কান্তি ছিন্ন হইয়া ঐ রমণী-মূর্ত্তির নখরাজির কিরণে প্রতিভাত হইতেছে ; উহার নিশ্বাসে মধুময় পরিমলবাহী মলয় পবন প্রবাহিত হইতেছে। উহার প্রত্যেক অঙ্গের সৌন্দর্য্য এই বিশাল বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থের সহিত সমন্বিত। যে বিশিষ্ট আধারে বিশ্বকে সমন্বিত করিয়া দেখিতে পারে, সেই ত' কবি !! কবির লেখনী-প্রসূত বিদ্যাসুন্দরের অতুলনীয় বিদ্যার চিত্রটী দর্শন করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ছিন্নে ও সর্ব্বে একই সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি না হইলে, তাহ লইয়া কবি সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি গঠিত করিতে পারেন না। কোথায় ফণী আর কোথায় বেণী,—কোথায় ঢল ঢল সুধায় অংশুমালার আধার চন্দ্রমা, আর কোথায় পদ-প্রান্তাবলম্বী নখ-নিকর! কোথায় মৃগমদ আর কোথায় অপাঙ্গ প্রান্তে প্রতিভাসিত অমৃতের ইঙ্গিত ! অথচ কবি সেই বিশ্লিষ্ট-প্রায় বস্তুতে কি একরূপ সৌন্দর্য্য তত্ত্ব বুঝিয়া বলিলেন,—

বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥
কেড়ে নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কি চাঁদ মৃগ নিয়ে কোলে॥

প্রকৃতই ভারতচন্দ্র ত' সেই চির-সুন্দরের প্রতি সদানুরক্তা মহাবিদ্যার চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

তারপর শ্যাম, মহামায়ার ভক্ত। তিনি রমণীরূপের প্রতি অঙ্গের সৌষ্ঠবে কেবল সৌন্দর্য্য দেখিয়াই তৃপ্ত নহেন ; তাঁহার চক্ষে সমস্ত ঘনীভূত হইয়া সেই মহামায়ার ভাষাই ইঙ্গিত করিতেছে। এই ভাবেই মহামায়ার রূপ বর্ণিত। তাহা না হইলে কোন্ ভক্ত মহামায়ার ধ্যান করিতে যাইয়া তাঁহাকে "পীনোন্নত পয়োধরাং" 'নিতম্বসদৃশো ভূবি' ইত্যাদি ভাবিতে সাহস করিতে পারে? জননীর যৌবন-বিভূষিত নগ্ন মূর্ত্তির সম্মুখীন হইবার স্পর্দ্ধা রাখে, আর কেই বা কাম ও কামনার পরিসমাপ্তিরূপ ভগবানকে চিন্তা করিতে যাইয়া

"গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং" বলিয়া ভাবিতে সক্ষম হয়। পরন্তু প্রত্যেক তত্ত্ব, প্রত্যেক বস্তুই পরাভাবে আমাদিগের চিত্তকে শ্রীভগবানের সম্মুখীন করিতে সক্ষম। $\frac{১}{২}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৫}+\frac{১}{৬}$ এই কয়টী ভগ্নাংশকে যোগ করিতে হইলে, গায়ের জোরে "মিশে যা" বলিলেই উহা মিশিয়া যাইবে না। প্রত্যেকের সমান-অধিকরণ স্বরূপ (greatest common measure) গরিষ্ঠ, সাধারণ, গুণনীয়ককে জানিতে হইবে। সে যে বাস্তবিকই গরিষ্ঠ, বাস্তবিকই সাধারণ, বাস্তবিকই গুণ সমূহের নিয়ামক ও গুণ সমূহের অতীত। এই ভাবে দেখিলে $\frac{১}{৩০}$টী সেই সামান্যরূপী গুণনীয় ৬০এর ত্রিংশাংশ মাত্র ; সে আর আপনার বিশিষ্ট একেকে দেখাইতে চাহেনা। সে তখন বাস্তবিকই "মমৈকাংশ" হইয়া গেল। এইরূপে সামান্য ও পর ষষ্ঠী (৬০) সংখ্যা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইলে, সংখ্যা-সমূহ রূপান্তরিত হইয়া $\frac{৩০}{৬০}+\frac{২০}{৬০}+\frac{১৫}{৬০}+\frac{১২}{৬০}+\frac{১০}{৬০}$ হইল। তখন তাহারা পরস্পরে মিশিতে সমর্থ হয়। তজ্জন্যই শ্রীভগবান, জীবের ভিতর মহাযোগিনী শক্তির আবির্ভাবকল্পে বলিলেন 'যে বিশিষ্ট আমির জন্য আর চেষ্টা করিও না। যাহাই কেন কর না, তাহাই আমার পরাভাবে অর্পিত হইয়া কর।' ইহাই গীতায়—'যৎকরোসি যদশ্নাসি' মন্ত্র। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইল,—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়িবুদ্ধিং নিবেশয়ঃ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।

ইহাই শিব-প্রমুখ দেবতাগণের তেজ ও তদ্দ্বারা মহামায়ার মূর্ত্তি গঠন।

ইহাই ভূতশুদ্ধির মন্ত্র। ইংরাজীতে বলে Take care of the small things in life, the greater things will take care of themselves. জীবনের ছোট ব্যাপার গুলি মহাভাবে সংসাধিত হইলে, সমগ্র জীবনই সেই মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যায়। তা'ই সাধক 'সোহং ইতি বিচিন্ত্য' আপনাকে ভগবানের ভগ্নাংশরূপে বুঝিতে পারিয়া, জীবনের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত তত্ত্ব-সমূহের ভিতরে ভগবানের ভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। তখন কামে কাম-পতি, প্রাণে প্রাণেশ্বর, ইন্দ্রিয়ে হৃষীকেশকে প্রত্যক্ষ করতঃ তত্ত্বনিচয় যে তাঁহারই ব্যঞ্জন (Denominator) তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগের অভ্যন্তরে তদীয় বিশিষ্ট 'আমি'র অংশ ন্যাস কারিতে সমর্থ হয়। তখন তাহার ক্ষুদ্রতম এক 'আমিটি' শ্রীভগবানের পরিপূর্ণতায় অসীম হইয়া যায়। কারণ $\frac{১}{০}=£$ বা অসীমতা = ইহা অঙ্কশাস্ত্রের উপদেশ।

তারপর সাধক স্বীয় ছিন্ন অহঙ্কারের অধিকার হইতে পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় ও

তত্ত্বসমূহকে পরাভাবে—"এই চক্ষু তোমার চক্ষু," "এই কর্ণ, তোমার কর্ণ," 'এই কর, তোমার কর,' 'এই চরণ, তোমার চরণ' ও সর্ব্বশেষে "এই হৃদয় তোমার হৃদয়' স্বরূপে উপলব্ধি করতঃ যখন প্রতিমার হৃদয়-দেশ স্পর্শ করে, তখনই মহাযোগিণী মহামায়া অভিব্যক্তা হয়েন। তা'ই—শাস্ত্র বলিলেন,—

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজং।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ং ত্বিষা। চণ্ডী

এজন্যই বুঝি সর্ব্বতীর্থের জলে, সর্ব্বভাবের পৃথী এমন কি বেশ্যা-দ্বারের মৃত্তিকা, সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদ ও ফলের সারাংশ, মহামায়ার পূজায় আবশ্যক হয়। এই সলিল-রস সংগ্রহই ত' আবার সন্ধ্যার মন্ত্রে 'শন্ন আপঃ ধন্বন্যা, সমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ'—উপদিষ্ট হইতেছে। ব্যক্ত 'সর্ব্ব' হইতে একরস, মধু-স্বরূপ ভগবৎ-ভাব সংগ্রহ করাই বিষ্ণু-শক্তির কার্য্য, ইহা বুঝা গেল। ঐ কার্য্য সাধিত হইতে হইলে, সর্ব্বের ভিতরে প্রসুপ্ত পরাভাব জাগ্রত হওয়া চাই। তৎপরে সেই মহাভাবের বিশেষ ভাব গুলি এবং আপন আপন বিশিষ্ট অহং-বুদ্ধি পরাভাবের সদৃশ-প্রবাহে ত্যাগ করিয়া পরিসমাপ্ত হইয়া যাওয়াই যে অবস্থার ধর্ম্ম। এই জন্যই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিশিষ্ট ভাব ত্যাগ করতঃ, আমাদিগের দেহে কেবল আমাদিগকেই দেখাইতে চেষ্টিত। সাধক পাঠক, ধ্যানের সময় যে সদৃশ-প্রবাহতা উপলব্ধি করিতে পান,—যেমন বাহ্যবস্তু ও ভাবসমূহ তখন একরূপ হইয়া ধ্যেয়ের মূর্ত্তি গঠন করে; এবং তখন আর ভেদ থাকে না—বিলাস থাকে; মহালক্ষ্মী শক্তির 'খেলাটীও' সেই ভাবে বুঝিবে। সমাধিতে আর খেলাও থাকে না। শৈবী-ভাবে দেবী চৈতন্যময়ী 'দ্বিতীয়া কা মমাপরা' ভাবে 'ব্রাহ্মী' প্রভৃতি বিলাস-সমূহকে বিভূতি বা 'ভস্ম' করিয়া আপনাতে ন্যাস করেন। ইহাই বৈষ্ণবী ও শৈবী ভাবের পার্থক্য। **ধ্যানে বৈষ্ণবী, সমাধিতে শৈবী**;—এই দুইটী কথা স্মরণ রাখিলে দেবী-মাহাত্ম্য বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

ভেদাত্মক জীব এই সদৃশ-প্রবাহতা-স্বরূপা চৈতন্যময়ীর দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া মনে করে যে, এই সংযোগিনী শক্তির কেন্দ্রই বুঝি তা'র বিশিষ্ট 'আমি'-কেন্দ্র। ইহাই কামের বন্ধন শক্তি;—অহঙ্কারের বা শুম্ভের আত্মজ মহিষাসুরের ভাব। দৈবী ভাবের সহিত এই আসুরিক ভাবের যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বুঝিয়া দেখ। 'দিব্' অর্থে প্রকাশ, ব্যঞ্জনা ও 'আড়-নয়নের ঈঙ্গিত'। এই দেবময়ী চৈতন্য যখন খেলেন, তখন আমরা ভাবুক প্রেমিকের ন্যায় বা ভাবময়ী রাধার ন্যায় দেখিয়া ফেলি যে—

জলে স্থলে, রূপ উছলে, অতিক্রমি বিশেষের ভান।
সমরূপে যায় মিশি, অনন্ত 'বহুর' রাশি, একবোধে সান্ত হয় 'প্রাণ' ॥

'অসু' অর্থ প্রাণ। প্রাণনের ধর্ম্মই,—স্পন্দন। বিশেষ আধার লইয়াই স্পন্দন। সে জন্যই যতক্ষণ আমরা প্রাণে অবস্থিত থাকি, ততক্ষণই বাহ্য ভাবের আবশ্যকতা দেখা যায়। প্রবাসী প্রেমিক যখন প্রিয়তমার প্রতি অভিনিবিষ্ট-চিত্তে 'সুখরূপ' বোধে লীন হইয়া যান, তখন প্রেমের প্রাণন ভাবরাশি,—আলিঙ্গন ও অঙ্গ সঙ্গের প্রযত্ন, আর থাকে না। ইহাই 'প্রাণ' ও 'দেব' ভাবের প্রভেদ। অসুরেরা মহাভাবে ভাবিত হইয়াও বোধরূপে বিশিষ্ট আমিকে পরিসমাপ্ত করিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের ক্রিয়া চাই, স্পন্দন চাই, বাহ্য বিকাশ চাই; অথবা ভেদভাবেও চাই। ভাবরূপী ভগবান বহিলেন, "ময়ি ইদং সর্ব্বং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব," এবং দেবী ভাবের সাধক তাহার হৃদয়ে সর্ব্ব-প্রবিলাপনকারী এক মহান্ সত্বার আভাস পান। উহা ঘন ও এক; উহাতে বিলাস আছে, বাহ্য স্পন্দন নাই; বোধ আছে, প্রাণ নাই। ঐ ভাবে সূর্য্যকে দেখিলে সবিতাভাব কেয়ুর কুণ্ডলবাস শ্রীনারায়ণে পরিসমাপ্ত হইয়া যায়; অগ্নিকে দেখিল উহা মহাদেবের তৃতীয় বা জ্ঞান-নেত্রের ঈঙ্গিত করিয়া তাহাতেই মিশিয়া যায়, ভিন্ন থাকে না; চন্দ্রকে দেখিলে উহা অমৃতে ডুবিয়া যায়। যেমন প্রিয়তমা প্রণয়িণীর সর্ব্ব অঙ্গের স্পর্শই ভাবুক প্রেমিকের নিকট মহাপ্রেম-ভাবে পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। ইহাই মহালক্ষ্মী দেবীর বিকাশ। মহিষাসুর বা বিশিষ্ট অবয়বী-বুদ্ধি সর্ব্বকে এরূপ ভাবে দেখে না। সে সূর্য্য, ইন্দু, অগ্নি, অনিল প্রভৃতি দেবগণের <u>অধিকার বা বাহ্যভাবের ক্রিয়া ধর্ম্মটী স্বয়ং কবলিত</u> করিয়াই সন্তুষ্ট। ইন্দ্রাদি দেবগণের ভগবৎরূপে পরিসমাপ্তি ও তাহাদের সমগ্র কর্ম্ম পরা-জ্ঞানে পরিসমাপ্ত করিতে পারে না। "সর্ব্ব কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" এ বোধ তাহার নাই। সে ঘন একত্বকে বড় ভয় করে এবং দেবতা সমূহকে ও আপনাকে ঘন এক রূপে মিশিতে দেয় না! মানব যেমন অশ্বাদির স্বাতন্ত্র্য-ভাব 'গায়ের জোরে' স্ববশে আনিয়া আপনার বাহ্য কর্ম্ম সাধন করে, মহিষাসুরও তদ্রূপ দেবতাদিগকে স্ববশে আনয়ন করতঃ তাহাদিগকে তাহার 'আমির' দাসত্বে পরিচালিত করিয়া সন্তুষ্ট হয়। কারণ প্রাণনই তাহার স্বধর্ম্ম; তাহার যে স্পন্দন চাই; তরঙ্গায়িত বহুর খেলা চাই; সে 'আমার' (মমেদং) ভাবে বহুগুলিকে বশ করিয়াই তৃপ্ত, <u>সে গুলিকে 'আমি' হইতে দেয় না।</u> কারণ তাহা হইলে যে আর তা'র খেলা থাকিবে না;

ভাই সাধক! তোমার ভিতরে একবার মহিষাসুরকে দেখিয়া লও। এই তত্ত্বের

বশে শ্রীমতি এ্যানি-বেশান্ত ও তাহার সজ্য নূতন অবতার লইয়া এত ব্যস্ত। বাপুহে! 'অবতার আসিবে সে, উত্তম কথা; ভগবান ত' আমাদের চির আকাঙ্ক্ষিত। তবে তিনি ভগবান; তিনি আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়াই আপনি জন্ম গ্রহণ করেন। "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভাবাম্যাত্মমায়য়া"। তদীয় প্রকাশে রাম শ্যাম প্রভৃতির সমষ্টিও ব্যষ্টিভাবে কোনও 'হাত' নাই; কারণ তিনি স্বপ্রকাশ।" কিন্তু এই পরম ভাব বুঝিতে না পারিয়া "পরম ভাবমজানন্ত মম ভূতমহেশ্বরং।" রাম শ্যাম মনে করে বুঝি ভগবানের প্রকাশ বিষয়ে আমাদের চেষ্টায় কৃষ্ণমূর্ত্তিকে উপাধি ভাবে প্রস্তুত না করিলে, তিনি প্রকট হইতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার প্রকাশ হইতে গেলে, বিশেষগুলি denominator বা 'বাচক' হইয়া যাওয়া চাই; জীব আপনাকে তৃণাদপি সুনীচ করিয়া ফেলা চাই। কিন্তু অবয়বী ভাবের এমনই প্রবল মোহ যে, রাম শ্রীভগবানের বিলাসক্ষেত্রে স্বকীয় বিশিষ্ট অধিকারী ও কর্ম্ম রাখিবার নিমিত্ত প্রযত্ন-পরায়ণ হয়, ও অভিসন্ধি-পূর্ণ কুটীল লোকের ক্রীড়নক-রূপে আপনাকে বিক্রীত করে। ভক্তগণকে চুপি চুপি বলিয়া দেওয়া হইল, 'দেখ রাম, এই অবতারে, তুমি অবতারীর শিক্ষক হইবে; "দেখ শ্যাম, তুমি প্রধান সেনানী হইবে"; "দেখ কিশোরী। তুমি ইহার পৌরিহিত্য ব্যাপারে সহায়তা করিবে," অমনি সকলেই সেই অধিকারের মোহে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহারা ভুলিয়া গেল যে, শ্রীভগবানের প্রকাশ চক্ষুর ভিতর দিয়া আপনাকে অভিব্যক্ত করে, মনের ভিতর দিয়া স্বকীয় ভাব-প্রকাশ করে বটে; সে চক্ষু ও সে মনে আর স্ব স্ব অধিকার-বুদ্ধি থাকে না। যদি থাকে ত' সেই চক্ষু ও মন শ্রীভগবানে পঁহুছিতে ও তাঁহার অবয়ব নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় না।

যন্মসা নমনুতে যেনাহুর্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদম যদিদমুপাসতে ॥ কেনোপনিষৎ।

এই মহিষাসুরের অবয়বী-মোহের বশে, বৈষ্ণব ভায়া স্বরূপা-শক্তির মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারূপে আপনাকে না মিশাইয়া, শ্রীযুগলের লীলাবিলাসের নিমিত্ত না হইয়া, নিজেই রাধা-সাজে সাজিয়া ভগবানকে পায়ে ধরাইতে চাহেন। একবারে নিষ্ক্রিয় হইতে বড় ভয় হয়, একেবারে শ্রীভগবানের নিমিত্ত-মাত্র হইতে বড় আতঙ্ক হয়; তা'ই শাক্ত ভ্রাতারাও আপনাকে 'শবরূপে' সিদ্ধ না করিয়া, চণ্ডাল-পুত্রের দেহটি লইয়া শব সাধন করিতে ব্যাকুল হয়েন। তাহাকে ভুলিয়া যান যে মহামায়া কেবল মহেশ্বরেই অনুগতা ও তাঁহারই লীলাবিলাস দেখাইবার জন্য

থলেন। তোমার আমার ক্ষুদ্র অহঙ্কারের বড় একটা ধার ধারেন না। নিজে শব না হইয়া, অহঙ্কার রাখিয়া শব-সাধন করিতে গেলে, বাহ্য দানবীয় শক্তির উৎপাতে ভ্রান্ত সাধক মনে করে 'আমি বড় বীর, এ সকল বিভীষিকা অনায়াসে বিধ্বস্ত করতঃ বৈষ্ণবী-শক্তিকে বশে আনয়ন করিতেপারিয়াছি।" আর অধিক কি বলিব, অবয়বী ভাবে আপনাকে রাখিবার মোহে সেই মহামিলন-লগ্নে ভগবান যীশুদেবও আতঙ্কে চমকিত হইয়া নাকি বলিয়াছিলেন,—"Father! Father! hast thou for saken me" 'পিতঃ! ভগবন্, তুমি কি আমায় ত্যাগ করিলে!' ইহাই পূর্ব্বোক্ত Life in form সে অবয়বী-বুদ্ধি মোহ বা মহিষাসুর তত্ত্ব। পরে যখন তিনি ভগবৎ প্রেমে অনুপ্রাণিত হইলেন, তখন নাকি বলিয়াছিলেন,—"Father! how thou glorifiest me" পিতঃ! আমার এই 'আমি'টীকে তুমি আজ কি পরিপূর্ণ—ভরপূর করিয়া! ইহাতে যে আর অবকাশ বা ছেদ নাই!!!

সর্ব্বঘটে ভগবানই একমাত্র স্বপ্রকাশমান; কাজে কাজেই বিশিষ্ট ঘট সংরক্ষণের ত' কোনও আবশ্যকতা নাই। যখন বাস্তবিকই 'কানু ভিন্ন গতি নাই',—তিনি ভিন্ন অন্য পুরুষ নাই, যখন তিনিই সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশিত হইতেছেন, তখন অবয়বী ভাবনী ধরিয়া রাখিবার এত প্রবল পিপাসা কেন? জন্ম-জন্মান্তরে এই বিশিষ্ট 'আমির' হিসাব রাখিয়া, জন্মান্তরের স্মৃতির উদ্ধার করিয়া এত 'বগল বাজান' কেন? একবার একটী ভেদ-বিবক্ষার বশে সহস্র রূপে কল্পিত করিয়া মত্ত হইয়াছিল; কিন্তু যখন সে দেখিল যে তাহার পশ্চাতে 'আধার' 'গতি' ও 'সাক্ষী'রূপে সেই নিষ্কল নাম-রূপের অতীত শ্রীভগবানই আপাতঃ প্রতীয়মান 'শূন্য'রূপে তাহার অনুসঙ্গী আছেন বলিয়াই তাহার এত মান; তখনই একটী তাহার অহঙ্কার বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবানকে বলিতে পারিল, "মৎপ্রাণনাথস্তু সঃ এব নাপরঃ," "তিনিই আমার প্রাণনের বা বাহ্য বিকাশের নাথ ও কর্ত্তা।"

এই মহিষাসুর-বধের দিন আজ উপস্থিত। "সর্ব্ব-স্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে" মহাবিদ্যা আমাদের ভেদ-মোহের ভিতর দিয়া আবার প্রকাশিত হইবেন। যাহা স্বয়ং 'উছলিয়া' বা ফুটিয়া উঠে, তাহাকেই রূপ বলে। এত জীবের নহে; এ যে শ্রীভগবানের বিলাস! এই রূপসাগরে যদি ডুবিতে চাও, তবে তোমার বিশিষ্ট রূপের মোহ বা মহিষাসুরকে রূপময়ের মহাভাবের নিকট বলি প্রদান করিতে হইবে। তিনি যে সদা স্বপ্রকাশরূপ, সকল হইতেই সমভাবে ফুটিয়া উঠিতেছেন। আর আমাদের রূপ-মোহ বাস্তবিকই মহিষের ন্যায় বিবেক-শূন্য, অবুদ্ধি-প্রণোদিত। "করইতে কোরে ধনি মোড়সি অঙ্গ" তাহার গায়ে হাত

দিতে গেলে,—সে শিং ঘুরাইয়া ল্যাজ উঠাইয়া মারিতে আসে। সে আপনাকে হারাইতে পারে না; অথচ তাহার সবই চাই। সে কেমন গম্ভীরভাবে কাম ভোগ করে, অথচ ভাবে সবই ভগবানের জন্য। তা'র মান চাই, যশ চাই, ধন চাই, বল চাই। সে চক্ষুর ভিতর প্রকাশিত ভগবান দেখিতে পায় না, অথচ চক্ষু-শক্তিকে Clairvoyance বা সূক্ষ্ম-দৃষ্টিরূপে নিজস্ব করিতে চাহে। "দৃশ্যস্য উপলব্ধি সা ভোগঃ।" দৃশ্য ভাবটী রাখিয়া তাহার গ্রহণ করাকে ভোগ বলে। ভোগই অবয়ব ও অবয়বী ভাব। কিন্তু যখন আর অন্য দৃশ্য থাকে না, একমাত্র শ্রীভগবানই দর্শনীয় হন, তখনই এই শক্তি শ্রীভগবানের রূপ ফুটাইয়া দেয়। ইহাই মহিষাসুরের পরিণাম। ইহাই দোললীলায় মেঢ্রাসুর বধ। ভোগেচ্ছাগুলিকে একত্র সংগ্রহ করতঃ যদি তাহাতে 'এক ভগবানই সত্য' এই জ্ঞানাগ্নি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হও, তবেই সেই অসুরের বিনাশ হইবে। 'অসু' বা 'প্রাণের' মোহ ত্যাগ করিতে পারিয়া 'বোধে' আসিতে পারিবে ও নিত্য-বোধস্বরূপকে 'আমির' ভিতরে দেখিতে পাইবে।

অবয়বী বুদ্ধির অন্তরালে শ্রীভগবানের যে ভাব আছে, তাহাকে ধর্ম্মি বলে। ইহা পাতঞ্জল-ভাষ্যে ব্যাসদেবের উক্তি। এই "ধর্ম্মায় ধর্ম্মপতয়ে" শ্রীভগবানে যদি সর্ব্বের বিশিষ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলেই মহাযোগিনী জ্ঞানরূপা মহামায়া তোমার ভিতরে প্রকাশিত হইয়া তোমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বপ্ন-মায়ার দুর্গ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়া নিজে উপরতা হইয়া তোমাকে শ্রীভগবানে মিলিত করিবেন।

যত্বেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥ ভাগ—১।৩।৩৪।

যখন মহামায়া তোমার 'আমিটীকে' লইয়া শ্রীভগবানে উপরতা হইবেন, তখনই 'আমিটী' তদীয় মহীমায় মহীয়ান্ হইবে। অবয়বী ভাবের মোহ লইয়া আজ জগতে কি না অনর্থ সংঘটিত হইতেছে, তাহা জানিয়া,—আইস সেই মহাযোগিনী মহামায়াকে স্মরণ করিয়া বলি,—

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে,
নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে।
নমস্তে চিদানন্দনন্দস্বরূপে,—
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥
ওঁ নমো দুর্গায়ৈঃ; তন্নোধীয়ো প্রচোদয়াৎ ওম্। সম্পাদকয়োঃ।

আবাহন।

(১)

অবগাহি ঘন নীরে সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করে।
সাজিছে প্রকৃতি সতী আহ্বানিতে শারদারে ॥
প্রেম ভরে ফুলে ফুলে, নেচে নেচে তালে তালে;
তটিনী চলেছে ধেয়ে, পীযূষ পসরা নিয়ে;
নির্ম্মল অম্বর তলে, বিহগ বিহগী খেলে,
পঞ্চমে তুলিয়া তান, মধুরে গাহিছে গান;
তৃণ গুল্ম তরুদল——, লাবণ্যেতে ঢল ঢল,
মৃদুল মারুতে তা'য়, মরি কি স্পন্দন হায়;
অবগাহি ঘন নীরে সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করে,—
সাজিছে প্রকৃতি সতী আহ্বানিতে শারদারে।

(২)

আয়্ মা শারদে, শুভদে, বরদে,
ব্রহ্ম-বাদিনী দেবী বরেণ্যে!
সিন্ধু-মেখলা, সুজলা শ্যামলা,
উজলি হিন্দু-ধরণী, ধন্যে!
বরষ অন্তে. নীলিম প্রান্তে.
মাতায়ে জগৎ শারদ ইন্দু।
কনক কিরণে, মা, তোর চরণে,
ঢালে অজস্র অমিয় বিন্দু।
অনাদি ওঙ্কার, ব্যোম ঝঙ্কার,
ধাইছে অনন্তে প্লাবিয়া বিশ্ব।
নব তরঙ্গে, ফুটিছে অঙ্গে,
সঙ্গীত তানে বিমল হাস্য।
অসীম বীর্য্যে, হে মহৈশ্বর্য্যে!
চমকি পৃথ্বি নভোমণ্ডল,
সিংহ-বাহিনী, আয় মা ঈশানী,
শ্রবণে দৃপ্ত মণি-কুণ্ডল।

উরে চঞ্চল, বসনাঞ্চল,
ঝলসি গগন দিক্-দিগন্ত।
দলমল গলে, মরকত দোলে,
ভাতিছে বক্ষে সূর্য্যকান্ত।
সুরভি সিন্ধু, মথিত ইন্দু,
সিন্দুর শোভে ললাট চুম্বি।
জিনি শশধর, শ্রীপদ নখর,
কণ্ঠে মুকুতা-হার বিলম্বি।
ঊর্দ্ধে রাজিছে, অম্বর মাঝে,
রত্ন মুকুট ভেদিয়া অভ্র।
মধু সমীরণ, করে বরিষণ,
পদে চম্পক শেফালী শুভ্র।
জীব কোলাহল, বাসনা প্রবল,
ক্ষণিকের লাগি থাকুক বন্ধ,
মায়া-সংসার, বৃথা অহঙ্কার
মা, তোর জ্যোতিতে রহুক অন্ধ।
বীরাঙ্গনা সাজে, নাশ, দশভুজে!
মোহান্ধ জীবের 'আমিত্ব' মহিষ।
স্বরগ কান্তি, সোহহং শান্তি,
পরমানন্দ পুণ্য আশীষ।
দাও মা ভবানী, দে অভয় বাণী,
টুটুক বন্ধ জনম মরণ।
স্রক্ চন্দনে, হৃদি নন্দনে,
বন্দিবে তোমা নিখিল ভুবন।

———

ধর্ম্ম]

বিদ্যাবিলাস।

কৈশোরলীলা।

যিনি রামাবতারে শাস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, তিনি এই গৌরাবতারেও শাস্ত্র বিদ্যা শিখিতেছেন। উদ্দেশ্য কিন্তু সেই একই,—ধর্ম্ম সংস্থাপন। সেবার

ক্ষসকুল নিধন করিয়া শাস্ত্র ও সাধুরক্ষা করিতে হইয়াছিল, এবার পণ্ডিত-লকে শোধন করিয়া সেই শাস্ত্র-রক্ষা ও সাধু-রক্ষা করিতে হইবে। গৌর-কশোরের কৈশোর লীলায় তাহারই আয়োজন হইতেছে। পাঠক, ঐ দেখ ঁথি হাতে করিয়া প্রচ্ছন্ন প্রভু গঙ্গাদাসের টোল আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

যোগপট্ট ছাঁদে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বৈসেন সভার মাঝে করি বীরাসন॥
চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ তিলক সুভাতি
মুকুতা গজয়ে শ্রীদশনের জ্যোতিঃ॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ মদনমোহন।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপম॥ চৈঃ ভাঃ

চারিদিকে পড়ুয়ায় দল ঘিরিয়া আছে, মধ্যখানে তারকা বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ায় গৌরচন্দ্র শোভা পাইতেছেন। নিমাইয়ের এখন আর অন্য কর্ম্ম াই; দিবানিশি পুঁথি লইয়াই আছেন।

"রাত্রি দিন বিদ্যারসে নাহি অবসর।" চৈঃ ভাঃ

নিমাই যখন যাহা ধরেন, তাহাতেই একেবারে আবিষ্ট হইয়া পড়েন; ইহা নিমাই চরিত্রের বিশিষ্টতা। বাল্যকাল হইতে আমরা তাহাই দেখিয়া আসিতেছি। এখন বিদ্যারসেই ভরপূর হইয়া আছেন।

'পূর্ব্বেই বলিয়াছি নবদ্বীপে টোলের অভাব নাই—ছাত্রেরও অভাব নাই। নবদ্বীপের গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ব্যাকরণ শাস্ত্রে গঙ্গাদাস অদ্বিতীয় পণ্ডিত; তা'ই তাঁহার টোলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভিড়। বেদ-বেদান্ত ন্যায়-দর্শন যিনি যাহাই অনুশীলন করুন না কেন, প্রথমে সকলকেই ত' ব্যাকরণ পড়িতে হইবে। তাই তাঁহার টোল সব চেয়ে জমকাল। বিশেষ এই সময়ে গঙ্গাদাসের টোলে যেন নবরত্নের সভা হইয়াছিল। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, (দীধিতিকার) নৈয়ায়িক রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ, কমলাকান্ত বাচস্পতি, শ্রীমুরারি গুপ্ত, প্রভৃতি নবদ্বীপের উজ্জ্বল রত্ন সকলেই এইখানে মিলিয়াছিলেন। আমাদের শচীনন্দন নিমাই ছিলেন তাঁহাদের মধ্যমণি। নিমাই যেখানে যাইবেন, সেইখানেই প্রভু হইয়া বসিবেন। দুই দিনে তিনি টোলের ছোট বড় সব ছাত্রের দলপতি হইয়া উঠিলেন। সকলকেই তিনি পাঠ-ব্যাখ্যা করিয়া দেন, সূত্র-বৃত্তি, পঞ্জীটীকা সমস্তই নিমায়ের কণ্ঠস্থ। নিমাই যে শ্রুতিধর; একবার শুনিলেই সব শাস্ত্রই নিমাইয়ের অধিগত হয়। সুতরাং কোন শাস্ত্রে কেহ

তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। একদিন নিমাই অধ্যাপক শিরোমণি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের অভ্রান্ত ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া ফেলিলেন। নিমাই যে সমস্ত দোষ দেখাইলেন, বৃদ্ধ গঙ্গাদাসকে তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইল। ছাত্রেরাও অবাক্। সকলেই নিমাইয়ের অসাধারণ শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পরক্ষণেই নিমাই নিজকৃত ব্যাখ্যা খণ্ড খণ্ড করিয়া গুরুদেবের ব্যাখ্যাই অভ্রান্ত বলিয়া স্থাপনা করিলেন; গুরুর মর্য্যাদা রক্ষিত হইল। গঙ্গাদাস চমৎকৃত হইলেন,—টোলের সকলেই মন্ত্র-মুগ্ধ। শাস্ত্রবিদ্যা লইয়া নিমাই যেন ভোজবাজির খেলা করিতেছেন;—

'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকলই স্থাপয় ॥

এরূপ অপূর্ব্ব শিষ্যের গুরু হইয়া গঙ্গাদাস আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছেন।

দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব শিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত ॥

বিদ্যারসে মজিলে কি হইবে; নিমাইয়ের কিন্তু সে পূর্ব্ব স্বভাব যায় নাই; বরং চঞ্চলতার সহিত দাম্ভিকতা মিশিয়া উদ্ধত নিমাই পরমোদ্ধত হইয়াছেন।

"তেমত উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে"।

নিমাইয়ের ছোট বড় জ্ঞান নাই, "সবারে চালায় প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া"। যে কেহ নিমাইয়ের অধীনতা সহজে স্বীকার না করেন, নিমাই তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। মুরারি গুপ্ত নিমাইয়ের অপেক্ষা যথেষ্ট বয়সে বড়। তিনি বালক নিমাইয়ের কাছে পাঠ বুঝিয়া লয়েন না, এই অপরাধে পাঠক, ঐ দেখ আজ তাঁহার সহিত নিমাইয়ের বিষম কলহ বাধিয়া গিয়াছে। মুরারিকে দেখিয়া নিমাই ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, 'সন্ধিমাত্র জ্ঞান নাই, অথচ অহঙ্কার আছে; কাহারও কাছে পুঁথি বুঝিতে যাওয়া হইবে না"। মুরারি সে কথা কাণে লইলেন না; বালক বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। নিমাই কিন্তু ছাড়িলেন না, তিনি তখন স্পষ্টাস্পষ্টি আরম্ভ করিলেন। 'বলি ও বৈদ্যরাজ, তুমি পড়িতে এসেছ কেন? ব্যাকরণ বড় সোজা জিনিস নয়। ইহাতে বায়ু-পিত্ত-কফের বিচার নাই বা অজীর্ণের ব্যবস্থা নাই; তোমায় এ বুদ্ধি কে দিয়াছে? তুমি হাতুড়ে কবিরাজ; বরং বাড়ী যাও, লতা পাতা নিয়ে গিয়ে জাত-ব্যবসা করগে।"

"প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়।
লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দড় ॥" চৈঃ ভাঃ

একদিন এই নিমাইয়ের হাতে মুরারির উত্তম শিক্ষা হইয়াছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ বুঝিয়া মুরারি এই নিমায়ের পদতলে লুঠাইয়াছিলেন; কিন্তু সে অনেক পরের কথা। তাহাতে এখন নিমাইয়ের প্রাকৃত বালক-সুলভ চপলতা ও ধৃষ্টতা দেখিয়া মুরারির সে ধারণা উল্‌টিয়া গিয়াছে। প্রচ্ছন্ন প্রভু, তা'ই আজ কৌশলে তাঁহাকে আবার চম্‌কাইতেছেন। বামুনের ছেলে বলিয়া মুরারি অনেক খাতির করিয়াছেন, অনেক ব্যঙ্গোক্তি সহিয়াছেন; কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে, আর চুপ্ করিয়া থাকা পোষাইল না, মুরারি মুখ ধরিলেন।

"কেন হে ঠাকুর! এত গর্ব্ব কিসের? কোন্ দিন্ আমায় কি জিজ্ঞাসা করেছ যে উত্তর পাও নি।

তখন কলহ বেশ আঁটিয়া গেল। বিদ্যারস লইয়া প্রভু ভৃত্যে উত্তম লাঠালাঠি আরম্ভ হইল।

"গুপ্ত বলে এক অর্থ, প্রভু বলে আর।
প্রভু ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার ॥" চৈঃ ভাঃ

বিস্তর বাদ-বিতণ্ডা চলিল, উভয়ের বিচার শক্তিতে উভয়েই স্তম্ভিত। নিমাই খুসী হইয়া মুরারির পিঠে রহস্যে এক চড় মারিলেন, 'তাই ত' বৈদ্য ত' কেবল বৈদ্য নহে, পণ্ডিতও বটে। মুরারি চমকিত হইলেন; হস্তস্পর্শে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দ-প্রবাহ ছুটিল।

"এমন পাণ্ডিত্য কভু মনুষ্যের নয়।
হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরমানন্দময় ॥"

নিমাই পণ্ডিতের অলৌকিক প্রতিভা দেখিয়া মুরারি গুপ্ত পরম বিস্মিত হইলেন; নিমাই ত' পড়েন ব্যাকরণ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সকল শাস্ত্রেই তাঁহার অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি! এরূপ সুমার্জ্জিত বুদ্ধি নবদ্বীপে আর নাই; সুতরাং ইহাঁকে গুরু স্বীকার করিতে কোন লজ্জা নাই। বলিলেন,—"চিন্তিব তোমায় স্থানে শুন বিশ্বম্ভর।" প্রভু ভৃত্যের আপোষ হইয়া গেল।

নবদ্বীপের অধ্যাপক ও নিমাই পণ্ডিত।

তখনকার বিদ্যা-মদগর্ব্বিত নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের সহিত রাজা-মহারাজারও তুলনা হয় না। তাঁহারা দম্ভের মূর্ত্তিমন্ত অবতার; 'ধরা সরা জ্ঞান' করেন। ভগবানের সহিতও কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা, তাঁহারা আদৌ প্রয়োজন মনে করেন না। ভগবদ্ভক্ত পাইলে তাঁহাদের আমোদ বাড়িয়া যায়; হিংসাবৃত্তি পূর্ণমাত্রায়

জাগিয়া উঠে; নির্ম্মমভাবে ভক্তপ্রাণে আঘাত করিতেই তাঁহাদের আনন্দ। পড়ুয়াদলের হাতে পড়া, আর ডাকাইতের হাতে পড়া একই কথা। সাধু বৈষ্ণব দেখিলেই তাহারা তাড়াইয়া ধরে এবং তাঁহাদিগকে নানা প্রকার নির্য্যাতন করে।

"দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে।
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে কত মত কটু ভাষে॥

সেই অমিত বিক্রম পণ্ডিতগণের এখন বিষম বিপদ উপস্থিত। তাঁহাদের দম্ভস্ফীত উর্দ্ধশির অবনত হইয়া পড়িয়াছে। অপ্রতিহত গর্ব্ব বুঝি আর বজায় থাকে না। গ্রহ বিপর্য্যয় হইয়াছে; তাই তাঁহাদের ঘরের মধ্যেই ভীষণ শত্রু উদয় হইয়াছে। মিশ্র-নন্দন নিমাই নিজে পণ্ডিত হইয়া, পণ্ডিতকুলে 'মূষল' হইয়া উঠিয়াছেন। পণ্ডিতদের সমগ্র ভারতব্যাপী মান-মর্য্যাদা আর থাকিল না; নিমাই হ'তে সবই নষ্ট হইবার পথে উঠিয়াছে।

ভাগ্যবান্ মুকুন্দ সঞ্জয়ের সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই টোল খুলিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা এবং অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্যের সৌরভ দেশ-দেশান্তে ছুটিয়াছে। চারিদিক হইতে অগণন ছাত্র আসিয়া জুটিয়াছে।

"কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঁই ঠাঁই॥
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ কুমার।
আসিয়া প্রভুর পায় করে নমস্কার॥" চৈঃ ভাঃ

নবদ্বীপের গর্ব্ব-স্ফীত অধ্যাপকের উর্দ্ধশির এতদিন কাহারও নিকট অবনমিত হয় নাই। নিমাই অধ্যাপক হইয়াই সেই গর্ব্ব চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আটোপটঙ্কারে পণ্ডিত মণ্ডলে বিষম 'হৈ চৈ' পড়িয়া গেল। তিনি সগর্ব্বে বলিতেছেন,—

"প্রভুবলে তাঁ'রে আমি বলি যে পণ্ডিত।
একবার বিচার করে আমার সহিত॥" চৈঃ ভাঃ

প্রথমে বালক বলিয়া অনেকেই উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু টিট্‌কারির মাত্রা ক্রমে খুব বাড়িল। তার্কিক পণ্ডিতদের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। একে একে অনেকেই গাত্র-কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির জন্য নিমাইয়ের সঙ্গে লড়িতে আসিলেন। প্রাণপণে যুঝিলেন; কিন্তু কেহই বালককে আঁটিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের হাতে যেন শাস্ত্র-বিচারের মরণ-কাঠি জীবন-কাঠি রহিয়াছে। নিমাই কখন 'রামকে' খণ্ডন করিয়া 'শ্যাম' করিতেছেন; আবার অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে 'শ্যামকে' খণ্ডন করিয়া 'রাম'কে স্থাপন করিতেছেন। অথচ নিমাইয়ের সকল বিচারই অকাট্য, অভ্রান্ত, এবং শাস্ত্র-সম্মত।

"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা॥" চৈঃ ভাঃ

বালকের কাছে হারিয়া মাথা হেট করিয়া মর্ম্মাহত পণ্ডিতেরা সরিয়া পড়েন।

যত অধ্যাপক প্রভু চালেন সবারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোনজন নাহি ধরে॥ চৈঃ ভাঃ (ক্রমশঃ)

শ্রীবামাচরণ বসু।

ধর্ম্ম]

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী সংবাদ।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্)।

লোক-হিতৈষিনী শ্রুতি চিরদিনই আত্মার অস্তিত্ব ও একত্ব বুঝাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু মানব চিরদিনই ঐ তত্ত্ব নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়াছে। এমন কি সমস্ত উপনিষদ্ যুক্তিদ্বারা আত্ম-তত্ত্বটিকে দৃঢ় সংস্থাপিত করিবার জন্য সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। আখ্যায়িকা গুলি সত্য। ইহার গুণ এই যে, ঝটিতি শ্রোতা ও পাঠকবৃন্দের মন আকৃষ্ট করে। পর-পক্ষকে বুদ্ধিবলে কোনমতে নিরস্ত করাই, তর্কের উদ্দেশ্য নহে। তর্ক—বিচার? অসার বিচারের নাম বিতণ্ডা। বিতণ্ডা, জল্প ও বাদ ত্রিবিধ তর্কের মধ্যে বিতণ্ডা নিকৃষ্ট; বাদ উৎকৃষ্ট। পরপক্ষ খণ্ডনই যাহার উদ্দেশ্য, স্বপক্ষ স্থাপন যাহার উদ্দেশ্য নহে, তাহাই বিতণ্ডা! "বাদ প্রবদতামহং" স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন 'বাদে' আছে; কিন্তু বাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সত্য-নির্ণয়; সত্য নির্ণয়ার্থই বাদে পরপক্ষ খণ্ডন ব্যবস্থিত।

গুরু-শিষ্য বা ছাত্রগণের পরস্পরের মধ্যে, সত্য-নির্ণয়ার্থ যে শাস্ত্রানুযায়ী বিচার, তাহারই নাম বাদ। কথোপকথন রূপ বাদ তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে, তজ্জন্যই উপনিষদে আখ্যায়িকার বাহুল্য। আখ্যায়িকা গুলির মধ্যে তত্ত্বগুলি বেশ সরল ও মনোরম ভাবে গ্রথিত থাকে। এক্ষণে বিতণ্ডাত্মক বিচার ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে; কারণ লিখিত-বিচারে বিতণ্ডার আধিপত্য অল্প। এখনও বাঙ্গালার নৈয়ায়িকগণের মধ্যে বিতণ্ডার তাণ্ডব নৃত্য দেখা যায়। পূর্ব্ব বঙ্গের

অনেক স্থলে বিবাদ মাত্রকেই ন্যায় হইতেছে বলা হয়। বৌদ্ধ চার্ব্বাকৃগণকে নিরস্ত করার জন্য সময়ে সময়ে বিতণ্ডার সার্থকতাও হইত।

একদিন বিদেহ-রাজ জনক বহু-দক্ষিণক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞ একটি প্রাচীনকালের একধারে ধর্ম্ম-কার্য্য ও উৎসব। যজ্ঞে পরমেশ্বর ও দেবতাগণের তৃপ্ত্যর্থ হোম হইত, পূজা হইত, বৈদিক স্তবাদি পঠিতও হইত। এই যজ্ঞেও সমস্ত দেশের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সমস্ত দেশের জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মী ও পণ্ডিতগণের সমবায়ে যজ্ঞসভা অপূর্ব্ব শোভাময় হইয়া উঠিয়াছিল। এই জনক রাজই যে সীতার পিতা ছিলেন, তাহা নহে। জনক বংশীয় মিথিলার রাজার নামই ছিল জনক। অবশ্য ইনিও রাজর্ষি ছিলেন। সেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 'কে ব্রহ্মিষ্ঠ,' রাজা জনক এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলেন। ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে কহিলেন;—"সমবেত ব্রাহ্মণ মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি আমার এই সহস্র গোধনের অধিকারী। অতএব আপনাদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি এই পয়স্বিনীগুলিকে স্বচ্ছন্দে স্বগৃহে লইয়া যাইতে পারেন।"

কোন ব্রাহ্মণই আপনাকে ব্রহ্মিষ্ঠ মনে করিতে সক্ষম হইলেন না; কেহই সেই স্পৃহনীয় সহস্র গোধন লইবার চেষ্টা করিলেন না। তখন * যাজ্ঞবল্ক্য আপনার ব্রহ্মচারী ছাত্রকে আজ্ঞা করিলেন; "হে সৌম্য,! হে সামবেদাধ্যায়ী শিষ্য, এই গো সকলকে আমার গৃহে লইয়া যাও" গুরু আজ্ঞা পাইয়া ভক্ত শিষ্য গো সকলকে আচার্য্য গৃহে লইয়া যাইতে উদ্যুক্ত হইলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটি অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল; ক্ষমায় রুদ্ধ ব্রহ্মণ্য-তেজ গুমরিয়া গুমরিয়া জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল। সকল ব্রাহ্মণেরই মনোভাব এই যে, "সকলেই সমান; যাজ্ঞবল্ক্য কেন আপনাকে ব্রহ্মিষ্ঠ মনে করিলেন?"

জনক রাজের হোতা, রাজ সম্মান-গর্ব্বিত "অশ্বলের" প্রাণে যাজ্ঞবল্ক্যের সে প্রাধান্য সহ্য হইল না। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে তিরস্কার সূচক বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাজ্ঞবল্ক্য, কথং ত্বং খলু ব্রাহ্মিষ্ঠোঽসি।"

ঔদ্ধত্য ব্রাহ্মণের ত' লক্ষণ নহে; নিরভিমানিতাই তপস্বীর ধর্ম্ম। যাজ্ঞবল্ক্য ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "আমি ব্রহ্মিষ্ঠগণকে নমস্কার করি। গোধন আমার প্রিয়; তা'ই আমি এই গোসকল লইতে মনস্থ করিয়াছি"।

* "যাজ্ঞবল্ক্য" ও মৈত্রেয়ীতথ্য" গ্রন্থকার প্রণীত "অবকাশ" নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

তার পর হোতা "অশ্বলকে' প্রশ্ন করিলেন, জনকও তাহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। * "অশ্বল" নিরস্ত হইয়া মৌন হইয়া রহিলেন। তারপর প্রশ্ন করিলেন "জারৎকারের আর্ত্তভাগ"; যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট ও পরাজিত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। অনন্তর "কহোল কৌষীতকেয়" জিজ্ঞাসু হইলেন; তিনিও প্রশ্নের মীমাংসা শুনিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী গার্গী দণ্ডায়মানা হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন। তর্ক ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে চলিল! অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য অকস্মাৎ গার্গীকে কহিলেন—"চুপ কর গার্গি, আর জিজ্ঞাসা করিও না। "ব্রহ্মলোক কাহাতে ওতঃপ্রোত" এ জিজ্ঞাসা আর করিও না। পুনরায় যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তোমার মস্তক-পাত হইবে!" বাচক্নবী গার্গী ভয়ে আর কথা না কহিয়া বসিয়া পড়িলেন।

তাহার পর 'উদ্দালক আরুণি'ও যখন পরাজিত ও হতমান হইয়া গেলেন,—তখন যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠতা বিঘোষিত হইবার উপক্রম করিল। তখন বাচক্নবী গার্গী পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে অভিলাষিনী হইয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের অনুমতি চাহিলেন;—"ব্রাহ্মণগণ, আমি মস্তকপাত ভয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারে মৌন হইয়াছি। আপনাদের অনুমতি পাইলে পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন করিব। এই প্রশ্ন দুইটির সন্তোষজনক উত্তর পাইলে, আমি তাঁহাকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিব; ইঁহার শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত হইবে।" ব্রাহ্মণগণ অনুমতি দিলে বাচক্নবী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন,—

"মহাবীর কাশ্য বা বৈদেহ যেরূপ 'অবতারিকজ্যাক' শরাসনে শত্রু পীড়াকর দুইটী বাণ-যুক্ত শর যোজনা করেন, আমিও তদ্রূপ দুইটী প্রশ্ন লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি। যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নদ্বয়ের সমাধান করিয়া আত্মরক্ষা করুন'।

ব্রাহ্মণগণ মহোল্লাসে গার্গীকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠতা খণ্ডিত হয়, তাহাই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল।

গার্গী তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা স্বর্গের ঊর্দ্ধে, পৃথিবীর নিম্নে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত, অথবা যাহার মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য বিদ্যমান, যাহা অতীতে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে স্থিতিশীল, তাহা কাহাতে ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান।" ১ম প্রশ্ন।

* যাজ্ঞবল্ক্য সহ ব্রাহ্মণগণের প্রশ্নোত্তর বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য নহে।

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলিলেন,—"গার্গী, তুমি সুত্রাত্মক জগতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। এই সুত্রাত্মক, নামরূপে প্রকাশিত, ব্যাকৃত, বিশ্ব-প্রপঞ্চ—নাম রূপহীন সূক্ষ্ম আকাশে ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত, জানিও। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই নামরূপ-বিশিষ্ট, ব্যাকৃত দ্বৈত-প্রপঞ্চ, এই স্থূল মায়াময় পার্থিব পদার্থ অব্যাকৃত সূক্ষ্ম আকাশে কি অতীত, কি ভবিষ্যতে বিদ্যমান জানিও! "আকশে তদোতঃপ্রোতঞ্চেতি"। ১ম প্রশ্নের উত্তর।

তথন গার্গী বলিলেন—"যাজ্ঞবল্ক্য, আপনাকে নমস্কার! আমার একটি প্রশ্নের আশাতীত উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছেন। একটি শর ব্যর্থ হইয়াছে, এইবার দ্বিতীয় শর নিক্ষেপ করিতেছি; আপনি সাবধান হউন!" দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল;—"এই ব্যাকৃত-বিশ্ব অব্যাকৃত-আকাশে ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান; কিন্তু আবার এই অব্যাকৃত আকাশ (নামরূপ-হীন সূক্ষ্ম বিশ্ব) আর এই ব্যাকৃত নামরূপাত্মক বিশ্ব (স্থূল ব্রহ্মাণ্ড) কাহাতে ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান?" ২য় প্রশ্ন।

তথন যাজ্ঞবল্ক্য দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"অস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতঃপ্রোতশ্চেতিঃ" 'এই অক্ষরে বা পরম-ব্রহ্মে' অব্যাকৃত আকাশ ওতঃ-প্রোত-ভাবে বর্ত্তমান জানিও! যাহা প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান হইয়াও স্বরূপতঃ পরোক্ষ, যাহা সর্ব্ববিধ গতির পরাকাষ্ঠা, যাহা সর্ব্বান্তর, সর্ব্বভূতস্থ, অশনায়াদি ধর্ম্মবিহীন, সেই নিত্য, অক্ষর, পরম-ব্রহ্মে—এই ব্যাকৃত বিশ্ব ও এই অব্যাকৃত আকাশ ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত। নামরূপ-বিশিষ্ট স্থূলের পরিণতি সূক্ষ্ম নামরূপ-হীন অব্যাকৃত তত্ত্বে; আর এই অব্যাকৃত তত্ত্বও একমাত্র পরমাত্মায় বর্ত্তমান। তিলে তৈলের মত, মণিগণে সূত্রের মত বিদ্যমান! আকাশে গন্ধর্ব্ব নগরতুল্য, শূন্যে ইন্দ্রজাল-ক্রীড়া সদৃশ, মরীচিকার মরুভূমিবৎ বর্ত্তমান।

"এই অক্ষর স্থূল বা অণু নহে, দীর্ঘ বা হ্রস্ব নহে। ইহা গুণহীন স্নেহহীন। ইহা অস্থায় অতমঃ। ইহা বায়ু নহে, আকাশ নহে। রস গন্ধ, চক্ষু শ্রোত্র, বাক্য, মন, তেজ, প্রাণ, মুখ, অন্ন—এ সকল কিছুই নহে। ইহার ছিদ্র, বাহ্য নাই। ইনি কিছুই ভোগ করেন না। বাহ্য বস্তু ইহার ভোগ্য নহে। মোট কথা গার্গী, ইহাকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না।

"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমলোহিতমস্নেহমস্থায়মতমঃ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক।

অহোরাত্রের প্রদীপস্থানীয় সূর্য্য চন্দ্র এই অক্ষরের প্রশাসনে অবস্থিত; ইঁহার প্রশাসনে স্বর্গ, মর্ত্ত্য বিধৃত; ইঁহারই প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র,

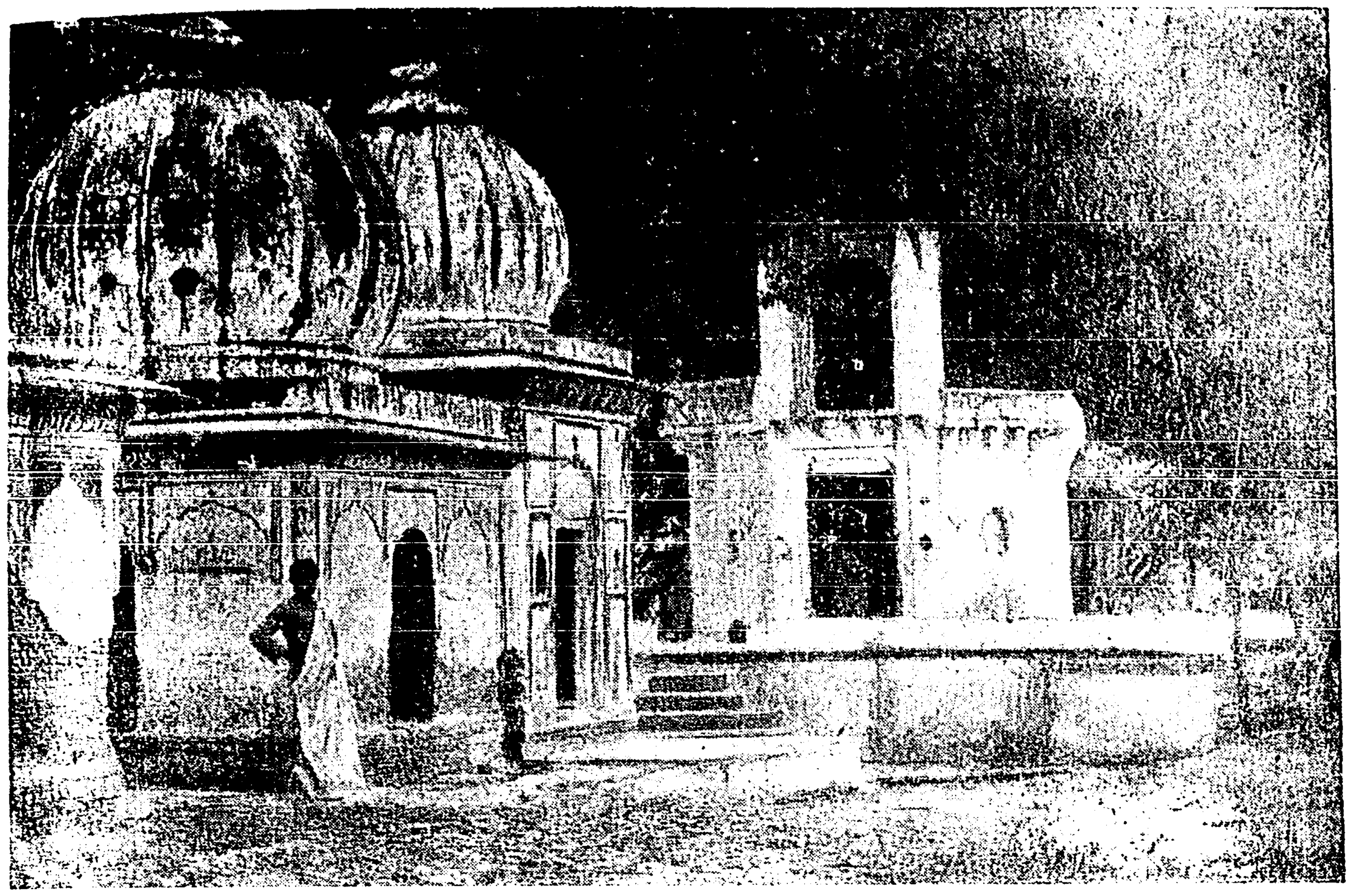

হরিদ্বার দৃশ্য (৫) কণখলের দক্ষেশ্বর শিবমন্দির।

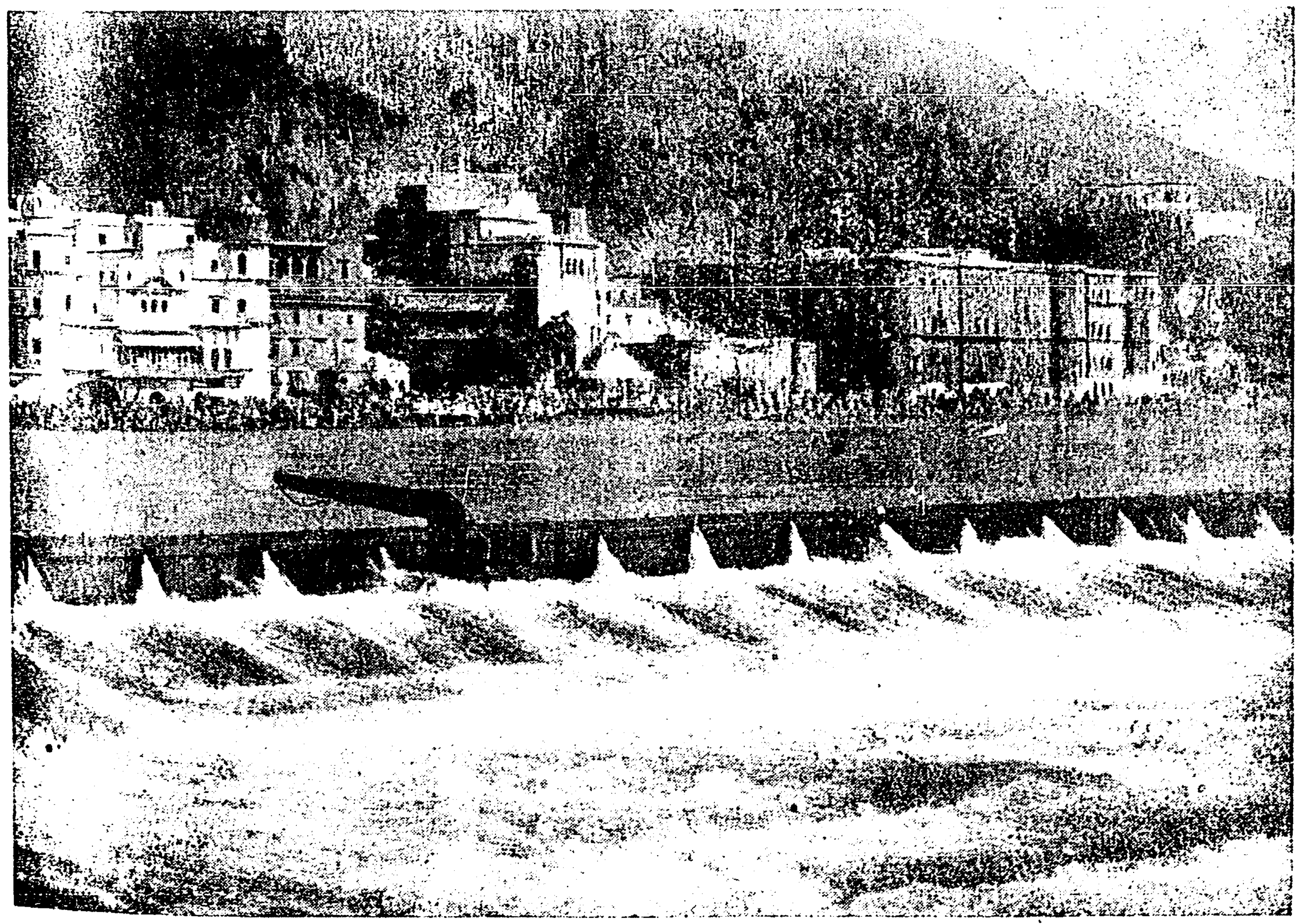

হরিদ্বার দৃশ্য (৬) ক্যানেল ও হরিদ্বার।

মাস, ঋতু, সংবৎসর নিয়ন্ত্রিত। ইহারই প্রশাসনে হিমালয়াদি পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বদিগভিগামিনী গঙ্গাদি নদী প্রবহমানা; পশ্চিমাভিগামী সিন্ধু প্রভৃতি নদ প্রবাহমান। ইহারই প্রশাসনে মানবেরা দেবতার, দেবতারা যজমানের, পিতৃগণ হোমের প্রশংসা করেন। "এতস্যাক্ষরস্য প্রশাসনে সূর্য্যচন্দ্রামসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকোপনিষৎ!

হে গার্গী, এই অক্ষর জ্ঞান সম্যক্ আয়ত্ত্ব না করিয়া যিনি হোম করেন, যজ্ঞ করেন, তপস্যা করেন, তাঁহার হোম, যজ্ঞ, তপস্যা আংশিক স্বর্গফলদ হইলে, পরিণামে ক্ষীণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব যাহারা এই অক্ষর-তত্ত্ব জ্ঞান না করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন, তাহারাই কৃপণ। তাহাদের সুখই অল্প।

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ'। "অল্পং বৈ তেষাং সুখং" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। এই কৃপণগণের জীবন পণ্যক্রীত দাসাদির মত ভারবহ মাত্র। আর যাঁহারা অক্ষর-তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

"অথ য এতদক্ষরং গার্গী বিদিত্বাহস্মাল্লোকাং প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ" "ভূমৈব তেষাং সুখং"। সে তাঁহাদের সুখ পরিপূর্ণ, আনন্দ প্রচুর।

এই অক্ষর কেমন জান? তিনি পৃথিব্যাদি যাবতীয় বস্তুতে বিদ্যমান; অথচ পৃথিব্যাদির কোনকালে ইহাকে জানিতে পারা সম্ভব নহে। এই পৃথিব্যাদি যাঁহার শরীর স্থানীয়, যিনি এই পৃথিব্যাদিকে নিয়মিত করিতেছেন, সেই অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মাই অক্ষর। ইনি অদ্রষ্টা হইয়াও দ্রষ্টা, অজ্ঞাতা হইয়াও জ্ঞাতা। ইহা হইতে পৃথক কোন পদার্থই নাই। যাহা দৃশ্যমান, তাহা ইহারই অবভাস। আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া সে দৃষ্টির বিচার করিলে তাহা ঔপাধিক; তাঁর দৃষ্টি তাঁরই, এভাবে বিচার করিলে নিত্য। আমাদের আকার, রূপ দৃষ্টান্তে তাঁহাকে সাকার বল, সত্য রূপ বিশিষ্ট বল, তাহা ঔপাধিক—মায়িক। আর যদি তাঁরই নিজ আকার, তাঁরই নিরঞ্জন রূপ—তাঁরই, ইহা মনে করিতে পার, তাহা হইলে প্রকৃতিই তিনি সাকার, রূপবিশিষ্ট। ভক্তানুকম্প-ধৃত-বিগ্রহ শ্রীভগবান্, নিত্য দ্রষ্টা, নিত্য দৃষ্টি স্বরূপ, বিজ্ঞানগম্য, বিজ্ঞান-লভ্য, মনোগম্য—যাহাই বলা যাউক, সবই তাঁহাতে কল্পিত, সবই তাঁহাতে সত্য। আমরা যে ভাবে কর্ত্তা, সে ভাবে তিনি কর্ত্তা নহেন।

গার্গী সন্তুষ্ট হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রণাম করতঃ তত্ত্ব কথা শ্রবণে মুগ্ধ—হৃদয়

ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন,—"ভোঃ ভগবন্তো ব্রাহ্মণাঃ! যাজ্ঞবল্ক্য বস্তুতই ব্রহ্মিষ্ঠ: সকলেরই নমস্কারার্হ। শ্রেষ্ঠ সম্মান ইঁহারই। ইনি আমাদিগের মধ্যে শ্রে ব্রহ্মাবাদী মহর্ষি।

জনক রাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ আজ সফল হইল। ব্রাহ্মণগণের পবিত্র সম্মিলনে আজ কৃতকৃত্যতা লাভ করিল।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ ভট্টচার্য্য।

কাম]

প্রেমময়।

মম হৃদয়-তরু শাখে, জাগ জাগ
আজি গাহ গাহ পাখী !
লহ নাম তাঁর বার বার,
প্রেম-সুধায় মাথি ॥
প্রভাত রবির উদয়ে যাঁহার,
প্রেম আলোক হেরি।
অস্ত-রবির কিরণে তাঁহার
হের করুণ পূর্ণ আঁখি ॥

ভেবনারে মন, ভেবনারে আর,
ভাবনা কিছুই নাই।
জীবনে মরণে হৃদয়-রতনে,
হৃদয়ে নিয়ত পাই ॥
মৃত্যু কোথায়,—দুঃখ কোথায়?
বিরহ বেদনা নাহি।
অরুণ-কিরণে প্রেমময় মোর,
হৃদয়-পানে চাহি ॥

কাম]

পাগলের প্রলাপ।

বেশ তো, যত ইচ্ছা ভয় দেখাও, আমি কিন্তু কিছুতেই ভয় পাচ্ছিনা। তোমাকে যে না চেনে, সে তোমাকে ভয় করুক বা 'জড় সড়' হয়ে বসে থাকুক—আমি সে সব কর্ত্তে গেলাম্ কেন? যারা তোমার খবর রাখে না, তা'রা তোমা চোখ-রাঙ্গানিতে কম্পবান হ'ক; কিন্তু আমি যে, দাদা! তোমাকে বে চিনি,—বিলক্ষণ করে তোমাকে জানি। আমার কাছে ও সব রং-তামাসা তোমা চল্‌বে না। জানি গো জানি, তুমি এত রকমের ভেল্কি দেখাতে পার, যে ত দেখে বুদ্ধিকে স্থির রাখা কঠিন। তা' হ'ক, বুঝ্‌তে পারি বা না পারি, ধর পারি বা না পারি; কিন্তু এ সব সত্যিকার ভেল্কি—তা'তো ঠিকই জানি! ভ একটু হয়—হ'ক; তা'য় আর কি কর্‌ব! ধর্‌তেই না হয় নাই পারলাম্। 'বাজী

রে যে ভেল্কি দেখায়,—ধর্ত্তেই যদি পার্‌লাম, তবে আর বাজি দেখানো হল কি? ন্তু মনে মনে তো জানি ও সবই মিথ্যা—তা'ই নিশ্চিন্ত আছি। অনেক সময় 'রা শুধু শুধু ছেলেকে ধমক দিয়ে কাঁদায়; আবার আদর ক'রে হাঁসায়,—এই কম করে রঙ্গ দেখে। বোকা ছেলেরা ধমক খেয়ে কাঁদে, আর আদর পেলে সে। আমি কিন্তু তা'তে ভুল্‌চি না। তুমি ধমক দিলেই যে পড়ে পড়ে দবো, তা' মনে করো না;—ও সব ফিকির তোমার আমি বুঝি! তুমি ধমকই ও, আর সজোরে একটি চপেটাঘাতই কর—আর যাই কর, আমি 'টবাং' রে তোমার কোলে চড়ে বস্‌বো। তারপর তোমার বকৃতে হয় বকো, মার্‌তে মেরো,—যা খুসি হয় করো; আমি চুপ করে পড়ে থাকৃবো এখন।

আচ্ছা এ কি তোমার কাণ্ড বল দেখি! চিরকালই কেবল তোমার ঐ লা আর তামাসা!! বেশ, যত ইচ্ছা খেল; কিন্তু আমাকে আর কিছু বল্‌তে বে না; আমি তোমার কোল থেকে নড়্‌চি না!! তুমি তো বহুরূপী—হু' রূপ ধরে খেলে বেড়াচ্চ—বেশ খেলে বেড়াও; আমি তোমার ঐ মাতৃমূর্ত্তির লা-জুড়ান স্নেহ-সিক্ত কোল্‌টিতে ঘুমিয়ে নিই। বাবা!! একদিন নয়, দু'দিন , যুগ-যুগান্ত ধরে তোমার এই খেলা চল্‌চে,—থামাবার নামটি নেই। বাপু! তোমার নাচ্‌তে ভাল লাগে, নেচে নাও; মনের মধ্যে নৃত্য করে ড়াও, আমাকে আর আসরে নামিও না। আমি বাস্তবিকই আর পেরে ঠ্‌ছি না; আমাকে এইবার একটু অবসর দিতে হয়েছে! তোমার খেলার লায় উত্তক্ত হয়ে উঠেছি, ভাই! দোহাই তোমার, এইবার একটীবার খেলা মাও। বন্ বন্ করে মাথা ঘুরে পড়্‌চে। মাথাটা আগে একটু ঠাণ্ডা হ'ক —তার পর যদি ভাল লাগে, তখন না হয় ফিরি ফিত্তি আবার খেলা যাবে! তোমার কি বল ভাই, মাথাও নাই—মাথার ব্যাথাও নাই!! আমাদের আস্ত মাথাটি কিন্তু তোমার খেলার চোটে গুঁড়া হ'তে বসেছে। তোমার কাছে য়ে নিস্তার নাই, জেগে নিস্তার নাই। জেগে থাকৃলে কি অপরূপ ভেল্কি খাও, তা দেখে দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়—বুদ্ধিতে যে তা'র কিছু থই পাই নাই! আবার যদি ঘুমুই; স্বপ্ন রাজ্যে সে কি খেলা তোমার!! কোন খানেই কিন্তু খেলার কামাই নাই। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এ তিনটা যেন তোমার খেলার মাঠ; সেখানে কেবল বোঁ বোঁ করে ঘুর্‌পাক দেওয়া হচ্চে!!

আমার একটা পরামর্শ যদি শুন, তবে বলি। এ আগেকার মাঠ দুটো ছেড়ে পালাই চল! বেশ তো সুষুপ্তির সুনীল নির্ম্মল প্রান্তরে পড়িয়া পড়িয়া,

একবার প্রাণের বোঝা গুলা নামাইয়া হাল্কা হইয়া লই না কেন? এ দুটো মাঠ যেমন কদর্য্য, তেমনি উব্‌ড়ো খুব্‌ড়ো;—কেবল সেখানে হোঁচট্‌ খেয়ে খেয়ে পড়ে যাচ্চি! এখানে যে অগ্নি জ্বালা; চারিদিক যেন পুড়িয়ে ফেল্‌চে;—এক জায়গায় তিষ্ঠুবার জো নাই। আর ও মাঠটি কেমন স্নিগ্ধ, শীতল ছায়া—কি চারু দৃশ্য! কোন জ্বালা নাই—কোন তাপ নাই। পথের কোন খানে বন্ধুরতা নাই। যদি খেলতেই হয়, তবে চল ঐ খানে গিয়ে খেলিগে। আনন্দময়-কোরে বসে বসে দুজনে কত আনন্দের খেলাই খেল্‌ব!—বেশ হবে! এ নিরানন্দের ভূমি ছেড়ে—চল, সখা! পালিয়ে যাই।

আপনাদের পুরাতন পাগল।

কাম]

ভোগ ও ত্যাগ।

ভগবতী ভারতভূমি চিরকালই 'ত্যাগ'ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। জগতে যে অন্যান্য দেশ আছে, তাহা সব 'ভোগ'স্থান। অন্যান্য দেশের লোকগণ দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির পরিতৃপ্তির নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতের মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কর্ম্মের অভ্যন্তরে স্ফুট বা অস্ফুট ভাবে ত্যাগ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অন্যান্য জীবের যেমন দেহ ইন্দ্রিয়াদির ভোগই চরম লক্ষ্য, আহার বিহার ব্যতীত অন্য লক্ষ্য তাহাদের নাই, মানবের কি তাহাই উদ্দেশ্য? যদি মানবের তাহাই লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি হইতে মানবের বৈশিষ্ট্য কি? বাস্তবিক পক্ষে অন্যান্য জীবের ন্যায়, মানব-জন্ম ভোগের নিমিত্ত নহে। অনেক জন্মের পর দুর্ল্লভ মানব-দেহ ধারণ, কেবল মাত্র আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য। কিন্তু সেই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ভোগে হয় না; তজ্জন্য ত্যাগই একমাত্র অবলম্বনীয়। যদি ভোগের পরাকাষ্ঠা সম্পাদনই আমাদের চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে পশু প্রভৃতির দেহ দ্বারাই পর্য্যাপ্ত হইত; পুনঃ মানব-দেহ ধারণের বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন থাকিত না। যদি বল, বিচিত্র বিমানে যথেচ্ছ-বিহার, নদ নদী গিরিতে অনায়াসে গমন, অভ্রংলিহ প্রাসাদে অবস্থান, মুহূর্ত্ত মধ্যে জগতের ব্যাপার অবগতি, প্রভৃতি বিচিত্র ভোগ অন্য দেহে সম্ভব নহে ও সেই সমস্ত ভোগ সম্পাদনের জন্যই মানব দেহ। তাহা হইলে একবার ভোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। যান, বসন, আহার, প্রাসাদ আমার নাই, তাহা অপ-

রের দেখিয়া আমার মনে দুঃখ জন্মে; সেই দুঃখ নিবারণের জন্য সেই সমস্ত বস্তুর আহরণ করিতে হয়; তাহাতে ও দুঃখ-পরম্পরা আছে। জগতে সকলে সেই সমস্ত দ্রব্য যথেচ্ছ-আহরণ করিয়া দুঃখ-নিবৃত্তি করিতে পারে না। অপিচ এই সমস্ত দ্রব্য মানব-মতি-প্রসূত; যদি কেহ তদপেক্ষা সুনিপুণ সুন্দর যান আহারাদির ব্যবস্থা করিতে পারে, তবে তাহা অপরের দুঃখের হেতু হয়। যে ব্যক্তি তাহা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারও তদ্বিষয়ে দৃঢ় অভিনিবেশ করিতে হয়; তাহার রক্ষণ, উন্নতি ও সংস্কারে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। এই সমস্ত বিচিত্র বস্তুর উপভোগ কখনও স্পৃহা নিবৃত্তি করে না, বরং শত গুণে বর্দ্ধিত করে। চিরকাল নির্জ্জন বনবাসী অনাস্বাদিত-মিষ্টান্ন মানব, নগরে ধনীর গৃহে ধনীকে স্বাদু মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহাতে তাহার লালসা জন্মিল। সে ভাবিল ঐ অপূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্ত হইলে, তাহার স্বাদ গ্রহণ করিলে, তাহার অপ্রাপ্তি নিবন্ধন দুঃখ নিবৃত্ত হইবে। যখন সে সেই দুর্ল্লভ বস্তু পাইয়া আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন মুহূর্ত্তমাত্র একটু শান্তিলাভ করিল বটে; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে জ্ঞাতাস্বাদ-ইন্দ্রিয় আবার তাহা পাইবার জন্য লোলুপ হইল। এইরূপ যত বস্তুই ইন্দ্রিয়কে উপহার দেও না কেন, সে ততই নূতন নূতন তজ্জাতীয় বস্তু চাহিবে। সেইজন্য ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা কখনও বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না; যেমন অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিলে তাহা অধিকতর প্রজ্বলিত হয়।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়; তাহাদের গ্রহণের নিমিত্ত যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষুঃ, রসনা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। যদি ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত বিষয় থাকিত, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের আধিক্য ও আবশ্যক হইত। বি পূর্ব্বক ষিঞ্‌ (ষি) ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্‌ প্রত্যয় করিয়া 'বিষয়' পদ সিদ্ধ হইয়াছে; অর্থাৎ যে পুরুষকে বন্ধন করে, তাহাকে 'বিষয়' বলে। ইন্দ্রের অর্থাৎ আত্মার ভোগ সাধক বলিয়া শ্রোত্রাদিকে 'ইন্দ্রিয়' বলা হয়। যেমন ভৃত্য নানাস্থান হইতে বিবিধ ভোগ্য-দ্রব্য আহরণ করিয়া প্রভুকে উপহার দেয়, তাহাতে প্রভুর পরিতৃপ্তি হয়;—সেইরূপ আত্মার পরিজন-স্থানীয় ইন্দ্রিয় সমূহ পার্থিব বিষয় জাত আহরণ করিয়া, প্রভুস্থানাপন্ন আত্মাকে উপঢৌকন দিতেছে। অনাদি অবিবেক নিবন্ধন আত্মা তাহাতে আত্ম-আত্মীয়

ভাব স্থাপন করতঃ নিত্যমুক্ত স্বরূপ হইয়াও বদ্ধের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। অজ্ঞান বশতঃ আত্মা বুঝিতে পারেন না 'যে এই সমস্ত বিষয়ের সহিত আমার কোন ও সম্বন্ধ নাই; ইহারা বিষয়, আমি অবিষয়।' বিষয়ের স্বরূপ বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাহার ভোগের পরিণতি কতদূর?

শব্দ ধ্বনিমাত্র সামান্য-ধর্ম্মরূপে এক হইলেও, 'ষড়জাদি' বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়। তাহা আবার স্তুত্যাদিরূপে প্রিয়, এবং অনিত্য-বীৎসাদিরূপে অপ্রিয় হইয়া থাকে। লোক, প্রশংসা শ্রবণ করিয়া তাহাতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করতঃ তাহার দ্বারা নিজের বৃদ্ধি, এবং নিন্দা শ্রবণ করিয়া তাহার দ্বারা নিজের হানি বিবেচনা করিয়া থাকে। প্রশংসা বা নিন্দা শব্দে কল্পিত; তাহা আবার আত্মাতে কল্পনা করিয়া লোক আত্মার হানি বা বৃদ্ধি কল্পনা করে। শব্দ বাহ্য পদার্থ; তাহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু লোক সেই অত্যন্ত বাহ্য বস্তুতে আত্ম-আত্মীয়ত্ব বুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিজেকে সুখী দুঃখী বিবেচনা করে।

সেইরূপ একই স্পর্শ, শীত, উষ্ণ ভেদে, নানা প্রকার ভেদ প্রাপ্ত হইয়া সুখ দুঃখের কারণ হয়। সুন্দররূপ দর্শনে তাহাকে পাইবার জন্য মনে বাসনা হইল; পরে দেহের ক্রিয়া আরম্ভ হইল; এইরূপে তাহাকে লাভ করিবার জন্য কত সাধনের আশ্রয় লইতে হইল। উর্ব্বশী দর্শনে পুরুরবার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা পুরাণ পাঠকগণের অবিদিত নাই। একমাত্র রূপের মোহে সমাচ্ছন্ন মানব, তাহাকে আত্মা বিবেচনা করিয়া, তাহাকে পাইবার জন্য ইতস্তত ধাবিত হয়; ভেলার দ্বারা দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হয়, রজ্জু বোধে বিষধর অহিকে আলিঙ্গন করে। এক রূপই মনুষ্যকে কতদূরে নিক্ষেপ করে, তাহা সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগোচর। আবার কুৎসিত রূপ দর্শন করিয়া তাহা অপ্রিয় বোধে তাহাতে দ্বেষ করে। মধুর রস আস্বাদন করিয়া তাহাতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করতঃ তাহা লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত হয়। রাহু একবার মাত্র রসনার দ্বারা সুধার আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছিল; তাহা গলাধঃকরণ করিতে পারে নাই। সে তথাপি ছিন্নদেহ হইয়াও সুধা পাইবার জন্য সুধাকরকে অদ্যাপি গ্রাস করে। পক্ষান্তরে অতি কটু তিক্তরস আস্বাদ করিয়া তাহাতে হেয়ত্ব বুদ্ধি স্থাপন করে। পুষ্পাদির মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া লোকে তাহাতে মানব পুনরায় ধাবিত হয়; বিষ্ঠাদির গন্ধে উদ্বেজিত হইয়া তাহা ত্যাগ করে।

উল্লিখিত পাঁচটী বিষয় গ্রহণ করিতে করিতে ইন্দ্রিয় সমূহ এতদূর অভ্যস্ত হয় যে, বিষয় ব্যতীত তাহারা অন্য কিছু গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। থিয়েটারে

বারাঙ্গনাদিগের সঙ্গীতও শব্দ, এবং দেবগৃহে অধীত বেদ-বেদাঙ্গ ব্যাখ্যানও শব্দ। উভয়ের মধ্যে শব্দের কোনরূপ পার্থক্য না থাকিলেও, লোক অর্থব্যয় ও রাত্রি জাগরণ করতঃ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তাহা শুনিবার জন্য কেন ধাবিত হয়? আর অর্থ ব্যয় নাই, রাত্রি জাগরণে দেহক্ষয়ের ও সম্ভাবনা নাই; তথাপি আচার্য্যের উপদেশ এক ঘণ্টাকাল লোকে শুনিতে চায় না বা কেন? তাহার কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় ঐরূপ সঙ্গীত অনেক বার শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়াছে; সংস্কার দৃঢ়ভাবে বসিয়াছে; তা'ই শ্রবণ তজ্জাতীয় সঙ্গীত শুনিতে চায়। আচার্য্যের ব্যাখ্যান তাহার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করে নাই; সুতরাং তাহা তাহার কর্ণ-জ্বালা উৎপাদন করে! সে ঐরূপ দর্শন করিয়াছে; নব-নীরদ-নিন্দিত কুণ্ডলি-বিড়ম্বী কেশগুচ্ছের শোভায় দিক্‌হারা হইয়াছে; নর্ত্তকীর অভিরাম অঙ্গ সঞ্চালনে নয়ন স্থাপন করিয়াছে; তাই তাহার নয়ন পুনঃ পুনঃ সেই বস্তু দর্শন করিতে চায়। কিন্তু পরম পবিত্র নাভোদর্ক দেব-মূর্ত্তি কিংবা শিখা-তিলক-মণ্ডিত-মস্তক আচার্য্য-মূর্ত্তি দর্শনে তাহার নয়ন অভ্যস্ত নহে; সুতরাং নয়ন তাহা চায় না। পবিত্র আজ্য, চরু, পায়সও খাদ্য, এবং হোটেলে ম্লেচ্ছপক্ক মাংস, পলাণ্ডু, লসুন প্রভৃতিও খাদ্য; তবে পরোক্ত খাদ্যে লোকের স্বভাবতঃ রুচি হয় কেন? কেনই বা হবিষ্যান্নে অরুচি ঘটে? তাহার কারণ রসনা ঐ সমস্ত বস্তুর বার বার আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিলে, তাহাদের স্বরূপ বোধগম্য হইবে। এই সমস্ত প্রিয়াপ্রিয় শব্দ-স্পর্শাদি মানবকে ইতস্ততঃ চালিত করে, অকাণ্ডে নিপাতিত করে। কিন্তু মানব অজ্ঞান নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না; তা'ই শব্দ-স্পর্শাদিতে মনোনিবেশ করে। সমস্ত প্রাণীর সুখই প্রার্থনীয়; কিন্তু বিষয়জ সুখ চপলা প্রভাবৎ ক্ষণভঙ্গুর এবং পরিণামে দুঃখদ। বিবেকী পুরুষ বিষয়ের স্বরূপ অবগত হইয়া, তাহা অনন্ত দুঃখের নিদান ভাবিয়া তাহার দিকে ধাবিত হ'ন না; বরং মলমূত্রাদির ন্যায় বর্জ্জন করেন। যতই এই সমস্ত বিষয় ভোগ করা যায়, ততই ইন্দ্রিয়ের কৌশল বৃদ্ধি হয়; নূতন নূতন বিষয়ে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। যখন ভোগে বিন্দুমাত্র শান্তি ও সুখ নাই, বরং অনন্ত দুঃখের আগার, তখন সুধী ব্যক্তির তাহা হইতে উপরত হওয়া বিধেয়। ত্যাগই একমাত্র শান্তির উপায় ও সুখের আশ্রয়।

বিশেষতঃ প্রাণী-পীড়ন ব্যতীত ভোগ সম্পাদিত হইতে পারে না; শত শত তরু, গুল্ম, লতা, পশু, পক্ষীর প্রাণবিয়োগ করিয়া তোমার ভোগ-বাসনার পরিতৃপ্তি করিতে হইতেছে। মানব! তুমি এক গ্রাস অন্ন মুখে দিবে, কত জীব

তোমার ঐ গ্রাসটী গ্রহণ করিবার জন্য উদ্গ্রীব রহিয়াছে ; এবংবিধ পর-পীড়ক ভোগে আসক্ত হওয়া মানব মাত্রের কখনও উচিত নহে। ভোগে যেমন পরের কষ্ট, সেইরূপ নিজেরও অশেষবিধ ক্লেশ বিদ্যমান আছে। কিন্তু ত্যাগে হিংসা, দ্বেষ কিংবা অসূয়া নাই। পক্ষান্তরে পরহিত-ব্রত তাহার মধ্যে নিহিত আছে। তবে ইন্দ্রিয়গুলিকে কিরূপে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়? বিষয়ের দোষ দর্শন করতঃ তাহা হইতে তাহাদিগকে ফিরানই একমাত্র উপায়। এইরূপ বিষয়ের দোষ দর্শন করিতে করিতে আবার ইন্দ্রিয়সমূহ সদ্বিষয়ে ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইবে। যে ইন্দ্রিয়, মন একদা উদ্দাম অশ্বের ন্যায় দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিত, কত লোকের অনিষ্ট সাধনে সর্ব্বদা নিরত থাকিত, এখন আর তাহারা দুষ্ট বিষয়ের দিকে প্রবৃত্ত হয় না। তখন মনঃ বিষয় পরিহার করিয়া অবিষয় পাইবার জন্য ব্যগ্র হইবে।

শব্দ স্পর্শাদি বিষয়, আত্মা অবিষয় ; সুতরাং ইন্দ্রিয় তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্'—স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়দিগকে বাহ্যদর্শী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং ইহারা অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না ; এইরূপ—শ্রুতি তদ্বিষয়ে প্রমাণ। অতএব এখন ভোগ ও ত্যাগ উভয়টী বিচার করিয়া দেখুন যে কোনটী ত্যজ্য, কোনটী বা গ্রাহ্য।

এই জন্য প্রাচীন মহর্ষিগণ ভোগস্থান হইতে দূরে অবস্থান করিতেন,—ভোগ-স্পৃহা মন হইতে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতেন। তা'ই তাঁহারা সংসারাবস্থায়ও পরমানন্দলাভ করতঃ অন্তিমে অপুনরাবৃত্তি-পদ প্রাপ্ত হইতেন। ত্যাগে প্রতি-দ্বন্দ্বী নাই, পরের দ্রব্য আহরণ করিতে হয় না ; কেবল মানসিক ব্যাপার মাত্র। প্রথমে অত্যন্ত বাহ্যবস্তু বসন, ভূষণ, অশন প্রভৃতিতে হেয়ত্ব বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করিতে হয় ; অনন্তর গো, হিরণ্য, চিত্ত, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে ত্যাগবুদ্ধি কর্ত্তব্য।

অতঃপর পুত্র কলত্রে, পরে স্বীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিতে ত্যাগবুদ্ধি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিবে। যখন ঐ সমস্ত বিষয়ে ত্যাগ প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, তখন তাহার অন্য কিছুই প্রাপ্তব্য থাকিবে না। এই ত্যাগ-ব্রতের জন্য ভারত জগতের গুরু। যে দেশে বাল্যকালে উপবীত গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিলাস-বাসনা পরিত্যাগ করতঃ গুরুগৃহে থাকিয়া ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, পরে গার্হস্থ্য-আশ্রমে দৈব, পৈত্র্যকার্য্য, অতিথিসেবা প্রভৃতির দ্বারা ত্যাগের মহিমা প্রদর্শন করিতে হয় ; তৃতীয় বৈখানস আশ্রমেও ত্যাগের বিস্তার সাধন করিতে হয় ; চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রম কেবল ত্যাগেরই জন্য ; সেখানে পুত্র, কলত্র,

চিত্ত, ঐশ্বর্য্যের কণামাত্রও নাই ; সমস্ত বস্তুকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া কৌপীন পরিধান করতঃ ব্রহ্মপদে মতি রাখিতে হয়। এই সময়ে শ্রুতিও গম্ভীর নিনাদে বলিয়াছেন,—

'ন কর্ম্মণা প্রজয়া জায়য়া ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ'—

কর্ম্ম, পুত্র ও জায়া দ্বারা মুক্তিলাভ করা যায় না, কেহ কেহ একমাত্র ত্যাগের দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মুক্তিই মনুষ্যের একমাত্র প্রার্থয়িতব্য বস্তু ; মনুষ্য-দেহ ধারণ তাহারই জন্য ; ভোগের জন্য নহে। সেই মুক্তিলাভ করিতে গেলে ত্যাগই আশ্রয়নীয়।

অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী (পঞ্চতীর্থ)।

কাম]

আসিবে।

বিলম্ব হউক সখা, তাহে কোন ক্ষতি নাই।
'আসিবে আসিবে তুমি' এতে যে ভরসা পাই॥
বসে আছি কত যুগ, তব আশাপথ চেয়ে।
নয়ন পলকহীন, তোমাপানে চেয়ে চেয়ে॥
হৃদয়-কমল মাঝে, আসন বিছায়ে একা।
বসে আছি কত দিন, টের কি পাওনি সখা !
ভাবিয়া ভাবিয়া মন পাগল হয়েছে এবে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁখি, শুষ্ক হয়েছে তবে॥
কাঁদাতে আপন জনে, কেন ভালবাস প্রভু।
ব্যথা দিতে নিজ জনে, বেদনা হয় না কভু॥
সে বিশ্বাস হয় না যে, তুমি যে করুণাময়।
তব প্রেমে আছে পূর্ণ, হেরি তা' যে বিশ্বময়॥
অন্য কাজ থাকে সখা, সব তুমি নিও সেরে।
যখন রবে না কাজ, এস এ কুটীর দ্বারে॥
ব্যস্ত আমি নহি কিছু, হ'ক না বিলম্ব আর।
এ যে পরমানন্দ, নহে তা' যে ঢাকিবার॥
হৃদয়-নিকুঞ্জ মাঝে, রব প্রতিদিন জাগি।
অবসর হলে তুমি আসিও দাসের লাগি॥

৮

সে দিন কেমন হবে, ভাবি আমি তাই মনে।
এই রবি, এই চন্দ্র, কি শোভা ধরিবে ব্যোমে ॥
জল, স্থল, অন্তরীক্ষে, আসিবে অপূর্ব্ব সাজে।
সব আলো, সব গন্ধে, তুমি ধরা দিবে নিজে ॥
নয়ন দেখিবে তব, কিবা রূপ মনোহর।
সুধা সম প্রবেশিবে, কর্ণে তব কণ্ঠস্বর ॥
অমৃত পরশ তব, হৃদয় পাগল করা।
অমৃত চাহনি তব, শান্তি সুধায় ভরা ॥
আসিবে তুমি যে হেথা, সে কথা শুনিতে চাই।
বিলম্ব হউক সখা তাহে কোন ক্ষতি নাই ॥

———

কাম]

মায়ের পূজা।

মা! মা! তুমি সে দিন (গত বৎসর) আমাদের ছে'ড়ে চ'লে গিয়ে-ছিলে!!! জানিনা, তুমি "মা" সন্তানগণকে ফেলে চলে গিয়েছিলে কি মানব-চক্ষুর অদর্শনে সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ছিলে; কিন্তু মা, তোমা-

মার অদর্শনে।

সে বিশ্ব বিমোহন-কারিণী, প্রশান্তি-দায়িনী প্রতিমার অদ-র্শনে সমস্ত ভারতের হৃদয়ে হৃদয়ে এক বিরহ জনিত দুঃখের প্রবাহ চলিতেছিল। সকল অন্তঃকরণই যেন অপূর্ণ; এত দিন যেন বিষাদের প্রতিবিম্বে সক-হৃদয়ই নীলিমায় কলুষিত ছিল। তোমার অদর্শনে সমস্ত ভারত বিপন্ন,—ব্যথিত! মা-হারা সন্তানের মত "মা—মা" বলে কাতর কণ্ঠে কত কাঁদ্‌ছিল। মা! আমাদের অশ্রুনীরে ভাসিয়ে তুই চ'লে গিয়েছিলি!!!

আঃ, বহু দিন হ'য়ে গেল! এক্ষণে আর সহ্য হয় না! ভারত আর বিচ্ছেদ-রূপ দুঃখ-সাগরে ভাস্‌তে পারে না। মা, অসহ্য যন্ত্রণা! এস মা! একবার এস! একবার দেখা দাও মা! তোমার সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি দে-

মা! এস মা!

দিয়ে ভারতকে অকূল প্রবাহমাণ দুঃখ-সাগর হ'তে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে তুলে নাও মা! যতই দিনের পর দিন গত হচ্ছিল, আমাদের হৃদয়ের প্রজ্বলিত শোকাগ্নিতে কে যেন ঘৃতাহুতি প্রদান করছিল, আর সে অগ্নি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল ভাবে জ্বলে জ্বলে উঠ্‌ছিল! এক্ষণে এস মা!

...রত-হৃদয়ে সংস্থাপিত হও মা! প্রজ্বলিত শোকাগ্নিতে সুশীতল বারিধারা সিঞ্চন ...র মা! দুঃখ-নিবারিণি, শরণাগত-পালিনি, ভারতজননি! মা তুমি সন্তানের দুঃখ ...খে এখনও নীরবে বসে আছ? একবার কৃপা-কটাক্ষ পতিত কর মা!

ওমা! তুমি যে ভারতের প্রতি চিরানুকূল! তুমি বৎসর বৎসর আমাদের ...ধার প্রতিমারূপে দেখা দাও। প্রতি বৎসরেই তোমার অপত্য-স্নেহের প্রবাহ বহিয়া থাকে। প্রতি বৎসরেই আমরা তোমার নিকটে অনন্ত স্নেহ-ধারা পান করিয়া থাকি; এবং স্বর্গীয় কমনীয় মুখারবিন্দু দর্শন করতঃ দেহে জীবন পাইয়া নবোৎসাহিত হই।

...যুগে মায়ের অনন্ত ...-ধারা পান করিয়া থাকি!

মা! প্রকৃতি-রাণী পূর্ব্বেই ভারতকে তোমার শুভাগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন ...রিয়াছে। এখন যেন আবার নূতন যুক্তি সমাগত! গত বৎসরের বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখের নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ সমুদ্রের উপর আনন্দরশ্মি ঝলকিতেছে। সকলের মনই মাতার আগমন ...র্ত্তা শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল! প্রকৃতি-রাণী নব বেশে সজ্জিতা। নভোমণ্ডল ...ঘ নির্ম্মুক্ত নীলাকাশে নক্ষত্র মালা বিভূষিত! চারিদিকে অনুপম শোভা। ...ক সকল ফুল-ফলাবনত। সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে সুবর্ণাগ্রযুক্ত ধান্য সকল যেন ...মার আগমন জন্য কনকাসন বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে এই ...কল অপূর্ব্ব শোভার আধার স্বরূপা সুখদা ধরিত্রী দেবীর প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে ...তি-প্রেম বারি অবিশ্রান্ত উত্তাল তরঙ্গ বিস্তার করতঃ ধাবিত হইতেছে!! ...তুর্দ্দিকেই আনন্দময়! সকল প্রাণীর ধমনীতে ধমনীতে আনন্দের ধারা ...বাহিত। ধরণী আনন্দে নিমজ্জিতা হইয়া মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

নূতন যুগ।

...! এস মা! তৃষিত প্রাণ জুড়াও মা! তোমার সেই শারদ-শশাঙ্কের ...মনীয় আভা-বিনিন্দিত প্রশান্ত মূর্ত্তির ...ভ, মস্তকে মনোহর উজ্জ্বল কিরীট, ...স্তে রবিকর সমন্বিত অসি, সমস্ত জগতের দুঃখ-তিমির নাশ করতঃ স্বর্গীয় সুখ-...দায়িনী শান্তির আলোকে আলোকিত করুক!!!

মাগো! সর্ব্বস্বরূপিনি! প্রতি বৎসর তুমি একবার আসিয়া দু'দিন থাক ...ত্র। আর তমসাচ্ছন্ন মানব-মানসাকাশে সমুজ্জ্বল প্রভা প্রকাশ করতঃ চলিয়া যাও। মা আমরা তোমার পুত্র, তুমি আমাদের মা! তুমি আমাদের মানব চক্ষুর অন্তর্হিত থাক; কিন্তু মা! ...তোমার ক্রোড়ে শায়িত ভারতী অপত্য-স্নেহ-সুখে সতত নিমজ্জিত। মা, তুমি

...মি মা ভারত জননী!

সর্ব্বস্বরূপিণী, তুমি মা জগজ্জননী! আঁধারে আলোকে. তুমি মা ভারতে আলোক।

মা! মা! আমাদের পথ দেখাও, আমরা নিবিড় অন্ধকারে পতিত। মা, তুমিই আমাদের দুঃখ-নিশার একমাত্র উজ্জ্বল তারা। তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের অন্ধকারে পথ প্রদর্শক? দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখধামে উপস্থিত হইতে হইলে, তুমি ভিন্ন আর আমাদের কে কর্ণধাত্রী আছে মা? তুমি ফেলিয়া যেও না মা! তুমি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। তুমি আমাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি বর্ষণ কর মা! কিন্তু যে মা জগৎ সুখ-বিধায়িনী, যে মা সর্ব্বসন্তাপহারিণী, যে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে জগৎ শায়িত, সে মায়ের শান্তিময় ক্রোড়ে কি আমরা স্থান পাব না? আমাদের পক্ষে সে জননীর প্রসাদ কি নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য?— ———অসম্ভব! কিন্তু আবার মনে যেন কেমন এক প্রকার নিরাশার ছায়া পড়ে। আবার মনে হয়———যে জননীর স্নেহের দ্বারা আমরা পুষ্ট, যাঁর নিঃশ্বাসে আমরা অনুপ্রাণিত, যাঁর করুণাধারা আমাদের হৃদয়ে নিরন্তর প্রবাহিত, সেই অনন্ত স্নেহ-পারাবার-স্বরূপিণী জননীর চরণ যুগল কখনও একবার কৃতজ্ঞতার বাষ্পবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিতে পারি নাই, তাঁহার নিকট কাতর কণ্ঠে ভক্তি গদগদ চিত্তে কখনও ত' একবার "মা—মা" বলে ডাকি নাই, আমরা তাঁ'র চরণে অকৃতজ্ঞ!

তুমি যে আমাদের দুঃখ-নিশার একমাত্র উজ্জ্বল তারা!

কিন্তু আবার মনে হয়,—এরূপ চিন্তন অলীকতা মাত্র। কারণ—"কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখন নয়॥" মাতৃপদে সন্তান যতই অপরাধ করুক না কেন, সন্তানের শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও জননী স্নেহ বর্ষণে কুণ্ঠিত হইবেন না।

জননী! তোমার ও শ্রীচরণকমলে আমরা কত আব্দার ক'রে থাকি; মা ভিন্ন আর কা'র কাছেই বা সন্তান আব্দার করবে?—কা'র কাছেই বা হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা জানাব? তুমিই মা আমাদের বাসনা-প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতেছ, আবার তুমিই সেটাকে নিভাইতেছ। কিন্তু মা! এ বাসনা যে অনন্ত! এক বাসনা পরিতৃপ্ত হইতে না হইতেই অপর বাসনার উদয়! মা, চিরকালই কি এইরূপ অদম্য বাসনা হৃদয়কে কলুষিত করিবে? এ যে শান্তি পথের কণ্টক! এই বাসনা, এই ইচ্ছা—তোমার প্রশান্তিদায়িনী জননীর সুখ-বিধায়ক নামে

অদম্য বাসনার নিবৃত্তি কর মা!

একবার স্মরণ করিতে বাধা প্রদান করে। তোমার সেই স্বর্গীয় কমনীয় পদারবিন্দের একবার ধ্যান করিতে গেলেও পার্থিব বাসনা, পার্থিব চিন্তা আসিয়া মন কাড়িয়া লয়। চিরকালই কি এই অনন্ত বাসনা-জালে বিজড়িত থাকিতে হ'বে মা!

যে চির-প্রশান্তিময় পথ এক অনন্ত সুখধামে পৌছিয়াছে, যে পথ চির-প্রফুল্লিত, যে পথাভিমুখে অগ্রসর হইলে, মায়ের সমস্ত সন্তান-সন্ততি মায়ের কার্য্যে ব্রত, মায়ের ধ্যানে রত হইতে পারিবে; মা আমাদিগকে সেই পথের পথিক কর। সমস্ত ভারতের মন এক দিকে ধাবিত করাও মা!

কোন্ মোহিনী শক্তি বলে মুগ্ধ হয়ে জীবনাবধি তোমাকে ভুলে রহিলাম? মোহের বন্ধন কি ছিন্ন কর্‌বি না মা! ঘুমের ঘোর কি ভাঙ্গাবি না মা! জালে পতিত হ'য়ে ভুলে আছি ব'লে কি চিরকাল এই অধম সন্তানগণকে ভুলাইয়া রাখিবি?

মা! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি আমাদের জননী। আমরা তোমার মোহান্ধ সন্তান। সর্ব্বমঙ্গলময়ি! তুমি কি কখনও সন্তানের অমঙ্গল দেখতে পার? জননী সন্তানের দুঃখে দুঃখী, সন্তানের সুখে সুখী! যে মা অবনীর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, যিনি ত্রিভুবনের সর্ব্বসুখ বিধায়িনী, যাঁর সামান্য কৃপা-কটাক্ষের দ্বারা সমস্ত জগতের মানব-হৃদয় আলোকিত হয়, তাঁর সন্তানের বিষাদানল কেন? তাঁ'র সন্তান মোহান্ধ ও দুঃখ নিপীড়িত কেন? এই দুঃখ পাশ হ'তে মুক্ত করা কি সেই অসীম শক্তিশালিনী মহামায়ার শক্তির বহির্ভূত?—অসম্ভব! মা'গো! ইহাতে কি গূঢ় মর্ম্ম নিহিত আছে, তাহা মানব-বুদ্ধি ও শক্তির অগোচর। জানিনা মা, তুমি কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত সতত যত্নবতী। জানি না, অচিন্ত্য-চরিতে! তুমি কোন্ পথের পথ প্রদর্শিনী? কেবল জানি যে তুমি চির মঙ্গলময়ী ও সুখ-বিধায়িনী!

মা সর্ব্বময়ি! পরমেশ্বরি! তোমার ইচ্ছাই ফলবতী হউক। সন্তানের শ্রীচরণের এই প্রার্থনা!

জননি! আজ তুমি আমাদের ঘরে। তোমার দেব-দেব বাঞ্ছিত শ্রীচরণ কি দিয়ে সাজাব মা? ও চরণের উপযুক্ত আমাদের কি আছে মা? আমাদের অর্ঘ্য-ডালি শূন্য, আমাদের উদ্যান পুষ্পহীন মানস-মরুভুমি সম! কিছুই নাই, কি দিব মা?

মা এসেছেন। আজ এই সুখের দিনে ভারত মায়ের চরণ কমলে

কি দিবে, এই ভেবেই আকুল! কিছুই নাই, কেবল ভারতের শরীরে, ক্ষীণ প্রাণের ভিতরে যে ভক্তিটুকু সঞ্চারিত, তাহাই ভারত তোমার চরণে অঞ্জলি স্বরূপে প্রদান কর্ছে। জননি! সন্তানের এই দীনহীন উপহার কি গ্রাহ্য না মা? ভ্রমরের মত হৃদয়-বন হ'তে ভক্তি-মধু চয়ন কর্বে না কি মা?

মাতঃ! প্রকৃতির দিব্য ধুপ ধূনাদি গন্ধ দ্রব্য তোমার চরণে উত্থিত হউক অবনী তোমার চরণে ভক্তি অঞ্জলি প্রদান করুক; তোমার যশ গুণ গানে দশদিশি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হউক।

জননি! প্রেমময়ী তুমি। রেখ মাগো—শান্তিময় সুশীতল ছায়ায় তোমার॥

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র।

অর্থ]

সন্দেহ ও তাহার নিরাকরণ।

১।—সন্দেহ।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও একজন বিশিষ্ট ও প্রথিতনামা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া এই যে মানব-জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, ইহা কি কেবল আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কতিপয় স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিপালন করিলেই ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে; অথবা ইহার আর অন্য উদ্দেশ্য আছে? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা কিরূপেই বা লাভ হইয়া থাকে, এবং তাহা কি করিয়াই বা ঠিক রাখিতে হয়।" তাহাতে তিনি এই মর্ম্মে উপদেশ দিলেন যে, মনুষ্য-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কেবল কতকগুলি স্বাভাবিক ধর্ম্ম আচরণ করিলেই তাহার উদ্দেশ্য পালন করা হইল না। ইহার উদ্দেশ্য কি, তাহা ঠিক করিতে হইলে, গৃহস্থের পক্ষে সৎগ্রন্থ পাঠ, সাধু সঙ্গ ও মাঝে মাঝে নির্জ্জন বাস করিয়া ধ্যান, বিচার ও উপাসনাদি করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য যে কি, তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। পরে দৃঢ়ভাবে উহার সফলতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে, মানব নিজ অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে। এই কথাগুলিতে কেমন একটা সন্দেহ আসিল, ভাবিলাম আমাদের মত নিম্ন অধিকারীর পক্ষে, আমাদের মত অল্প বুদ্ধিজীবীর পক্ষে, আমাদের মত অকর্ম্মা জীবের পক্ষে এই বাক্যগুলি সর্ব্বাংশে কিরূপে প্রয়োগ হইতে পারে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে ক্ষতি কি।

সৎগ্রন্থ পাঠে চরিত্রের সংগঠন হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্যও যে কতকটা ঠিক হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সৎগ্রন্থ নির্ব্বাচন করে কে? সকলেই এক এক গ্রন্থের পক্ষপাতী, কাজেই কোন্ ব্যক্তির উপর ভার দিলে আমার প্রকৃতি অনুযায়ী গ্রন্থ বাছিয়া দিবেন; তাহারই বা নির্দ্ধারণ করি কি করিয়া? ষড়্দর্শন যাঁহার সম্পত্তি, তাঁহাকে নির্ব্বাচনের ভার দিলে, তিনি তাঁহার দর্শন-শাস্ত্র হইতে সংখ্যাতীত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া দর্শন-শাস্ত্র পাঠের উপকারিতা দেখাইয়া আমাকে তাহাই পাঠ করিতে বলিবেন। যিনি ন্যায়-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তিনি তাঁহার ন্যায় ও তর্ক-শাস্ত্রের পরিচয় দিয়া আমাকে ন্যায়-শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, যিনি সাহিত্য-রক্ষী, তিনি তাঁহার সাহিত্য-সাগর মন্থন করিয়া গুরু-গম্ভীর সন্ধি-সমাস-যুক্ত শব্দের লহরী তুলিয়া আমাকে চমকিত করিবেন; কখনও বা ভাবের অমৃত তুলিয়া আমাকে পান করিতে বলিবেন; আবার কখনও বা কল্পনার অতীত রাজ্যে লইয়া যাইবেন এবং বলিবেন সাহিত্যে যেমন ভাবের বিকাশ ও স্ফুরণ হয়, এমন আর কোন শাস্ত্রে হয় না। শাস্ত্রে কেবল মাত্র প্রকৃতি, জড়, চৈতন্য, দ্বৈত ও অদ্বৈত লইয়া তুমুল সংগ্রাম। অতএব যদি বিশুদ্ধ ভাবের উৎকর্ষ সাধন করিতে চাও, তবে স্বদেশী ও বিদেশী গ্রন্থকার প্রণীত গ্রন্থ সকল পাঠ কর, তাহা হইলে মনে শান্তি পাইবে। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, যাঁহারা ঐতিহাসিক, যাঁহারা মানব-প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিবেন, যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতেছ, তাহা ছাড়িয়া বৃথা কল্পনার পদানুসরণ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে যাওয়া প্রকৃত বাতুলের কার্য্য। অতএব এই সমগ্র ভূখণ্ডের কোথায় কি রত্ন আছে, তাহার অন্বেষণ করিয়া কৃতকার্য্য হইলে মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহাও জানিতে পারা যায়।

এই ত' গেল এক দিকের কথা। আবার অন্য দিক দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি,—যিনি খৃষ্ট-ধর্ম্ম-মতাবলম্বী, যিনি মহম্মদ-ধর্ম্মাবলম্বী, যিনি বুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী—প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দিয়া তাহাই পাঠ করিতে বলিবেন। আবার এই হিন্দু ধর্ম্মও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কাহাকেও গ্রন্থ নির্ব্বাচনের ভার দিলে, তিনি সেই সম্প্রদায়ের পুস্তকরাজী উপহার দিয়া আমাকে তাহাই পড়িতে বলিবেন। আবার ইহার ভিতর জ্ঞানী আছেন, ভক্ত আছেন, যোগী আছেন, কর্ম্মী আছেন। এই সংসার-মেলায় অগণ্য দোকানদার, প্রত্যেকেই ক্রেতাগণকে নিজেদের গ্রন্থ দিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। সকলেই যেন বলিতে

চাহেন, তাঁহাদের নির্ব্বাচিত গ্রন্থই সৎগ্রন্থ, আর অপরের কৃত্রিম। তাই সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি,—এই অসংখ্য শাস্ত্ররাশি, যদি এক একটী পাঠ করিয়া সৎগ্রন্থ নির্ব্বাচন করিতে হয়, তাহা হইলে কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে, তাহার সীমা নাই। কোন্ গ্রন্থ আমার প্রবৃত্তির উপযোগী, অথবা কোন্ গ্রন্থ আমার প্রকৃতির প্রতিকূল, তাহা আমি ঠিক করিব কেমন করিয়া? অনন্ত শাস্ত্রের অতল গর্ভে অনন্ত ও মহামূল্য তত্ত্ব-কথা নিহিত আছে সত্য; কিন্তু সে সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম অধিকার করিতে না পারিলে ত' আমি আমার গন্তব্য পথ কি, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। আপনি মহাজ্ঞানী—আমাকে জ্ঞান-কাণ্ডের 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য বুঝাইতে আসিলেন; কিন্তু মহামূর্খ আমি, আপনার সে ভাষা ও ভাব আমি আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। আপনি মহাপ্রেমিক ও ভক্ত, ভক্তি-শাস্ত্রের মহিমা আমার নিকট কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন; কিন্তু পাষাণ-চিত্ত আমি, আমার চিত্ত তাহাতে একবিন্দুও দ্রব হইল না। আপনি মহাযোগী পুরুষ, যোগ-শাস্ত্র ও যোগ-সংহিতা হইতে রাশি রাশি তত্ত্ব-কথা কহিয়া আমাকে অষ্টসিদ্ধি লাভের উপায় বলিতে আসিলেন, কিন্তু চঞ্চল-চিত্ত আমি, তাহাতে মন স্থির করিতে পারিলাম না। আপনি যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়া-কুশল পরম নিষ্ঠাবান ও মহাকর্ম্মী পুরুষ, আমাকে কর্ম্মকাণ্ডের উপকারিতা বুঝাইতে আসিলেন, কিন্তু আমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া উহা বৃথা পণ্ডশ্রম জ্ঞান করিলাম। আমাদের পরমায়ু অল্প, জ্ঞান নিতান্তই সঙ্কীর্ণ এবং শক্তি সামর্থ্যও নিতান্ত ক্ষীণ; কাজেই যদি নিজে সৎগ্রন্থ পড়িয়া—বুঝিয়া নিজ গন্তব্য পথ ঠিক করিতে হয়, তাহা হইলে ইহজনমে আর হইবে না। আমার বিশুদ্ধ প্রকৃতি কি চাহে, তাহা অজ্ঞানান্ধ-মায়াবিকার মুগ্ধ—আমি বুঝিতে পারি না; তা'ই খেয়ালের বশে কখনও বেদে, কখনও বাইবেলে, কখনও পুরাণে, কখনও কোরাণে যাই।—কখনও বা জ্ঞানীর জ্যোতির্ম্ময় সচ্চিদানন্দে আকৃষ্ট হই, বা ভক্তের শান্তিময় প্রেম-নিকুঞ্জ-কাননে শান্তির আশায় ছুটিয়া যাই; আবার পরক্ষণেই হয়ত যোগীর অষ্ট-সিদ্ধি-সম্পন্ন যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া ঋদ্ধি ও সিদ্ধির ভিখারী হইয়া যোগ-প্রাণায়াম করিতে বসি। কিন্তু তাহাও অতি কষ্টসাধ্য দেখিয়া ও কর্ম্মীকে ভগবৎ সেবায় অহঃরহঃ নিরত দেখিয়া, তাঁহার পদানুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হই। এই রূপ নানা ধর্ম্মের, নানা সাধন প্রণালীর ভিতর দিয়া ছুটাছুটি করিতেই জীবন অবসান হইয়া আসিল! গন্তব্য পথ কোথায় কোন্ স্থানে তাহার কিছুই ঠিকানা করিতে পারিলাম না। অনন্ত শাস্ত্রের গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া দিশাহারা

হইয়া কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সেইজন্য মনে হয়, আমাদের মত দুর্ব্বল ও নিম্ন অধিকারীর পক্ষে পুস্তক পাঠ করিয়া নিজের পথ, নিজ জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা ঠিক করা একান্তই অসম্ভব।

আজীবন ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে সুফল না হউক, কুফলও যে হয় না, ইহা ঠিক। ইহাতে অন্ততঃ চরিত্রও যে সংগঠিত হয়, তাহাতে মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু সাধুসঙ্গ আমাদের পক্ষে একেবারেই আকাশ-কুসুমবৎ। একে ত' আমরা সহজেই বিশ্বাসহীন, তাহাতে আবার সংসারের আবর্জ্জনা রাশি দ্বারা নয়নদ্বয় অন্ধীভূত; কাজেই আমাদের পক্ষে সাধু চিনিয়া সাধুসঙ্গ করা প্রকৃতই আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমরা আমাদের নিজ নিজ সীমা বিশিষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা, অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা, অপরিণত বিচার-শক্তি দ্বারা ও কল্পিত সাধুত্বের ভিতর দিয়া সাধু চিনিতে যাই; কাজেই প্রকৃত সাধু আমরা পাই না। কলির অধম জীব আমরা, সাধুসঙ্গ আমাদের পক্ষে দুর্ঘট হইয়াছে। অবশ্য সাধু পাওয়া যায় না বলিয়া নহে, প্রকৃত চেষ্টা করিলে সাধু পাওয়া যাইতে পারে বটে; কিন্তু সে চেষ্টা, সে উদ্বেগ, সে আন্তরিক যত্ন আমাদের কৈ? আমাদের চেষ্টার শতধারা সাংসারিক কার্য্যে ছুটিয়া যায়, কিন্তু তাহার একটী অতি ক্ষীণ রেখাও সাধু অন্বেষণে দেখা যায় না। আমরা নিজে সাধন-বিহীন, অসাধু, কপট, কদাচারী; তা'ই সাধন-সিদ্ধি-সম্পন্ন সরল সাধু-প্রকৃতি সাধু দেখিতে পাই না। আমার শ্রীগুরুদেব একবার বলিয়াছিলেন যে, "সাধু কতটুকু সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন, কতটুকু সাধন-সিদ্ধি সম্পন্ন লক্ষণ তাহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে, সাধন-ক্ষেত্রে কোন্ গূঢ় গর্ভের নিভৃত-রত্ন ভাণ্ডারের অধিকার তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহার বিচার করিয়া লওয়া আমাদের মত অসাধকের শক্তি ও সামর্থ্যের বহির্ভূত"।

প্রকৃত কথাই তাহাই। আমরা নিজে অসাধু হইয়া কেমন করিয়া সাধু চিনিব। নিজে মূর্খ হইয়া অপরের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিমাণ কেহ কি করিতে পারে। তাহার উপর অমরা একেবারে চেষ্টাশূন্য। শত সহস্র দুঃখ কষ্টে পতিত হইলেও ভ্রম ক্রমেও আমরা সাধুর অমৃতময়ী উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করি না। বিষম বিপদে পতিত হইলেও আমরা সেই ভবভয়-হারিণী, দুর্গতিনাশিনী, করাল-বদনী মায়ের কাছে যাইতে চাহি না। আজ ভক্ত ধ্রুব বিমাতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও অপমানিত বোধ করিয়া, পিতার প্রাসাদ ফেলিয়া আসিলেন এবং গহন-কান্তারে 'কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি' বলিয়া প্রাণের ডাকে ডাকিতে

পারিয়াছিলেন বলিয়াই না, বিপদের সহায় দীনবন্ধু সাধক-শ্রেষ্ঠ সাধু-হৃদয় দেবর্ষি নারদকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই অমৃতময় উপদেশে তিনি জলে হরি, স্থলে হরি, বৃক্ষে হরি, ব্যাঘ্রে হরি, ভূচরে—খেচরে হরি, অনলে,—অনিলে হরি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি মর্ম্মভেদী যাতনায় কাতর হইয়া ভগবানের দিকে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই না, জীবন্মুক্ত নারদ ঋষি আসিয়া দীক্ষাচ্ছলে তাঁহার গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা ঐরূপ যাতনায় কাতর হইব, যতক্ষণ সর্ব্বভূতে হরি না দেখিব, ততক্ষণ আমাদের উপায় কি? কে আমাদের মলিন চিত্তকে পরিমার্জ্জিত করিয়া ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুদ্‌ব্যোমে হরি দেখাইবার সহজ কৌশল শিখাইবেন? কে আমার উন্মত্ত মন-মাতঙ্গকে শ্রীহরির ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত চরণ-প্রহারে নিয়মিত করিয়া আমার জীবনের কর্ত্তব্য কি, গন্তব্য কোথায়, তাহা ঠিক করিয়া দিবেন? হে ত্রিজগদ্‌গুরো! আমি তোমাতেই আত্ম-সমর্পণ করিলাম; আমার সকল চেষ্টা, সকল যত্ন যেন তোমাতেই লীন হয়।

যাহার মন সংসারের ঘোর আবর্ত্তে সদাই নিমজ্জিত, যাহার বুদ্ধি-বৃত্তি অপরিমার্জ্জিত, অসংস্কৃত ও হীন, যাহার চরিত্রের সম্যক্‌রূপে সুগঠন হয় নাই, তাহার আবার নির্জ্জন বাস কি? বরং এবম্প্রকার জীবের নির্জ্জন বাস কুচিন্তা ও দুশ্চিন্তাকেই প্রসব করে। যে দুরাচার রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া নির্জ্জন কারাগারে কালাতিপাত করিতে থাকে, সে কি নির্জ্জন বাস-কালে গভীর ভগবৎ-তত্ত্বে কালক্ষেপণ করে? না সে কারাগারে বসিয়া প্রতিবেশীকে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া, প্রতিফল দিবার মৎলব আঁটিতে থাকে। আমরা সেইরূপ সংসার-কারাগারে আবদ্ধ জীব। আমরা নির্জ্জন বাস ইচ্ছা করিলেই বা কি হইবে? মন নির্জ্জন হওয়া চাই। আমি দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া, ঈশ্বর চিন্তা ও ধ্যান করিব বলিয়া বসিলাম, হয়ত ধ্যেয় মূর্ত্তিকে চিন্তা করিবার জন্য মনকে নানা বিষয় কার্য্য হইতে আকর্ষণ করিয়া, ক্ষণেকের জন্য টানিয়া রাখিলাম; কিন্তু চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে দেখি, মন আমার মনে নাই, অর্গলবদ্ধ গৃহের চতুষ্কোণের কোন স্থানে নাই, বাহিরে পিতা মাতায় নাই, পুত্র-কলত্রে নাই, আত্মীয়-স্বজনে নাই, বন্ধু-বান্ধবে নাই। তখন খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর মানস-পুত্র কমলাকান্তের মত, হয়ত কাহারও দুগ্ধ ভাণ্ডের মধ্যে, আর না হয় বাজারের ভিতর, কিম্বা যদি অন্য কোথায়ও না থাকে, তাহা হইলে "মুল্‌তুবী" কাগজ পত্রের ভিতর। পুনরায়

মনকে জোর করিয়া আনিলাম; ভাবিলাম এইবার নিশ্চয় মনকে কোথাও যাইতে দিব না। কিন্তু এই যা, এবার মন অন্য কোথাও যাইল না বটে, কিন্তু গৃহিনীর পাকশালায় ঘুরিতে লাগিল। এইরূপে মনকে লইয়া টানাটানি করিতেই মুহূর্ত্ত ক্ষণ লগ্ন নষ্ট হইল। কাজেই এত আড়ম্বর সবই বৃথা হইল, নির্জ্জন বাসের কোন ফলই হইল না। মন রহিয়াছে সংসারের ভিতর, আর বাহিরে ঠাট-ঠমক দেখাইয়া, লোক জনকে জানাইয়া, ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া নির্জ্জন বাস বা চিন্তা কিছুই নহে। মনে নির্জ্জনতা না হইলে, বাহ্যে নির্জ্জনতা কেবলমাত্র আত্ম-প্রবঞ্চনা। সমস্ত প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিয়া মনেতে বিনাশ করিতে পারিলে, তবেই নির্জ্জন বাসের ফল উপলব্ধি হইবে। অথবা সমস্ত বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া কেবলমাত্র ভাগবতী প্রবৃত্তিকে জাগরিত বা প্রবুদ্ধ করিতে পারিলে, তবে নির্জ্জন বাসের উপকারিতা বুঝিতে পারা যায়। নচেৎ আজীবন অন্ধকার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মনে নির্জ্জনতা না হইলে কিছুই হইবে না; ইহাতে যেন না বুঝেন যে মনে কিছুই থাকিবে না। অবশ্য মনে বিষয়াদির চিন্তা, আত্মীয়-পরিবারের চিন্তা কিছুই থাকিবে না বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে মনে কেবল ভগবৎ চিন্তাকেই জাগরিত করিয়া রাখিতে হইবে। যখন দেখিব ও বুঝিব আমাদের মন সমস্ত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে, যখন পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের চিন্তায় মন উদ্বেলিত হইতেছে না, যখন বুঝিব মন, প্রাণ কি এক অজানা অচেনা বস্তুর জন্য সদাই চঞ্চল হইয়াছে, তখনই বুঝিব নির্জ্জন বাসের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। তখনই জানিব সামান্য চেষ্টা করিলেই চুম্বুক-শৈলাভিমুখে লৌহের আকর্ষণের ন্যায় মন ভগবৎ চরণে সংলগ্ন হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে; এবং অল্পক্ষণেই তাঁহাতে সংযুক্ত হইয়া যাইবে। একবার আমার গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম যে কোন একটী সমাধিশীল সাধুর নিকট দুইটী তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভক্ত শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য সমাগত হ'ন। তাহাদের কাতর বানীতে সাধুর সাধু হৃদয় আকৃষ্ট হয়। কিন্তু শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে একবার কষিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি দুইজনকে দুইটী কপোত পক্ষী ও দুইখানি শাণিত তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা দিয়া বলিলেন "যাও এই দুইটী কপোতকে কোনও জনপ্রাণী হীন নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া বধ করিয়া লইয়া আইস; এবং যে অগ্রে আসিবে, তাহাকেই দীক্ষিত করিব।" দুইজন দুই দিকে চলিয়া গেলেন। একজন অনতি-বিলম্বেই তাহার কপোতটির ছিন্ন মস্তক লইয়া আসিয়া গুরুপদে অর্পণ করিয়া

বলিলেন, "গুরুদেব! একটী জনপ্রাণী-হীন বনান্তরালের ভিতর যাইয়া এই কপোতটীর বধ সাধন করিয়াছি, কেহই দেখিতে পায় নাই। আমার সঙ্গী এখনও আইসে নাই, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দীক্ষা দিউন।" সাধু তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া একটু হাসিলেন ও প্রবোধ দিয়া তাহার সঙ্গীর জন্য একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, ভগবান মরিচিমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন; ঠিক সেই সময় অপর যুবকটী জীবিত কপোতটিকে লইয়া আসিয়া অশ্রুপরিপুর্ণ লোচনে সাধুর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "প্রভু আমার সদৃশ হতভাগ্য কেহই নাই। আমি সারাদিন বনে বনে ঘুরিয়াছি, কিন্তু কোথায়ও নির্জ্জন ভূমি দেখিতে পাইলাম না। সর্ব্বত্রই দেখিলাম এবং অনুভব করিলাম, যেন অসংখ্য জীবগণে পরিপূরিত; সকলই যেন তাঁহার সত্ত্বায় সত্ত্ববান! তাঁহার ঈশ্বরী লীলা সর্ব্বত্রই যেন এক অপূর্ব্বভাবে লীলা করিতেছে, মনে হইল যেন সেই চৈতন্যময়ের প্রভাবে সমগ্র ভূখণ্ড চেতনাযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তরু, লতা ও গুল্মাদিতে তাঁহার চৈতন্য, নদী তড়াগ-সরোবরে তাঁহার চৈতন্য, পশু-পক্ষী মানবে তাঁহার চৈতন্য, এমন কি সামান্য ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে কিংবা অত্যুচ্চ অভ্রভেদী মহীধরেও তাঁহার চৈতন্য উপলব্ধি হইল। সকল স্থানেই তাঁহাকে দেখিলাম; সুতরাং যেখানে সেই অনাদি অচিন্ত্য এক মহাপুরুষ লীলা করিতেছেন, সেখানে আমি কেমন করিয়া নির্জ্জন স্থান পাইব। কাজেই আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইলাম। ভাবিয়াছিলাম আপনার নিকট দীক্ষিত হইয়া জীবনের গন্তব্যপথ ঠিক করিয়া লইব, কিন্তু অদৃষ্টদোষে তাহা হইল না।" যুবা এবংবিধ নানা প্রকার বিলাপ করিয়া সাধুর পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া অজস্র অশ্রুধারায় বক্ষ সিক্ত করিতে লাগিলেন। সাধু যুবকের এই প্রকার ভাবপ্রবণতা দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন; এবং সেই যুবককে সস্নেহে ক্রোড়ে করিয়া বলিলেন "বৎস, তুমিই যথার্থ শিষ্য হইবার যোগ্য পাত্র। বুঝিলাম তোমার যাবতায় বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি অন্তর্ম্মুখী হইয়া সর্ব্বত্রই ভগবৎ সত্ত্বা দর্শনের উপযোগী হইয়াছে। আর অপর যুবকের ততদুর হয় নাই। তোমার হৃদয় যথার্থই কর্ষিত হইয়া ভগবৎ-সেবার উপযোগী হইয়াছে। অতএব তোমাকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলাম।" এতক্ষণে বুঝিলেন নির্জ্জনতা কোথায়। মনের অবস্থা এইরূপ যতক্ষণে না হইবে, নির্জ্জনবাসে নির্জ্জনে চিন্তায় কিছুই ফলোদয় হইবে না। আর যখন ঠিক এই অবস্থা আসিবে, তখন সংসারে যে কোন অবস্থায় থাকিলেও চিত্ত সদাই স্থির থাকিবে।

আমাদের না আছে স্থৈর্য্য না আছে ধৈর্য্য। বিচার করিতে বসিলে কত ধীর হওয়া প্রয়োজন তাহা বিচারবান্ পুরুষ মাত্রেই জানেন। কোনও টী সিদ্ধান্তে হঠাৎ উপনীত হওয়া উচিত নহে। বিচার করিতে বসিলে দুই সমান ভাবে বিচার করিতে হইবে। কিন্তু সে বিচারে কত জ্ঞানের য়োজন—বহুদর্শিতার আবশ্যক। আমাদের এই সঙ্কীর্ণ—অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি ও ন লইয়া কোনও একটী ধর্ম্ম বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যে নিতান্তই মূর্খ-র কার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি হয়ত কোন একটী মতের বা ান্তের পক্ষপাতী, কাজেই সেই মতের সমর্থনকারী যত শ্লোক যত রচনা বৃত্তি করিয়া অপরকে বুঝাইয়া দিলাম বটে। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত ও সমীচীন, তাহা কে বলিবে? আমি যেমন আমার সিদ্ধান্তের অনুযায়ী শত ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিলাম, তেমনি আমার প্রতিপক্ষ সহস্র স্র গ্রন্থ হইতে তাহার সমর্থনকারী সংখ্যাতীত শ্লোক আবৃত্তি না করিবেন হা কে বলিবে? কাজেই এ বিচার বড়ই শক্ত ব্যাপার। যে বিচারের ান্তে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালিত হইবে, তাহার বিচার কি নিজের ছন্দমত গ্রন্থ পড়িয়া হইতে পারে? আমার যে গ্রন্থকে সহায় করিয়া আমি মার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিব, সে গ্রন্থের শ্লোক হয়ত পরস্পরে বিরুদ্ধবাদী। খন আমাদের অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি যে আরও বিকৃতিভাবাপন্ন না হইবে, াহাই বা কে বলিবে? যিনি জ্ঞানমার্গের পথিক, তিনি শাস্ত্র-সাগর মন্থন রিয়া জ্ঞানগর্ভ শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিবেন, যিনি ভক্তিমার্গের পথিক, তিনি ক্তি-অমৃতোপম রচনার মালা গলায় পরাইয়া দিবেন। তখন মনে হইবে মি ভক্ত হই কি জ্ঞানী হই। আমি বেদ পড়িলাম বেদান্ত পড়িলাম; আমি াংখ্য পড়িলাম, পাতঞ্জল পড়িলাম; আমি ন্যায় পড়িলাম, দর্শন পড়িলাম; আমি মিল্ পড়িলাম, 'টিণ্ডাল' পড়িলাম, আমি 'হক্স্লে' পড়িলাম, 'কম্টে' পড়িলাম; কিন্তু পড়ার মত পড়িতে পারিলাম না বলিয়া সমস্তই পণ্ডশ্রম হইল, সকলই বৃথা হইল। আবার যিনি বিচারকের আসনে সমাসীন হইয়া অপরের অপরাধের বিচার করিতেছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন দেখি নিজের সম্বন্ধে কি বিচার করিতেছেন? কোথা হইতে আসিলেন, কিসের জন্য আসিলেন, কেনই া আসিলেন, আসিয়াই বা কি করিলেন—এ সমস্ত বিষয়ের সৎ মীমাংসা সৎ-বিচার তিনি কয়বার করিয়াছেন? এ বিষম সমস্যার, বিষম প্রহেলিকার মীমাংসা ক যেমন তেমন বিচারক করিতে পারেন? কয়টী লোক নিজে বিচার করিয়া

নিজে জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে এই সুখময় সংসারে নরকের বিষম দৃশ্য দেখিতে হইত না। সকলেই ত' জানেন— অনৃত-ভাষণ, অহিতাচরণ, পরহিংসা, পরপীড়ন কোনও সভ্য-সমাজে আদৃত হয় না; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বোধ করি অর্দ্ধেক লোক স্পষ্টতঃ উক্ত দোষে কলঙ্কিত, আর বাকি সাধুতার ভাণে, কপটতার ছলনায় সিদ্ধ-হস্ত। কেনা জানে—জীবহত্যা, নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা, চৌর্য্য, দস্যুতা, পরদারাভিমর্ষণে, গুরুস্ত্রীগমনে অনন্তকালব্যাপী নরকবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেয়; কিন্তু তাই বলিয়া কি সভ্যসমাজ হইতে উক্ত দোষগুলি উঠিয়া যাইতেছে। অধিকন্তু যে যে কার্য্য করে, সে তাহার নিজ বুদ্ধির উপযোগী একটা না একটা মত ঠিক করিয়াই রাখে। তাই যে হয়ত অপরাধে অপরাধী, সেও নিজ দোষ প্রক্ষালনের জন্য কূট-বুদ্ধি ব্যবহারজীবীদের আশ্রয় লইয়া নিজেকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিতে চাহে। যে চোর বা দস্যু, সে চুরি বা দস্যুতা জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু উক্ত কার্য্যগুলি যে গর্হিত ও পাপ সেইগুলি তাহাকে বুঝাইয়া না দিলে চলিবে কেন? আমরাও ছলনায় কপটতায় 'ভাবের ঘরে চুরি' করিয়া থাকি, অতএব আমাদিগকেও সেইগুলি বুঝাইয়া দিতে হইবে।

যদি কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না, তখন উপাসনা আরাধনা করি কাহার? বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ, বিভিন্ন মত, বিভিন্ন পথ, কাজেই কোন্ পথে যাই। নানা ধর্ম্মের নানা সম্প্রদায় সকলেই নিজ নিজ মত লইয়া আমার নিকট আসিতেছেন। বলুন দেখি, কোন্ মতে আমি স্বীকৃত হই, কোন্ পথেই বা যাই। পাঁচজনের পাঁচ কথায় সংসারের কাজ যখন ঠিক সুশৃঙ্খলায় চলে না, তখন এত বড় বিষয়টী পাঁচধর্ম্মের পাঁচটী মত লইয়া এক পথে চলিব কেমন করিয়া? কাজেই আমার কিছুই হইল না। এক পথ না ধরিলে আমি ত' কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিব না। জানি, সকল পথ কি সকল মত সেই একই ঈশ্বর লইয়া। সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য এক। কিন্তু তাই বলিয়া আমার মত জীবের মনে শান্তি আসে কৈ? এখন কোন্ পথটী সহজ সুগম, তাহা আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া না দিলে, অল্পবুদ্ধি আমি, ঠিক করিব কেমন করিয়া? আমার উন্মত্ত মন সংসারের নানা বিষয় লইয়া উন্মত্ত। বলুন দেখি কি করিয়া আমাদের এই বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তিগুলি সংযত করিয়া অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারি। আমাদের কি সেই শিক্ষা আছে, না যত্ন আছে। বাল্যকাল হইতে পুস্তকের কতগুলি ছত্র কণ্ঠস্থ করিতেছি, এবং তাহারই উদ্গীরণ করিয়া কোনও মতে

র-বস্ত্রের আয়োজন করিতেছি। আমরা প্রবৃত্তির তাড়নায় এতই বিমুগ্ধ যে ন্টী সৎ, কোন্টী অসৎ, কোন্টী সু, কোন্টী কু কিছুই বুঝিতেছি না। আমরা বৃত্তির বশে সকল বস্তুতেই আগ্রহ প্রকাশ করি, আবার বিফল মনোরথ হইয়া নমুখে ফিরিয়া আসি। সংসার-মেলায় নানাবিধ চাকচিক্যময় দ্রব্যসম্ভার স্তরে রে সাজান রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কোন্ বস্তুটী আমাদের প্রয়োজনে আসিবে, হা বাছিয়া দেয় কে? বাহিরের চাকচিক্যময় সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলে চলিবে । আমরা নির্ব্বাচন বিষয়ে অতি শিশু, কাজেই যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রবীন, চক্ষণ ও বহুদর্শী তাঁহাদের উপর ভার দিতে হইবে, তাঁহারা বাছিয়া যে া আমাদের দিবেন, তাহাতেই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে। আমরা অস্মিতার বশীভূত হইয়া নিজে পছন্দ করিয়া পথ নির্ব্বাচন করিতে যাই, সেইজন্য সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ, শান্তির শীতল ছায়ার পরিবর্ত্তে অশান্তির জ্বালা-ী তাপ আমাদের ভাগ্যে নিয়তই ঘটিতেছে। আমরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে রিয়া নয়ন-মন-মুগ্ধকর আকাশ পথের দৃশ্য লিপিবদ্ধ করিতে যাই, আমরা প্রাতঃকাল হইতে গভীর নিশীথকাল পর্য্যন্ত সংসারের নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও কষ্ট বোধ করি না; কিন্তু একদণ্ড কাল নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও কামনাশূন্য হইয়া ঈশ্বর ধ্যান বা ভগবানের নাম কীর্ত্তণ করিব, সে ক্ষমতা আমাদের নাই। তখন হয়ত মনে হয়, ঐ এক মুহূর্ত্তকালে আমরা না জানি কত কার্য্য শেষ করিতাম। অন্য সময় হয়ত সমস্ত দিন গল্প করিয়া, পরচর্চ্চায়, পর-নিন্দায় রত থাকিয়া সংসার কোলাহলে মাতিয়া, অথবা অন্য কোন দ্যূত-ক্রীড়ায় মত্ত থাকিয়া, দুই প্রহর কাল স্বচ্ছন্দে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করিয়া থাকি। কিন্তু যত কষ্ট, যত উদ্বেগ ঐ একদণ্ড কাল। আমরা সমস্তদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নাটক, উপন্যাস, প্রহসন, গল্প, গুজবের বহি পাঠ করিতে কষ্ট বোধ করি না; কিন্তু যত তর্ক যত আপত্তি ঐ একটু সাধুর সহিত বাস করা, কি সাধুর কাছে যাওয়া কিম্বা সাধুর প্রস্তাব শুনা বা সৎবিষয়ের জিজ্ঞাসা।

২।—নিরাকরণ।

গ্রন্থ পড়িলাম কিন্তু কোনটী সৎ কোনটী অসৎ, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। সাধু অন্বেষণে বাহির হইলাম, কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তাহাও অপ্রাপ্য হইল। নির্জ্জনে বসিলাম, যত কুচিন্তা মনে আসিয়া উদয় হইল। বিচারে বসিলাম, কুসংস্কার বর্দ্ধিত এবং অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া অপসিদ্ধান্তেই উপনীত হইলাম।

আর উপাসনা তাহাও কেবল বাক্যের প্রতিধ্বনিতে পরিসমাপ্ত হইল। কাজে কিছুই হইল না। এতক্ষণে বুঝিলাম, আমরা নিজে কিছুই করিতে পারিব না; যতক্ষণ কেহ আমাদের পথ ঠিক করিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া দিবেন, ততক্ষণ আমাদের কোন উপায় নাই। সংসারের অধম জীব আমরা, আমাদের ত কথাই নাই; ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ভগীরথ প্রভৃতি সকলেই প্রথমে গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া, তবে জীবনের গন্তব্য পথ ঠিক করিরাছিলেন। মহাত্মা ভগীরথ যখন মহর্ষি কপিল শাপে ভস্মীভূত নিজ পিতৃ-পিতামহগণের উদ্ধারার্থে গঙ্গা দেবীর আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, শত বৎসর কৃচ্ছ্র সাধনায়ও গঙ্গার দর্শন পাইলেন না; তখনই না ভগবান নারদ আসিয়া সাধন-কৌশল শিখাইয়া দিলেন। যখন পঞ্চম বর্ষের শিশু ধ্রুব সুনীতি মায়ের অঞ্চলের নিধি ঘোরা দ্বিপ্রহরা রজনীতে "কোথায় পদ্ম পলাশলোচন হরি" এই কথা বলিতে বলিতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, পথে কত মায়া, কত বিভীষিকা দেখিলেন, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। দুই নয়নে অশ্রুধারা, বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, মুখে কেবল "কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি"; কিন্তু কৈ, এরূপ একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা, দার্য্যতা থাকা সত্ত্বেও যে পর্য্যন্ত না তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করিতে বা ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। ভগবানের অবতার শাক্যসিংহ কিম্বা প্রেমের অবতার চৈতন্য দেব, সকলকেই দীক্ষিত হইতে হইয়াছিল। যাহার পিতা-পিতামহগণ ভগবানের অন্তরঙ্গ নিজ আত্মীয় ছিলেন সেই রাজাধিরাজ পরীক্ষিতকেও প্রবুদ্ধ করিবার জন্য শুকদেবকে আসিতে হইয়াছিল। সপ্তাহকাল গঙ্গাগর্ভে বাস করিয়া হরি কথা শ্রবণ, চিন্তন, ধ্যান করিয়া ও সাধুসঙ্গ করিয়া, শুকদেব মুখ নিঃসৃত ভাগবৎ শ্রবণ করিয়া পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়াছিলেন। পাছে জীবনের অত্যল্পকাল সময়েও চিত্ত-চাঞ্চল্য না ঘটে, সেইজন্য ভগবান ব্রহ্মর্ষি জীবন্মুক্ত শুকদেবকে পরীক্ষিতের জীবন-তরীর কর্ণধার করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর আমাদের এই সুদীর্ঘ জীবনের জন্য একজন কর্ণধারের প্রয়োজন হইবে না ইহাই বা কেমন কথা। যিনি যত বড়ই সিদ্ধ ও বুদ্ধ হউন না কেন, তাঁহাকে প্রথমে যথারীতি দীক্ষিত হইয়া যথা-বিধি-সাধন প্রণালীর ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। ঘোর সংসারী হই অথবা ঘরি সন্ন্যাসীই হই, বিদ্যার্থীই হই, আর যাহাই হই না কেন, প্রথমে একজন পরি-চালক না হইলে চলিবে না। প্রবল বাত্যাহত উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গকারী মহা-সমুদ্রেই হউক অথবা নিষ্কম্প মৃদু মন্থর স্থির ধীর নদীতেই হউক, পার হইবার

যেমন একটি তরী আর শত সুদক্ষ ক্ষেপণক থাকিলেও একটি পরিচালক কর্ণধার চাই; তদ্রূপ শত কৃচ্ছ্র-সাধনশীল হঠ-যোগাদি করি কিংবা শান্তিময় ...ম সাধনই করি, প্রত্যেক ধর্ম্মাচরণের জন্য একটী গুরু চাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, নিজে যখন শাস্ত্র পড়িতে পারি, তাহার ব্যাখ্যা ...শ্লেষণ করিতে পারি এবং অন্যকে তাহা বুঝাইতে পারি, তখন আর গুরুর ...য়োজন কি। পুস্তক দেখিয়া পুস্তকলিখিত আচরণগুলি পালন করিলেই ...ইবে। ইহাতে পৃথক্ গুরুর আবার কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে আমাদের ...ইমাত্র বক্তব্য যে, শাস্ত্র পড়িলে বা তাহার বর্ণবোধ হইলেই যে শাস্ত্রের গভীর ...দেশ্য সাধিত হইল, তাহা কে বলিবে? যিনি পণ্ডিত, পাণ্ডিত্যের অভিমানে ...নি সদাই স্ফীত আছেন, তিনি শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কি বুঝিবেন? তিনি ...চনার কোন্ স্থান ব্যাকরণ-দুষ্ট কোন্ স্থান যুক্তিযুক্ত নহে, তাহার বিচার ...রিতে তিনি সক্ষম; কিন্তু কোথায় ভক্তের প্রাণ ভেদ করিয়া ভক্ত-হৃদয়ের ...ন্তঃস্থল উদ্ভিন্ন করিয়া, কোন্ সুরের কোন্ রাগিণীতে "মা" অথবা "হরি" এই ...ধামাখা নামটী বাহির হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতের সাধ্য কি যে বুঝিতে ...রেন? পণ্ডিত রচনার বহির্ভাগ লইয়া ব্যস্ত, তিনি কি শাস্ত্রের গভীর হইতে ...ভীরতম প্রদেশে যাইতে পারেন? নারিকেলের উপরের নীরস বিশুষ্ক ...াবরণ লইয়াই ব্যস্ত; কিন্তু উহার গর্ভে যে অমৃতোপম সুস্বাদু পানীয় আছে, ...াহা তিনি জানিতে পারেন না। ভক্তপ্রাণের আকুলি বিকলির সময়, 'মা' 'মা' ...লিয়া কাঁদিবার সময় তাহার যতি-ছন্দ ঠিকই বা না রহিল, তাহাতেই বা কি? ...স যখন প্রাণের যাতনা বলিবার ও জুড়াইবার স্থান পাইয়াছে, তখন হইলই বা ...াহার রচনার ভুল, হইলই বা তাহার সন্ধি-সমাসের অশুদ্ধি। যাঁহার জন্য নিখিল ...াস্ত্র রচিত হইয়াছে, যাঁহার শোভা-সৌন্দর্য্যের জন্য সন্ধি-সমাস গ্রন্থিবদ্ধ হই-...াছে, তাঁহাকেই যখন ভক্ত লাভ করিয়াছে, তখন তাহার ত' সমস্তই ঠিক ...ইয়া গেল। এত যে শাস্ত্র পাঠ, এত যে সাধনা, সমস্তই গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে ...ালিত হইলে, তবেই নিজ গন্তব্য পথ ঠিক হইবে। আমরা যতই বুদ্ধিমান্, মেধাবী হই না কেন, সময়ে সময়ে এমন একটী প্রশ্ন বা ধাঁধা আসিতে পারে, ...াহার সমাধান কিছুতেই করিতে পারি না; এমন সময় গুরু বা শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। তখন গুরু বা শিক্ষক মহাশয় এমন একটী কৌশল বা সঙ্কেত বলিয়া দেন, যে তাহাতেই আমাদের ধাঁধা সংশয় কাটিয়া যাইতে পারে। যখন সামান্য বিদ্যালয়ের সামান্য পরীক্ষার জন্য গুরুর সাহায্য প্রয়োজন হয়, তখন এই

নানা বিঘ্ন-সঙ্কুল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিষম পরীক্ষার জন্য যে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন হইবে না, ইহা কিরূপে যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অজ্ঞাত, আমাদের শক্তিসামর্থ্যের বহির্ভূত অন্তর্নিহিত কোন্ শক্তি কোথায় কি প্রকারে কার্য্য করিতেছে, কোথায় কোন্ সুরে কি রাগ-রাগিণী কোন্ হৃদয় তন্ত্রীতে বাজিতেছে, তাহা স্থূলবুদ্ধি আমরা বুঝিতে পারি না। কোন্ বস্তু প্রাপ্ত হইলে, আমাদের মরম-মাঝারের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা, চিরদিনের বাসনা, জনমের মত ধুইয়া যাইবে, তাহা সকল সময়ে আমরা বুঝিতে পারি না। সেই জন্য ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ গুরুদেবের সাহায্য প্রয়োজন। তিনি আমার প্রকৃত অভাব জানিয়া ও বুঝিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাই যথাযথ সাধিত হইলে জীবনের উদ্দেশ্য আপনা আপনি সাধিত হইবে। ভগবৎসখা অর্জ্জুনকেও কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে হইয়াছিল,—"শিষ্যস্তেহহং সাধি মাং ত্বং প্রপন্নং"। আর আমরা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া বলিয়া থাকি, পুস্তক-পাঠে মনোমত ইষ্টদেব নির্ব্বাচন করিয়া সাধনমার্গে উন্নতি করিতে পারিব। ইহা অপেক্ষা ধৃষ্টতার পরিচায়ক আর কি আছে।

গুরুর নিকট শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন ত' আছেই; অধিকন্তু গুরুর নিকট গুরুগৃহে বাস করা শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন। সদা সর্ব্বদা গুরুর নিকট বাস করিলে, তন্মুখনিঃসৃত অমৃতোপম উপদেশ অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাবরাশি একে একে শিষ্যের হৃদয়-ক্ষেত্রে উপ্ত হইতে থাকে এবং শিষ্যও ক্রমশঃ সাধুহৃদয়-সম্পন্ন হইয়া উঠে। সাধু-হৃদয়ের সাধন-সিদ্ধ-সম্পন্ন তেজোরাশি শিষ্যের অন্তর্নিহিত মলিনতা সমস্তই ভস্মীভূত করিয়া দিবার সুবিধা হয়। দীক্ষা-গুরুর তাপসী-শক্তি শিষ্যের তামসী ভাবকে পূত-সলিলা-ভাগীরথী-প্রবাহের ন্যায় সমস্তই ধৌত করিয়া দেয়। গুরুর সাধনপ্রণালী, গুরুর ঈশ্বর-উপাসনায় অনুরাগ, শিষ্যের মনেও সেইভাব জাগরিত করিয়া দেয়। গুরু ও শিষ্য একত্রে বাস করায় স্বভাবসূত্রে পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাহাতে গুরুদেবও শিষ্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বিশেষ করিয়া জানিবার সুবিধা পাইয়া থাকেন; এবং কিসে সেই প্রকৃতি ভগবৎ-প্রেমে অনুরাগী হইয়া সমধিক বিকশিত হয়, তদ্বিষয়ে গুরুদেব আরও যত্ন করেন এবং সাধনার কৌশলাদি শিক্ষা ও দান করিয়া থাকেন। কেবল ইহাই নহে, শিষ্য যাহাতে অপথে কি কুপথে যাইতে না পারে, তদ্বিষয়েও তিনি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। কি মানসিক, কি দৈহিক, কি নৈতিক, কি ঐহিক, কি পারত্রিক সমস্ত বিষয়ের প্রতি গুরু লক্ষ্য রাখিয়া

থাকেন এবং যাহাতে শিষ্যের সৎবৃত্তির স্ফুরণ হয়, যাহাতে ভগবৎ-ভাব ও ভগবৎ-প্রেম সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে থাকেন। শিষ্যও তখন অনন্যগতি হইয়া গুরুদেবের শরণাপন্ন হয় ও তাঁহারই আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া ইহ জীবনে ধন্য ও পরজীবনে মুক্ত হয়েন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে এমন ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ গুরুদেব পাই কোথা? ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি ও বলিতে চাহি, যে যখন মন প্রাণ সংসারের জ্বালামালায় অস্থির হইয়া উঠিবে; দুঃখ-দুর্ব্বিপত্তিতে অধৈর্য্য হইয়া চতুর্দ্দিক্ যখন শূন্যময় দেখিবে, যখন পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগ্নীতে তৃপ্তি না হইবে, পুত্র-কলত্রাদিতে সন্তোষ না পাইবে, সংসারের মনোমোহিনী ছবিতে মন মুগ্ধ না হইবে, সংসারের সুখ-ঐশ্বর্য্য শ্মশানের অঙ্গারস্তূপ বোধ হইতে থাকিবে, যখন মনের কামিনী-কাঞ্চনে অনুরাগ না থাকিবে, প্রাণের ভিতর হইতে অসহ্য অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অনুভূত হইতে থাকিবে, যখন দারুণ উৎকণ্ঠা বা ভয় আসিয়া প্রাণ ব্যাকুলিত করিবে, হৃদয়ে একটা অসম্পূর্ণতা ভাব একটা শূন্যতার বিপুল ছায়া অনুভূত হইবে, যখন "কিছুই হইল না" "আসিয়া করিলাম কি" ইত্যাকার একটা হতাশার বিকট ছায়া হৃদয়কে ঘিরিতে আসিবে, যখন প্রাণের প্রতিগুহ্যতম প্রদেশ হইতে একটী অস্ফুট অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়া মন প্রাণকে উদ্বেলিত করিতে থাকিবে, তখনই জানিবে প্রাণের ভিতর হইতে প্রাণের ইষ্টদেব বাহিরে শ্রীগুরুরূপে প্রকটিত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি, গন্তব্য পথ কি, তাহা বুঝাইয়া দিবেন। সেই গুরুর সেবা করিলে, তাঁহারই কাছে দীক্ষিত হইলে, প্রাণের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা মিটিয়া যাইবে। তখন নিখিল শাস্ত্র পাঠ করিয়া যাহা না হইবে, তাঁহার প্রদত্ত এক বা দ্বি অক্ষর মন্ত্রে জীবনের সকল উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। সমগ্র ভূখণ্ডের সকল সম্প্রদায়ের সাধু সেবা করিয়া যাহা না হইবে, সেই একমাত্র শ্রীগুরুসেবা করিয়া সাধুসঙ্গের সমস্ত ফলই প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত বেদ বেদান্তের ও সমস্ত আগম পুরাণ পাঠে সমস্ত দেবদেবীর, সমস্ত যক্ষ পিশাচাদির মন্ত্র সাধন করিয়া, অথবা আজীবন শত শত কৃচ্ছ্র-সাধনশীল যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদি পালন করিয়া যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইবে, গুরুদেবের নির্দ্দিষ্ট 'প্রণব' মন্ত্র জপ সাধনে তাহার অপেক্ষা অসংখ্য গুণে ফললাভ করিবে। তখন আর নানা শাস্ত্র হইতে বৃথা কূট তর্ক করিয়া আত্ম-বঞ্চনা করিতে অথবা জিগীষা বৃত্তির পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইবে না। তখন মন আর অন্য কোন শ্রুতিসুখকারী বাক্যে প্রধাবিত হইতে চাহিবে না, তখন সেই একভাবে সমস্ত ভাব ডুবিয়া যাইবে, তখন মন কোনও প্রকার দ্বন্দ্বে

না থাকিয়া কেবলমাত্র সেই আনন্দময়ীর চিৎ-আনন্দ-রসের অতল তলে তলাইয়া যাইবে। তখন শিষ্য কখন জ্ঞানীর সৎ-চিৎ-আনন্দ-নিকেতনে কখন বা ভক্তের প্রেম-নিকুঞ্জ-কাননে আবার কখনও বা তিনি ধ্যানস্তিমিত-নেত্র যোগীর সহিত একাসনে, আবার কখনও বা নিত্য-নৈমিত্তিক-ক্রিয়ারত কর্ম্মীর সহিত একত্র বাস করিতে থাকিবেন। কখনও বা তিনি 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ বলিয়া সর্ব্বজীবে দয়ার প্রচার করিতেছেন, আবার হয়ত দেখিবেন পরক্ষণেই নৃমুণ্ডমালিনী মায়ের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মায়ের রাতুল চরণে সরক্ত জবা পুষ্পের অঞ্জলি দিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতেছেন। নিজ ইষ্টদেবকে মুখ্য করিয়া, শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সহায় করিয়া, এইরূপে তিনি যথা তথা নিষ্কাম হইয়া বিচরণ করিতে থাকিবেন।

এতক্ষণে আমরা বুঝিলাম কি ? আমরা বুঝিলাম এই যে, আমরা সমগ্র শাস্ত্র পড়িতে পারিব না, অথবা পারিলেও যথাযথ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। আমরা নিজে অসাধু, কাজেই সাধন-সিদ্ধ-সম্পন্ন সাধু আমরা চিনিতে পারিব না। নির্জ্জনে বসিলেই সংসারের যত কুচিন্তা মনে আসিয়া উদয় হইবে; মলিন অসংস্কৃত বিকৃতবুদ্ধি লইয়া ভগবত্তত্ত্ব-বিচার অথবা গভীর গবেষণাপূর্ণ সাধুচিন্তা হইবে না। কেবল ইহা নহে, সাংসারিক আধি-ব্যাধি-বিজড়িত দুঃখ-দুর্ব্বিপত্তিতে ঘিরিয়া থাকিলেও আমরা মূকের মত চুপ করিয়া থাকি। আমরা দুইটী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আমাদের মরমের অরুন্তুদ যাতনা যে প্রকাশ করিব, সে ক্ষমতাও নাই; তখন আমাদের কাতর ক্রন্দন ব্যতীত আর কি আছে? কলির কলুষিত জীব আমরা, অকর্ম্মঠ ও অনধিকারী জীব আমরা, পাষাণ ও মলিনচিত্ত আমরা, আমাদের পক্ষে জগজ্জননীর কৃপা ভিন্ন উপায় আর কি আছে? আমরা ক্রন্দন করিয়া বলিব, 'মা' আমরা লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই সাধের মানবজন্ম পাইয়াছি বটে, কিন্তু জীবনের প্রকৃত পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। সংসারের খেলা-ধূলা করিতে করিতে নিজ বাড়ী হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কোন্ পথে যাইলে আমি নিজ বাড়ী ফিরিয়া যাইব মা! আমাকে তাহাই বলিয়া দাও। মাগো, আমাকে অসহায় দেখিয়া পথের দুই পার্শ্বের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাদের নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য অবিরত ডাকিতেছে; কিন্তু মা, আমি তাহাদের বাড়ীতে যাইতে চাহি না, তাহাদের মাকে মা বলিতে চাহি না। মাগো! যে বাড়ীতে জ্ঞান-তপোনিষ্ঠ ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী আদি মুনি ঋষিগণ গৃহের পরিচালনার ভার লইয়াছেন, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশরাদি ঋদ্ধি-সিদ্ধিসম্পন্ন মুনিগণ যে বাটীস্থ ব্যক্তিবর্গের উন্নতিকামনায় অহরহঃ নীতি শিক্ষাদান করিতেছেন,

যে বহিঃপ্রাঙ্গণে পিতৃভক্ত অভিমন্যু বৃষকেতু আদি বালকগণ, ধ্রুব প্রহ্লাদ নাচিকেতাদি ভক্ত শিশুগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, যেখানে দেবর্ষি নারদ ও দেবদেব মহাদেব অহোরাত্র বিভুগানে বিভোর হইয়া গৃহস্থালীকে আনন্দ-নিকেতন করিয়া রাখিয়াছেন, যেখানে অনন্তজ্যোতির্ম্ময়ী বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য ভুলিয়া ধনধান্য লইয়া বসিয়া আছেন, যেখানে স্মিত-বদনা কোটী শরদিন্দু-সৌন্দর্য্যচ্ছটা-নিষ্প্রভকারিণী বাগ্বাদিনী বীণাপাণি শিশুদিগের শিক্ষার ভার লইয়া আছেন এবং সপ্তস্বরে অহরহঃ মূর্চ্ছনা ও ঝঙ্কার দিতেছেন; যেখানে সকল-সিদ্ধিদাতা দেবগণপতি সুর-নরবন্দিত বিনায়ক আছেন; যেখানে বিশ্ববিজয়ী বীর-কেশরী অমিততেজা দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় শরাসনে শর সন্ধান করিয়া কামক্রোধাদি প্রবল রিপুবর্গের ভীতি উৎপাদন করিতেছেন, আর যেখানে মা! তুমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী হইয়া অন্নপূর্ণারূপে জীবের জন্য দুগ্ধান্নপূর্ণ কাঞ্চন-দর্ব্বী হস্তে লইয়া বসিয়া আছ, আমাকে সেইখানে লইয়া যাও! মাগো! সংসারমেলাতে দিশাহারা—পথহারা হইয়া আর ঘুরিতে পারি না, বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি; তাই মা, তোর কোলে গিয়া বসিবার জন্য প্রাণ সদাই কাঁদিতেছে। মা, একবার কোলে লইয়া পদ্মহস্ত বুলাইয়া দাও, তাহা হইলেই ত' আমার এই চির-সন্তপ্ত দেহে শীতল বারিধারার সিঞ্চন হইবে। মা, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মাগো, একবার কৃপা-নেত্রে চাহ মা, মা অধম-তারিণ! এ অধমের প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষে চাহ মা! মাগো এ দিকে জীবনের সন্ধ্যাও আগতপ্রায়। অমানিশার ঘোর অন্ধকারের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ নৈরাশ্যের ঘোর বিভীষিকায় ঘিরিয়া আসিতেছে; জানি না কখন কোন্ মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র জীবনতারাটী কালাকাশ পথ হইতে চিরদিনের জন্য খসিয়া পড়িবে! তা'ই মা, সময় থাকিতে তোর কোলে যাইয়া বসিতে চাহি। মাগো, তোমার ঐ চির সমুজ্জ্বল মহামহিমমণ্ডিত ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে, কিংবা বেদ বেদাঙ্গের অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মময়ী নামে আমার প্রয়োজন কি মা। আমি দীনহীন পথের ভিখারী, তুমিও ত' মা ভিখারীর ঘরণী; তা'ই বড় সাধ তোমার ঐ রত্ন-সিংহাসন ত্যাগ করিয়া, ভিখারিণী-বেশে আসিয়া আমার চির-সন্তপ্ত প্রাণে অমৃত ঢালিয়া দাও। মাগো, শ্রীমন্ত প্রাণভয়ে ভীত হইলে, তোমায় ডাকিবামাত্র যে অতি বৃদ্ধবেশে আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া লইয়াছিলে! মাগো, সেই বেশে আসিয়া আমাকে একবার কোলে লও। মা কৃতান্ত-দলনি! কৃতান্ত-কিঙ্করেরা সতত আমাকে ভয় প্রদর্শন করি-

তেছে ; মা তুমি থাকিতে আমার এই দুর্দ্দশা হইতেছে ; এই দুঃখ বড় মরমে লাগিতেছে।

আমার উন্মত্ত মনোমাতঙ্গ পথভ্রষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিতেছে মা, তুমি তোমার ঐ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চরণ-প্রহারে তাহাকে সুশাসিত করিয়া সুপথে চালিত কর! তুমিই শ্রীগুরুদেবরূপে আসিয়া অপথ কুপথ দেখাইয়া দাও। মা, আমি শাস্ত্র কি তাহা বুঝি না, জ্ঞান ভক্তি কি তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, তুমি আমাকে যে পথে চালাইবে, আমি সেই পথেই চলিব। মা, তুমি অন্তরে হৃষীকেশ, বাহিরে গুরুরূপে আবির্ভূতা হইয়া আমার হাত ধরিয়া লইয়া যাও! আমি তোমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তোমারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে থাকি। মা, আমি কুলগুরু চাহি না, কুল-দেবতা চাহি না, তুমি আমার গুরুর গুরু হইয়া, দেবের দেবতা হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও ; আমি তোমার চির প্রেমময়ী, চির স্নেহময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে তোমার ঐ মধুময়ী 'মা' নাম গাহিতে গাহিতে, তোমারই অগাধ স্নেহের কথা স্মরণ করিতে করিতে জন্ম ও জীবন সার্থক করিয়া লই। মা, এ সংসারের আর কিছুই চাহি না। আমার সমস্ত সংশয় সন্দেহ ছিন্ন করিয়া, সমস্ত চেষ্টা যত্ন বিনাশ করিয়া, আমাকে তোমার ঐ পাদপদ্মে স্থান দাও! দেখো মা, যেন অন্তিমে তোমার ঐ 'মা' নাম গাহিতে গাহিতে এ মর-দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারি। মা, এ দীনহীনের কি সে সাধ পূর্ণ হইবে না।

শ্রীনিবারণচন্দ্র নন্দন।

অর্থ]

দুর্গারাণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হিরণ্ময়ী ঊষা যখন পূর্ব্বদিকের আকাশটি তাঁহার দিব্য সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া সশৈল-কাননা শস্য-শামলা ধরার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, যখন গ্রামের উপান্তবর্ত্তী আম্রকাননটি কোকিল-ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং পথপার্শ্ববর্ত্তী পলাশ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া কেবল একটীমাত্র শ্যামা উল্লাসে প্রভাত-গীতি গাহিতেছিল, সেই আলোকান্ধার-বিমিশ্রিত সুমধুর ও সুশীতল শারদ প্রভাতে পলাশডাঙ্গা গ্রামের প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী পথ বাহিয়া চারিটি পথিক চলিতেছিল। অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি পুরুষ ; তাহার মাথায় একটী মোট ও দক্ষিণ হস্তে বাঁশের একটী দীর্ঘ যষ্টি। তাহার পশ্চাতে তিনটি স্ত্রীলোক ;

তন্মধ্যে মধ্যবর্ত্তিনী দুইটী রমণীকে আকার, প্রকার ও পরিচ্ছদে সম্ভ্রান্তবংশীয়া যুবতী বলিয়া মনে হইতেছিল। সর্ব্ব পশ্চাদ্বর্ত্তিনী স্ত্রীলোকটী দাসী ; তাহার বক্ষে একটী নিদ্রিত শিশু ও মস্তকে একটী পুঁটুলী। অন্ধকার ক্রোড়ে ঘুমন্ত বাল-সূর্য্যের ন্যায়, দাসী-ক্রোড়ে এই ঘুমন্ত শিশুটি শোভা পাইতেছিল।

প্রান্তরের মধ্যে কোথাও স্থলপদ্ম-বন, কোথাও শেফালিকা-বন এবং কোথাও বা পলাশবন। এই সমস্ত বনের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া পথিকেরা অগ্রসর হইতে লাগিল। কাহারও মুখে একটী বাক্য নাই ; সহসা একটী যুবতী অপরাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দিদি, শিউলি ফুলের কি চমৎকার গন্ধ দেখ! গাছের তলায় কে যেন ফুলের বিছানা পেতে রেখেছে! আমি চাট্টি ফুল কুড়িয়া নেব?"

অপরা যুবতী হাসিয়া বলিল—"রাণি, এখানে ফুল কুড়িয়ে কি হবে? পিসীমার বাড়ী চল ; সেখানে দেখ্তে পাবে, তাঁদের বাড়ীর পাশেই পাহাড় ; আর পাহাড়ের উপর কেবল শিউলি ফুলেরই বন। সেখানে যত ইচ্ছে ফুল কুড়োবে। এখনও আমাদের অনেকখানি পথ হেঁটে যেতে হ'বে। প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ। এখন পা তুলে না চল্লে, আমরা সেখানে সকাল সকাল পৌঁছুতে পার্ব না। আর একটু পরেই এমন রোদ হ'বে যে আমাদের হাঁট্তে ভারী কষ্ট হ'বে। আজ পঞ্চমী ; কাল ষষ্ঠীতে দেবীর উদ্বোধন। পিসীমা দু'দিন আগেই যাবার জন্যে ব'লেছিলেন। আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে বিমলা আজ চার পাঁচ দিন ব'সেছিল।"

পশ্চাদ্বর্ত্তিনী বিমলা দাসী সেই কথা শুনিয়া বলিল—"হুঁ গো, তুম্রা থর থর চল। দেখবে এখন গিন্নী আমাকে কত কেঁকাব্যেক্। দু'দিন আগে তুমাদের যাত্যে হ'তোক্ ; কিন্তুক্ তুমার বাবা তো নাই যাত্যে দিল্যেক্। এখন কি আমাদের বসে থাকা চলে? এখন ঘরে আমাদের কত কাম। দিন রাত্যের ভিতরে আমাদের টুক্বের নিশ্বাস ফেল্বারও যো নাই আছে।" *

রাণী বলিল—"ঘরে তো তোমার অনেক কাম আছে, তা' জানি। কিন্তু বাবা আমাদের না যেতে দিলে কি কর্ব? তিনি কি আমাকে যেতে দিতে

---

* মানভূম জেলার ইতর শ্রেণীর এইরূপ ভাষা। ইহার অর্থ এইরূপ, "হাঁ গো, তোমরা একটু শীঘ্র চল। দেখিবে এখন গৃহিণী আমাকে কত বকিবেন। তোমাদের দু-দিন আগে যেতে হ'তো ; কিন্তু তোমার বাবা তো যেতে দিলেন না। এখন কি আমার বসিয়া থাকা চলে? এখন বাড়ীতে আমাদের কত কাজ। দিন রাত্রির মধ্যে আমাদের একটুও নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই।" মানভূম এখন বেহারের অন্তর্গত হইলেও, বঙ্গমাতার এই নিরক্ষরা কন্যাটির ভাষা পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গ নাসিকা সঙ্কুচিত করিবেন না, ইহাই অনুরোধ। লে—খক।

চান? পিসীমার বাড়ী আমি কখনও যাইনি। বাবা আমাকে কিছুতেই পাঠাবেন না; আর আমিও না গিয়ে ছাড়্‌ব না। সেই জন্যেই তো দু'দিন দেরী হ'ল।"

বিমলা বলিল—"হুঁ গো, তোমার মাও বল্‌ছিল, এত বড় আইবুড়া বিটিছাটাকে কি ক'রে ভিন্ গাঁয়ে পাঠাব? এখন সব মাঠেই ধান; কুথাও গাড়ীর পথ নাই আছে। গাড়ীর পথ থাক্‌লে, না হয় গাড়ী ক'রে পাঠাতি।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইল। তখন বেশ ফর্শা হইয়া উঠিয়াছিল। সকলে প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ধান্যক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী আলি রাস্তার উপর দিয়া চলিতে লাগিল আলি রাস্তার হরিৎ-তৃণ রাজির উপ রশিশিরবিন্দুনিচয় উষালোকে মুক্তামালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল, এবং যুবতীদ্বয়ের পদতলের প্রগাঢ় অলক্তকরাগ অল্পে অল্পে মুছিয়া ফেলিতেছিল। ধান্যশীর্ষ সমুদায়ও নৈশ-শিশিরপাতে সরস ও সতেজ হইয়া প্রাভাতিক মারুত-হিল্লোলে মৃদুমন্দ আন্দোলিত হইতেছিল এবং যেন ক্রীড়াচ্ছলেই শিশির বর্ষণ করিয়া যুবতীদ্বয়ের পরিধেয় বসনের অঞ্চলপ্রান্ত সিক্ত করিতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুর্গারাণী অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব এরূপ নির্দ্দোষ যে, মনে হয় বিধাতা তাহাকে নির্জ্জনে বসিয়া গড়িয়াছিলেন। বর্ণ তপ্ত-কাঞ্চনবৎ; কেশপাশ কুঞ্চিত ও ভ্রমরকৃষ্ণ। কপাল, ভ্রূ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, অধরোষ্ঠ, চিবুক—সমস্তই মনোহর ও পরম রমণীয়। দন্তপংক্তি মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় সুবিন্যস্ত। তাহার সুমধুর হাস্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল দেখিলে তাহাকে কোনও দেবকন্যা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। আজ এই মনোহর শারদ-প্রভাতে প্রান্তরমধ্যে সহসা তাহাকে একাকিনী দেখিলে মনে হইত, বুঝি আকাশ হইতে স্বয়ং উষাদেবী ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন; অথবা এই ধান্যক্ষেত্রমধ্যে তাহাকে একাকিনী বিচরণ করিতে দেখিলে মনে হইত, বুঝি স্বয়ং কমলাদেবী শস্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছেন। এরূপ সুন্দরী এবং সপ্তদশবর্ষীয়া অনূঢ়া যুবতী কন্যাকে পদব্রজে ভিন্ন গ্রামে পাঠাইতে তাহার পিতামাতা যে ইতস্ততঃ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

রাণীর দিদি ভবানীও সুন্দরী। কিন্তু রাণীকে যদি সৌন্দর্য্যের 'কায়া' বলা হয়, তাহা হইলে ভবানী তাহার 'ছায়া' মাত্র। ভবানী রাণীর অপেক্ষা তিন চারি

বৎসরের বড়; তাহার মুখমণ্ডলে সৌন্দর্য্য ঢল ঢল করিতেছে; কিন্তু চিন্তা-কালিমা সেই সৌন্দর্য্যকে যেন কিছু ম্লান করিয়াছে।

অগ্রবর্ত্তী মোটবাহক পুরুষটি এতক্ষণ একটীও কথা বলে নাই। শস্যক্ষেত্র-সমূহের কিয়দংশ উত্তীর্ণ হইলে, সে ভবানীর দিকে ফিরিয়া বলিল—"বহিন্, ঐ ভাগে, পরেশ মুখুয্যার জমী। এমন জমী ই তল্লাটে নাই আছে। ধান কেমন তেজ বাঁধ্যেছে, দ্যাখ্! আহা, মুখুয্যাকে কি এমন জমীও ঘুচাত্যে হয়? আর না ঘুচায়েই বা কি করছে বল্? তোকে বিহা করতে মুখুয্যা দেড় হাজার টাকায় এই জমীটো হলা পোদ্দারকে বন্ধক দিঁয়েছিল। পোদ্দার বেটা ডাকাত বটে। সে শ টাকায় মাসে মাসে তিন টাকা ক'রে সুদ খাঁয়েছে। মুখুয্যা দু' তিন বছর সুদ ঠেল্ল্যেক; তারপর আর লারল্যেক্। এখন হলা এই জমীটো বিকে লিঁয়েছে। মুখুয্যার ই জমীটোতে যে ধান হ'তোক্, তাথে সে সম্বছর খাঁয়ে প'রে এক মরাই ধান বাঁধতোক্।"

ভবানী তাহার পিতার বৃদ্ধ মুনীষ ক্ষেতু মাহাতোর এই কথাগুলি নীরবে শুনিল। শুনিয়া একবার ধান্যক্ষেত্রসমূহের দিকে চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল পর মুহূর্ত্তেই তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং তাহা হইতে টস্ টস্ করিয়া দুই চারি ফোঁটা জল পড়িল।

ভবানীর চক্ষে জল দেখিয়া দুর্গারাণীর হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইল। সহসা তাহার মুখমণ্ডলে ভাবান্তর লক্ষিত হইল। তাহার সুন্দর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; ক্ষুদ্র বিম্বাধরটি ক্রোধে ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না।

বিমলা কিয়ৎক্ষণ নীরবে চলিতে লাগিল। পরে বলিল "বামুনগুলানের ই রীত নাই ভাল বটে। বামুনগুলান্ বিটির বিহাতে ঢের টাকা ল্যেয়। গরীব বামুনগুলানের তো বিহা নাই হয়। বাঁড়ুয্যা দুটো বিটির বিহাতে ঢের টাকা লিয়েছে; আবার রাণীর বিহাতেও ঢের টাকা লিব্যেক্। এত বড় জুয়ান বিটিছা বটে; টাকার লালচে এখনও বিহা নাই দিঁয়েছে।"

বিমলার কথা শুনিয়া রাণীর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সে বিমলার দিকে চাহিয়া বলিল, "বিম্‌লি, চুপ্ ক'রে থাক্, বল্‌ছি।"

বিমলা যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "বহিন্, তুমি রুষ্‌ছো কেনে? রাগ রোষের কথা আমি নাই বল্‌ছি।

আমি মিছা নাই বল্‌ছি, সবাই কহে, তুমাদের বামুনদের ই রীতটো নাই ভাল বটে।”

রাণী ও বিমলার বিতণ্ডা মিটাইবার জন্য ভবানী বলিল “রাণি, বিমলা তো কিছু মন্দ কথা বল্‌ছে না। মেয়ে বিক্রী করা এদেশের বামুনদের মধ্যে একটা কুরীতি হ’য়েছে। শুনেছি, পূর্ব্বদেশে মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বাপ ছেলের বাপকে অনেক টাকা দেয়। আর আমাদের দেশে ঠিক তা’র উল্টো।”

রাণী তখনও প্রকৃতিস্থা হয় নাই। সে ভবানীর কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই বলিল, “দেখ এই দুইটী রীতির মধ্যে কোনটীই ভাল নয়। আমাদের দেশে বৌ কিন্‌তে হয়; আর পূর্ব্বদেশে জামাই কিন্‌তে হয়। এই জন্যেই তো এদেশের ছেলের বাপ আর পূর্ব্বদেশের মেয়ের বাপ গরীব হ’য়ে পড়ে। দেশের এ কি রকম ধারা, আর দেশের লোকেরই বা কি রকম মতিগতি, তা জানি না।” এই বলিয়া রাণী সহসা নিস্তব্ধ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিল “বাবার কেমন বিবেচনা দেখ না! মুখুয্যে মশায় তাঁ’র জমীজমা বন্ধক দিয়ে তোমাকে বিয়ে কর্‌লেন; এখন তাঁ’র সব গেছে। এখন তিনি দেশত্যাগী হ’য়ে কোথায় দশটি টাকা বেতনে চাকরী কর্‌ছেন। বড়দিদিরও কপাল পুড়ে গেছে। গাঙ্গুলী মশায় সর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়ে তাঁকে বিয়ে কর্‌লেন; তারপর মহাজন সব বেচে কিনে নিলে। তিনি পেটের দায়ে কোথায় দিনাজপুরে চাকরী কর্‌তে গেলেন, আর সেইখানে জ্বরে মারা পড়্‌লেন।” বলিতে বলিতে রাণীর চক্ষে জল আসিল ও সে অঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈষৎ সংযত হইয়া বলিল, “মেয়েদের কষ্ট হ’লে কি বাপ-মায়ের মনে কষ্ট হয় না? আমি এক একবার ভাবি, যাদের টাকা নাই, তারা বিয়ে ক’র্‌তে যায় কেন? আর বাপ-মাকেও বলি, তাঁরা যে মেয়ে বেচেন, মেয়ে যদি বলে আমি বিয়ে ক’র্‌ব না, তো কি হয়?”

রাণীর এই কথা শুনিয়া ভবানীর ম্লানমুখে একটু হাসির রেখা ফুটিল। সে বলিল “তাও কি কখন হয়, রাণী! মেয়েরা কি মুখ ফুটে বাপ-মাকে কোনও কথা ব’ল্‌তে পারে? না আইবুড়ো থাক্‌ব বল্‌লেই আইবুড়ো থাকে?”

রাণী বলিল “কেন থাক্‌বে না? কুলীনদের কত মেয়ে যে আইবুড়ো থেকেই মরে যায়! মেয়েরা কি ছাগল-গরু যে বাপ-মা তাদের বেচে টাকা

...বে?” তারপর ঈষৎ অনুচ্চ কণ্ঠে ভবানীর কাণের কাছে বলিল “কই, ...মার বিয়েতে বাবা টাকা নিন্ দেখি, আর জোর ক’রে আমার বিয়ে দিন্ ...খি?”

রাণীর কথা শুনিয়া ভবানী একটু হাসিল? কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ-...ণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। রাণী বাল্যকাল হইতেই ভয়ানক এক্‌রোখা, ...াহা ভবানী জানিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধান্যক্ষেত্র সমূহ অতিক্রম করিয়া সকলে:একটী বিস্তৃত ও উচ্চ টাঁড় জমীতে (...প্রান্তরে) উপনীত হইল। এই বিস্তৃত প্রান্তরটি একটী পর্ব্বতের সানুদেশ ...ইতে ক্রমশঃ আনত হইয়া ধান্যক্ষেত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। পর্ব্বতের ...ানুদেশে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের চারিদিকেই ভুট্টার ক্ষেত্র, অড়হর ক্ষেত্র ... অতসী-ক্ষেত্র। অতসী বৃক্ষসমূহ পুষ্পিত হইয়া ভূমির উপর স্বর্ণের শোভা ...বস্তার করিয়াছে। প্রভাত-অরুণের কণকময়ী কিরণমালা সেই স্বর্ণ-ক্ষেত্র-...মূহের উপর নিপতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। রাণী এই ...নোরম শোভা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বাড়ী হইতে কখনও ...াহির হয় নাই বা হইতে পায় নাই; এই কারণে এই শোভা তাহার নিকট ...অদৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে বালিকার মত উল্লসিত হইয়া বলিল “দিদি. ঐ দিকে চেয়ে দেখ, কি চমৎকার শোভা! আহা, ঐ গ্রামটি কি ...সুন্দর! আমাদের পলাশ-ডাঙ্গায় তো এমন শোভা কখনও দেখতে পাই না। ...আহা, এমনি একটী জায়গাতে ঘর বেঁধে বাস ক’র্‌তে হয়!”

খোকা এতক্ষণ দাসীর ক্রোড়ে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আসিতেছিল। সহসা ...মাসীমাতার উল্লাসময় কণ্ঠস্বর শ্রবণে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং চারিদিকে ...একবার চাহিয়া যেন কিছু চকিত ও ভীত হইয়া জননীর ক্রোড়ে যাইবার জন্য ...ব্যগ্র হইল। রাণী তাহাকে ভবানীর ক্রোড়ে যাইতে না দিয়া আপনার ক্রোড়ে ...লইল এবং সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, “খোকন, বল দেখি আমারা ...কোথায় যাচ্ছি, আর কোথায় এসেছি? ঐ দেখ, কেমন রাঙ্গা সূর্য্যি উঠেছে; ...ঐ দেখ, কেমন হল্‌দে ফুল ফুটেছে; ঐ দেখ, ঐ পাহাড়ের উপর কেমন মন্দির ...দেখা যাচ্ছে!” খোকন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। সে ...জাগিয়া আছে, না ঘুমাইতে ঘুমাইতে সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহা যেন বুঝিতে ...পারিল না।

রাণী আবার তাহাকে আদর করিয়া বলিতে লাগিল, "খোকন, আমি ঐ পাহাড়ের উপর একটী ঘর বেঁধে তোমাকে নিয়ে থাক্‌ব। তোমার হাত ধরে আমি মাঠে মাঠে বেড়াব, আর তোমায় কত ফুল তুলে দেব।—কেমন?"

খোকন হাসিয়া বলিল, "হাঁ, আর মাও থাক্‌বে।"

রাণী হাসিয়া বলিল, "কেন, তুমি তোমার মাসীর কাছে থাক্‌তে পার্‌বে না? মা নাই বা থাক্‌লো?

খোকন গম্ভীর স্বরে বলিল "না, মাও থাক্‌বে।"

রাণী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা—বেশ বেশ মাও থাক্‌বে।" এই বলিয়া সে খোকাকে দুই বাহু দ্বারা বক্ষের উপর তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে বলিল:—

"কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন?
সংসারে কি কোথাও আছে মার মত ধন?"

কিয়ৎক্ষণ পরে সকলেই গ্রামের সন্নিহিত হইল। অতসী-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে রাণী খোকাকে কতকগুলি ফুল তুলিয়া দিল। গ্রামে সাঁওতাল প্রভৃতি ইতর জাতীয় ব্যক্তিগণ বাস করে; সেই কারণে গ্রামের ভিতর দিয়া যে পথ গিয়াছে, সেই পথে না গিয়া সকলে গ্রামের বাহিরের পথ ধরিয়া চলিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে পর্ব্বতের পাদমূলে উপনীত হইল।

পর্ব্বতটি দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি ক্রোশ হইবে। পর্ব্বতশ্রেণী বেষ্টন করিয়া গেলে, তাহাদের গন্তব্য স্থান কৈলাসপুরে উপনীত হইতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। কিন্তু পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া গেলে মধ্যাহ্নে সেখানে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এই কারণে, ক্ষেতু মাহাতো পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া যাওয়াই স্থির করিল। পর্ব্বতপৃষ্ঠটি একস্থানে আনত হওয়ায়, তাহার উপর দিয়া যে পথ গিয়াছে, তদ্দ্বারা অল্প আয়াসে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারা যায়। যাহারা পদব্রজে যায়, তাহারা এই পথই অবলম্বন করে; কিন্তু গো-যানে যাইতে হইলে, পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া যাইতে হয়।

রাণী ইতিপূর্ব্বে আর কখনও পর্ব্বতে আরোহণ করে নাই। সুতরাং সে পর্ব্বতে উঠিতে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল এবং ক্ষেতু ও বিমলার নিবারণ সত্ত্বেও সে সকলের আগে আগে যাইতে লাগিল। খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করা আয়াস-সাধ্য বুঝিতে পারিয়া সে তাহাকে বিমলার ক্রোড়ে দিয়াছিল।

পর্ব্বতে আরোহণ করিতে করিতে তাহার পবিত্র নির্জ্জনতা এবং নূতন নূতন শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাণীর মন উল্লসিত ও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে একটী অল্পবয়স্কা বালিকার মত আনন্দে চীৎকার করিয়া করতালি দিতে লাগিল, এবং এইরূপ মনোরম স্থানই দেবতাগণের বিহার-ভূমি, ইহা মনে করিয়া একবার উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ওগো ঠাকুর! ওগো দেবতা! তোমরা কোথায়? দয়া করে তোমরা একবার আমাকে দর্শন দাও না!"

আল ও পর্ব্বতস্কন্ধের চূড়ায় উপনীত হইয়া রাণী ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত বৃক্ষ-চ্ছায়াসমন্বিত একটী শিলাতলে বসিয়া পর্ব্বতের উভয়পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তৃত ভূ-ভাগের বিচিত্র শোভা দর্শনে চমৎকৃত হইতে লাগিল। তাহার দৃষ্টির সীমা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোরাজ্যেরও সীমা যেন প্রসারিত হইতে লাগিল। পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সুন্দর চিত্রপটের ন্যায় তাহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল। সে প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যেন আত্মহারা হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ভবানী, বিমলা ও ক্ষেতু সেই স্থলে দ্রুতপদে উপনীত হইল। ভবানী রাণীকে দেখিয়াই তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল "রাণি! তুই এখনও ছেলে-বেলাকার মত দুরন্ত রইলি? এত বড় আইবুড়ো মেয়ে, তুই একলা ছুটে ছুটে পাহাড়ে উঠ্‌ছিলি কেন? তোর একটু ভয় হচ্ছিল না? পাহাড়ে কত ঠাকুর দেবতা আছে, তা জানিস্‌?"

ভবানীর কথা শুনিয়া রাণী খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল "দিদি, ঠাকুর-দেবতাকে কি কখনও ভয় হয়? তাঁরা যে দেবতা; তাঁরা যে সকলের মঙ্গল করেন। তাঁদি'কে ভয় কিসের? আমি যে তাঁদেরই দেখা পাবার জন্যে চেঁচিয়ে ডাক্‌ছিলাম।"

ভবানী সত্যসত্যই রাণীর চীৎকার শুনিয়াছিল এবং শুনিয়া মনে করিয়াছিল হয়ত' রাণী কিছু দেখিয়া ভয় পাইয়াছে; সেই কারণে তাহারা দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। এক্ষণে রাণীর কথা শুনিয়া ও তাহাকে হাসিতে দেখিয়া ভবানী যেন কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল "তুই এক সৃষ্টিছাড়া মেয়ে, রাণি! তোকে আমি এঁটে উঠ্‌তে পারব না। পিসীমার বাড়ী যাচ্ছ, সেখানে পাহাড়ে কত ঠাকুর দেবতার মন্দির আছে; সেখানে তুমি যদি পাহাড়ের উপর এই রকম করে ছুটে ছুটে বেড়াও, তা হলে ভাল হ'বে না বলে

রাখ্‌ছি। তুমি যদি আমার কথার অবাধ্য হও, তা' হ'লে, আমি তোমাকে তখনই বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

রাণী হাসিয়া বলিল "আচ্ছা।"

দূরে পর্ব্বতশৃঙ্গে যে একটী মন্দির দেখা যাইতেছিল, তাহা দেখাইয়া ক্ষেতু বলিল যে, ইহাই কৈলাসপুরের পাহাড় ও মন্দির, এবং ঐ পাহাড়ই তাহাদের গন্তব্য স্থান। ঐ স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য এখনও প্রায় তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। মধ্যে কৃষ্ণপুর গ্রাম দেখা যাইতেছে; ঐ গ্রামের পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে তাহারা জল খাবার খাইয়া কৈলাসপুর যাইবে।

বেলা প্রায় আটটা বাজিয়াছিল সূর্য্যের তেজও ক্রমশঃ প্রখর হইয়া উঠিতেছিল। পর্ব্বতশৃঙ্গের সেই শিলাতলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সকলে আবার পর্ব্বতের অপর দিকে অবতরণ করিতে লাগিল।

পর্ব্বতের পাদমূলে উপনীত হইতে না হইতে তাহারা দেখিল, একটী অশ্বারোহী ভদ্রলোক তাহাদের অভিমুখে আসিতেছেন এবং তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে একটী সুন্দর যুবাপুরুষও আসিতেছেন। আতপ-তাপ নিবারণের জন্য অশ্বারোহীর মস্তকে একটী উষ্ণীশ বাঁধা রহিয়াছে এবং পদব্রজে যে যুবকটি আসিতেছিলেন, তাঁহার গায়ে একটী শুভ্র উত্তরীয়, পায়ে জুতা এবং মস্তকে একটী শুভ্র ছত্র রহিয়াছে। ভবানী ও দুর্গারাণী এই আগন্তুক ভদ্রলোকদ্বয়কে দেখিয়া লজ্জায় যেন একটু সঙ্কুচিত হইল। রাণী যুবকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্বারোহীর দিকে অনিমিষ লোচনে চাহিতে লাগিল এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ঈষৎ হাসিয়া ভূতলে দৃষ্টি অবনত করিল। আগন্তুক ভদ্রলোকদ্বয়ও বিস্ময়ের সহিত এ যুবতীদ্বয়কে দেখিতেছিলেন, কিন্তু অশ্বারোহী ব্যক্তি রাণীকে ঈষৎ হাসিতে দেখিয়া সহসা অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন, এবং বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন "কে, দুর্গারাণী না কি? তুমি এত বড় হ'য়েছ? তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

রাণী সলজ্জ বদনে বলিল—"কৈলাসপুরে।—পিসীমার বাড়ী।"

অশ্বারোহী বলিলেন—"ঘোষালদের বাড়ী? ওঃ, কাল যে আমি সেখানে ছিলাম। দুদিন আগে তোমাদের সেখানে যাবার কথা ছিল না? তোমরা না যাওয়াতে তোমার পিসেমশাই তোমাদের জন্য ভাব্‌ছিলেন। আজ আমি তোমাদের গ্রামে যাচ্ছি। তোমার বাবা বেশ ভাল আছেন তো? তোমাদের গ্রামের বালিকা-স্কুল তো এখনও বন্ধ হয় নাই?"

রাণী তেমনই সলজ্জভাবে বলিল—"আমি তো আর স্কুলে যাই না। কিন্তু শুনেছি, কালও স্কুল খোলা ছিল।"

অশ্বারোহী ব্যক্তি পার্শ্ববর্ত্তী যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হরনাথ, ইনি পলাশডাঙ্গার যাদব বাঁড়ুয্যের কন্যা। এরই কথা তোমাকে বলেছিলাম। এই মেয়েটি সে বৎসর ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষায়, আমাদের এই পুরুলিয়া জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। দুর্গারাণী! ইনি তোমার সঙ্গে কে? তোমার দিদি বুঝি? আহা, তোমাদের, বিশেষতঃ ঐ ছেলেটির মুখ শুকিয়ে গেছে। রৌদ্রও প্রখর হ'য়েছে। যেতে তোমাদের ভারী কষ্ট হবে দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

হরনাথ, ক্ষেতু ও বিমলার দিকে চাহিয়া হঠাৎ বিমলাকে চিনিতে পারিলেন, এবং বলিলেন—"এই যে বিমলা র'য়েছ! বিমলা, তুমি এদের নিয়ে কৃষ্ণপুরে আমাদের বাড়ী যাও। বাড়ীতে মা আছেন। এরা খেয়েদেয়ে ও বিশ্রাম ক'রে বিকেল বেলায় কৈলাসপুরে যাবেন। কাল সকালে আমি সেখানে যাব।"

অশ্বারোহী ব্যক্তি পুরুলিয়া জেলার স্কুলসমূহের ডিপুটী ইন্সপেক্টার শ্রীনাথ বাবু। তিনি হরনাথকে বলিলেন,—"হরনাথ, তবে তুমি আর আমার সঙ্গে কেন আস্‌ছ? তুমি নিজে এদের সকলকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যাও।"

হরনাথ তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন এবং সকলকে আসিয়া বলিতে অগ্রগামী হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ তর্কবাচস্পতি নবদ্বীপ ও ৺কাশীধামে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অল্প বয়সেই এই জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় সাতাইশ বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ও গৌরাঙ্গ। তাঁহার প্রশস্ত ললাট ও বিশাল চক্ষুই তাঁহার অসাধারণ ধী-শক্তির পরিচায়ক। তিনি এখনও অকৃতদার আছেন; তাঁহার প্রধান কারণ এই যে, এই প্রদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কন্যাপণ না লইয়া কেহই তাঁহাকে কন্যাদান করিতে সম্মত হ'ন নাই।

পলাশ ডাঙ্গার যাদব বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই প্রদেশের জঘন্য প্রথানুসারে শুক্র-বিক্রয়ী হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে ইঁহাদের বংশে শুক্রবিক্রয়-দোষ ছিল না। ইনি ইঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় কন্যার বিবাহে প্রায় তিন হাজার টাকা পণ গ্রহণ করিয়া, সেই টাকা সুদে খাটাইতেছেন। সুন্দরী দুর্গারাণীর বিবাহেও ইনি অনেক টাকা পণ গ্রহণ করিবেন, ইহা স্থির সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া আছেন।

হরনাথ বাচস্পতির সহিত দুর্গারাণীর বিবাহের প্রস্তাব লইয়া একবার উভয় পক্ষে কথাবার্ত্তাও চলিয়াছিল ; কিন্তু হরনাথ অবস্থাপন্ন লোক বলিয়া যাদব তাঁহার নিকট তিন সহস্র মুদ্রা কন্যাপণ চাহিয়াছিলেন। তিন হাজার টাকা পণ দিবার সামর্থ্য থাকিলেও, হরনাথ কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, বরং তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিবেন, তথাপি কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিবেন না।

স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রদেশের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সমাজের এই দুরবস্থা দেখিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। যাহাতে এই কুপ্রথা দূরীভূত হয়, তজ্জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হ'ন নাই। হরনাথকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। দুর্গারাণীর সহিত যাহাতে তাঁহার বিবাহ হয়, তজ্জন্য তিনি ইতিপূর্ব্বে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাদব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। আজও হরনাথের টোল পরিদর্শন করিতে আসিয়া, তিনি হরনাথের সহিত এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন এবং পলাশডাঙ্গায় গিয়া যাদবের নিকট আবার কথা পাড়িবেন, তাহার সঙ্কল্প করিতেছিলেন ; এমন সময়ে দৈবক্রমে পর্ব্বতের পাদমূলে যাদবের কন্যাদের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীনাথবাবু দুর্গারাণীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। অধীত বেদান্ত-শাস্ত্র, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচারী হরনাথেরও মন যে কিছু বিচলিত হইল না, তাহা নহে।

দুর্গারাণীও ইতিপূর্ব্বে লোকমুখে হরনাথের রূপ গুণের কথা শুনিয়াছিল। শুনিয়া তাঁহার প্রতি তাহারও মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। স্বাধীনা হইলে সে হরনাথকেই পতিরূপে বরণ করিত ; কিন্তু সে মাতাপিতার অধীন, তাঁহারা যাঁহার সহিত বিবাহ দিবেন, তিনিই তাহার স্বামী হইবেন। কিন্তু ভগিনীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া, বিবাহের প্রতি তাহার কতকটা বিতৃষ্ণাও জন্মিয়াছিল। সে এক একবার মনে করিত, বিবাহ না করিয়া সে বরং চিরকাল অনূঢ়াই থাকিবে। কিন্তু আজ হরনাথকে স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার মন কেমন এক রকম হইয়া গেল। সে শ্রীনাথবাবুর প্রশ্নের দুই একটা উত্তর দিতে দিতেই অন্যমনস্কা হইয়া পড়িল।

হরনাথ সকলকে আসিতে বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলে, রাণী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া পথপার্শ্বে বসিয়া পড়িল। ভবানী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া একবার রাণীর দিকে চাহিল এবং চিন্তাকুল মনে ভাবিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ক্ষেতুকে বলিল,—"ক্ষেতু, পরের বাড়ী গিয়ে কাজ নাই ; অন্য কোনও পথ দিয়ে তুমি আমাদের নিয়ে চল।"

বিমলা ছেলে কোলে করিয়া পাহাড়ে উঠিতে ও নামিতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; এবং বিশ্রামের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিল। সে ভবানীর কথা শুনিয়া বলিল, "ও মা! তুম্‌রা হরঠাকুরের ঘরকে নাই যাবে, কি বল্‌ছো গো ? হরঠাকুর ঘোষালের ভাগ্না বটে ; না গেলে তোমার পিসে ও পিসী রাগ কর্‌বে যে!" ক্ষেতুও বলিল, কৈলাসপুরে যাইবার আর অন্য কোনও পথ নাই ; তাহাদিগকে কৃষ্ণপুর হইয়া যাইতেই হইবে। অগত্যা সকলে কৃষ্ণপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাণী একেবারে নীরব ও গম্ভীর হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাহার যে স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, তাহা যেন সহসা অন্তর্হিত হইল। ভবানী রাণীর এই পরিবর্ত্তন বিশেষরূপে লক্ষ্য করিল, এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিল, তাহারা কৃষ্ণপুর গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া বাহিরের পথ দিয়াই চলিয়া যাইবে ; কিন্তু তাহারা গ্রামের সন্নিহিত হইবামাত্র দেখিল যে, একটী বর্ষীয়সী মহিলা ও কতিপয় যুবতী তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সকলেই রাণী ও ভবানীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু ভবানী বলিল, "আমরা এখন আপনাদের বাড়ী যেতে পার্‌ব না। কৈলাসপুর যেতে আর দেড়ক্রোশ মাত্র পথ বাকী আছে ; এখনই আমরা সেখানে চলে যাব।" হরনাথের মাতা ভবানীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "ও মা, সে কি কথা গো! এতখানি বেলা হ'য়ে গেছে ; আহা, রোদে বাছাদের মুখ শুকিয়ে গেছে! তোমরা এ বেলা না খেয়ে যেতে পাবে না। রোদ পড়্‌লে তখন বিকেল বেলায় যাবে। তোমরা না খেয়ে গেলে, দাদা কি বল্‌বেন বল দেখি ? আর তোমার পিসীমাই বা কি বল্‌বেন ? চল, চল, আমাদের বাড়ী চল।"

ভবানীর আর ওজর আপত্তি চলিল না। গ্রামের যুবতীরা রাণীর রূপ দেখিয়া এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল এবং পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল, "আহা, মেয়ে তো নয় ; যেন সাক্ষাৎ ভগবতী! দুর্গারাণী তো দুর্গারাণীই বটে! যেমন মেয়ে, তেমনই বর! এমন বরে বাপ মেয়ে দিতে চায় না গা ?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাণী ও ভবানী যে তিন চারি ঘণ্টা কৃষ্ণপুরে কাটাইল, সেই সময়ের মধ্যে গ্রামের অনেক যুবতী ও মহিলার সহিত তাহাদের আলাপ হইল। হরনাথের জননীর আদর, যত্নে ও স্নেহে তাহারা মুগ্ধ হইল। কিন্তু রাণীর মনে একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল; তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, হরনাথ এবং তাঁহার এই ঘরবাড়ী যেন তাহার কতকালের পরিচিত! এই ঘর, এই উঠান, ঐ পক্ষীর কলরবে মুখরিত বৃহৎ বকুল গাছটি এবং তাহার অন্তরালে ঐ বিষ্ণু মন্দিরটি সে যেন কখন্ কোথায় দেখিয়াছে! তাল পুকুরের বাঁধাঘাটে স্নান করিতে গিয়া তাহার মনের গোলযোগ আরও বাড়িয়া উঠিল। এই পুকুর, ঐ শালের বন, ঐ মাঠ, ঐ পাহাড়, সে যেন ইহার পূর্ব্বে কোথা দেখিয়াছে! তাহার মনে এ কি রকম গোলযোগ উপস্থিত হইল! সে তো জন্মাবধি বাড়ীর বাহিরে কখনও একটী পাও বাড়ায় নাই! স্নানান্তে বাঁধা ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া রাণী অনন্যমনে এই সমস্ত কথা ভাবিতেছিল, এমন সময়ে ভবানীর আহ্বানে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় ভবানীর অনুসরণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। গৃহে উপনীত হইয়া বিষ্ণু মন্দিরে প্রণাম করিতে গিয়া তাহারা হরনাথের সম্মুখে পড়িল। হরনাথ পূজা করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইতেছিলেন; এমন সময়ে সহসা ভবানী ও রাণীকে আসিতে দেখিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলেন। রাণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল এবং তাহার দেহের শিরায় শিরায় ও ধমনীতে ধমনীতে বেগে উষ্ণ রক্ত-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। রাণী ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গিয়া প্রণামের মন্ত্র ভুলিয়া গেল, এবং মনের মধ্যে ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া কেবল হরনাথের মূর্ত্তিই দেখিতে পাইল! বৈকালে তাহারা যখন কৃষ্ণপুর ত্যাগ করিল, তখন রাণী যেন কিছু প্রকৃতিস্থা হইল। সান্ধ্য শীতল সমীরণ সংস্পর্শে তাহার মস্তিষ্ক যেন অনেকটা সুশীতল হইল।

কৈলাসপুরে উপনীত হইলে, রাণীর মন বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দে উৎফুল্ল হইল। বাড়ীর পার্শ্বেই প্রকাণ্ড পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর কৈলাসনাথের মন্দির। পাহাড়ের প্রস্তরময় সোপানসমূহ অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উপনীত হইতে হয়। পথের উভয় পার্শ্বেই শেফালিকা বন ও কুটজ বন। বন-মল্লিকার লতাবলী স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব বিভাগ সমূহের সৃষ্টি করিয়াছে। পর্ব্বতের উপর বহু বৃক্ষলতা এবং স্থানে স্থানে নিবিড় বনও আছে; কিন্তু মন্দিরে সর্ব্বদা লোক

সমাগম হয় বলিয়াই হউক, কিম্বা স্থান-মাহাত্ম্য বশতঃই হউক, পাহাড়ের উপর কোথাও হিংস্র জন্তুর উপদ্রব নাই। কৈলাসনাথের সান্ধ্য আরতি দেখিবার জন্য দলে দলে নরনারী পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছিল। রাণী এবং ভবানীও পিসীমাতার সহিত ভগবানের সান্ধ্য আরতি দেখিবার জন্য মন্দিরে আরোহণ করিল।

কৈলাসনাথের মন্দিরের পার্শ্বেই ভৈরবের মন্দির; এবং অদূরে পর্ব্বত গাত্র কাটিয়া একটী প্রকাণ্ড গুহার মধ্যে কাত্যায়নীর মন্দির আছে। কাত্যায়নী দশভুজার মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি একটী বৃহৎ অখণ্ড প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছে। একটী গুহার মধ্যে গণেশের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও আছে। তাহাকে লোকে গণেশ-গুহা বলে। এই মন্দির সমূহ ব্যতীত পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কালীর মন্দির, লক্ষ্মীর মন্দির এবং জগদ্ধাত্রীর মন্দির আছে। এই শেষোক্ত মন্দিরটি যেন অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বিষ্ণুমন্দিরও আছে; কিন্তু তাহা অতীব দুরারোহ। কোন্ প্রাচীনকালে কে এই মন্দির-নিচয় ও গুহা সমূহ প্রস্তুত করাইয়া, তন্মধ্যে এই বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তৎসম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আছে, তন্মধ্যে একটী এই যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য বঙ্গদেশ বিজয় করিতে আসিয়া এই পর্ব্বতের সৌন্দর্য্যে অতিশয় মুগ্ধ হয়েন, এবং এই প্রদেশে কিয়দ্দিন বাস করিয়া এই মন্দির সমূহ নির্ম্মাণ করান! এই প্রদেশের ক্ষত্রিয় ভূম্যাধিকারিগণ আপনাদিগকে বিক্রমাদিত্যের বংশধর বলিয়া পরিচিত করেন। বহু প্রাচীনকাল হইতে ভগবান্ কৈলাসনাথ ও ভগবতী কাত্যয়নীর পূজা হইয়া আসিতেছে। ইঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক পূজার জন্য মূল্যবান্ দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তি নিরূপিত আছে, তাহারই আয়ে পূজাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কৈলাসপুরের ঘোষাল মহাশয়েরা বহুকাল হইতে এই পূজা কার্য্য সম্পাদন ও দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কাত্যায়নীর মন্দিরে শারদীয়া পূজার সময়ে ভগবতীর বিশিষ্ট ভাবে পূজা হয়; তৎপরে লক্ষ্মীর মন্দিরে লক্ষ্মীপূজা ও কালীমন্দিরে কালীপূজা এবং অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীর মন্দিরে জগদ্ধাত্রী দেবীরও পূজা বিশিষ্ট ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভবানী তাহার জনক জননীর সহিত বহুবার কৈলাসপুরে পিসীমার বাটীতে আসিয়াছিল; কিন্তু রাণী কখনও এখানে আসে নাই। এই কারণে সে কৈলাসপুরের পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর মন্দির নিচয় ও দেব-দেবীগণের মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইল। কৈলাসপুর তাহার নিকট সাক্ষাৎ

কৈলাসপুরীর মত প্রতিভাত হইতে লাগিল। দেবমূর্ত্তি সমূহ দর্শন করিয়া তাহার পবিত্র হৃদয়ে অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব ও ভক্তি জাগিয়া উঠিল। রাণী মনে করিতে লাগিল, এইস্থানে যেন সাক্ষাৎ স্বর্গ এবং পলাশ-ডাঙ্গা যেন নরক। সে পলাশ-ডাঙ্গার বাটীতে আর ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাও করিল না।

অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া দুর্গারাণী তাহার পিস্‌তুতো ভ্রাতার পত্নী শৈলজার সহিত কৈলাস পর্ব্বতের মন্দাকিনী ধারায় স্নান করিতে গমন করিল। পার্ব্বত্য পথটি তাহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী শেফালিকা বৃক্ষের শাখাচ্যুত পুষ্পরাশিতে আকীর্ণ হইয়াছিল, এবং পুষ্পের সুমধুর গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইতেছিল। মল্লিকা ও কূটজ পুষ্প সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাদের শুভ্র শোভায় পর্ব্বত গাত্র আলোকিত করিতেছিল। সেই উজ্জ্বল প্রভাত সময়ে পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে দুর্গারাণীর মনে হইতে লাগিল যেন, সে দেবলোকে গমন করিতেছে। কৈলাসনাথের প্রস্তরময় বিশাল মন্দিরটি বামভাগে রাখিয়া তাহারা একটী অপ্রশস্ত পথে কিয়দ্দূর গিয়া নানা বিহঙ্গম-মুখরিত একটী মনোহর আম্রকাননে উপনীত হইল। তাহা অতিক্রম করিয়া তাহারা একটী বিশাল বিল্ববনে উপস্থিত হইল। দুর্গারাণী সবিস্ময়ে দেখিল যে, সেই স্থানের দুরারোহ পর্ব্বত গাত্রটি অবিরল বিল্ববৃক্ষে সমাচ্ছাদিত। সেখানে অন্য কোনও জাতীয় বৃক্ষ নাই। ফল ভারাবনত পত্র-বহুল বিল্ববৃক্ষের এই মনোহর বন তাহার নিকট একটী অপূর্ব্ব দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইল! গিরি গাত্রস্থিত অপ্রশস্ত পথ দিয়া গমন করিতে করিতে, দুর্গারাণী অদূরে একটী জল-প্রপাতের প্রচণ্ড পতন শব্দ শুনিতে পাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই প্রপাতের নিকটবর্ত্তী হইয়া সে যে দৃশ্য দেখিল, তাহা তাহার মানসপটে চির মুদ্রিত হইয়া গেল। একটী উচ্চ দুরারোহ ও নগ্ন পর্ব্বত শৃঙ্গের গাত্র বহিয়া জলধারা প্রচণ্ড নিনাদে অনবরত ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই জলধারা একটী গোলাকার বৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর নিপতিত হইয়া, বেগে পর্ব্বত গাত্রের উপর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেই ধারা পর্ব্বত গাত্রের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে অবতরণ করিবার সময়, এক গম্ভীর নিনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। দুর্গারাণীকে চিত্রার্পিতার ন্যায় সেই ঝরণার দিকে সবিস্ময়ে চাহিতে দেখিয়া, শৈলজা বলিল "রাণি! তুমি শুনেছ যে বিষ্ণুর পাদপদ্ম হ'তে মন্দাকিনী বেরিয়ে শিবের মাথায় প'ড়েছিলেন। তারপর শিবের মাথা হ'তে ভূতলে নেমে, সেই মন্দাকিনী গঙ্গা নাম ধারণ কর্‌লেন। তারপর তিনি পাতালে

[না]মে ভোগবতী নাম নিলেন। ঐ যে পাহাড়ের উচ্চ চূড়াটি দেখ্‌ছ, উহার [না]ম বৈকণ্ঠ। ঐখানে বিষ্ণুর মন্দির আছে। সে মন্দিরে উঠা বড় শক্ত। [ঐ]খানে বিষ্ণুর পাদপদ্ম হ'তে মন্দাকিনী বেরিয়ে ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে নাম্‌ছেন। [না]মে, ঐ দেখ শিবের মাথায় পড়্‌ছেন। শিবের মাথা হ'তে নেমে ঐ দেখ [ম]ন্দাকিনী গঙ্গা হ'লেন। সাম্‌নে আমরা যে জলের স্রোত দেখ্‌ছি, ইনি গঙ্গা। তারপর দেখ, এই গঙ্গা পাহাড়ের নীচে পর্য্যন্ত নেমে ঐ গভীর বনে একটী [গ]াদের মধ্যে লুকিয়ে গেছেন। সেইখানে তিনি ভোগবতী নাম ধারণ ক'রেছেন। [ম]ন্দাকিনীর ধারায় স্নান করা শিব ছাড়া কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। আমরা কেবল [গ]ঙ্গাধারায় স্নান করি। কিন্তু যিনি গঙ্গা, তিনিই মন্দাকিনী, আর তিনিই ভোগবতী। রাণি! এমন সুন্দর ও পবিত্র স্থান তুমি আর কোথাও দেখেছ? আমি রোজই গঙ্গাধারায় স্নান করি এবং এইখানে শিবপূজা ক'রে বাড়ী যাই। এখন চল, আমরা গঙ্গাধারায় স্নান করি। এখানে কোনও ভয় নাই, আর এখানে জলের স্রোতও তেমন প্রবল নয়। আহা, কেমন পরিষ্কার জল দেখেছ! এই জল কখনও ঘোলা হয় না। এখন যেমন দেখ্‌ছ, বর্ষাকালে আর সব সময়েই তেমনি থাকে।"

দুর্গারাণী বিস্ময়ে, হর্ষে ও ভাবাবেগে নির্ব্বাক্ হইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিল ও বৌদিদির কথা শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ঐ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ সত্য সত্যই যেন বৈকণ্ঠধাম, এবং ঐ পর্ব্বত গাত্র বাহিনী এই নির্ঝরিণী যেন গঙ্গা। রামায়ণে যে গঙ্গাবতরণের কাহিনী পড়িয়াছিল; আজ সেই দৃশ্য সে স্বচক্ষে দেখিতে পাইল! সত্য বটে, ইহা প্রকৃত গঙ্গা নহে; কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, হয়ত ইহা পুরাকালের সেই সত্য ঘটনার একটী সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয়। কে বলিতে পারে, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ এই দৃশ্যের সৃষ্টি করেন নাই? এই কৈলাস গিরির পবিত্রতা যে সাক্ষাৎ কৈলাসেরই তুল্য এবং এই গঙ্গা যে প্রকৃত জাহ্নবীরই ন্যায় পবিত্র ও কলুষনাশিনী, সে বিষয়ে তাহার মনে কোনই সন্দেহ রহিল না। সে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে সেই পূত জলধারায় শৈলজার সহিত স্নান করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করিল।

উভয়ে সিক্তবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিল। শৈল সেই পবিত্রধারার জল একটী কলসে পূর্ণ করিয়া লইল। দুর্গারাণীও ঘটী পূর্ণ করিয়া জল লইল। তৎপরে উভয়ে নিকটবর্ত্তী এক বিল্ববৃক্ষের মূলে এক শিবলিঙ্গের সম্মুখে উপবিষ্টা হইয়া তাঁহার পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। শৈল প্রত্যহ স্নানান্তে মহাদেবের পূজা করে। সে কতিপয় বিল্বপত্র চয়ন করিল, নিকটবর্ত্তী এক পরিচ্ছন্ন

শিলার পার্শ্বে একটী চন্দন কাষ্ঠ ছিল ; তাহা ঘসিয়া চন্দন সংগ্রহ করিল। কতিপয় শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি একটী মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহাতে সুগন্ধি ধুপ নিক্ষেপ করিল। শিলাতলে একটী নিভৃত স্থানে একটী প্রদীপ ও তৈলপূর্ণ তৈলাধার ছিল; বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া সে প্রদীপটি জ্বালিল এবং অঞ্চলে বাঁধা কতকগুলি আতপ তণ্ডুল, একটী কলা ও কতিপয় বাতাসা বাহির করিয়া, সেই নির্ঝর বারি দ্বারা ভগবান্‌কে স্নান করাইয়া ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করিল। দুর্গারাণী কখনও শিবপূজা করে নাই। বৌ-দিদিকে শিবপূজা করিতে দেখিয়া তাহারও শিবপূজা করিবার প্রবৃত্তি প্রবলা হইল। শৈল বলিল, "আজ তুমি মন্ত্রগুলি মুখস্থ করে নাও ; কাল থেকে শিবের পূজো কর্‌বে।"

শুদ্ধ-স্নাতা ও রক্ত-পট্ট-বস্ত্র-পরিহিতা সুন্দরী দুর্গারাণীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া শৈল বিস্মিত মনে তাহাকে কিয়ৎক্ষণ দেখিল ; পরে বলিল দুর্গারাণি ! তুমি দুর্গা-রাণীই বটে; কাল থেকে তুমি মহাদেবের পূজা ক'র; তাহ'লে মহাদেবের মত স্বামী পাবে। তুমি একটু ব'স ? তোমার কপালে আমি চন্দনের অলকা এঁকে দিই।' এই বলিয়া শৈলজা একটী বিল্বপত্রের বোঁটা দ্বারা দুর্গারাণীর কপালে চন্দনের বিচিত্র অলকা আঁকিয়া দিল। অলকা-শোভিতা দুর্গারাণীকে দেখিয়া শৈলজার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অপূর্ব্বভাবের উদয় হইল।

স্নানান্তে উভয়ে গল্প করিতে করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে পথিমধ্যে স্নানার্থী হরনাথের সহিত তাহাদের দেখা হইল। হরনাথ শৈলজাকে দেখিয়া বলিল, "এই যে, এর মধ্যেই বৌদিদির স্নান হ'য়ে গেছে!" শৈল হাসিয়া বলিল, "কোন্ দিন না হয় ? তুমি বুঝি বাড়ী থেকে এখনই এলে ?" তুমি আমাদের দুর্গারাণীকে দেখেছ ?" হরনাথ গতকল্য তাহার একবিধ রূপ দেখিয়াছিলেন; আজ তাহার অন্যবিধ অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া, বিস্ময়ে চমকিত হইলেন। তিনি বলিলেন "হাঁ দেখেছি ; ইনি সাক্ষাৎ দুর্গারাণীই বটে।" শৈল বলিল, "আর তুমিও তো সাক্ষাৎ হরনাথ। আমরা হরগৌরীর মিলন দেখ্‌বো কবে ?" হরনাথ বলিলেন "যে দিন গৌরী প্রসন্ন হবেন।" শৈলজা হাসিয়া বলিল, 'যে দিন গৌরী প্রসন্ন হবেন, না যে দিন হরনাথ প্রসন্ন হবেন ?" হরনাথ হাসিয়া বলিলেন "শাস্ত্রের কথা তাই বটে ; কিন্তু আজ কাল সব উল্টো।" শৈলজা বলিল "উল্টো নয়, উল্টো নয় ; আমি দুর্গারাণীকে ব'লেছি, কাল থেকে সে শিবপূজা করবে, তা হ'লেই হরনাথ প্রসন্ন হবেন।" হরনাথ বলিলেন, "আপনার ব্যবস্থা উত্তম।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ। কার্ত্তিক ১৩২১। ৭ম সংখ্যা।

মোক্ষ]

শ্রীশ্রীকালীরূপ বর্ণন।

(Iconographical.)*

যুগপৎ সমুদিত, কোটী সূর্য্য শোভান্বিত,
স্থির-ক্ষীর-অম্বুধির সুনীল হৃদয়ে।
কে আনি রাখিল ওই, তরুণ অরুণ দুই
দু'টী নীল-পদ্ম দিয়ে এমনে ঢাকিয়ে ?
প্রতি নীল ইন্দীবরে, অর্দ্ধ ইন্দু শোভা করে,
কোটী শশী আভা জিনি পঞ্চ পঞ্চ দলে ;
তদুপরি যুগ মীন, ঊর্দ্ধমুখ চারু পীন,
করভে ছলিতে বুঝি লুকাল মৃণালে ?

* হিন্দুর শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, তন্ত্র, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় শিল্প সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার মধ্যেও আর্য্য ঋষিগণ সকলের প্রতিপাদ্য ও পরিসমাপ্তি একমাত্র ভগবানকেই লক্ষিত করেন। তত্ত্বদর্শনাভিলাষী মানব যাহাতে ভগবানের স্বত্বা সর্ব্বে ও সর্ব্বকে ভগবানে লীন দেখিতে পান সেই নিমিত্ত তাঁহাদের ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের সাহায্যে অভিষ্ট-দেব প্রতিমার গঠন সৌকর্য্যার্থে জগতের সৌন্দর্য্য-সমাহারে অভীষ্ট দেবতার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করাইবার জন্য ও দেবতার সৌন্দর্য্যে জগৎকে বিভূষিত দেখাইবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি জাগতিক বস্তুর রূপ, গুণাদির সহিত তুলনায় দেবমূর্ত্তি গঠন প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কবিতাটী সেই পন্থানুমোদিত উপমেয় বস্তুর বিশেষ ভাব সংগ্রহে লিখিত। পাঠক স্বীয় মানস-ফলকে ঐ সকল বস্তুর বর্ণ, গঠন, সৌন্দর্য্য, কাঠিন্য ও কোমলতা দ্বারা ইষ্টদেবের অলৌকিক দ্যুতি-বিভাষিত চিন্ময় মূর্ত্তি অঙ্কিত ও চিত্রিত করিয়া দেখিতে পারিলে আনন্দ-লাভ করিতে পারিবেন আশা করা যায়। উপম্য ও উপমেয়ের পর্য্যায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভাবে বুঝি তাই হবে, উভচর হ'য়ে তবে ;
কর্কট যুগল কেন রহে তার মাঝে ?
বিমুখী হইয়া তা'ই, করভ দুইটী ভাই,
যুক্ত-তুণ্ডে ভিন্ন-শুণ্ডে বিভঙ্গে বিরাজে।
চম্পকলি কাঞ্চি হারে, তা'দিগে বেড়িল কেরে,
নৃ-কর-কিঙ্কিণী শোভা যাই বলিহারি,
উর্দ্ধে সিংহ কটি'পরে, গোমুখ বিরাজে কিরে,
শিরোপরে ধরি দুই পয়োধর-গিরি ?
দুই গিরি পার্শ্ব ঘিরে, মন্দাকিনী বহে ধীরে,
ধর্ম্মিল্য-শৈবাল রক্ত-উৎপল শোভিত।
বুঝি সে আবর্ত্ত লীলা, দেখায় নৃমুণ্ডমালা
যুগ্ম-গজ-কুম্ভরূপ অংশোপরে স্থিত।
সহ দুই করি তুণ্ড, একি হেরি চারি শুণ্ড,
চারি বাহু নানা রত্ন ভূষণ ভূষিত।
তাহারই প্রান্ত ভাগে, রাম রম্ভা-শিশু আগে,
শোভে চম্পা-কলি কর-কমল সহিত।

স্থির ক্ষীর অম্বুধির সুনীল হৃদয়=রজতগিরিনিভ নীলকণ্ঠ মহাদেবের অঙ্গ-জ্যোতি ও গাম্ভীর্য্যাদি ভাব।

তরুণ অরুণ=রক্তবর্ণ পদতল। নীল পদ্ম=বর্ণ ও ন্যুব্জিকৃত ফুল্লপদ্মদলের অবনমিত গঠনের সহিত পদপৃষ্ঠের গঠনভঙ্গি। অর্দ্ধ ইন্দু=পদনখ। পঞ্চ পঞ্চদল=পাঁচ পাঁচ পদাঙ্গুলি (গঠনের উপমা)। মীন=জঙ্ঘা। করভ=করি শিশুর শুণ্ডের সহিত উরু ও শিরের সহিত নিতম্বের গঠন উপমা। কর্কট=জানু (হাঁটুর খিলা)।

চম্পকলি=(চাঁপার কলি) করাঙ্গুলি। সিংহকটী=সিংহের ন্যায় ক্ষীণকটী। গোমুখ=নাভীর কিঞ্চিত নিম্ন হইতে কণ্ঠাস্থির নিম্ন পর্য্যন্ত তনুর গঠন। পয়োধর গিরি=অমৃতপূর্ণ গুণ গঠনেও গিরির ন্যায়। মন্দাকিনী=গৈরিক বর্ণ। ধর্ম্মিল্য (কেশ) শৈবালের ন্যায় রক্তোৎপল সহ আবর্ত্তে রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ডের ন্যায় দেখায়। অংশ=স্কন্ধ, করি-শির সদৃশ গঠন। গজশুণ্ড=বাহুর গঠন। রাম রম্ভাশিশু=কফোনি হইতে কর পর্য্যন্ত বাল-কদলী কাণ্ডবৎ। কম্বু-কণ্ঠ=শঙ্খের ন্যায় বলি ও রবযুক্ত। শশি=বদনশশি গোস্পদাঙ্কিত-চিবুক=অবনমিতমধ্য (টোল পড়া) চিবুক। বন্ধুজীব (বান্ধুলী ফুল)=অধরের গঠন। মুক্তামালা=দন্তপংক্তি। পক্কবিম্ব=গঠনে ও বর্ণে ওষ্ঠাধর। চ্যুতপত্র (আম্রপত্র)=জিহ্বা। শুকচঞ্চু=নাশিকার গঠন। বুকে=নাশিকার বুকে (অর্থাৎ ছিদ্রদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে) যোড়া ধনু—ভ্রূদ্বয়। নীলাব্জ—চ'খের তারা। কমল দল—চ'খের ডিম। গৃধ্র=কর্ণ (উপবিষ্টাবস্থার গঠন কর্ণাবয়বের সদৃশ) ধুমকেতু পুচ্ছ—কেশগুচ্ছ। নীলেন্দু কপালের গঠন।

পং সং

অভয় বরদ যাম্যে, নৃমুণ্ড খর্পর বামে,
শান্তরৌদ্র একাধারে রহিয়াছে মিশি।
কণ্ঠ-নীল কম্বুপরে, এরূপে রাখিল কেরে,
কোটী ভানু-জ্যোতি-জিত হেন নীল শশী।
তার—অধোভাগে অনুপম, রত্ন ঘট মনোরম,
সুচারু গোস্পদ চিহ্ন তাহাতে অঙ্কিত।
তাহে বন্ধুজীব দলে, জড়ায়ে মুকুতা মালে,
পক্ক বিম্বফল দিয়া করিল সজ্জিত !
দোঁহার মাঝারে একি, ললিত লোলিত দেখি,
নবীন লোহিত চারু চ্যুত-পত্র দোলে।
সদ্য রক্তবিন্দু প্রায়, সিন্দুর শোভিত তায়,
কোন দেবে, কে পূজিবে এ বিধু-মণ্ডলে ?
শুক-চঞ্চু নত মুখে— গুঞ্জামণি দোলে বুকে—
এমন আধারে জানি কোন দেব বসে ?
আকুঞ্চিত জোড়া ধনু, তাহার আশ্রয়ে জনু,
রক্তাভ কমল দলে নীলাব্জ বিকাশে।
স্পর্শি বাল নীল ইন্দু ভালে শোভে কলা বিন্দু
নীলেন্দুর অবনত দুই শৃঙ্গ পাশে।
শব-যুগ্ম ধরি নখে, গৃধ্রদ্বয় নত মুখে,
বসে বুঝি আছে অই শিশু শব আশে।
সবার পশ্চাতে একি ? ধুমকেতু-পুচ্ছ দেখি,
নবীন নীরদ কৃষ্ণ উড়ে মন্দ বায়।
কোটী সূর্য্য প্রভা জিনি, সুনীল বরণী ধনী,
মুক্তকেশ আগে খেলে দামিনী প্রভায়।
কে জানে এ নারী কেরে ? দেখে প্রাণ মন হরে,
ইন্দ্রিয়, বাসনা বুদ্ধি ও পদে লোটায়।
ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, শিবা, গায়ত্রী, সাবিত্রী কিবা,
পরব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী রূপেতে খেলায় !

শ্রীচিন্তা—

ভাবে বুঝি তাই হবে, উভচর হ'য়ে তবে ;
কর্কট যুগল কেন রহে তার মাঝে ?
বিমুখী হইয়া তা'ই, করভ দুইটী ভাই,
যুক্ত-তুণ্ডে ভিন্ন-শুণ্ডে বিভঙ্গে বিরাজে।
চম্পকলি কাঞ্চি হারে, তা'দিগে বেড়িল কেরে,
নৃ-কর-কিঙ্কিণী শোভা যাই বলিহারি,
ঊর্দ্ধে সিংহ কটি'পরে, গোমুখ বিরাজে কিরে,
শিরোপরে ধরি দুই পয়োধর-গিরি ?
দুই গিরি পার্শ্ব ঘিরে, মন্দাকিনী বহে ধীরে,
ধর্ম্মিল্য-শৈবাল রক্ত-উৎপল শোভিত।
বুঝি সে আবর্ত্ত লীলা, দেখায় নৃমুণ্ডমালা
যুগ্ম-গজ-কুম্ভরূপ অংশোপরে স্থিত।
সহ দুই করি তুণ্ড, একি হেরি চারি শুণ্ড,
চারি বাহু নানা রত্ন ভূষণ ভূষিত।
তাহারই প্রান্ত ভাগে, রাম রম্ভা-শিশু আগে,
শোভে চম্পা-কলি কর-কমল সহিত।

স্থির ক্ষীর অম্বুধির সুনীল হৃদয়=রজতগিরিনিভ নীলকণ্ঠ মহাদেবের অঙ্গ-জ্যোতি ও গাম্ভীর্য্যাদি ভাব।

তরুণ অরুণ=রক্তবর্ণ পদতল। নীল পদ্ম=বর্ণ ও ন্যুব্জিকৃত ফুল্লপদ্মদলের অবনমিত গঠনের সহিত পদপৃষ্ঠের গঠনভঙ্গি। অর্দ্ধ ইন্দু=পদনখ। পঞ্চ পঞ্চদল=পাঁচ পাঁচ পদাঙ্গুলি (গঠনের উপমা)। মীন=জঙ্ঘা। করভ=করি শিশুর শুণ্ডের সহিত উরু ও শিরের সহিত নিতম্বের গঠন উপমা। কর্কট=জানু (হাঁটুর খিলা)।

চম্পকলি=(চাঁপার কলি) করাঙ্গুলি। সিংহকটী=সিংহের ন্যায় ক্ষীণকটী ; গোমুখ=নাভীর কিঞ্চিত নিম্ন হইতে কণ্ঠাস্থির নিম্ন পর্য্যন্ত তনুর গঠন। পয়োধর গিরি=অমৃতপূর্ণ গুণ গঠনেও গিরির ন্যায়। মন্দাকিনী=গৈরিক বর্ণ। ধর্ম্মিল্য (কেশ) শৈবালের ন্যায় রক্তোৎপল সহ আবর্ত্তে রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ডের ন্যায় দেখায়। অংশ=স্কন্ধ, করি-শির সদৃশ গঠন। গজশুণ্ড=বাহুর গঠন। রাম রম্ভাশিশু=কফোনি হইতে কর পর্য্যন্ত বাল-কদলী কাণ্ডবৎ। কম্বু-কণ্ঠ=শঙ্খের ন্যায় বলি ও রবযুক্ত। শশি=বদনশশি গোষ্পদাঙ্কিত-চিবুক=অবনমিতমধ্য (টোল পড়া) চিবুক। বন্ধুজীব (বান্ধুলী ফুল)=অধরের গঠন। মুক্তামালা=দন্তপংক্তি। পক্কবিম্ব=গঠনে ও বর্ণে ওষ্ঠাধর। চ্যুতপত্র (আম্রপত্র)=জিহ্বা। শুকচঞ্চু=নাশিকার গঠন। বুকে=নাশিকার বুকে (অর্থাৎ ছিদ্রদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে) যোড়া ধনু—ভ্রূদ্বয়। নীলাব্জ—চ'খের তারা। কমল দল—চ'খের ডিম। গৃধ্র=কর্ণ (উপবিষ্টাবস্থার গঠন কর্ণাবয়বের সদৃশ) ধুমকেতু পুচ্ছ—কেশগুচ্ছ। নীলেন্দু কপালের গঠন।

পং সং

অভয় বরদ যাম্যে, নৃমুণ্ড খর্পর বামে,
শান্তরৌদ্র একাধারে রহিয়াছে মিশি।
কণ্ঠ-নীল কম্বুপরে, এরূপে রাখিল কেরে,
কোটী ভানু-জ্যোতি-জিত হেন নীল শশী।
তার—অধোভাগে অনুপম, রত্ন ঘট মনোরম,
সুচারু গোষ্পদ চিহ্ন তাহাতে অঙ্কিত।
তাহে বন্ধুজীব দলে, জড়ায়ে মুকুতা মালে,
পক্ক বিম্বফল দিয়া করিল সজ্জিত !
দোঁহার মাঝারে একি, ললিত লোলিত দেখি,
নবীন লোহিত চারু চ্যুত-পত্র দোলে।
সদ্য রক্তবিন্দু প্রায়, সিন্দুর শোভিত তায়,
কোন দেবে, কে পূজিবে এ বিধু-মণ্ডলে ?
শুক-চঞ্চু নত মুখে— গুঞ্জামণি দোলে বুকে—
এমন আধারে জানি কোন দেব বসে ?
আকুঞ্চিত জোড়া ধনু, তাহার আশ্রয়ে জনু,
রক্তাভ কমল দলে নীলাব্জ বিকাশে।
স্পর্শি বাল নীল ইন্দু ভালে শোভে কলা বিন্দু
নীলেন্দুর অবনত দুই শৃঙ্গ পাশে।
শব-যুগ্ম ধরি নখে, গৃধ্রদ্বয় নত মুখে,
বসে বুঝি আছে অই শিশু শব আশে।
সবার পশ্চাতে একি ? ধূমকেতু-পুচ্ছ দেখি,
নবীন নীরদ কৃষ্ণ উড়ে মন্দ বায়।
কোটী সূর্য্য প্রভা জিনি, সুনীল বরণী ধনী,
মুক্তকেশ আগে খেলে দামিনী প্রভায়।
কে জানে এ নারী কেরে ? দেখে প্রাণ মন হরে,
ইন্দ্রিয়, বাসনা বুদ্ধি ও পদে লোটায়।
ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, শিবা, গায়ত্রী, সাবিত্রী কিবা,
পরব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী রূপেতে খেলায় !

শ্রীচিন্তা—

স্বামীজির শ্যামাপূজা।

কাল রাত্রে স্বপ্নে স্বামীজির সাক্ষাৎলাভ হইল। দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রণিপাত করিয়া বলিলাম "এবার বহরমপুরে দেবেন্দ্রের বাড়ীতে, বেশ ভাল করিয়া ৺কালীপূজা করিবার ইচ্ছা আছে, তৎসম্বন্ধে যদি কিছু উপদেশ দেন, ত' বড়ই ভাল হয়।"

স্বামি। তো'র মনোগত ভাব আমি বুঝিতে পারিয়াই আজ তোকে দেখা দিলাম। প্রথমে বল দেখি শ্রীকালীতত্ত্ব কি বুঝিয়াছিস্?

আমি। সত্যি কথা বল্‌তে কি, ঠাক্‌রুণের নামেই কেমন একটা ভয় হয়! তবে আমাদের শ্রীমতি আনি বেশান্ত ও লেডবিটার সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝাযায়, অজ্ঞান বা বামমার্গের শক্তির নামই কালী। উহা স্বরূপ-চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছায়ারূপা বিরুদ্ধ শক্তি। বিদূষী বেশান্ত এইজন্য তাঁহাকে তামসী বা জড়শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সামি। তবে পূজা করিস্ কেন?

আমি। তা' ঠিক বলিতে পারি না। যখন মায়ের রাঙ্গা পাদপদ্ম বা মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন প্রাণের ভিতর কি-জানি-কি-রকম একটী মিষ্ট আকর্ষণ জাগিয়া উঠে; এবং মনে হয় বাহ্যে মায়ের যে রূপ দেখিতেছি ইহার 'অভ্যন্তরে কি এক পরিপূর্ণ আনন্দ-ঘন সত্ত্বার আভাস আছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ওটা আমাদের ভ্রান্তি বলিয়াই মনে হয়। আমোক্ষ মূলর বেশান্তান্ত পণ্ডিতগণের গবেষণা স্বীকার না করিয়াও থাকা যায় না। তা'ই সেই মহাভীতিপ্রদা সংহারকারিণীকে—মনকে চোখ ঠারিয়া—তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই,—কি জানি রণচণ্ডী উগ্রা হইলে সমস্ত সাধনাই পণ্ড হইয়া যাইবে।

স্বামি। তোদের বিদ্যা এই রকমই বটে। যা'দের চৌদ্দপুরুষে কেহ বিশিষ্ট আমিটীকে ত্যাগ করিতে পারে না, যা'দের ধর্ম্ম, কর্ম্ম সবই সেই ভেদাত্মক বিশিষ্টতার জন্য, যা'দের মধ্যে তোদের পরমপূজনীয় জর্ম্মানজাতি স্কুলে এবং কলেজে এই শিক্ষা দেন যে 'দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তিগুলি দুর্ব্বলতার চিহ্নমাত্র ও মানব ঐ সমস্ত পরিহার-পূর্ব্বক স্বীয় অভিষ্ট-সিদ্ধির পথে উপস্থিত সহস্র সহস্র বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক জগদ্ব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত করত কোটি মানবের প্রাণনাশ করিয়াও যদি স্বার্থসিদ্ধি করিতে হয় তাহা অবশ্য করিবে'—সেই আসুরিক উপদেষ্টার হৃদয়ে কথনই মহাবিদ্যা আদ্যা ভগবতীর মহিমা

প্রকটিত হইতে পারে না। তো'কে তুই একটা কথা মাত্র বলিব, সমাহিত চিত্তে শুনিয়া যা।

চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের চৈতন্যকেই দেবী বলে। হিন্দুগণ ইঁহারই অর্চ্চনা করে। ইনিই খ্রীষ্টানদের Eternal Virgin, মিশরে Isis, প্রভৃতি নানা নামে অভিহিতা হন। ভগবান্‌কে পাইতে ও জানিতে গেলে তাঁহারই চৈতন্যের সাহায্য ভিন্ন পারা যায় না।

আমি। এ'ত খুব সহজ কথা। এই বিভিন্ন ভাবের চৈতন্য শক্তিকেই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইঙ্গিত করা হয়। কিন্তু যে মূর্ত্তির ক্রিয়া ধ্বংস ও বিনাশ, তাঁহাকে মানব কি করিয়া ভক্তি করিতে পারে?

স্বামি। বহুক্ষণ অনাহার পিড়ীত ব্যক্তি যেমন প্রদত্ত আহার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতে যায় না, সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে যাহার প্রাণ ভগবানের জন্য লালায়িত হয়, সে বাহ্যভাবের বিলাস লইয়া মুগ্ধ হয় না। দূরদেশ প্রত্যাগত স্বামী গৃহে আগমন করিলে, পতিব্রতা রমণী যেমন তাঁহার পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি করে না, সেরূপ যাহাদের চিত্ত ভগবানের শুদ্ধ নিষ্কল পরব্রহ্মরূপে সংলগ্ন তাহারা আনন্দময়ীর পরব্রহ্মরূপেসিদ্ধা মূর্ত্তির স্বরূপ দেখিতেই উদ্গ্রীব; কারণ তাহারা জানে যে বাহ্য ভাবটি বিলাস মাত্র। যাহারা ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তাহারা শ্রীভগবানের মায়াবিভূতির মধ্যে কোন্ ভাবটীকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে? যে ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বাহ্যিক সুখ সমৃদ্ধি সিদ্ধ হয়, যাহার সেবায় সাধক লোক হইতে লোকান্তরে গমন করত চৈতন্যময়ীর বাহ্য বিলাসের তরঙ্গ-ভঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে, সেই ভাবের খেলার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি স্বরূপে পৌছান যায়? এই বাহ্য বিলাসকে আমরা প্রকৃতি বলি। ইহার সাহায্যে সাধক অল্পে অল্পে বাহিরে আগমন পূর্ব্বক সর্ব্বের সহিত খেলা করিতে থাকে। প্রকৃত ভগবদ্‌বুদ্ধি না থাকিলে তাহার সাধনা ঈদৃশ খেলাতেই পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু যখন আর খেলা দেখিতে ভাল লাগে না, যখন সেই খেলাকে এক অধিকরণে অবসান বা শেষ করিবার নিমিত্ত "সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে স্বর্গাপবর্গদে" দেবীকে দেখিতে পাইবে, তখন প্রকৃত বুদ্ধি যে বাহিরের ভাবগুলিকে 'স' বা একরূপ শ্রীভগবানে অবসান করে, ইহা বুঝিয়া জনগণের বুদ্ধিরূপে সংস্থিত ও বাহ্যভাবে সংলগ্নচিত্ত মানবের পক্ষে স্বর্গদায়িনী এবং অপর পক্ষে শ্রীভগবানে অনুরক্তচিত্ত সাধকের অপবর্গদায়িনী বুদ্ধিরূপা প্রবণতার সাহায্য গ্রহণ করিয়া সাধক বলিয়া উঠে

"তন্নোধিয়ো প্রচোদয়াৎ"—"মা এরূপভাবে খেল, যাহাতে প্রকট চতুর্দ্দশভুবনাত্মক বিশ্বের মধ্যে—অস্থিরের মধ্যে স্থির, চঞ্চলের ভিতর শাশ্বত, অগতির গতি শ্রীভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব চিত্তে প্রস্ফুটিত হইতে পারে।"

আমি। এ'ত খুব ভাল কথাই ; ইহার সহিত মায়ের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির কি সম্বন্ধ আছে ?

স্বামি। পল্লবগ্রাহীর মত দেখিলে কিছুই নাই। দেখ সাধারণ জগতের প্রেমিককে কি শিখিতে হয় জানিস্ ? 'প্রাণে যার সয় না ব্যথা, সে কেন কয় প্রেমের কথা ?" "সুখ হল না বলে কি প্রেম ত্যাজিব ?" ইহাই প্রেমিক কবিগণের উক্তি। এইজন্যই বৈষ্ণব বলিলেন "শ্যাম তুঁহু মম মরণ সমান।" তো'রা আঁৎকে উঠে বলবি "কি 'প্রেম' গো ! "তুঁহু—মোর—মরণ সমান !!" "Drink to me with thine eyes" এই কথাটা শুনে আমাদের একজন কবি বলেছিলেন "বাবা, কি বিকট প্রেম !! তুমি আমায় খেয়ে ফেল, আমি তোমায় খেয়ে ফেলি। "এই হায় এর মর্ম্ম।' নাটুকে ভাবের প্রেমে, নটরাজের বাহিরের খেলাই অবশ্য বটে ; তাহাতে পূর্ণিমার চাঁদ চাই, মৃদুল মলয় সমীরণ চাই, প্রস্ফুটিত কুসুমদাম চাই, কোকিল কূজন ও ভ্রমরগুঞ্জন চাই। কিন্তু যাহারা প্রেম বুঝিয়াছে, তাঁহারা প্রকৃতির এই বাহ্য সৌন্দর্য্যের বিলাসগুলিকে ত' আর বাহ্য ভাবে দেখেন না। সঙ্গীতের সুরগুলি যেরূপ ঘনভাবে মিশিয়া যাইয়া রাগ রাগিণীতে পরিসমাপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ যাহাদের ভিতরে ভগবৎ-প্রবণতা বা বুদ্ধি জাগরিত হইয়াছে, তাহারাই বাহ্য বিলাসগুলিকে অন্তর্য্যামী ভগবানে নিঃশেষে মিশাইয়া ফেলিতে পারে। ফুল্ল-শারদ-পূর্ণিমা-সুশোভিত বৃন্দাবনে রাসলীলায় একটি গোপীকাও নাটুকে-ভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার প্রয়াসিনী হয় নাই। কারণ শ্রীভগবানে অপহৃতহৃদয়া গোপীনীগণের প্রাণে, বাহিরের সৌন্দর্য্য রাশিও আর ত' ভোগলিপ্সা বা কামকে কিছুতেই জাগ্রত করিতে পারিল না। "নহি মর্য্যাপিতচেতাং কাম কামায় কল্পতে।" ভিতরের টানে,—প্রেমময়ের প্রেমময় আকর্ষণে,—আর ত' বহির্দ্দৃষ্টির অবসর নাই ; আর ত' প্রকৃতির বিলাস দর্শনের সময় নাই। তখন সব যে ঘন হইয়া সেই পর-পুরুষে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

এত গেল প্রেমিকের কথা। কিন্তু যে প্রেমের অক্ষর পরিচয় করিতেও ভাষা শিখিতে যায়,—তাহার ত' এখনও বাহ্য ভাব আছে। তা'র যে এখনও 'বহু' আছে ; 'বহু' আছে বলিয়াই 'এক'ত এখনও স্থির হয় নাই। এখনও ত' জ্ঞান

হয় নাই ;—এখনও ত আত্মার অভেদ বুদ্ধি বা বিদ্যা-তত্ত্ব লাভ হয় নাই ;—এখনওত বাহ্য বস্তুগুলিকে একেরই পদচিহ্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই। যখন এই পরাভিসারিণী প্রেমের গতি জাগিয়া উঠে, যখন ব্যক্ত জগতের 'ক' হইতে 'ল' পর্য্যন্ত ঘন হইয়া, 'শক্তি' ও 'বুদ্ধি'রূপে স্থিতা ভগবচ্ছক্তির সাহায্যে 'ক্লীং'রূপে শ্রীভগবানের অভিমুখে ধাবিত হয়, তখনই ত কাম-বীজের সাধনা। কিন্তু সে প্রেম আসিবার আগে সর্ব্বাত্মিকাবুদ্ধি জাগরিত হওয়া চাই ; বাহিরের বর্ণমালাগুলি অন্ত্যস্থ একরূপে—পরাগতি রূপে—মিশিয়া ঘন একের দিকে যাওয়াত চাই। ইহাই 'র' ও 'ল'য়ের প্রভেদ ; বাস্তবিক প্রভেদ নাই। "রলয়োরভেদঃ"। কারণ উভয়েই ঘন পরাগতি আছে। তবে 'র'এর গতিতে এখনও 'দানা' আছে ; আর 'ল'টী যাহাকে ইংরাজীতে liquid sound বলে,—দানা-হীন হইয়াছে ; 'বহু' গুলি তখন তরল হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। এইরূপ ক্রীঁ বীজ ক্লীঁ এ পরিসমাপ্ত হয়। তার পর এই সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে স্থির হইলে দেখা যায় যে সর্ব্বাত্মক বিশ্ব স্বতঃই সম্পূর্ণরূপে, নিঃশেষিত রূপে একে মিশিয়া যাইতেছে। ঘন হইয়া মিশাই চিত্তের 'তৈল-ধারাবৎ' গতি। চিনির পানা ও মিছিরির রস যেমন একই পদার্থ ; তবে মিছিরির রসে আর দানাগুলির পার্থক্য দেখা যায় না ;—সেই রূপ জগৎ ভাবের মধ্যে ভগবানের অনুভূতি ও "সংহৃতি রূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে"-রূপা ঘন প্রবণতার একটু পার্থক্য আছে।

আমি। পার্থক্যটি কি আর একটু বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

স্বামি। পার্থক্যটি এখন বুঝাইবার সময় নহে ! তবে সামান্য ভাবে এইটুকু জানিয়া রাখ যে, সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ন্যায়। অর্জ্জুন নানা প্রকার রূপ দেখিলেন ; তাঁহার দর্শনে বহুত্বের ও ভেদের কিঞ্চিৎ আভাস আছে ; তবে ঐ বহুগুলি একে নিধন হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে গতি আছে ; বিশেষ গুলি সেই গতির বলে একের দিকে মিশিতে হয়। আধার ভাবে একে উপলব্ধি হইলেও উহাতে জ্ঞানের যেন একটু ছেদ রহিয়া যায়। 'সর্ব্ব যে আত্মা ও আত্মার' এই বোধ বা গতি বুদ্ধির প্রকৃত খেলা। আর কতকগুলি বহুয় মধ্যে ঐকদেশিক একত্ব জ্ঞানকে সার্ব্বজনীন জ্ঞান বলে। সার্ব্বজনীনতার (universatity) একত্ব আছে ; কিন্তু একই যে আত্মা তাহা স্থির হয় নাই। দেবী আনন্দময়ী সর্ব্বাত্মিকা।

আমি। দেবী সর্ব্বাত্মিকা ! তাঁ'র ভাব আর একটু বুঝাইয়া দিন।

স্বামী। শাস্ত্র যেখানে দেবীর কথা বলিয়াছেন সেখানে যদি বাহিরের—

আমাদের অহং বোধের বাহিরে স্থিত তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাকে ভাবা যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রার্থ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। যে সৌভাগ্যমান ব্যক্তি দেবীর খেলা দেখিয়াছেন ও দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছেন, তিনিও দেবীকে বাহিরের পদার্থ বলিয়া ভাবিলে প্রকৃত বোধ হইতে দূরে সরিয়া পড়েন। অনেকেই মনে করেন যে, 'আমিটী' লইয়া সাধনা করিতে করিতে আকস্মাৎ কোথা হইতে 'আত্মার' বিকাশ হইবে। কিন্তু শুদ্ধ দ্রষ্টাস্বরূপ আমি বোধটীকেই যদি ভগবানের 'রূপ' বলিয়া ভাবিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে যে কি পশু মনুষ্য কি দেবতা সকলেই এক 'আমিটী'; তাহার কোনও অবনতি বা উন্নতি নাই। আমরা যাহাকে উন্নতি বা অবনতি বলি, সেটা কেবল 'সর্ব্বের' সহিত সম্বন্ধ লইয়া সর্ব্বাত্মিকা ভারতীর উৎকর্য বা অপকর্যের সহিত জীব আপনার উন্নতি বা অবনতী কল্পনা করে। আজ আমি একা দশজনের সহিত কুস্তি করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিব; কিন্তু যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইবে তখন পারিব না। সে জন্য ভুল হয় আমিটি বুঝি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমিতে বল প্রভৃতির আরোপ কেবল বাহিরের সর্ব্বের সহিত সম্পর্কের জন্যই ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বকে কবলিত করিয়া ভেদাত্মক অহংএর প্রতিষ্ঠাই অহঙ্কার তত্ত্বের খেলা। তার পর যখন সার্ব্বজনীন জ্ঞান হইল, তখন আর বার্দ্ধক্যের দুঃখ থাকে না। কারণ তখন মানব একটু বুঝিতে পারে যে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

কিন্তু কয়জন মানুষ প্রকৃত পক্ষে সেই সার্ব্বজনীন জ্ঞানে অধিষ্ঠিত আছেন? তাহা হইলে আর জগতে শোক, দুঃখ, বিবাদ, বিসম্বাদ থাকে কেন? অনিবার্য্য সার্ব্বজনীন নিয়ম সকল যখন মানব অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লইতে পারে, তখনই বুঝা যায় যে সে 'অন্তঃস্বত্ত্বা' হইয়াছে;—ভিতরে কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ দেখিতে পাইয়াছে যাহার আকর্ষণে বাহিরে পদার্থ গুলির মান বা মূল্য কমিয়া যায়। জীবনে হাসিও আছে, কান্নাও আছে, সুখও আছে, শোকও আছে। উহা ত' খেলার কথা; তাহা লইয়া হর্ষ বা বিমর্ষ ভাব পোষণ করা কেন? যখন হামাগুড়ি ছাড়িয়া হাটিতে শিখিয়াছিলে, যখন খেলা ছাড়িয়া পড়িতে শিখিয়াছিলে, তখনও এই সকল পরিবর্ত্তনে ত' হাঁসি নাই কান্না নাই। তবে অন্য পরিবর্ত্তনে অত বিপর্যস্ত হইয়া যাও কেন? কয়জন ধর্ম্মবীর ও প্রচারক এই তত্ত্বটী বুঝিতে পারিয়াছেন?

তাহার পর এই সার্ব্বজনীন জ্ঞানের আসনে মহামায়ার প্রতিমা স্থাপিত করিতে হইবে। তখন বুঝিতে হইবে যে 'সর্ব্বের' উৎপত্তি ও লয়ান্তে যেরূপ খেলাই হউক না কেন, এই খেলা কেবল মাত্র এক নিষ্কল আত্মাকে দেখাইবার জন্যই হইতেছে। 'সবই যে আত্মার' ইহা বিদ্যাতত্ত্ব; ইট ছুড়িয়া দিলে মাটিতে পড়ে, বীজ পুতিলে গাছ হয়, যৌবনে কাম প্রবৃত্তি জাগে,—এ সব সার্ব্বজনীন জ্ঞান। কিন্তু যখন মাধ্যাকর্ষণ, বীজশক্তি প্রভৃতি তত্ত্বগুলির ভিতর একই আত্মার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই মায়ের মূর্ত্তি গড়া হইল। প্রত্যাহৃত-চিত্ত, ধ্যান-নিরত সাধকগণই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারেন! এই সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি ভেদ-ভাবে স্থিত মানবের বড় প্রিয় নহে! তুমি বিদ্বান 'থিয়সফিষ্ট' হইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া যে কার্য্য সিদ্ধ করিলে, আমি নিরক্ষর হইয়াও ভক্তিভরে পুষ্প ফলাদি দ্বারা মূর্ত্তি পূজা করিয়াও সেই ফল পাইলাম,—ইহা স্বীকার করিতে শিক্ষিত ভায়ার বড়ই কষ্ট হয়। ভগবানই যে সর্ব্ব জীবের, সর্ব্ব ভাবের, গতি—ইহা কি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছ? তাহা হইলে অজামিলের পুত্র-বোধে 'নারায়ণ' নামোচ্চারণ,—ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ব্যাধের ক্ষুধানিবন্ধন শিবলিঙ্গের উপর বারি পাতন, ও শিশুপালের আত্মা ভগবানের অঙ্গ-জ্যোতিতে মিশাইয়া যাওয়া, প্রভৃতি ব্যাপার গুলিকে একটু অনৈসর্গিক বলিয়া ভাব কেন? রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে যাও কেন? কামের আত্মা কি ভগবান নহেন? দ্বেষের গতি কি তাঁহাতেই পরিসমাপ্ত হয় না? যাহার হৃদয়ে ভগবৎ-বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সে ভগবানের প্রতি যে ভাবই প্রয়োগ করুক না কেন, তাহাতে ভগবানেরই পূজা হয়। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, স্ববশে বা পরবশে অগ্নিকে স্পর্শ করিলেই, অগ্নির স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকার বোধই সর্ব্বাত্মিকার প্রথম অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি গুলিকে দশ মহাবিদ্যা বলে। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ,—চারিটী খেলাই আনন্দময়ী খেলিতেছেন, যখন এই ভাবে দেখিতে পারিবে, তখন দুর্গাপূজা করিও। মহাকালী ভাবের খেলাকেই 'আদ্যা' নামে অভিহিত করা হয়। যখন তিনি এ ভাবে খেলেন, তখন আর চারিটী ফলের দিকে দৃষ্টি থাকে না। তখন সমস্ত গতিই ঘন হইয়া অবশেষ-শূন্য ভাবে ভগবানেই পরিসমাপ্ত হয়। জ্ঞানে যতটুকু অবশিষ্ট থাকে, ততটুকু ত' বাহিরে আসিয়া 'লোক' ভাবের সৃষ্টি করে।

আমি। কি বলিতেছেন কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামি। তোদের ভাষায় না বল্লে তোরা ত' বুঝ্‌বিনি। যে আনন্দ-শক্তির

প্রেরণায় স্ত্রীর কাছে যাস্, সেই আনন্দ ভাবটী যদি পূর্ণ বুঝিতে পারিস্, তখন দেখ্‌বি যে তাহাতে কোনও বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা নাই! ঐ আনন্দ আমাদের ভিতর স্বতঃই, সর্ব্বদাই, প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; কিন্তু আমাদের জ্ঞান অত ঘন হয় না; আনন্দের বোধটি পূর্ণ বা ভরপুর হইয়া ফুটে না। তা'ই সে আনন্দে তাহার, 'নিমিত্ত কারণ' ও 'ক্রিয়া' প্রভৃতি বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। স্বপ্নদোষ রোগে আনন্দ অনুভূত হয়; অথচ দেখ স্থূল বস্তু নাই; সূক্ষ্ম ভাবে বস্তু-বুদ্ধি আছে। সেই জন্য উহা (astral) ভূবর্লোকের খেলা। স্বর্গ-চৈতন্যে আবার বাসনাটুকুও নাই; কাজেই কেবল মানসিক ভাবেই, ঐ আনন্দের বিকাশ হয়। অথচ তোরা পণ্ডিত, ভাবিস্ ইন্দ্র বুঝি ইন্দ্রানী প্রভৃতি কত রমণী লইয়া তোদের মত সুখ বোধ করে। সেখানে কেবল স্ত্রী ও পুরুষ এই বুদ্ধির উপর অবস্থিত হইয়াই আনন্দের অনুভূতি হয়; কিন্তু লিঙ্গ বা মূর্ত্তির পার্থক্য নাই; শরীরের সংস্পর্শ নাই; কারণ, স্থূল দেহ বুদ্ধি নাই। প্রণয়িনীর প্রণয়-কটাক্ষে যে তোদের ভাবান্তর হয়, সেটা কি স্থূলের খেলা, না, মনের খেলা? অথচ যে রাসলীলায় বিশ্ব-দেবতাগণও স্থান পান না, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা যাহা কেবল বাহির হইতেই দেখেন, ওরে মুর্খ! সেটা কি অঙ্গ সঙ্গ?

সর্ব্বাত্মিকা ভাবটীও সেইরূপ। সর্ব্বাত্মিকা ভাবে প্রকৃত পক্ষে 'বাহ্য সর্ব্ব' নাই। এমন কি সার্ব্বজনীন জ্ঞানে—যাকে তোরা abstract বা 'অবিশেষ জ্ঞান' বলিস্—'বিশেষ বুদ্ধি' প্রকটরূপে থাকেনা। একটী ইট মাটিতে পড়িতে দেখিয়া কি ভাবিস যে "কাল গাছ পড়িতে, পরস্ব ঘোড়া পড়িতে দেখিয়াছিলাম?" অথচ সার্ব্বজনীন মাধ্যাকর্ষণবশে সকল জিনিসেরই পতনশীলতা সিদ্ধ হইয়া গেল। সার্ব্বজনীন জ্ঞানই চৈতন্যময়ীর প্রথম বিকাশ বলিয়া, উহাতেও তাঁহার পরাভাবের বীজ আছে।

আমি। তাহা হইলে 'সর্ব্বাত্মিকা' জ্ঞানের আবশ্যকতা কি?

স্বামি। সার্ব্বজনীন জ্ঞানে পরাভাবের বীজ আছে সত্য, কিন্তু উহার ভিতরে বিশেষরূপে পরিসমাপ্ত হইবার একটী প্রবণতা বা শক্তি আছে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে, উহার একত্ব unstable equilibriumএ অর্থাৎ বাহ্যভাবে স্থিতিশীল। 'সকলেই মরে' এই জ্ঞানটী যাই রাম মরিল, অমনি 'রামও মরে' এইরূপে স্থির হইয়া গেল। সার্ব্বজনীন জ্ঞানে 'জন' বা বিশেষের অভিমুখী প্রবৃত্তি আছে। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিটী অন্যরূপ। উহা চৈতন্যময়ীর দ্বিতীয় পাদ; উহাতে ঘন একত্ব জ্ঞানটী আর বাহ্য বস্তুভাবে সিদ্ধ

হয় না।—আত্মা বা ভগবদ্ভাবে মিশিয়া যায়। দেহী মাত্রেরই মৃত্যু আছে এই সার্ব্বজনীন জ্ঞানটী, প্রাকৃত ও 'জীব বা দেহী যে অবধ্য' এইরূপে পরিসমাপ্ত হয়। একে মরণ ধর্ম্মী বিশেষের সহিত সংলগ্ন হইয়া আত্মার অমরত্ব সিদ্ধ করে। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিই চৈতন্যময়ীর বিপরীত বিহার। তা'ই তন্ত্র চৈতন্যময়ীর রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া তাঁহার আধারের স্থানে দেখিতে পাইল যে, তিনি তাঁহার স্বরূপ-প্রকাশের নিম্নভাগে মহাকালের সহিত বিপরীত ভাবে রমণ করেন, * * মহাকালেনচ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্।" (তন্ত্রসার—শ্যামা ধ্যান্।) এই বিপরীত ভাবের রতি বলিয়াই আমাদিগের নিকট তাঁহার মূর্ত্তি নৃমুণ্ড-মালিনী, বিশেষের বিনাশ-সাধিনী ভয়ঙ্করী বলিয়া মনে হয়। 'বিশেষ' গুলির বিশেষত্ব রক্ষা করতঃ 'কলন' বা প্রকাশকেই সৃষ্টি ও স্থিতি বলে। 'বিশেষ' গুলি হইতে সে বিবক্ষা দূর করিয়া, তাহাদিগকে ঘন করিয়া মিশাইলে, আমাদের নিকট সেই কলন-ক্রিয়া ভয়ঙ্করী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ইহাও চৈতন্যময়ীর প্রকৃত ভাব নহে। যখন তিনি তৃতীয় পাদ বিক্ষেপ করেন, তখন আর 'সর্ব্ব' ভাবের কিছুই থাকে না; তখন কেবল শুদ্ধ, অতিগ ও নিষ্কল ভগবৎ-স্বরূপই ফুটিয়া উঠে। তাহাতে আর মায়া নাই; জগত নাই; বিভ্রম নাই। সর্ব্বাত্মিকা জ্ঞানে জগৎ দগ্ধ-বস্ত্র-অবভাসরূপে থাকে। কিন্তু চৈতন্যময়ীর যে পাদে তিনি পরব্রহ্মরূপে সিদ্ধা হয়েন, তাহাতে সেইটুকুও থাকে না। তখন তিনি সদানন্দ-স্বরূপ আনন্দঘন পরব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপে ঘন হইয়া, নিজ মায়া-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া, সৎ বা সন্ধানি, চিৎ বা বোধরূপা ও আনন্দ বা হ্লাদিনী রূপ তিন ভাবে ও এই তিন ভাবের অনন্ত বিলাস মূর্ত্তি বা সঙ্গিনীগণের সহিত পরমাত্মায় বিহার করেন। তাহার সেই ধাম বা জ্যোতিতে আর সূর্য্যচন্দ্র থাকে না, পাবক বা বহ্নিও থাকে না। আমাদের পক্ষে এই ধাম বা কলা, অমাবস্যার চন্দ্রের ন্যায় জগদ্ভাব হইতে বিচ্যুত; তাই ঘোর কালো বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে ত, কালো নয়; সে যে "জ্যোতিষামপি তদ্‌জ্যোতি" শুভ্র, হিরণ্যজ্যোতি। কিন্তু তাহার এ মূর্ত্তি সকলে দেখিতে পায়না। যখন 'সবই আত্মা' এ জ্ঞান সিদ্ধ হইতে আর কিছু বাকী থাকে না,—যখন সাধক নিগ্রন্থ হইয়া যায়,—তখনই হ্রীং বীজাত্মক বা হ-রি স্বরূপ পরাভাবের বিকাশ দেখিতে পায়। তখন সে দেখে যে সহস্র সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত হইলে যে জ্যোতি বিকীরিত হইয়া উঠে, সেই জ্যোতিও চিদানন্দময়ীর অঙ্গজ্যোতির সমীপে নিষ্প্রভ হইয়া যায়,—তখন দেখে যে জগতে ও সাধনা

মার্গে যে দুই ভাবের আনন্দের বিকাশ হয়, সেই দুই আনন্দই আনন্দময়ী ৺কালীর পদনখের জ্যোতিমাত্র।

আমি! একবার কৃপা করিয়া মায়ের এই মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়া দিন।

স্বামি। তথাস্তু।

* * * *

আমি। একি—একি! বড় ভয় করিতেছে! অথচ কেমন আনন্দ হইতেছে! আমার 'আমিটী' কোথায় যেন আর যে খুঁজিয়া পাইতেছিনা। রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন্, সহ্য করিতে পারিতেছি না।

স্বামি। মায়ের বামপদের বিশিষ্ট-ভাবটী একবারে ত্যাগ কর। তাঁহার দক্ষিণ পদেই চিত্ত সম্পূর্ণরূপে ভক্তিভরে সংলগ্ন কর।

* * * *

আমি। একি হল, ভয় কোথায় চলিয়া গেল। এ কি পরিপূর্ণতার সমুদ্র!! এযে সবই ভগবান; আপনিও ভগবান, আমিও ভগবান,—ভগবান সবই।

স্বামি। দেবাদিদেবকে আশ্রয় করিয়া, মা আমার, তাঁহার প্রথম বাম পাদ যতক্ষণ মুলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের উপর রাখেন, তখন তাঁহার খেলা বড় মিষ্ট বোধ হয়। তখন জীব তাহার প্রজনন্ কার্য্য দেখিতে পায়, ও পরে 'বহু'জনের ভিতরে সার্ব্বজনীন জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু হিন্দুরা ও মূর্ত্তির পূজা করে না; কারণ উহা স-কল। যাহারা বিশেষাভিমুখী বামাচারী, তাহারা বাম পাদের পূজা করে। সেইজন্য দক্ষিণাকালিকা মূর্ত্তিতে দেখ, মা আমার, হর-হৃদয়-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া, তথায় তাঁহার দক্ষিণ পাদ স্থাপন করিয়াছেন, আর বাম পাদটী বিশেষের বিলাসক্ষেত্র স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধার হইতে তুলিয়া লইবার উপক্রম করিতেছেন। তো'রা সর্ব্বাত্মিকা জ্ঞানে একেবারে ভয়ে বিহ্বল হইয়া যাস্ বলিয়া পাদটী একেবারে পূর্ণ ভাবে তোলেন নাই; তা'ই একটু একটু বিশেষের ভাব পাইয়া স্থির থাকিতে পারিস্। কিন্তু ও পাদের দিকে চিত্ত সন্নিবেশ করিলে পূজা করা হয় না। যে সাহস করিয়া মাকে বাম পাদ তুলিতে বলিতে পারে, এবং তাঁহার শুদ্ধা সর্ব্বাত্মিকা দক্ষিণ পাদে থাকিতে পারে, সেই প্রকৃত ভক্ত; এবং তাহারই মহাকালীর পূজা সার্থক। তাহার পর, যখন সর্ব্বাত্মিকা ভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া আনন্দময়ীর প্রতি অহৈতুকী ভক্তি জাগিয়া উঠে,—যখন সাধক অকিঞ্চন হইয়া 'আমির' একটুও চৈতন্যময়ীর

বাহিরে রাখিতে চাহে না, তখন ভাগবতের ভাষায়, মা জগদম্বার আর একভাব জাগিয়া উঠে;—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসর পদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়োদহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্ত মুখে॥ ভাঃ ১০।৮৭।১৮

ঋষি মার্গের মধ্যে যাঁহাদের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত স্থূল, তাহারা উদর বা 'মণিপুর' ক্ষেত্রস্থ ভগবদ্ভাবের উপাসনা করেন। উদরের বহ্নিতে যেরূপ ভুক্তান্নের পরিণতি হইয়া দেহাদির গঠন হয়, তদ্রূপ মণিপুর-চক্রস্থ ভগবৎ-চৈতন্যে সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতির পরিনাম স্থির হয়; ইহাই ব্রহ্মার ক্ষেত্র। তারপর আরুণি মার্গের সাধকগণ হৃদয়-দহর (আকাশ) রূপ চৈতন্যের উপাসনা করেন। এই হৃদয়কে ভাগবত পরিসর-পদ্ধতি বলিয়া অভিহিত করিলেন। স্থূল ভাবে দেখিলে "পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তীতি পরিসরাঃ নাড্যঃ; তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসরণ-স্থানমিত্যর্থ"—শ্রীধর,। এইরূপে 'পরিসর পদ্ধতি' শব্দ সিদ্ধ হয়। কিন্তু নাড়ীগুলি ত' বাস্তবিক স্থূল পদার্থ নহে; উহারা বাস্তবিক চৈতন্যের প্রবণতা মাত্র। চৈতন্যের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটী অনন্ত ভাবে বিতন্বত হয়, এইজন্য তাঁহাদের নাম 'পরিসর'। এই অনন্ত ভাবরাশির গতি যখন 'হৃদি+অয়ম ইতি হৃদয়ম'—আমাদের হৃদয়েই আছেন এরূপ ভগবানের অভিমুখে প্রেরিত হয়, তখন তাহারা সেই সূক্ষ্মতম ভগবৎ-ভাবে আসিয়া স্থির হয়, তখন আর বাহ্য খেলা থাকে না। প্রবৃত্তি মার্গে হৃদয় হইতে এই জ্ঞানরাশি আপন আপন ভাবে, বস্তুরূপে গূঢ় শ্রীভগবানেরই পদাঙ্ক অনুসরণে,'কাম' নামে অভিহিত হইয়া বাহিরে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সাধক যখন সমস্ত কামের পরিসমাপ্তি ভগবানের অন্বেষণে প্রযুক্ত করিয়া এইভাবে শক্তি ও গতিরাশিকে হৃদয়ে সমাহিত করেন,—যখন

প্রজহাতি সদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ গীতা ২৫৫।

যখন সমস্ত মনোগত কামকে—যে কাম মনের ভিতর থাকিয়া মনের প্রেরক হইয়া মনকে পরিনমিত করে, সেই কাম যখন হৃদয়স্থ চৈতন্যময়ীর দ্বিতীয় পাদে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, যখন আর মনে 'বিশিষ্ট অহং' 'মম' প্রভৃতি কোনও রূপ অভিসন্ধি থাকেনা, যখন বিশিষ্ট বৃত্তিগুলি মায়ের দ্বিতীয় পাদে অভিব্যক্ত সর্ব্বাত্মিকা ভাবে লীন হয়, সেই বিশেষের মহাশ্মশানক্ষেত্রে

আনন্দময়ীকে ভয়ঙ্করী বলিয়া মনে হয়। তারপর যখন সাধক বুঝিতে পারে, যে সর্ব্বাত্মিকা ভাবেই প্রকৃত রস আছে, তখন সাধক যদি সাহস করিয়া আনন্দময়ীকে "মা তোমার সর্ব্বাত্মিকা খেলা সংহার কর; মা কাত্যায়ণী মহামায়ে সর্ব্বের ভাবে আর তৃপ্তি হয় না; মা সেই পর-পুরুষকে একবার দাও মা; তোমার ব্যক্ত, বিলাসের মধ্যে আমি ত' আর কিছু চাহিনা" একথা বলিতে পারে, তখন সাধকের হৃদয়-চৈতন্যে এক অপরূপ ধাম বা জ্যোতির আবির্ভাব হইবে। "ততো হৃদয়াৎ ভো অনন্ত তব ধাম উপলব্ধি-স্থানম্ সুষুম্নাখ্যাম্ পরমম্ জোতির্ম্ময়ম্ শিরোমূর্দ্ধানং প্রতি উদগাৎ উদসর্পং হৃদয়স্য মধ্যাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রত্যুদ্গতম ইত্যর্থ'—শ্রীধর। অর্থাৎ হৃদয় হইতে সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে সিদ্ধ হইয়া সাধকের ভিতর শ্রীভগবানের অনন্ততা, অসীমতা ও পরাভাবের উপলব্ধি-স্থান স্বরূপ এক জ্যোতির্ম্ময়ী—জানিনা কি বলিব—মূর্ত্তি, না, গতি,—ফুটিয়া উঠে। ঐ গতি ব্রহ্মরন্ধ্রের প্রতি ধাবিত। ঐ গতিতে 'আমিকে' ছাড়িয়া দিলে, আর কৃতান্ত-মুখে পড়িতে হয় না।

বুঝিলি কি? সার্ব্বজনীন ভাবে স্থিত মন কেবল ধানের সদৃশ-প্রবাহতার স্রোতে শ্রীভগবানের দিকে প্রযুক্ত হইলে হৃদয়-চৈতন্যে পঁহুছিতে পারে। অকিঞ্চন, 'তৃণাদপি সুনীচ' না হইলে, বিশিষ্ট 'অহং' এর মোহ একেবারে চৈতন্যময়ীর পদযুগে বলিদান না দিলে, হৃদয়ে পঁহুছান যায় না। এই হৃদয়স্থ ভগবানের প্রকাশ ভাব বা নাম,—সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থ কেয়ুর-কুণ্ডলবান নারায়ণ। তাই ভগবান বলিলেন।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি সংযম্য মনোহৃদি নিরুদ্ধ্য চ। গীতা

তারপর প্রোজ্ঝিত-কৈতব (প্রকৃষ্টরূপে উৎসৃত কৈতব) হইয়া সর্ব্বভাবের বীজটীও পরিত্যাগ করিতে হইবে। শ্রুতি চ বলেন "সর্ব্বভাব পরিত্যাগো সমাধি ইতি উচ্যতে।" 'সর্ব্ব' ঘন হইয়া সেই একেই মিশা চাই। তখনই সম্পূর্ণরূপে ও নিঃশেষিত রূপে (সম + আ + ধা) বা সমাধিতে শ্রীভগবানে থাকিতে পারা যায়। বাহ্যভাবে কামের গ্রন্থি ও বিশিষ্ট ভাবে 'অহং' এর পিপাসাকে 'হৃদয় গ্রন্থি' বলে। 'সর্ব্ব যে কেবল শ্রীভগবানেরই জন্য', ইহা বুঝিয়া,—সাধক যদি এইবার বলিতে পারেন,—

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষণ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ঈশোপ।১৫।

হে ভগবন; হে সর্ব্বভাবের পরিপোষক ও আধার-স্বরূপ! পরমাত্মন্! তোমার

জ্যোতির্ম্ময় 'সর্ব্ব'-প্রকাশক চৈতন্যের ক্রীড়া বা রশ্মি সমুদয় একবার সংহরণ কর; আমার 'সর্ব্বের' সাধ মিটিয়াছে। আমি বুঝিয়াছি,—তুমিই সর্ব্বের আত্মা, আমারও নাথ ও পতি। নাথ! এইবার তোমার জ্যোতির্ম্ময়-রূপ একটিবার সরাইয়া লও; আমি তোমার নিষ্কল বিশ্বাতিগ 'আম' বা কালরূপের কলা দেখিতে চাই।" যখন সাধক আনন্দময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারেন' উঠ মা আনন্দময়ি! খোল মা কুটীর দ্বার'—তখনই আনন্দময়ী, ভগবৎ-স্বরূপ-চৈতন্য-স্বরূপিণী মহামায়া উমা, হৈমবতী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া তাঁহার তৃতীয় পাদ বিক্ষেপ করিবেন। বলিতে পার তোমাদের বাহ্য চিত্রের ভাষায়, মায়ের তৃতীয় পাদ কোথায় আছে? হর-হৃদয়েই বা ভগবানের হৃদয়-চৈতন্যেই তাহার দ্বিতীয় প্রকাশ স্থান; কারণ তিনিই হর-হৃদি-বিলাসিনী। বলিতে পার মা তৃতীয় পাদ বিক্ষেপ করিলে, উহা তদীয় প্রকাশক্ষেত্র বা আধার রূপ শ্রীভগবানের কোন স্থানে তোমাকে লইয়া যাইবে? তৃতীয় পাদটী তাঁহার স্বরূপ-ক্ষেত্র সহস্র রেখ পাতিত হইবে; এবং আনন্দময়ী বাস্তবিক অভেদ হইয়া স্বীয় ব্রহ্মরূপে সিদ্ধা হইয়া সেখানে নিত্য বিরাজিতা আছেন। তিনি যেন হর-হৃদয়কে আধার করিয়া, উমারূপে, প্রকাশ ভাব অতিক্রম করতঃ, সদানন্দ-স্বরূপিনী হইয়া, সর্ব্বভাব-বিবর্জ্জিতা হইয়া, সঙ্গিনীগণের সহিত বিরাজ করিতেছেন! এই দেখ তাঁহার মূর্ত্তি!

আমি। কই! আমি যে দেখিতে পাইতেছি না।

স্বামি। তুই হাঁ করিয়া শুনিবি; আমি যে বোধটুকু তোর ভিতর সংক্রমণ করিতে চাহিতেছি, তাহা লইবি না। মনকে এইবার শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ত্যাগ কর, বুদ্ধিকে তাঁহার চরণারবিন্দে উৎসর্গ কর। ভয় নাই। ঐরূপ ভাবেই করিতে হইবে। কোনও সঙ্কল্প বা আকাঙ্ক্ষা যেন না থাকে। ভগবান ত' বলিয়াছেন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়
নিবশিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ। গীতা

'বৈষ্ণব' ভাবে বলিতে গেলে, তাঁহার 'রূপ' সাগরে ঝাঁপ দেও। 'শাক্ত'ভাবে বলিতে গেলে মা উমার শরণ গ্রহণ কর; তিনি যে "ওঁ + আ (সমন্তাৎ)। একবার ব্রজ-গোপীকার ন্যায় কেবল মাত্র তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তিনি নিশ্চয়ই (আ) নন্দ ও (গোপয়তি ইতি) গোপের তনয়কে মিলাইয়া দিবেন। এইরূপ 'সর্ব্বের আহরণ' করেন বলিয়াই, সেই সর্ব্বের আহরক, সুতরাং প্রসিদ্ধ চোর (নারায়ণ ইতি প্রসিদ্ধ চৌরঃ) হৃদয়ে স্থাপন করেন বলিয়াই 'হ্রীং'

বীজ। অনন্ত মায়ার খেলা এই এককে দেখাইবার জন্য। এই আহরণ করিয়া তিনিই পরব্রহ্মরূপ পরম-বিশেষ পদার্থে উপরতা হ'ন বলিয়া, সর্ব্বকে নিঃশেষে পরম বিশেষ ভগবানে পরিসমাপ্ত করেন বলিয়া, তাহার সেই পরব্রহ্ম-নির্দ্দেশক হুং বীজ। 'হুঁ ইতি নির্দ্দেশে' (ছান্দোগ্য শাঙ্কর ভাষ্য)। তা'ই তন্ত্র বলিয়াছেন—যে তন্ত্রের নামে তো'রা আঁৎকে উঠিস্—

বীজত্রয়া শাম্ভবী সা কেবলং জ্ঞানচিৎ-কলা
শব্দবীজদ্বয়েনৈব শব্দরাশি প্রবোধিনী ॥
লজ্জাবীজদ্বয়েনৈব সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারিণী
সম্বোধন পদেনৈব সদাসান্নিধিকারিণী ॥
স্বাহায়া জগতাং মাতা সর্ব্বপাপ প্রনাশিনী।

এই তিন বীজই জগদম্বার তিন পাদ। প্রথম বীজে, মা আমার, 'সর্ব্ব' বা প্রকাশ ভাব স্ফূরিত করিয়া ভগবানের প্রকট মহিমা সিদ্ধ করিতেছেন। দ্বিতীয় বীজে 'পশ্যন্তী'রূপা পরমাগতিতে, সর্ব্বাত্মিকা ভাবে, বিশ্বের অন্ত বা বিশ্রামস্থান দেখাইয়া দেন। তৃতীয় বীজে সর্ব্বের মোহ বা পাপ বিনাশ করতঃ স্বরূপের সান্নিধ্য প্রদান করেন। সৃষ্টীর সময়ে শ্রীভগবান যে ক্রমানুসারে তাঁহার তিনটী পাদ বা প্রণবের মাত্রা প্রকট করেন, যাহাকে লক্ষ্য করতঃ শ্রুতি বলেন "ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং,"—সেই ক্রমের বিপরীত ভাবে খেলাই মায়ের প্রকৃত বিলাস। তা'ই তিনি বিপরীত রতাতুরা হইয়াছেন। তাই (উৎ+ষ্ণিক) 'উষ্ণিকই' তাঁহার ছন্দ, হৃদয় তাহার প্রকাশ স্থান। তাঁহার পাদ সমূহ ভগবানের নির্দ্দেশ করে বলিয়াই, 'হুং' ই তাঁহার শক্তি বা প্রবণতা। সর্ব্বাত্মিকা ভাবে প্রতিষ্ঠিতা বলিয়া, তাঁহার মূল আধার; বিচ্ছিন্ন সর্ব্বভাবকে ঘন করিয়া প্রথম পাদে তাহার মূর্ত্তি বা অঙ্গ গঠন করেন বলিয়াই "ক্রীং" তাঁহার কীলক। স্বয়ং মহাদেবই তাঁহার মন্ত্রের ঋষি বা তাঁহার খেলার দ্রষ্টা। তা'ই তন্ত্র আবার বলিলেন "শিরসি ভৈরব ঋষয়ে নমঃ; মুখে উষ্ণীক ছন্দসে নমঃ, হৃদি দক্ষিণা কালিকায়ৈ দেবতায় নমঃ; গুহ্যে হ্রীং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ হুং শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ক্রীং কীলকায় নমঃ॥ ঐ দেখ মা তাঁহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করত, হর হৃদি-বিলাসিনী উমা-স্বরূপে প্রকটিতা হইতেছে। আমিটীকে ছাড়িয়াছি দাও। সেই 'পরিপূর্ণ ভবারি'রূপ পরম 'আমি' যখন নিত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তখন আর একটা ভেদ বিশিষ্ট 'আমি' রাখিবার প্রয়াস কেন?"

* * * *

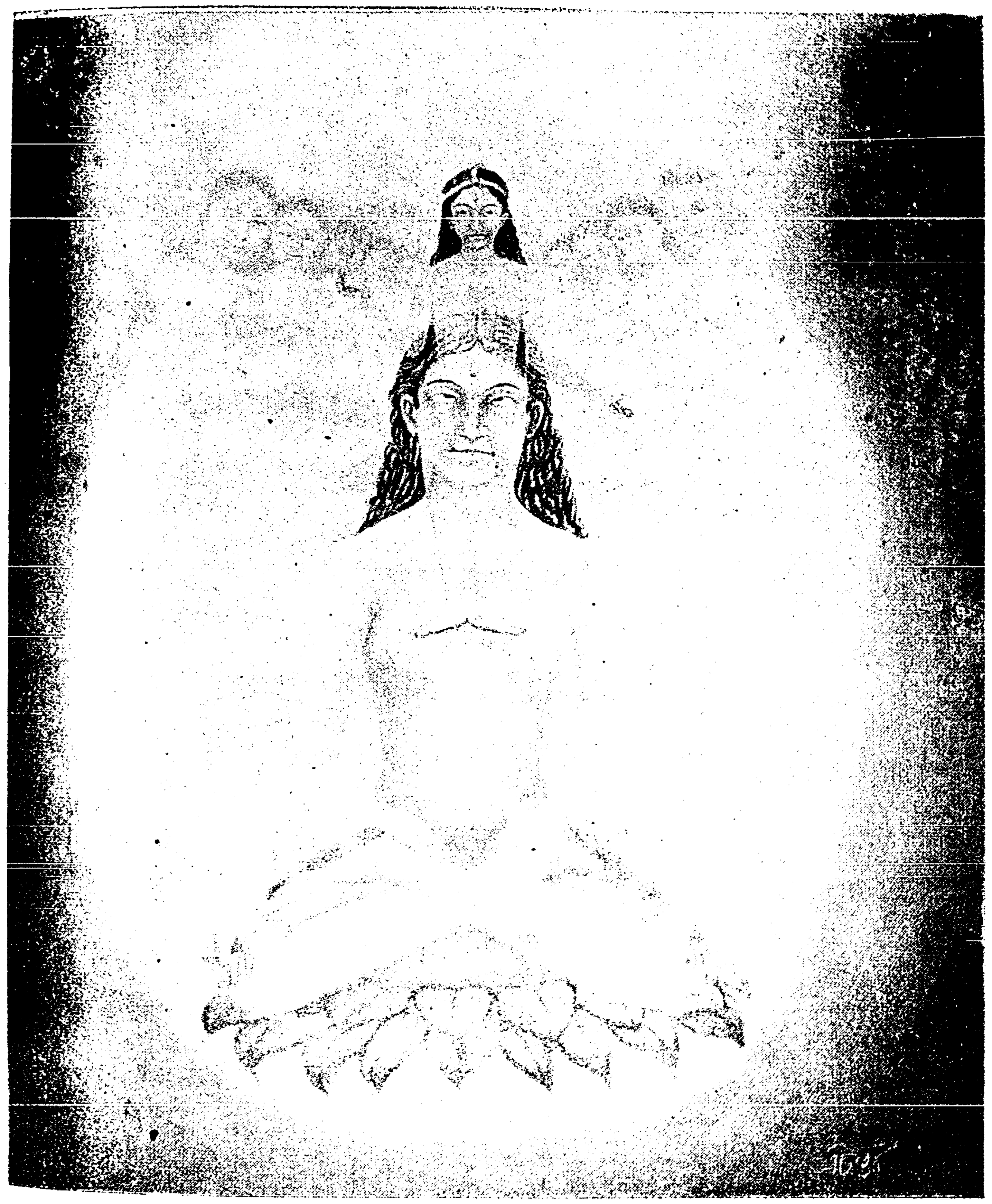

শঙ্কর উরে কে মা বিহরে
রমা রঙ্গিণী সনে।

কি দেখিলাম,—কেমন ছিলাম—মায়ের তৃতীয় পাদ কোথায় যাইয়া রহিল, তাহা আর বলিতে পারিব না। তবে মা আমার, তৃতীয় পাদ বিক্ষেপের সময় যে ভাবে স্ফুরিত হইয়াছিলেন, তাহার একটী অপরিস্ফুট আভাস মাত্র চিত্ররূপে, অকিঞ্চন নিবৃত্তি-পরায়ণ ও শ্রীভগবানে জাতি কুল মান প্রভৃতি ত্যাগ করিতে যাহাদের প্রাণ সদাই কাঁদিতেছে, সেইরূপ সুধীগণকে উপহার দিলাম। জানিনা মহাভাবময়ী চৈতন্যময়ী মহামায়ার সেই কৈবল্য-দায়িনী স্বরূপাভিব্যক্তির, কতটুকু আমাদের মরলোকের ভাষায় বর্ণিত ও স্থূলাভিমুখী চিন্তার সাহায্যে, অঙ্কিত চিত্রে অঙ্কন করিতে সক্ষম হইয়াছি। তবে ভরসা এই যে—

বদক্ষয়ং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু সর্ব্বত্র তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥

হরিঃ ওঁ তৎসৎ।

উপেন্দ্র-পরায়ণ শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

মোক্ষ]

অন্বেষণ।

পরাণ মাঝারে অতৃপ্ত বাসনা,
রহিয়াছে সঙ্গোপন।
দিশাহারা হৃদে উৎসুক পরাণে
করি তাই অন্বেষণ॥
প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, আকুল-পিয়াসা,
রেখেছি বাঞ্ছিত তরে।
সাজায়ে সতত অতি সযতনে,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে॥
মর্ম্ম পট জুড়ে তাহারি সে ছবি,
থাকিলেও সদা আঁকা।
অসংযত চিত্ত,—মানস মলিন,
তা'ই গো মিলেনা দেখা॥

চপলার মত ক্ষণ-দীপ্তি দিয়ে,
অনন্তে মিশিয়ে যায়।
ভীষণ আঁধারে ক্ষীণ-জ্যোতিঃ তার,
ঝলকে নয়ন হায়!!
দ্বিগুণ আবেশে কেঁপে উঠে প্রাণ,
দুরু দুরু করে হিয়া।
চির আকাঙ্খিত কোথা তুমি মোর,
ঢাল শান্তি দেখা দিয়া॥
রাখিয়াছি হৃদি—শূন্য সিংহাসন,
তোমারে লইতে বরি'।
এস হে সুহৃদ! মানস-মোহন
অন্তর কালিমা হরি'॥

শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

আত্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই জীবকে অনেক দুঃখ প্রদান করিবে এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে? এক্ষণে এই অর্থ স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা সঙ্গ বিষয় দুঃখের কারণতা নিরূপিত হইতেছে। তথায় বাস্তবিক সর্ব্ব-সঙ্গ-রহিত যে নির্গুণ আত্মা, সেই আত্মা ও অবিদ্যাদি কল্পিত সঙ্গ বশতঃ নানাপ্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই সঙ্গই সর্ব্ব জীবের অনর্থের কারণ; কিম্বা স্বভাবতঃ শীতল যে জল, সেই জল যখন অগ্নির সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই জলও উষ্ণভাব প্রাপ্ত হয়। আর স্বভাবতঃ ছেদন ভাব রহিত যে বৃক্ষ, সেই বৃক্ষ যখন কুঠারের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই বৃক্ষ ছেদন ভাব প্রাপ্ত হয়। আর স্বভাবতঃ অন্তর্মুখ যে মন, সেই মন যখন বিষয় সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই মন বহির্মুখতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব পাপ কর্ম্ম যুক্ত যে পাপী পুরুষ, সেই পুরুষ যখন দুষ্ট পুরুষের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই পাপী পুরুষ সেই পাপের দুঃখরূপ ফল অনুভব করে. এবং স্বভাবতঃ দুঃখ রহিত যে ধর্ম্মাত্মা পুরুষ সেই ধর্ম্মাত্মা যখন দুঃখী পুরুষের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই ধর্ম্মাত্মা পুরুষও নানাপ্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ কাম দোষ রহিত যে পুরুষ, সেই পুরুষ, যখন কামী পুরুষের সঙ্গ লাভ করে, তখন সেই পুরুষও কাম দোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানুষ চোরের সঙ্গে থাকিলে চোর হইয়া থাকে। অম্লরস যুক্ত তেঁতুল ও লেবু প্রভৃতির দর্শনরূপ সঙ্গ হইতে এই পুরুষের মুখের লালা দ্রবীভূত হইয়া যায়। আর স্বাভাবিক নির্ম্মল যে সূর্য্য ও চন্দ্র, তাহা রাহুর সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত হয়; তখন আর নির্ম্মলতা থাকে না। স্বভাবতঃ ক্রিয়া-রহিত যে লৌহ, যখন চুম্বক পাষাণের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই লৌহ নানাপ্রকার গমন আগমনাদি ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ এই জীব, স্ত্রী পুত্রাদি পদার্থের সঙ্গ লাভ করিয়া নানাপ্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, ইহলোকে জড় রূপে প্রসিদ্ধ যে লৌহাদি পদার্থ সেই লৌহাদি জড় পদার্থ ও চুম্বকাদি জড় পদার্থের সঙ্গ বশতঃ যখন নানাপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন এই চেতন জীব, স্ত্রী পুত্রাদি চেতন পদার্থের সঙ্গ দ্বারা নানাপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হইবে, এ বিষয় আর কি বক্তব্য আছে! সুতরাং 'অহং মম' অভিমানরূপ সঙ্গ যুক্ত এই শরীর সর্ব্ব জীবের দুঃখের কারণ। এই

বিষয়ে আমি যাজ্ঞবল্ক্যই দৃষ্টান্ত স্থল। কারণ পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় আমি যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বসঙ্গ রহিত ছিলাম, সুতরাং আমার কিছুমাত্রও বিক্ষেপ প্রাপ্তি হয় নাই। সেই আমি যাজ্ঞবল্ক্য এখন স্ত্রী পুত্রাদির সঙ্গ করিয়া নানাপ্রকার বিক্ষেপ প্রাপ্ত হইতেছি। তাহাতে এই জানা যাইতেছে যে এই সঙ্গই পরম দুঃখের কারণ। এক্ষণে স্ত্রী পুত্রাদির সঙ্গ বিষয়ে অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা বিক্ষেপের কারণতা নিরূপণ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় আমি যাজ্ঞবল্ক্য নিজের শরীর বিষ্ঠার ন্যায় মলিন জানিয়া অত্যন্ত বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; আর অত্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমি অরণ্যে তপস্যা করিয়াছিলাম। সেই বনে স্বর্গের অপ্সরা আসিয়া নানাপ্রকার হাব ভাব কটাক্ষ দ্বারা আমার ধৈর্য্য বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পরন্তু সেই অপ্সরাদিগের হাব ভাব কটাক্ষ দেখিয়া আমার ধৈর্য্য বিচলিত হয় নাই। সেই অপ্সরাগণ কিরূপ? তাহারা কামরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া মন্দ মন্দ গতিতে গমনাগমন করিতেছিল। তাহাদের শরীরের সুগন্ধে কেতকী চম্পকাদি পুষ্পের গন্ধও লজ্জা পায়। তাহাদের শরীরের সৌন্দর্য্য সুবর্ণের পুষ্পকেও পরাজয় করে এবং পীনোন্নত যে স্তন যুগল এবং জঘনস্থান তাহা হইতে সমীরণ পরিধেয় বস্ত্র হরণ করিয়া (উড়াইয়া) লইয়া যাইতেছে। তাহাদের মুখ মণ্ডল পৌর্ণমাসী চন্দ্রের ন্যায় আভাযুক্ত, এবং চন্দ্র-সদৃশ উজ্জ্বল যে বস্ত্র ও ভূষণ তদ্দ্বারা তাহাদের শরীর শোভায়মান। এরূপ অপ্সরাগণ আপনাদের কটাক্ষ দ্বারা আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই অপ্সরাদিগের কটাক্ষ কিরূপ? সেই কটাক্ষ কামী পুরুষদিগের ধৈর্য্য বিনাশকারী এবং তাহাদের সহিত সম্ভোগ ইচ্ছারূপ উৎকৃষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশকারী। কিন্তু সেই অপ্সরাদিগের মধুর বচন দ্বারাও আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। তাহাদের বচন কিরূপ? অত্যন্ত কোমল এবং মন্দ মন্দ হাস্য যুক্ত এবং কামী পুরুষের মন হরণকারী। তাহাদের বাক্যের অর্থ প্রসিদ্ধ এবং অভিপ্রায় গম্ভীর, এবং ঘৃতের ন্যায় কামরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী এবং সুদীর্ঘ ললিত স্বর দ্বারা উচ্চারিত। এরূপ মধুর শব্দ দ্বারা এবং পদদ্বয় স্থিত নুপুরাদি ভূষণের নিরন্তর শব্দ দ্বারা সেই অপ্সরাগণ আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। সেই অপ্সরাগণ আপনাদের হস্ত পদাদির অঙ্গ ভঙ্গী করিয়াও আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। সেই অপ্সরাদিগের অঙ্গ কিরূপ? বায়ু দ্বারা এবং চলন দ্বারা শিথিল ভাব প্রাপ্ত যে দুকুলাদি বস্ত্র এবং কাঁঞ্চি, কঙ্কণ, অঙ্গদ্ প্রভৃতি ভূষণ দ্বারা সুশোভিত, এবং রোমাঞ্চরূপী কাঁচুলী বিশিষ্ট। অঙ্গ-ভঙ্গী পূর্ব্বক

চলন, সুগম শ্রমরূপ ভাব দ্বারা বিহ্বল এবং দ্রবীভাব প্রাপ্ত মস্তকে সিন্দুর এবং নেত্রে অঞ্জন দ্বারা পরিশোভিত। ললাটোপরিস্থিত কুঙ্কুম চন্দনাদি পদার্থ যুক্ত এবং সুগন্ধ পুষ্পদ্বারা গ্রথিত যে কেশ, সেই কেশ-গ্রন্থি আলুলায়িত হওয়াতে অত্যন্ত শোভায়মান এবং হাস্য বাদিত্র গীতাদি দ্বারা সুশোভিত। এরূপ অপ্সরা-দিগের মনোরম অঙ্গভঙ্গী দ্বারাও আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। এবং সেই অপ্সরাগণ তাহাদের মনোহর স্থান দ্বারাও আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। সেই স্থান কিরূপ? কোকিলাদি পক্ষীর মধুর শব্দ দ্বারা কল্লোলিত এবং চির বসন্ত ঋতু যুক্ত; মন্দাকিনী গঙ্গার সমীপতা নিবন্ধন অত্যন্ত কোমল এবং বালুকা রাশি পরিপুর্ণ এবং দেবতাদিগের দ্বারা সেবিত। ইত্যাদি নানা-প্রকার উপায়ে সেই অপ্সরাগণ আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পরন্তু সেই অপ্সরাগণের দ্বারা আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি হয় নাই। সেই আমার ধৈর্য্য এখন বৃদ্ধাবস্থায় কেবল ভ্রান্তি দ্বারা নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সেই ভ্রান্তি নিরূপণ করা যাইতেছে। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় যে স্ত্রী আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিয়াছিল, সেই স্ত্রীর শরীর আমার শরীর হইতে কিছুমাত্রও ভিন্ন নহে। কিন্তু যেরূপ রুধির, মাংস, পূয, বিষ্ঠা, মুত্র, নাড়ী, মজ্জা, অস্থি ইত্যাদি মলিন বস্তুর সমষ্টি আমার শরীর, সেইরূপ এই আমার স্ত্রীদিগের শরীর ও রুধির মাংসাদি মলিন বস্তুর সমষ্টি রূপ। সুতরাং এরূপ মলিন স্ত্রীর শরীরকে যদি আমি সুখের সাধন জ্ঞান করি, তাহা কেবল ভ্রান্তি দ্বারা মানিতে হয়। কিম্বা, আমি যাজ্ঞবল্ক্য আপনার শরীরকে বারম্বার মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা প্রক্ষালন করি, তথাপি এই আমার শরীর শুদ্ধ হয় না, কিন্তু সর্ব্বদা দুর্গন্ধ দ্বারা অশুদ্ধ থাকে; আর এই স্ত্রীও আমার ন্যায় মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা আপনার শরীর সর্ব্বদা প্রক্ষালন করে না, তবে এই স্ত্রীর শরীর কি প্রকারে শুদ্ধ হইবে? সুতরাং এই স্ত্রীর শরীর সর্ব্বদাই অশুদ্ধ থাকে। এরূপ অশুদ্ধ স্ত্রীর শরীরকে যদি সুখের কারণ স্বীকার করিয়া থাকি, তাহা কেবল ভ্রান্তি দ্বারাই স্বীকার করিয়াছি। যিনি বিবেকী ও বিরক্ত পুরুষ হইবেন, তিনি আপনার এবং স্ত্রীদিগের শরীরকে সর্ব্বদা অশুদ্ধই জানিবেন ইহাতে সন্দেহ কি? 'স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিধস্পন্দান্নিধনা-দপি। কায়মাসেচ শৌচত্বাৎ পণ্ডিতাহ্যশুচি বিদুঃ। অর্থ, এই শরীর মাতার উদররূপ স্থানে থাকে এবং পিতামাতার শুক্র শোণিত রূপ বীজ হইতে উৎপন্ন হয় এবং অন্ন পানাদি রসের পরিণাম। নেত্রাদি নব দ্বার হইতে যাহার মল নির্গত হয় এবং অশুচির কারণ এবং স্বভাবতঃ শুদ্ধত্ব রহিত। এই কারণে

বিবেকী মহাত্মা পুরুষ এই শরীরকে অশুচি বলিয়া জানে। কিম্বা যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত যে স্ত্রীলোকের পীনোন্নত পয়োধর যাহাকে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সুবর্ণ কমলের সহিত উপমা দিয়াছেন, সেই স্তন কিরূপ? যেরূপ আমাদিগের কোন রোগের বশে হৃদয় দেশে মাংসের গ্রন্থি হয়, সেইরূপ মাংসের গ্রন্থির সমান সেই স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়। এরূপ মাংসের গ্রন্থিরূপ স্তনে যে আমার সুখের কারণতা জ্ঞান হইয়াছে, সেই জ্ঞান ভ্রান্তি মূলক। কিম্বা কেবল স্তন ছাড়িয়া দিলে স্ত্রীর শরীর ও পুরুষের শরীর সমান। আর বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে এই স্তনদ্বারা ও স্ত্রীলোকের শরীরে বিলক্ষণতা সম্ভব নহে। কারণ পুরুষের কটী স্থানের নিম্নভাগে মাংসের গ্রন্থিরূপ যে উপস্থ আছে, সেই উপস্থে এবং স্ত্রীর-স্তনে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভেদ নাই। কিম্বা পুরুষের যে পায়ুছিদ্র এবং স্ত্রী-লোকের যে কোন ছিদ্র এই উভয় ছিদ্র মল বহির্গত হইবার দ্বার। সুতরাং এই উভয় ছিদ্রেও কিঞ্চিন্মাত্র বিলক্ষণতা নাই। সুতরাং এই সিদ্ধ হইতেছে যে স্ত্রীর শরীরে দুটী পায়ুদ্বার আছে, আর পুরুষের শরীরে একটি পায়ুদ্বার আছে। এরূপ স্ত্রীলোকের শরীরে, "এই স্ত্রী আমার সুখের সাধন" এইরূপ সুখ-সাধনতা জ্ঞান যে আমার হইয়াছিল, সেই জ্ঞান প্রাপ্তিরূপ। কারণ বিচার দৃষ্টি করিয়া দেখিলে এই স্ত্রীর শরীর গ্লানি উৎপত্তি করতঃ বিবেকী পুরুষের পশ্চাৎ তাপের কারণ। এরূপ দুঃখের সাধনতা রূপ স্ত্রীর শরীরে, সুখ সাধনতা বুদ্ধি ভ্রান্তিরূপই হইতেছে। যেরূপ সর্প ভাব হইতে রহিত রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ভ্রান্তিরূপ। কিম্বা! ইহলোকে অবিবেকী পামর পুরুষও অন্য পুরুষের সমীপস্থিত আপনার স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করে না। আর আমি যাজ্ঞবল্ক্য সেই স্ত্রী হৃদয় দেশস্থিত যে অন্তর্য্যামী আত্মারূপ পুরুষ, তিনি অত্যন্ত সমীপে বিদ্যমান থাকিলেও নিলর্জ্জ হইয়া স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিয়াছিলাম। সুতরাং সেই পামর পুরুষ অপেক্ষাও আমি যাজ্ঞবল্ক্য নিকৃষ্ট। এক্ষণে এই বিষয়ে সুখের কারণ বিচার করা যাইতেছে। স্ত্রী পুরুষের যে পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধ, সেই সংযোগ সম্বন্ধ এই জীবের বিষয়-জন্য সুখের কারণ নহে। কিন্তু 'এই স্ত্রী আমার বিষয় সুখের সাধন' এই প্রকার যে পুরুষের এবং স্ত্রীর ভাবনা সেই ভাবনাই সেই পুরুষের এবং স্ত্রীর বিষয় সুখের সাধন। কারণ যদি কখনও স্ত্রী পুরুষের সংযোগ সম্বন্ধই সেই বিষয় সুখের কারণ হইত, তাহা হইলে স্নেহ পূর্ব্বক আপনার যুবতী মাতাকে আলিঙ্গনকারী যে যুবাপুত্র এবং স্নেহ পূর্ব্বক আপনার যুবা পুত্রকে আলিঙ্গনকারিণী যে যুবতী মাতা তাহাদের

দুইজনের এই বিষয় সুখ হওয়া উচিত। এবং পরস্পর দ্বেষ ভাবাপন্ন যে যুবতী স্ত্রী ও যুবা পুরুষ, তাহাদের দৈব যোগে পরস্পর আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইলেও সেই বিষয়-জন্য সুখ হওয়া উচিত। কিন্তু সেই পুত্রাদি পুরুষের আপনার মাতাদি স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গন করিয়া সেইরূপ সুখ প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে স্ত্রী শরীর ও পুরুষ শরীরের পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধ এই বিষয় সুখের কারণ নহে; কিন্তু পূর্ব্ব কথিত ভাবনাই এই বিষয় সুখের কারণ। স্ত্রীর শরীর, পুরুষের শরীর, এবং সেই উভয়ের পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধ এই তিনটী সেই বিষয়-সুখের কারণ নহে। যে আত্ম-স্বরূপ আনন্দের লেশমাত্র আনন্দ দ্বারা ব্রহ্মাদি লোক আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এরূপ আনন্দের সমুদ্র, স্বয়ং-জ্যোতি, আত্মা সর্ব্বদা আমার হৃদ্দেশে বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই আনন্দস্বরূপ আত্মাকে উপেক্ষা করিয়া আমি যাজ্ঞবল্ক্য, যেরূপ ভূতাবিষ্ট পুরুষ এই ভূমিতে নানা প্রকার নৃত্য করে সেইরূপ এই নারীরূপ নরক ভূমিতে নানা প্রকার নৃত্য করিতেছিলাম। কারণ আত্মারূপ নিত্য সুখ উপেক্ষা করিয়া, স্ত্রীরূপ নরকে যে আমার সুখ-বুদ্ধি আছে, সেই সুখ-বুদ্ধি আমার মূর্খতা জানাইতেছে। কারণ ইহলোকে যে পুরুষ উৎকৃষ্ট পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট পদার্থ গ্রহণ করে, সেই পুরুষকে সকল লোকে মূর্খ বলে। ইহ লোকে মহান্ পুরুষের যে অবজ্ঞা, সেই অবজ্ঞাই সেই মহান্ পুরুষের হনন বলিতে হইবে। আর সূর্য্য চন্দ্রমাদিকে আপনার আজ্ঞাতে নিয়োগকারী যে এই আনন্দস্বরূপ অন্তর্যামী আত্মা তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্; সেই মহান্ আত্মাকে আমি যাজ্ঞবল্ক্য বিষয় সুখ প্রাপ্তির জন্য উপেক্ষা করিয়া দিয়াছি, এই উপেক্ষারূপ অবজ্ঞাই সেই আত্মার হনন সন্দেহ নাই। আর আত্মা হত্যাকারীর ন্যায় পাপাত্মা ইহলোকে কেহ নাই। সুতরাং নিজের আত্মাকে হননকারী আমি যাজ্ঞবল্ক্য অত্যন্ত পাপাত্মা! ইহলোকে অবিবেকী পামর পুরুষ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে জানে না, এই কারণে সেই পামর পুরুষ স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থে আসক্তি করিয়া বহির্মুখ হয়। কিন্তু আমি যাজ্ঞবল্ক্য গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে আনন্দ-স্বরূপ আত্মাকে জানিয়াও, এই স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থে আসক্তি করিয়া বহির্মুখ হইয়াছি। সুতরাং আমি যাজ্ঞবল্ক্য অবিবেকী পামর পুরুষ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। ইহলোকে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত যে পামর পুরুষ, সেই পামর পুরুষও আপনার স্ত্রীকে বৃদ্ধা দেখিয়া, সেই বৃদ্ধা স্ত্রীকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু আমি যাজ্ঞবল্ক্য

এই বৃদ্ধা স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সুতরাং আমি পামর পুরুষ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কিম্বা যে স্ত্রীতে আমার আসক্তি হইতেছে সেই স্ত্রী কিরূপ? শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় যাহার শরীর এবং আমার ন্যায় যাহার উদর, এবং পুত্রদিগকে স্তন্য পান করাইয়া যাহার স্তন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সূর্য্য ভগবান্ যে আমাকে গৃহস্থাশ্রম করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা পুত্র উৎপত্তির জন্য এবং বেদবিদ্যা সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য আজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই আজ্ঞা পরিপূর্ণ হইলে পরও আমি বৃথা কাল অতিবাহিত করিয়াছি। ইহা তাঁহার আজ্ঞা ছিলনা; আমি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার বিদ্যার সম্প্রদায় অনেক প্রবর্ত্ত করিয়াছি। কারণ চারি বেদ প্রচার করিতে সমর্থ অনেক ব্রাহ্মণ তো আমার শিষ্য এবং কত ব্রাহ্মণ তো আমার শিষ্যের শিষ্য; আরও কত ব্রাহ্মণ তো আমার প্রশিষ্যের শিষ্য। এই প্রকার সমস্ত ব্রাহ্মণ মিলিয়া অনেক কোটী ব্রাহ্মণ আমার শিষ্য পরম্পরা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি যাজ্ঞবল্ক্য আমার স্ত্রী পুত্রাদির সুখের এবং ধনের আসক্তি করিয়া এই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করি নাই। এই স্ত্রী পুত্র ধনাদির বিষয় সকল বিচার করিতে করিতে আমি যাজ্ঞবল্ক্য অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি আমার চিত্ত এই সংসার হইতে উপরত্ত হইতেছে না। কিন্তু অদ্যাবধিও আমার চিত্ত সংসারের দিকে ধাবমান হইতেছে। সুতরাং স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থের সঙ্গই এই জীবের অনর্থের মূল। সুতরাং এই সিদ্ধ হইতেছে যে স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থের সঙ্গই আসক্তি দ্বারা এই জীবের সর্ব্ব অনর্থের কারণ। সুতরাং যে ব্যক্তির করামলকের ন্যায় সংশয় বিপর্য্যয় রহিত আত্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে, সেই বিদ্বান্ পুরুষ ও স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থের সঙ্গ কখনও করিবেনা! ইহাদের মধ্যেও স্ত্রীর সঙ্গ কখনও করিবেনা। সেই স্ত্রীর মধ্যেও যুবতী স্ত্রীর সঙ্গ এই পুরুষ কখনও করিবেনা। কারণ মরণান্তর পাপী জীবের যে নরক প্রাপ্তি হয়, সেই নরক স্থাবর। সুতরাং সেই নরক ত্যাগ করিলে পর সেই পাপী জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসে না। কিন্তু এই স্ত্রী ত' দুই পদ দ্বারা চলিতে সমর্থ, মূর্ত্তিমান নরক। সুতরাং সেই স্ত্রীরূপ নরক ত্যাগ করিলে পরও এই পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করে। এরূপ স্ত্রীরূপ ঘোর নরকে যদি কখনও সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা বিদ্বান্ পুরুষও পড়ে, তবে সেই বিদ্বান্ পুরুষও সেই স্ত্রীরূপ নরক হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন না। সেই বিদ্বান্ পুরুষের মধ্যে আমি যাজ্ঞবল্ক্যই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-

রূপ। সুতরাং যোগারূঢ় পুরুষেরও স্ত্রীর সঙ্গ প্রযুক্ত অধঃপতন হয়, এই যে বার্ত্তা সর্ব্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তাহা যথার্থ। যেরূপ ইহলোকে গ্রামে লইয়া যাইবার রাস্তা থাকে, সেইরূপ নরক রূপ গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য এই স্ত্রীর শরীররূপ মার্গ আছে। সুতরাং মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য যে আত্মজ্ঞান রূপ মার্গ, সেই মার্গ প্রাপ্তির ইচ্ছা যে পুরুষ করে, সেই মুমুক্ষু এই স্ত্রীরূপ নরকের পথ অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। ইহলোকে যে অধিকারী পুরুষ সংন্যাস আশ্রম রূপ মার্গ দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি ইচ্ছা করে, সেই অধিকারী পুরুষের সেই সংন্যাস রূপ মার্গে এক স্ত্রী হইতেই ভয় থাকে। আর সেই স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য কোন সিংহ, সর্প, চৌর, রাজা, জল, অগ্নি, বিষ, আধি, ব্যাধি, দেবভূত ইত্যাদি কিছু হইতে এই অধিকারী পুরুষের ভয় নাই। তথায় সন্ন্যাসীদিগের স্ত্রীলোক হইতে যে ভয় হয়; এ বিষয়ে এই কারণ যে, বহির্মুখ পুরুষের আত্মসাক্ষাৎকার হয় না এই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সেই বহির্মুখতা যেরূপ স্ত্রীলোকের সংসর্গ হইতে হয়, সেরূপ অন্য কোনও পদার্থের সংসর্গ হইতে হয় না। কারণ যেমন করিয়া এই স্ত্রীলোকের স্মরণ করা যায়, সেই স্মরণই এই পুরুষের চিত্তে কাম উৎপাদন করে। যখন সেই স্ত্রীর স্মরণই এই পুরুষের কাম উদ্রেক করে, তখন সেই স্ত্রীর দর্শন হইতে এবং বাক্য হইতে এবং স্পর্শ হইতে এই পুরুষের চিত্তে কাম উৎপত্তি হইবে এ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে? সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার জন্য যে অধিকারী পুরুষ সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অধিকারী পুরুষ শরীর বাণী মন দ্বারা কখনও সেই স্ত্রীর সঙ্গ না করেন। যদি কখনও এই অধিকারী পুরুষ সংন্যাস আশ্রম ধারণ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গ করেন, তাহা হইলে যেরূপ অগ্নির সম্বন্ধ হইতে ঘৃত দ্রবীভূত হয়, সেইরূপ এই সংন্যাসীর চিত্তও আপনার ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়া দ্রবীভাব প্রাপ্ত হইবে; তদ্দ্বারা এই সংন্যাসী মোক্ষ মার্গ হইতে পতিত হইবেন। সুতরাং সংন্যাসীগণ সর্ব্ব প্রকারে স্ত্রীলোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। কিম্বা ইহলোকে প্রসিদ্ধ সর্পাদির বিষ, নিবৃত্তি করিবার জন্য যদ্যপি শাস্ত্র নানাপ্রকার উপায় কথন করিয়াছেন, তথাপি সেই স্ত্রীরূপ সর্পের বিষ নিবৃত্তি করিবার একই উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সেই উপায় এই:— শরীর দ্বারা সেই স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না, এবং মন দ্বারা সেই স্ত্রীর স্মরণ করিবে না, এবং বাগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণাদি করিবে না। এই প্রকার উপায় ব্যতিরেকে অন্য কোনও উপায় এই স্ত্রীরূপ সর্পের বিষ

নিবৃত্তি করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং আমি যাজ্ঞবল্ক্য সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিব। কারণ বাসনা বশতঃই জীবের জন্ম হইয়া থাকে। যেরূপ জাগ্রত অবস্থায় যে পদার্থে দৃঢ় বাসনা থাকিবে, সেই পদার্থ এই পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় দেখিবে,—সেইরূপ মৃত্যু সময়েও এই পুরুষের যেরূপ দৃঢ় বাসনা হইবে, সেই বাসনা অনুসারেই সেই পুরুষ অন্য শরীর প্রাপ্ত হইবে। আর সেই অন্য শরীরেও এই জীব পূর্ব্ব জন্মের কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি সংস্কাররূপ বাসনা অনুসারে পুনঃ কাম ক্রোধাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই কাম ক্রোধাদি সংস্কার রূপ বাসনা বশতঃ এই জীব পুনঃ জন্ম প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে জীব স্ত্রী প্রভৃতির সংসর্গ করিলে অনেক প্রকার জন্ম প্রাপ্ত হইবে। কিম্বা স্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গ দ্বারা এই পুরুষের চিত্তে কাম ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হয়। আর সেই কাম ক্রোধাদি বিকার প্রযুক্ত এই পুরুষের চিত্ত অশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়। আর সেই অশুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞান পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলেও, শিথিল হইয়া যায়। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মজ্ঞানও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলে যখন অশুদ্ধ চিত্ত শিথিল হইয়া যায়, তখন সেই অশুদ্ধ চিত্তে নবীন জ্ঞান উৎপত্তির কি আশা আছে? সুতরাং এই সিদ্ধ হইতেছে যে স্ত্রী পুত্রাদি পদার্থের সঙ্গ প্রযুক্ত এই পুরুষে কাম ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হয়। সেই কাম ক্রোধাদি বিকার দ্বারা এই পুরুষ ব্রহ্ম জ্ঞান হইতে এবং কর্ম্ম উপাসনারূপ দুই মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বারম্বার কীট পতঙ্গাদি শরীর প্রাপ্তিরূপ এবং নরক প্রাপ্তিরূপ তৃতীয় মার্গ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার স্ত্রী সঙ্গ হইতে পুরুষ কোটী কল্প পর্য্যন্ত নানা প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কিম্বা যেরূপ এই পুরুষ স্ত্রী সঙ্গ বশতঃ কামাদি উৎপত্তি দ্বারা অনেক জন্ম দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষয়াসক্ত কামী পুরুষের সঙ্গ হইতেও এই জীব সেই প্রকার দুঃখ পাইয়া থাকে। কারণ সেই বিষয়াসক্ত কামী পুরুষ সর্ব্বদা স্ত্রী সম্বন্ধীয় কামেরই বর্ণনা করে। সেই কামী পুরুষের বচন হইতে সেই পুরুষের অবশ্যই স্ত্রীকাম স্মরণ রূপ জ্ঞান হইবে, এবং সেই স্মরণ দ্বারা সেই স্ত্রীরূপ অগ্নি সেই পুরুষের চিত্তকে অবশ্য দগ্ধ করিবে। সেই দগ্ধ চিত্তে আত্মার বিচার হইতে পারে না।

হে শিষ্য! এই প্রকার স্ত্রী প্রভৃতি পদার্থের সঙ্গ বিষয় নানাপ্রকার দোষ বিচার করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি স্ত্রীপুত্র ধনাদি পদার্থের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্য মুনি অত্যন্ত কৃপালু। তিনি ভাবিলেন স্ত্রীদিগের সহিত বহুকাল

রক্ষিয়াছি। সুতরাং শাস্ত্রের রীতি অনুসারে এই স্ত্রীগণ আমার মিত্র স্বরূপ। সুতরাং এই স্ত্রীদিগের উপর আমার উপকার করা উচিত। কাত্যায়নীর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার নাই। সুতরাং উহার জীবনোপায়ের বন্দোবস্ত করিলেই হইবে। আর আমার মৈত্রেয়ী নামক যে অন্য স্ত্রী, সেই মৈত্রেয়ী সংসারের জন্ম মরণাদি দুঃখ দেখিয়া সর্ব্বদা শোকাতুরা থাকেন। এবং এই মৈত্রেয়ী সর্ব্বদা মোক্ষ অভিলাষ করেন। আর এই মৈত্রেয়ী যৌবন অবস্থাতেও কামাদি বিকার প্রাপ্ত হন নাই। এই মৈত্রেয়ীর নিজের শরীরের উপর, কিম্বা পতি পুত্রাদির উপর কিছুমাত্রও স্নেহ নাই। কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রীর পতিসেবা শাস্ত্রে লিখিত আছে এবং তাহাই পতিব্রতার স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এজন্য পতি সেবায় রত থাকেন। ধনাদিতেও ইনি অত্যন্ত নিস্পৃহ। সুতরাং এই মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী। সুতরাং এই মৈত্রেয়ীকে প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া পশ্চাৎ আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র, (৺কাশীধাম)।

মোক্ষ]

তোমায় ছাড়িয়ে।

তোমায় ছাড়িয়ে প্রভো!
পেয়েছি অনেক ব্যথা।
সকলি হেরেছ তুমি,
গাঁথিয়ে করম-গাথা॥
অশ্রু-জলে ভেসে ভেসে,
বিষাদে কেটেছে দিন।
শোকে দুঃখে পড়ে হায়!
পরাণ হয়েছে ক্ষীণ॥
অনুতাপ-দাবানল,
এ হৃদি করেছে ছাই।
এবে প্রভো! বুঝিলাম,
তোমা বিনে গতি নাই॥
দিয়েছিলে আশীর্ব্বাদ,
করেছি সম্ভোগ কত।
হাতে স্বর্গ দিয়েছিলে.
করে যত্ন নানা মত॥
উপেক্ষিয়ে মোহে হায়!
ফেলেছিনু সবি দূরে।
সংশয় নিরাশ মোরে,
করেছিল ভব ঘুরে॥
আবার দিয়েছ যদি,
কৃপা-হস্ত প্রসারিয়ে।
নিয়োনাকো পিতঃ! আর,
দীন সুতে ফাঁকি দিয়ে॥

ফেলিওনা মোহে কভু,
এই দাসে—অভাজনে।
বঞ্চিতে অধম সুতে,—
দীন সেবক-"রঞ্জনে"॥

শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

মোক্ষ]

অদৃশ্য।

কে তুমি আমার আড়ালে বাস কর্‌চ? তোমাকে চখে দেখ্‌তে পাচ্চিনা বটে, কিন্তু প্রাণে বেশ অনুভব কর্‌চি। কায়া দেখ্‌তে পাচ্চিনা, কিন্তু ছায়া তো লুকাতে পার্‌চ না। ওগো চতুর, কে তুমি? কে আমার সঙ্গে এরূপ রহস্য আরম্ভ করেছ? যখনি নীলাম্বরে অগণ্য নক্ষত্র চিক্‌মিক্ করে উঠে, চন্দ্রিমা কখন একটু মেঘের মাঝে লুকাইয়া থাকে—আবার হাসিতে হাসিতে তখনি বাহির হয়, সেও কি মেঘের সঙ্গে তোমার মত লুকোচুরি খেলে? অগণ্য নক্ষত্রের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় সে লুকায়? তুমিও তেমনি সমস্ত হৃদয়ের মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত হৃদয়কে ফাঁকি দিয়া বেশ বেড়াইয়া বেড়াইতেছ তো? সূর্য্যের প্রথমোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বগগন যখন সিন্দুররাগে রঞ্জিত হয়ে উঠে, সাগরের সুনীল জলরাশির বিক্ষোভিত তরঙ্গ হইতে কেমন একখানি অপূর্ব্ব ছবি ফুটিয়া উঠে—মনে হয় ঠিক এই ছবিখানিকে লইয়া কে যেন খেলা কর্‌চে। নব প্রভাতের আগমন বার্ত্তা জানাবার জন্য কিছু আগেই চঞ্চলা উষা নাচিতে নাচিতে হাঁসিতে হাঁসিতে কোন্ অন্ধকারের অদৃশ্য গৃহ হ'তে বাহির হইয়া আসিয়াছে;—তাহার সে হাঁসিতে কত যুথি, যাঁতি, মল্লিকা, মালতী, সেফালিকা ফুটিয়া উঠিল;—মৃদু গন্ধবহ তাহাদের গাত্র হইতে গন্ধ হরণ করিয়া উষার গাত্র বস্ত্রে মাখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল;—দিগাঙ্গনারা উষার সমস্ত গাত্রে কুসুম সুরভির সুবাস পাইয়া হাঁসিয়া উঠিল;—কুঞ্জবনে কোকিলেরা কাহার 'সাড়া' পাইয়া পঞ্চম সুরে গান ধরিয়া বসিল;—সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল! এ আনন্দ কার? এত প্রকাশ কার? কা'কে দেখে সকলের এত আনন্দ? এইবার তো ধরা পড়েছ। আর লুকিয়ে লুকিয়ে রং তামাসা করিলে চলিবে না! আচ্ছা তোমার একি আনন্দ! পটান্তরাল হ'তে একি তোমার কৌতুক? আমাকে রাজার সাজে সাজাও, কখন ভিখারীর বেশ পরাও, এ তোমার কি আমোদ! আমি এত ক্ষুদ্র তবুও আমার সঙ্গে

খেল্‌তে, তামাসা করতে তোমার সম্ভ্রমের কোন হানি হয় না? তবে কি তুমি প্রৌঢ়ও নয়, বিজ্ঞও নয়—একটি ছোট্ট ছেলের মত? তা বই কি! কতদিন ধরে দেখচি, কত কাল কেটে গেল তবু তোমার ছেলেমানুষি ঘুচিল কৈ? আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হ'লাম, বৃদ্ধ হ'লাম, আবার এই জীর্ণ হতে বসেছি—কে তুমি অপরূপ কিশোর—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী পুরুষ, গীতগন্ধ ভরা—আমার হৃদয়-কুঞ্জে বসিয়া বসিয়া কত সুরই ভাঁজিতেছ—কত খেলাই খেলিতেছ; ওগো তুমি কি তোমার খেলা কখন বন্ধ করিবে না?

আচ্ছা যদি এত খেল্‌তেই ভালবাস, এত আড়ালে আড়ালে থাক কেন! কখন সম্পূর্ণ অবয়বটা তোমার দেখ্‌তে পেলাম না। কখন পৃষ্ঠখানি, কখন লম্বিত বেণীটি, কখন হাতখানি, কখন মিষ্ট কণ্ঠ সুরটি, কখন পাদপদ্মের লাল আভাটুকু, কখন নয়ন কোণে হাঁসির রেখাটি, কখন বিদ্যুতের মত সুন্দর মুখশ্রীটি ফুটিয়া উঠে;—ফুটিয়া তুমি যে আছ এইটুকু বুঝাইয়া আবার অদৃশ্য গৃহে সরিয়া পড়। চক্ষু তোমাকে দেখ্‌বে বলে তাকিয়ে তাকিয়ে অন্ধ হয়ে গেল; কর্ণ তোমার কথা শুন্‌বার আশায় স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে করতে বধির হয়ে গেল; অঙ্গ তোমার পরশ লাগিয়া চিরজীবন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিবশ হইয়া গেল। হে চঞ্চল! হে দুরন্ত! তবু তো তুমি ধরা দিলে না?

ধরা দিবেই না, এই কি তোমার নিয়ম? আমি চিরদিন চখের জলে বক্ষ ভাসাইব, আর তুমি আড়ালে বসিয়া বাঁশী বাজাইবে, ইহাই কি খুব সঙ্গত! আমি যদি তোমার ধরা পাবার অযোগ্যই হই, তুমি যদি খুব বড়ই হও—অসীম অনন্তই হও, আর আমার মনোবুদ্ধির অগোচর হও তবে তোমার রূপ কেন প্রকাশ করলে? কেন তোমার জন্য মনের মধ্যে এত ব্যাকুলতা গেঁথে দিলে? আমি মনে করেছিলাম, তুমি সূর্য্যের চেয়েও কত বড়। কত সূর্য্য, আকাশের গায়ে নক্ষত্রের মত, তোমার মধ্যে ঝিকমিক্‌ করচে,—তুমি এতই বড়!! আর আমি—যে পৃথিবী সূর্য্যের কাছে একটি নগণ্য পদার্থ বল্লে হয়—আমি সেই পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম অংশে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র একটি জীব মাত্র, সমুদ্রধারে একটি বালুকা কণার মত; তুমি কি তা'র কিছু খবর রাখ? এই যে দেশের সম্রাট যিনি, তিনি তাঁর কটা প্রজাকেই চেনেন এবং তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখে তাঁর কি-ই বা আসিয়া যায়। আমি ভাব্‌তাম তুমিও ঠিক সেই রকম! তাতে এই একটু আনন্দ হতো যে তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে এক রকম ভালই হয়েছে; মনের যা খুসি তাই কর্'ব—কাহাকেও সমীহ করতে হবে না। তুমি

আপনার মহিমার মধ্যে বিরাজ করছ, আমি আপনার ক্ষুদ্রত্ব লইয়া এক কোণে পড়িয়া আছি। কিন্তু একি অদ্ভুত লীলা তোমার! আমি যে এত ক্ষুদ্র আর এই যে বালুকাকণা কত ক্ষুদ্রতম—তুমি কাহাকেও বাদ দাও নাই? সকলের সঙ্গেই সুপরিচিত হয়ে আছ! এত ক্ষুদ্রের নিকটেও আপনার পূর্ণতা লইয়া সর্ব্বদা বিরাজমান! দীন বলিয়া ঘৃণা কর নাই! এত ক্ষুদ্রকে লইয়াও সমানের মত ব্যবহার করিতেছ!—'সখা' বলিয়া ডাকিতেছ?

আমি ভাবতাম তুমি বিশ্ব জুড়ে অনন্ত অসীম হয়ে পড়ে আছ;—আমার মতন লোক ডাকলে কি আর তোমার সাড়া পাবে? হরি! হরি! এই যে না ডাকতেই এসে উপস্থিত! আমি পাশ কাটাতে চাই, আমি ছাড়তে চাই,—তুমি যে ছাড়চ না! একি তোমার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। আমি ভাবতাম আমার আবার তুমি খবর রাখছ? তা'তে একরকম নিশ্চিন্ত ছিলাম না যে তা নয়। এখন একি দেখ্‌চি, তুমি আমার সব খবর রাখ, আমার মনের—আমার ঘরের কোন কথাই জান্‌তে তোমার বাকী নাই! আচ্ছা এত বড় ছিলে—এত ছোট হয়ে এলে কি করে? অবশ্যই ছোট হয়েছ—তা না হলে আমার কাছে থাক কি করে? 'সর্ব্বের মধ্যে' না হয়ে 'সর্ব্বব্যাপী' যে তুমি—আবার এই শরীরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশে সেই বোধরূপে তুমি! ওহে আমার রসরাজ রসিক শেখর প্রেমময়—একি তোমার লীলা, নাথ? হাঁগো এই কি তোমার দয়া? আমি তোমার পানে তাকাবো না বল্লে কি হবে—তুমি যে ভুল্‌তে দাও না! আমি তোমার পানে তাকাবো না বল্লে কি হবে—তুমি যে আঁখির দৃষ্টিকে কেড়ে নাও? আচ্ছা এত নগণ্য এত ক্ষুদ্র আমি, আমাকে নিয়ে তোমার এ রহস্য কেন?

কি করে এ কথা প্রাণকে বুঝাব—কি করে এ কথা বিশ্বাস কর'ব, যে তুমি ও আমাকে চাও? কিন্তু এ যে প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি আমাকে তুমি এক মুহূর্ত্ত ছেড়ে নাই—আমার সমস্ত চিন্তা, কর্ম্ম, সবই তুমি জান—কিছুতেই তোমাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না!!

হে মায়াবী! একবার তোমার গাত্রবাস খানি উন্মোচন কর—মুখের ঘোমটা খানি সরাইয়া দাও—আমি তোমার নিরাবরণ মুখশ্রী জন্মের মত একবার দেখিয়া লই!

হে পাগল! আমার এ কথাটি শুনিবে তো? রক্ত-কমল-রাগ-রঞ্জিত তোমার পা দুখানির ছায়া আর একবার আমাকে দেখাবে কি? তেমনি করে

সখা! তোমার পরশমণি বাঁকা নয়নে আর একটীবার কি চাহিবে? আমার নয়ন ভুলানো, হৃদয় জুড়ানো, তোমার মোহন মূরতি আর কতকাল লুকাইয়া রাখিবে? একবার চকিতের মত এস,—একবার হৃদয়ে হৃদয় পরশ করিয়া—আপনাতে আপনি ভুলিয়া যাই!!

উন্মাদ

——

ধর্ম্ম]

বিদ্যাবিলাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অধ্যাপক সমাজে বিষম 'নিমাই-আতঙ্ক' জন্মিয়াছে। পড়াইতে পড়াইতে নিমায়ের নাম শুনিতেই তাঁহাদের বুদ্ধি আগুন হইয়া যায়, সুপঠিত বিদ্যা ভুল হইয়া যায়। কেবল পশার বজায় রাখিবার জন্য মুখে নিমায়ের নিন্দা করেন, কিন্তু সকলেই মনে মনে বলেন,—

এতাদৃশ পাণ্ডিত্য কি মনুষ্যের হয়।
প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নয়॥

উদ্ধত নিমায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে বেচারিদের পথ ঘাট একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্বপ্নেও কেহ আর নিমায়ের ছায়া মাড়ান না; কিন্তু কি মুস্কিল! নিমাই পণ্ডিত শিষ্যমণ্ডলী লইয়া ঐ ৺গঙ্গাতীরেই যে হানা দিয়া থাকেন। গঙ্গাস্নান না করিয়াও ত' উপায় নাই; অথচ গঙ্গাতীরে গেলেই নিমায়ের হাতে পড়িতে হইবে। আবার পণ্ডিতের চেহারা দেখিলেই ব্যঙ্গ স্বরে নিমাই বলিতে থাকেন, "কলিতে পণ্ডিতের ত' অভাব নাই, বড় বড় লেজটীরও অভাব নাই; যাঁহার সন্ধিমাত্র জ্ঞান নাই তিনিও একজন বিদ্যাবাগীশ।"

প্রভু কহে সন্ধিকার্য্য নাহিক যাহার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥
হেনজন দেখি ফাঁকি বলুক আমার।
তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী তাহার॥

এরূপ বাক্যবাণে পণ্ডিতেরা একে বারে জর জর হইয়া উঠিলেন। লজ্জিত পণ্ডিতগণের বিশেষ অন্তর্জ্বালা আরম্ভ হইল। তাঁহারা ভগ্নকটি সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ও বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন; সহস্র মুখে নিমাইয়ের নিন্দা করিতেছেন। কেহ বলিলেন নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য খুব গভীর নহে, তবে চতুরতা বুদ্ধি খুব প্রখর। অপর মাৎসর্য্যপূর্ণ পণ্ডিত বলিলেন, "বুদ্ধিই বা এমন কি বেশী—তা নয়, তবে উহার নিশ্চয় কোন সিদ্ধি জানা আছে; উহাতেই দেখিতেছি অন্যের বুদ্ধি জড় হইয়া যায়।" তৃতীয় তর্কবাগীশ বলিলেন, "সিদ্ধি অমনি মুখের কথা কিনা; ষোল বছরের ছেলে উহার আবার কি সিদ্ধি হইবে? সে সব কিছু নয়, তবে তোমরা জান না ছোট বেলা থেকে নিমাই 'দেবপুষ্ট' বটে, তাহাকে হারাইতে হইলে দেব শক্তির প্রয়োজন।" তিন চারিজন একেবারে শিখা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, সে সব আমরা কিছুই মানিনা, নিমাইকে বেশ বুঝা গিয়াছে উহার শাস্ত্র বিদ্যা সবই ফাঁকি, ফাঁকি বই তার আর কিছুই পুঁজি নাই; ঐ উপরের চটকুটা কোন রকমে ভেদ করতে পারলে দেখতে পাবে, নিমাই একেবারে গো রাখাল। তখন যুক্তি স্থির হইল একবার উহাকে সপ্তরথীতে ঘেরিতে হইবে, উহার সহিত একজনে লড়িয়া কিছু করা যাইবে না। গঙ্গাতীরে সতর্কিত ভাবে নিমাইকে আক্রমণ করা হইবে যুক্তি স্থির হইল।

নিমাই বিদ্যাসাগর।

পাঠক! অই দেখ তোমাদের নিমাই পণ্ডিত শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া সুরধুনী-সৈকতে চাঁদের বাজার মিলাইয়া বসিয়া আছেন। সে অপরূপ রূপ-মাধুরী দেখিয়া কবি শ্রীবৃন্দাবন দাস মহা বিপদে ঠেকিয়াছেন; কোন উপমা পাইতেছেন না, ছট্‌ফট্‌ও যাইতেছে না।

কোটিমুখে সেই শোভা না পারি কহিতে।
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥

প্রথমে চাঁদ মুখ দেখিয়াই গগণ চন্দ্রের কথা মনে উঠিল; কিন্তু তাহা সকলঙ্ক, আবার হ্রাস বৃদ্ধি আছে। তাঁহার গৌরচন্দ্র যে অকলঙ্ক নিত্য পূর্ণ। তারপরে অপরূপ রূপশ্রী দেখিয়াই কামদেবের কথা মনে হইল। তাহা ও একেবারেই বর্জ্জিত; সে নাম মনে হইলে চিত্তের বিকার জন্মে ভব বন্ধন বর্দ্ধিত হয়; আর গৌর হরিনামে চিত্তের প্রসাদ জন্মে সর্ব্বস্ব ক্ষয় হয়। শেষে গুণের কথা মনে খুব জাগিল, ভাবিলেন সাক্ষাৎ দেবগুরু বৃহস্পতি; কিন্তু তাহাও হইল না। তিনি যে পক্ষপাতির দোষে দুষ্ট, তিনি দেবের সহায়, দৈত্যের বিপক্ষ আমাদের নিমাই পণ্ডিত যে সবার সহায়, জগতের হিত-কর্ত্তা, জগদ্‌গুরু। ত্রিভুবন ঘুরিয়া অবশেষে বৃন্দাবন দাস শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া তবে নিবৃত্ত হইলেন; বলিলেন—

কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দ কুমার।
গোপ বৃন্দ মধ্যে বসি করেন বিহার॥

কিন্তু অন্য কবি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছেন,—

আমার গৌরাঙ্গের তুলনা গৌরাঙ্গে রহিল, অতুলন গৌর কিশোর। প্রচ্ছন্ন প্রভুর রূপে গঙ্গাতীর আলো করিয়া আছেন। কিন্তু নিমায়ের মুখে 'কৃষ্ণ বিষ্ণু' কিছুই নাই ; কেবল পাণ্ডিত্যের গরিমা বাহির হইতেছে,

আমা প্রবোধিতে পারে হেন শক্তি কার।

এ হেন অহঙ্কার বাক্য নবদ্বীপে কেহ কখন বলিতে পারেন নাই ; পারিবে বলিয়াও কেহ ভাবে নাই। এই গর্ব্ব-বাক্য পণ্ডিতদের মর্ম্মে বাণের ন্যায় বিঁধিতেছে। আজ বিদ্যাবাগীশেরা সব দল পাকাইয়া আসিয়াছেন, পথিমধ্যে অনেকেই খুব লম্ফ ঝম্ফ দিতেছিলেন ; এখন শ্রীমূর্ত্তি দেখিতেই সকলের মাথা হেট হইয়া আসিতেছে, আর সকলেই পিছাইতেছেন। কাঁচপোকা দেখিলে তেলাপোকার যেরূপ দুর্গতি হয়, পণ্ডিতদের তাহাই হইল।

হেন কে সাধ্বস জন্মে প্রভুকে দেখিয়া।
সবেই করেন ভকদিকে নম্র হৈয়া॥

সাহসে ভর করিয়া কোন রকমে তাঁহারা আসে পাশে বসিলেন ; কিন্তু প্রশ্ন করিবেন কি ? তাঁহারা বিভিন্ন শাস্ত্রের অগাধ পণ্ডিত নিমাইকে ঠকাইবার, জন্য বাছিয়া বাছিয়া, বেদ বেদান্ত, সাংখ্য পাতঞ্জল, কাব্য অলঙ্কার, হইতে যে সমস্ত কূট প্রশ্ন মুখে করিয়া আসিয়াছিলেন, নিমাই তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সেইগুলি লইয়া ভোজবাজি আরম্ভ করিয়াছেন ; শাস্ত্র-যুক্তি দিয়া একবার খণ্ডন করিতেছেন, আবার অন্যরকমে স্থাপনা করিতেছেন—

অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গাসমীপে বসিয়া॥
'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয়॥ ১৮ ভাঃ

দেখিয়া শুনিয়া বিদ্যাবাগীশের একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন ; না বুঝিতেই নিরস্ত্র—নির্জ্জিত ! তখন বোকা হইয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। ব্রজের হারুয়া রাখাল বালকের মত

"খেলায় হারিয়া তখন পলাইতে চায়"

একজন বলিলেন, 'কেমন দেখিলেত দেবজুষ্ট কি না ?

কেহ বলে "এত তেজ ব্রাহ্মণের নহে"। ২৮ ভাঃ

অন্য জন বলিতেছেন, "ঠিক বলেছ ভায়া ; বড় ! যে কেহ নয়, সাক্ষাৎ বিষ্ণু

"কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু অংশ হয়।" চৈ ভাঃ

অংশ ; যাঁহারা 'কেষ্ট বিষ্টু' মানেন না, তাঁহারা বলিলেন, 'শাস্ত্রে যে বিপ্র রাজা হইবার কথা আছে, নিশ্চয় সেই এই রাজ-চক্রবর্ত্তী পুরুষ।'

কেহ বলে বিপ্ররাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই, হেন বুঝি, কখনো না নড়ে॥

সর্ব্বশাস্ত্রে নিমায়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তৎসম্বন্ধে আর কোন মতভেদ রহিল না। একবাক্যে পণ্ডিতেরা সকলেই স্বীকার করিলেন নিমাই বিদ্যাসাগর। তাঁহাদের জ্ঞান গরিমা ঘুচিয়া গেল ; মন্ত্রমুগ্ধের মত, সাক্ষাৎ বৃহস্পতি জ্ঞানে, সকলে নিমায়ের চরণে বিলুণ্ঠিত হইলেন।

পরম পণ্ডিত জ্ঞান হইল সবার।
সবেই করেন তখন সম্ভ্রম অপার॥
পণ্ডিত দেখয়ে বৃহস্পতির সমান।
বৃদ্ধ আদি পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম॥

পড়ুয়ার ঝাঁকে এ সংবাদ পৌঁছিতেই পরদিনই সমগ্র নবদ্বীপ ছাইয়া পড়িল। নিমাই বিদ্যাসাগরের জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।

"জয় জয় অধ্যাপক শিরোরত্ন বিপ্ররাজ।" চৈ ভাঃ

নিমাই পণ্ডিতের বিদ্যার গরবে নদেবাসী সকলেই আনন্দিত। কেবল ভক্তবৃন্দের হরিষে বিষাদ। মহাদাম্ভিক, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ, পণ্ডিতগুলার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, ইহাতে আনন্দ ; কিন্তু নিমায়ের মুখেও ত' কৃষ্ণ নাম শুনেন নাই, তাহাই পরম বিষাদ। তা'ই তাঁহারা হর্ষে ও ক্ষোভে বলিলেন—

মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি।
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥
কেহে বল হেনরূপ হেন বিদ্যা যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ নাহি কোন উপকার॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিলেন, প্রচ্ছন্ন প্রভুর পতিতপাবন লীলার প্রথম অধ্যায় হইয়া গেল।

হেন মতে বিদ্যারসে শ্রীগৌরাঙ্গ নাথ।
বৈসেন সবার করি বিদ্যা-গর্ব্বপাত॥ চৈঃ ভাঃ

নবদ্বীপের বিপদ।

এই সময় নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজে আর এক মহা আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন নিমায়ের কাছে হারিলেও তবু নবদ্বীপের গৌরব নষ্ট হয় নাই; কিন্তু এইবার বুঝি তাহাও যায়। হাতী ঘোড়া, লোক লস্কর, লইয়া দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরী নবদ্বীপে আসিয়া থানা করিলেন। চারিদিকে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র, মহা শক্তিধর, কেহ বলিতেছে মহা তান্ত্রিক সিদ্ধ পুরুষ, মন্ত্রবলে সরস্বতীকে বশীভূত করিয়াছেন। তাঁহার ললাটের ফোঁটা দেখিলেই প্রতিদ্বন্দীর সব বুদ্ধি জড় হইয়া যায়। মৎস্য সমাজে বৃহদাকার মহাশৈল অতর্কিত ভাবে প্রবেশ করিলে, যেমন চারিদিকে হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি পড়িয়া যায়, নবদ্বীপের বিদ্বৎ-সমাজে পড়ুয়াদলের মধ্যে একটা ভয়ানক ছুটাছুটি ও বকাবকি পড়িয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মণ্ডলীর আহার নিদ্রা শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকের শিরঃপীড়া প্রবল হইয়াছে, অনেকের শূল বেদনা ঘন ঘন জাগাইতেছে, কাজেই পাঠ শেষ দিয়া তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। নবদ্বীপের অনাদিকালের অখণ্ড প্রতিপত্তি বুঝি এইবার ভাসিয়া গেল।

পরম সমৃদ্ধ অশ্ব গজযুক্ত হই।
সবা জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত সভায়।
মহা ধ্বনি উপজিল সর্ব্ব নদীয়ায়॥

এমন দিগ্‌গজ পণ্ডিত কেহ কখন দেখে নাই। নবদ্বীপের মধ্যখানে দিগ্বিজয়ীর তাম্বু পড়িয়াছে, তাহাতে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—

"দিগ্বিজয়ী আপনার প্রতিদ্বন্দী চায়।
নহে জয় পত্র মাগে পণ্ডিত সভায়"॥

জয়-ডঙ্কা অনবরত বাজিতেছে; আর নকিব ঐ বলিয়া অবিরাম ফুকরাই-তেছে। পথে ঘাটে বড় আর সে মহা দাম্ভিক পণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিবার যো নাই। পণ্ডিতেরা অনেকেই গঙ্গাস্নান ছাড়িয়াছেন; যে কেহ অভ্যাস দোষে বাহির হ'ন, তাঁহারাও অতি প্রত্যূষে—লোক সমাগমের পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ভিতরে ভিতরে বিদ্যাবাগীশেরা পরামর্শ সভা করিতেছেন, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাজাইয়া কত যুক্তি আঁটিতেছেন; কিন্তু কেহই সম্মুখীন হইতে স্বীকার

করিতেছেন না। যাঁহার মুখে স্বয়ং সরস্বতী বিরাজিতা, তাঁহার কাছে সাধ করিয়া অপমান হইতে কে যাইবে? পণ্ডিত মহলে মহা চিন্তা হইয়াছে।

সহস্র সহস্র মহা ভট্টাচার্য্য।
সবেই চিন্তেন মনে ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য॥
নবদ্বীপ দিগ্বিজয়ী যাইবে জিনিয়া।
সংসারেই অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিব শুনিয়া॥
যুঝিতে বা কার শক্তি আছে তার সনে।
সরস্বতী বক্তা যার জিহ্বায় আপনে॥
চতুর্দ্দিকে সবেই করেন কোলাহল।
বুঝি বাস্ত এই যত্ন যার বিদ্যাবল॥

গুরুতর বিপদে সমাগত দেখিয়া পণ্ডিত সকলের বুদ্ধি একবারে অগুলাইয়া গিয়াছে। তখন বৃদ্ধ ন্যায়বাগীশ মহাশয় শিখা সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "বৃদ্ধস্য বচনম্ গ্রাহ্যং বিপদকালেহ্যুপস্থিতে। ইহাপেক্ষা নবদ্বীপের আর বেশী বিপদ হইতে পারে না। এখন তোমরা এই বৃদ্ধের কথা শুন। আইস সকলে এই সময়ে বালক নিমাই পণ্ডিতের শরণাগত হই; নিমাই পণ্ডিতও বড় কম নহেন, মহা ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন। হয়তো তাহা হইতে এ যাত্রা নবদ্বীপের মুখ রক্ষা হইতে পারে, সবে চল তাঁহাকে ধরা যাউক।"

মার্জ্জিত বুদ্ধি তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন "উত্তম বুদ্ধি হইয়াছে, বাঘে সিংহে লড়াই হউক, যে হারে—সেই উত্তম"। তর্কবাগীশ মহাশয় সদ্য সদ্যই নিমাই পণ্ডিতের নিকট যারপর নাই লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সে অন্তঃর্জ্বালা এখনও যায় নাই। শেষে এই বুদ্ধি স্থির হইল নিমাই পণ্ডিত যেরূপ উদ্ধত, তাহাতে তাঁহার কাছে যাইয়া দরবার করিতে হইবে না, সকলে যেমন গা ঢাকা দিয়া আছেন, সেইরূপই থাকুন, দেখিবেন ২।১ দিন মধ্যেই সিংহ শার্দ্দূলে বেশ বাধিয়া যাইবে। বরং তলে তলে দিগ্বিজয়ীর কাছে সংবাদ পাঠান হউক যে নিমাই পণ্ডিতই নবদ্বীপের মাথা, তিনিই নবদ্বীপ-পুরন্দর, তাঁহাকে জয় করিলেই নবদ্বীপ জয় করা হইল। আর নিমায়ের কাণেও শিষ্যকে দিয়া দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কারের কথা অলঙ্কারে বলিয়া পাঠান হউক। শেষে এই বুদ্ধিই স্থিরীকৃত হইল। অনেকেই মনে মনে গৌরাঙ্গ শরণ লইলেন। বৃদ্ধ ন্যায়বাগীশ ত' মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিলেন, 'মা চণ্ডি! নিমাই পণ্ডিত হৈতে নবদ্বীপ যেন রক্ষা হয়।'

ঐশ্বর্য্য মদে গর্ব্বিত সুরপতি ইন্দ্র দেবরাজের হস্ত হইতে কিরূপে শ্রীবৃন্দাবন রক্ষা হইবে, সেই চিন্তায় ব্রজবাসীগণ যেমন শ্রীনন্দদুলালের শরণ লইয়াছিলেন, আজ নবদ্বীপ মহিমা রক্ষার চিন্তায় নদে বাসীরা সেইরূপ শচীর দুলালের শরণ লইলেন।

নবদ্বীপের পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে অই দিগ্বিজয়ীর কথা ভিন্ন আর কথা নাই। ঘরের কুলবধুরাও ঐ দিগ্বিজয়ীর কথা ও নদের পণ্ডিতের দুর্দ্দশার কথা লইয়া হাঁসাহাসি করিতেছেন।

"শুন ভাই সব এই কহি তত্ত্বকথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥

নদের পণ্ডিতেরা বড় বাড়াইয়াছিলেন, 'ধরা সরা জ্ঞান করিতেছিলেন;' সাধুভক্ত-ভক্তদের লাঞ্ছনা করিতে ছাড়েন নাই। ভগবান এত গর্ব্ব সইবেন কেন, আমাদের নিমাই পণ্ডিতের কাছে ত' প্রতিদিন যাহা হইবার হইতেছে, এইবার একেবারে দর্প চূর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের নামও ডুবিল। নবদ্বীপের চিরদিনের মহিমা যাইবে, ইহা কিন্তু সকলেরই মনে বাজিল। অনেকেই বলিলেন "দেখি মা মঙ্গলচণ্ডী কি করেন।" নিমাই পণ্ডিতের দিকে সকলেই আশা করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীবামাচরণ বসু।

কাম]

ভ্রান্তি।

মানবজীবনের বিচিত্র গতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভ্রমান্ধ মানব কি এক উদ্দাম বাসনায়, বিশ্বের অণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের অন্বেষণে ছুটিতেছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতে দুর গগন-গাত্র-বিরাজিত নক্ষত্রপুঞ্জও যেন তাহার প্রয়োজনের দ্রব্য। কি এক অতৃপ্তির তাড়নায় মানব যেন অস্থির; সারা বিশ্ব আলোড়ন করিয়াও সে যেন সুখ পায় না। একটির পর একটি করিয়া ভ্রান্তির ঘোরে সমস্ত পার্থিব দ্রব্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিসের অনুসন্ধানে সে যেন ছুটিয়া বেড়াইতে চায়। কে জানে, বিষয়ের পর বিষয়, সুখের উপর সুখ, আনন্দের পর আনন্দ ভোগ করিয়াও কেন মানবের ব্যাকুল-চিত্ত তৃপ্ত হইতে চাহে না? দুঃখময় পদার্থকে জানিয়া শুনিয়াও সে কেন দুঃখকে

আলিঙ্গন করিয়া দুঃখের চক্রে নিষ্পেষিত হয়? সংসার জলধির শ্রবণ বিদারী রোমাঞ্চকারী ভয়াবহ কল্লোল শুনিয়াও সে কেন কুলুকুলুনাদিনী নির্ঝরিণী পার্শ্বে শ্যাম শোভা সম্পন্ন তপোবনে,—শান্তির নিভৃত আলয়ে, শান্তি সাধনায় নিরত থাকিতে চাহে না? চাহিলেও কেন কোন গুপ্ত বাসনা ধীরে ধীরে তাহাকে সংসার সাগরের মোহাবর্ত্তে ফেলিয়া দেয়! জীবন সংগ্রামের নিত্য নব ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয় যখন অস্থির হইয়া পড়ে, সংসার দাবানলের জ্বালাময়ী অগ্নিশিখায় সে যখন নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে; প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যাথায় যখন শোকার্ত্ত হইয়া সংসার-গণ্ডীর বাহিরে পালাইয়া যায়;—সংসারকে কারাগার মনে করিয়া সে যখন কারামুক্তির আশায় ভক্তি-পরিপ্লুত বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে প্রেমময় বিধাতার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যোগাসনে সমাসীন হয়, তখন কে আবার তাহার যোগবিঘ্ন ঘটাইয়া তাহাকে সংসার-জলধির বাসনা তরঙ্গে ফেলিয়া দেয়? অহরহঃ বিষয় বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও, সে কেন আবার বিষয়ের মধ্যে সুখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়? মানব চাহে কি? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত সহজ হইলেও, মানবের অপ্রবুদ্ধ কামনা-বাসনা কলুষিত মন ভ্রান্তির নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া, কামনা-বাসনার অতীত প্রদেশে, তাহার চিরবাঞ্ছিতের সন্ধানে, সেই সত্য-স্বরূপের চিরমঙ্গল রাজ্যের দ্বারদেশে যাইতে সমর্থ নহে। যাইবে কেমনে? ভ্রান্তি-অমানিশার ঘনান্ধকারে কখনও সেই দুর্গম পথে গমন করা যায় না। ভ্রান্ত মানব চায় ভ্রান্তির মধ্য দিয়া সেই অভ্রান্তকে খুঁজিতে। তাই বুঝি তাহার অভ্রান্ত স্বরূপকে ভ্রান্তির আবরণে আচ্ছাদন করিয়া, স্ব স্বরূপ ভুলিয়া, কাহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়! সুখের জন্য ব্যাকুল হইয়া সুখ ভ্রমে দুঃখকে আলিঙ্গন করিয়া, ক্রন্দনের উচ্চরোলে বিশ্ব-বিমোহনের মনোমোহন সঙ্গীত শুনিতে পায় না। উপযুক্ত পথ প্রদর্শকের দ্বারা চালিত না হইয়া, স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল আকর্ষণে স্বতঃই আকৃষ্ট হয়, এবং সহজ-সুযোগ্য পন্থাকে দুরারোহ করিয়া তুলে। সুপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপথে গমন করে, এবং নিবিড় বনানীর কণ্টকাকীর্ণ পথে উপস্থিত হইয়া ক্ষতবিক্ষত হয়। বিশ্বপিতার কাছে কি চাহিতে কি চাহিয়া বসে। অদূরদর্শী বালক যেমন যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই পিতার নিকট চায়, আবার পরক্ষণেই তাহা ফেলিয়া দিয়া অন্য দ্রব্যের 'বায়না' ধরিয়া বসে, আমরাও তদ্রূপ খেয়ালী; ভ্রান্ত বুদ্ধির ফলে কি চাহিতে কি চাহিয়া বসিতেছি। অভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি না করিয়া, ধীর প্রশান্তভাবে না বুঝিয়া, বিচার করিয়া না দেখিয়া, মানবের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অন্তরালে যে তিমিরাতীত শুদ্ধ জ্ঞানময় মহান্ পুরুষ আছেন, শ্রুতি

যাঁহাকে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" বলিয়া বর্ণণা করিয়াছেন, যাঁহাকে জানিলে জীব মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার লাভ করে,—সেই ধ্রুব বস্তুকে হৃদয়ে অনুভব করিতে না চাহিয়া হয়ত চাহিয়া বসিলাম,—

"পত্নীং মনোরময়ং দেহি মনোবৃত্ত্যানুসারিণীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি॥" (চণ্ডী)

আমরা ভ্রান্তির ঘোরে যাহা আপাততঃ সুখকর তাহাই চাহি। সংসারে আমাদের প্রকৃত কিসের অভাব, আমরা তাহা জানিনা; বোধহয় জানিবার শক্তিও আমাদের নাই। অবিদ্যার ঘনান্ধকারে আমরা দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে পারি না; কেবল বর্ত্তমান জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমাদের বর্ত্তমান জীবনের লক্ষ্য কয়েকটী সাধারণ বিষয় লইয়াই আবদ্ধ আছে। আমরা (সাধারণ মানব) এই কয়েকটী বিষয় বেশ যত্নে পালন করিয়া আসিতেছি। জগতের যে সব উচ্চ মহান্ আদর্শ আছে, যাহা লইয়া মানবের মানবত্ব, আমরা সে বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য করি না। আমাদের জীবনের লক্ষ্য—অর্থোপার্জ্জন, পুত্রোৎপাদন, সুখ-সাচ্ছন্দ্যে দু'দিন 'হাই তুলিয়া' 'তুড়ি দিয়া' কাটান। তারপর একদিন অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু আসিয়া আমাদের জীবনের যবনিকা পাত করে। এই যেন আমাদের জীবন—এই যেন আমাদের জীবনের কার্য্য খেলা। আমাদের চিন্তা মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থা লইয়া; মৃত্যুর পরবস্থা আমাদের চিন্তনীয় নহে। কেননা জীবনের শেষ চিত্র মানবের নয়নে আদৌ সুখকর নহে; তাহা যেন স্বতঃই দুঃখকর, বিষাদময়। তাই সুখৈষী মানব, জীবনে যেখানে দুঃখ, সেখানে বিষাদ, তাহার চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া, জীবনে যেখানে সুখ, যেখানে আনন্দ, সেইখানে চিন্তায় মগ্ন থাকিতে চায়। জীবনে কিসে সুখ, কিসে দুঃখ, তাহা বিচার করিবার সামর্থ্য থাকিলেও, ভাল করিয়া না দেখিয়া অনন্ত দুঃখের মধ্যে এক কণিকা সুখের অন্বেষণে ঘুরিয়া যায়। ভ্রমান্ধ মানব সুখের জন্য এমনই লালায়িত; যে আপাততঃ তুচ্ছ সুখের কামনায় সে ব্যস্ত থাকে; সংসারে যে ভূমা সুখ আছে, তাহার সাধনায় মুহূর্ত্তকালও নিরত থাকিতে চাহেনা। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের করুণায় এমনই অনন্ত প্রস্রবন, যে যেরূপেই হউক, আমরা একান্ত মনে যখন যাহা চাই, তাহাই তিনি পূরণ করিয়া দেন। তাঁহাদের সেই সদা মুক্তহস্ত প্রাণিতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সদাই উত্তোলিত থাকে। সিদ্ধিদাতার সিদ্ধি দানেই কার্য্য। যাহার যে বিষয়ে যেমন সাধনা, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তাই বুঝি মহাশক্তির নিকট ঘোর স্বার্থপর দস্যু তস্করের অভীষ্ট সিদ্ধির সাধনাও সিদ্ধিদায়িনী হইয়া থাকে। না হইবে কেন? ঋষিও বলিয়াছেন,—

"সাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"॥

মানব যখন যে বিষয় লাভের জন্য দৃঢ়ভাবে চিন্তা করিবে, তখন তাহাই তাহার করায়ত্ত হইবে; ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের চিন্তা সমষ্টি সাধারণতঃ বহির্মুখী; চিত্তের বহির্মুখতা অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তির ফল। জ্ঞান চিত্তকে অন্তর্মুখী করিয়া একাগ্রতা আনয়ন করে, এবং সত্য বস্তুর সন্ধান বলিয়া দেয়। আমরা অবিদ্যাগ্রস্ত মানব, তাই আমাদের চিত্তের অস্থিরতা বশতঃ আমাদের কাম্য খুঁজিয়া পাই নাই; শুধুই এক জ্বালাময়ী লালসার তাড়নে তাড়িত হইয়া অনিত্য অসার পদার্থে——একবার ধনে, একবার মানে, একবার বিষয়ের মধ্যে, কখনও বা নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের মধ্যে আমাদের সেই কাম্য পদার্থটীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। ভ্রান্তির ঘোরে জগৎ সংসার আলোড়ন করিয়া বিফল মনোরথ হইতেছি, কিন্তু কোথাও আমাদের আশা মিটিতেছেনা। আমাদের ব্যাকুল প্রাণের আকুল পিপাসা মিটাইবার জন্য যেখানেই পিপাসার অমৃত বারির সন্ধানে ছুটিয়া যাই, সেইখানেই নিরাশা ও নিস্ফলতা পদে পদে ব্যথিত করে।

ভ্রান্তির নিয়মই এই। যতদিন আমরা ভ্রান্তির বজ্র-দৃঢ় প্রাচীর উলঙ্ঘন করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের সফলতা বহু দূরে। ভ্রান্তির অন্ধকারে আমরা জগতের সত্য বস্তু দেখিতে পাই না; সর্ব্বত্রই যেন এক মায়ার আবরণ সত্যের স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া বিভিন্ন রূপ দেখাইতেছে। মায়া মরীচিকার এই দুর্ভেদ্য রহস্য জাল ছিন্ন করা সাধারণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই যে বিবিধ বিচিত্রময়ী বিরাট বিশাল জগৎ আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, কে বলিতে পারে যে ইহাই ইহার প্রকৃত স্বরূপ? এই জগৎ সংসার যখন অবিদ্যা সম্ভূত; "আমি" "আমার" জ্ঞান যখন অবিদ্যাভূত, তখন জগতের বস্তু সকলের জ্ঞানও যে মিথ্যা নহে, তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? আমরা একদেশদর্শি যুক্তির আশ্রয়ে আজ যাহাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছি, কাল আবার তাহাই বিভিন্ন তার্কিকের যুক্তিতে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। একদল দার্শনিকের মত, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদের মনেরই বিভিন্ন অনুভূতি মাত্র; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কোন বাস্তব সত্ত্বা নাই। আর একদল বলিতেছেন, "তুমি এই পরিদৃশ্যমান জগতের বুকের

উপর দাঁড়াইয়া, জাগতিক ভাষা বুদ্ধির সাহায্যে এই জগতের সত্তা উড়াইয়া দিতে চাও, ইহা ত' কম সাহসের কথা নহে। এই জগতের কোন সত্তা নাই, এরূপ ধারণা বাতুলতা মাত্র। বাস্তবিক এই জগতের বাস্তব সত্তা আছে।" আমরা সর্ব্বত্রই দুইটী বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাই; প্রত্যেক দলের মত পরস্পর বিবদমান। কিন্তু যেখানে দ্বৈত, যেখানে ভেদ, যেখানে বিবাদ, সেইখানেই ভ্রান্তি বর্ত্তমান। মানবের ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে জাত জ্ঞানই ভ্রম-প্রমাদ সঙ্কুল হইবার কথা। ভ্রম কি? কোনও বস্তুর অসম্যক্ দর্শন, বা এক-বস্তুকে অন্যরূপ দর্শনই, ভ্রম। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানবের মধ্যে এই দোষ নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং অবিদ্যাগ্রস্ত মানব জগতের নির্ণীত তত্ত্ব যে অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপ্রমাদ সঙ্কুল হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সাধারণ স্বল্প শক্তিসম্পন্ন অল্পজ্ঞ মানবের বহু উচ্চে যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞানবিৎ মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের বিচার বুদ্ধি ও অনুভূতি বিভিন্নমুখী। তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সর্ব্বত্র এক হইলেও, একজন আর একজনের ভ্রম নিরসনে ব্যস্ত! ইহার কারণ কি? দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিদিগের মত বিরোধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া মাদৃশ সামান্য ব্যক্তির ক্ষমতাতীত। যাঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও অনুভূতি অভ্রান্ত, সেই ঈশ্বরকল্প ঋষিদিগের মত ও পথ ভিন্ন কেন, এই প্রশ্ন অনেক সময়ে অনেক ব্যক্তির মনে সংশয়ের সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় এই মত-বিরোধের কারণ নির্দ্দেশ হয় নাই; হইবে কি না জানি না।

আমরা সাধারণ জ্ঞানে দেখিতে পাই, একই বস্তুর বিভিন্ন মূর্ত্তি দর্শন অবিদ্যা বা ভ্রান্তির প্রভাব ছাড়া আর কি হইতে পারে? যাহা সত্য, তাহা নিত্য সত্য; সত্য কখন একবার সত্য ও একবার মিথ্যা হইতে পারে না। যদি কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রষ্টা কর্ত্তৃক একই বস্তু বিভিন্ন মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বস্তুর অযাথার্থ্য প্রতিপন্ন না হইয়া দ্রষ্টার ভ্রান্তির কারণ নির্দ্দেশই সমীচীন। কোথায় সে অবিদ্যা বা ভ্রান্তির শেষ তাহা কে জানে? মানব জ্ঞান বলে ভ্রান্তির আবরণ ভেদ করিয়া জগতের অনেক তত্ত্ব অবগত হইতে পারে, কিন্তু তত্রাচ শতশত তত্ত্ব মানব জ্ঞানের অতীত রহিয়া যাইবে। কবিবর নবীনচন্দ্র এই কথা ভগবান বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ দিয়া বলিয়াছেন;—

প্রচ্ছন্ন যে মহাতত্ত্ব মানব নয়ন
দেখিবে না। আবরণ পর আবরণ

মানবের জ্ঞানবলে হবে উত্তোলিত;
রবে তবু আবরণ পর আবরণ।

তাই বলিতেছিলাম এই মায়াময় জগৎ প্রপঞ্চের অবিদ্যা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে এবং স্ব-স্বরূপ দেখিয়া মুক্ত হয়। কিন্তু এই অবিদ্যার নাশ করা বড় সহজ নহে। অগণিত পুস্তকরাশি পাঠ করিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইতে অবিদ্যার নাশ হয় না। কোটী কোটী জন্মের সাধনবলে ভাগ্যোদয় হইলে, সদ্‌গুরু কৃপায় অবিদ্যাপাশ ছিন্ন করিবার পন্থা মিলিয়া থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তিলাভ হয়। জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। "জ্ঞানাৎমুক্তি" (সাংখ্যসূত্র)।

মোক্ষলাভ করিতে হইলে ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য সদ্‌গুরুর কৃপাকণা লাভ করিতে রীতিমত সাধনার প্রয়োজন। গুরুই একমাত্র তিমিরান্ধকে জ্ঞানাঞ্জন-রূপ শলাকা দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিতে পারেন;—অন্যে নহে। সাধন মার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে, যখন প্রকৃত দীক্ষার কাল আইসে, সেই সময়ে গুরুদেব আপনা হইতেই দর্শন দিয়া থাকেন। মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তি অবশ্য সাধনার দ্বারা আপনাকে দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করিবেন। সাধনার নানা স্তর আছে। বিষয়লোলুপ মানবকে প্রথমতঃ বিষয়ের চিন্তা হইতে দূরে থাকা প্রয়োজন; তজ্জন্য তাঁহার অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। "তপস্যা, অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। "তপস্যা, অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ এবং ঈশ্বরে সমুদায় কর্ম্মফল সমর্পণ করাকে ক্রিয়াযোগ কহে।"—তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ—(পাতঞ্জল যোগসূত্র)। অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ সাধনার প্রথম অবস্থা বটে; কিন্তু ইহা প্রকৃত সাধনা নহে। তবে এই অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠের ফলে মনকে আকর্ষণ করিয়া সাধনার পথেই লইয়া যায়। আজকালকার দিনে অনেকেই দুই চার খানি অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়া সাধক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সাধক বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সাধন সৌধের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে হইলে যম, নিয়ম আসন' ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার প্রভৃতি যে সকল যোগাঙ্গ পালনের নিয়ম আছে, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আর এই সকল যোগাঙ্গ পালন করিতে করিতে জ্ঞান প্রদীপ্ত হইয়া উঠে; এই সকল জ্ঞানলাভের সোপান পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ণজ্ঞান লাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সত্য বটে শাস্ত্র অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ; কিন্তু সে সব শাস্ত্রের

গূঢ় মর্ম্ম যোগী-সন্নাসী ব্যতীত কেহই অবগত হইতে সমর্থ নহেন। তবে ইহাও অতীত প্রদেশে না যাইলে—অবিদ্যা পাশ ছিন্ন না করিলে, জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হয় না—ভ্রান্তির আচরণ উত্তোলিত হয় না, বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েই বিসংবাদী। বিদ্যা দ্বারা মায়াভ্রান্তি দূর করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হয়; আর অবিদ্যা জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়া ভ্রান্তি মোহের পথে লইয়া যায় বিদ্যা তাহাই, যাহা অবিদ্যাকে দূর করিয়া সেই শুদ্ধ জ্ঞানময় অক্ষর পুরুষকে ধরাইয়া—চিনাইয়া দেয়। অবিদ্যা কাহাকে বলে? যোগদর্শনের পিতাস্বরূপ ভগবান পতঞ্জলি বলেন;—

"অনিত্যাশুচি দুঃখ নাত মাস্থ নিত্যশুচি সুখাতম খ্যাতির বিদ্যা॥" ৫॥

"অনিত্য, অপবিত্র, দুঃখকর ও আত্মা ভিন্ন পদার্থে যে নিত্য শুচি, সুখকর ও আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে অবিদ্যা বলে।" এই অবিদ্যা প্রভাবে জীব জগতের নিত্য বস্তু দেখিতে পায় না। শুক্তিতে রজত ভ্রমের ন্যায়, সর্পে রজ্জু-ভ্রমের ন্যায়, এক বস্তুতে অন্যরূপ দেখিয়া থাকে। অবিদ্যা বা ভ্রান্তির বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ করাই আমাদের জীবনের প্রধান কার্য্য। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য সে নিত্যশাস্ত্র পাঠে বিপুল শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে, এবং বিশ্বাসী ভক্ত পাঠকের মনে নিত্য নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়। আধ্যাত্ম শাস্ত্রে মন্ত্র-বিন্যাসের এবং মন্ত্রের এমন অদ্ভুত শক্তি আছে যে, তদ্দ্বারা শাস্ত্রের সম্যক অর্থাব-গতি না হইলেও, কেবল নিত্য পাঠের ফলে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে ক্রমে শান্তির পথে লইয়া যায়। কিন্তু কোন ও উন্নতিশীল সাধক, কেবল মাত্র শাস্ত্র পাঠ অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন না। শাস্ত্রে, অতিরিক্ত শাস্ত্র-পাঠকেও সাধন মার্গের বিঘ্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু শাস্ত্রপাঠে জ্ঞানের দ্বার সম্যক্ উদ্‌ঘাটিত হয় না, তৎসহ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। "শাস্ত্রাণ্যধিত্যাপি ভবন্তি মূর্খা"—শাস্ত্রপাঠ করিলেও মূর্খ জ্ঞানী হয় না। "যস্তু ক্রিয়াবান পুরুষঃ স বিদ্বান"—যিনি ক্রিয়াবান তিনিই পণ্ডিত।

অবিদ্যা দূর করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে হইলে কেবল মাত্র জ্ঞানের সাধনই যথেষ্ট নহে; কেবল মাত্র জ্ঞানালোচনায় মোক্ষ লাভ হয় না। কর্ম্মের ভিতর দিয়া জ্ঞান লাভ করিতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র কর্ম্মও অনুষ্ঠেয় নহে; কেননা নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম, জ্ঞান পথের বিরোধী। অতএব মোক্ষেচ্ছু সাধক, জ্ঞান ও কর্ম্মকেও একত্রে অনুষ্ঠেয় জানিয়া উভয়ের অনুষ্ঠান করিবেন। এ সম্বন্ধে ঈশোপানিষৎ বলিয়াছেন;——

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥"

(জ্ঞান ও কর্ম্ম ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠেয় জানিয়াও) যাহারা (কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জ্ঞানদ্বারা) মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করে, তাহারা (চিত্ত শুদ্ধির অভাবে) গাঢ় তামস লোকে গমন করে। আবার যাহারা (জ্ঞান ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কর্ম্ম দ্বারা) ভোগের নিমিত্ত যত্ন করে, তাহারা (তত্ত্ব জ্ঞানের অভাবে) তদপেক্ষা গাঢ় তামস লোকে গমন করে। (৺শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয়ের অনুবাদ)। কর্ম্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞানের উন্মেষ হয়। চিত্ত শুদ্ধি না হইলে কখন সত্যলাভ হয় না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রযত্নে চিত্ত শুদ্ধির প্রয়োজন। চিত্ত শুদ্ধির কি?—বাসনার ক্ষয়। কামনা যুক্ত মন অশুদ্ধ, এবং কাম-মুক্ত মন শুদ্ধ। 'অশুদ্ধং কামঃ সঙ্কল্পং শুদ্ধং কাম বিবর্জ্জিতম্।" অতএব বাসনার ক্ষয়ই চিত্তশুদ্ধির উপায়। যতদিন ষড় রিপুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করা না যাইবে, ততদিন চিত্ত শুদ্ধ হইবে না, সংসার বন্ধনও মোচন হইবে না। কামিনী-বাসনা পরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে কখন সত্যের স্নিগ্ধালোক জ্বলিতে পায় না। ঐ শুনুন সন্ন্যাসী গাহিতেছেন,—

পশিতে পারেনা কভু তথা সত্য,
কাম লোভ বশে যেই হৃদি মত্ত;
কামিনীতে করে স্ত্রীবুদ্ধি যে জন,
হয় না তাহার বন্ধন মোচন;
কিম্বা কিছু দ্রব্যে যার অধিকার
হউক সামান্য—বন্ধন অপার
ক্রোধের শৃঙ্খল কিম্বা পায়ে যার,
হইতে না পারে কভু মায়া পার।"

মায়াই অবিদ্যা বা ভ্রান্তি। এই মায়া মরীচিকাই আমাদিগকে অহরহঃ প্রলুব্ধ করিতেছে। মায়াই আমাদিগের বন্ধনের কারণ। অতএব আমাদিগকে ধীরে ধীরে সংসারের সকল প্রকার বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। সংসার আসক্তি বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। সংসার আসক্তি বাসনা হইতেই জন্ম গ্রহণ করে। আবার বাসনার উৎপত্তি রিপুর উত্তেজনা হইতে; সুতরাং মায়া পার হইতে হইলে, ভ্রান্তি দূর করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রকারে রিপুগণকে দমন করা প্রয়োজন।

সংসারে যত কঠিন কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে রিপুনিচয়কে দমন করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। দুর্দ্দমনীয় রিপুগণকে দমন করিবার একমাত্র উপায় প্রত্যাহার। প্রত্যাহার কাহাকে বলে ? ভগবান পতঞ্জলি বলেন—"স্ব স্ব বিষয়াসমপ্রয়োগে চিত্তস্ব-স্বরূপানুকার ইতিন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহার" অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে প্রত্যাহার বলে। প্রত্যাহার হইতেই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া থাকে। "ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়ানাম্"—(যোগসূত্র ৫৫) ইন্দ্রিয়গণ জিত হইলেই আমাদের মনোজয় হইল। মনোজয় হইলে এ জগতে আমাদের আর অসাধ্য রহিল কি? আমাদের শোক, দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, মায়ামোহ —সকলই মনের মন লইয়াই আমাদের শোক, দুঃখ, হর্ষ বিষাদ ; মনই আমাদের বন্ধন ও মোক্ষ কারণ। যথা :—

"মন এবং মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম ॥" (ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ)

"মনই মানবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের এবং বিষয়ে অনাসক্ত মন মোক্ষের কারণ।

একমাত্র অনাসক্তিই যখন মানবের মোক্ষের কারণ, তখন এই নশ্বর সংসারে ক্ষণভঙ্গুর মানব জীবনে এত আসক্তি কেন ? অনেকেই জানেন, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ, আসক্তিতে দুঃখ। তবে কেন ত্যাগ না আসিয়া আসক্তি মানবকে বন্ধন করে ? সকলেই বাল্যকাল হইতে উপদেশ পাইয়া আসিতেছেন, "চুরি করিও না, মিথ্যা বলিও না, সদা সত্য কথা বলিবে, কখন ও কাহাকে কুবাক্য বলিও না, কুবাক্য বলা বড় দোষ" ইত্যাদি কিন্তু কয়টী লোক লোক এই উপদেশ পালন করিয়া আসিতেছে ? সকলেই অল্পবিস্তার ধর্ম্ম জানেন, কিন্তু কদাপি কাহারও তাহাতে মতি হয়। সকলেই জানেন অধর্ম্মে কখন মঙ্গল হয় না ; উহাতে নাশ অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু কয়টী লোক ঐ পথ হইতে নিবৃত্ত হয় ? মানব সব জানে, বুঝে, অথচ সে কুপথ ছাড়িয়া সুপথে যাইতে পারে না। উপদেশের অভাবে সংসারের খুব কম লোকেরই অধঃপতন হইয়া থাকে। এমন কি যিনি উপদেষ্টা, যাঁহার নীতিপূর্ণ উপদেশ সংসারের অনেক উপকার করিয়াছে, সেই সকল নীতি হয়ত তাঁহার চরিত্রের একা কোনও উন্নতি করিতে পারে নাই। আমরা সব জানি, অথচ কিছুই জানি না ; সব বুঝি অথচ কিছুই বুঝি না। উপদেশ দিলে বেশ বুঝিতে পারি, পালন করিবার সময় কিছুই পালন করিতে পারি না। ইহা কি ? ইহা আর কি ? ইহা সেই ভ্রান্তি—মহামায়ায় মায়া। যেমন বিকারগ্রস্ত

রোগীর অন্তরে জ্ঞান থাকে, বাহিরে কিছু বলিতে গেলেই নানা গোলমাল করিয়া ফেলে,—পিতাকে ভ্রাতা বলিয়া আত্মীয় স্বজনের ভীতি উৎপাদন করে, আমরাও তদ্রূপ সসার কিছু কিছু তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেও এক পথ ধরিতে যাইয়া আর এক পথ ধরিয়া বসি ;—ভাল করিতে যাইয়া মন্দ করিয়া ফেলি। মায়ার ঘোর কাটাইব মনে করিলেও কাটাইতে পারি না। এই মায়া যেন আমাদিগকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মায়ামুক্তির শতসহস্র পথ থাকিলেও, সেই মহামায়ার করুণা বিনা এই মায়া বা ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার পাইব না। তাঁহাকে জানিতে না পারিলে তাঁহার মায়া হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে না। ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন ;—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে" ॥

"অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দুস্তরা আমার যে মায়া, সে সকল ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় করে, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।' সুতরাং আমাদিগকে মায়ামুক্তি হইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই আশ্রয় না করিলে, তাঁহার করুণা না হইলে আমরা কোন মতে এই ভ্রান্তির বন্ধন হইতে উদ্ধার পাইব না। তাঁহাকে আশ্রয় করিতে হইবে—জানিতে হইবে, নচেৎ আমাদের ভ্রান্তি দূর হইবে না। কিন্তু আমরা বাসনাপর, ইন্দ্রিয়সুখে পরিতৃপ্ত, আমরা সেই সত্যকে নীহারাবৃত করিয়া রাখিয়াছি, আমরা তাঁহাকে জানিব কি প্রকারে ? তাঁহাকে জানিবার অনেক প্রকৃষ্ট উপায় আছে—থাকুক ! আমরা একমাত্র তাঁহার প্রসাদেই তাঁহাকে জানিয়া ভ্রান্তির আচরণ হইতে উদ্ধার পাইতেও পারি, অন্ত প্রকারে নহে। তিনি প্রকাশই হউন বা অপ্রকাশই তাঁহার প্রসাদ ভিন্ন অপর কোনরূপে তাঁহাকে জানা যায় না।

কথংনু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি ন ভাতি বা। (কঠ ২।২।১৪)।

আমি কি করিতে কি করিতেছি, জানি না। ভ্রান্তির আঁধারে স্বখাদ-সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল, মোহ-তিমিরে আচ্ছন্ন, চিন্তায় লক্ষ্যহীন। তাই দেব, বড় কৃপাপ্রার্থী, তুমি না উদ্ধারিলে, ভ্রান্তি আঁধার না ঘুচাইলে কে ঘুচাইবে ? কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

"চিন্তা-স্রোতে ভেসে ভেসে হইয়াছি লক্ষ্যহীন,
কি করিতে পারি আর, আমি যে দীনের দীন,

হৃদয়-মন্দির মম হইয়াছে অন্ধকার,
জ্যোতির্ম্ময় বিনা বল ঘুচাইবে কে আঁধার"।

শ্রীহৃদয়নাথ মিত্র।

হরিদ্বার।

পঞ্চতীর্থ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৫। কনখল।—তীর্থোৎপত্তি প্রসঙ্গে কনখলের কথা লিখিয়াছি। এখানেই দক্ষেশ্বর মহাদেব ও সতীকুণ্ড বিরাজমান। পাণ্ডারা বলেন কনখলেই দক্ষ-যজ্ঞ হইয়াছিল। আমরা পৌরাণিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, "যজ্ঞক্ষেত্র দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত" ছিল। কনখল তাহার মধ্যে কেন্দ্রস্থল, এখানেই "সতীর দেহত্যাগ" স্থান—সতীকুণ্ড বিরাজমান। সুতরাং কনখল যে হিন্দুর চক্ষে পবিত্রতম তীর্থ তাহাতে সন্দেহ কি? ইহার প্রত্যেক ধূলি কণা, হিন্দুর চক্ষে মণিমাণিক্য অপেক্ষা মূল্যবান; কারণ তাহা সতীদেহের সংস্রবে পবিত্রীকৃত। স্বভাব সৌন্দর্য্যেও কনখল মনোরম। সহরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহা মায়ানিবৃত্তির স্থান। তাই নিবৃত্তিপরায়ণ বহু সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম এইস্থলে বিরাজমান। গঙ্গার ধারে ধারে বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন সারি সারি উদ্যানবাটিকা ইহার মধ্যে অধিকাংশই উদাসী সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম, আখড়া এবং মঠ। মঠগুলিতে সংস্কৃত পাঠশালা ও সদাবর্ত্ত আছে। অনেক আশ্রমেই প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক এবং ভজনসাধন পরায়ণ সাধু সন্ন্যাসী এখনও বিদ্যমান আছেন। হরিদ্বার ও কনখল সংস্কৃত বিদ্যা চর্চ্চার একটী প্রধান কেন্দ্রস্থল; তাহার মধ্যে অধিকাংশ মঠ ও বিদ্যালয়ই কনখলে প্রতিষ্ঠিত। এখানে অনেকগুলি অন্নসত্রও আছে। কনখলের গঙ্গাতীরে, সাধু মহাত্মা এবং রাজা মহারাজাগণের প্রতিষ্ঠিত অনেক উচ্চ চূড়া সমন্বিত সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির আছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রবচনে আমরা দেখিয়াছি যে,—"যাঁহার চিত্ত দুষ্ট, তিনি তীর্থস্নান দ্বারা শুদ্ধ হয়েন না" কিন্তু কনখলের এমনই মহিমা যে খল ব্যক্তিও এস্থানে স্নান করিলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। তা'ই ইহার নাম 'কনখল'।—

খলঃ কো নাম মুক্তিং বৈ ভজতে তত্র মজ্জনাৎ।
অতঃ কনখলং তীর্থং নাম্না চক্রু মুনীশ্বরাঃ॥ কেদার খণ্ড।

এমন খল কে আছেন যিনি এই কনখল তীর্থে স্নান করিলে মুক্তিলাভ করেন না। এইজন্য ঋষিবর ইহার নাম কনখল রাখিয়াছেন। কালীদাসের মেঘদূত মহাভারত এবং প্রায় সকল পুরাণেই কনখলের মহিমার উল্লেখ আছে। শাস্ত্রে যে কোন ঋষি বা মহাত্মার তীর্থ ভ্রমণকাহিনী বিবৃত আছে, তাহাতেই কনখল ভ্রমণের প্রসঙ্গ আছে। কনখলে গঙ্গাস্নান মহা-পুণ্যজনক।

"কুরুক্ষেত্র সমাগঙ্গা যত্র তত্রাবগাহিতা।
বিশেষে বৈ কনখলে প্রয়াগে পরমং মহাৎ॥

মহাভারত বনপর্ব্ব—৮৬ অধ্যায়।

* * * * *

ততঃ কনখলে স্নাত্বা ত্রিরাত্রোপষিতো নরঃ।
অশ্বমেধমেবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি॥

মহাভারত বনপর্ব্ব—৮৪ অধ্যায়।

কনখলে গমনপূর্ব্বক ত্রিরা উপবাস ও স্নান করিলে মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।—

তীর্থং কনখলং পুণ্যং মহাপাতকনাশনং।
যত্র দেবেন রুদ্রেণ যজ্ঞো দক্ষস্য নাশিতঃ॥
তত্র গঙ্গামুপস্পৃশ্য শুচির্ভাব সমন্বিতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্ব পাপৈস্তু ব্রহ্মলোকে বসেন্নরঃ॥

কূর্ম্মপুরাণ—৩৬ অধ্যায়।

কনখল মহাপাতক নাশক ও পুণ্যবর্দ্ধক তীর্থ। এইস্থানে দেবাদিদেব রুদ্র দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থে শুচী ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে মানব সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং ব্রহ্মলোকে বাস করে।

বামনপুরাণে প্রহ্লাদের তীর্থভ্রমণ কাহিনীতে কনখল তীর্থের উল্লেখ আছে।—

"তং দৃষ্ট্বার্চ্চ্য হরিং চাসৌ তীর্থং কনখলং যযৌ।
তত্রার্চ্চ্য ভদ্রকালীশং বীরভদ্রং চ দানবঃ॥

হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ড হইতে কনখল প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণে। ১২ই জ্যৈষ্ঠ

প্রাতঃকালে ঘোড়াগাড়ী (Tonga) আরোহণে আমরা কনখল রওয়ানা হইলাম। ভাড়া জন প্রতি /০ এক আনা হিসাবে লাগিল। আসিবার সময়ও ঐরূপ। পাকা রাস্তাটি অতি সুন্দর চারিদিকের দৃশ্য বৈচিত্র্য ও মনোরম; বিশেষতঃ ক্যানেলের উপরিস্থিত সেতু পার হইবার সময় হরিদ্বারের দৃশ্যটী বড় মনোরম বোধ হইল। মনে হইল যদি ফটোক্যমেরা' থাকিত তবে একটী ছবি তুলিয়া রাখিতাম।

কনখলের রাজঘাটেই স্নন-তর্পণাদি করিতে হয়। এই ঘাটেই গঙ্গার সহিত নীলধারার সঙ্গম হওয়ায় ইহা প্রয়াগতীর্থে পরিণত হইয়াছে। ঘাটটী সুন্দররূপে বাঁধান, উপরেই সুন্দর মন্দিরাবলী। সম্মুখেই নীলপর্ব্বতের মনোরম দৃশ্য। সম্মিলিত গঙ্গার স্রোত অতিশয় প্রবল। লৌহশৃঙ্খল ধারণে আমরা অতি সাবধানে স্নান-তর্পণাদি করিলাম। তীর্থগুরু সংকল্প মন্ত্রের সহিত গঙ্গামাহাত্ম্য সূচক নিম্নলিখিত পৌরাণিক বচনটি আবৃত্তি করিলেন।—

''দৃষ্টাজন্ম শতং পাপং পীত্বা জন্মশতদ্বয়ং।
স্নাত্বা জন্মসহস্রেকং হরতি গঙ্গা কলৌযুগে ॥''

কনখলে বানরের বড় উৎপাত। সুতরাং স্নানকালে বস্ত্রাদি সাবধানে রাখা আবশ্যক। অতঃপর ঘাটের উপরেই (১) শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির (২) ৺শিব মন্দির (৩) ৺সত্যনারায়ণ মন্দিরে চরণপাদুকা (৪) শ্রীরামজানকীর মন্দির (৫) গঙ্গাতীরে সতীঘাটে শিবলিঙ্গ ও (৬) বেদব্যাসের মন্দিরে নানারূপ সুন্দর সুন্দর দেবমূর্ত্তি আমরা দর্শন করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। রাজঘাটের উপরই যে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটী আছে তাহার কারুকার্য্য অতি চমৎকার। ভিত্তিগাত্রে অতি চমৎকার ভাবে কালীয়-দমন, গজেন্দ্রউদ্ধার, বৃন্দাবন বিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমুহ চিত্রিত। ইহার সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইলাম। মনে হইল সর্ব্বসৌন্দর্য্যের যিনি আধার, যাঁহা হইতে সকল সৌন্দর্য্যের উদ্ভব, যিনি চির-মধুরও চির-সুন্দর তাঁহার মন্দির এইরূপই সুন্দর হওয়া আবশ্যক। এই মন্দির কোন দানশীলা রাণীর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি এবং শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিতা শ্রীরাধার মূর্ত্তিটী এত মনোরম ও ভক্তি উদ্দীপক যে আমাদের প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অতঃপর কিঞ্চিৎ দূরে কনখলের বাজারের দক্ষিণাংশে দক্ষেশ্বর মহাদেবের দর্শন করিলাম। দক্ষেশ্বরের পুরাতন মন্দিরটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় বর্ত্তমান মন্দিরটী ১৭৭০ শকাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানটী বৃহৎ বৃক্ষ-ছায়া-সমন্বিত অতি সুন্দর সাধন ভজনের উপযোগী নীরব নির্জ্জন তপোবনের ন্যায়। নিকটেই বীরভদ্র এবং ভদ্রকালীর মূর্ত্তি। মহাবীর হনুমানের প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য। মহাবীরের পদতলে কালনেমী। মহাবীর সিন্দূরে, এবং কালনেমী কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। মূর্ত্তিটী ৫।৬ হাত উচ্চ হইবে। দক্ষেশ্বর মন্দিরের পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে, ইহাই পাণ্ডারা যজ্ঞ-কুণ্ড বা সতীর দেহত্যাগ স্থান বলিয়া দেখান। ইহাতে কিঞ্চিৎ বিভুতি রক্ষিত আছে, * তাহাই যাত্রীগণকে দিয়া দক্ষিণা আদায় করেন। যাত্রীরা এই ভস্ম সতীদেহাবশেষ জ্ঞানে সযত্নে গৃহে লইয়া আসেন। এইটী কিন্তু প্রকৃত সতীকুণ্ড নহে; সতীকুণ্ড এখান হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে একটী বনমধ্যে আছে। আমরা যখন দক্ষেশ্বর মহাদেব দর্শনে যাইতেছিলাম, সেই সময় এক গৈরিক-পরিহিতা বঙ্গদেশীয়া সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদিগকে স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া বলেন,—''বাবা! এই মন্দিরের পশ্চাতে পাণ্ডারা যে সতীকুণ্ড দেখাইবেন, তাহা প্রকৃত সতীকুণ্ড নহে। প্রকৃত সতীকুণ্ড এখান হইতে এক মাইল দূরে। যখন এই মহাতীর্থে আসিয়াছ, তখন তাহা দেখিতে ভুলিও না। কারণ শাস্ত্রে আছে, সতীকুণ্ড দর্শনে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হয়। বিশেষতঃ মায়েরা সতীকুণ্ড দর্শন ও জলস্পর্শ করিলে, আদর্শ সতীর ন্যায় পতিব্রতা হইবেন।'' সতীকুণ্ড যাইবার পথে আমরা 'পান-চক্কির' অর্থাৎ জলের স্রোতের বেগে জাঁতা ঘুরাইয়া গম্ পেষার কারখানা দেখিলাম। হিমালয়ে স্মরণাতীত কাল হইতে জলের স্রোতের সাহায্যে গম ভাঙ্গা, কাঠ মসৃণ করা ও খোদাইর কার্য্য হইয়া থাকে। তাহার নমুনা এখানে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন; একটী ঘরে সারি সারি জাঁতা বসান আছে। এই ঘরটির নিম্নদেশ ফাঁপা; ঘরের নিম্নদেশ দিয়া ক্যানেলের জল দুই তিন হাত উচ্চ হইতে পড়িয়া সবেগে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। জাঁতাগুলির মধ্যদেশ দিয়া একটী লৌহ দণ্ড ২।৩ হাত নিম্নে জল স্রোতের মধ্যে স্থাপিত। উক্ত লৌহদণ্ডে কতকগুলি পাখা বক্রভাবে লাগান আছে। জলের বেগ পাখাগুলিতে লাগায় দণ্ডটী অনবরত ঘূরিতেছে। এই দণ্ডের ঘূর্ণনে জাঁতার উপরিস্থ প্রস্তর খণ্ড আঁটা থাকায় জাঁতা পেষা হইতেছে। এইরূপ জলের স্রোতের বেগে নানারূপ কার্য্যের একটী বৃহৎ কারখানা রুড়্কীতে আছে। তথায় মেসিন্ সকল ক্যানেলের প্রবাহে পরিচালিত হইয়া নানারূপ কার্য্য করে। আম্রকানন ও বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আমরা সতীকুণ্ডে পৌছিলাম। ইহা

* ভাদ্র আশ্বিন সংখ্যক ''পন্থায়'' দক্ষেশ্বর মন্দিরের চিত্র দ্রষ্টব্য।

একটী প্রকাণ্ড কুণ্ড, এখনও জল কতকটা আছে। এই সতীকুণ্ড নির্জ্জন বনমধ্যে অবস্থিত। সতীকুণ্ডের তীরে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে২ আমাদের সেই পুরাকালের কাহিনী মনে পড়িল ;—মনে পড়িল ভ্রান্ত দক্ষ রাজার শিবহীন যজ্ঞ-কাহিনী, আর মনে পড়িল পতিনিন্দা শ্রবণে সতীকুণ্ডের আদর্শ মহামায়া আদ্যাশক্তির এই কুণ্ডে দেহত্যাগ। শিবহীন যজ্ঞের অর্থাৎ ভগবান্‌কে ছাড়িয়া যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার পরিণাম এইরূপ শোচনীয়ই হয়। ভাবিতে ভাবিতে আমরা যেন সেই প্রাচীন দৃশ্য মানস নয়নে দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল আদ্যাশক্তির দেহ-সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত এই রজঃরাশি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ধন্য হই। অধুনা সতীকুণ্ডে অতি অল্প যাত্রীই আসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইহা একরূপ অজ্ঞাতই ছিল ; এবং বনজঙ্গলে পরিবৃত থাকায় পাণ্ডারা কাহাকেও ইহার সন্ধান দিতেন না। সতীকুণ্ডের একধারে একটী মৃত্তিকা স্তূপের উপর প্রাচীনত্বের নিদর্শন কয়েকটী সিন্দুর লেপিত ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি। একটী মস্তক-বিহীন মূর্ত্তিকে পাণ্ডারা দক্ষের মূর্ত্তি বলিয়া দেখান। কেহ কেহ বা বলেন এগুলি বুদ্ধ মূর্ত্তি ; এবং এখানে প্রাচীনকালে একটী বৌদ্ধ স্তূপ ছিল। যাহা হউক আনন্দের বিষয় হরিদ্বারের পণ্ডা পান্নালাল কুম্ভকর্ণ সতীকুণ্ডের তীরে দশ বিঘা জমি লইয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইতেছেন। বোম্বাই হইতে দক্ষযজ্ঞের দৃশ্য অঙ্কিত করাইয়া চিত্র আনাইয়াছেন। মন্দিরে দক্ষযজ্ঞের দৃশ্য স্মারক মূর্ত্তি ও চিত্রাদি রক্ষিত হইয়াছে। পাণ্ডাজী বলিলেন, 'কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবার সতীকুণ্ডে একটী মেলা হয়।' অতঃপর আমরা পদব্রজে কণ্‌খল বাজারে পৌঁছিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া এক্কারোহণে বেলা প্রায় একটায় হরিদ্বারে আমাদের বাসায় পৌঁছিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

শক্তিতত্ত্ব।

এই বিশাল ভারতবর্ষে আমাদের আর্য্যজাতি যে, কত অনন্ত বিষয়ে উন্নতির চরম সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহের কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। সকল বিষয়ের মধ্যে এক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বা বেদান্ত প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব শ্রেষ্ঠতম, এই পরমতত্ত্ব ভারতীয় ঋষিগণই সুকঠোর

তপশ্চরণ দ্বারা অলৌকিক শক্তি বলে সমগ্র ধরামণ্ডলকে দিয়াছিলেন। এইরূপ লোকত্তর প্রতিভা, তপোবল কিম্বা যোগচর্য্যা অথবা ব্রহ্মচর্য্য, সত্যনিষ্ঠা ভিন্ন মানবের কথনও উদয় হয় না। সেরূপ চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতি-বিজ্ঞান শিল্পবিজ্ঞান * প্রভৃতি আর্য্য ঋষিরাই মানবজাতির মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই ভারতই যে অশেষ ঐশ্বর্য্য বা সুখসম্পদের আকর, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাশীলগণও স্বীকার করেন।

ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের সময় ভারতের জনগণের প্রতি হৃদয়ে যে ধর্ম্ম বিজ্ঞান উন্মিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ভূয়ো নিদর্শন দেখিয়া এখনও বিদেশীয় বিদ্বদ্‌গণ মুগ্ধ হন। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বিশাল ভারতবর্ষে অনন্ত লোকের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনা নানা শ্রেণীতে নানা প্রকারে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের মধ্যে এরূপ একটী ধারণা বদ্ধমুল হইয়াছে যে, তন্ত্রশাস্ত্র ও তদুক্ত শক্তির আরাধনা অতি আধুনিক ; তাহা বৈদিক যুগে ছিলনা। তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে প্রাচীন বেদশাস্ত্রের সম্বন্ধও অতি বিরল ; অর্থাৎ স্মৃতি পুরাণের মূল বা আকর যেরূপ বেদশাস্ত্রে, তদ্রূপ তন্ত্রের মূলীভুত বেদ নয়। এই বিষয়ে 'বৈদিক-শক্তি' রহস্য নামক পুস্তকে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব। বৈদিক যুগে যে শক্তির উপাসনা ছিল, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্মৃতি পুরাণের পরবর্ত্তীকালে তন্ত্রশাস্ত্রের বিস্তার ও উপাসনা হিন্দু সমাজে ব্যাপক হইয়া এখনও রহিয়াছে। বৈদিক কালের উপাসনা দেবীসূক্ত, শ্রীসূক্ত, অম্বামন্ত্র, রাত্রী-সূক্ত, পাবমানীসুক্ত, পৃথ্বীসূক্ত প্রভৃতির দ্বারা জানা যায়। তদানীং বশিষ্ঠর্ষি তারাদেবীর উপাসক এবং রাজর্ষি বিশ্বামিত্র শক্তি আরাধনা বলে 'বিজয়া ও জয়া' বিদ্যায় সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে প্রজাপতি ও শ্রীরামচন্দ্র শক্তির আরাধনা করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন—ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে।

(*) ভারতীয় শিল্প নৈপুণ্য সম্বন্ধে শিল্পশাস্ত্রের বহু আর্য্যগ্রন্থ বিদ্যমান আছে, এমন কি শুক্ল যজুর্ব্বেদের (শতরুদ্রীতে) রুদ্রাধ্যায়ে শিল্পের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে মহর্ষি পরাশরের 'পরাশরীয় শিল্পশাস্ত্র' মহর্ষি অগস্ত্যের 'আগস্ত্য শিল্পশাস্ত্র,' ময়-প্রণীত শিল্পশাস্ত্র (বৃহৎসংহিতোক্ত) সারস্বত শিল্প শাস্ত্র, বৃহৎকাশ্যপীয় শিল্পশাস্ত্র. লঘুকাশ্যপীয় শিল্প শাস্ত্র. শিল্পময়ূর, ব্রাহ্মীয় শিল্পশাস্ত্র, মূলস্তম্ভশাস্ত্র মূর্ত্তিধ্যান শাস্ত্র, কুমার বাস্তু শাস্ত্র, মণ্ডল সূত্রধারীকৃত শিল্প শাস্ত্র এই সকল গ্রন্থে মূর্ত্তিতত্ত্ব, চিত্রাঙ্কন; সূত্রপাতন, দেবমূর্ত্তিতত্ত্ব, বাস্তু শিল্পসৌধ, রাজধানী, আপনাদি নির্ম্মাণ, বাপী, তড়াগ, সবোবর, সেতু. দেবায়তন, মঠ, আরাম প্রভৃতির তত্ত্ব সুবিস্তৃত ভাবে আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে, শ্রীমদ্দেবীভাগবতে, কালীকাপুরাণে এবং নন্দীকেশ্বর পুরাণে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে, কাশীখণ্ডেও দেবীর আবির্ভাব এবং তাঁহার তত্ত্ব, অকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূজা, প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ আছে। মহাভাগবত-পুরাণে লিখিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্র অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম দ্বারা মায়ের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন; কিন্তু মহাদেবী তাহাকে ছলনা করিয়া তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিবার নিমিত্ত একটী পদ্ম লুকাইয়া রাখেন; সে সময় শ্রীরামচন্দ্র সমাহৃত পদ্মের সঙ্কল্পানুসারে সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আপনার একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবীর পাদপদ্মে সমর্পন করিতে উদ্যত হন। তৎক্ষণাৎ দেবী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া মনোরথ পূর্ণ করেন। দেবী পুরাণে ভগবতীর অর্চ্চনা বিষয়ে যাহা আছে, তাহা অতি সামান্য। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সম্পূর্ণ দেবী পুরাণ এখন আর পাওয়া যায় না। রাজর্ষি সুরথ লক্ষ জীব বলি দ্বারা মায়ের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু লক্ষ জীব-নাশের অপরাধে মরণের পর নিহত জীবগণ অসি হস্তে আসিয়া রাজর্ষি সুরথকে আঘাত করিয়াছিল। এই প্রস্তাবটী পুরাণ শাস্ত্রে কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতও ভগবতী দুর্গাদেবীর নাম বা মাহাত্ম্য শূন্য নয়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাট রাজ্যের সমীপে শেষ একবৎসর কাল নির্ব্বিঘ্নে যাপনের নিমিত্ত সর্ব্বানন্দময়ী ভগবতীকে কায়মনোবাক্যে স্তব করিয়াছিলেন। ইহা দ্বাপরের শেষের কথা। পরম ভক্তি-সুধার্ণব শ্রীমৎভাগবতে শাপভ্রষ্ট দেববালাগণও মরজগতে অমরেশের অনির্ব্বচনীয় লীলা উপভোগের নিমিত্ত ভগবতী কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শ্রীমদ্দেবীভাগবতে সকল শাস্ত্র বর্ণিত ভগবতীর মাহাত্ম্য সমূহ একত্র সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী ভাগবতে বর্ণিত প্রায় সকল বিষয়ই বৈদিক সূক্তমূলক ও বেদান্ততত্ত্ব পূর্ণ। মনীষি শৈব নীলকণ্ঠ তাঁহার দেবীভাগবতের টীকায় সেই সকল শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। দেবী ভাগবতের টীকায় বিস্তৃত ভূমিকা পড়িলেই এই বিষয়ে সকল রহস্য অবগত হইতে পারা যায়। সূত সংহিতান্তর্গত সূত গীতার ভাষ্যে শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য যেরূপ অধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা বিবৃত করিয়াছেন, তদ্রূপ দেবীভগবতোক্ত দেবীগীতার (৭ম স্কন্ধ ১০ ম অঃ) নীলকণ্ঠ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যাখ্যায় বৈদিক দেবীতত্ত্ব অতি বিস্তৃত ভাবে গবেষণা পূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন।

যে পঞ্চ দেবোপাসনা সনাতন বেদশাস্ত্রে গীত, যজ্ঞ, ও স্তোত্ররূপে ছিল, তাহাই স্মার্ত্ত বা পৌরাণিক যুগে বিভিন্নমার্গে নানাভাবে সুপ্রসৃত হইয়া আর্য্য সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাহার নামান্তরে তন্ত্রশাস্ত্র বা আগম শাস্ত্রের দেশময় জয়ঢক্কা ধ্বনি। এই আগম শাস্ত্র, সময়ে সময়ে আগম, তন্ত্র, যামল, উড্ডীশ, আচার প্রভৃতি নামে বিভিন্ন হইয়া, বহু সহস্র গ্রন্থের দ্বারা দেশব্যাপক স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছিল। তান্ত্রিক উপাসনায় অল্পায়াশে সরল পথে সহজ সাধ্য কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায় বলিয়া, বৈদিক উপাসনা হইতে কোন কোন স্থানে তান্ত্রিক উপাসনার প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

অদূরদর্শী অনেকের ধারণা আছে যে, তন্ত্রে কেবল জীবহত্যা ও মদ্যাদি-ব্যবহারের কথাই আছে; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহাদের ধারণা ভ্রমাত্মক, বহু প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণাদি যোগানুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ, পূজা, জপ, স্তব, সম, দম, প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি ভগবৎ ভক্তি ও তাঁহার সেবা, আরাধনা, অতি বিপুলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কতকগুলি সম্প্রদায়ের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অসাধু-লোক কর্ত্তৃক আধুনিক তন্ত্রশাস্ত্রের যে প্রকরণ পুস্তকের সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলি তত্ত্বচিন্তাশীল নৈষ্ঠিক জন-গণের অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে; এবং তন্ত্রে বামাচারের কার্য্যাবলীর বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অঘোরী, অবধূত-সন্ন্যাসী ব্যক্তি বিশেষের জন্য; তাহা সাধা-রণের বা বিমল তত্ত্বজ্ঞানের জন্য নয়। সে সমুদয়ের উপদেষ্টা ও উপদেশ্য সম্প্রতি আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। চারি বেদের মধ্যে অথর্ব্ববেদেই তন্ত্রের মৌলিকতা অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল; তাহা অথর্ব্ববেদ পাঠে জানা যায়। অথর্ব্ববেদের খৈলক-সূক্ত (পরিশেষ সূক্তনিচয়) ও মহানারায়ণ উপ-নিষদাদিতে তান্ত্রিকভাবের সমধিক উন্মেষ ও তত্ত্ব বিদ্যমান আছে। অথর্ব্ববেদকে আধুনিক বলিবারও উপায় বিশেষ নাই। কেন না যজুর্ব্বেদের পরিশেষে "শত পথ ব্রাহ্মণ" (বাজসনেয়সংহিতা); শতপথ ব্রাহ্মণের শেষভাগে "বৃহদারণ্যক উপনিষদ" এবং উপনিষদের মধ্যে প্রাচীনতম—'ছান্দোগ্য উপনিষদ"। এই দুইখানি ও অপর বহু উপনিষদে অথর্ব্ববেদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ বেদ আগে, কোন্ বেদ পরে,—এই বিচারের কোন সৎ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। আমার বোধ হয় অথর্ব্বাঙ্গিরসের গীতিকা (মন্ত্র) সকল অতি প্রাচীনকাল হইতেই যজ্ঞীয় নানাপ্রকার বিঘ্ন দূরীকরণ ও মানবের ত্রিবিধ (দিব্য, আন্তরীক্ষ্য, ভৌম,) উৎপাতাদির শান্তির জন্য যাগ কার্য্যাদিতে প্রযুক্ত হইত। প্রতীচ্য

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, অথর্ব্ববেদের চতুর্থ বেদরূপে পরিণতি 'শতপথ ব্রাহ্মণাদি' বিরচণের উত্তরকালে সংঘটিত হইয়াছে; ইহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয় স্পষ্টভাবে, "বৈদিকতত্ত্ব কথা" নামক সংস্কৃত ভাষা নিবদ্ধ—পুস্তকে বলিবার ইচ্ছা রহিল। অথর্ব্বসংহিতায় আর্য্য-অনার্য্য উভয়-শ্রেণীর আচরিত নানাবিধ রীতি-নীতি আচারাদি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ভারতবর্ষীয় জন-সাধারণের মহার্ঘ্য সম্পত্তিরূপে পরিণত করিয়াছে। অথচ যাহা বৈদিক সংহিতায় কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না, তাদৃশ বহুতর সাধারণের অত্যুপকারক প্রাচীনতম, প্রকৃত কথা "অথর্ব্বসংহিতায়" পাওয়া যায়। অথর্ব্বসংহিতার উপাসনা সূচক সূক্তগুলি সকল সময়েই শ্রদ্ধেয়। 'বৃহৎ দেবতায়' উক্ত আছে যে, "সম্পূর্ণং ঋষি-বাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে" বা ছন্দোময় সম্পূর্ণ ঋষিবাক্যের নাম সূক্ত।

তন্ত্র বলিলে যে, দুই চারি খানি গ্রন্থকে বুঝায় (অর্থাৎ তন্ত্র শাস্ত্রকে বুঝায়) এমন নয়। যদ্দ্বারা মোক্ষ বা নির্ব্বাণের অবরোধ হয়, আচার্য্যগণ তাহাকেই তন্ত্রনামে অভিহিত করিয়াছেন। "তন্ত্র্যতে ব্যুৎপাদ্যতে মোক্ষসাধনমনেন ইতি তন্ত্রং মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং" স্বামী নারায়ণতীর্থ এইরূপ ভাবে তন্ত্রশব্দের অর্থ অবধারিত করিয়াছেন। দার্শনিক সময়ে ও তাহার পূর্ব্ব সময়ে তন্ত্রশব্দ, শাস্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হইত; যথা সাংখ্য দর্শনে—"ষষ্ঠিতন্ত্রম্" "তন্ত্রং প্রোবাচ" (ব্যাসভাষ্য পাতঞ্জল দর্শন)। পুরাণ শাস্ত্রেও শাস্ত্র এই অর্থে তন্ত্রশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা "ন্যায়তন্ত্রাণ্যনেকানি সাংখ্য ভাস্যোক্ত প্রমাণ" 'পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অপ্পয়দীক্ষিত ও উক্ত অর্থে তন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন;—যথা 'তন্ত্রাণ্যধীত্য সকলানি সদাহবদাতম্।'

ষড়্দর্শনের মধ্যে নানাশাস্ত্র সমাহিত সাংখ্য দর্শনই সর্ব্বাগ্রে সমধিক ভাবে শক্তিবাদের বা তন্ত্রোক্ত মূল প্রকৃতির সমর্থণ করে। শৈব দর্শন ও সাংখ্য দর্শন এই উভয় দর্শনই তন্ত্রের বিশেষভাবে উপজীব্য।

দেবী ভাগবতের সপ্তম স্কন্দের দেবী গীতাধ্যায়ে উক্ত আছে যেঁ, তন্ত্র দ্বিবিধ, বেদানুযায়ী ও বেদ প্রতিকূল, (বেদবিরুদ্ধ)। বৈদিকগণ বেদের অনুকূল তন্ত্র-মত গ্রহণ করিবেন, এবং তাহার বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ করিবে। এ সম্বন্ধে মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন যে, "যাবেদবার্হ্যাঃ স্মৃতয়ঃ" ইত্যাদি বচনদ্বারা বেদ বহির্ভূৎ স্মৃতি পর্য্যন্ত ত্যাগের যোগ্য। কূর্ম্ম পুরাণেও * ভগবতী স্বয়ং

* কূর্ম্ম পূরাণে দেবীবাক্যং (দেবী ভাঃ ৭ম, স্কন্দ) দ্বাদশাধ্যায়। "মমৈরাজ্ঞাপরা-শক্তির্ব্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী। ঋগ, যজু: সামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ত্ততে॥"

বলিয়াছেন—"আমার আজ্ঞা (আদেশ) স্বরূপ পুরাতন বেদ অর্থাৎ ঋগ্, যজু, সাম প্রভৃতি সৃষ্টির আদিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব রাজার আদেশের ন্যায় জগদ্বীশ্বরীর আজ্ঞা-শ্রুতিও মানবের সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। বায়ু সংহিতাতে উক্ত আছে যে † শৈবাগম দুই প্রকার, শ্রৌত ও অশ্রৌত; বেদের সারময় যে, (বেদের অবিরুদ্ধ) তাহা শ্রৌত; বেদ-ভিন্ন অশ্রৌত। যাহা শ্রৌত (শ্রুতির অনুকূল), তাহা বৈদিকের গ্রাহ্য, ইহা 'সুতসংহিতায়'ও ব্যক্ত আছে। আর যাঁহারা তন্ত্রের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহাদের গতি কেবল তন্ত্রের গণ্ডিতে। তবে যে সকল শ্রুতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অভিশপ্ত হইয়াছে, সেগুলি দক্ষ ও ভৃগুমুনির শাপে অধমত্ব প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের ক্রমে বেদে আস্তিক্য বুদ্ধি জন্মাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। বাম, কপালক, কৌলক ও ভৈরব তন্ত্র এই কয়খানি বিরোধিগণের মোহের নিমিত্ত মহাদেব প্রণয়ণ করিয়াছেন ‡ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার 'মলমাসতত্ত্বে' (৬৪) চৌষট্টি খানি তন্ত্রের উল্লেখ ও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

"যে সকল ব্রাহ্মণ দক্ষ, ভৃগু, দধীচি মুনির শাপে দগ্ধ হইয়া বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত অর্থাৎ অন্য জন্মে বেদাধিকার প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কোনরূপ উপাসনা করা কর্ত্তব্য—এই মনে করিয়া দেবাদিদেব শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত এবং গাণপত্য এই পঞ্চ প্রকার আগম প্রণয়ণ করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্ব্বে কাশ্মীরে তন্ত্রের দর্শন "শৈবাগম" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল; তাহা এখন পাওয়া যায় না। কাশ্মীরে বহুকাল হইতে শৈব দর্শনের ও জগৎপিতা মাতা শিব শক্তির উপাসনার বিস্তৃতি রহিয়াছে; উক্ত শৈবাসগমের প্রথমে লিখিত আছে যে, আগম দ্বিবিধ, সৎ ও অসৎ, বেদ বিরুদ্ধে সৎ, অসৎ বেদের অনুকূল, কিন্তু শৈবাগম অদর্শনে উক্ত বিষয় কতদূর সত্য তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না; শৈব দর্শন ও শ্রীকণ্ঠ ভাষ্য, (ব্রহ্ম সূত্রের শৈবভাষ্য) তাহার ব্যাখ্যা শিবার্ক মণিদীপিকায় ঐরূপ কোন বিষয় দেখিতে পাই নাই।

‡ "শৈবাগমোহপিদ্বিবিধ: শ্রৌতাশ্রৌতশ্চ তন্ময়ঃ। শ্রুতিসারময়ঃ শ্রৌতঃস্বতন্ত্রইতরো-মতঃ॥" বায়ুসংহিতায়াম্। "ন্যায় তন্ত্রাণ্যনেকানিস্তৈরুক্তানিবাদিভিঃ। হেত্বাগমসদাচা-রৈর্ব্বযুক্তং তদুপাস্যতাম্॥" (তত্রৈব পুরাণে)

'শ্রৌতো গ্রাহ্যস্তুবৈদিকৈঃ" ইতি স্কান্দে সূতসংহিতায়াম্।

"তথাপি যোহংশোমার্গানাম্ বেদেন নবিরুধ্যতে।"

সোহংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তং॥

মীমাংসা দর্শনে শিষ্টাকোপাধিকরণে (৩৫ সূং) বার্ত্তিক প্রণেতা কুমারিল স্বামী বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বৈষ্ণবাগম সমূহের কোন কোন অংশ যুক্তিপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। আচার্য্য সুচরিত মিশ্রও বার্ত্তিককার বচনের প্রতি-ধ্বনি করিয়াছেন। বৈষ্ণবাগম বলিতে হয় শীর্ষপঞ্চরাত্র, নারদ পঞ্চরাত্র, গণেশ পঞ্চরাত্র, সাত্বতসংহিতা প্রভৃতিকে বুঝায়। বৃহৎ হয়-শীর্ষপঞ্চরাত্র গ্রন্থে পঞ্চরাত্র সম্বন্ধে বহু বৃত্তান্ত লিখিত আছে। এইগুলি বৈষ্ণব মতে তন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত।

মহাশক্তির সত্তাতেই জগতের সত্তা ; এই শক্তিই সকল বস্তুতে সূক্ষ্মভাবে অনুস্যূত ও পরিব্যাপ্ত। শক্তি মাহাত্ম্যে তাহাই কথিত আছে, "নিত্যৈবসা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।" এবং উক্ত মাহাত্ম্যে অপর একস্থানে কথিত হইয়াছে "যে দেবী সকল বস্তুতে (ভূতে) শক্তিরূপে সংস্থিত আছেন, তাঁহাকে নমস্কার। 'যদ্দ্বারা মানব সকল বিষয়ে জয় করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে শক্তিনামে অভিহিত করা হয়। এই অর্থে শক্ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় হইয়া শক্তিশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই শক্তি অবস্থাভেদে, বস্তুভেদে, কালভেদে, ক্রিয়াভেদে এক হইয়াও নানাবস্তুতে নানাভাব প্রাপ্ত হয়। যথা "বায়ুর্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্টোরূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব" "একং সৎ, বিপ্রাবহুধা বদন্তি" "একোঽহং বহুস্যাম্" এই মহাশক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসবিত্রী (‡)

প্রতীচ্য দেশীয় পণ্ডিতগণ ইহাতে Power Force এবং Energy এই তিনটি শব্দদ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের বৈয়াকরণ মহর্ষিগণের মতে উপাদান কারণ বা প্রকৃতিই মহাশক্তি। এই সম্বন্ধে (জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ, ১।৪।২০) পাণিণি, পতঞ্জলি, বররুচি, কৈয়ট, জয়াদিত্য, নাগেশ প্রভৃতির ঐক্যমত দেখাযায়। ষড় দর্শনও তাহার ভাষ্য, প্রকরণ গ্রন্থে এই শক্তিকে নানাভাবে নানা কৌশলে স্বীকার করিয়াছে। ছয়জন আদি দার্শনিক মহর্ষির মধ্যে কেহই শক্তি পরিহার বা উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারেন নাই। স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, শাস্ত্রে কতস্থানে মহাশক্তি মাহামায়ার বিবরণ ও অসংখ্য নাম, লীলা প্রভৃতি

+ অন্যানি যা নি শাস্ত্রানি লোকহস্মিন বিবিধানিচ।
শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধানি তামসান্যেব সর্ব্বশঃ ॥ ২৬।
বামং কাপালকঞ্চৈব কৌলকং ভৈরবাগমঃ।
শিবেন মোহনার্থায় প্রণীতোনান্য হেতুকঃ ॥ ২৭।
‡ দক্ষশাপাদ্ভৃগোঃশাপাদ্দধীচস্যচশাপতঃ
দগ্ধাযে ব্রাহ্মণবরা বেদমার্গ বহিস্কৃতাঃ ইত্যাদি ॥
... ...আগমাশ্চ প্রণীতাঃ শঙ্করণতু। (দেবী ভাগবতে ৭ ম স্কন্ধে)

বর্ণিত আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা অসম্ভব, প্রতীচ্য দেশীয় পণ্ডিতগণ হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি দার্শনিক গবেষণার প্রসঙ্গে অজ্ঞেয় বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিত্রী মহাশক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতীয় সুধীমণ্ডলী এই শক্তির স্বীকার এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপাসনা, ধ্যান ধারণাদি দ্বারা অভীষ্ট সম্পাদন করিয়া, সিদ্ধ হইয়া বাহ্য ও অন্তর্জগতে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র গ্রন্থ পূর্ণ তন্ত্রশাস্ত্রেও ঐ মহাশক্তির মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে ; এবং তদ্দ্বারা যে উপায়ে পরমেশত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্ত্র শাস্ত্রে তাহার সরল, সুগম, সহজ উপায় সম্যক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

ভারতে বৌদ্ধ যুগেও (বিবেক, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান, সাম্য, মৈত্রীর প্রবাহকালে) তন্ত্র সাগরের প্রবাহ তীব্রভাবে বহিয়াছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রের ধারণী শাস্ত্র হইতে বৌদ্ধ তন্ত্রের বিস্তৃতি হয়। বৌদ্ধ তন্ত্র প্রায়ই হিন্দু তন্ত্র-শাস্ত্রের অনুরূপ ; বৌদ্ধ তন্ত্রের মধ্যে সাধনমালা, চতুর্বিংশতি সহস্রিকা, মায়ূরী প্রভৃতিতে তন্ত্রোক্ত প্রায় সকল বিষয়ই বর্ণিত আছে। বুদ্ধদেবের অনেক প্রকার প্রভেদ আছে অর্থাৎ—মনুষ্য বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ প্রভৃতি। সাধরণ হিসাবে পাঁচ মনুষ্য বুদ্ধ, যথা—ক্রকুচণ্ড, কনকমুণি, কশ্যপ, গৌতম, মৈত্রেয়। ধ্যানী বুদ্ধ,—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্ন-সম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধ। বোধিসত্ত্ব—সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি, বিশ্বপাণি। ইহাদের মধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ দ্বারাই বুদ্ধের আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ বিকশিত হয়। প্রত্যেক কল্পে প্রত্যেক বুদ্ধের হস্তে যতপ্রকার মুদ্রা আছে সকল মুদ্রার বিবরণ 'সাধনমালা তন্ত্রে' মন্ত্র, উপাসনা, পুরশ্চরণ প্রণালী প্রভৃতি সহযোগে আছে। বৌদ্ধতন্ত্রের বিস্তৃতি পূর্ণভাবে নেপালে হইয়াছিল ; সেখানে সহস্র সহস্র গ্রন্থ এখনও বিদ্যামান আছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন নেপাল হইতেই মিথিলাদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা ও কার্য্যাবলী আইসে, সম্প্রতি মিথিলাতে পনর আনা হিন্দুই তান্ত্রিকাচার সম্পন্ন। মিথিলায় দুইজন মহা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন ; ৺রঘুনাথ ঠাকুর মহোদয় ও ৺মহেশ ঠাকুর মহাশয়। এই দু'য়ের মধ্যে স্বীয় সিদ্ধি প্রভাবে তদানীন্তন "বাদসাহ" হইতে একজন রাজকীয় সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৈথিল-সিদ্ধ পুরুষপ্রবর ৺নৃসিংহ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত "তারা ভক্তিসুধা লহরী" নামক তন্ত্রগ্রন্থ গভীর গবেষণা পূর্ণ ও শ্রদ্ধেয়। এই গ্রন্থে তন্ত্রের "প্রামাণ্য কাণ্ড" বিশেষ প্রশংসনীয়। মহেশ ঠাকুর' প্রণীত "দুর্গা প্রদীপ" নামক গ্রন্থে ভগবদ্দেবী মাহাত্ম্য বিশেষ-

রূপে বর্ণিত ও আলোচিত আছে। ভারতে তান্ত্রিক যোগীগণের মধ্যে কত শত সিদ্ধ পুরুষ যে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দক্ষিণ ভারতে ত্রিপুরাদেবীর উপাসনা এখনও বিদ্বৎ সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। নানা শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রে-নিপুণ ও তদনুষ্ঠান পরায়ণ এই কয়েকজন ঋষিকল্প ব্যক্তিকে দেখিতে পাই,—স্বনামখ্যাত অপ্পয়-দীক্ষিত নাগেশ ভট্ট (নাগোজী), পরম শৈব শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্ট (মহাভারত প্রভৃতির টীকাকার)। তন্ত্রের আবির্ভাব সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, সম্প্রতি আরও দুই চারিটী কথা বলিবার আছে। দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও তান্ত্রিক মতে শক্তি অর্চ্চনা হইত। সেই কালের উৎকীর্ণ শীলা প্রতিমার দ্বারা ইহা জানা যায়, মৌর্য্য রাজগণ শক্তির উপাসক ছিলেন। চালুক্য নৃপগণ সপ্ত মাতৃকাশক্তির অর্চ্চণাকারী ছিলেন; ললিতবিস্তরে (৫০২—৫০৭ পৃষ্ঠায়) অপরাজিতা শক্তি প্রভৃতির নাম উল্লিখিত আছে। বৌদ্ধ-সমাজের শক্তিপূজার পূর্ব্বেও মহাভারতের সময়ে শক্তির উপাসনা ছিল; যথা—(মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্বে) "হ্রীঁ, শ্রীঁ, গার্গীঞ্চ গান্ধারীং যোগিনাং যোগদাং সদা"। নেপালের সাধনমালা তন্ত্রে লিখিত আছে যে আচার্য্য নাগার্জ্জুন ভোটদেশীয় এক জটা নাম্নী তারাদেবীর মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। নেপালের বজ্রাচার্য্যগণ এখন তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে শক্তির আরাধনা অর্থাৎ তারাদেবীর স্তোত্রাদি পাঠ করেন। যামলে উক্ত আছে যে মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক চীনদেশ হইতে তারাতত্ত্ব আনীত হইয়াছিল। আচার্য্য নাগার্জ্জুন প্রবর্ত্তিত মহাযান সম্প্রদায়ে কুলাল-কাম্নায়ে—পঞ্চবেদ, পঞ্চযোগী, পঞ্চপীঠ, পঞ্চাম্নায়ের উল্লেখ আছে! উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উর্দ্ধাম্নায় এই পঞ্চ আম্নায় পঞ্চ মহেশ্বর বা ধ্যানীবুদ্ধ। প্রাক্‌জ্যোতিষপুরে (আসামে) অতি প্রাচীন কাল হইতে শক্তি উপাসনা প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে মহারাজ বল্লালসেন শক্তি-মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনও শিবশক্তির পূজক ছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় শক্তির উপাসক ছিলেন, তৎপরে কৃষ্ণানন্দ-আগমবাগীশ, তন্ত্রশাস্ত্রের ও তাহার সাধনাদি কার্য্যাবলীর বাহুল্য ঘটাইয়া যান। তিনি সুপণ্ডিত, সুসাধক (নবদ্বীপে লব্ধজন্মা) ছিলেন, তাহার তন্ত্রসার তন্ত্রশাস্ত্রের গভীর গবেষণা পরিপূর্ণ গ্রন্থ। তাহার পরে অনেকেই অতি বৃহৎ তান্ত্রিক সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মেহারে (নোয়াখালী জেলায়) একশত বৎসর পূর্ব্বে এক সিদ্ধ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাহার সিদ্ধ-পীঠ মেহার নামক স্থানে এখনও জাগ্রত রহিয়াছে। তাঁহার বিরচিত "সর্ব্বোল্লাসতন্ত্র"

অতি পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বপূর্ণ। সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহোদয়ের বংশে এখনও সাধনা-তৎপর শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। *

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারক ৺স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে ব্রহ্মের স্তব গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয় মত-পোষক প্রকরণ ও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানগুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যও পরিশেষে শক্তি প্রাধান্য স্বীকার করিয়া "আনন্দ-লহরী" নামক গভীর গবেষণা পূর্ণ বৃহৎ শক্তিস্তব রচনা করিয়া শাক্তমত সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ স্তবের দ্বৈত এবং অদ্বৈত ও মন্ত্রোদ্ধারের বিষয়ে নানা ব্যাখ্যা আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। বুক্ক নরেন্দ্র-সচিব শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য (বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর) সূতসংহিতা ভাষ্যে শক্তিতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

সাম্প্রাদায়িক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের (মত বা শাস্ত্রে) বিজ্ঞান করিয়া গিয়াছে; যথা—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে—"লিঙ্গার্চ্চন পরাঃ শৈবা নাস্তিকাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ," ইহা মাধ্য সম্প্রদায়ে বৈষ্ণবগণের (শৈবের প্রতি)। আবার শৈবগণও বৈষ্ণবগণের প্রতি পাল্‌টায় বলিয়াছেন—'তপ্ত-মুদ্রাঙ্কিতনুর্নাস্তিকং ধর্ম্মমাশ্রিতঃ"। "পশুতুল্যঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকর্ম্ম সুগর্হিতঃ"॥ এইরূপ স্মার্ত্ত ও পৌরাণিকগণ কোন কোন স্থানে তন্ত্রের সৎ ও অসৎ বিষয়ের

* চন্দ্রশেখর তীর্থের প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের সমাসন্ন ভূমিতে চট্টগ্রামে কতিপয় মহাশক্তি-সাধনা-সিদ্ধ পুরুষ জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, (১) কাশ্যপীয় ৺রুদ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য—ইনি স্বীয় কঠোর সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তাহার প্রভাবে শঙ্খনদীর উপশাখার গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ সাধক ও ভক্ত ৺শুক্লাম্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও স্বীয় অভিনব খনিত সরোবরে একটী মৃত পতিত পশুকে জীবিত করিয়াছিলেন। ইহাঁদের বংশধরেরা এখন বিখ্যাত ও সাধনা তৎপর আছেন। (২) অপর মহারাজ ভট্টাচার্য্য—ইনিও (রাঢ়ী শ্রেণী) এবং শক্তিমন্ত্র-সিদ্ধ ছিলেন, এক সময় চট্টগ্রামের কোনও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভূপতি তাঁহার সিদ্ধমন্ত্রের পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন, ইহার ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার জন্য উক্ত মহারাজ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নির্ভয়ে সেই মুহূর্ত্তেই নিজের সিদ্ধ মন্ত্র একটী বোধিদ্রুম পত্রে লিখিয়া নিকটবর্ত্তী স্রোতস্বিনী নদীতে ভাসাইয়া ছিলেন। অনন্তর মন্ত্রযুক্ত পত্রটি সরিৎ প্রবাহের প্রতিকূলে তীব্রবেগে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া ঐ মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মহারাজ ভট্টাচার্য্যের (রাজাবাহাদুর) শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। (৩) চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বদান্য প্রবর সুপণ্ডিত মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন বাহাদুরের পিতামহ স্বর্গীয় ৺রায় শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত বাহাদুরও শক্তিমন্ত্র সুসিদ্ধ এবং সন্ন্যাসীপ্রায় ছিলেন; তিনি স্বকীয় সাধনার উপদেশ সমুহ শেষ সময়ে সুযোগ্য পৌত্রকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে খুব পণ্ডিত ছিলেন। নিজের অতুল বিভবের প্রতি তাঁহার কখনও দৃষ্টি ছিল না জীবনের অধিক সময়ই তীর্থে ও সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে অতিবাহিত করিতেন। স্বীয় ভবনে উপাস্যদেবতা পীঠাধিষ্ঠাত্রীরূপে এখনও বিরাজমান আছেন॥

বিচার না করিয়া নিন্দা করিয়াছেন ; তদ্রূপ কোন কোন তন্ত্রেও স্মৃতি পুরাণের নিন্দা দেখিতেছি। আর শাক্ত-বৈষ্ণবের তো পরস্পর অপ্রীতির কথার পরিসীমা নাই। বোধ হয় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ও প্রাধান্য কীর্ত্তণ প্রসঙ্গেই অপরের নিন্দা (অধীরতা হেতু) আসিয়া উপস্থিত হইত, ইহা ভিন্ন অন্য কোন (পরস্পর নিন্দা চর্চ্চার) হেতু দেখিতেছি না। এই বৈদিক শক্তি তত্ত্ব প্রবন্ধে বেদ উপনিষদ্ (অপর) স্মৃতি, পুরাণাদির প্রমাণ অধিক পরিমানে থাকা সত্ত্বেও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম না ; ইহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে সে সমস্ত অনুক্ত প্রমানাবলী উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই মাত্র যে—বৈদিক যুগেও শক্তির আরাধনা হইত, কেবল তান্ত্রিক সময়ে নয়। ভারতের বাহিরে হিন্দু উপনিবেশ সমূহে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বালি, চীন, মরিসস্ প্রভৃতিতে যে সকল প্রাচীন দেব মন্দিরের এখনও পরিশেষ আছে, সে সকল মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ বহু শক্তি মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, এবং ঐ সকল দেশীয় হিন্দুগণ শক্তির উপাসনা করিত, যে তাহার ভূয়ো নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন তির্ব্বত, চীনদেশীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষে শক্তি দেবতার আরাধনা প্রচলিত আছে। (ক্রমশঃ)

বিদ্যারত্নোপাধিক—শ্রীঈশ্বর চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ।

———

অর্ঘ]

দুর্গারাণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শৈলজা দুর্গারাণীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসনাথের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল ; তৎপরে উভয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ভৈরবের মন্দিরে গেল ; সেখান হইতে গণেশ গুহাতে গমন করিয়া ভগবান্ গণপতিকে প্রণাম করিল। তৎপরে কালী, জগদ্ধাত্রী ও লক্ষ্মীর মন্দিরে দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বশেষে কাত্যায়নীর মন্দিরে গমন করিল। এই মন্দিরটি পর্ব্বতের নিম্নভাগে অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গন উন্মুক্ত ও প্রশস্ত ; তাহার চতুর্দ্দিকে বিল্ববৃক্ষ, জবাবৃক্ষ, করবী বৃক্ষ, স্থলপদ্ম বন ও শেফালিকা বন। ঠাকুর দালান ও দেবীর মন্দির পর্ব্বত গাত্র হইতে খোদিত। স্তম্ভশ্রেণী বিচিত্র কারুকার্য্যময়

ও দেখিতে পরম রমণীয়। তাহাদের উপরিভাগে প্রস্তর মধ্যে দেবীলীলা উৎকীর্ণ হইয়াছে। দেবীর মূর্ত্তিও মনোহারিণী। ভাস্কর এই মূর্ত্তি খোদিত করিতে অদ্ভুত শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে। আজ ষষ্ঠ্যাদি সঙ্কল্প হইবে ; এইজন্য মন্দির ও ঠাকুর দালান সুমার্জ্জিত হইয়াছে এবং দেবী নানাবিধ মূল্যবান ভূষণে সুসজ্জিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ পুরোহিত দেবীর সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া নিমীলিত নেত্রে আগমনী গাহিতে ছিলেন :—

“গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এল পাষাণি, তোর ঈশানী।”

এমন সময়ে শৈলজা ও দুর্গারাণী ঠাকুর দালানে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবতীকে প্রণাম করিল। বৃদ্ধ হঠাৎ নয়ন মেলিয়া অলৌকিক রূপ লাবণ্যবতী দুর্গারাণীকে দেখিয়া বিস্ময়ে যেন বিহ্বল হইলেন। পরে বধুমাতার সহিত তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “মা, তুমি কে গো ?”

দুর্গারাণী কি উত্তর দিবে, প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারিল না। পরে বলিল “আমার নাম দুর্গারাণী।”

বৃদ্ধের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন,—“তোমার নাম দুর্গারাণী” ? আচ্ছা, এমন নাম তুই কোথায় পেলি মা ? এ যে সত্য সত্যই তুই আমার দুর্গারাণী ! মা আমার কতস্থানে কতরূপে বেড়াচ্ছে গো ! বোস্ মা বোস্ ; বৌমা, তুমিও বসো।”

উভয়েই তাঁহার সম্মুখে বসিল। বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে শৈলজা সংক্ষেপে দুর্গারাণীর পরিচয় প্রদান করিল। তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ আহ্লাদে গদ্গদকণ্ঠ হইয়া বলিলেন,—“মা দুর্গারাণি, তুই সাক্ষাৎ উমা। মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য মা আমার কৈলাসে যেমন তপস্যা ক’রেছিলেন, তুইও আজ তেমনি এই কৈলাস গিরিতে তপস্বিনী বেশে এসেছিস্। বাবা কৈলাসনাথ তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন। মা তুইও যেমন দুর্গারাণী, তেমনই আমাদের হরনাথও সাক্ষাৎ শিব। তুই তারই যোগ্য, আর সেও তোরই যোগ্য। এই যে ! বাবা হরনাথের কথা বল্‌তে বল্‌তেই তিনি এসে হাজির ! বাবা হরনাথ, তুমি আমার এ দুর্গারাণীকে দেখেছ ? দেখ দেখি, আমার মায়ের কেমন রূপ ! আচ্ছা, আমার মাকে কখন আমার বাবার পাশে দাঁড়াতে দেখ্‌বো ? কবে আমি তাদের মিলন দেখে হরগৌরীর মিলন প্রত্যক্ষ কর্‌বো ?”

হরনাথ বৃদ্ধ পুরোহিতের উচ্ছ্বাস দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “মুখুয্যে

মশাই, সবই বাবা কৈলাসনাথের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না এবং তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। দুর্গারাণীকে আমি দেখেছি এবং গুণের কথাও শুনেছি। এঁর মত ধর্ম্ম পত্নীলাভ করা সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাগ্যবল চাই।"

বৃদ্ধ পুরোহিত বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে বাবা, আমি তোর ভাগ্য আর এঁর ভাগ্যও দেখ্‌তে পাচ্ছি। বাবা কৈলাসনাথ তোমাদের উভয়কে উভয়ের জন্য অভিপ্রেত ক'রেছেন। আমি আজ পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে বাবা কৈলাসনাথ আর মা ভগবতীর পূজা ক'র্‌ছি। আমার কথা কখনও মিথ্যা হ'বার নয়।" ঠিক্ সেই সময়ে গৃহকোণে একটা টিক্‌টিকী ডাকিয়া উঠিল এবং একটী কোকিল সহসা কুহু কুহু রবে সেই স্থান ঝঙ্কৃত করিয়া উঠিল। *

বৃদ্ধ পুরোহিত বলিয়া উঠিলেন,—"তারা—তারা, জগদম্বা! তুই মা সত্য।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পূজার কয়েকদিন কাত্যায়নীর মন্দিরে বিলক্ষণ সমারোহ হইল। চারি পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও বহু নরনারী জগন্মাতার পূজা দেখিতে আসিল। প্রত্যহ ব্রাহ্মণ ভোজন ও দরিদ্র ভোজন হইতে লাগিল। আনন্দময়ীর পূজোৎসবে সকলে আনন্দময় হইল। কাত্যায়নীর মূর্ত্তি চির প্রতিষ্ঠিতা। সুতরাং তাঁহার আহ্বানও নাই, বিসর্জ্জনও নাই। তাঁহার মন্দিরে এবং অন্যান্য মন্দিরেও যেরূপ নিত্য পূজা হয়, সেইরূপ পূজা হইতে লাগিল। হরনাথ পূজার পর কৃষ্ণপুরে গমন করিলেন। যে কয়েকদিন তিনি কৈলাসপুরে ছিলেন, দুর্গারাণী অন্যান্য মহিলাদের সহিত কাত্যায়নীর মন্দিরে পূজা ও আরতি দেখিতে আসিয়া প্রত্যহ অলক্ষিতে তাঁহাকে দেখিয়া যাইত। হরনাথের দেবোপম সৌম্য ও সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া দুর্গারাণী নিজ হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস অনুভব করিতে লাগিল।

পূজার পর হরনাথ নিজ বাটীতে গমন করিলে দুর্গারাণী চারিদিক যেন শূন্য দেখিতে লাগিল। মন্দাকিনী ধারায় স্নান করিয়া শিব পূজা করিবার সময় সে মানস চক্ষে কেবল হরনাথকেই দেখিতে পাইত। কাত্যায়নীর মন্দিরে হরনাথ যে স্থানটিতে বসিয়া পূজার মন্ত্র বুঝাইতেন, দুর্গারাণী সেই স্থানটি শূন্য

* শরৎকালের কোকিলের কুহুস্বর শ্রবণে পাঠক পাঠিকাবর্গ চমকিত হইবেন না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার ছোট নাগপুরের অনেক স্থানে বারমাস কোকিল ডাকে। যে কৈলাস গিরিতে চির বসন্ত বিদ্যমান, সেখানে যে বসন্তসখাও থাকিবে তাহার আর বিচিত্রতা কি?

দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিত। বৌ-দিদির সহিত প্রথম দিন মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিবার সময় যে স্থানে হরনাথের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থানটি তাহার সুমধুর স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়াছিল। সে প্রত্যহ সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইত, কিম্বা শৈলজা সঙ্গে থাকিলে মৃদু মন্দ গতিতে চলিত এবং মনে করিত হয়ত তাঁহার সহিত আবার সেই স্থানে হঠাৎ সাক্ষাৎ হইবে? সে কাত্যায়নীর মন্দিরে আসিয়া বৃদ্ধ পুরোহিতের সহিত গল্প করিতে করিতে যখন পূজার জন্য পুষ্পমালা ও বিল্বপত্র মালা গাঁথিত, তখন কাহারও সামান্য পদশব্দে চমকিত হইয়া মনে করিত বুঝি হরনাথ মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে-ছেন! হরনাথের সেই দিনের সেই কথাটি সর্ব্বদাই তাহার হৃদয়ে জাগিতেছিল। 'দুর্গারাণীর মত ধর্ম্মপত্নী লাভ করা সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাগ্যবল চাই।" দুর্গারাণী সেই কথার অর্থ ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিত "কার ভাগ্যবল? তাঁর না আমার? আমি কি তাঁর যোগ্যা? কত তপস্যা ক'র্‌লে তাঁর মত স্বামী পাওয়া যায়। আমার কি গুণ আছে? আমার কি গুণের কথা তিনি ব'ল্‌লেন? ছি, ছি, ছি—তাঁর কথা শুনে আমার বড় লজ্জা হ'য়েছিল। তাঁর মত স্বামী পেলে আমিই সৌভাগ্যবতী হ'ব। তাঁর আর সৌভাগ্য কি?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দুর্গারাণী কখন কখন কৃষ্ণ-পুরে হরনাথের বাটীর কথা চিন্তা করিত। বাটীটি কেমন সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাটীর প্রশস্ত উঠানের মধ্যে নিবিড় পত্র পল্লব সমন্বিত বকুল গাছটি পক্ষীর কলরবে সর্ব্বদাই কেমন মুখরিত! হরনাথের গৃহে রাশীকৃত কত বই ও পুঁথি! এই সমস্ত বই তিনি পড়িয়াছেন! হরনাথের জননী কেমন স্নেহময়ী! আচ্ছা, তিনি একাকিনীই সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করেন, এবং একাকিনীই রন্ধন করিয়া সকলকে ও টোলের ছাত্রগণকে খাওয়ান। দুর্গারাণী যখন সেখানে যাইবে, তখন তাহার পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইবে। দুর্গারাণী নিজেই রন্ধন করিয়া স্বামীকে ও তাঁহার ছাত্রগণকে খাওয়াইবে, এবং স্বামীর অবসর সময়ে তাঁহার কাছে বসিয়া কত শাস্ত্রের কথা ও কত দেবদেবীর কথা শুনবে। দুর্গারাণী আরও ভাবিত, সে প্রত্যহ প্রত্যুষে তালপুকুরের সেই বাঁধা ঘাটে স্নান করিয়া সর্ব্বাগ্রে শিবের পূজা করিবে, তারপর গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। যে দিন পাহাড়ের নীচে শ্রীনাথবাবু ও হরনাথের সহিত তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেদিনের কথা দুর্গারাণী এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলে নাই। সে কি সুন্দর ও চমৎকার ব্যাপার! স্বামীর সহিত তাহার সেই প্রথম সাক্ষাৎ! হরনাথকে

দেখিয়া তাহার কত লজ্জা ও আনন্দ হইয়াছিল! হরনাথও তাহাকে দেখিয়া কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছিলেন। বিবাহের পর সেই ঘটনার কথা তুলিয়া দুর্গারাণী হরনাথকে কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু দুর্গারাণী হরনাথের প্রশ্নের কোনও যথার্থ উত্তর দিবে না; সে ভারি মজা হইবে!

"ও রাণি, ও রাণি, সন্ধ্যে হ'য়ে গেল; এখনও তুমি একলাটি এখানে ব'সে র'য়েছ যে!" অকস্মাৎ শৈলজার কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুর্গারাণী চমকিত হইয়া উঠিল। কোজাগর লক্ষ্মীপূজার জন্য শৈল তাহাকে মন্দাকিনী হইতে এক কলস জল আনিতে বলিয়াছিল। কিন্তু সেদিন সে মন্দাকিনীর ধারে একটী শিলাতলে বসিয়া বসিয়া উক্তরূপ চিন্তাস্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছিল। কখন যে সূর্য্যদেব অস্তগমন করিয়াছেন এবং পূর্ণিমার চন্দ্র ধীরে ধীরে আকাশ কোলে উদিত হইতেছিলেন, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। বৌ-দিদির কণ্ঠস্বর শ্রবণে সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল, এবং সে অতিশয় লজ্জিতা হইয়া তাড়াতাড়ি মন্দাকিনী জলে কলস পূর্ণ করিল। শৈল হাসিতে হাসিতে বলিল "একলাটি ব'সে ব'সে এত কি ভাব্‌ছিলে? তোমার বরকে বুঝি? তোমার বরকে ক'দিন দেখ্‌তে না পেয়ে তুমি যে শুকিয়ে গেলে!"

দুর্গারাণী অপ্রতিভ হইয়াছিল, কিন্তু একটু হাস্যের ভান করিয়া বলিল "তোমার কি ধারার যে কথা, বৌ-দিদি! কেন, তাঁকে ছাড়া আর কিছু ভাববার নাই বুঝি?"

শৈল বলিল,—"নিশ্চয় নাই। তোমার মন এখন হরময় হ'য়েছে। তিনিও দুর্গাময় হ'য়েছেন। ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছে?"

দুর্গারাণী বিস্মিত হইয়া বলিল,—"তুমি ক্ষেপেছ না কি? তিনি রইলেন কৃষ্ণপুরে, আর আমি রইলাম এখানে। তাঁর সঙ্গে মনে মনে দেখা হ'বে না কি?"

শৈলজা বলিল "মনে মনে তো দিবানিশি দেখা হ'চ্ছেই। এখন চোখে চোখে দেখা ক'রবে চল। তিনি লক্ষ্মী পূজো ক'রাতে এসেছেন। লক্ষ্মীর মন্দিরে গেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'বে। চল, আমিও সেখানে যাচ্ছি।

দুর্গারাণী লজ্জায় কক্ষ হইতে কলস নামাইয়া দিয়া বলিল, "না, আমি এখন সেখানে যাব না। তুমি যাও।" এই বলিয়া পাশ কাটাইয়া বাটীর দিকে দ্রুতপদে নামিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ। অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২১। ৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

[মোক্ষ]

স্তব্ধা।

১

মানস-লোচনে পেখল রাই;
'অপর বধূ সঞ্জে মিলল কানাই।'
কহইতে লাগল ভুলি' অভিমান,—
কামিনী অন্তর কো বিহি জান?

২

"আজু কোই কুলবতী, হাম'সে গুণবতী পাওল মধুরিপু সঙ্গ?
তোষয়িতে তছু মন করতহি সুযতন রসরাজ কতহুঁ তরঙ্গ!

৩

"ধনী মুখমণ্ডল লেই নিজ করতল রচতহি তিলক মধুর;
শোহই—বৈছন কালিম-লাঞ্ছন সমুজল বদন বিধুর!

৪

"জলদ পটল নিভ রুচির চিকুর ধরি" হিঙ্গুল-অঙ্গুলী মাহ.
আনত মুখে, তঁহি কুরুবক-ফুলদলে কবরী বনাওত নাহ।

৫

"মৃগ-মদে রঞ্জয়ি তারা-হার দোলয়ি গণতহি হৃদয় কি ঘাত;
গুরু তছু কম্পন করতহি জ্ঞাপন মাতল মরম কি বাত।

৬

"নায়িকা-পাণিতল জনু নলিনীদল, ভুজযুগ বিশদ মৃণাল;
তঁহি পর অলি যনি মরকত-কাঁকনি দেওত নন্দ-দুলাল।

৭

"প্রেম-পুলকময়ী তা'কর অরুণিম কিশলয়-রুচির চরণ;
ধারয়ি হৃদিমাহ, যাবক রঞ্জিতে রঞ্জই উরস আপন।

৮

"এত লখল যব, লাজহি নীরব বালি-বদনে মৃদুহাস,
নয়ন নিমীলয়ি গদ গদ কূজয়ি ঘন ঘন ছোড়ত শ্বাস।

৯

"তৈথন মঝু পঁহু হাসয়ি লহু লহু বাহু পসারয়ি দেলি,
সব কছু পাশরি' ভীত কপোতিনী নাহ-হৃদয়ে নীড় নেলি।

১০

"কতি সুখ-ভাগিনী শ্যাম-সোহাগিনী যা' পর অনুকুল কান্ত,
মাধব-বঞ্চিতা— ভুজঙ্গ ভনতহি— লুটাওব তছু পদ-প্রান্ত।"

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

মোক্ষ]

উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য ভূমা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

অনুভব।

"মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ জ্ঞান-প্রবাহা-বিমলাদি-গঙ্গা" — শঙ্করাচার্য্যঃ।

যেখানে এই সমস্ত নাই, ইহার বৃত্তিও নাই, তাহার পরে যাহা শেষ সত্ত্বা থাকে, তাহা আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, নিস্মল, অনন্ত, পরম শূন্য, যেখানে শূন্যেরও অভাব, শান্ত, এক অদ্বিতীয়, বায়ু ব্যতিরেকে, আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, জ্ঞানাত্মক, স্বয়ংবেদ্য

পেথল-দেখিল, সঞে-সঙ্গে, বিহি-বিধি, জান-জানে, কোই-কোন্, হাম'সে-আমা হইতে, তছু-তাহার, লেই-লইয়া, শোহই-শোভে, যৈছন-যেমন, সমুজল-সমুজ্জ্বল, বিধুর-চন্দ্রের, মাহ-মধ্যে, তঁহি-তাহাতে, নাহ-নাথ, মৃগমদে-কস্তুরীতে, মাতল-মত্ত, যনি-যেন, তা'কর-তাহার, যাবক-অলক্ত, এত-এইসব, লখল-লখিল, লাজহি-লজ্জায়, বালি-বালা, তৈথন-তথনি, পঁহু-প্রভু, লহু-লঘু,

নির্গুণ ব্রহ্ম।

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্মঃ সদানন্দো নিরাময়ঃ।
বিকার রহিতঃ সাক্ষী শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ॥"

ব্রহ্মের চমৎকার বা চমক্ বৈদূর্য্যমণির ন্যায় শক্তির স্ফুরণোন্মুখতা। ইহা স্বাভাবিক সর্ব্বেশ। যখন বোধের বশে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্ষয় হয়, তখন যাহা শেষ থাকে, তাহা সম্বিৎতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব। ব্রহ্ম আদি নাম দ্বারা কথিত শুদ্ধ, আকাশ হইতে সূক্ষ্ম, যাহার সমক্ষে আকাশও স্থূল, যেরূপ অণুর সমক্ষে সুমেরু স্থূল।

সম্বিৎতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব।

সৃষ্টিক্রমঃ। "আদৌ সচ্চিদানন্দাল্লীনা শক্তিরুচ্ছূনরূপতয়াঽভিব্যক্তা"।

তাহাতে যে বেদনা শক্তি আভাস রূপে স্ফুরিত হয় তাহার নাম চেতন।

সম্বেদন—"পার্থক্যেন ব্যবহার্যোঽভূৎ"।

ব্রহ্মের চমক্ দর্শন দ্বারা বালকের বৈতাল দর্শনের ন্যায় তাহার লাটকে "অহমস্মি" রূপে আপনাকে 'অহং' জ্ঞান করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ ব্রহ্মের চমক্‌কে "আমি" বলিয়া বোধ। এই 'অহং জ্ঞানের' সহিত চেতন-কলা বা স্পন্দ-কলা মিলিত হইয়া নিত্যা

মহামায়া বা পরাশক্তি।

"তস্মাদ্বিনির্গতা নিত্যা সর্ব্বগা বিশ্ব-সম্ভবা"। "সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ"। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ"।

"শিবেচ্ছয়া পরাশক্তিঃ শিবতত্ত্বৈকতাং গতা।
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ স্বর্গে তৈলং তিলাদিব॥"

পরাশক্তির দুই অবস্থা—পূর্ব্বাবস্থা এবং উত্তরাবস্থা। যখন শিবোন্মুখী বা নিরাময় পদোন্মুখী 'হুং'রূপ তখন তাহাকে পরাশক্তি কহে। এবং যখন প্রবুদ্ধ হন, তখন তিনি নাদাত্মক হয়েন।

পরাশক্তি (ত্রিপাদ পুরুষ) নাদাত্মক (একপাদ)

নাদ—

"পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

নাদ (পূর্ব্বাবস্থা)

চেতন আকাশে মহামায়ার স্বত্ব-বৃত্তি দ্বারা সৎ চিৎ আনন্দরূপ জ্ঞানে পরব্রহ্মের লাটে স্থিতি।

পরমাত্মা

মধ্যসামানাধিকরণ "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য দ্বারা উভয়ের একতা এবং পরমাকাশে স্থিতি

বিন্দু (উত্তরাবস্থা)

মহামায়ার স্বত্ব-বৃত্তি দ্বারা (চৈত্য) সৎ চিৎ আনন্দের বৃত্তিকে আপ্ তেজ অন্ন রূপ জ্ঞানে আনন্দকে অন্য বস্তু রূপে দর্শন।

প্রত্যগাত্মা

জীব সংজ্ঞা—(অবিদ্যা উপহিত চৈতন্য)

নাদের ঘনীভাব ক্রিয়া প্রধান অবস্থা। স্বপ্ন নগরীর ন্যায় চিদ্‌ঘন আত্মার আশ্রয়ে উৎপন্ন হইয়া জীব আপনার শরীরকে দেখে।

সত্য — জ্ঞান — অনন্ত — আনন্দ

চিন্মাত্র জ্যোতির সন্নিধি বশতঃ সেই তত্ত্ব-সংজ্ঞা নাদ ঘনীভূত হইয়া বিচিকীর্ষু অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন হইয়া বিন্দুতা প্রাপ্ত হন। ঐ বিন্দু চিদ্‌শক্তি উভয়াত্মক। ক্ষোভ ক্ষোভক এবং সম্বন্ধ রূপে ত্রিবিধ।

ঈশ্বর (সমষ্টি অজ্ঞানে অভিব্যক্ত)

ক্ষেত্রজ্ঞ — সাক্ষী — কূটস্থ — অন্তর্য্যামী

ক্রিয়াশক্তি প্রধান বিন্দুরূপী প্রকৃতি হইতে অখণ্ড শব্দ ব্রহ্মাত্মা "খ" (নাদ মাত্র)। এই শব্দ ব্রহ্ম - শব্দার্থ রূপ অণ্ডের স্ফোটও নহে এবং শব্দ রূপ বাহ্য স্ফোটও নহে, উভয় শব্দের জড়ত্ব হেতু এবং তাহাদের সম্বন্ধে ব্রহ্ম শব্দের অনর্থকত্ব হেতু শব্দ ব্রহ্ম চৈতন্যই হন। এই শব্দ ব্রহ্ম পরা নামক শব্দাবস্থা চৈতন্যরূপী কুণ্ডলিনী শক্তি।

আদি যে জীব স্ফুরিত হইয়াছে, অথচ প্রমাদ প্রাপ্ত হয় নাই।

আপনার স্বরূপ বিষয়ে অহং প্রত্যয় রহিয়াছে এই কারণে ঈশ্বর। তাঁহার এই নিশ্চয় থাকে যে-আমি সনাতন নিত্য শুদ্ধ পরম আনন্দ স্বরূপ অব্যক্তরূপ পরম পুরুষ। এই শুদ্ধ-স্বত্ব প্রধান মায়া বিশিষ্ট বা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, যিনি সকল ব্যষ্টি জীবের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মানুসারে জানাইতেছেন। "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" ইত্যাদি।

শিবাত্মক হেতু — বিন্দু সংজ্ঞা
শক্ত্যাত্মক হেতু — বীজ সংজ্ঞা
সম্বন্ধরূপে — নাদ সংজ্ঞা

এই নাদ ও বিন্দু পূর্ব্বোক্ত নাদ ও বিন্দু হইতে ভিন্ন। পূর্ব্বোক্ত নাদ ও বিন্দু কারণ রূপ, এই নাদ ও বিন্দু কার্য্য রূপ। এই তিন হইতে তিন শক্তি।

ইচ্ছাশক্তি — রুদ্র (১)
ক্রিয়াশক্তি — ব্রহ্মা (২)
জ্ঞানশক্তি — বিষ্ণু (৩)

"মাহাত্ম শক্তিং স্বগুণৈ নিগূঢ়াং মুনয়ো বিদন্ স্বভাবাবিষ্ট-ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া চ।"

অথ অর্থ সৃষ্টি-

শম্ভুর শক্তি ভাব প্রাপ্ত অন্ন (অব্যাকৃত) হইতে অরূপ কাল সহায় দ্বারা মায়াত্মন বিন্দুরূপ প্রাপ্ত সৃষ্টিস্থিতি ধ্বংস নিগ্রহ অনুগ্রহ

উভয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ

আদি জীব উৎপন্ন হইয়া যে যে প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছেন. সেইরূপ হইয়া স্থিত হইয়াছেন। বাস্তবিক আদি জীব সমেত সমস্ত অসৎ। পরমাকাশের এক নিমিষে উৎপত্তি আর উন্মেষে লয়। কেবল অহঙ্কারের সহিত বাসনার সম্বন্ধ হওয়াতে আকার দর্শন। এই মলিন স্বত্ব প্রধান অবিদ্যা বিশিষ্ট বা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীবাত্মা ব্যষ্টি, যিনি কর্ম্মানুসারে নানারূপে জন্ম মরণ পথে পরিভ্রমণ করেন।

পরাশব্দ (মূলাধারে অভিব্যক্ত)

"সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়-স্বরূপিণী।
অশ্রোত্র বিষয়া তস্মাদ্গচ্ছ কুণ্ডার্দ্ধগামিনী॥"

পশ্যন্তি (স্বাধিষ্ঠানে অভিব্যক্ত) — মধ্যমা (হৃদয়ে অভিব্যক্ত) — বৈখরী (জিহ্বাতে অভিব্যক্ত)

"স্বয়ম্প্রকাশা পশ্যন্ত সুষুম্নাশ্রিতা ভবেৎ।
শৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিনী॥
ততঃ সঙ্কল্পমাত্রাস্যাদিবিভক্তোর্দ্ধগামিনী।
সৈবোরঃ কণ্ঠতালুস্থা শিরোঘ্রাণরদস্থিতা॥
জিহ্বা মূলোষ্ঠ নিষ্ঠ যুত রূপ বর্ণ পরিগ্রহা।
সর্ব্ব প্রপঞ্চ জননী শ্রোত্রগ্রাহ্যা তু বৈখরী॥"

ইয়ং শব্দ সৃষ্টিঃ——বেদরাশি

"অস্য মহতো ভুতস্য নিশ্বসিতং ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহ-থর্ব্বাঙ্গীরসঃ" (বেদঃ)

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ" চণ্ডী

শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ সহিত ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব

- শব্দ বিদ্যা
  - তপ
    - অহং গ্রহাদি উপাসনা ও তাহার ফল
      - দেবযান মার্গ দ্বারা
        - ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি
  - কর্ম্ম
    - অগ্নি হোত্রাদি ইষ্টং, বাপিকূপ তড়াগাদি পূর্ত্তংকর্ম্ম,
      - সকাম
        - পিতৃযান মার্গ দ্বারা
        - স্বর্গ লোক প্রাপ্তি।
      - নিষ্কাম
- ব্রহ্ম বিদ্যা
  - শ্রবণাদি সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান
    - মোক্ষ বা নির্ব্বাণ মুক্তি

ধর্ম্ম অর্থ কাম — অভ্যুদয়

চিত্তশুদ্ধি — নিঃশ্রেয়স

কার্য্য পঞ্চকের কর্ত্তা অতএব জগন্নির্ম্মাণ বীজ রূপ জগৎ সাক্ষী সদাশিব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তৎপরে ক্রমশঃ ঈশ, রুদ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সমস্ত সৃষ্টির মূলরূপ অব্যাকৃত হইতে সৃষ্টি উন্মুখ বিন্দু, বিন্দু মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইল।

- শান্ত বা অবিকল্প
  - বীজ বা ওত সদাশিব
    - পূর্ব্বাবস্থা
      - আপ্ — রজ
      - তেজ — সত্ত্ব
      - অন্ন — তম
      - সাম্যাবস্থা অব্যাকৃত (প্রকৃতি)
    - উত্তরাবস্থা
      - অন্ন বা অব্যাকৃত (ঈশ)
        - বিন্দু (মায়াত্মন)
          - মহত্তত্ত্ব বা চিত্ত সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব
            - সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্ব
            - রাজসিক মহত্তত্ত্ব
            - তামসিক মহত্তত্ত্ব
  - বিন্দু বা অনুজ্ঞাতা
  - শক্তি বা অনুজ্ঞা

বিষ্ণু (৩)	ব্রহ্মা (২)	রুদ্র (১)
বৈকারিক অহঙ্কার	তৈজস অহঙ্কার	ভূতাদি তামস্ অহঙ্কার
দেবতাগণ, দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মন ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।	দশ ইন্দ্রিয়	আপ্, তেজ, অন্ন এই তিনের ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা অপঞ্চীকৃত আকাশ।

অপঞ্চীকৃত আকাশ

কার্য্যগুণ (শব্দ তন্মাত্র)

অপঞ্চীকৃত বায়ু

- কারণ গুণ: শব্দ
- কার্য্যগুণ: স্পর্শ তন্মাত্র

অপঞ্চীকৃত তেজ

- কারণ গুণ: শব্দ ও স্পর্শ
- কার্য্যগুণ: রূপ তন্মাত্র

অপঞ্চীকৃত জল

- কারণ গুণ: শব্দ স্পর্শ রূপ
- কার্য্যগুণ: রস তন্মাত্র

অপঞ্চীকৃত পৃথিবী

- কারণ গুণ: শব্দ স্পর্শ রূপ রস
- কার্য্যগুণ: গন্ধ তন্মাত্র

অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত।

এইরূপে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বরূপে পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চ স্থূল মহাভূত সৃষ্ট হইল।

আকাশ — বায়ু — তেজ — জল — পৃথিবী

পঞ্চীকৃত আপ্ বহুল পঞ্চ মহাভূত হইতে (অপ্)

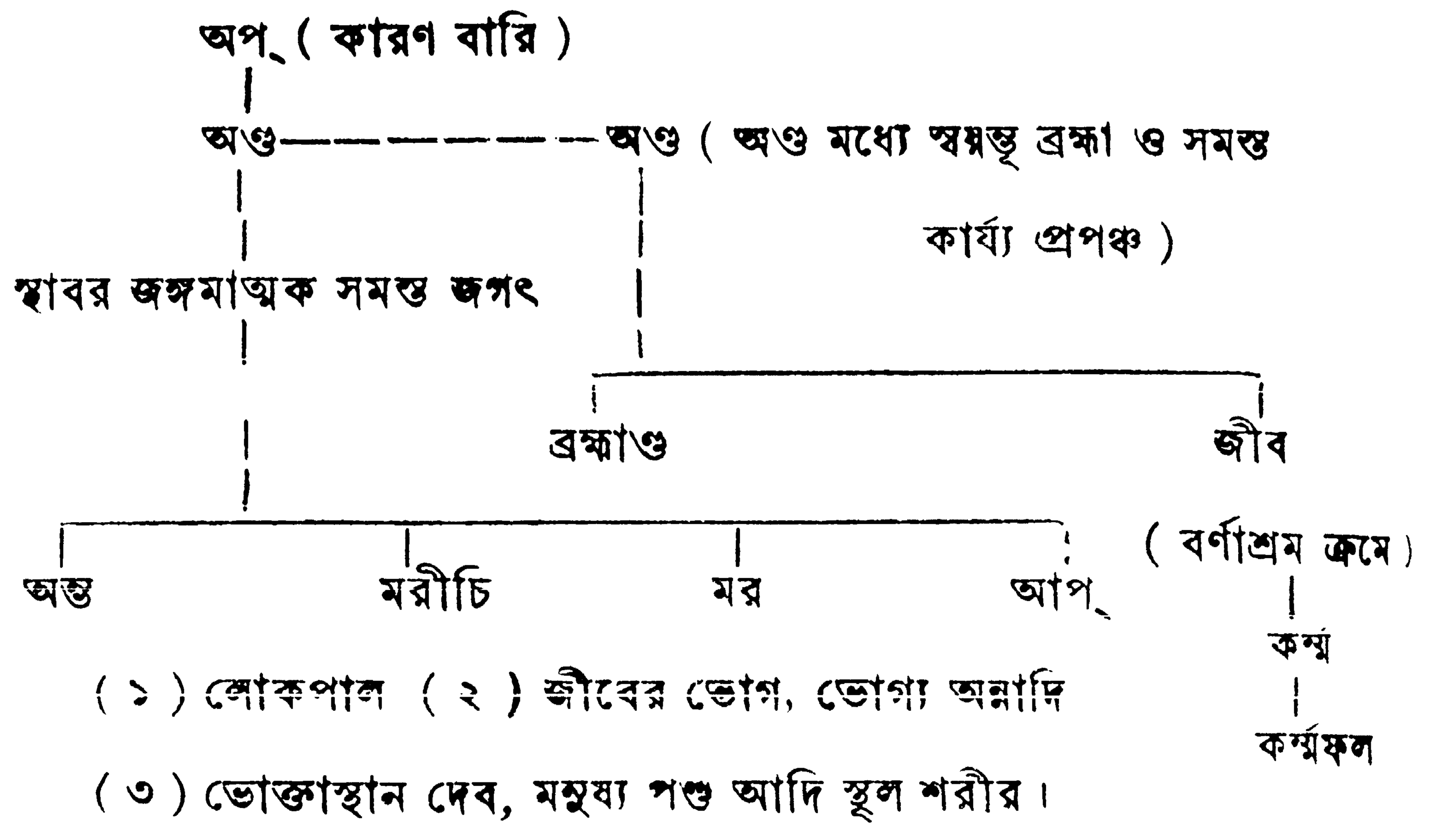

"অপ্ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজ মবাসৃজৎ।
তদণ্ড মভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভম্॥" (মনু)

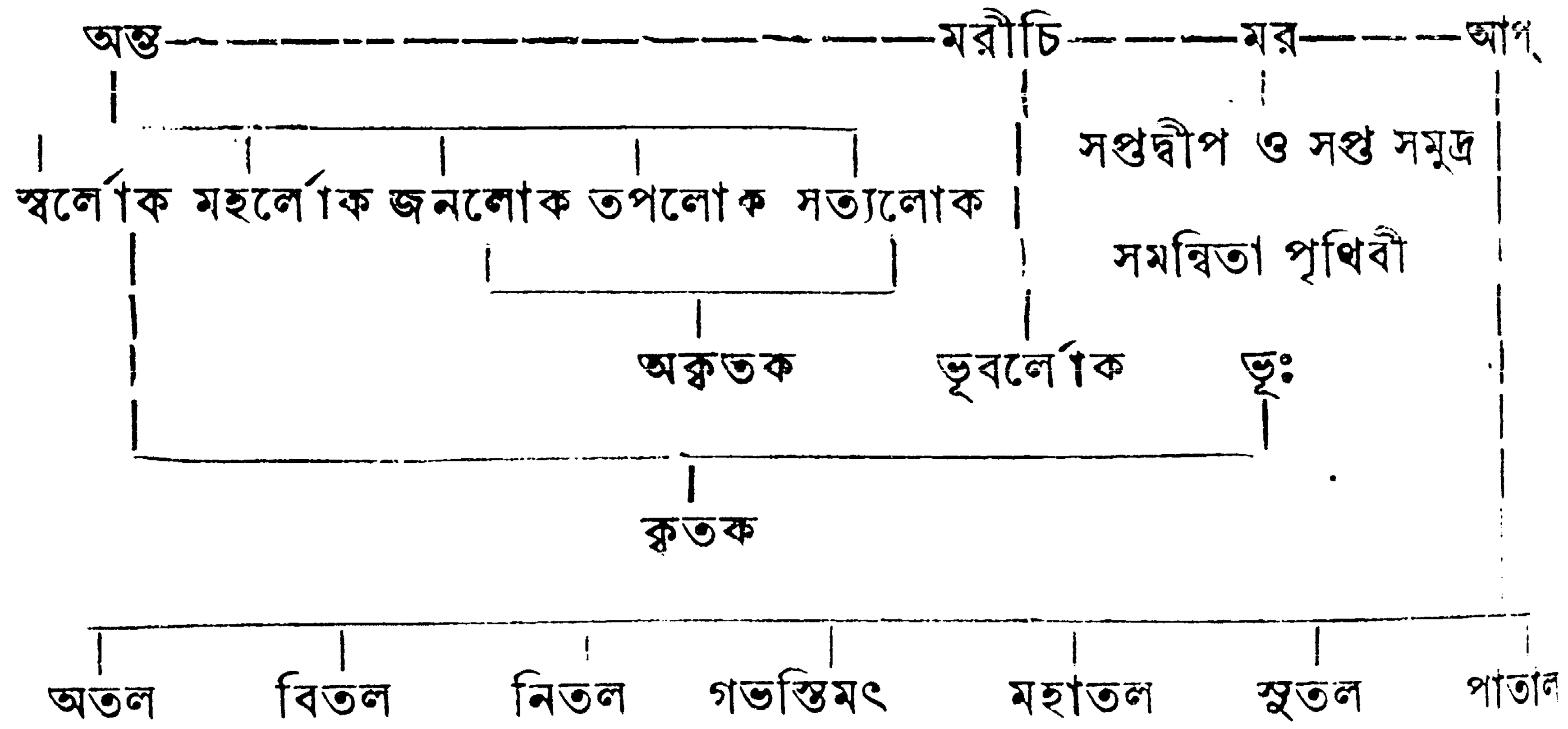

মহামায়ার পূজা।

"যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্॥"
"সচ্চিদ্সুখৈকং জগদাত্মরূপং, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপং॥ শঙ্করাচার্য্যঃ,

ছান্দোগ্য উপনিষদোক্ত নারদ ও সনৎকুমার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া এক্ষণে সর্ব্ব জ্ঞানের সমুদ্র গৌরীশকে ভগবান বশিষ্ট দেব ভূমা বিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রকলাধারী তাঁহাকে যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করা যাইতেছে। বশিষ্ট বলিলেন "হে ভগবন্ আপনি ভূত

ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালের ঈশ্বর এবং সর্ব্ব কারণের কারণ; আপনার প্রসাদে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইয়াছি। হে মহাদেব! যাহা কিছু আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন চিত্তে তত্ত্ব বিষয়ে উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া শীঘ্র বলুন। হে সর্ব্ব-পাপ নাশক এবং সর্ব্ব-কল্যাণ বর্দ্ধক! দেব অর্চ্চনার বিধান আমাকে উপদেশ দিন।" ঈশ্বর বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! যে দেব-অর্চ্চনা শ্রেষ্ঠ, যাহা করিলে মনুষ্য সংসার-সমুদ্র হইতে পার হইয়া যায় তাহা শ্রবণ কর। হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ! পুণ্ডরীকাক্ষ যিনি বিষ্ণু, তিনি দেব নহেন, ত্রিলোচন যিনি শিব, তিনিও দেব নহেন, পদ্মযোনি যিনি ব্রহ্মা, তিনিও দেব নহেন, এবং সহস্রাক্ষ ইন্দ্রও দেব নহেন, পবনও দেব নহেন, সূর্য্যও দেব নহেন। অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, তুমি, আমি, এই দেহ, চিত্ত এবং রূপ কেহই দেব নহে; অকৃত্রিম, অনাদি অনন্ত সম্বিদ্ রূপই দেবনামে কথিত হন। অপর আকারাদি পরিচ্ছিন্ন রূপ, তাহা বাস্তবিক কিছুই নহে। এক অকৃত্রিম অনাদি অনন্ত চেতনরূপ দেব আছেন, সেই দেব মহামায়া শব্দ দ্বারা অভিহিত হন; তাঁহার যে পূজা, তাহাই পূজা। সেই দেব সর্ব্বত্র বিরাজিত জানিবে। যাঁহা হইতে এই সমস্ত হইয়াছে, যাহার সত্বা সান্ত আত্মরূপ; "সর্ব্ব স্থানে তাঁহাকেই দেখিবে" এই তাঁহার পূজা। যিনি সেই সম্বিৎ-তত্ত্বকে জানেন না, তাঁহার জন্য আকারের অর্চ্চনা কথিত হইয়াছে। যেরূপ যে ব্যক্তি যোজন পর্য্যন্ত না চলিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে এক ক্রোশ, দুই ক্রোশ চলা ভাল, সেইরূপ যে ব্যক্তি অকৃত্রিম দেবের পূজা করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহার পক্ষে সাকার পূজাই ভাল। হে ব্রাহ্মণ! যাঁহার ভাবনা যিনি করেন, তাঁহার সেই অনুসারে ফল লাভ হয়। যিনি প্রচ্ছন্নের উপাসনা করেন, তাঁহার ফলও প্রচ্ছন্ন লাভ হয়; এবং যিনি অকৃত্রিম আনন্দ অনন্তদেবের উপাসনা করেন, তাঁহার ঐ পরমাত্মা রূপ ফল লাভ হয়। হে সাধো! অকৃত্রিম ফল ত্যাগ করিয়া কৃত্রিমকে যে চাহে সে কি করে? যেরূপ কেহ মন্দার বৃক্ষের বন ত্যাগ করিয়া খর্জ্জুর বন প্রাপ্ত হয়, সে সেইরূপ করিয়া থাকে। সেই দেব কিরূপ, এবং তাঁহার পূজাই বা কি? এবং পূজা কিরূপেই বা হয় তাহা শুন। তিন ফুল আছে, সেই ফুল দ্বারা তাঁহার পূজা হয়। (১) এক বোধ (২) এক সাম্য, (৩) এক শম এই তিন পুষ্প। সম্যক্ জ্ঞানের নাম বোধ অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব যেরূপ সেইরূপ জানা। সাম্য অর্থে এই যে, সর্ব্ব স্থলে পূর্ণ দর্শন। শম অর্থে চিত্ত নিবৃত্তি করা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব ব্যতিরেকে অন্য কিছু

স্ফুরণ না হয়। এই তিন ফুল দ্বারা জীব চিন্মাত্র শুদ্ধ দেবের পূজা হইয়া থাকে। হে মুনীশ্বর। বোধ, সাম্য ও শম এই তিন পুষ্প দ্বারা আত্মা দেবের পূজা করা ইহাই দেবের পূজা। সাকার অর্চ্চন দ্বারা অর্চ্চনা হয় না। যিনি আত্ম সম্বিৎ চিন্মাত্র, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর জড়কে যে অর্চ্চনা করে, সে চিরকাল ক্লেশ ভোগ করে অর্থাৎ জন্ম মরণ রূপ সংসারে ভ্রমণ করে। হে ব্রাহ্মণ! জ্ঞেয় পুরুষের যে যথার্থ জ্ঞান, তাহা আত্ম ধ্যান ব্যতিরেকে অন্য পূজন অর্চ্চন বালকের ক্রীড়ার ন্যায় মানে। আত্মা ও ভগবান একই দেব। তিনি 'শব পরম কারণ রূপ. সর্ব্বদা তাঁহারই জ্ঞান, অর্চ্চন পূজন কর্ত্তব্য; অপর পূজা কিছুই নাই। ঋগ্বেদ প্রমাণে জানা যায় "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরং কিং চ নাম।" সেই এক অদ্বিতীয় বায়ু ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ঐতরেয় যথা—"আত্মা বৈ ইদমেকমগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মষৎ"। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। চেতন আকাশ অবয়ব স্বভাব নামে তুমি এক আত্মাদেবকে জান; অপর পূজ্য, পূজক পূজা এই ত্রিপুটী দ্বারা আত্মা দেবের পূজা হয় না। বশিষ্ঠ বলিলেন, "হে ভগবন্! চেতন আকাশ মাত্র। আত্মার যেরূপ জগৎ এবং চেতনকে যেরূপে জীব কহা যায় তাহা আপ'ন বলুন। ঈশ্বর বলিলেন চেতন আকাশ প্রসিদ্ধই আছে। যিনি সকল প্রকৃতি হইতে রহিত, যিনি মহাকল্পে শেষ থাকেন, তিনি নিজেই কোন রূপ হন। যেই কিছু দ্বারা এই জগৎ হইয়াছে। ঋগ্বেদ প্রমাণে জানা যায় তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে সলিলং সর্ব্বথা ইদং তুচ্ছেনাত্বভিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্ মহিনা জায়তৈকং"। অর্থ—অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যা প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। এক্ষণে দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবানের প্রথম... (হিরণ্যগর্ভঃ প্রথমঃ শরীরী) বর্ণন করিবার জন্য প্রথম মনু ভগবান উক্ত সৃষ্টি ক্রম আশ্রয় করিয়া সেই সৃষ্টিকালের পূর্ব্ব অবস্থা বর্ণন করা যাইতেছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সম্পূর্ণ কার্য্য জগৎ আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে তম রূপ হইয়াছিল। "তম এব ইদমগ্র আসীৎ" সেই তম কিরূপ? প্রত্যক্ষ প্রমাণের অযোগ্য এবং কার্য্য রূপ হেতু হইতে অনুমান করিবার অযোগ্য এবং শব্দ দ্বারাও বর্ণন করা যায় না; এবং সুষুপ্ত পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিতে অসমর্থ। পর ছায়াতে বালকের বৈতাল জ্ঞানের ন্যায় এরূপ তম এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে হইয়াছিল।

...ধানে তমের সমান আচরণ করিতে সমর্থ যে অব্যাকৃত মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি ...দের বাচ্য অর্থ রূপ জ্ঞান, সেই অজ্ঞান উপহিত সত্য বস্তুর নাম তম। এক্ষণে ...ই অর্থে "নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং কিম্বহভূতমঃ" এই শ্রুতির অর্থ প্রমাণ ...রূপে বর্ণন করা যাইতেছে। হে ব্রাহ্মণ ইহলোকে অসৎ শব্দ দ্বারা কথন করি...র যোগ্য যে অভাব, সেই অভাবও এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না। ...বং ইহলোকে সৎ শব্দ দ্বারা কথন করিবার যোগ্য যে ভাব পদার্থ, সেই ভাব পদার্থও এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না। ইহলোকের তেজের বিরোধী রূপ প্রসিদ্ধ যে অন্ধকার, সেই অন্ধকারও এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না। আর এই আকাশাদি পঞ্চভূতও ছিল না। এই দিন ও রাত্রি ছিল ... এবং প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল এই দুই প্রকার সন্ধ্যা এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল না। এই দুই প্রকার সন্ধ্যার চিহ্ন রূপ যে সূর্য্য চন্দ্রমা ইত্যাদি ...ও এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না। কিন্তু প্রসিদ্ধ তমের ন্যায় আত্মার ...রূপ আচ্ছাদন করিতে সমর্থ কারণ-তত্ত্বই এই জগতের পূর্ব্বে হইয়াছিল। ...রূপ বালক আপন পরছায়াতে বৈতাল কল্পনা করিয়া নিজেই ভয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ মিথ্যা বৈতাল নিজের স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ পরমাত্মা ...প্রত্যগাত্মা নিজের সঙ্কল্প দ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকেই জগৎ রূপে বোধ করিয়া থাকেন; বাস্তবিক উহা অন্য বস্তু—কিছুই নহে। এই কারণ-তত্ত্ব ...রূপেও জ্ঞাত নহে এবং অমৃত রূপেও জ্ঞাত নহে। এখানে সংহার করিতে ...র্থ তাহার নাম মৃত্যু এবং বৃদ্ধির কারণ রূপ যে অচ্ছিন্ন পরিণাম তাহার নাম অমৃত। সেই মৃত্যু ও অমৃত উভয়ে দ্বৈত অবস্থায় থাকে, অদ্বৈত অবস্থায় থাকে না। পুনঃ সেই কারণ-তত্ত্ব কিরূপ? এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে অস্পষ্ট নাম রূপ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে বেদান্ত শাস্ত্রে এই কারণ-তত্ত্ব অব্যাকৃত নামে কথিত হইয়াছে। সেই অব্যাকৃত নামক তত্ত্ব এই সমস্ত জগতের নাম রূপের কারণ। কিন্তু সেই অব্যাকৃত নিজে কারণের অপেক্ষা রহিত এক অদ্বিতীয় রূপ। এজন্য শ্রুতিতে ইহা স্বপর নির্ব্বাহক নামে উক্ত হইয়াছে। ইহা কেবল শ্রুতি বাক্য গম্য এবং সর্ব্ব লক্ষণ রহিত। আর ইহলোকে বাস্তব এবং বিদ্যমান পদার্থ কারণ হইয়া থাকে। অবাস্তব এবং অবিদ্যমান পদার্থ কারণ হইবে না; কিন্তু এই অব্যাকৃত নামক তত্ত্ব তো বাস্তবিক অবিদ্যমান হইয়াও এই জগতের কারণ হইতেছে। ইহলোকে অনাদি ভাব রূপ পদার্থের অবিনাশীপণা প্রসিদ্ধ আছে। যেরূপ আত্মা অনাদি

ভাব রূপ হওয়াতে অবিনাশী কিন্তু এই অব্যাকৃত নামক তত্ত্ব জড় রূপ হওয়াতে পরতন্ত্র হইয়াও অক্রিয় অসঙ্গ আত্মার সংস্রবে কর্ম্মাদির কারণ হইয়া থাকে। যেরূপ লৌহ জড় হইয়াও অক্রিয়, অসঙ্গ চুম্বকের সংস্রবে ক্রিয়াবান হয়, সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়তার বোধক অনেক প্রকার দুর্ঘট লক্ষণ বিশিষ্ট শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যুক্ত অব্যাকৃত নামক কারণ যাহার শরীর, তিনি ঈশ্বর। সলিল হইতে যেরূপ ফেন বা বুদ্‌বুদাদির সৃষ্টি হয় এবং সেই ফেন বুদ্‌বুদাদি যেরূপ সলিলেই মিশিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান প্রবাহ রূপ জগৎ বীজ যে আত্মায় নাম রূপ অব্যাকৃত ভাবে লুক্কায়িত ছিল, সেই অব্যাকৃত নাম রূপ আত্মাই সঙ্কল্প বশে জগতের উপাদান কারণ। "সঙ্কল্পাদেব তু তৎশ্রুতেঃ" (ব্রহ্মসূত্র)। এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে বিজ্ঞান বাদী বুদ্ধ মতের এবং বেদান্তমতের বৈলক্ষণ্য দেখা যাউক। বিজ্ঞান বাদ বেদের অভিমত বটে, কিন্তু বুদ্ধ যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন সে ভাবে নহে। উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে বুদ্ধ বলেন প্রতিক্ষণে উৎপত্তি বিনাশশীল বুদ্ধি-বিজ্ঞানই আত্মা। বেদান্ত মতে বিজ্ঞান যে আত্মা একথা সত্য, কিন্তু সে বিজ্ঞান ক্ষণিক বুদ্ধিবৃত্তি নহে; পরন্তু "বিজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য কথিত নিত্য নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বিজ্ঞান। বুদ্ধ বলেন দৃশ্যমান বাহ্য জগৎ সত্য নহে; ইহা কেবল আন্তর-বুদ্ধি বিজ্ঞানের বিলাস বা কল্পনা মাত্র। বেদান্ত মতে বাহ্য জগৎ—কেবল বাহ্য জগৎ কেন ব্রহ্মেতর পদার্থ মাত্রই মিথ্যা; কিন্তু তা বলিয়া জগৎ তোমার আমার কল্পনা-প্রসূত নহে। পরন্তু "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত সর্ব্বজ্ঞ শক্তি মহামায়া বা পরমেশ্বরের সঙ্কল্প প্রসূত। অতএব মূল সৃষ্টির ইচ্ছা, মায়া বা সিসৃক্ষা হইতেই জগতের সৃষ্টি। ঋগ্বেদে কথিত আছে "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।" এ সৃষ্টি আত্মার সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির একটী বিকাশ মাত্র। ঈশ্বরের তপস্যা জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ"। কার্য্যের বিকাশ ইহার অনেক পরে হইয়াছিল। যেরূপ কোন ইঞ্জিনিয়ার বিশাল রাজবাটীর আলেখ্য ইট, চুণ, কাঠ ব্যতিরেকে মনে মনে সম্পাদন করিতে পারেন, পরে মিস্ত্রীরা সেই আলেখ্য অনুসারে ইট চুণ, কাঠ দ্বারা রাজবাটী নির্ম্মাণ করে। সেইরূপ ভগবান সঙ্কল্প মাত্র জগতের আলোচনা প্রথমে করেন, পরে হিরণ্যগর্ভ (সমষ্টি মন) সেই সঙ্কল্পানুসারে মায়া উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে, নির্গুণ ব্রহ্মে শশশৃঙ্গবৎ জগতের লেশ মাত্রও নাই, পরমাত্মাতে রজ্জু সর্পবৎ কল্পিত রূপে জগৎ বিদ্যমান আছে এবং সমষ্টি পুর্য্যষ্টকাতে প্রতিবিম্বিত

আভাস আত্মা হিরণ্যগর্ভে স্থূল জগৎ লক্ষিত হয়। এই পঞ্চীকৃত "আপ্" প্রধান তরল পঞ্চভূতকে মনু ভগবান 'অপ্' শব্দেই ব্যবহার করিয়াছেন।

"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভম্" ॥

এই অপ্‌কেই কারণ-বারি বলা যায়; ইহাকেই 'কারণার্ণব' বলিয়া থাকে। (মহাভারত হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণ ও কূর্ম্ম পুরাণাদিতে দ্রষ্টব্য)। এইরূপ আত্মা হইতে যেরূপ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ বিলোমক্রমে জগৎ আত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। সমস্ত জগৎ মায়ায় প্রলীন হইলে, মায়াও ঈশ্বরে বিলীন প্রায় হইয়া থাকে। তখন আবার কোন প্রকার ব্যাপার বা ক্রিয়া না থাকায়, কিছুই নাই বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য ঐ অবস্থাই মহা প্রলয় শব্দে কথিত হয়; ঈশ্বর নিজ শরীরে সমস্ত জগতের সংহার কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। আবার তিনি ব্রহ্মে যাইয়াই বিলীন হন। ব্রহ্মকুণ্ডে বিশ্ব প্রপঞ্চের হোমকারী ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া পরমাত্মা ইন্দ্র নিজ মহিমায় হোম করেন। আবার সেই ইন্দ্রই জ্ঞান প্রবাহ বশতঃ তরঙ্গের উচ্চ নীচ জ্ঞানের ভাবে উন্মত্ত (একাগ্র) হওয়াতে সর্ব্বজ্ঞ স্বভাব প্রযুক্ত সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বিজ্ঞতা হেতু সংকল্প বশতঃ মায়ায় অভিরমণ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মের অজ্ঞান প্রযুক্ত মায়ার অধীন হইয়া বহু ইন্দ্র হইয়াছিলেন। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপোঈয়ায়'। যখন ক্রোধের বশে কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার পর যাহা শেষ থাকে তাহা সম্বিৎ-তত্ত্ব বা আত্ম-সত্ত্বা। ব্রহ্ম আদি নাম দ্বারা কথিত; তিনি শুদ্ধ, আকাশ হইতে সূক্ষ্ম; তাঁহাতে সৎ চিৎ আনন্দ পরমাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম শাস্ত্রকারগণ কল্পনা করিয়াছেন। যেখানে এই সমস্ত নাই, ইহার বৃত্তিও নাই, তাহার পরে যাহা শেষ সত্ত্বা থাকে, তাহা আকাশ হইতে সূক্ষ্ম নির্ম্মল অনন্ত পরম শূণ্য, যেখানে শূণ্যেরও অভাব তাহা নির্গুণ ব্রহ্ম। তাঁহাতে জগৎ শশশৃঙ্গ বা 'খ' পুষ্পবৎ মিথ্যা। পরে পূর্ব্বোক্ত সম্বিৎ-তত্ত্বে যখন বেদনা শক্তি আভাসরূপে স্ফুরিত হয়, তাহার নাম চেতন (সম্বেদন)। এই চৈতন্যোন্মুখ সম্বিৎ-তত্ত্ব 'অহং' ভাব প্রাপ্ত 'অহমস্মি' রূপে আপনাকে 'অহং' জ্ঞান করিতে লাগিলেন; যেরূপ স্বপ্নে পুরুষ আপনাকে হস্তীরূপে দেখেন। 'অহং' দেখিবার পর পুনঃ দেশ কাল আকাশ প্রভৃতি দেখিতে লাগিলেন। তখন চেতন-কলা জীব অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং বাসনা করিবার উপযুক্ত হইল। যখন জীব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক হইয়া স্থিত হইল; শব্দ এবং

ক্রিয়া জ্ঞান সংযুক্ত হইল, তখন স্পন্দ-কলা চৈতন্য ভাব ছাড়িয়া চিত্ত ভাব ধারণ করিল। এক একের সহিত মিলিত হইয়া শীঘ্রই কল্পিত হইয়াছিল। তখন যে মন হইয়াছিল, সেই মন সঙ্কল্প রূপ মায়ার বীজ। তখন অণ্ডবাহক (সূক্ষ্ম শরীরে আত্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্ম-সত্তা স্থিত হইয়াছিলেন। যেরূপ বীজ পত্র ফুল ফলাদির আশ্রয় হয়, সেইরূপ এই পূর্য্যষ্টকা উহাই অণ্ডবাহক দেহ, উহাই বায়ু সত্ত্বা, তেজ-সত্ত্বা, জল-সত্ত্বা, পিণ্ড-সত্ত্বা, দেশ-সত্ত্বা, কাল-সত্তা ও সর্ব্ব সত্ত্বার আশ্রয় হইল। বাস্তবিক কিছুই উৎপন্ন হইল না। পরমাত্ম সত্তা আপন আপনি আপনার বিষয়ে স্ফুরিত হইল। হে মুনিশ্বর! সাক্ষাৎ বিষযে যে সম্বেদন পৃথক রূপ হইয়া স্ফুরিত হয়, তাহা নিস্পন্দ হইয়া যখন স্বরূপকে জানিতে পারে, তখন নষ্ট হইয়া যায়। যেরূপ সঙ্কল্পের রচিত নগর সঙ্কল্পের অভাব হইলে অভাব হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা সম্বেদনের অভাব হইয়া যায়। তখন সম্বেদন সম্বিৎ বিষয়ে লীন হইয়া যায়। ইহার যে ভিন্ন সত্ত্বা হইয়াছিল, তাহা আর কিছুমাত্রও থাকে না। হে মুনীশ্বর! যে প্রথম অণু, তন্মাত্রা ছিল, তাহা ভাবনার স্থূল দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যেরূপ যেরূপ দেশ কাল পদার্থ ভাবনা হইয়া যাইতেছিল, সেইরূপ সেইরূপ ভাসিতেছিল, যেরূপ গন্ধর্ব্ব নগর ভাসে, যেরূপ স্বপ্নপুর ভাসে, সেইরূপ ভাবনার বশে এই পদার্থ ভাসিতে থাকে। হে মুনীশ্বর! আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আনন্দকে ব্রহ্মস্বরূপ না দেখিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে জ্ঞান করা; এইরূপে স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হওয়াই জগৎরূপ ভ্রম জ্ঞানের হেতু। ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দ একরস, কিন্তু আনন্দ বস্তু ত্রিগুণাত্মক, আনন্দ প্রবাহ, আনন্দ জ্যোতি, আনন্দ বস্তু। উহা ক্রিয়া তেজ ও বস্তুমূলক, সুতরাং অপ্ তেজ অন্নই উহার বীজ অর্থাৎ রজ সত্ত্ব তম গুণাত্মক। ইহাদের সত্ত্ব রজ তমের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মিশ্রণে জগৎ কল্পিত হইয়াছিল। বশিষ্ট বলিলেন, হে ভগবন্! এই জীব যে আদি সর্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং দেহ ভ্রম আপনার সহিত দেখিয়াছে, তাহার পর কিরূপে স্থিত হইয়াছে? ঈশ্বর বলিলেন, হে মুনীশ্বর! পরমাকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, যেরূপ তোমাকে বলিয়াছি। সে আপনার সহিত শরীর দেখিতেছিল। স্বপ্ন নগরীর ন্যায় সর্ব্বগত চিদ্‌ঘন আত্মার আশ্রয়ে উৎপন্ন হইয়া জীব আপনার শরীরকে দেখিয়া থাকে। হে মুনীশ্বর! আদি যে জীব স্ফুরিত হইয়াছে, অথচ প্রমাদ প্রাপ্ত হয় নাই, আপনার স্বরূপ বিষয়ে অহং প্রত্যয় রহিয়াছে, এই কারণে ঈশ্বর হইয়া স্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার এই নিশ্চয় থাকে যে

আমি সনাতন নিত্য শুদ্ধ পরম আনন্দস্বরূপ অব্যক্তরূপ পরম পুরুষ, এই প্রকার আদি জীবের নিশ্চয় ছিল। আত্মার সহিত তুলনায় তাঁহাকে জীব কহা হইয়াছে এবং সৃষ্ট জগতের অপেক্ষায় (তুলনায়) তাঁহাকে ঈশ্বর কহা যায়। হে মুনীশ্বর! এই যে আদি জীব, তাহার মধ্যে কেহ বিষ্ণুরূপ হইয়া ব্রহ্মার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কোন সৃষ্টিতে প্রথম ব্রহ্মা হইয়াছেন, বিষ্ণু রুদ্র তাঁহা হইতে হইয়াছে। কোন সৃষ্টিতে প্রথম রুদ্র হইয়াছে, বিষ্ণু ব্রহ্মা তাঁহা হইতে হইয়াছেন। চেতন আকাশে যেরূপ যেরূপ সংকল্প স্ফুরিত হইয়াছে, সেইরূপ হইয়া স্থিত হইয়াছেন। আদি জীব উৎপন্ন হইয়া যে যে প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেইরূপ হইয়া স্থিত হইয়াছেন। বাস্তবিক সমস্ত অসৎরূপ অজ্ঞান ভ্রম দ্বারা হইয়াছেন। যেরূপ পরছায়াতে বৈতাল সৎরূপে ভাসে, সেইরূপ অজ্ঞান বশতঃ সৎরূপ হইয়া ভাসে। যেরূপ গর্দ্দভ নিজের শব্দে নিজে ভীত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে থাকে, সেইরূপ নিজের সঙ্কল্পে নিজে জড়িত হইয়া জন্ম মরণ পথে পরিভ্রমণ করেন এবং দুঃখী হন। আদি পুরুষ সমেত যে সৃষ্টি, তাহা পরমাকাশের নিমেষ মধ্যে হইয়াছে আর উন্মেষে লয় হইয়া যায়। যেরূপ বৈদূর্য্যমণির চমক্ এক নিমেষে স্ফুরিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ লয় হইয়া যায়; পুনঃ অন্য স্থানে চমকিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ লয় হয়। সেই চমকের যে লাট, তাহাই জগৎরূপে প্রসিদ্ধ। স্ফুরণোন্মুখ সম্বিতের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে স্পন্দরূপ ভ্রম জন্মে। ইহাই দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ। এক নিমেষের প্রমাদ বশতঃ কল্পসমূহ ব্যতীত হইয়া যায় এবং পরমাণু পরমাণুতে সৃষ্টি স্ফুরিত হয়; কল্প এবং মহাকল্প তাহাতে ভাসে। এইরূপ সৃষ্টি তাঁহার স্পন্দ-কলাতে স্ফুরিত হইয়া চমৎকার হইয়া থাকে। আবার যখন স্পন্দ-কলা স্বরূপের অন্তর্ব্বর্ত্তী হয়, তখন লীন হইয়া যায়; অর্থাৎ বহির্মুখী হইলে সৃষ্টি, অন্তর্মুখী হইলে প্রলয়। যেরূপ স্বপ্ন পদার্থ জাগ্রত অবস্থায় লয় হইয়া যায়, সেইরূপ জাগ্রত সৃষ্টি স্ফুরিত, না হইলে লীন হইয়া যায়। হে মুনিশ্বর! জীব প্রতি স্ব স্ব সৃষ্টি লক্ষিত হয়; সেই সৃষ্টি কোন দেশ কাল নিবারণ করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে ঐ সৃষ্টি আপন আপন সঙ্কল্প বিষয়ে স্থিত থাকে। আত্মার এই মহা চমৎকার আছে যে, যেরূপ স্ফুরিত হয়, সেইরূপ চমৎকার হইয়া ভাসে। হে মুনীশ্বর! কিছুই জন্মে না বা কিছুই নাশ হয় না। স্বতঃ চেতন-তত্ত্ব আপনি আপন বিষয়ে চমকিত হইতে থাকে। শ্রুতি যথা "চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।" যেরূপ স্বপ্ন নগর উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ জগৎ

উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। রুদ্র হইতে বৃক্ষ পর্য্যন্ত সমস্তই এক ক্ষণ মধ্যে ঐ তত্ত্ব হইতে স্ফুরিত হইয়া আসিয়াছে। সুমেরু প্রভৃতিও আপনাদের স্থিতি বিষয়ে কেহ কাহাকে বাধা দিতে পারে না; কারণ উহা বাস্তবিক নাই। সুতরাং আত্মাতে সৃষ্টি আভাস রূপ। হে মুনীশ্বর! এই প্রকার সমস্ত জগৎ মায়ামাত্র। মাণ্ডুক্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;—

"প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত, নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।"
মায়াময়মিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥

ভাবনা দ্বারা ভাসিয়া থাকে। যখন আত্মার অভ্যাস হইতে থাকে, তখন ভেদ কল্পনা মিটিয়া যায়। কেবল উপশম রূপ শিবতত্ত্ব ভাসিতে থাকে। সৎ অসৎ রূপ জগৎ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করে। আত্মতত্ত্ব দূরও নহে, নিকটও নহে, অধঃ নহে, ঊর্দ্ধ নহে, পূর্ব্বও নহে, পশ্চিমও নহে। সৎ ও অসতের মধ্যে অনুভব রূপ সকলের জ্ঞাতা। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ তাঁহাকে বিষয় করিতে সমর্থ নহে ; যেরূপ জল হইতে অগ্নি কদাপি বহির্গত হইতে পারে না। যেরূপ স্বপ্নে চিদাত্মাই সর্ব্বগত জগৎ রূপ হইয়া ভাসে, সেইরূপ জাগ্রত জগৎ ও চিদাকাশ রূপ। আদি সর্গ হইতে একাল পর্য্যন্ত আত্মা ব্যতিরেকে অন্য বস্তুর অভাব আছে। যেরূপ স্বপ্নে যে জগৎ ভাসে, তাহা সমস্ত চিদাকাশ রূপ অপর ইতর কল্পনা কিছু নাই ; চিন্মাত্রই পাহাড় রূপ, চিন্মাত্রই আকাশ, চিন্মাত্রই সর্ব্ব জীব, চিন্মাত্রই সর্ব্ব ভূত, চিন্মাত্র ব্যতিরেকে ইতর কিছু নাই। সৃষ্টির আদি এবং অন্ত পর্য্যন্ত যাহা কিছু দ্বৈত কল্পনা ভাসে, তাহা ভ্রমমাত্র। যেরূপ স্বপ্নে কাহারও অঙ্গ কাটিলে তাহাতে কাহারও কিছু কাটা যায় না, নিদ্রাদোষ বশতঃ এরূপ ভাসে মাত্র, সেইরূপ এই জাগ্রত জগতও ভ্রম মাত্র।

হে মুনীশ্বর! আকাশ, পরমাকাশ, ব্রহ্মাকাশ এই তিন একেরই পর্য্যায়। যেরূপ স্বপ্নে সঙ্কল্প দ্বারা মায়াতে তাঁহা হইতে অনুভব (স্ফুরণ) হয়, তাহা সমস্ত চিদাকাশ ; সেইরূপ এই জাগ্রত জগতও চিদাকাশ রূপ। যেরূপ স্বপ্নে আকাশ ব্যতিরেকে ইতর কিছু নাই, সেইরূপ জাগ্রত স্বপ্নও আত্ম-তত্ত্ব দ্বারা ভাসে। আত্মা ব্যতিরেকে অন্য দ্বিতীয় বস্তু কিছু নাই। হে মুনীশ্বর! যেরূপ স্বপ্নে চিদাকাশই ঘট পট প্রভৃতি হইয়া ভাসে, সেইরূপ স্থিতি প্রলয়াদি জগৎ চিদাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আত্মাই এইরূপে ভাসে। যেরূপ শুদ্ধ সম্বিৎ ভিন্ন অন্য নগর স্বপ্নে পাওয়া যায় না, সেইরূপ জাগ্রত কালে অনুভব ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া যায় না। হে মুনীশ্বর! ভাব অভাবরূপ পদার্থ তিন কালে

জগতে ভাসে, তাহা সমস্ত চিদাকাশ রূপ ; আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। হে মুনীশ্বর! এই যে দেব আমি তোমাকে বলিলাম, তাহা পরমার্থতঃ বলিলাম। তুমি, আমি এবং সর্ব্বভূত, জাতি, জগৎ এই সকলের যিনি দেব, তিনি চিদাকাশ পরমাত্মা। তাহা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। যেরূপ সঙ্কল্প পুরে চিদাকাশই শরীর রূপ হইয়া ভাসেন, অন্য কিছু প্রস্তুত হয় না ; সেইরূপ এই সব চিদাকাশ রূপ।

ঈশ্বর বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! এই প্রকার এই সমস্ত বিশ্ব কেবল পরমাত্মা রূপ। পরমাত্মা ব্রহ্মই এক দেবরূপে কথিত হন। তাঁহারই পূজা সার। তাহা হইতে সর্ব্ব ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই দেব সর্ব্বজ্ঞ এবং সমস্তই তাহাতে স্থিত। তিনি অকৃত্রিম দেব, অজ পরমানন্দ অখণ্ডরূপ। তাঁহাকে সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহা দ্বারা পরম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনীশ্বর! তুমি জাগ্রত হইয়াছ, এই কারণে এই প্রকার দেবার্চ্চনা আমি তোমাকে বলিলাম। পরন্তু যিনি অসম্যক্‌দর্শী বালক, যাঁহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে নাই, কেবল চিত্তই আছে, তাহার নিমিত্ত ধূপ, দীপ, পুষ্প, কর্ম্ম, অর্চ্চনা শাস্ত্রে কথিত আছে। আকার দ্বারা কল্পিত দেবের মিথ্যা কল্পনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। হে মুনীশ্বর! আপনার সঙ্কল্প দ্বারা যে দেব নির্ম্মিত হয়, তাহাকে ধূপ দীপ পুষ্প দ্বারা যে পূজা করা যায়, তাহা ভাবনা মাত্র। তদ্দ্বারা তাহার সঙ্কল্প রচিত ফল লাভ হয় ; তাহা বালক বুদ্ধির অর্চ্চনা। যাহারা তোমার মত লোক, তাহাদের পূজা এই, যাহা আমি তোমাকে সর্ব্বাত্মা ভাবনা করিয়া করিতে কহিলাম। হে মুনীশ্বর! আমার মতে অপর কোনও দেব নাই ; একই পরমাত্মাদেব এই তিন ভুবনে আছেন ; তিনি ভিন্ন অন্য দেব কেহ নাই।

তিনিই শিব, তিনিই অদ্বৈত এবং তিনিই সর্ব্ব পদ হইতে অতীত। তিনি সর্ব্ব সঙ্কল্প উল্লঙ্ঘন করিয়া অবস্থিতি করেন এবং সর্ব্ব সঙ্কল্পের অধিষ্ঠান তিনিই। তিনি দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদ শূন্য। সর্ব্ব প্রকার শান্তরূপ, এক চিন্মাত্র নির্ম্মল স্বরূপ। তাঁহাকেই দেবরূপে কহা যায়। মাণ্ডুক্য উপনিষদে তিনি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। "অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ সিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং দেব।" অর্থ যিনি ওঙ্কারের চতুর্থ পাদ তিনি মাত্রা বিহীন এবং তিনিই পরমাত্মা। তিনি অব্যবহার্য্য যেহেতু সেই পরমাত্মা, বাক্য ও মনের অগোচর। অতএব সর্ব্ব প্রকার ব্যবহারের অন্ত ; অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে বাক্য এবং মন উভয়ই ক্ষীণ হয়। তিনি

সর্ব্ব প্রকার বিকার বিহীন মঙ্গলময়; কেবল পরমানন্দ স্বরূপ এবং অদ্বৈত, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই। এই পরমাত্মা স্বয়ং আত্মাতে প্রবেশ করিয়া আছেন। যাঁহারা এইরূপে সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, সেই সকল পরমার্থদর্শী ব্রহ্ম বিজ্ঞানবিৎ সাধকগণ এই সংসার দগ্ধ করিবার নিমিত্ত আত্মাতে প্রবিষ্ট হন। পরন্তু তাঁহাদিগের আর জন্ম পরিগ্রহ হয় না। হে মুনীশ্বর! যে সম্বিৎ-সত্ত্বা পঞ্চভূত কলা হইতে অতীত এবং সর্ব্ব ভাবের অন্তর বহিঃস্থিত হন এবং সকলের সত্ত্বা প্রদাতা দেব, তিনিই সকলের সত্ত্বা ও সংহর্ত্তা হন। হে ব্রাহ্মণ! যে ব্রহ্ম সত্য অসত্যের মধ্য এবং অসত্য সত্যের পর বলিয়া কথিত আছেন, সেই দেব পরমাত্মা। পরম স্বতঃ সত্ত্বা স্বভাব দ্বারা সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মহাচিত্ত রূপে কথিত আছেন, সেই পরমাত্মা দেব-সত্ত্বা স্বরূপ হন। তিনি এইরূপে সর্ব্ব পদার্থে অবস্থিতি করেন। যেরূপ সর্ব্ব বৃক্ষের লতার অন্তরে রস জল স্থিত হয়, সেইরূপ সত্ত্বা সমানরূপ দ্বারা পরম চেতন আত্মা সর্ব্ব স্থানে স্থিত হন। অতএব যে চেতন তত্ত্ব অরুন্ধতীর, এবং যে চেতন তত্ত্ব তোমার ন্যায় নিষ্পাপ জীবের, আর যে চেতন তত্ত্ব পার্ব্বতীর, সেই চেতন তত্ত্ব আমার, সেই চেতন তত্ত্ব জগৎ ও ত্রিলোকের। তিনিই একমাত্র দেব, অপর দেব কেহ নাই। পরন্তু যে অপর হস্তপদ সংযুক্ত দেব কল্পনা করিতেছ, তাহাও চিন্মাত্র, অন্য কিছু সার নাই। চিন্মাত্রই সর্ব্ব জগতের সারভূত পদার্থ। তাহাই অর্চ্চনা করিবার যোগ্য, তিনিই সর্ব্ব ফল দাতা। সেই দেব কাহারও হইতে দূরে স্থিত নহেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া কোন প্রকারে কাহারও পক্ষে কঠিন নহে; তিনি সকলেরই দেহে অবস্থিতি করেন এবং সকলের আত্মা। সেই এক দেবের আশ্রয়ে মন সহিত ষড় ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে। সেই এক দেবের সংজ্ঞা ব্যবহারের নিমিত্ত তত্ত্ববেত্তা পুরুষ কল্পনা করেন যে সেই এক দেব চিন্মাত্র। সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন, আত্মা, ব্রহ্ম, ইত্যাদি নাম জ্ঞানী পুরুষ যথাশাস্ত্র উপদেশ ব্যবহারের নিমিত্ত রাখিয়া দেন। পুর্য্যষ্টকাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তিনিই প্রকাশিত হন। হে বশিষ্ঠ দেব! যাহা কিছু বিস্তার সহিত জগৎ অবভাসিত হইতে দেখা যায়, সেই সকলের প্রকাশক তিনিই, পরন্তু সকল হইতে রহিত। তিনি নিত্য শুদ্ধ অদ্বৈত রূপ। তিনি সর্ব্ব জগতে অনুস্যূত আছেন। এক চিত্ত-সত্ত্বা স্পন্দ দ্বারা অনেক ভার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মুনীশ্বর! সম্যক্‌দর্শীর নিকট জগৎ একরূপ আত্ম স্বরূপ; পরন্তু অসম্যক্‌দর্শীর নিকট জগৎ নানা প্রকারে ভাসে। অতএব তুমি সমক্‌দর্শী হইয়া দেখ জগৎও আত্মরূপ। এক্ষণে সম্যক্ দর্শন যেরূপে প্রাপ্ত হওয়া

যায় তাহা শ্রবণ কর। সাধু সঙ্গ কবিবে এবং সৎ শাস্ত্রের বিচার করিবে। যখন দৃঢ় ভাবনা করিবে, তখন কত কালে স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইবে। কালের অপেক্ষা দৃঢ় ভাবনাকে বা বিচারকে শাস্ত্রে নিমিত্ত কহিয়াছে। যখন দৃঢ় বিচার হয়, তখন সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যখন স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তখন স্পন্দ, নিস্পন্দ উভয় বিষয়ে এক সমান হইয়া যায়। হে মুনীশ্বর! অজ্ঞানীর চিত্ত থাকে আর জ্ঞানীর সত্ত্বা থাকে, যাহা প্রারব্ধের বেগে স্ফুরিত হয় এবং ব্রহ্মাকার বৃত্তি হয়। আর অজ্ঞানীর চিত্ত স্ফুরণ দ্বারা পুনঃ শরীর প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী ইষ্ট অনিষ্ট বিষয়ে সমান থাকেন আর অজ্ঞানী এক সমান থাকেন না। ইষ্ট বিষয়ে প্রসন্ন এবং অনিষ্ট প্রাপ্তি বিষয়ে শোকাতুর হন। জ্ঞানী যখন শরীর ত্যাগ করেন, তখন ব্রহ্ম সমুদ্রে স্থিত হন এবং যে পর্য্যন্ত স্বত্ত্ব শেষ না হয়, সেই পর্য্যন্ত স্ফুরণ হইতে থাকে। আর অজ্ঞানীর শরীর ত্যাগ করিবার সময় তাহাতে সূক্ষ্ম সংস্কার বিদ্যমান থাকে। যেরূপ বীজে বৃক্ষ ফুল ফল সূক্ষ্মরূপে স্থিত থাকে, তাহা কালক্রমে পুনঃ বহির্গত হইতে থাকে। অতএব হে মুনীশ্বর! তুমি আপনি আপনাকে দেখ, যাহা অনুভব রূপ এবং নিরন্তর আপনি আপনার বিষয়ে স্থিত হও। যখন তুমি আপনি আপনার দ্বারা অর্থাৎ স্বত্ত্ববৃত্তি দ্বারা আপনাকে দেখিবে, তখন তপাদি ক্রিয়াকে দূর করিয়া শোভায়-মান হইবে। যেরূপ মেঘ দূর হইলে চন্দ্রমা প্রকাশবান্ হইয়া শোভা পায়, সেইরূপ তুমিও ভোগের চপলতা ত্যাগ করিয়া শোভা পাইবে। পরন্তু যখন ইন্দ্রিয়কে জয় করিবে, কোন পদার্থে আসক্তি হইবে না এবং সর্ব্ব বাসনা ত্যাগ করিবে, তখনই জ্ঞানবান্ হইবে। আর যিনি সর্ব্ব বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাকে বিষ্ণু জানিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র। (কাশীধাম)

মোক্ষ]

জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

একবার দেখা হলেই সব হয়ে গেল। (এ চোখের দেখা নয়) তখন চির-কালকার জন্য নিশ্চিন্ত! তার পর সুখ দুঃখ, ভাব, অভাব, জন্ম, মৃত্যু যা কিছুই আসুক, তাকে আর ভয় হয় না। এ সব গুলিকেই যেন তখন ঘরের লোক বলে মনে হয়; পরিচিত বন্ধুর মত এরা হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণই করে; কোন অতৃপ্তি বা ক্লেশ আনয়ন করে না! যতক্ষণ চাই, "দাও দাও" বলে চীৎকার

করি, ততক্ষণই না কষ্ট, তখন চাওয়ার কষ্ট, না পাওয়ার কষ্ট, অভিমানের কষ্ট বিরহের কষ্ট, কত কষ্টই না পেতে হয়। এখন আশাও নাই—আকাঙ্ক্ষাও নাই; স্থতরাং না পাওয়ার কষ্টও নাই। হৃদয় আর ধুক্ ধুক্ করে না, মন আর লুক্ পুক্ করে না। তখন এ হৃদয় কিছুতেই আর অবসন্ন হয় না। যত ভারই মাথায় চেপে বসুক, কিছুতেই তাকে আর দমাতে পারে না। তখন তার জোর কি।—আনন্দ কি? কেননা সত্যের মুখ দেখেছে; স্থতরাং এই মায়া-হাটের ছায়ানাট দেখে সে আর বিচলিত হয় না। অভিনয়-কারীর মুখ চেনা থাক্‌লে সে যম সেজে এলেও আর ভয় হয় না। "সর্ব্বভূতস্থ-মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" ঠিক এই রকম করে একবার দেখে নেওয়া চাই। এই যে দেখা—এ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দেখা নয়—এ মনে প্রাণে এক করে দেখা—এরই অপর নাম জ্ঞান! এই জ্ঞানের উদয় হইবামাত্রই তার ইহ পরত্রের বন্ধন খসিয়া যায়। ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মের সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়।

———

মোক্ষ]

মিলনের সময়।

সেই দিন তব সনে আমার মিলন,
আসিবে দুর্দ্দিন যবে করিয়া গর্জ্জন;
প্রমত্ত ক্ষুধিত হয়ে; দিবে উপাড়িয়া,—
একটি একটি করি ভীম বাহু দিয়া।
আমার হৃদয় হ'তে বৃথা অভিলাষ,
বৃথা গর্ব্ব অভিমান বাসনা পিয়াঁস;
রিপুদের উত্তেজনা দাসত্ব তাদের,—
সর্ব্ব দুঃখ সর্ব্ব দৈন্য জড়তা প্রাণের॥
মৃত্যু মাঝে কোন ভয় না রবে আমার,
মৃত্যু আসি দিবে খুলে অমৃতের দ্বার;
কোন কষ্ট, কষ্ট বলে না থাকিবে বোধ,—
দুর্ব্বল অক্ষম পেয়ে না থাকিবে ক্রোধ।
উদ্বেগ না রবে হৃদে না কোন অভাব,
হেরিব বিধানে তব শান্ত শিব ভাব;
দুর্ব্বলে করিতে রক্ষা মোর দুটি বাহু—
উদ্যত নিয়ত রবে, না শুনিবে কভু॥
মরণ যদ্যাপি আসে বরিবে মরণ,
অকারণে শত্রুরেও না করি পীড়ন;
দুষ্ট অশ্ব ধায় যথা বিপথে নিয়ত,—
দুরাসদ কাম আদি রিপুরা সতত।
ফিরায় চঞ্চল করী এ মোর মানসে,
রাখিতে তাদের হবে দৃঢ়ভাবে বশে;
পিড়ীতেরে কায়মনে করিয়া শুশ্রূষা,—
ক্লান্ত নাহি হবে মন, প্রতিদান আশা
না রহিবে চিত্তে মোর, অনন্ত উদ্যম,
স্ত্রী বৃদ্ধ মানীদের রাখিতে সম্ভ্রম;
সাধিয়া চলিতে পথে কর্ত্তব্য আপন,—
না রহিবে কোন মোহ কোন আকিঞ্চন।

প্রয়োজন হলে বিত্ত পুত্র পরিজন,
আপন শরীর আর সমস্ত বন্ধন;
করিতে হইবে ত্যাগ ক্ষোভ নাহি রাখি,—
হাসিমুখে যেতে হবে নিশ্চিত একাকী॥
সুখ দুঃখ যাহা ঘটে লাভ কিম্বা ক্ষতি,
সন্তুষ্ট থাকিয়া লব সব শির পাতি;
তোমার অস্তিত্বে রবে সুদৃঢ় নিশ্চয়,—
তব পদে রবে মোর অনন্ত নির্ভয়।
তোমাতে আমাতে যোগ অনন্ত কালের,
তাহাতে সন্দেহ কভু না হবে মনের;
তোমার চরণ পথ করিয়া চুম্বন,—
তব প্রেমে মগ্ন মোর রহিবে এ মন॥
অনন্ত আশ্রয় পাব তোমার চরণে,
রবে না তিলেক ভয় জীবনে মরণে;
সেইদিন শুভদিন আসিবে আমার,—
আসিবে আমার চিত্ত আনন্দে অপার।
তব পদ স্পর্শে হবে দুঃখ বিমোচন,
ঘুচিবে সকল জ্বালা সকল বন্ধন;
সে দিন আসিবে যবে সেই শুভক্ষণ,—
তোমাকে বরিতে পারি ত্যজি ধন জন॥
তোমার আহ্বান ভেরী বাজিবে যখন,
না করি সন্দেহ যেন না করি গোপন;
আসবে আমার গৃহে তুমি মহারাজ,—
কি দিয়ে ঢাকিব মোর দীনতার সাজ?
তবু তুমি আস যদি চাও প্রভু মোরে,
ফিরায়ে না দিই তোমা যেন রিক্ত করে;
সম্বল যা আছে মোর নয়নের জল,—
তা দিয়ে ধুয়াই যেন চরণ কমল॥
আমার হৃদয় পদ্ম দিই যেন পাতি।
তোমার আসন তরে ওগো বিশ্বপতি!
তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপে তুমি
নিও মোরে শূন্য করে হে জীবন স্বামী!

———

ধর্ম্ম]

ভক্তি-সুধা লহরী।

"চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্নবিরাজিত পদাম্বুজম্।
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং তত্ত্বমালা বিভূষিতং।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্।"

গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের ও চরাচর সর্ব্বভূতের চরণ বন্দনা করতঃ আজ মহাপ্রভুর কৃপার্থী হইয়া শাস্ত্রোক্ত "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" এই গভীর তত্ত্বের গবেষণায় ও বিশ্লেষণে রত হইতেছি। জানিনা সেই অন্তর্য্যামী হৃদয় দেবতা আমার মনের সংশয় অপনোদন করতঃ অপূর্ব্ব জ্ঞান জ্যোতিঃতে আমার মস্তিষ্ক উদ্ভাসিত করিয়া এই দুরতিগম্য তত্ত্বালোচনায় আমাকে সক্ষম করেন কিনা! তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই অধ্যাত্মতা লাভের এই প্রকার

সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা করিতে পারেনা ; তাই সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহার কৃপা ভিখারী হইয়া এই সুকঠিন ও পবিত্র কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম।

বিশেষজ্ঞ কয়েকজন বৈষ্ণবের সঙ্গে মিশিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি এবং শাস্ত্রালোচনায় বিচার যুক্তি অবলম্বনে আমার সংকীর্ণ বুদ্ধিতে যাহা ধারণা করিতে পারিয়াছি, শুধু তাহার উপর নির্ভর করতঃ এই দুরূহ তত্ত্বালোচনায় অগ্রসর হইতে সাহসী হইলাম। আশা করি সুধীবৃন্দ আমার সংশয়াপনোদন করতঃ আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে ভক্তিমার্গে বৈষ্ণবীয় রস-সাধনায় সান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবের সাধন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হইয়া ঠিক সেইরূপ ভাবের উপদেশ লইয়া থাকেন। কোনটিই মন্দ নহে। চৈতন্য চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

পঞ্চভাবের পঞ্চবিধ ভক্তির আধার।
সান্ত, দাস্য, সখ্য আর বাৎসল্য মধুর ॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে॥ চৈঃ চঃ ৩য় ৭ আদিখণ্ড

যে কোন ভাবেই ভগবানের কাছে অগ্রসর হই না কেন, শ্রেয়োলাভ নিশ্চয়ই এবং ইহাও সকলে স্মরণ রাখিবেন যখন আমরা যে প্রকার সাধনের অধিকারী, তাহাই তখন আমাদের নিকট সর্ব্বোত্তম বা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দৃঢ় ধারণা হওয়া প্রয়োজন। পরম ভক্তিভাজন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেইরস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম্য॥ চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড।

—এই "তটস্থ হইয়া বিচার" করিবার অধিকার সাধন ভজন বিহীন, কাম-কামিনীর দাসানুদাস আমাদের একেবারেই নাই। এই অপূর্ব্ব অবস্থা লাভের পূর্ব্বে আমরা যে যেই স্তরে বিচরণ করিতেছি, তাহাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বোত্তম বলিয়া ধারণা করা উচিত।

সান্ত, দাস্যাদি সমস্তই ব্রতাভাবের সাধনার অন্তর্গত। যে সে ব্যক্তি এই

নিষ্কাম রাজ মার্গের ভক্ত হইতে পারেন না। কোটী কোটী জন্মের সুকৃতিবশতঃ বহু তপস্যা ও পুণ্যের ফলে যদি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সংগুরু মিলাইয়া দেন, তবে কামান্ধহীন এই সর্ব্বোত্তম পবিত্র রূপ-সাধনায় আমাদের অধিকার জন্মে। দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিত্যধামের পরিজনকে লইয়া প্রকৃতির রম্য নিকেতন শ্রীবৃন্দাবনধামে জীবগণকে পূর্ণানন্দ প্রদান করিবার জন্য এবং জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই অভিনব মধুর লীলা করিয়া গিয়াছেন। সংকীর্ণ মনুষ্য বুদ্ধিতে আমারা তাঁহার ব্রজলীলা ধারণা করিতে পারিব না। তবে শাস্ত্রলোচনা ও সাধু মহাত্মাদের গভীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সমুহ হইতে এই সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিয়াছি, তাহাই পাঠকগণের কাছে নিবেদন করিব, অভিপ্রায়ে সম্যক্ অনধিকারী হইলেও এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।

দাস্তরূপের আলোচনার পূর্ব্বে আমাদের প্রথমে সান্ত রূপ কাহাকে বলে এবং সান্ত ভক্তের লক্ষণ কি তাহা আলোচনা করা উচিত। চৈতন্য চরিতামৃতকার গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ সান্তের দুই গুণ।
এই দুই গুণ জপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে॥
সান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় সান্তরসে।" চৈতন্য চরিতামৃত

এই যে "তৃষ্ণাত্যাগ" যাহার জন্য সমস্ত সাধক মণ্ডলী আবহমান কাল হইতে স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী আপন আপন অধিকার হিসাবে সাধনমার্গ অবলম্বন করতঃ ছুটিয়াছেন, তাহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তৃষ্ণা বা বাসনা ত্যাগ হইলে সংসার বন্ধন—কর্ম্ম বন্ধন—ধর্ম্মাধর্ম্ম বন্ধন সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের বন্ধনই একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়। এই প্রকার তৃষ্ণাত্যাগী মহাপুরুষই "মুক্ত" পদ বাচ্য। কোটি কোটি জন্মের সাধনার ফলে মানুষ যখন আকুল হইয়া তীব্র বৈরাগ্য ও বিবেক আশ্রয় করতঃ সমস্ত বিষয় আশয় ভুলিয়া গিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্য উন্মত্ত হইয়া ছুটে, সেই শুভ মুহূর্ত্তেই সংগুরুর কৃপায় তাহার প্রাণের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় দিব্য জ্যোতির লহরী খেলিতে থাকে, সেই জ্যোতিঃ দেখিয়া সে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া ভগবানের পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি করতঃ দেব দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করে। শ্রীপাদদেবের স্বরূপ জ্ঞান ব্যতীত কেহই ভক্ত হইতে পারে না। যাহাকে

জানি না তাঁহার কাছে কিরূপে যাইব? প্রত্যক্ষ দর্শন বা উপলব্ধি ব্যতীত শুধু আনুমানিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে জানি বা বিশ্বাস করি, এরূপ ভাণ করিলে চলিবে কেন? যদি ভগবান থাকেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হইবে—তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহা হইতেই সমস্ত তত্ত্ব জানিয়া লইতে হইবে—তাঁহার কাছেই দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা—সমস্ত পূর্ণ নিবেদন করিতে হইবে। অন্যথা শান্তি কোথায়? আনন্দ কোথায়? প্রেমের চরম স্ফূর্ত্তিই বা কিরূপে সম্ভবে।

'সৎগুরু' ব্যতীত সেই কেহই "পরমপদ" আমাদিগকে দেখাইতে পারিবেন না। যদি দরকার হয়, তাঁহার প্রেমভিখারী হইয়া সৎগুরু লাভ করিবার জন্য কোটী কোটী জন্ম অপেক্ষা করিতে হইবে, অবশ্যই সেই পরম দয়াল প্রভু আমাদিগকে কৃপা করিবেন। তিনি যদি একবার ফিরিয়া দেখেন, আমাদেরও যদি সেইরূপ সুকৃতি বল থাকে, তবে হয়তঃ এই জন্মেও 'সৎগুরু" লাভ করিতে পারি। তাঁহার 'নাম' লইয়া দীনাদপি দীন বেশে নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুপাত ব্যতীত তাঁহার কৃপা আকর্ষণের দ্বিতীয় পন্থা ত' খুঁজিয়া পাইতেছি না। চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণ বলি কান্দে ভক্ত, তবে কৃষ্ণ মিলে।"

অহো! যাঁহারা ভগবানের 'নাম' লইয়া কাঁদিতে জানেন—হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করতঃ ব্যাকুলভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া সৎগুরু কামনা করতঃ তাঁহার উদ্দেশে অঝোরে অশ্রুপাত করিতে পারেন, ভগবান অবশ্যই তাঁহাদিগকে দয়া করিয়া থাকেন। সৎগুরু রূপে তিনি অবশ্যই ভক্তের কাছে উপস্থিত হন। এই প্রকার 'সৎগুরুর' আশ্রয় বা তাঁহার 'সাক্ষাৎ কৃপা' ব্যতীত কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না; এবং তাঁহাকে জানিতে না পারিলে রাজমার্গের ভক্ত হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত, কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥
স্বর্গ. মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
সেবা মাগি লয় তারা দাসানুদাস সনে॥" চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড

অহো! কি সুন্দর ভাব! প্রকৃত ভক্ত এইরূপে ভগবানকে পাইয়াই চরিতার্থ হইয়া থাকেন। স্বর্গ বা মোক্ষসুখ বা অন্য কোনও প্রকারের বিষয়-সুখে তাঁহারা সারাৎসার সেই প্রিয়তমকে হারাইতে যাইবেন কেন? ভগবানের

দাসানুদাসের সেবা করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। তাঁহারা অহৈতুকী শ্রদ্ধা ভক্তির ভিখারী। এই প্রকার ভক্তি হইতেই "প্রেমের" স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ হইয়া থাকে। স্বর্গ বা মোক্ষ বাসনায় যাঁহারা ভগবানকে ডাকেন, তাঁহারা এই দেবদুর্ল্লভ প্রেম লাভ করিতে পারেন না। নিষ্কাম হইতে না পারিলে, কেহই প্রেম-ভক্তি বা সান্ত রসের অধিকারী হইতে সমর্থ নহেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ব্রজরসের সান্তভাব লইয়া আকুলকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে জগৎজননী আদ্যাশক্তিকে বলিয়াছিলেন—"মা! আমায় ভক্তি দাও? এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শ্রদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শ্রদ্ধা-ভক্তি দাও। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শ্রদ্ধা-ভক্তি দাও। আমি মুক্তি চাহি না, আমায় ভক্তি দে। আমি স্বর্গ চাহি না, আমায় ভক্তি দে। আমি সালোক্য, সাযুজ্য, নির্ব্বাণ, মোক্ষ—এ সব কিছুই চাহিনা, আমায় ভক্তি দে। তোর সু নে, কু নে, আমায় ভক্তি দে। লীলাময়ি! তুমি দেখো—তোমার ঐ অভয় পাদপদ্মই যেন আমার সার হয়। তোমার ঐ বরাভয়-দায়িনী আনন্দময়ী মূর্ত্তি চিরজন্মের মত আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করো। ঐ অপরূপ রূপের ছবি আমার বুকের ভিতর বুক চিরিয়া আঁকিয়া দাও। তোমার কৃপায় যেন মা আমি সর্ব্বভূতেই তোমায় দেখিতে পাই।"

এই প্রকারের প্রাণস্পর্শী ক্রন্দনই ভগবানের কৃপালাভ করিবার একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত কে কবে তাঁহাকে ভক্তিযোগে উপাসনা করিতে পারিয়াছে? এই ভাবে বিভোর হইয়াই পাঠক প্রেমজড়িত কণ্ঠে ভগবানের উদ্দেশে বলিতেছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতু ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

"হে জগদীশ! আমি ধন, জন, কবিতা বা সুন্দরী কিছুই প্রার্থনা করিনা; হে ঈশ্বর! তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।"

এই অহৈতুকী নিষ্কাম সহজ ভক্তি না হইলে কেহই প্রকৃত ভক্ত হইতে পারেন না। শাস্ত্র ইঁহাদের সম্বন্ধেই বলিতেছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা বীজ॥

উপজিয়া পড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায়—তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ-চরণ-পঙ্কজ বৃক্ষ করে আরোহণ ॥ চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড।

উপরি উদ্ধৃত বাক্য হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে "গুরু কৃষ্ণ প্রসাদ" ব্যতীত কেহই এই অহৈতুকী শ্রদ্ধাভক্তি পাইতে পারেন না। এইস্থলে 'ভক্তি' শব্দের দ্বারা "বিধিভক্তি" বুঝিলে বড়ই গোল হইবে। তাহা হইলে শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য আমরা ধারণা করিতে পারিব না। বিধিভক্ত সকাম। বৈধভাব কামনা মূলক। বিধিভক্তের গতিস্থান বৈকুণ্ঠ। যথা ;—

"বিধিভক্তে পার্ষদ দেহে বৈকুণ্ঠেতে যায়।" চৈ, চ, মধ্যখণ্ড
ঐশ্চর্য্য জানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া।" চৈঃ চঃ আদি খঃ, ২য় পঃ।

রাজমার্গাবলম্বী ভক্তদের গতিস্থল শ্রীকৃষ্ণ চরণ—পরম মাধুর্য্যময় চিন্ময় অপ্রাকৃত বৃন্দাবন, গোলোকধাম। জীবন্মুক্ত নিত্যধামের অধিবাসীগণের এই সহজ রাগভক্তি বা রসাশ্রয় ব্যতীত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পূর্ণতম ভগবান প্রত্যক্ষীভূত হয় না। রাগমার্গ বেদবিধি বহির্ভূত। আমরা সকলেই বিধিভক্ত এই বৈধীমার্গ আশ্রয় করিয়া যতদিন যাবৎ আমাদের কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন না হয়, ততদিনই ঘুরাফিরা করিতে হইবে এবং তীব্র জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কর্ম্মবীজকে সমূলে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তৎপরে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করতঃ যুগযুগান্তর ধরিয়া বৈকুণ্ঠাদি ভোগ করিতে করিতে বৈকুণ্ঠের সুখভোগ স্পৃহা পরিপূর্ণ হইলে, তবে অনন্যভাবে কৃষ্ণচরণ বা ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিবার জন্য আমাদের তীব্র ব্যাকুলতা উপস্থিত হইবে। এই সময়েই 'সৎগুরু' আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দিবেন এবং আমাদের প্রাকৃত দেহকে অচিন্ত্য দিব্যশক্তি সম্পন্ন চিদ্‌ঘন আনন্দঘন অপ্রাকৃত নিরঞ্জন দেহে পরিণত করিবেন। এই অভাবনীয় অবস্থায় আমরা স্বরূপে পৌঁছিয়া সচ্চিদানন্দ তনু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিবার অধিকারী হইব। এই অপূর্ব্ব নিষ্কাম মার্গ আশ্রয় করিয়া যাঁহারা ভগবানকে ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বৈষ্ণবীয় সাধনের প্রথম স্তরের কৃষ্ণভক্ত। এই প্রথম স্তরের আদর্শ ভক্ত হওয়াও কত কঠিন ব্যাপার, পাঠকগণ একবার বুঝিয়া দেখুন। বহু কোটি জীবের মধ্যে গুরু কৃষ্ণ

প্রসাদে মাত্র দু'একজন আদর্শ সান্ত ভক্ত হইতে পারেন। শাস্ত্র ইঁহাদিগকে এইরূপ ভাবে পরিচিহ্নিত করিতেছেন। যথা ;—

রূপগোস্বামীকে মহাপ্রভু ভক্তিরস লক্ষণ বিচার প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে বহুৎ কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে হয় এক কৃষ্ণভক্ত ॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব সান্ত।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥" চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আস্থাবান এবং বৈদিক যাগ যজ্ঞ ব্রত সন্ধ্যোপাসনায় ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া দেবতাদের কাছে পুত্রকলত্রাদি ক্রমে স্বর্গ কিম্বা মোক্ষ বাঞ্ছা করিয়া থাকি। * সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে কাম কামনা জর্জ্জরিত, জাতি বিদ্যা জ্ঞানাভিমানী ঘোর বিষয়াসক্ত আমরা কিছুতেই কৃষ্ণভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে পারি না ; অথবা নিজেও ঐরূপ ভক্তাভিমানে গৌরবান্বিত হইতে অসমর্থ। কেননা যাহা আমাদের নাই, তাহা আছে বলিয়া মনে করিলে কিম্বা দশজনের কাছে বলিয়া বেড়াইলে নিশ্চয় প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে। আমি ত' মুক্তকণ্ঠেই বলিতে পারি শাস্ত্রোক্ত আদর্শ সান্ত স্তরের কৃষ্ণভক্ত আমি এই পর্য্যন্ত একজনও দেখি নাই এবং ইহজীবনে দেখিতে পাইব কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—গীতোক্ত এই নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া কিম্বা মুখে বলা খুব সহজ ; কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা প্রতিপালন করা অত্যন্ত কঠিন। 'আমি' 'আমায়' ভুলিয়া গিয়া সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়া ফলাফল

(+) প্রবন্ধ লেখক এইখানে ভুল করিয়াছেন. যাঁহারা যাগযজ্ঞ ব্রত, সন্ধ্যা বন্দনা করেন, তাঁহারা অবশ্য ভক্ত, যেহেতু তাঁহারা ভক্তি. শ্রদ্ধা পূর্ব্বকই ভগবৎ উদ্দেশে উক্ত কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করেন। সে সকল কার্য্য ত' ভগবান্‌শূন্য নয়। উক্ত কার্য্য সমূহ ভগবান্ শূন্য বলিলে অথবা ভক্তিহীন বলিলে, সনাতন শাস্ত্রের ক্রম হয় স্তর লঙ্ঘন করা হয় এবং শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সমন্বয় থাকে না। সহ...সং শ্রী...শাস্ত্রী।

ভগবচ্চরণে নিবেদন করতঃ তদেকনিষ্ঠ হইয়া ও তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা ভক্তিপথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহারা যে সম্প্রদায়ের লোক হউন না কেন, আমাদের আদর্শস্থানীয় এবং বৈষ্ণবীয় সাধনের প্রথম স্তরের কৃষ্ণভক্ত। ইঁহাদের সর্ব্ব কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। পরশমণির সংস্পর্শে আসিয়া ইঁহারা খাঁটি সোণা হইয়াছেন, সর্ব্ব বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছেন এবং তাঁহাকে লইয়া পূর্ণ রসাস্বাদন ও পূর্ণানন্দ সম্ভোগে কাল কাটাইতেছেন।

শুদ্ধ, নিষ্কাম সান্ত ভক্ত কাহাকে বলে? শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"সেই শুদ্ধ ভক্ত, তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ দুঃখ হয় ভোজ ভাগী॥
তোমা অনুকম্পা চাহি ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তারা তোমার চরণ॥ চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ৯ম পঃ

ভগবানের জন্যই ভগবানের ভজন এবং তাঁহারই কৃপা ভিখারী হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ ব্যতীত কেহই শুদ্ধ ভক্ত হইতে পারেন না। শত দুঃখ আসুক, ভক্ত মস্তক পাতিয়া ভগবানের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বলিয়া তাহা অম্লান বদনে গ্রহণ করেন। রোগ, শোক, দারিদ্র্য কিম্বা পার্থিব কোনও অভাব পূরণ করিবার জন্য কখনই তাঁহার ভজন করেন না; এবং প্রেমগদ্গদকণ্ঠে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণ খুলিয়া বলেন;—

"হরি, আমি দুঃখ ভালবাসি, সুখ সাধ নাই হে।
আমি জনমে জনমে যেন দুঃখ পাই হে॥
সুখে যে দুঃখের স্মৃতি চলে যায়,
দুঃখস্মৃতি লোপে মোহ মদিরায়;
বিলাস কামনা লালসা জাগায়,—
শেষে অবসাদে অলসে ঘুমাই হে।
দুঃখেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে,
দুঃখেই আমার চেতনা হয়েছে;
দুঃখেই তোমার চরণে লুটাই হে।
যত তাপে ফোটে বেদনা আমার,
তত তাপে উঠে স্মরণ তোমার;
সাধে কি সাধিয়ে ডেকে দুঃখ চাই হে॥'

ভক্তের কি হৃদয়ভেদী প্রাণস্পর্শী আকুল উচ্ছ্বাস! আমাদের মধ্যে জানি না এরূপ সুকৃতিবান্ কেহ আছেন কিনা; যিনি এরূপ ভাবে দুঃখ পাইবার জন্য ভগবানের কাছে অহর্নিশ প্রার্থনা করেন। যুগে যুগে সাধকগণ মস্তক পাতিয়া সহাস্য বদনে, নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করতঃ লৌকিক সুখ দুঃখকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিয়া এবং অক্ষয় অনন্ত ভূমানন্দে আত্মহারা হইয়া সাধনের একমাত্র বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানকে লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়াছেন। ইঁহারাই সান্তস্তরের আদর্শ ভক্ত।

উপাসক ত্রিবিধ—নিষ্কাম, মোক্ষকাম ও সকাম। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ!॥

আর্ত্ত ও অর্থার্থী সকাম ভক্ত। জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী মোক্ষকাম। ইঁহারা পরম সুকৃতিশালী হইলেও কেহই শুদ্ধ নিষ্কাম সান্তস্তরের ভক্ত হওয়ার অধিকারী নহেন। কামান্ধ হইতে না পারিলে কেহই রূপমার্গের ভক্ত হইতে পারেন না। এইরূপ আদর্শ ভক্ত হওয়া দূরে থাকুক, মোক্ষকাম ভক্ত হওয়াও বড় সহজ ব্যাপার নহে। ভক্তিসাধন করিতে করিতে নিজের স্বরূপ তত্ত্বে ডুব দিতে না পারিলে—জন্ম মৃত্যুর হাত এড়াইয়া সচ্চিদানন্দ তনু স্পর্শে সচ্চিদানন্দময় হইয়া পূর্ণস্বরূপে অবস্থিত করিতে না পারিলে, কেহই বেদান্তের মুক্তি বা বৌদ্ধের নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন না। শাস্ত্র বলিয়াছেন।

ভক্তিবলে প্রাপ্ত রূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া ভজে কৃষ্ণ পায়॥
এই সব সান্ত যবে ভজে ভগবান।
সান্তভক্ত বলি তবে কহি তার নাম। চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড।

সাধন বলে যাঁহারা আত্মার যথার্থ স্বরূপে পৌঁছিয়া দিব্যদেহে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় ভাবদেহে শুদ্ধ-অহৈতুকী ভক্তিমার্গে তদাকারবৃত্তিযোগে তৎগুণাকৃষ্ট হইয়া ভগবানের ভজন করিতে পারেন, তাঁহারাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে বর্ণিত যথার্থ সান্তভক্ত।"

রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ আলোচনা করিয়া আমরা শাস্ত্রোক্ত 'দাস্য' রসতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। মহাপ্রভুর সাধন ভক্তি নির্ণয় প্রসঙ্গে তাঁহার পরমভক্ত সনাতনকে বলিতেছেন,—

"ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে অধিষ্ঠতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥

রাগময়ী ভক্তি হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য, অন্তর, ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
দাস, সখা পুত্রাদি প্রেয়সী গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥
এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি॥
যাহা হৈতে পায় কৃষ্ণের প্রেম রসধন।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান॥" চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড।

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা। বৎসের জন্য গাভী যেমন ব্যাকুলা হয়; প্রবাসী পুত্রের জন্য মাতা যেরূপ উৎকণ্ঠিতা হন, পতির শ্রীচরণ সেবা করিবার জন্য সতী স্ত্রী যেমন উদ্বিগ্না হন, প্রাণের একান্ত প্রিয়তম বস্তু লাভের জন্য জীব যেমন উতলা ও দিশাহারা হইয়া ছুটে, ভগবানের জন্য ভক্তের প্রাণ যখন ঠিক এইরূপ ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত বা উদ্বিগ্ন হয়, বিষয়, আশয়, স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন সমস্ত ভুলিয়া গিয়া উন্মাদের মত ভক্ত হৃদয় ভগবানকে পাইবার জন্য যখন এইরূপ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠে, ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তেই সৎগুরু কৃপায়, তাহার প্রাণের নিভৃততম ক্ষেত্রে ভগবান স্বরূপে প্রকাশিত হন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন।

ধর্ম্ম]

ভক্ত।

এস' সন্ধ্যার মত মুগ্ধ সতত, উজ্জ্বল মম হৃদয়ে।
পাপ তাপ নাশি, রাগ প্রকাশি, পুলক বিভল প্রণয়ে
এস, আশা ভাস্বর তরুণ অরুণ, কিরণ মানস গগনে
চিন্তার সাথী নিশীথের ভাতি, এস গো! পবন বাহনে
এস' আমার হৃদয়ে,
বস' মানস আসনে॥

২

ওহে তোমারে বরিতে চিত্ত ত্বরিতে, ছুটিছে গগন তীর,
তোমারি লাগিয়া রেখেছি রচিয়া, পাদ্য নয়ন নীর
হের শক্তি অর্ঘ্য সুকৃত ধূপ, বিবেক দীপ জ্বালি।
নিবেদি চিত্ত নিখিল বিত্ত, তোমার মহিমাশালী!
র'য়েছি বসিয়া ধীর
মুছায়ে কলুষ-কালি!!

৩

কবে শরতেরি কম জোছনারি সম, তোমার পাবন হাসি
মধুর সিক্ত মলয় পৃক্ত, করুণা সলিল রাশি
আসি ফুটিবে, বলিবে নব মেঘরবে স্ফুটিত রত্ন মত
আমার হৃদয়ে তোমার উদয়ে, আমি সে হইব নত।
এস, মমতা প্রকাশি
পূরায়ে বাসনা শত!!

প্রসাদ, —রাজসাহি।

কাম]

প্রলাপ।

বিশ্ব-বীণার গভীর মন্ত্র, পাঠক! তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রে কখনও বাজিয়াছে কি? অনাদি সঙ্গীতের মোহন মূর্চ্ছনায় মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার মন মুগ্ধ হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" এই বহু আরাধনা-লব্ধ মানব জন্ম

শুধু বিলাস লালসায় ব্যয়িত করিলে চলিবে না, সংসারে আসিয়া শুধু সং সাজিয়া থাকিলে হইবে না, সার টুকু লাভ করিতে হইবে। মোহ মদিরা পানে মত্ত হইয়া থাকাই এই দুর্ল্লভ মানব জন্মের উদ্দেশ্য নহে, সংসার সাগরোত্থিত তরঙ্গাভিঘাতে বিধ্বস্ত হইবার জন্য, দরিদ্রের দৈন্য, শোকের হা হুতাশ, রোগের যন্ত্রণা, নিরাশার তাড়না ভুগিবার জন্যই আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি নাই; পক্ষান্তরে এই সাধনার তপোবনে দীক্ষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শোক দুঃখ রোগ দারিদ্র্যের অভিনয় কেন, ইহাদের উদ্দেশ্য ও ইঙ্গিত অবগত হওয়াই এই জীবনের লক্ষ্য। এই ভীষণ ভয়ের রাজ্যে সেই অভয়ার মাভৈঃ বাণী শুনিবার জন্যই এই জন্ম মৃত্যুর জরা ব্যাধি বিভীষিকার অন্তরালে মায়ের চরণ কমলস্থিত স্নিগ্ধ সুনীল অম্বুরাশি দেখাইবার জন্যই সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গলময় পদ্মহস্ত ওতঃপ্রোত ভাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত জানাইবার জন্যই জীবের সংসার-ক্ষেত্রে অবতারণা ও ভোগ।

আমরা মেঘের গভীর গর্জ্জনে আড়ষ্ট হই, সুকোমল শিশুর ক্রন্দনে ব্যথিত হই, নায়িকার নুপুর নিক্কনে চকিত হই, প্রিয় সম্ভাষণে পুলকিত হই; কিন্তু ঐ নানা শব্দ যে একই বিশ্বব্যাপী শব্দসিন্দুর বিভিন্ন স্পন্দন মাত্র এবং ঐ নানা ভাব যে জীব হৃদয়স্থিত ভাবরূপী জনার্দ্দনের অসীম ঘন ভাব রাশির বিভিন্ন ব্যঞ্জনামাত্র, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না; কারণ আমরা,—

> "দুষ্পারে ভবসাগরে জনি-মৃতে ব্যাধাদি দুঃখোৎকটে
> ঘোরে পুত্র কলত্র মিত্র বহুল গ্রাহাকরেভিকরে,
> কর্ম্মোত্তুঙ্গ তরঙ্গ ভঙ্গ নিকরৈরাকৃষ্যমানো মুহুঃ—"।

ঐ বিশ্বব্যাপী অনাদি শব্দই ভগবানের ভাষা, মন্ত্র, নাদ বা সনাতন সঙ্গীত ও ঐ ঘন ভাবই ব্যঞ্জনা, ছন্দ, মাধুর্য্য বা লয়।

আমবা বহু লইয়াই ব্যস্ত, পৃথক ভাবই আমরা জন্মাবধি পোষণ করিয়া আসিতেছি; কিন্তু এই দৃশ্যমান বহুর ভিতরে যে এক সত্বা প্রবাহিত, একেরই যে বহু ভাবে বিকাশ, সমস্ত পৃথক ভাবই যে সেই এক সূত্রে মণিগণাইব গ্রথিত, তাহা আমরা উপলব্ধি করি কৈ। আমরা স্পর্দ্ধা হইতে ছোট বড় সহস্র সহস্র তরঙ্গ দর্শন করিয়া থাকি সত্য, কিন্তু সিন্ধু সলিলে নিমজ্জিত হইলে, দিগন্ত বিস্তৃত অগাধ বারিরাশি ব্যতীত কিছুই দেখা যায় না। মা জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে! কবে আমি তোমার সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রূপ-সিন্ধু মাঝে ডুবিয়া যাইব মা! কবে সেই নিবিড় কৃষ্ণ জলদ-জাল বক্ষে সৌদামিনীর ক্ষণিক ভাতি মহামেঘ

প্রভাং ঘোরাং" শ্যামা মায়ের আমরা চকিত চাহনি বলিয়া বুঝিতে পারিব. স্নেহমাখা শিশুর সরল হাসিতে শারদ-পূর্ণিমা শোভা শশধরের সুবিমল রজত কিরণে মন্দানিল চুম্বির বিকচ কুসুম দল সৌরভে তোমার অজস্র স্নেহধারা, তোমার পবিত্র জ্যোতি, তোমার বিমল হাসি দেখিয়া এ জনম সার্থক করিতে দিবি কি মা? আমার প্রাণের লক্ষ বাসনা, হৃদয়ের সহস্র দুর্ব্বলতা, মনের হর্ষ, বিষাদ, বিরহ, প্রেম, বাহিরের আলোক-আঁধার,-শীত উত্তাপ ইত্যাদি সর্ব্বের ভিতরে তোমার প্রসারিত হস্ত দর্শন করিয়া "ত্বমেকা গতির্দ্দেবী নিস্তার দাত্রী" বলিয়া চিনিতে পারিব কি মা! একেশ্বরি মা আমার, আমার এই পুঞ্জীভূত বহুগুলিকে এক তানে তোমার অভিমুখে টানিয়া লও মা। তোমার সর্ব্ব সন্তাপ-হারিণী কোলে এই অধম সন্তানকে একটীবার স্থান দে মা।

ধ্বংস আমাদের মানসিক বৃত্তিকে একাভিমুখী করিতে শিক্ষা দেয়। এই সুবিশাল ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আপাততঃ ইহা কেবল ধ্বংসের লীলাভূমি ব্যতীত আর কিছু বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে না। জগৎ-ভক্ষক মহাকাল যেন মহাশ্মশান রূপ বিস্তৃত বদন ব্যাদান করিয়া একে একে সকল গ্রাস করিতেছেন। সৃজন, বর্দ্ধন, সৌন্দর্য্য রমণীয়তা সকলই সেই মহাশ্মশানে আহুতি দিবার সম্ভার মাত্র। ইহাদের বিকাশ যত বেশী হইবে, অন্তিমে আহুতিও সেই পরিমাণে পূর্ণতর হইতে থাকিবে। ঐ যে পূর্ব্ব গগন রক্তিম-রাগে রঞ্জিত করিয়া স্বকীয় কিরণ জালে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতে করিতে সহস্রাংশু দিবাকর উদিত হইতেছে, ইহারও সন্ধ্যা-সমাগমে অস্তাচল চূড়া অবলম্বন করিয়া তামসী নিশার আগমন বার্ত্তা সূচিত করিতে হইবে। যে নবীন যুবক সে দিন মাত্র উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রমোদোদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে মনোমত কুসুম চয়ন করিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনীর কম্বু-কণ্ঠ মনোরম মাল্যনিচয়ে শোভিত করিতেছিল, ভবিষ্যৎ জীবন যাহার নিকট পিককুল-মুখরিত, পারিজাত শোভিত-নন্দনে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সুখ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, যে তাহার বাল-বিধবা জননীর একমাত্র নয়নানন্দকর অঞ্চলের নিধি, ভবিষ্যৎ জীবনের আশা ও ভরসার কেন্দ্রস্থল, সংসারের লক্ষ্য ও অবলম্বন; ঐ দেখ নদীতীরস্থ শ্মশানবহ্নি ভীষণ লোল রসনা প্রসারণ করিতে করিতে তাহারই দুগ্ধ-ফেননিভ সুন্দর বপু মাতা, স্ত্রী, আত্মীয়, বান্ধবের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ও অজস্র অশ্রুসিক্ত দীর্ঘশ্বাস বেষ্টিত হইয়া ভস্মে পরিণত হইতেছে। একদিন যে বারবিলাসিনীর ফুল্ল নিলোৎ-পল সদৃশ বঙ্কিম নয়ন-যুগলের চকিত-চাহনি কত শত মানবকে মন্ত্র মুগ্ধবৎ

তাহার পদপ্রান্তে আকর্ষণ করিত, আজ ঐ দেথ গগণ-বিহারী নির্দ্দয় শ্রেন তাহার তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা উহা উৎপাটিত করিয়া নিজ উদরপুর্ত্তি সাধনে ব্যস্ত। এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য, এত প্রেম সকলই কি ধ্বংসের জন্য! যাহাদের দ্বারা আমরা দিবারাত্রি বেষ্টিত হইয়া আছি, এই সুরম্য হর্ম্ম্যমালা শোভিত বিলাস-ভবন, এই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ইত্যাদি প্রিয় স্বজন বান্ধব, এই হৃদয়-শোণিত সম অর্থরাশি, এই ভোগশীল প্রিয়তম দেহ সকলই কি সেই ধ্বংসরূপ পরিণতির জন্য অগ্রসর হইতেছে ?

এই সত্যমুখী বিচার, এই ভস্মাচ্ছাদিত রত্ন লাভের অনুসন্ধিৎসা ও প্রবল আকাঙ্ক্ষাই মুমুক্ষ পাঠক! তোমাকে ধ্বংসের পরপারের সংবাদ আনিয়া দিবে।—এক অভূতপূর্ব্ব মহান্ ভাষা বুঝাইয়া দিবে; এক জগদ্ব্যাপী অনিত্যের খেলা হইতেই তোমার নয়ন একমাত্র নিত্য বস্তুর উপর পতিত হইবে। এই পরিণামশীল তরঙ্গ ভঙ্গ হইতে একমাত্র প্রশান্ত সত্য সাগরের উপলব্ধি হইবে; অপূর্ব্ব জ্যোতিতে তুমি ডুবিয়া যাইবে, ধ্বংসের বিভীষিকা হইতে তোমার প্রাণ একমুখী হইবে, তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে; "ত্বমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তখন প্রাণের সহিত বলিবে।—

"উদয় গিরিমুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তং।
নিখিল ভুবন নেত্রং রত্ন রত্নোপমেয়ম্॥
তিমির করি মৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনীনাং।
সুরবরমভিবন্দে সুন্দরং বিল্ববন্দ্যম্॥"

জগদ্বন্ধু বনমালীর বিশ্ব-বিমোহন মুরলী ঝঙ্কারে পাঠক! তুমি নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে। তোমার হৃদি-বৃন্দাবন প্লাবিত করিয়া উল্লাস বিভোরা নীল যমুনা লহরমালায় নৃত্য করিতে করিতে উজান বহিবে, তোমার প্রাণ-প্রবাহ সীমার গণ্ডি ছাড়াইয়া অসীমের পানে ধাবিত হইবে। পরমানন্দময় মাধবের কোটি শশী বিনিন্দিত মুক্তিপ্রদ চরণ কমলে শরণ পাইয়া তুমি উচ্চকণ্ঠে গাহিবে।

"ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥"

শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত।

উৎসর্গ।

তোমা—পাশরিতে পারি কেমনে!
আমি—দেহমন প্রাণ সকলই সঁপেছি,—
তোমার রাতুল চরণে।
তুমি—লুকায়ে মেঘের আড়ালে ছড়াও—
সুহাস সন্ধ্যা গগণে—
আমি—যে দিকে নেহারি হাসে সেই দিক,
সাজিয়া সোণার বরণে
তব—মধুর সুহাস পেখিয়া,
বুকে—কণক কিরণ মাখিয়া;
ধায়—কুলকুলরবে নাচিয়া গরবে,—
তটিনী সাগর সদনে।
তব—কোমলতারাশি বিকাশে চাঁদিনী,
যামিনী জোছনা কিরণে।
তব—প্রেমে মাতোয়ারা ঢালে সুধা ধার
চকোরী বিমল গগনে।
তব—সুধামাখা নাম জপিয়া,
মম—এ ক্ষুদ্র পরাণ সঁপিয়া;
তব—চরণে; নিরখি তোমার মধুর
মুরতি, শয়নে স্বপনে।
তব—কনক কিরণ জাগায়ে প্রভাতে
প্রকাশি এ দীন ভবনে।
তব—মহিমা অপার. বিকচ কুসুম,
ছড়ায় প্রভাত পবনে
তব—প্রেমেতে আপনা ভুলিয়া,
নব—সুরভি কুসুম তুলিয়া;
মাখি—যতনে ভকতি চন্দনে করি,
নিবেদন তব চরণে॥

তব—গৌরব গীতিকা গায় পাখীকুল,
হরিষে নিবিড় কাননে।
নাচে—ব্রততী নিচয় তব প্রেমে ভোর,
তব গুণ গান শ্রবণে॥
ওই—প্রকৃতির ভাব হেরিয়া,
যায়-তব প্রেমে প্রাণ ভরিয়া,
ধায়—আকুলি বিকুলি চিত মোর,
তব, প্রেম ভরা গীত শ্রবণে।
কত—প্রবাসী পথিক, বসিয়া ছায়ায়,
তোমার করুণা স্মরণে।
সুখে—লভয়ে বিরাম সেবা করে আসি,
তোমার সেবক পবনে॥
আমি—তোমার করুণা চাহিয়া,
যাই জীবনের স্রোত বাহিয়া,
তুমি—যে দিকে চালাও চলি সেই দিকে,
বাসনা তোমার মিলনে।
ওই—ডুবু ডুবু রবি ঝিকিমিকি বেলা,
হাসিয়া জানায় ভুবনে,
যাবে—ভবে ছায়াবাজি ফুরায়ে, ডুবিবে—
আয়ু-দিবাকর যেদিনে।
তব—প্রেমময় রূপ স্মরিয়া,
আছি তোমার চরণে পড়িয়া,
তুমি—কাছে লও আর দূরে রাখ, সাথি
আমার জীবনে মরণে

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস।

হরিদ্বার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অন্যান্য তীর্থ।

অতঃপর হরিদ্বারের অন্যান্য তীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।—

আনন্দ ভৈরব। পোষ্টাপিসের উত্তর দিকে মাঠের মধ্যে জুনা ...খড়ায় আনন্দ-ভৈরবের প্রাচীন মূর্ত্তি যাত্রীগণের অবশ্য দর্শনীয়। আখ্‌ড়ার ...ন্ন্যাসীরা বলেন, ইনিই ক্ষেত্রপাল ভৈরব। শাস্ত্র বিধানানুসারে ক্ষেত্রপাল ...ভৈরবের পূজা করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয়। বদরিকাশ্রম মাহাত্ম্যে আছে, ...রিদ্বারে স্নানাদি করিয়া নীল ভৈরবের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ ...পূর্ব্বক কেদার বদ্রী যাত্রা কর্ত্তব্য। হরিদ্বারে তিনটী ভৈরব, প্রথম আনন্দ ...ভৈরব, দ্বিতীয় বিল্লকেশ্বর পথে ভৈরব, তৃতীয় চণ্ডীর পাহাড়ের ভৈরব। ...দের মধ্যে কোন্‌টী নীল ভৈরব, তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারেন না। ...আমরা কেদার বদ্রী যাত্রী, সুতরাং তিন স্থানেই শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রানুসারে প্রার্থনা করিলাম,—

নমো নমস্তে ভগবন্নীল ভৈরব ক্ষেত্রপঃ।
অনুজ্ঞাং দেহি যাত্রায়ৈ ধন্যঃ স্যাং ত্রিজগৎস্বু বৈ॥

আনন্দ ভৈরবের মূর্ত্তি সিন্দুর মণ্ডিত—শিবলিঙ্গের ন্যায়। লিঙ্গের উপরিভাগে ...দুইটী চক্ষু এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত।

মায়াদেবী—আনন্দ ভৈরবের অনতিদূরেই মায়াদেবীর প্রাচীন মন্দির। ...মায়াদেবী ত্রিমুণ্ড ধারিণী ও চতুর্ভুজা; সর্ব্বাঙ্গে সিন্দুর লেপিত। দেবীর হস্তে ...অসুর মুণ্ড, চক্র ও ত্রিশূল, অপর হস্তে মা অভয় দান করিতেছেন, পার্শ্বেই ...অষ্টভুজ মহাদেব মূর্ত্তি।

এই মন্দিরের দ্বারে একটি প্রাচীন শিলালিপি পাঠে কানিংহাম সাহেব এই ...মন্দির দশম কিম্বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ পুরাতন মন্দির ভগ্ন হওয়ার পর এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মন্দিরের সম্মুখে একটী নন্দীকেশ্বর আছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়

মায়াপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সেবা পূজা অতি সামান্য ভাবেই হয়, এবং মন্দিরটিও সংস্কার বিহীন; চতুর্দ্দিকে বড় অপরিস্কার এবং বন জঙ্গল সমাকীর্ণ। মন্দির প্রায়ই বন্ধ থাকে, সুতরাং দর্শনের বড়ই অসুবিধা। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুজারী মহাশয় পুজান্তে মন্দির অর্গল বন্ধ করিয়া চলিয়া যান।

নারায়ণ-শিলা।—মায়াপুরী মহল্লার আর একটী পুরাতন মন্দিরে নারায়ণ-শিলা অবস্থিত, মায়াপুরী মাহাত্ম্যে আছে;—

ততঃ পশ্চিম দিগ্‌ভাগে শিলা পরম পাবনী।
নাম্না নারায়ণী খ্যাতা সর্ব্ব পাপ প্রণাশিনী॥
যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিতঃ।
পিতৃ বংশ্যাঃ শতং মাতৃ বংশ্যাশ্চাপি তথা স্বয়ং॥
তারিতাঃ পিতরস্তেন সত্যং সত্যং ন সংশয়॥

কেদার খণ্ড ১১৫ অধ্যায় ১২। ১৩ শ্লোক

পরম পবিত্র নারায়ণী-শিলা সর্ব্ব পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধা ভক্তি যুক্ত হইয়া এস্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃ ও মাতৃ বংশ এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধ কর্ত্তা উদ্ধার পাইয়া থাকেন। গঙ্গার খালের (canal) সহিত ভুতনা নদীর সঙ্গমের নিকটেই নারায়ণ-শিলার মন্দির। ইহার অনতিদূরেই বেন রাজার কেল্লার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টব্য। মায়াপুরী মহল্লা হরিদ্বারের একটী প্রাচীন স্থান; এই মহল্লায় ভৈরব, নারায়ণ-শিলা, মায়াদেবীর মন্দির ও বেন রাজার কেল্লার ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং মায়াপুরী বা "ময়ুলোর" বৌদ্ধযুগে সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভূগর্ভ খনন কালে এই স্থানে বহু প্রকারের মুদ্রা ও হিন্দু এবং বৌদ্ধ মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

সূর্য্যকুণ্ড—হরিদ্বারের বাজারের অনতিদূরে পর্ব্বতোপরি সূর্য্যকুণ্ড অবস্থিত। প্রবাদ, সূর্য্যদেব এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। পর্ব্বতের গায়ে একটু সমতল ক্ষেত্রে জলপূর্ণ কুণ্ড, পাথরের ভিতর হইতে জল বাহির হইতেছে। এই নির্জ্জন পর্ব্বত বেষ্টিত স্থানটী তপস্যার উপযুক্ত বটে! পাহাড়ের গায়ে একটী সিন্দূর লেপিত সূর্য্যের সুগোল মুখ। এই পর্ব্বতের চূড়ায় মনসাদেবীর ক্ষুদ্র মন্দির আছে। যাঁহারা হরিদ্বারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে চাহেন, তাঁহারা এই পর্ব্বতশৃঙ্গে অবশ্য আরোহণ করিবেন। দূরে পর্ব্বতের সমুদ্র তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া দিগন্ত বিস্তৃত; নিম্নে নীল কলেবরা ভাগীরথী নানা ধারায় বিভক্ত হইয়া ছুটিতেছেন। নদী তীরে শুভ্র মঠ, মন্দির পরিশোভিত

হরিদ্বার নগর কি সুন্দর দেখাইতেছে। দক্ষিণে কিছু দূরে সুন্দর কণখল দেখা যাইতেছে; আর একটু দূরে নয়ন মেলিয়া দেখ, গঙ্গার canal বা খাল নদীর অধিকাংশ জল লইয়া বহিয়া যাইতেছে।

ভীমেশ্বর মহাদেব ও ভীমকুণ্ড। ব্রহ্মকুণ্ডের এক মাইল উত্তরে হৃষীকেশাভিমুখী পথের পার্শ্বেই ভীমকুণ্ড ও ভীমেশ্বর মহাদেব। ভীমকুণ্ড একটী ক্ষুদ্র সরোবর, তাহার মধ্যে মন্দিরে ভীমেশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান। প্রবাদ ভীমেশ্বর, মধ্যম পাণ্ডব ভীম প্রতিষ্ঠিত। ভীমেশ্বরকে স্থানীয় লোকে ভীমগদা বা ভীম ঘোড়া বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন ভীমের অশ্বের ক্ষুরাঘাতে এই কুণ্ডের উৎপত্তি; আবার কেহ বলেন যে স্বর্গারোহণকালে ভীম গদা নিক্ষেপ করিয়া যাওয়ায় "ভীমগদা" নাম হইয়াছে। সম্মুখে পতিত একটী প্রস্তর খণ্ডকে পাণ্ডারা ভীমের গদা বলিয়া দেখান। উহার উপর আঘাত করিলে এক প্রকার শব্দ হয়। মায়াপুরী মাহাত্ম্যে ভীমেশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ কোন পৌরাণিক প্রবাদের উল্লেখ নাই। পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে একটী ক্ষুদ্র উৎস নির্গত হইয়া ভীমকুণ্ডে পতিত হয় এবং সেখান হইতে একটী প্রণালীদ্বারা সেই সলিলরাশি গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ভীমকুণ্ডের অনতিদূরে পর্ব্বত কন্দরে পঞ্চ পাণ্ডবের, নারায়ণের অবতারের এবং কালীমাতার মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য। অনতিদূরে নদীর উপকুলে গৌরীশঙ্কর মহাদেবের একটী বৃহৎ মন্দির বিরাজমান।

সর্ব্বনাথ। সর্ব্বনাথ মহাদেবের মন্দির কুশাবর্ত্তঘাটের অনতিদূরে অবস্থিত। ইহা পুরাণ বর্ণিত প্রাচীন তীর্থ নহে। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে (সম্বৎ ১৮৭৬ সালের মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষীয় ৫মী তিথিতে) শ্রবণনাথ নামক জনৈক সাধু এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শিলালেখ্য পাঠে জানা যায়, মন্দির প্রতিষ্ঠায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সর্ব্বনাথদেবের মন্দিরই হরিদ্বারে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং এখানকার সেবা পূজার বন্দোবস্ত উত্তম। মন্দিরের অনেকগুলি ভূ-সম্পত্তি আছে, তাহা হইতেই সেবা পূজা ও সদাব্রতের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রশস্ত প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে প্রধান মন্দিরে দেবাদিদেব মহাদেবের কৃষ্ণপ্রস্তর বিনির্ম্মিত অতি সুন্দর পঞ্চমুখী লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। লিঙ্গের চতুর্দ্দিকে সুন্দর পঞ্চমুখ শোভিতেছে। মূর্ত্তি মনোরম ও ভক্তি উদ্দীপক—জীবন্ত বলিয়া প্রতিয়মান হয়। মূর্ত্তিটীতে সদাশিবের করুণাময় ভাব প্রকটিত। সম্মুখে মন্দিরের জগমোহনের মধ্যে মর্ম্মর বিনির্ম্মিত বৃহৎ সুন্দর নন্দীকেশ্বর (বৃষভ)। ইহা ৮ ফিট লম্বা এবং ৪৷৷০ ফিট উচ্চ। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রোথিত একটী প্রকাণ্ড

ত্রিশূল বহুদুর হইতে দৃষ্ট হইয়া সর্ব্বনাথদেবের মন্দিরের অবস্থান নির্দ্দেশ কর মূল শিবমন্দিরের চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে শ্বেতপ্রস্তর বিনির্ম্মিত গঙ্গা সরস্বতীর সুন্দর মূর্ত্তি। নেপালী কারিকরের নির্ম্মিত পিত্তল গঠিত বহু সুন্দর সুন্দ দেবমূর্ত্তি এবং বৃষভ-বাহন হরপার্ব্বতী, চতুর্ভুজ নারায়ণ, দ্বিভূজ মূরলীধর শ্রীরাধা কৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তি, কালভৈরব ও শিবলিঙ্গ প্রভৃতি দর্শন করিলাম। আ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে সাধু শ্রবণনাথের প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি এবং তাঁহার খড়ম কমণ্ডলু রক্ষিত আছে। শ্রবণনাথজী যোগী ও ভক্ত সাধু ছিলেন; তাঁহা প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে একটী শান্ত সৌম্য ও গাম্ভীর্য্যের ভাব আছে। সর্ব্বনাথ দেবের সান্ধ্য-আরত্রিক বড় মনোরম; পাঠক ইহা দেখিতে ভুলিবেন না।

শ্রবণনাথের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে বিকানীর মহারাজের স্থাপি উচ্চ চূড়া সমন্বিত একটী সুন্দর মন্দিরে গঙ্গাদেবীর সৌম্য-মূর্ত্তিটীও দর্শনীয় বিকানীর দরবারের পক্ষ হইতে এখানে সাধু সন্ন্যাসী অনাথ দরিদ্রকে ভোজন প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইন্দোর মহারাণী ও অন্যান্য রাজা সাধু মহান্ত প্রভৃ প্রতিষ্ঠিত বহু দেবালয় গঙ্গাতীরেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা সময়াভাবে সকলগুলি দেখিবার সুযোগ পাই নাই।

সপ্ত সামুদ্রিক ও সপ্ত শ্রোতা তীর্থ। এই তীর্থ হরিদ্বার হইতে মাইল উত্তরে অবস্থিত। পুরাণে আছে সমুদ্র এইস্থানে মহাদেবের অরাধন করিয়াছিলেন।

সপ্ত-সামুদ্রিকং নাম তীর্থ পরম পাবনম্।
যত্র স্নাত্বা মহাভাগ শিবলোকে মহীয়তে॥
পুরা তত্র সমুদ্রৈশ্চারাধিতঃ ভগবান শিবঃ।
সমুদ্রেশ্বরো মহাদেবঃ সর্ব্বকাম ফলপ্রদঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—সপ্তশ্রোতা তীর্থে সপ্তঋষি তপস্যা করিয়াছিলেন এ তাঁহাদের প্রীতি সাধনার্থ গঙ্গা সেইস্থানে আপনাকে সপ্তধারায় বিভক্ত করিয়া ছিলেন; এইজন্য এই পুণ্য তীর্থ সপ্তশ্রোতা নামে খ্যাত।

দক্ষিণে হিমবত ঋষীনাং আশ্রমঃ—
স্রোতোভিঃ সপ্তর্ভিযাবৈ স্বধূর্ণীসপ্তধাব্যষাৎ।
সপ্তানাং প্রীয়তে নানা সপ্তশ্রোতঃ প্রচক্ষতে॥ ভাগবৎ ১।১৩।

কপিলস্থান বা কপিলাবট। কোন ইংরাজী guideএ লেখা আ হরিদ্বারের এক নাম "কপিলস্থান"; কারণ কপিলঋষি এখানে তপস্যা করি

ছিলেন। কোন পুরাণে আমরা এ কথার উল্লেখ পাই নাই; কিন্তু মহাভারতে বনপর্ব্বে কণখলের সহিত কপিলাবট নামক তীর্থের উল্লেখ আছে। "কপিলায়াং বটং গচ্ছেৎ তীর্থদেবী নরাধিপঃ। উষ্যৈকাং রজনীং তত্র গোসহস্র ফলং লভেৎ॥" (বনপর্ব্ব ৮৪ অধ্যায়)। কপিলস্থান বা কপিলাবটের কোন সংবাদ পাণ্ডাদিগের নিকট পাওয়া যায় না। প্রবাসী পত্রিকায় (১৩১৭ ভাদ্র, ভ্রমণ কাহিনী) জনৈক লেখক লিখিয়াছিলেন, যে তিনি সাধু সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন যে হরিদ্বার হইতে তিন মাইল উত্তরে কপিলস্থান অবস্থিত।

পিছোরনাথ মহাদেব, বিষ্ণুতীর্থ, শিবতীর্থ, পুরুকুৎসেশ্বর, আপদুদ্ধারণ, শালিহোত্রেশ্বর, সর্ব্ব-দারিদ্র্যনাশিনী কৌমুদ্বতী নদী, বজ্রশিলা, রন্তাকুণ্ড প্রভৃতি অনেক তীর্থের উল্লেখ মায়াপুরী মাহাত্ম্যে আছে। কালপ্রভাবে তন্মধ্যে অনেকগুলি লুপ্ত। পাঠকমহাশয় ইচ্ছা করিলে কেদার খণ্ডান্তর্গত মায়াপুরী মাহাত্ম্য পাঠে এইগুলির বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

———

অর্থ]

জড় প্রেম

(সনেট)

ভালবাসা, ভালবাসা কাতর ক্রন্দন।
দুর্বোধ্য প্রেমের ভাষা বুঝিবার আশে,
অচেতনে ধ'রে আনি বাঁধি প্রেম পাশে!
—জগতের জড় দেহ সহিল বন্ধন।
বহুদিন হ'ল মোর সে অভিনন্দন।
জড় নাহি কথা কয়, কাছে নাহি আসে,
কত করে সাধি,—তুষি, জড় নাহি হাসে
জড় সে কি কভু হয় হৃদয় নন্দন?
অবশেষে একদিন শারদ গগনে,
(সুনীল আকাশ পটে মেঘ নাহি ছিল।)
তপন ছাইল ধরা রঞ্জিত কিরণে;
প্রেমের পুলকে মোর দেহ শিহরিল।
নশ্বর সংসার মোর হইল নন্দন।
জড়ে হেরিলাম আমি প্রেমের স্পন্দন॥

শ্রীশশধর মৈত্র।

সম্মোহন বিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকশিতের পর।)

মোহ-নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির স্মরণ:শক্তি একটী বিশেষ আলোচনার বিষয়। নিদ্রার গভীরতা অনুসারে ইহার তারতম্য লক্ষিত হয়। স্বল্প নিদ্রার পর সুপ্ত ব্যক্তি নিদ্রাকালীন সকল ঘটনাই বিবৃত করিতে পারে; কিন্তু গভীর নিদ্রার পর কিছুই পারে না। কাহারও স্বপ্নবৎ কিছু মনে থাকে; কাহাকেও বা কিছু স্মরণ করাইয়া দিলে ঘটনাবলী বলিতে পারে। মোহ-নিদ্রাবস্থায় কোন লোককে একটী সুরম্য ফুলের বাগানে বেড়াইতে বলা হইল; সে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কতকগুলি ফুল তুলিয়া আঘ্রাণ লইল; কতকগুলি লইয়া তোড়া বাঁধিল; কতকগুলি মালা গাঁথিয়া গলায় পরিল। নিদ্রাভঙ্গের পর সে যে বাগানে বেড়াইতেছিল, ইহাই মাত্র মনে থাকে; কিন্তু বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে সে কি করিল, তাহা কিছুমাত্র মনে থাকে না; কাহারও বা ইহাও মনে থাকে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে কেবলমাত্র বলে যে, সে ঘুমাইতেছিল। কিন্তু যদ্যপি তাহাকে বলা হয়, যে সে বাগানে বেড়াইতেছিল, তাহা হইলে তাহার নিদ্রাকালীন কোন কোন ঘটনা মনে জাগরূক হয়। অত্যন্ত গভীর নিদ্রার পর (স্বপ্নাটন অবস্থার পর) সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির কিছুই মনে থাকে না; কিন্তু নিদ্রাবস্থায় যদ্যপি তাহাকে বলা হয় যে তাহার সকল ঘটনাই মনে থাকিবে তাহা হইলে সে নিদ্রা ভঙ্গের পর সমস্ত ঘটনাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে পারে। সময়ে সময়ে ইহাও দেখা গিয়াছে, যে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির কেবলমাত্র চক্ষু বন্ধ করিয়া নিদ্রাকালীন ঘটনাবলী বলিতে বলিলে, সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাগুলি বলিতে পারে।

মোহ-নিদ্রাবস্থায় জীবনের বিস্মৃত ঘটনাগুলি পুনরায় স্মরণ পথে আনয়ন করা যায় এবং পরিজ্ঞাত ঘটনাবলীর বিস্মৃতি উৎপাদন করা যায়। এমন কি যে সকল ঘটনাবলী কিছুমাত্র মনে নাই, তাহাও স্পষ্টরূপে মনে আইসে; এবং যাহা নিশ্চিতরূপে জানা থাকে, তাহারও ভ্রম হয়। একটী ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে মোহ নিদ্রাভিভূত করিয়া বলা হইল, যে তাহার বয়স ৭ বৎসর; সে অমনি তাহার জীবনের ৭ বৎসর বয়সের পর সমস্ত ঘটনাবলী ভুলিয়া গেল। এ

বস্থায় সে মনে করে যে বাস্তবিকই সে একটী ৭ বৎসরের বালক; তদূর্দ্ধ বয়সের ঘটনা তাহার মনে থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহার ৭ বৎসর বয়সের ঘটনাবলী যাহা অধিকাংশ ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা স্পষ্টরূপে স্মরণ পথে আইসে এবং জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত ঘটনাই বলিতে পারে। তখন কি পড়ে, কোন শ্রেণীতে পড়ে, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে "ফার্ষ্ট বুক, শিশুশিক্ষা" ইত্যাদি পড়ি ...ম শ্রেণীতে পড়ি। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাকে লিখিতে দিলে সে বালকের হস্ত লিপির ন্যায় বড় বড় অক্ষরে A. B. C. D. লিখে। বর্ত্তমান কোন ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বলিতে পারে না। সুপ্ত ব্যক্তিকে তাহার নাম ভুলাইয়া দিয়া অপর একটী নাম বলিলে সে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। তখন তাহার নিজ নাম ধরিয়া ডাকিলে আর উত্তর দেয় না; তখন সে নূতন নামে পরিচয় দেয়, নূতন নাম ধরিয়া ডাকিলে তবে উত্তর দেয়। একদা নলিনী নামে এক মদ্যপায়ীকে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম তাহার নাম নলিনী নহে, সুরেন্দ্র বাবু; তাহাকে নলিনী বলিয়া ডাকাতে কোন উত্তর দিল না, যখন সুরেন্দ্র বাবু বলিয়া ডাকিলাম তখন উত্তর দিল। তাহাকে মদ্য পানের অপকারিতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিতে বলিলাম; সে লোকটী সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা দুই তিন বার শুনিয়াছিল; আমার কথানুযায়ী সে মদ্যপান সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা দিল। তাহার বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে বক্তৃতা দিবার সময় সে অবিকল সুরেন্দ্র বাবুর হাবভাব অনুকরণ করিয়াছিল। এই অবস্থায় পুরুষকে নারী ভাবাপন্ন করা যায়; তখন সে নিজের পুরুষত্ব ভুলিয়া গিয়া নারীবোধে মাথায় অবগুণ্ঠন দেয় ও পুরুষের সহিত কথা কহিতে সঙ্কুচিত হয়। তখন নারীর ন্যায় গলার স্বরেরও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এমন কি সুপ্ত ব্যক্তিকে পশু বা পক্ষী বলিলে, সে পশু পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করে ও তাহাদের মত ডাকে। তাহাকে কুকুর বলিলে সে হস্তে ও পদে ভর দিয়া বিচরণ করে ও কুকুরের ন্যায় ডাকিতে থাকে। তাহাকে কুক্কুট বলিলে সে কুক্কুটের ন্যায় ডাকিতে থাকে। সুপ্ত ব্যক্তিকে অচেতন পদার্থেও পরিণত করা যায়। তাহাকে প্রস্তরময় মূর্ত্তি বলিলে সে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান থাকে; চেয়ার বলিলে অঙ্গ বিকৃত করিয়া একখানি চেয়ারের মত অর্দ্ধ উপবেশন ভাবে থাকে। গালিচা বলিলে শয়ন করিয়া নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া থাকে।

Post Hypnotism আরও আশ্চর্য্যের বিষয়। যে সকল দৃশ্যাবলী পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা মোহ-নিদ্রাবস্থায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু মোহ-নিদ্রা অপনয়ন করিবার

পরও সুপ্ত-কালীন প্রেরণা বাক্যানুযায়ী দৃশ্যতঃ জাগ্রত অবস্থায় অতি অদ্ভুত ক্রিয়াবলীর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মোহ-নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিকে সুপ্ত অবস্থায় যদ্যাপি বলা যায়, যে সে নিদ্রাভঙ্গের পর কোন একটী ক্রিয়া করিবে, তাহা হইলে তাহাকে জাগ্রত করিবার পর সে প্রেরণা বাক্যানুযায়ী সেই ক্রিয়া জাগ্রত অবস্থায় সম্পাদন করে। কেবল মাত্র স্বপ্নাটনকারীর (Somnambulist) উপর Post hypnotismএর দৃশ্যাবলী দেখিতে পাওয়া যায়; এবং যে সকল দৃশ্যাবলী মোহ-নিদ্রাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই Post hypnotism অবস্থায় হইয়া থাকে। মোহ-নিদ্রাবস্থায় কোন লোককে যদ্যাপি বলা হয় যে নিদ্রাভঙ্গের পর কথা কহিতে পারিবে না, তাহা হইলে সে জাগ্রত হইয়া বোবা হইয়া যায়; অনেক চেষ্টা করিয়াও কথা কহিতে পারে না। তাহাকে যদ্যপি বলা হয় যে সে নিদ্রাভঙ্গের পর চেয়ার হইতে উঠিতে পারিবে না, তাহা হইলে নিদ্রাভঙ্গের পর তাহাকে উঠিতে বলিলে সে সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম হয়। তাহাকে যদ্যপি বলা হয় যে জাগ্রত হইবার পর অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর মল মূত্র ত্যাগ করিবে, তাহা হইলে নিদ্রাভঙ্গের পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় ও বাধ্য হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করে।

এই সকল ঘটনাবলী দৃশ্যতঃ জাগ্রত অবস্থায় হইলেও প্রকৃত জাগ্রত অবস্থায় হয় না। সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিলে, সে তাহার স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় আসে বটে, কিন্তু নিদ্রাকালীন প্রেরণা-বাক্য প্রণোদিত ক্রিয়া সম্পাদনের সময় তাহার অজ্ঞাতসারে এক প্রকার নূতন মোহ-নিদ্রাবস্থা আইসে এবং ক্রিয়া নিষ্পন্নের পর তাহা চলিয়া যায় ও পুনরায় স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় আইসে। এই নূতন অবস্থায় সুপ্ত ব্যক্তির কিছুমাত্র জ্ঞান থাকেনা। এতদ্ সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং উল্লিখিত কোন ঘটনাই মনে থাকে না; জিজ্ঞাসা করিলে স্বীকার করে না। জাগরিত হইবার পর, নিদ্রাকালীন প্রেরণা বাক্যানুযায়ী ক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্য স্বতঃই একটী বলবতী ইচ্ছা হয় এবং তাহাতে তাহার অজ্ঞাতসারে এক প্রকার মোহ-নিদ্রা আইসে ও সেই অবস্থায় প্রেরণা বাক্য নির্দ্দিষ্ট কার্য্যটী সম্পাদন করিয়া পুনরায় জাগ্রত হয়। দৃশ্যতঃ জাগ্রত অবস্থায় ক্রিয়াটী নিষ্পন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নব উদ্ভূত মোহ-নিদ্রাবস্থায় হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রিয়া সম্পাদনের পর ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র স্মরণ থাকে না; জিজ্ঞাসা করিলে সকলই অস্বীকার করে; কদাচিৎ

কাহারও কাহারও সমাপিত ক্রিয়া মনে থাকে। তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উল্লিখিত ক্রিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে অস্বীকার করে না। তাহারা মনে করে যে ক্রিয়াটী স্ব-ইচ্ছায় করিয়াছে। কার্য্যটী অন্যায় হইলেও তাহার একটী সদুত্তর দিতে চেষ্টা করে। একটী গভীর মোহ-নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিকে বলিলাম যে নিদ্রাভঙ্গের পর সে টেবিল হইতে পুস্তকগুলি লইয়া সেল্ফের উপর রাখিবে। নিদ্রাভঙ্গের পর সে তাহাই করিল। জিজ্ঞাসা করিলাম পুস্তকগুলি সেল্ফে রাখিলে কেন; সে উত্তর দিল, বইগুলি টেবিলের উপর বড়ই অপরিচ্ছন্ন দেখাইতেছিল।

কেহ কেহ Post-Hypnotic প্রেরণা বাক্যানুযায়ী ক্রিয়া সম্পাদনের সময় কার্য্যটী অন্যায় হইতেছে বুঝিতে পারে এবং কার্য্যটী না করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পায়; কিন্তু ইচ্ছা এত বলবতী হয়, যে কার্য্যটী না করিয়া থাকিতে পারে না। একজন সুপ্ত ব্যক্তিকে বলিলাম যে জাগ্রত হইবার ৫ মিনিট পরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবে এবং ক্ষণেক পরে পুনরায় আসিয়া আমাকে জিহ্বা দেখাইবে ও গালাগালি দিয়া পুনরায় নিজ আসনে উপবেশন করিবে। তাহার মোহ-নিদ্রা অপনয়ন করিয়া দিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলাম, ঠিক ৫ মিনিট পরে সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং ক্ষণেক পরে পুনরায় গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন সে একটী বলবতী ইচ্ছা-দমন করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছে ও তজ্জন্য মুখ ক্রমশঃ রক্তিম হইয়াছে। প্রায় ২।৩ মিনিট পরে সে অতি কষ্টে একবার জিহ্বাগ্রভাগ বাহির করিল ও আমাকে অতি অনুচ্চস্বরে একটী গালি দিয়া বসিয়া পড়িল এবং অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

কেহ কেহ এই প্রকার বলবতী ইচ্ছা কথঞ্চিৎ দমন করিতে সমর্থ হয়। তাহারা প্রেরণা বাক্যানুযায়ী কতক কার্য্য করে এবং কতক কার্য্য করে না। একটী লোককে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম যে সে জাগ্রত হইবার পর আমার নস্য-দানি হইতে এক টিপ নস্য লইবে। জাগরিত হইবার পর সে নস্য-দানিটী লইয়া ডালা খুলিয়া একবার আঘ্রাণ লইল ও নস্য-দানিটী পুনরায় বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। নস্য না লইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল যে সে নস্য লইতে অভ্যস্ত নহে, লইলে অসুস্থ বোধ করে।

Post hypnotismএ সুপ্ত ব্যক্তিকে নির্দ্ধারিত সময়ে কোন ক্রীড়া করিতে

বলিলে ঠিক সময় মত তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে। সময় নিরূপণের জন্য কোনরূপ সঙ্কেত করিতে হয়। সঙ্কেতটী কোন বাহ্য বস্তু সংশ্লিষ্ট হইলে নির্দ্ধারিত সময় নিরূপণের তারতম্য হয় না। একটী লোককে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম যে নিদ্রাভঙ্গের পর যখনই আমি হস্তে হস্ত ঘর্ষণ করিব, তখনই সে নৃত্য করিবে। মোহ-নিদ্রাভঙ্গের পর কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যেমন হস্তে হস্তে ঘর্ষণ করিলাম, অমনি সে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। যতক্ষণ হস্ত ঘর্ষণ করিলাম, ততক্ষণ সে নৃত্য করিতে লাগিল; ঘর্ষণ বন্ধ করিয়া হস্ত অপসারিত করিলে সেও নিরস্ত হইল। জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত অস্বীকার করিল। তাহার ধারণা যে; সে বরাবরই আমার সহিত কথোপকথন করিতেছে। এই লোকটীকে পুনরায় মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম, কল্য রাত্রি ঠিক ৮টার সময় আমার বাটীতে আসিয়া টেবিল হইতে একখানি পুস্তক লইয়া আমাকে দিবে। পরদিন ঠিক রাত্রি ৮টার সময় সে আসিয়া কথিত মত ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। একদিন একটী লোককে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম, যে সে ২২ ঘণ্টা পরে আমাদের বাটীতে আসিবে ও তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলে সে 'ন' অক্ষরটী ভুলিয়া যাইবে। লোকটীর নাম নগেন্দ্রনাথ। পরদিন সে আসিল বটে, কিন্তু বস্তুগত সঙ্কেত অভাবে ঠিক ২২ ঘণ্টা পরে আসিল না; প্রায় এক ঘণ্টা দেরী করিয়া আসিল। ক্ষণেক কথাবার্ত্তার পর আমি তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একখণ্ড কাগজে নিরোদচন্দ্র লিখিতে বলিলাম; সে 'ন' বাদ দিয়া —রোদচন্দ্র লিখিল। তাহার নাম লিখিতে বলাতে, সে লিখিল "অগেন্দ্রআথ"। নাম জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "অগেন্দ্রআথ"।

Post hypnotism অবস্থায় সুপ্ত ব্যক্তি যখন প্রেরণা-বাক্যানুবর্ত্তী কোন কার্য্য করিতেছে, তখন অপর কোন নূতন প্রেরণাবাক্য প্রয়োগ করিলে, সুপ্ত ব্যক্তি তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাতে দেখা যায় Post hypnotic অবস্থা মোহ-নিদ্রা হইতে বিভিন্ন নয়। একটী লোককে মোহ-তন্দ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম যে নিদ্রাভঙ্গের পর সে টেবিল হইতে পুস্তকগুলি উঠাইয়া আলমারির মধ্যে রাখিবে। নিদ্রাভঙ্গের পর যখন সে প্রেরণা বাক্যানুযায়ী টেবিল হইতে পুস্তকগুলি লইয়া আলমারির মধ্যে রাখিতেছে, তখন বলিলাম যে আলমারির মধ্যে একটী সর্প রহিয়াছে এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অলীক সর্পটী দেখাইয়া দিলাম। সে তখন সর্প দেখিয়া সভয়ে নিরস্ত হইল এবং একটী যষ্ঠী লইয়া সেই অলীক-সর্পটীকে মারিয়া বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে আলমারীর মধ্যে পুস্তক-

গুলি রাখিয়া উপবেশন করিল। জিজ্ঞাসা করাতে কোন সদুত্তর দিতে পারিল না।

মোহ-নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির উল্লিখিত অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, যতক্ষণ মনুষ্য অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ সে বাহ্যিক বা ইন্দ্রিয়গত মনের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে, ততক্ষণ সে আত্ম-বোধ ও আত্ম গরিমাতে মত্ত থাকে, ততক্ষণ সে আমি ও আমার লইয়া আত্মহারা হয়। কিন্তু যেই কিছুক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয়গত মনের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া মনুষ্যের আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় মনের অভ্যুদয় হয়, তখনই সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তখন অদ্ভুত দৃশ্যাবলী দেখিলে কাহারও মনে হয় না যে সুপ্ত ব্যক্তি কিছু-মাত্র প্রকৃতিস্থ আছে বা কিছুমাত্র তাহার আত্মজ্ঞান আছে। তখন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে সুপ্ত ব্যক্তি আত্মহারা হইয়াছে। তখন তাহাকে যাহা বলা হইতেছে, তাহাই সত্য বোধে অম্লান বদনে গ্রহণ করিতেছে। নলিনীকে যেমনি বলা হইল যে, সে নলিনী নহে, সুরেন্দ্র বাবু, অমনি সে নিজ নামটী ভুলিয়া গেল ও নিঃসঙ্কোচে আপনাকে সুরেন্দ্র বাবু বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া লইল। সামান্য মোহ-নিদ্রায় মানবের চির পোষিত আত্ম-ভাব ক্ষণেকের মধ্যে কোথায় চলিয়া যায়, ইহা দেখিয়াও মানবের চৈতন্য হয় না। মোহা-নিদ্রা আসিলে তাহার এই আত্ম-ভাব কোথায় থাকিবে। মহামায়ার খেলাঘরে দু'দিন খেলাইতে আসিয়া এ খেলনাটী লইয়া আমি খেলিয়াছি, অতএব ইহা আমার, এরূপ মনে করা অপেক্ষা ভ্রান্ত আর কি হইতে পারে। তাহার একবারও মনে হয় না যে নির্দ্দিষ্ট কাল ফুরাইলে তাহাকে যেখানকার খেলনা সেইখানে ফেলিয়া রিক্ত হস্তে চলিয়া যাইতে হইবে। এক কণিকা মাত্রও লইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই। খেলনা যাহার তাঁহারই থাকিবে; আপনার বলাই সার হইবে।

মাগো! একি খেলা তোর ভ্রান্ত জীব ল'য়ে।
কেনই বা ক্রীড়া-মত্ত বিশ্ব-মাতা হ'য়ে।
জীব-প্রসবিনী যদি, মাতৃস্নেহ হরে।
বদ্ধ কেন করিলি বা দৃঢ় মায়া ডোরে!
কোথা হতে আসে তারা, কোথা চলে যায়।
কেনই বা আসে আর কেনই বা যায়।
জন্মিতেছে যদি, কেন মরিতেছে তারা।

পুনরায় আসি কেন হইতেছে সারা।
জন্ম মৃত্যু দেখিয়াও অন্ধ কেন তারা।
পুনঃ পুনঃ আসে যায় তবু আত্মহারা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়।

অর্থ]

সাধনায় বিঘ্ন।

আত্মানুভূতিই সাধনার চরম লক্ষ্য। সাধনা ব্যতিরেকে কোনও বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধিলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। মানবের চিত্তে অনাদি কাল হইতে যে সব বিষয় বাসনা ও অবিদ্যা বদ্ধমূল হইয়া আছে, সাধনা ব্যতীত তাহার ক্ষয় সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কি অবিদ্যা নাশ, কি মোক্ষ সাধন, ইহ-পরত্র যে কিছু দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ লাভের উপায়—সাধনা। সাধনা, সর্ব্ব ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ; সাধনা, সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বল। এই রোগ, শোক, দুঃখ, দুর্দ্দশা, দৈন্য পীড়িত জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারে—এই বাহ্য চাকচিক্যময় নিরাশা-পীড়িত দুঃখময় মানব জীবনে সাধনাই চিরশান্তির পথ দেখাইয়া দেয়। সাধনার পথে গমন করিলে কত অননুভূতপূর্ব্ব শান্তি লাভ হয়। সে শান্তি রাজাধিরাজের রত্ন সিংহাসনে কেন, স্বর্গের অপ্সরা কণ্ঠ-নিনাদিত নিত্য নব আনন্দের চির লীলা নিকেতন রমনীয় নন্দন কাননেও নাই ; বুঝিবা বিশ্বের কুত্রাপি সে সুখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এ হেন সর্ব্বসুখ শান্তি দাতা সাধনার মার্গ আপাততঃ সুখশান্তি পূর্ণ নহে। এই মার্গ বিবিধ বিচিত্র কুসুমিত তরুলতা মণ্ডিত ও প্রসূন সমাচ্ছন্ন নহে। বরং এই পথ বিবিধ বিঘ্ন বিপদ্‌রাশি সমাকুল। সাধনার পথে পদে পদে বিপদ ; সাধনার পথে উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমি—যেন পিশাচের করাল মুর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। সেই উত্তপ্ত মরুতে মায়া কত মরিচীকা তুলিয়া শান্তি-পিপাসু সাধককে মার্গ ভ্রষ্ট করিয়া লোভ মোহাদি দস্যুদিগকে যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিবার সুবিধা দিতেছে। মায়া-মুগ্ধ সাধক দস্যুদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, বিভ্রান্ত হইয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন ও নিরাশ হইয়া পড়েন। তথায় তাঁহাদের শ্রম অপনোদনের কোনও উপায় নাই। সিদ্ধিকামী সাধক স্বীয় সহিষ্ণুতা ও উদ্যম বলে সাধন-পথের এই সকল দুঃখ কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া সাধন-মার্গে সোপানের পর সোপান আরোহণ করেন। সাধক মাত্রেরই জীবন এইরূপ

বিঘ্ন-বিপদ্‌রাশি সঙ্কুল ; দুঃখ কষ্ট যেন সাধকের অঙ্গাভরণ। সাধনার পথে এবম্প্রকার বিঘ্ন বিপদ্ আছে বলিয়া কোন প্রকৃত সাধক কি এই পথ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ?—কখনই নহে। কারণ এই সব বিপদরাশি উত্তীর্ণ হইয়া যদি সাধনার সমুচ্চ সোপানে আরোহণ করা যায়, তাহা হইলে সেখানে যে "অবাঙ্‌মানসগোচরম্" পদার্থ লাভ হয়। তাহাতে জীবনের সকল দুঃখ ও তাপ-ত্রয় দূর হইয়া এক পরমানন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ আর কোথাও নাই।

আর এক কথা। সাধনার পথে বিঘ্ন বিপদ আছে বলিয়া এ পথ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। নশ্বর সংসারের তুচ্ছ সুখও বিনা বাধা বিপত্তিতে মিলে না ; আর মানব জীবনের চরম সুখ—সাধনার অত্যুত্তম সুখ বিনা বাধায় মিলিবে কি প্রকারে ? সংসারে যাহা যত সুখকর, তাহার সংগ্রহে ততই দুঃখ। যেমন বহুমূল্য প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া রত্নাকরের অতলতলে নিমজ্জন না করিলে মণি-মাণিক্য পাওয়া যায় না ;—তদ্রূপ জীবন-মরণ পণ করিয়া সাধন-সিন্ধুর অতল তলে নিমজ্জন না করিলে কখনও সাধনার নিধিকে পাওয়া যায় না। সুখের পথে দুঃখ আছে বলিয়া কে কবে সুখ চেষ্টায় বিরত হয় ? ভোগে রোগ ভয়—"ভোগে রোগ ভয়ম্" আছে বলিরা কে কবে ভোগ বিমুখ হয় ? "মদ্যমদেয়মস্পর্শমপেয়ম্' এবং সকল দুঃখের আকর জানিয়া, কবে কোন্ মদ্যপায়ী মদ্য-পান হইতে বিরত হয়েন ? তদ্রূপ সাধনায় বিঘ্ন আছে জানিয়া, কবে কোন্ ভক্ত-অলিসাধন সৌধ-তোরণের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সাধু-ঋষিগণ-আকাঙ্খিত, জন্ম-মৃত্যু-জরানাশিনী ত্রিতাপহারিণী, 'চিরশান্তিদায়িনী, মুক্তি-সুধা লাভে বিরত হয়েন ? তল্লাভে বিরত হওয়া দূরে থাকুক বরং 'মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ' পণ করিয়া সেই অপার্থিব ব্রহ্মানন্দ-সুধা লাভে অধিকতর যত্নবান হয়েন। সংসারের অস্থায়ী অনিত্য সুখের ন্যায় সাধনার সুখ অনায়াস-লভ্য ও অস্থায়ী নহে। এ সুখ ভূমা নিত্য এবং বহু আয়াস লভ্য। বহু জন্মের সুতীব্র সাধনার ফলে, কত উত্থান পতন ও পতনোত্থানের পর মুক্তির এই চিরবাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। কিন্তু মৃদু সাধনায় মুক্তির এই বাঞ্ছিত ফল লাভে বহু বিলম্ব ও বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয়। তাই উপনিষদ উপদেশ দিয়াছেন,—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" অর্থাৎ 'উঠ, জাগ, বর গ্রহণ কর, যে পর্য্যন্ত না চরমে পৌঁছিতে পার ? কবিরা এই পথকে শাণিত ক্ষুর ধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।'

সাধনার যত উচ্চ সোপানে যিনি আরোহণ করেন, তাহার পতন ঘটিলে

তিনি তত নিম্নেই পতিত হয়েন। কিন্তু তাই বলিয়া এই পতন, সংসার-মার্গের দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তির পতনের ন্যায় ভবিষ্যত ভীতি ও দুঃখপূর্ণ নহে। পরন্তু পতিত সাধক পূর্ব্ব জন্মের সাধনার ফলে, উদ্ধারের পথ পাইয়া থাকেন। ঈশ্বর-পরায়ণ সাধকের পতন হইলেও তাঁহাদের কথনও বিনাশ নাই। ভগবান এই কথা গীতাতে বলিয়াছেন ;—

"পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নাহ কল্যাণকৃত কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
অথবা যোগীনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্॥
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥
তত্র তং বুদ্ধি-সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যত তে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তেহ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতি বর্ত্ততে॥
প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ।
অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

গীতা ৬ষ্ঠ অঃ ৪০-৪৫।

"ভগবান কহিলেন, হে পার্থ! কি ইহলোকে কি পরলোকে, কুত্রাপি যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির বিনাশ নাই; কারণ হে তাত; কল্যাণকারী ব্যক্তি কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি বহু বর্ষ যাবৎ পুণ্যশীলগণের প্রাপ্য লোকে অবস্থিতি করতঃ সদাচার ধনবানদিগের গৃহে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া থাকে; অথবা ধীমান্ যোগীগণের কুলে জন্মগ্রহণ করে। ঈদৃশ যে জন্ম ইহলোকে অতীব দুর্লভ, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পূর্ব্বদেহ-লব্ধ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ-প্রাপ্তি বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হইয়া থাকেন। যোগভ্রষ্ট-ব্যক্তি কোন বিঘ্ন-নিবন্ধন অনিচ্ছু হইলেও পূর্ব্ব জন্ম কৃত অভ্যাস তাহাকে ব্রহ্ম-পরায়ণ করে; তখন সেই ব্যক্তি যোগ-জিজ্ঞাসু হইয়া বেদ কথিত কর্ম্মফল অপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। নিষ্কলুষ যোগী অধিকতর প্রযত্ন সহকারে বহু জন্মে সিদ্ধ হইয়া অবশেষে পরমাগতি লাভ করে।"

তাই বলিতেছি, সাধনার মার্গ বিঘ্ন বিপদ্‌সঙ্কুল হইলেও, অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে

পুনঃ পুনঃ ব্যাঘাত ঘটিলেও, সকলেরই এই পথ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। সাধনার পথ আপাতঃ দৃষ্টিতে দুঃখময় হইলেও, এ পথ কেবলই সুখের আকর স্বরূপ। সাধনার পথে যে দুঃখ আছে, তাহা প্রকৃত দুঃখ নহে—সুখ। যে সুখ পরিনামে দুঃখের পথে লইয়া যায়, তাহা কদাচ সুখ নহে—তাহাই দুঃখ। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সংসারের তাবৎ বস্তুই দুঃখানুবিদ্ধ। এই কারণ সাংসারিক অনিত্য বস্তু জীবকে এ যাবৎ সন্তোষ দান করিতে পারে নাই ও কখনও পারিবেনা। নশ্বর অনিত্য বস্তু হইতে কখনও সুখের উদ্ভব হয় নাই, হইবেও না। পরিণামে দুঃখ, বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভোগকালে দুঃখ এবং পশ্চাৎ বা স্মরণ কালেও দুঃখ হয় দেখিয়া এবং সত্ত্বাদি গুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে দেখিয়া, বিবেকীগণ সমস্ত বস্তুকেই দুঃখ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "পরিণাম তাপ সংস্কার দুঃখৈ গুণবৃত্তি বিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বম্ বিবেকিনঃ" (পাতঞ্জল দর্শন, সাধন পাদ ১৫ সূত্র)। এইরূপে সংসারের তাবৎ বস্তুই দুঃখ সংশ্লিষ্ট দেখিয়া, কালে জীবের বুদ্ধিও শক্তি স্বতঃ প্রেরিত হইয়া নিত্য সনাতন ও চির সুখ-ময় অবলম্বনকে ধরিতে যাইয়া সাধনার পথ দিয়া সেই মূল তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তিগণ মোহে মুগ্ধ হইয়া 'ইহাতে সুখ হয়' 'উহাতে দুঃখ হয়' মনে করিয়া আপনাকে একবার সুখী. একবার দুঃখী মনে করিয়া, সুখ-দুঃখের নিষ্পেষণে নিষ্পেশিত হয়। সংসার-চক্রের এই সুখ-দুঃখের নিষ্পেষণ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার পন্থাই—সাধনা। নিত্য সুখ মিলিবার কারণ বলিয়া সাধনার পথের ক্লেশও সুখকর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মানবের প্রকৃত সুখ কোথায়? বাস্তবিক সংসারের কোন বস্তুই সুখ বা দুঃখের হেতু নহে। সুখ বা দুঃখ মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা সংসারে নিরতিশয় সুখ বা দুঃখ অনুভব করা যাইতে পারে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনে যে সুখ হয়, তাহা পরিণামে দুঃখদ বলিয়া দুঃখের এবং নিবৃত্তির দ্বারা যে সুখ ভোগ হয়, তাহা পরিণামে সুখদ বলিয়া প্রকৃত সুখের। নিবৃত্তি দ্বারাই প্রকৃত দুঃখের বিনাশ ও সুখের উদ্ভব হয়। বৃত্তির এই নিবৃত্তির অবস্থাই যোগ বা সাধনা। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (পাতঞ্জল দর্শন ২য় সূত্র সমাধিপাদ)। বৃত্তির নিরোধই আত্মানুভূতির প্রকৃষ্ট উপায়। বৃত্তির নিরোধ হইলে আত্মানুভূতি হয়————"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" (ঐ তৃতীয় সূত্র সমাধিপাদ) তখন (এই নিরোধের অবস্থায়) দ্রষ্টা (পুরুষ) আপনার (অপরিবর্ত্তনীয়) স্বরূপে অবস্থিত থাকেন।

তিনি তত নিম্নেই পতিত হয়েন। কিন্তু তাই বলিয়া এই পতন, সংসার-মার্গের দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তির পতনের ন্যায় ভবিষ্যত ভীতি ও দুঃখপূর্ণ নহে। পরন্তু পতিত সাধক পূর্ব্ব জন্মের সাধনার ফলে, উদ্ধারের পথ পাইয়া থাকেন। ঈশ্বর-পরায়ণ সাধকের পতন হইলেও তাঁহাদের কখনও বিনাশ নাই। ভগবান এই কথা গীতাতে বলিয়াছেন ;—

"পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নাহ কল্যাণকৃত কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি ॥
প্রাপ্য পূণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥
অথবা যোগীনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ॥
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥
তত্র তং বুদ্ধি-সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যত তে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তেহ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতি বর্ত্ততে ॥
প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ।
অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥

গীতা ৬ষ্ঠ অঃ ৪০-৪৫।

"ভগবান কহিলেন, হে পার্থ! কি ইহলোকে কি পরলোকে, কুত্রাপি যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির বিনাশ নাই ; কারণ হে তাত ; কল্যাণকারী ব্যক্তি কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি বহু বর্ষ যাবৎ পুণ্যশীলগণের প্রাপ্য লোকে অবস্থিতি করতঃ সদাচার ধনবানদিগের গৃহে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া থাকে ; অথবা ধীমান্ যোগীগণের কুলে জন্মগ্রহণ করে। ঈদৃশ যে জন্ম ইহলোকে অতীব দুর্ল্লভ, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পূর্ব্বদেহ-লব্ধ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ-প্রাপ্তি বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হইয়া থাকেন। যোগভ্রষ্ট-ব্যক্তি কোন বিঘ্ন-নিবন্ধন অনিচ্ছু হইলেও পূর্ব্ব জন্ম কৃত অভ্যাস তাহাকে ব্রহ্ম-পরায়ণ করে ; তখন সেই ব্যক্তি যোগ-জিজ্ঞাসু হইয়া বেদ কথিত কর্ম্মফল অপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। নিষ্কলুষ যোগী অধিকতর প্রযত্ন সহকারে বহু জন্মে সিদ্ধ হইয়া অবশেষে পরমাগতি লাভ করে।"

তাই বলিতেছি, সাধনার মার্গ বিঘ্ন বিপদসঙ্কুল হইলেও, অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে

পুনঃ পুনঃ ব্যাঘাত ঘটিলেও, সকলেরই এই পথ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। সাধনার পথ আপাতঃ দৃষ্টিতে দুঃখময় হইলেও, এ পথ কেবলই সুখের আকর স্বরূপ। সাধনার পথে যে দুঃখ আছে, তাহা প্রকৃত দুঃখ নহে—সুখ। যে সুখ পরিনামে দুঃখের পথে লইয়া যায়, তাহা কদাচ সুখ নহে—তাহাই দুঃখ। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সংসারের তাবৎ বস্তুই দুঃখানুবিদ্ধ। এই কারণ সাংসারিক অনিত্য বস্তু জীবকে এ যাবৎ সন্তোষ দান করিতে পারে নাই ও কখনও পারিবেনা। নশ্বর অনিত্য বস্তু হইতে কখনও সুখের উদ্ভব হয় নাই, হইবেও না। পরিণামে দুঃখ, বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভোগকালে দুঃখ এবং পশ্চাৎ বা স্মরণ কালেও দুঃখ হয় দেখিয়া এবং সত্ত্বাদি গুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে দেখিয়া, বিবেকীগণ সমস্ত বস্তুকেই দুঃখ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "পরিণাম তাপ সংস্কার দুঃখৈ গুণবৃত্তি বিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বম্ বিবেকিনঃ" (পাতঞ্জল দর্শন, সাধন পাদ ১৫ সূত্র)। এইরূপে সংসারের তাবৎ বস্তুই দুঃখ সংশ্লিষ্ট দেখিয়া, কালে জীবের বুদ্ধিও শক্তি স্বতঃ প্রেরিত হইয়া নিত্য সনাতন ও চির সুখ-ময় অবলম্বনকে ধরিতে যাইয়া সাধনার পথ দিয়া সেই মূল তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তিগণ মোহে মুগ্ধ হইয়া 'ইহাতে সুখ হয়' 'উহাতে দুঃখ হয়' মনে করিয়া আপনাকে একবার সুখী. একবার দুঃখী মনে করিয়া, সুখ-দুঃখের নিষ্পেষণে নিষ্পেশিত হয়। সংসার-চক্রের এই সুখ-দুঃখের নিষ্পেষণ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার পন্থাই—সাধনা। নিত্য সুখ মিলিবার কারণ বলিয়া সাধনার পথের ক্লেশও সুখকর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মানবের প্রকৃত সুখ কোথায়? বাস্তবিক সংসারের কোন বস্তুই সুখ বা দুঃখের হেতু নহে। সুখ বা দুঃখ মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা সংসারে নিরতিশয় সুখ বা দুঃখ অনুভব করা যাইতে পারে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনে যে সুখ হয়, তাহা পরিণামে দুঃখদ বলিয়া দুঃখের এবং নিবৃত্তির দ্বারা যে সুখ ভোগ হয়, তাহা পরিণামে সুখদ বলিয়া প্রকৃত সুখের। নিবৃত্তি দ্বারাই প্রকৃত দুঃখের বিনাশ ও সুখের উদ্ভব হয়। বৃত্তির এই নিবৃত্তির অবস্থাই যোগ বা সাধনা। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (পাতঞ্জল দর্শন ২য় সূত্র সমাধিপাদ)। বৃত্তির নিরোধই আত্মানুভূতির প্রকৃষ্ট উপায়। বৃত্তির নিরোধ হইলে আত্মানুভূতি হয় ———— "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" (ঐ তৃতীয় সূত্র সমাধিপাদ) তখন (এই নিরোধের অবস্থায়) দ্রষ্টা (পুরুষ) আপনার (অপরিবর্ত্তনীয়) স্বরূপে অবস্থিত থাকেন।

যে পথে বৃত্তির নিরোধ হয়, তাহাই যোগ বা সাধনার পথ। নানা প্রকার বিঘ্ন বিপদের কিম্বদন্তী আছে। ইহাকে যোগ বা সাধন-বিঘ্ন বলে। এই যোগের পথে বা সাধনার পথে প্রত্যেক সাধকেরই অল্প বিস্তর বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। সেই সকল বিঘ্নের কথা যথাজ্ঞান বর্ণিত হইতেছে।

সাধনায় নানা প্রকার বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মধ্বজিতা, ভাবদুষ্টতা, বিলাস-লালসা, অহংজ্ঞান, অভিমান ও কপটাচার প্রভৃতি সাধনার প্রচলিত বিঘ্ন। এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও কয়েক প্রকার সাধন বিঘ্নের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এগুলি সাধনার সোপানে স্বতঃই উপস্থিত হয়। আবার সাধকের অহংকার প্রভৃতি দোষ হইতেও বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সাধক যখন সাধনার ক্রমোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার কোন কোন অলৌকিক দৈবী শক্তির আবির্ভাব হয়। সাধক সেই সকল দৈবী শক্তি লাভ করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনার শক্তির অযথা ব্যবহার করিয়া সাধন-সোপান হইতে বিচ্যুত বা যোগভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগ-সূত্রে সমাধিপাদে কয়েকটি সমাধি বা বিঘ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। "ব্যাধিস্ত্যানসংশয় প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনালব্ধ ভূমিকত্বানবস্থিতানি চিত্তবিক্ষেপোস্তেহন্তরায়াঃ॥' অর্থাৎ ব্যাধি, স্ত্যান (মনের অক্ষমতা, ইচ্ছা হইলেও কার্য্য করিবার শক্তির অভাব) সংশয় (যোগ করিতে পারিব কিনা অথবা যোগ হয় কিনা ইত্যাকার জ্ঞান) প্রমাদ (চিত্তের ঔদাসীন্য) আলস্য (শরীরের ও মনের গুরুত্ব যদ্দ্বারা যোগে অপ্রবৃত্তি জন্মে) অবিরতি (বিষয়-তৃষ্ণা, অর্থাৎ ইহা হউক, উহা হউক ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষা) ভ্রান্তি দর্শন (ভ্রম জ্ঞান অর্থাৎ একে আর জ্ঞান, শুক্তিতে রজত জ্ঞান) অলব্ধভূমিকত্ব (কোন কারণে বা প্রতিবন্ধক বশতঃ যোগাবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া, যোগ বা সাধনা আরম্ভ করিয়া কোন সিদ্ধি লক্ষণ না দেখিলে চিত্তে অমনি বিক্ষেপ উপস্থিত হয়. মনে হয় বৃথা পণ্ডশ্রম হইতেছে; ইহাও বিঘ্ন মধ্যে গণ্য) অনবস্থিত চিত্ত (চিত্তের অস্থিরতা; কোন এক যোগ অবস্থা পাইলে তাহাতে চিত্ত স্থির বা সন্তুষ্ট না থাকা);—এই গুলিন সকলই একাগ্রতা লাভের বিঘ্ন বা বিপক্ষ, সুতরাং সাধনার ঘোর অন্তরায়। চঞ্চলতা সাধনার প্রবল বিঘ্ন। চিত্তস্থির না হইলে সাধনার সোপানে কখন আরোহণ করা যায় না। *

চিত্তস্থির না হওয়ায় কতকগুলি কারণ আছে, সেই গুলি এই—"দুঃখ দৌর্ম্ম-

* ৺পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ব্যাখ্যা।

নস্যাঙ্গমজেয়ত্ব শ্বাসাবিক্ষেপসহভুবঃ (সমাধিপাদ—৩১ সূত্র) দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য (ইচ্ছার ব্যাঘাত হইলে যেমন ক্ষোভ জন্মে তাহার নাম দৌমনস্য) অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস—এগুলি বিক্ষেপের অর্থাৎ অস্থিরতায় সহচর। সুতরাং মনঃস্থৈর্য্যের প্রতিবন্ধক। আর কতগুলি বিঘ্ন, এগুলি সাধারণ সর্ব্বোচ্চ সোপানে উপস্থিত হয়। সাধক যখন সাধনার সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিতে থাকেন, যখন তাঁহার অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্য গুলি আয়ত্তে আইসে; তখন তিনি বঞ্চনাপরায়ণ দেবযোনি সমূহ অর্থাৎ পিশাচ গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া থাকেন।

বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় নানাবিধ আলৌকিক দিব্য মুর্ত্তি সাধকের মানসপটে উদিত হইয়া প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হয় সাধন-রসানভিজ্ঞ সাধক সেই মুর্ত্তির ইঙ্গিত মত চালিত হইয়া সাধন সোপান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

বৈরাগ্যাবতার জ্ঞানসিন্ধু ভগবান বুদ্ধ দেবের আলৌকিক জীবনেও আমরা এই সকল সাধন বিঘ্নের পরিচয় পাই। ভগবান বুদ্ধ দেবকে সাধনমার্গ ভ্রষ্ট করিবার জন্য 'মার' নামক দৈত্য নানা প্রকার পলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কবিবর নবীনচন্দ্র সেই সকল বিঘ্নের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তন্মধ্য হইতে দুই একটি উদ্ধৃত হইল।

"পঞ্চমা আবেশময়ী কুন্তল আলুলায়িতা, কুসুম শয্যায় অর্দ্ধ শায়িতা সুন্দরী অর্দ্ধ অনাবৃত বক্ষ, অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি, কি মধুর হাসিসিক্তবিম্বাধরে মরি! কুসুমে খচিত বাসা একবারে চারু বীণা তুলিছে; মূর্চ্ছনা মৃদু কি আবেশ ময়। সুরাপাত্র অস্ত করে, অবেশ কটাক্ষে কহে, আইস বিলাস সুখে পূরিব হৃদয়। দাঁড়াইয়া কামদেব, দাঁড়াইয়া রতি দেবী রতির কুসুম কায়, কুসুমেরি পাশ। কহে কাম, শাক্যসিংহ চেয়ে দেখ, এতাধিক আছে মানবের আর কিবা অভিলাষ। কি চাহ সকলি তাহা, দিবে প্রাণ পত্নী মম বাঁধিয়া কুসুমদাম করেতে তোমার। এই নির্ব্বাণের পথ দেখেছো কি দুঃখরেখা যাও ঘরে ফিরে যোগ কর পরিহার (অমিতাভ)।"

সাধনার পথে এইরূপ নানাবিধ বিঘ্ন নানা মূর্ত্তিতে উপস্থিত হয়। সিদ্ধিকামী সাধক এই গুলিকে বিঘ্নমাত্র জানিয়া অগ্রাহ্য পূর্ব্বক চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হয়েন। যদি তিনি এই সকল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। আমরা আগামী বারে অস্মদ্দেশের কোনও

বিখ্যাত সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগীর অপূর্ব্ব লোক বিস্ময়কর সাধন বিঘ্নের অথ্যায়িকা পাঠকবর্গের গোচর করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

মৃত্যুপথ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্যক্তি ভেদঃ কর্ম্ম বিশেষাৎ।

পরে অন্যান্য জীবের কর্ম্মে বা অদৃষ্টের বলে তাহা অংশে অংশে ভিন্ন হইয়া অনেক অর্থাৎ অসংখ্য হইয়াছে; যেমন এক পিতৃলিঙ্গ শরীর হইতে অনেক পুত্র কন্যাদির লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয় সেইরূপ।

তদনিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহেতদ্বাদত্তদ্বাদঃ ॥

লিঙ্গ শরীরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় সূক্ষ্মভূত এবং তাহার আশ্রয় এই ষাট্‌কৌষিক স্থূল। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে সূক্ষ্ম দেহই দেহ; পরন্তু তাহা ষাট্-কৌষিক স্থূলে অবস্থিত থাকে বলিয়া ষাট্-কৌষিক স্থূলও দেহ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

নস্বাতন্ত্র্যাত্তদৃতেচ্ছায়াবচ্চিত্র বচ্চ ॥

ছায়া অথবা চিত্র যেমন আধার পরিশূন্য হয় না বা থাকে না, তেমনি লিঙ্গ-দেহও নিরাধার বা নিরাশ্রয় নহে। তাহারও অধিষ্ঠান বা আশ্রয় আছে। তাহা সূক্ষ্ম ভূতের অবস্থাবিশেষ।

মূর্ত্তত্বেপিন সঙ্ঘাত যোগাৎ তরণীবৎ ॥

লিঙ্গ শরীর শরীর বলিয়া মূর্ত্ত বটে; পরন্তু তাহা অসঙ্গ ও স্বতন্ত্র অবস্থান করে না। তাহা সূর্য্য কিরণের ন্যায় সঙ্ঘাত অবলম্বনে অবস্থান করে। সূর্য্য কিরণ কেন? তেজ পদার্থ মত্রেই পার্থিব দ্রব্যাদিতে সম্বন্ধ হইয়া অবস্থান করে। লিঙ্গ-শরীর সত্ত্ব প্রকাশময় বলিয়া ভূতসঙ্গী অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূতাশ্রয়ী।

অণু পরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ ॥

লিঙ্গ-দেহ মূর্ত্ত ও পরিমিত পরিমাণ বিশিষ্ট। হেতু এই যে, তাহার ক্রিয়া শ্রবণ আছে। ক্রিয়া = কর্ম্মকরণ ও গত্যাগতি প্রভৃতি। মূর্ত্ত ব্যতীত পূর্ণ বা বিভু পদার্থে ক্রিয়া হয় না।

তদন্নময়ত্ব শ্রুতেশ্চ ॥

শ্রুতি বলিয়াছেন, লিঙ্গ শরীরের একাবয়ব মন; তাহা অন্নময় অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রব্যের পরিণামে উৎপন্ন। তাহাতেও বুঝা গেল, লিঙ্গ শরীর অনিত্য ও পরিমিত পরিমাণ বিশিষ্ট। যাহা অপরিমিত বা বিভু তাহা অনিত্য নহে; প্রত্যুত নিত্য।

পুরুষার্থং সংস্থৃতিলিঙ্গানাং সূর্পকারবদ্রাজ্ঞঃ ॥

জীব পুরুষের অবয়ব অঙ্গুষ্ঠ প্রমান। যাঁহার তেজ সূর্য্যের ন্যায়, যিনি সঙ্কল্প ও অহংকার প্রভৃতির আশ্রয়, সেই জীব পুরুষ স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারে।

সূক্ষ্ম দেহের বিস্তৃতি। আকৃতি থাকিলেই বিস্তৃতি থাকিবে। স্থূল শরীর যেমন কতক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, সূক্ষ্ম শরীরও কতক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে, যথা।—

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽঙ্গুষ্ঠঞ্চ সমাশ্রিতঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতিবিশ্বভুক ॥ ১৩৮ ॥ নারায়ণোপনিষৎ ॥

অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র স্থানকে আশ্রয় করিয়াছে; সমস্ত জগতের ঈশ্বর ও বিশ্বভুক্ প্রভু সমস্তকে প্রীত করেন।

সূক্ষ্ম শরীরের প্রকৃতি। জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর পঞ্চ কোষাত্মক। তন্মধ্যে স্থূল শরীর অন্নময়, সূক্ষ্ম শরীর প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়, এবং কারণ শরীর আনন্দময়। প্রাণী মাত্রেই এই নিয়ম।

(ক) অন্নময় কোষ বা স্থূল শরীর। ভৌতিক শক্তির আধার ভূতকোষ বা অন্নময় কোষ। অন্নের বিকারাত্মক ষাট্‌কৌষিক অর্থাৎ অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক, মাংস ও রক্ত দ্বারা গঠিত শরীরই অন্নময় কোষ। পিতৃ মাতৃ ভুক্ত অন্ন হইতে ইহা উৎপন্ন। যে শরীর অর্থাৎ স্থূলদেহ, পিতৃমাতৃ ভুক্ত অন্নের পরিণাম বিশেষরূপ শুক্র শোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নরস দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই অন্নময় কোষ বা স্থূল সমষ্টি। পিতৃমাতৃ ভুক্ত অন্নরস বনস্পতি প্রভৃতি বৃক্ষাদি হইতেই গৃহীত হয়, এইজন্য ইহাকে 'উদ্ভিদ্ কোষও' বলা যায়; কেননা ইহা উদ্ভিদের সহিত সম্পূর্ণই সাদৃশ আছে, যথা শ্রুতি—"তান্ হৈতৈঃ

শ্লোকৈঃ প্রপচ্ছ। যথা বৃক্ষোবনস্পতি স্তথৈব পুরুষোহমৃষা, তস্তলোমানি পর্ণানিত্বগসোৎপটিকাবহিঃ। ত্বচ এবাস্ত রুধিরং প্রস্তন্দি ত্বচ উৎপটঃ তস্তাত্তদা বৃক্ষোৎপ্রৈতিরসো বৃক্ষাদি বাহতাৎ। মাংসান্তস্ত শকরাণি কিনাটং স্নাবতৎ স্থিরং, অস্থীন্যন্তরতোদারুণি মজ্জামজ্জোপমকৃতা। ২৮॥ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

এই জগতে পুরুষ এবং বনস্পতি বা বৃক্ষ উভয়ই ঠিক একরূপ। পুরুষের লোম আছে, বনস্পতিরও পত্র আছে; পুরুষের যেমন ত্বক আছে, বৃক্ষেরও তেমন বল্কল আছে। পুরুষেরও কর্ত্তিত ত্বক্ হইতে রুধির নিঃসৃত হয়, বৃক্ষেরও কর্ত্তিত বল্কল হইতে রস নিঃসৃত হয়। পুরুষেরও মাংস আছে, বৃক্ষেরও মাংস স্থানীয় শকল আছে। পুরুষেরও স্নায়ু অর্থাৎ শিরা আছে, বৃক্ষেরও কিনাট অর্থাৎ বল্কলের ভিতরে এক প্রকার সূত্র আছে। পুরুষেরও স্নায়ুর পরে অস্থি সমস্ত আছে, বৃক্ষেরও কিনাটের নীচে দারু অর্থাৎ কাষ্ঠ আছে। পুরুষেরও মজ্জা আছে, বৃক্ষেরও সার আছে। এবম্প্রকারে স্থূল শরীর উদ্ভিদাত্মক অন্নময় কোষ।

সন্নিধানাদ্ যথাকাশ কালাদ্যাঃ কারণং তয়োঃ।
তথৈব পরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ।
ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ তথা।
কাণ্ডং কোষস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলাঃ॥
তুষাকণাশ্চ সন্তোবৈষান্ত্যাবির্ভাবমাত্মনঃ।
প্ররোহহেতু সামগ্রম্ আসাদ্য মুনিসত্তম॥
তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাঃ সমবস্থিতাঃ॥
বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তিবৈ॥ বি পু ২ অং-৭অঃ॥

আকাশ ও কাল প্রভৃতি যেমন সন্নিধান হেতু বৃক্ষোৎপত্তির কারণ হয়, সেইরূপ ভগবান্ হরিও জগতের পরিণামের কারণ। হে মুনিসত্তম! ধান্যের মধ্যে যেমন মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কোষ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কণা সকল আছে এবং অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু ভূমি জলাদি সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া আভির্ভূত হয়; সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম সকলে অবস্থিত দেবাদি সমুদয়, বিষ্ণু-শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অবির্ভূত হয়।

(খ) প্রাণময় কোষ বা সূক্ষ্ম শরীর। ভৌতিক শক্তি ও জীবনী শক্তি দুইয়ের একাধার উদ্ভিদ কোষ, প্রাণময় কোষ অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌দিগের অন্নময় ও প্রাণের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু মন, বুদ্ধি ও আনন্দের বিকাশ অন্যান্য জীবাদি

হইতে অতি অল্পতর মলিন। অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে অন্নময় শরীরে বলাধান করতঃ ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তিকারী পরিপূর্ণ স্বভাব যে পঞ্চ বায়ু, তাহাকে প্রাণময় কোষ কহে। দৈহিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া প্রাণময় কোষের কার্য্য। প্রাণময় কোষ সূক্ষ্ম শরীরের প্রথম আবরণ। এই প্রাণময় কোষে প্রাণাদি বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইলে, বক্তৃতাদি রহিত আত্মাকে বক্তার ন্যায়, দাতৃত্বাদি রহিত আত্মাকে দাতার ন্যায়, গমনাদি রহিত আত্মাকে গন্তার ন্যায় এবং ক্ষুৎ-পিপাসাদি রহিত আত্মাকে ক্ষুৎ-পিপাসাদি যুক্তের ন্যায় আবরণ করে।

(গ) মনোময় কোষ বা সূক্ষ্ম শরীর। ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি ও চেতন শক্তি এই তিনের একাধার পশ্বাদি কোষ বা মনোময় কোষ অর্থাৎ পশ্বাদিতে অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষের অভিব্যক্তি আছে; কিন্তু বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের অভিব্যক্তি অতি মলিন ও কম। প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোষ নামে অভিহিত হয়। ইহাই সূক্ষ্ম শরীরের দ্বিতীয় আবরণ। ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা, কল্পনা, ধারণা, ধৃতি, স্মৃতি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, মমতা, গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ ইত্যাদি সমস্তই মনোময় কোষের ধর্ম্ম। এই মনোময় কোষ হইতে 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি সংকল্প বিকল্প উত্থিত হয় এবং নামরূপাদি ভেদ কল্পনা দ্বারা প্রবল প্রাণময় কোষকে অভিপূর্ণ করিয়া স্বয়ং প্রকাশমান হয়।

অহঙ্কারোহভিমানশ্চকর্ত্তা মন্তা চ সংস্মৃতঃ।
আত্মাচ প্রাকৃতোজীবো যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥ কূর্ম্ম॥

অর্থাৎ অহঙ্কার, অভিমান, কর্ত্তা, অনুমন্তা, সংস্মৃত আত্মা, প্রাকৃত ও জীব এই সকল অহংকারের নাম। এক অন্তঃকরণই যেমন বীজ, অঙ্কুর ও মহাবৃক্ষাদিরূপে ত্রয়াবস্থা ভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ এক বীজেরও বীজ, অঙ্কুর ও মহা বৃক্ষাদি অবস্থাত্রয় উপস্থিত করে, তদ্রূপ মহত্তত্ত্বেরও সাত্ত্বিক বিকাশে বুদ্ধি, রাজসিক বিকাশে চিত্ত বা মন এবং তামসিক বিকাশে অহংকার উৎপন্ন হয়। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রকাশক সংশয়াত্মক মনের স্থান ললাটদেশ অর্থাৎ মস্তকাভ্যন্তরে ললাটদেশে মনোময় কোষ অবস্থিতি করে, এবং সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান মস্তিষ্ক সুতরাং মনের সহিত একীভাবাপন্ন। ঐ মনোময় আকুঞ্চণ শক্তিবলে যত ইচ্ছা তত সূক্ষ্ম হইতে পারে, এবং প্রসারণ শক্তিবলে

যত ইচ্ছা ততদূর প্রসারিত হইতে পারে; এক মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। ঐ মনের একটি সংরক্ষণী শক্তি আছে। মনোময় কোষের দুইটী কার্য্য। একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয় সংগ্রহ করণ, দ্বিতীয় অন্তরে তাহার চিন্তা দ্বারা পরিবর্দ্ধন ও বিস্তার করিয়া ভাবের আকার নির্ম্মাণ করণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়েতে বাহ্য বিষয় জ্ঞান পতিত হয়, স্নায়ু দ্বারা তাহা মনোময় কোষে অর্পিত হয়, মন তাহার 'আয়তন পরিবর্দ্ধন শক্তি' বলে বা প্রসারণ শক্তিবলে তাহা গ্রহণ করিয়া 'সংরক্ষণী' শক্তিবলে তাহাকে ধারণ পোষণ করিয়া তাহাতে ভাবের আকার নির্ম্মাণ করে; ঐ ধারণ পোষণের নামই ধৃতি ইত্যাদি। ঐ নির্ম্মিত ভাবে মনের যখন অভিনিবেশ বা আসক্তি জন্মে, তখনই ইচ্ছা রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি কামজ বৃত্তিরও বিকাশ হয় এবং উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বৃত্তি এবং বিশেষাবিশেষ ভাবের উদয় হয়।

ঐ মনোময় কোষের বিকার হইলে, সংশয় রহিত আত্মাকে সংশয়াপন্নের ন্যায়, শোকমোহাদিশূন্য আত্মাকে শোকমোহাদি যুক্তের ন্যায়, শ্রবণ দর্শনাদি গুণ বর্জ্জিত আত্মাকে শ্রবণ দর্শনাদি গুণ যুক্তের ন্যায় আবরণ করে, এবং কাম ক্রোধাধি বিহীন আত্মাকে কামুক ও ক্রোধীরূপে প্রতীয়মান করে।

(ঘ) বিজ্ঞানময় কোষ বা সূক্ষ্ম শরীর। ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতন শক্তি ও ধীশক্তি এই চারের একাধার বিজ্ঞানময় কোষ। মনোময় কোষের অভ্যন্তরে মস্তিষ্কস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে বিচার জনিত জ্ঞান-বুদ্ধি-বিকাশক, নিশ্চয়াত্মক বিজ্ঞানাময় কোষ রহিয়াছে; উহাই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রকাশক বিজ্ঞানাত্মা। সুষুপ্তি কালে অজ্ঞানে লীন হয় এবং জাগ্রতাবস্থায় আনখাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। যে চৈতন্য ! ছায়া বিশিষ্ট বুদ্ধি, তাহাকেই বিজ্ঞানময় কোষ বলে। ইহাই সূক্ষ্ম শরীরের তৃতীয় আবরণ। কর্ত্তৃত্বাভিমান এই বিজ্ঞানময় কোষের ধর্ম্ম। মন এবং বুদ্ধি ইহারা উভয়ে অন্তঃকরণ রূপে সামান্যতঃ অভিন্ন হইলেও অন্তরেতে কর্ত্তৃরূপে পরিণত হইয়া বুদ্ধি বিজ্ঞানময় শব্দের বাচ্য হয়, এবং মন বাহ্যেতে করণরূপে বিকৃত হইয়া মনোময় শব্দে উক্ত হয়। ইচ্ছা, নির্ব্বাচন, যুক্তি, বিচার, বিবেচনা, বিবেক প্রভৃতি এই বিজ্ঞানময় কোষের কার্য্য। বিজ্ঞানময় কোষ, জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির কেন্দ্র। মনোময় কোষ যে বিষয় ও অভিজ্ঞতা বাহ্য জগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া উপলব্ধি, ধারণা, চিন্তা, কল্পনা প্রভৃতি দ্বারা অন্তরে পরিবর্দ্ধন ও বিস্তার করে। বিজ্ঞানময় কোষ তাহা নির্ব্বাচন, বিচার ও যুক্তি দ্বারা উপযুক্তরূপে নিয়োগ ও সুব্যবস্থিত করে।

মনোময় কোষস্থ ইচ্ছা বাহ্য বিষয়ের আকর্ষণের অধীন; উহা ইন্দ্রিয়-লব্ধ বাহ্য বিষয় কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া তদাকারে অন্তরে গঠিত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ বাহ্য বিষয়ের অধীন হইয়া পড়ে। বাহ্য জগতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির প্রলোভনে পড়িয়া ইচ্ছা উহাদের অনুগত ভৃত্যের ন্যায় দাসত্বে নিযুক্ত হয়। ইচ্ছা রূপবতী কামিনীরূপে, উৎকৃষ্ট খাদ্যে, গন্ধে, মোহিত হইয়া পড়ে ও নানা প্রকার বিষয় ঐশ্বর্য্যে প্রলোভিত হয়। এইজন্য ঐ ইচ্ছা স্বাধীন ইচ্ছা নহে। কিন্তু বিজ্ঞানময় ইচ্ছা স্বাধীন; উহা বাহ্য বিষয়ের অধীন নহে, উহা অন্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া যুক্তি ও বিবেকের সহিত স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু সচরাচর মনোময় কোষস্থ ইচ্ছা প্রবল স্রোতে পড়িয়া স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান-ময় কোষস্থ স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি মনোময় কোষস্থ ইচ্ছা-শক্তিকে দমন করিতে পারিলে, সমস্ত জগৎকে স্বীয় অধীনে আনিয়া ইচ্ছামত চালাইতে পারে। ঐ ইচ্ছার নাম "ধীশক্তি।" ইহা দ্বারা মানবের স্বাধীন ইচ্ছা সেই মহৎ ইচ্ছার অংশ সাব্যস্ত হইতেছে। যোগীগণ স্বাধীন ইচ্ছা বলে স্থূল দেহে, সূক্ষ্ম দেহে বিবর্ত্তন, ও সূক্ষ্ম উপাদানে স্থূল বিশ্বের নির্ম্মাণ ও অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়কর ব্যাপার সকল সম্পাদন করিতে পারেন। বিজ্ঞানময় কোষই 'ব্যবহারিক জীব' বলিয়া কথিত হয়। বুদ্ধিতে চৈতন্যের ছায়া পড়াতে অত্যন্ত স্বচ্ছতা-প্রযুক্ত বুদ্ধিকে চৈতন্যের ন্যায় দেখায়। ইহাকেই আত্মার অভিভঙ্গ চৈতন্য বলে। স্ফটিকে জবা পুষ্পের ন্যায়, এই বুদ্ধিই আত্মার উপাধি। বুদ্ধি ভিন্ন ও অজ্ঞান বা অবিদ্যা নামক আত্মার সূক্ষ্মতর একটি উপাধি আছে, ইহাই বুদ্ধি-সম্পর্কের কারণ ও মূল উপাধি। "উপ সমীপে অধীয়তে" ইতি উপাধি অর্থাৎ যাহা আত্মার অতি নিকটে থাকে। নিদ্রাবস্থায় বুদ্ধি ঐ অজ্ঞানেই লীন হয়। বুদ্ধিরূপ উপাধিতে উপহিত চৈতন্যের নাম বুদ্ধিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা চৈতন্যাভাস। এই চৈতন্যাভাস যখন বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করেন, তখন তিনি স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং যখন অজ্ঞানোপাধিতে উপহিত চৈতন্যাভাস অজ্ঞানোপাধি বিজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিকে উপরত করেন, তখন তাহার সুষুপ্তি প্রাপ্তি হয়। বস্তুতঃ আত্মা সর্ব্বাবস্থায় একরূপেই বিদ্যমান থাকেন; কেবল বুদ্ধিই দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয় আকারে পরিণত হয়। সেই পরিমাণ অধ্যস্ত হইলে জাগরণাদি অবস্থাত্রয়ের কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়। ঐ সুষুপ্তি কালের বুদ্ধি বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে বটে, কিন্তু উক্ত অজ্ঞানরূপ উপাধি

কর্ত্তৃক সমাচ্ছাদিত হইয়া স্বরূপে শূন্যের ন্যায় অতি সামান্য ভাবে অর্থাৎ বীজাকারে অবস্থান করে; সুতরাং বুদ্ধির বীজাভাবে অবস্থানই সুষুপ্তি; ইহাই তাহার দৈনন্দিন নিত্য প্রলয়। মূর্চ্ছা, মরণ ও নৈমিত্তিক প্রলয় কালেও বুদ্ধি এই প্রকারে অবস্থান করিয়া থাকে। তজ্জন্যই মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর জ্ঞানোদয় হয় ও মরণাদির পর নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় জীবের পূণর্জন্ম লাভ হয়। ভোগ-জনক কর্ম্ম-সূত্রই বুদ্ধিকে এইরূপে রক্ষা করে। আত্মা নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব হইয়াও সন্নিহিত বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব হেতু সুখিত্ব ও দুঃখিত্ব সম্পর্কে 'আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী' ইত্যাদি রূপ অভিমান প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানময় কোষ বিকৃত হইলেই অর্থাৎ বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হইলেই অকর্ত্তা স্বরূপ আত্মাকে কর্ত্তারূপে, অবিজ্ঞাত স্বরূপ আত্মাকে বিজ্ঞানরূপে এবং মন্দত্বা জড়তাদি রহিত আত্মাকে মন্দতা ও জড়তাদি যুক্তের ন্যায় আবরণ করে।

(৬) আনন্দময় কোষ বা কারণ শরীর।

ভৌতিক শক্তি, জীবনী-শক্তি, চেতনা-শক্তি, ধীশক্তি ও আনন্দ শক্তি এই পাঁচের একাধার মানবিক আনন্দময় বা হিরণ্ময় কোষ। কর্ত্তৃ পদ-বাচ্য বিজ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে ভোক্তৃ পদবাচ্য আনন্দময়কোষ রহিয়াছে। পুণ্য কর্ম্ম ফলভোগ কালে প্রীতি, আনন্দ ও উল্লাসরূপ চিদানন্দ প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট এবং ভোগ সমাপ্তিতে প্রকৃতিতে যে আন্তরিক বুদ্ধি লীন হয়, বৃত্তি তাহাকে আনন্দময় কোষ বলে। ইহাই আত্মার কারণ শরীর। এই আনন্দময় কোষ বিকার প্রাপ্ত হইলে, অভোক্তা স্বরূপ আত্মাকে ভোক্তার ন্যায় ও অপরিমিত সুখস্বরূপ আত্মাকে পরিমিত সুখ যুক্তের ন্যায় আবরণ করে।

সূক্ষ্ম শরীরের গুণ। স্থূল শরীর যেমন ছেদ্য, ভেদ্য, দাহ্য, ক্লেদ্য গুণ বিশিষ্ট, সূক্ষ্ম শরীরটী সেরূপ নহে, যথা—নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥১০॥

বেদান্ত—৪ তঃ—২ পা॥

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণঞ্চ যো জীবঃ পুরুষঃ কৃতঃ।
বিভর্ত্তি সূক্ষ্ম দেহন্ত তদ্রূপং ভোগহেতবে ॥
সদেহো নভবেত্তস্ম জ্বলদগ্নৌ যমালয়ে।
জলেন নষ্টোদেহী বা প্রহারে সুচিরে কৃতে ॥

যেমন পাচকগণ রাজার নিমিত্ত পাক গৃহে সঞ্চরণ করে, তেমনি লিঙ্গ-

শরীর পুরুষের আত্মার নিমিত্ত ইহ-পরলোক ভ্রমণ করে। এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে যায়।

সূক্ষ্মা মাতা পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধাবিশেষাঃ স্যুঃ সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতা পিতৃজানিবর্ত্তন্তে ॥ ৩৯ সাংখ্যকারিকা ॥

বিশেষ তত্ত্ব তিন প্রকার, যথা—সূক্ষ্ম শরীর, শুক্র শোণিত প্রভব স্থূল শরীর-ও মহাভূত। সূক্ষ্ম শরীরও মাতৃ পিতৃজাত ষাট্‌ কৌষিক শরীর, এই দু'য়ের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর নিয়ত অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী। মাতৃপিতৃজাত শরীর নশ্বর। সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হয় না, স্থূল শরীরটাই নষ্ট হয়, মাটী হয়, ভস্ম হয় অথবা জীবের ভক্ষ্য হইয়া বিষ্ঠায় পরিণত হয়।

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্‌ সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধি-বাসিতং লিঙ্গম্‌ ॥ ঐ

সৃষ্টিকালে প্রধান হইতে প্রত্যেক আত্মার এক এক সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই শরীর অব্যাহত, কুত্রাপি তাহার প্রতিরোধ হয় না; এমন কি তাহা শিলা মধ্যেও প্রবিষ্ট হইতে পারে। তাহা নিয়ত অর্থাৎ আদি সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত থাকে, বিধ্বস্ত হয় না। তাহার স্বরূপ সংযুক্ত মহৎ অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা পঞ্চক। এই শরীরই সংসরণ করে অর্থাৎ এক শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অন্য স্থূল শরীর গ্রহণ করে। সূক্ষ্ম শরীর নিরুপভোগ অর্থাৎ স্থূল শরীর ব্যতীত সে শরীর স্বতন্ত্ররূপে সুখ দুঃখাদি ভোগ জন্মায় না। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, ও ভাব পদ বাচ্য এই সকলের সংস্কার এই শরীরের বিদ্যমানতায় সেই শরীরে সংলগ্ন হয়। প্রলয়কালে থাকে না, লয় হইয়া যায়; সেই কারণে তাহা লিঙ্গ শরীর।

চিত্রং যথাশ্রয় মৃতেস্থাণ্বাদিভাবিনা যথাচ্ছায়া তদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্‌ ॥ ৪১ ॥ ঐ ॥

চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতীত থাকে না, ছায়া যেমন বৃক্ষাদি ব্যতীত অবস্থান করে না, তেমনি বুদ্ধাদিও সূক্ষ্ম শরীর ব্যতীত নিরাশ্রয়ে থাকে না।

পুরুষার্থ হেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিক প্রসঙ্গেণ।
প্রকৃতের্বিভুত্ব যোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্‌ ॥ ৪২ ॥ ঐ ॥

এই লিঙ্গ শরীর (বুদ্ধাদিময় সূক্ষ্ম দেহ) পুরুষের অর্থের অর্থাৎ ভোগাপবর্গের উদ্দেশে প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। অধিকন্তু ইহা প্রকৃতিরই

আশ্রিত এবং অন্তর্ব্বাহ্যভেদে দ্বিবিধ করণাশ্রিত, ভাব অর্থাৎ ধর্ম্মাদি নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গে নটের ন্যায় অবস্থিত। নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম; নৈমিত্তিক স্থূল শরীর গ্রহণ। নটী যেমন নানা সাজে সাজে, তেমনি এই সূক্ষ্ম শরীরও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির প্রেরণায় দেব মনুষ্যাদি শরীর ধারণ করে অর্থাৎ সেই সেই যোনিতে গিয়া জন্মে। 'প্রধান' বিশ্বরূপ, তাহার পরিণামও অদ্ভুত; সেই কারণে সেই সেই শরীর হওয়া অসম্ভব হয় না।

এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শ বিস্তৃত।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে॥
অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি ॥ ভাগ-৪-২৯অঃ॥

পঞ্চ তন্মাত্রের পঞ্চধাগত পঞ্চ প্রকারে অভিব্যক্ত পঞ্চ প্রকারে স্পন্দিত প্রাণাদি পঞ্চ পদার্থের সমষ্টিকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ বলে। ত্রিগুণ বিশিষ্ট এবং ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত এই লিঙ্গ দেহ চেতনার সহিত সংযুক্ত হইয়া জীব নামে কথিত হইয়া থাকে। পুরুষ এই লিঙ্গ দেহ দ্বারা দেব-তির্য্যকাদি নানা দেহ ধারণ ও পরিত্যাগ করে।

শয়ানমিদমুৎসৃজ্যশ্বসন্তং পুরুষো যথা।
কর্ম্মাত্মনাহিতং ভুঙ্‌ক্তে তাদৃশেনেতরেণ বা॥ ভাগ-৪স্ক-২৯অঃ॥

যেমন মনুষ্য জীবদ্দশায় নিদ্রাগত এই দেহকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বপ্নাবস্থায় মনোধর্ম্মে কর্ম্মের সেবা করে, সেইরূপ ঐ সূক্ষ্ম শরীর পরলোকে গিয়াও ঐহিক কর্ম্ম জন্য দেহ অথবা পশ্বাদির দেহদ্বারা কর্ম্মভোগ করে।

সূক্ষ্ম দেহের আকৃতি। সূক্ষ্ম শরীরের পরিমাণ কত? স্থূল শরীরের ন্যায় কি?—না। স্থূল শরীর যেমন প্রত্যেকের হস্তের সার্দ্ধ তিন হস্ত প্রমাণ; সূক্ষ্ম শরীরও তেমনি আঙ্গুলের অঙ্গুষ্ঠ প্রমান।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমান সূক্ষ্ম দেহের উপরি জীবের ভোগ দেহ উৎপন্ন হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র রবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতোষঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোহপ্যবরোহপিদৃষ্টঃ॥
নশস্ত্রেচ ন চাস্ত্রেচ ন তীক্ষ্ণ কণ্টকে তথা।
তপ্ত দ্রব্যে তপ্ত লৌহে তপ্ত পাষাণ এবচ॥
প্রতপ্ত প্রতিমা শ্লেষেহপ্যতুর্দ্ধ পতনেহপিচ।
নচ দগ্ধোনভগ্নশ্চ ভুঙ্‌ক্তে সন্তাপমেবচ॥ ব্রহ্মবৈ॥

যমরাজ সাবিত্রীকে বলিতেছেন,—এই স্থূল দেহ অগ্নি দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ যে সূক্ষ্ম দেহ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ভোগ দেহ জন্মে, তাহা অগ্নি দ্বারা ভস্ম হয় না, জলে ক্লিষ্ট হয় না, প্রহারে, অস্ত্রে, শস্ত্রে, তীক্ষ্ণ কণ্টকাদিতেও ভেদ হয় না; তপ্ত দ্রব্যে, তপ্ত লৌহে, তপ্ত পাষাণে, যমালয়ে প্রতপ্ত মূর্ত্তি আলিঙ্গনে, উর্দ্ধ হইতে পতনে নষ্ট বা ভগ্ন হয় না; কিন্তু সন্তাপ ভোগ করে।

সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম।

তদেতৎ ষোড়শকলং লিঙ্গং শক্তিত্রয়ং মহৎ।
ধত্তেহনুসংসৃতিং পুংসিহর্ষশোকভয়র্ত্তিদা॥ ভাগ-৬স্ক-১ অঃ।

ষোড়শ কলা বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য তিন শক্তি। ইহারা ঐ জীবের কেবল সেই মতি জন্মাইয়া দেয়, যাহাতে হর্ষ, শোক, ভয় এবং পীড়া এতাবন্মাত্র উপস্থিত করিয়া থাকে। ইহারা উহার ধর্ম্ম।

অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি।
হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখঞ্চানেন বিন্দতি॥ গারুড়ে।

হর্ষ, শোক, ভয়, মোহ, সুখ, দুঃখ ইহা সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম। জীব এই সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন হইয়া ঐ সব ধর্ম্ম ভোগ করে এবং দেহ হইতে দেহান্তরে গমনাগমন করে।

সূক্ষ্ম শরীরের সহিত যে যে পদার্থ গমন করে।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ মনশ্চৈব পঞ্চভূতানি যানিচ।
ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চৈব যাশ্চান্যাঃ পঞ্চ দেবতা॥
তাশ্চৈব মনসঃ সর্ব্বে নিত্যমেবাভিমানতঃ।
জীবেন সহগচ্ছন্তি যাবত্তত্ত্বং নবিন্দতি॥ উত্তর গীতা॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, মন, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়াভিমানী দিগ্‌বাতাদি পঞ্চ দেবতা অর্থাৎ দিক, বায়ু, অর্ক, বরুণ, অশ্বিনীকুমার ইহা অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা নিত্যাভিমান বশতঃ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ অর্থাৎ অপরোক্ষানুভব লাভ না করে, তাবৎ কাল ইহারা জীবোপাধি লিঙ্গ শরীরের সহিত গমন করে।

সূক্ষ্ম শরীর দৃষ্ট কি অদৃষ্ট। সূক্ষ্ম শরীর দৃশ্য কি অদৃশ্য? দৃশ্যও বটে, অদৃশ্যও বটে। স্থূল দর্শীর অদৃশ্য, সূক্ষ্ম দর্শীর দৃশ্য। যথা :—

চ্যবন্তংজায়মানং বা প্রবিশন্তঞ্চ যোনিষু।

প্রপশ্যন্তি চতং সিদ্ধা-দেবা দিব্যেন চক্ষুষা॥ অগ্নি পুঃ—৩৭২ অঃ।

দেহ হইতে প্রচ্যুত অথবা যোনি প্রবেশনশীল বা জায়মান জীবাত্মাকে সিদ্ধগণ দিব্য চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তন্মাত্র অর্থাৎ পরমাণু দর্শন শক্তি বিশিষ্ট যে চক্ষু, সেই চক্ষুই উহা দেখিতে পায়।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপিভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ॥ গীতা॥

সূক্ষ্ম শরীর কখন দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, কখন দেহে অবস্থান করিয়াই সুখ দুঃখাদি গুণ উপভোগ করে; কিন্তু অজ্ঞগণ ইহাকে দেখিতে পায় না, জ্ঞান-চক্ষু সম্পন্ন ব্যক্তিগণই দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

সূক্ষ্ম দেহই ক্ষেত্র। যাহাতে বীজ বপন করিয়া শস্য উৎপন্ন করা হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র। সূক্ষ্ম শরীর একটী ক্ষেত্র। ইহাতে ইচ্ছা দ্বেষাদি কামনারূপ বীজ রোপণ করিয়া সুখ দুঃখ শস্য উৎপন্ন করা হয়। যথা গীতায়—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সহিত. অষ্টধা প্রকৃতি দশ ইন্দ্রিয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; কার্য্য স্বরূপ ইত্যাদি ভোগ স্বরূপ সুখ দুঃখাদি উৎপন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত চিত্তের সহিত সম্মিলন হইলেই সূক্ষ্ম ক্ষেত্র গঠিত হয়। ইহাই সূক্ষ্ম শরীর। তদুপরি স্থূল ক্ষেত্র গঠিত হয়।

ক্ষেত্রজ্ঞ। ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্ যোবেত্তিতং প্রাহুঃক্ষেত্রজ্ঞমিতিতদ্বিদঃ॥ গীতা॥

অপিচ স্মৃতি—ক্ষেত্রাণিহিশরীরাণি বীজমচাপি শুভাশুভে।

তানি বেত্তি সযোগাত্মাততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে॥

ভোগায়তন ত্রিবিধ শরীরই ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং যিনি এতন্মধ্যস্থ হইয়া ইহাকে 'আমার আমি' ইত্যাদিরূপে অনুভব করেন এবং তৎ সমস্তের তত্ত্ব অবগত আছেন,—তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া থাকেন। ক্ষেত্র যেমন বীজ বপনের স্থান, এই শরীরও কামাদি বীজ বপনের স্থান। এইজন্য

ইহার নাম ক্ষেত্র। প্রকৃতি ত্রিগুণা এবং সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদন সমর্থরূপে পরিণতা। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ উভয় সাধনই কর্ত্তব্য; এই উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত প্রকৃতি দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির সম্মিলন হয়। এই ভোগায়তন শরীর সংসাররূপ উৎপত্তি স্থান স্বরূপ। কৃষিজীবিগণ যেরূপ স্ব স্ব ভূমির ফলভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবও এই শরীর রূপ ক্ষেত্রজাত ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এই ইন্দ্রিয় প্রাণ সহকৃত শরীর ভোগ কর্ত্তা জীবের ভোগ্য সুখ দুঃখের অঙ্কুরোৎপাদক ভূমি স্বরূপ। এইজন্য ইহার নাম ক্ষেত্র; অবিদ্যাদ্বারা আত্মার ক্ষয় সাধন করে এবং বিদ্যাদ্বারা ত্রাণ সাধন করে, এই জন্য এই শরীরের নাম ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র কর্ম্মবীজের অঙ্কুরোৎপত্তির ভূমি। যিনি ভাসকরূপে ইহার যথার্থ ভাব প্রকটিত করিয়া ইহাকে উদ্ভাসিত করে, সেই চিদাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। এই শরীর অহঙ্কারাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিরই পরিণাম। ইহা জড়রূপ এবং পরিচ্ছিন্ন স্বভাব, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রের উপদান সমূহের আলোচনা করিলে, স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা জড় দ্বারা গঠিত এবং জড় পদার্থের সন্মিলন মাত্র, আর দেশ কাল পাত্র প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহার শক্তি ও যোগ্যতা সীমাবদ্ধ এবং ইহা নিত্য বিকারশীল ও পরিণামী। এই জন্য ইহাকে সবিকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই ক্ষেত্ররূপ দেহকে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষিজীবিগণের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ ইহা শুভাশুভ ফলপ্রসূ এবং পরিণামের মঙ্গলামঙ্গল বিধায়ক। ক্ষেত্রে যেরূপ কালে সতেজ সার প্রয়োগ করিলে ও নিয়মিত সময়ে অক্লান্তভাবে কর্ষণাদি রীতিমত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, যথাকালে তাহাতে উপ্ত বীজ সমূহ অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই শরীর ক্ষেত্রে অবস্থান কালে রীতিমত সৎসঙ্গ, সদুপদেশ ও সাধনাদি অনুষ্ঠিত হইলে, যথাকালে নিঃশ্রেয়স-রূপ পরম ফলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যেমন ক্ষেত্রের সহিত কৃষকের বারংবার ফলপ্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধ নাই, শরীরের সহিতও শরীরস্থ আত্মার তদ্রূপ ফল প্রাপ্তিমাত্র সম্বন্ধ। এই ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদ্‌গত হইলে আত্মস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের অবরোধ অবশ্যম্ভাবী। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অনায়াসেই উপলব্ধি করেন যে, ক্ষেত্রের সহিত তাহার কোন স্থায়ী সম্বন্ধ নাই; তিনি ক্ষেত্র মধ্য হইলেও ক্ষেত্রাতীত, ক্ষেত্র বদ্ধ হইলেও ক্ষেত্র নির্ম্মুক্ত এবং ক্ষেত্ররূপ হইলেও ক্ষেত্র-ধর্ম্ম-বিরহিত। সে আরও দেখিতে পায় যে, একই সম্রাটের অধীন বহু প্রজা, বহু ক্ষেত্র লইয়া চাস করে, তদ্রূপ

জীবের ভোগ-মোক্ষ-সাধনের ভূমি স্বরূপ স্ব স্ব ক্ষেত্রের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া প্রজার ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আর সেই একই সর্ব্বেশ্বর তত্তাবৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব সকলের নিয়ামক ও ভর্ত্তারূপে রাজার ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। এইরূপ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব সামান্য ভাবেও হৃদয়ে উপজাত হইলে, স্বতঃই পরমার্থ ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বলবতী বাসনা জন্মে। তখন সেই নিত্য স্বরূপ অদ্বিতীয় স্বরূপ, পূর্ণানন্দস্বরূপ পরম ক্ষেত্রজ্ঞের পরমতত্ত্ব হৃদয়ান্ধকার বিনষ্ট করিয়া সাধককে পরম কল্যাণের পথে লইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

———

অর্থ]

দুর্গারাণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কোজাগর লক্ষ্মীপূজার পর শ্যামা পূজা হইল। শ্যামাপূজার পর জগদ্ধাত্রী পূজা। জগদ্ধাত্রী পূজা হইতে আর সাত আট দিন বাকী আছে, এমন সময় কৃষ্ণপুর হইতে সংবাদ আসিল যে হরনাথের ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। কৈলাস-পুরে কালীপূজা করাইয়া বাড়ী গিয়াই তিনি জ্বরাক্রান্ত হইয়াছেন। এই জ্বরটি বড় সহজ নহে; তাহা সহসা বিকারে দাঁড়াইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া ঘোষালদের বাটীর সকলেই অতশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। বৃদ্ধ ঘোষাল মহাশয়ের পুত্র কালী প্রসাদ তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণপুরে গমন করিলেন।

হরনাথের কঠিন পীড়ার সংবাদ শুনিয়া অবধি দুর্গারাণী জীবন্মৃতা হইল। সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সে এখন আর শৈলজার সহিত একত্র মন্দাকিনী-ধারায় স্নান করিতে যায় না। যখন সকলের স্নান হইয়া যায়, তখন সে একাকিনী মন্দাকিনীতে স্নান করিতে যায় এবং সেখানে এক বিল্ববৃক্ষ মূলে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করে; পরে স্নান করিয়া শিব পূজায় নিযুক্ত হয়। এরূপ প্রগাঢ় ভক্তির সহিত সে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শিব পূজা করে নাই। দুর্গারাণী একদিন স্নান করিতে আসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব করিল। ভবানী তাহার খোঁজ করিতে আরম্ভ করিলে, শৈলজা বলিল "তুমি ব'স;

আমি তাকে খুঁজে আন্‌ছি।" শৈল দুর্গারাণীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, যে দিন হইতে হরনাথের পীড়ার সংবাদ আসয়াছিল, সেইদিন হইতে সে তাহার এবং অন্য সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যেন একাকিনী থাকিতেছিল। শৈল মন্দিরে মন্দিরে দুর্গারাণীকে খুঁজিল; কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মন্দাকিনী তটে উপস্থিত হইল। সেখানে সে সবিস্ময়ে দেখিল, বিল্ব-বৃক্ষের মূলে শিবলিঙ্গের সম্মুখে দুর্গারাণী কৃতাঞ্জলি ও গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া ধ্যানে নিমগ্না রহিয়াছে! তাহার সেই ধ্যানমগ্না পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া শৈলজার দেহ রোমাঞ্চিত এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল, তাহার কপালের উপর নিপতিত চূর্ণ কুন্তলগুলি লইয়া মধ্যাহ্ন সমীর ক্রীড়া করিতেছিল; বৃক্ষের ছায়া অপসারিত হওয়ায় তাহার মুখমণ্ডলে সূর্য্য কিরণ পড়িতেছিল; কিন্তু তথাপি তাহার ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। দুর্গারাণীর ধ্যানভঙ্গ করিতে শৈলজাও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী প্রবল বাতাস উঠিয়া বিল্ববনের শাখা সমূহ আন্দোলিত করিতে লাগিল এবং কতক গুলি পত্র বৃন্তচ্যুত করিল। সহসা একটী বিল্বপত্র জোরে দুর্গারাণীর মুখমণ্ডলের উপর নিপতিত হওয়ায় তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল এবং সে চকিতার ন্যায় শিবকে প্রণাম করিয়া সেই বিল্বপত্রটি সযত্নে তাহার অঞ্চলে বাঁধিল। গাত্রোত্থান করিয়া সে শৈলকে দেখিতে পাইয়া লজ্জায় কিছু সঙ্কুচিত হইল। শৈল বলিল "রাণি, অনেক বেলা হইয়াছে; চল বাড়ী যাই।" দুর্গারাণী মন্দাকিনীর জলে অর্দ্ধ পূর্ণ ঘটীটি লইয়া তাহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বৌদিদি, কৃষ্ণপুরের কোনও সংবাদ পেয়েছ?" শৈল দুঃখিতকণ্ঠে বলিল "অল্পক্ষণ আগে একজন লোক এসে বলে গেল, ব্যায়ারাম শক্ত হ'য়েছে। সেই শুনে মা আর বাবা সেখানে গেছেন।" দুর্গারাণীর মুখ মণ্ডল ঈষৎ অন্ধকারময় হইল; কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল "বৌদিদি, উনি ভাল হইবেন। কিন্তু তোমাকে একটী কথা চুপি চুপি বল্‌ছি; তুমি এখনই একটী বিশ্বাসী লোক সেখানে পাঠাতে পার?" শৈল কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন বল দেখি? দুর্গারাণী বলিল, "বৌদিদি, আমি তোমায় বল্‌ছি; কিন্তু তুমি যেন আর কারেও ব'লো না। আমি শিবের ধ্যান কর্‌ছি, এমন সময় এক মহাপুরুষ তাঁর মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল—পরণে বাঘছাল, আর তাঁর গা থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছে; তিনি আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন,—দুর্গারাণী, ওঠ; এই বেল পাতাটি নাও; এইটি হরনাথের মাথায় ও মুখের উপর বুলিয়ে দিলে সে ভাল হবে; আর তোমার এই ঘটীর জল

তাকে একটু খাওয়াবে। এই বোলে তিনি পাতাটি আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বৌদি দেখ সেটী আমার আঁচলের খুঁটে আমি বেঁধেছি।” বলিতে বলিতে দুর্গারাণীর নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। রাণীর বাক্য শুনিতে শুনিতে শৈলজারও নয়নে অশ্রু দেখা দিল ও দেহ রোমাঞ্চিত হইল। সে অমনি গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিল,—“বাবা কৈলাসনাথ, তুমি এ যাত্রা আমার ঠাকুরপোকে রক্ষা কর! আমার পিসি মা বড় দুঃখিনী; বাবা, দুঃখিনীর মুখপানে চেয়ো!” শৈলজা ও দুর্গারাণী উভয়েই বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। রাণী একটু প্রকৃতিস্থা হইয়া বলিল ‘বৌদিদি, এগুলি কৃষ্ণপুরে এখনই পাঠাবার কি উপায় হ’বে?” শৈলজা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “চল দেখি, আমরা একবার পুরুত ঠাকুরের কাছে যাই?” এই বলিয়া উভয়ে কাত্যায়নীর মন্দিরাভিমুখে দ্রুতপদে গমন করিল।

মন্দিরে উপনীত হইয়া তাহারা দেখিল, পুরোহিত মহাশয় মন্দির হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইবার উপক্রম করিতেছেন। শৈল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তিনি হরনাথকে দেখিবার জন্য কৃষ্ণপুরে যাইতেছেন। দুর্গারাণীকে দেখিয়া তিনি সজল নয়নে বলিলেন “মা, তোর কোনও চিন্তা নাই। হরনাথ নিশ্চয় আরোগ্য লাভ কর্‌বেন। তা না হ’লে আমার ব্রাহ্মণত্ব মিথ্যা।” অতর্কিতে দুর্গারাণীর চক্ষে জল আসিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে যেন তখনই ভূমিষ্ঠ হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে ও তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করে। কিন্তু লজ্জানুরোধে সে তাহা করিতে না পারিলেও, মনে মনে ভক্তিভরে ব্রাহ্মণকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিল। শৈলজা প্রণাম করিল। শৈলজা বলিল, “ঠাকুর মশাই, আপনি কৃষ্ণপুরে যাচ্ছেন; ভালই হয়েছে। রাণী এই একটী বেলপাতা দিচ্ছে; এইটী আপনি আপনার চাদরের খুঁটে বেঁধে নিন্, আর এই জলের ঘটীটিও নিয়ে যান। আপনি এই বেলপাতাটি ঠাকুরপোর মাথায় ও মুখে বুলিয়ে দেবেন।” ব্রাহ্মণ দুর্গারাণীর দিকে একবার স্থির নয়নে চাহিয়া সজল নয়নে বলিলেন,—“বুঝলাম এতক্ষণে বেটীর লীলাখেলা! আমিও এখনই তন্দ্রাবেশে দেখ্‌লাম, কে যেন হরনাথকে দেখ্‌তে যাবার জন্য আমায় আদেশ কর্‌লেন। তারা, তারা—জগদম্বা—মা! তোর লীলাখেলা বুঝা ভার; তুই মা সত্য!” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দুর্গারাণীর হস্ত হইতে বিল্বপত্র ও জলের ঘটীটি লইয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণ যাইতে যাইতে মধ্যে মধ্যে উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন “তারা—তারা—জগদম্বা! তুই মা সত্য!”

নবম পরিচ্ছেদ।

শৈল ও দুর্গারাণী সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই পুরোহিত ঠাকুরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় কাত্যায়নার মন্দিরে বসিয়াছিল। পরিচারিকা আরতির যোগাড় করিয়া দিল। পুরোহিতের মুখে কৃষ্ণপুরের সংবাদ শুনিবার জন্য উভয়েই অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিল, এমন সময়ে তাহারা তাঁহার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইল। “তারা তারা—জগদম্বা! তুই মা সত্য!” পুরোহিতকে আসিতে দেখিয়াই তাহারা তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেল। বৃদ্ধ সজল নয়নে সহাস্য বদনে বলিল “মা, তোদের আর কোনও চিন্তা নাই; জগদম্বা হরনাথকে এ যাত্রা রক্ষা করেছেন। জ্বর ত্যাগ হয়ে তার চৈতন্য হয়েছে। মা দুর্গারাণি! তুই কে মা, তোকে যে আমি চিন্‌তে পার্‌লাম না? চারিদিকেই তো আমি আমার মাকে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু মা, তোর মতন মা যে আমি এর আগে কোথাও দেখি নাই! বৌমা তোমায় কি আর বল্‌ব, আমি কৃষ্ণপুরে গিয়ে দেখি হরনাথের অবস্থা বড় খারাপ; কবিরাজ তার নাড়ী ধরে বসে আছে। আমি গিয়ে বাবার মাথায় আর মুখের উপর সেই বেলপাতাটি বুলিয়ে দিলাম, আর মুখে মন্দাকিনীর একটু জল দিলাম। বাবার তখন কোনও হুঁস ছিল না; কিন্তু একটু পরে বল্‌লে দুর্গারাণি আর একটু জল দাও।’ আমি মুখে আর একটু জল দিয়ে বল্‌লাম ‘হরনাথ, দেখ দেখি আমি কে?’ হরনাথ চক্ষু মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, ‘মুখুর্য্যে মশাই, আপনি কখন এলেন? দুর্গারাণী কোথায়? সে আমার মুখে এখনই জল দিলে না?’ আমি বলিলাম ‘দুর্গারাণীই তোমার জন্য এই জল পাঠিয়ে দিয়েছে; আর একটু খাবে?’ হরনাথ বলিল ‘না, আমার চোখ ও কপালের উপর একটু জল বুলিয়ে দিন।’ পাঁচ ছয় দিন হরনাথ সংজ্ঞাহীন ছিল। আজই তার চেতনা হ’ল। সে এখন কালীপ্রসন্নকে, ঘোষাল মশাইকে, মাকে, মাসীকে—সকলকেই বেশ চিন্‌তে পেরেছে। কবিরাজ বল্‌লেন যে, সঙ্কট উত্তীর্ণ হ’য়ে গেছে, নাড়ী বেশ স্বাভাবিক হ’য়েছে, এখন আর কোনও ভয় নাই। পরশ্ব জগদ্ধাত্রী পূজা। দুর্গারাণীর বাবা যাদব বাঁড়ুয্যে জগদ্ধাত্রী পূজা দেখ্‌তে ও মেয়েদিকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য এখানে আস্‌ছিলেন। ঘোষাল মশাই কৃষ্ণপুরে হ’য়েছেন, আর হরনাথ অত্যন্ত পীড়িত হ’য়েছেন, এই কথা শুনে তিনিও সেইখানে আছেন। তিনি আমার সঙ্গেই আস্‌ছিলেন; কিন্তু ঘোষাল মশাই তাঁকে আটক কর্‌লেন। কাল সকালে তাঁর সঙ্গে এখানে আস্‌বেন।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ “তারা তারা—জগদম্বা! তুই মা সত্য”; এই কথা বলিতে বলিতে মন্দিরের

দিকে অগ্রসর হইলেন। শৈলজা দেখিল, দুর্গারাণী তাহার কাছে নাই; সে কখন যে সেখান হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। কাত্যায়নীর মন্দির হইতে নামিতে নামিতে শৈলজা দেখিল, দুর্গারাণী একটী নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছে ও অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছে।

শৈলজা ব্যথিতা হইয়া বলিল "রাণি, কাঁদ্‌ছ কেন? পুরুত ঠাকুরের মুখে শুনলে তো তিনি ভাল হয়েছেন, আর কোনও ভাবনা নাই; চল এখন বাড়ী যাই। বাবা কৈলাসনাথই আজ ঠাকুরপোকে বাঁচিয়েছেন। তোমার প্রাণ যেমন হরময় হয়েছে, তাঁরও তেমনই দুর্গাময় হয়েছে। এত ব্যারামের ঘোরেও তিনি তোমাকে ভুলেন নাই। শুন্‌লে তো মন্দাকিনীর একটু জল খেয়েই তিনি বলেছিলেন দুর্গারাণী, আর একটু জল দাও?" "বলিতে বলিতে শৈলজার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল।

দুর্গারাণী অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রু মোচন করিল, পরে বলিল "বৌদিদি, তুমি আমার মনের ভাব জান; তোমার কাছে আমি আর কি লুকোব! আমি তাঁকে যে কি চোখে দেখিছি, তা তোমায় বল্‌তে পারি না। তাঁর অসুখের কথা শুনে অবধি আমার মন তাঁর কাছেই পড়ে আছে। আজ আমি কয়দিন কোথায় যে গেছি, কি যে করেছি, কি যে খেয়েছি, আর কি যে বলেছি তা আমার মনে নাই। দেখ তাঁর সঙ্গে আমার এখনও বিয়ে হয় নাই, কখনও যে হবে তা আমি বল্‌তে পারি না। নাই হোক্ কিন্তু আমি চিরকাল তাঁরই। এই কয় দিন কেবলই আমার মনে হয়েছিল, আমি ছুটে তাঁর কাছে চলে যাই, আর তাঁর সেবা শুশ্রূষা করি। ওগো এখানে আমার কিছুই ভাল লাগে নাই। কিন্তু লজ্জায় আমি কিছু কর্‌তে পারি নাই। কারুর কাছে আমি মনের কথাও ফুটে বল্‌তে পারি নাই। বৌদিদি, তোমাকেও বলি নাই, পাছে তুমি কিছু মনে কর; তাই আমি একলা একলাই থাক্‌তুম আর কেবল বাবা কৈলাসনাথের কাছে কাঁদ্‌তুম। আজকাল কৈলাসনাথ আমার কান্না শুনছেন। বৌদিদি, তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। দুই দিন পরেই বাবার সঙ্গে বাড়ী যেতে হবে। এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। তোমার স্নেহ ভালবাসা আমি জীবনে কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না।" এই কথা বলিতে বলিতে দুর্গারাণী আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

শৈলজা বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি ও কি কথা বল্‌ছ দুর্গারাণি!"

দুর্গারাণী একটু বিকৃত হাসি হাসিয়া বলিল "বৌদিদি, আমি তোমাকে ঠিক্

কথাই বল্‌ছি। তুমি আমার বাবাকে তো জান? আমাকে বেচে যেখানে বেশী টাকা পাবেন, সেইখানেই আমার বিয়ে দেবেন। কিন্তু তোমায় আমি বলে রাখ্‌ছি, আমার বিয়ে তাঁকে আর দিতে হবে না। বিয়ের আগেই দুর্গারাণী ভবলীলা সাঙ্গ কর্‌বে।

শৈলজার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইল। সে বলিল, "অমন কথা বল্‌তে নাই রাণি! ঠাকুরপোর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। মামা বাবু কি এত অবুঝ? তিনি সব কথা শুন্‌লে বা জান্‌তে পারলে, কখনও অন্য জায়গায় তোমার বিয়ে দেবেন না।

রাণী বলিল, "তা দেখ্‌তে পাবে!

শৈলজা বলিল "আচ্ছা, অন্য জায়গায় তিনি কেমন তোমার বিয়ে দেন, তা দেখ্‌বো।"

দশম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে সমারোহের সহিত শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী পূজা সমাপ্ত হইয়া গেল। হরনাথ অসুস্থ থাকায় অন্য একজন তন্ত্রধারক আসিয়া দেবীর পূজা করাইলেন। পূজার পর দুর্গারাণীর পিতা তাহাকে ও ভবানীকে বাড়ী লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, কার্ত্তিক মাসের কয়টা দিন থাকিয়া অগ্রহায়ণ মাসে তাহারা বাড়ী যাইবে; কিন্তু যাদব তাহাতে আপত্তি করিতে লাগিলেন। অপত্তির কারণ বারম্বার জিজ্ঞাসা করায়, যাদব বলিলেন যে, অগ্রহায়ণ মাসে রাণীর বিবাহ হইবে; আগামী ত্রয়োদশী তিথিতে পাত্রপক্ষ কন্যা নিরীক্ষণ করিতে আসিবে। সুতরাং তিনি তাহাকে কিছুতেই কৈলাসপুরে রাখিয়া যাইতে পাবিবেন না।

ঘোষাল মহাশয় কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্র কোথাকার?"

যাদব বলিলেন, "পাত্র পুরুলিয়ার একজন উকীল।"

"পুরুলিয়ার কোন্ উকীল হে? নাম বল না, আমি ত' সকলকেই চিনি?"

"ত্রৈলোক্য মুখুয্যে।"

ঘোষাল মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ওঃ সেই সত্তর বছরের আফিংখোর খেঁথুরে উকীলটা। বেশ পাত্রটী বেছেছো তো?—যাদব সে কতগুলি টাকা তোমায় দেবে?"

যাদব একটু রুষ্ট হইয়া বলিল, "আপনার তো কেবল ঐ কথা! আমি কি মেয়ে বেচ্‌ছি, যে টাকা নেবো?

"তবে মেয়ে বেচাটা দোষের, তা তুমি স্বীকার কর?"

"তা করি বই কি?"

"কেন বল দেখি?"

"লোকে বলে মেয়ে বেচ্‌তে নাই, এইজন্য।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "লোকে যে বলে তার তো একটা কারণ আছে? কারণ হচ্ছে শাস্ত্র আর যুক্তি। শাস্ত্রে বলে মেয়ে বেচ্‌লে মহাপাপ হয়; সেই মেয়ের গর্ভে যে সন্তান হয়, তার দ্বারা পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডোদক ক্রিয়া হয় না; আর তাঁদের নরকে বাস হয়। এই কারণে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, সালঙ্কারা ও সবস্ত্রা কন্যাকে সৎ ও যোগ্যপাত্রে দান করবে। যুক্তিতেও বলে তুমি যেমন আপনাকে বেচে পরের গোলাম হ'তে ইচ্ছা কর না, মেয়েকেও বেচে পরের ক্রীতদাসী করতে পার না। তোমার মেয়ে পরের ক্রীতদাসী হবে, এটা কি তুমি ইচ্ছা কর? বিক্রীত কন্যা কখনও ধর্ম্মপত্নী হতে পারে না; সে তো একটী ক্রীতদাসী বাঁদী মাত্র, আর সেই কন্যার বিবাহটা বিবাহ নামের যোগ্যই নয়। তারপর যোগ্যপাত্রের কথা জিজ্ঞাসা করি; সত্তর বছরের বুড়ো মিন্‌সেকে কি তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র মনে কর? এমন পাত্রকে কন্যা বেচ্‌বার আগে কন্যাকে একটু আফিং খাইয়ে মেরে ফেলা ভাল। যে লোক আজ বাদে কাল মর্‌বে, তুমি বাপ হ'য়ে কোন প্রাণে তাকে কন্যা বেচ্‌বে?"

যাদব মস্তক হেঁট করিয়া নিরুত্তর রহিল।

ঘোষাল মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন, "দেখ, যাদব আমি তোমাকে গুটীকতক স্পষ্ট কথা বল্‌ছি—রাগ করতে হয় ক'রো। তুমি তোমাদের বংশের নাম ডুবিয়েছ। তোমাদের বংশে কখনও শুক্র বিক্রয় দোষ ছিল না। তোমার পিতৃপুরুষেরা বরাবরই কন্যা দান ক'রে গেছেন। কিন্তু তুমি তাঁদের বংশধর হ'য়ে দুইটি কন্যাকে বিক্রয় ক'রেছ, আর এইটীকেও বিক্রয় করতে উদ্যত হ'য়েছ। শুক্র বিক্রয় দোষের জন্য তোমার পরিচয় দিতে আমি লজ্জাবোধ করি এবং তোমার বাড়ীতে খাওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রেছি। এখনও বল্‌ছি সাবধান হও। তুমি যে পাপ করিয়াছ সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তার ফল তোমাকে ইহলোকে এবং পরলোকেও ভোগ করতে হবে। তুমি দুর্গারাণীকে বেচ্‌তে পাবে না। সে যেমন তোমার মেয়ে, তেমনই আমারও মেয়ে। আমি বেঁচে

থাকতে তুমি তাকে বেচ্‌তে পাবে না। তাকে আমি যোগ্য পাত্রে দান করব।

যাদব বলিলেন "মেয়ের বাপ মা বেচে থাকতে কি আপনি তাকে সম্প্রদান করতে পারেন?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "নিশ্চয়ই পারি। তোমরা যদি সম্প্রদান ক'রতে চাও, তা হ'লে তোমরা থাকতে অবশ্য আমি সম্প্রদান করিতে পারি না; আমার তায় অধিকার নাই। কিন্তু তোমরা যখন মেয়ে বিক্রয় করবে, তখন তাকে তো আর সম্প্রদান করছো না! এরূপ স্থলে আমি তোমার মেয়েকে যোগ্য পাত্রে নিশ্চয়ই সম্প্রদান ক'রতে পারি। আর তোমার মেয়ে যখন বয়ঃস্থা হ'য়েছে, তখন সে বাপ মা কিম্বা কারুর অপেক্ষা না ক'রে আপনাকে আপনিই সম্প্রদান ক'রতে পারে। যে কন্যা সাবালিকা হয়েছে, তার উপর কারুরই অধিকার নাই। সে আপনার মালিক আপনিই। তোমার সৌভাগ্য এই যে, তুমি এমন গুণবতী মেয়ে পেয়েছ। নতুবা তুমি পয়সার লোভে তাকে এত বড় করে রেখেছ—সে যে তোমার বংশে বা তোমার মুখে চূণ কালী দেয় নাই, এই যথেষ্ট। শোন, আমি তোমায় স্পষ্ট বল্‌ছি—কারুর সম্প্রদানের অপেক্ষা না করে, সে আপনিই আপনাকে যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান করেছে। পণ্ডিত হরনাথ তর্কবাচস্পতি তোমার জামাতা হবে। এই বিবাহে তোমার কিছু খরচ পত্র নাই। কন্যা ও জামাতাকে যা দিতে হয় তা আমি দেব। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখে আমি বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি। তার পূর্ব্বেই তুমি সপরিবারে এখানে আস্‌বে, তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ করলাম; এসে বিবাহ উৎসবে যোগ দান করবে। মেয়ে তার পূর্ব্বে তোমার বাড়ী যাবে না। ভবানীকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা কর, এখন নিয়ে যেতে পার; কিন্তু সেই সময়ে আবার নিয়ে আস্‌বে,—বুঝ্‌লে?"

যাদবচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের কথা শুনিয়া ক্রোধে ও বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে ক্রোধে বলিলেন, "বিবাহে মেয়ের স্বাধীন মত কি; আমি তার বাপ; আমি যার সঙ্গে তার বিয়ে দেব, সেই তার স্বামী হবে।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "মেয়ে যদি সেখানে বিয়ে ক'রতে না চায়; তুমি কেমন ক'রে তার বিয়ে দেবে?"

যাদবচন্দ্র একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি তো চমৎকার কথা বল্‌ছেন, দেখ্‌ছি? মেয়ে যদি একটা শূদ্রকে বিবাহ ক'রতে চায়, আমি সেই বিয়ের অনুমোদন কর্‌'ব না কি?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "দেখ যাদব, তুমি শান্ত হও, অত উত্তেজিত হ'য়ো না, হিন্দু সমাজে শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ হয় না ; তাহা অশুদ্ধ এবং বিবাহ বলেই গণ্য হয় না। কলিকালে হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু তোমরা যখন এত ডাগর আইবুড়ো ঘরে রাখ্‌তে পার, তখন শুধু অসবর্ণ বিবাহ কেন, আরও গুরুতর ব্যাপারের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। হিন্দুসমাজ তোমাদের এত অত্যাচারেও যে এখনও ছারখার হয় নাই, সে কেবল তোমাদের ধর্ম্মশীলা কন্যাদেরই জন্য। কন্যাদের যখন জ্ঞান থাকে না, তখন তোমরা সত্তর বছরের মিন্‌সে কেন—একটা গঙ্গাযাত্রার মড়ার সঙ্গেও অনায়াসে তাদের বিয়ে দিতে পার—আর অর্থের লোভে তা দিয়েও থাক। কিন্তু তাদের যখন জ্ঞান হয়, তখন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিরূপে কাজ ক'র্‌বে ?"

যাদব কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "যে মেয়ে বাপ মায়ের বশীভূত নয়—অবাধ্য, সে মেয়ে বেঁচে থাকাও যা, আর মরে যাওয়াও তা। আমি আপনার কথা শুনে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, মেয়ে হরনাথকে পছন্দ করেছে। আমি এটা আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলাম ; সেইজন্য তাকে কখনও আপনাদের এখানে আস্‌তে দিই নাই। মেয়ে যদি আপনার ইচ্ছানুসারেই কাজ কর্‌বে, তবে সে আপনার ইচ্ছা নিয়েই থাকুক্‌, আমার সঙ্গে তার আর সম্পর্ক কি ? আমি মনে কর্‌ব, আমার মেয়ে মরে গেছে। আমি ইহ জীবনে তার আর মুখ দেখ্‌তে চাই না। কিন্তু আপনি কিরূপে তার বিয়েটা দেন, তাও আমি একবার দেখ্‌ব।" এই বলিয়া ক্রুদ্ধ যাদবচন্দ্র সেখান হইতে সহসা উঠিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

একাদশপরিচ্ছেদ।

ঘোষাল মহাশয়ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, পাপিষ্ঠটা এখান থেকে সরে গেল, ভালই হল। তার মুখ দর্শন কর্‌লেও পাপ হয়। হরনাথের সঙ্গে দুর্গারাণীর বিবাহ আমি নিশ্চয়ই দেব। এই বিয়ে সে কেমন করে ঠেকায় তা দেখি।"

অন্তঃপুরে গিয়া তিনি দেখিলেন দুর্গারাণী ও ভবানী উভয়েই কাঁদিতেছে এবং তাঁহার পত্নী তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন। ঘোষাল মহাশয় একটী মোড়ার উপর বসিয়া উভয়কেই তাঁহার সমীপে আহ্বান করিলেন। তিনি ভবানীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভবানি, শুন্‌লে তোমার বাবার কথা ? তিনি

একটা সত্তর বছরের থুরথুরে ঘেঁকুরে বুড়োর সঙ্গে দুর্গারাণীর বিয়ে দেওয়া স্থির করেছেন ! মেয়ের সুখ দুঃখের দিকে তাঁর কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। তাঁর কতকগুলো টাকা হলেই হ'ল। কাল যে মেয়ে বিধবা হবে কিংবা পথের ভিখারিণী হবে, সে কথা তিনি একটী বারও ভেবে দেখ্‌ছেন না। বল্লে তোমাদের মনে কষ্ট হবে, কিন্তু না বলেও থাকৃতে পার্‌ছি না—তিনি তোমাদের জন্মদাতা পিতামাত্র, তা নইলে তিনি তোমাদের ঘোর শত্রু। তারিণীর কি দশা হয়েছে ? তোমার কি দশা হয়েছে ? আবার তিনি দুর্গারাণীকেও জলে ভাসিয়ে দিতে প্রস্তুত। এমন ভয়ঙ্কর লোক আমি কোথাও দেখি নাই। তিনি ব'লে গেলেন যে দুর্গরাণীর আর মুখ দেখ্‌বেন না। দুর্গারাণীর মুখ দেখে তিনি যদি তাকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দেন, তার চেয়ে যদি দুর্গারাণী চিরকাল সুখে থাকে আর তিনি তার মুখ দেখ্‌তে না চান, সে তো সহস্রগুণে ভাল। শোন ভবানি, আমি কি স্থির করেছি শোন। হরনাথের সঙ্গে দুর্গারণীর বিয়ে আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে আমার এই বাড়ীতেই হবে। তুমি এখন পলাশডাঙ্গায় যেও না, বিয়ের পর যাবে।"

ঘোষাল-গৃহিণী বলিলেন, যাদব রাগ ক'রে চলে গেল ; তাকে একটু বুঝিয়ে বল্‌লে না ?

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, ওগো তা কি আমি না বুঝিয়েছি। কিন্তু যে অবুঝ —যে মেয়ে বেচে বড় লোক হবার স্বপ্ন দেখ্‌ছে—তাকে বোঝাব কি করে ?"

ঘোষাল-গৃহিণী বলিলেন, "আমি যে রকম দেখ্‌ছি—তাতে সে তো রাণীর বিয়ের সময় আস্‌বে না। সে না আসে নাই আসুক, কিন্তু রাণীর মাকে সেই সময় নিয়ে আস্‌বে না ? বৌ বলে পাঠিয়েছে হরনাথের সঙ্গেই যাতে রাণীর বিয়ে হয়, তাই যেন করা হয়।"

ঘোষাল মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা তার জন্য চিন্তা নাই। আমি তাঁকে নিয়ে আস্‌ব।"

বিবাহের সময় মা আসিবেন, ইহা শুনিয়া ভবানী ও দুর্গারাণী উভয়েই প্রফুল্ল হইল।

যাদবচন্দ্র পলাশডাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া গৃহিণীর সহিত ভয়ানক কলহ আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমিই ষড়যন্ত্র করে ভবানীকে আর রাণীকে কৈলাস-পুরে পাঠিয়েছ। রাণীকে আমি সেখানে কিছুতেই পাঠাতে চাই নাই; কিন্তু তোমার জিদে পড়ে আমি তাকে সেখানে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলাম। কথায়

বলে, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। মেয়ে মানুষের কথা শুনে চল্লে শেষ পর্য্যন্ত এই রকম বিপদই উপস্থিত হয়। শুনেছ কি, এখন তোমার রাণী সাবিত্রীর মত স্বয়ম্বরা হচ্ছেন? তিনি হরনাথকে পছন্দ করেছেন, আর হরনাথ ভিন্ন আর কারেও বিয়ে কর্‌বেন না! এমন নির্লজ্জ মেয়ে ভূ-ভারতে আর জন্মে নাই। আর তুমি স্বয়ং রত্নগর্ভা, তা নইলে এমন মেয়ে গর্ভে ধারণ কর্‌বে কেন? মেয়ে শেষকালে এমন হয়ে দাঁড়াবে জান্‌তে পাল্লে সেই আঁতুড় ঘরেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেল্‌তাম। ঘোষাল মশাই তো আমাকে দশ জনের সাক্ষাতে যা তা বলে অপমান কর্‌লেন। তিনিই অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখে রাণীর বিয়ে দেবেন। দেখি কেমন করে তিনি তার বিয়ে দেন! আমি মেয়ের বাপ, মেয়ের উপর আমার কোনও অধিকার নাই; আর তিনিই হলেন সর্ব্বেসর্ব্বা! 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।' আমি কিন্তু তোমায় আগে থেকেই বলে রাখ্‌ছি, যদিই কোনও রকমে হরনাথের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়, তা হলে মেয়ে জামাইকে কখনও যেন আমার এই বাড়ীতে এনো না। আমি তাদের মুখ দেখ্‌তে চাই না।

রাণীর মা স্বামীর ভর্ৎসনা শুনিয়া অনেক কাঁদিলেন। কিন্তু হরনাথের সহিত রাণীর বিবাহ হইতেছে শুনিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন।

সেই দিবস বৈকালেই যাদবচন্দ্র পুরুলিয়া যাত্রা করিলেন, পরদিন পুরুলিয়াতে উপস্থিত হইয়া ঘোষাল মহাশয়ের নামে ফৌজদারীতে নালিশ করিয়া কোন ওয়ারেণ্ট বাহির করা যায় কি না, তৎ সম্বন্ধে উকীল মোক্তারদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলেই ঘোষাল মহাশয়কে এবং যাদবচন্দ্রকেও চিনিতেন, তাঁহারা প্রস্তাবিত নালিশের কারণ অবগত হইয়া একবাক্যে ছি ছি করিতে লাগিলেন। হরনাথের আভিজাত্য এবং পাণ্ডিত্যও সকলেই বিদিত ছিলেন। এই কারণে সকলেই যাদবচন্দ্রকে এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য সদুপদেশ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই যাদবচন্দ্র নিরস্ত হইবার নহেন। তিনি প্রসার প্রতিপত্তি হীন এক নব্য মোক্তারকে ধরিয়া একটী দরখাস্ত লেখাইলেন এবং পর দিন প্রথম কাছারীতে ডেপুটী কমিশনার সাহেবের এজলাসে তাহা দাখিল করাইলেন।

যাদব সাক্ষীর কাঠ্‌রায় দাঁড়াইয়া হলপ লইয়া এজাহার দিলেন। সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"ঘোষাল তোমার কে হয়?"

"হুজুর আমার ভগ্নীপতি।"

"তোমার কন্যার বয়স কত?"

হুজুর সতের আঠারো বছর।"

"হরনাথকে বিয়ে কর্‌তে তার মত আছে?"

"হুজুর তা আমি ঠিক্ বল্‌তে পারি না, তবে শুনেছি মেয়ের না কি মত আছে; আর হরনাথই মেয়ের মন ভুলিয়েছে। হুজুর আমি হরনাথকেও আসামী কর্‌তে চাই।"

"হরনাথ ব্রাহ্মণ ও তোমাদের স্বজাতি বটে কিনা?"

হুজুর হাঁ।"

"তাহার বয়স কত ও অবস্থা কি রকম?

হুজুর তাহার বয়স সাতাশ আঠাশ বৎসর হবে। আর তার অবস্থা খুব ভাল। তার অনেক ব্রহ্মোত্তর জমী আছে, বছরে দু'তিন হাজার টাকা আয় হবে।

তাহার সহিত তোমার কন্যার বিবাহে কোনও বাধা নাই তো?

হুজুর আছে বই কি! আমি সেখানে মেয়ের বিয়ে দিতে চাই না। আমি মেয়ের বাপ, আমি যেখানে বিয়ে দেব, সেইখানেই তাকে বিয়ে কর্‌তে হবে।

মেয়ের এতে মতামত কি?

সাহেব ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "মেয়ের মতামত অবশ্যই আছে ও লইতে হইবে। তুমি জোর করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার বিবাহ দিতে পার না। সে যদি হরনাথকে ভালবাসিয়া থাকে ও পছন্দ করিয়া থাকে, সে তাহাকেই বিবাহ করিবে। তুমি কোনও বাধা দিতে পার না। খবরদার! তুমি তাহাদের বিবাহে কোনও গোলযোগ করিও না, করিলে আমি তোমাকে নিশ্চয় ফাটক্ দিব। যাও—দরখাস্ত না মঞ্জুর।"

যাদবচন্দ্র যেন সহসা আকাশ হইতে পাতালে পড়িলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত এবং কণ্ঠ ও তালু বিশুষ্ক হইল। তাঁহার মোক্তার দরখাস্তের অনুকূলে দুই চারি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সাহেব তাঁহাকে ধমক্ দিবামাত্র তিনি নিরস্ত হইলেন। যাদবচন্দ্র তখন অনন্যোপায় হইয়া সাহেবকে করজোড়ে ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"দোহাই হুজুর! দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমার সুবিচার করুন! শিবনাথ ঘোষাল আমার মেয়েকে জোর ক'রে তাঁর ঘরে আটক্ করে রেখেছেন। দোহাই ধর্ম্মাবতার, সুবিচার করুন!"

সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া কনেষ্টবলের প্রতি আদেশ করিলেন,—"ইস্‌কো কাঠ্‌রাসে উতার দেও, আউর এজলাস সে নিকাল দেও।"

সাহেবের মুখ হইতে হুকুম বাহির হইবামাত্র যমদূতের ন্যায় দুইজন কনেষ্টবল যাদবচন্দ্রের হাত ধরিয়া হিঁচ্‌ড়াইয়া তাহাকে কাঠ্‌রা হইতে নামাইল এবং বলপূর্ব্বক দ্বার পর্য্যন্ত তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। পরে গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া সজোরে এক ধাক্কা দিয়া দ্বারের বাহির করিয়া দিল। সেই সময়ে প্রথম কাছারীতে দরখাস্তাদি পেশ করিবার জন্য উকীল মোক্তার ও তাঁহাদের মক্কেলগণ এজ্‌লাসের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন। যাদবের নির্ব্বাচিত ভাবী জামাতা বৃদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও কাছারীর কোনও লোকমুখে তাঁহার ভাবী পত্নীর সম্বন্ধে কি একটা গোলযোগ ও মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের সাহায্যার্থ ডেপুটি কমিশনারের এজলাসে ব্যস্ত সমস্ত হয়া প্রবেশ করিতেছিলেন; এমন সময়ে যাদবচন্দ্র কনেষ্টবলদ্বয়ের সজোর ধাক্কা খাইয়া দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহারই উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন। বৃদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথের অপটু পদদ্বয় সেই ধাক্কা সাম্‌লাইতে অসমর্থ হওয়ায়, তিনিও চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং যাদবচন্দ্রও বেগে তাঁহার উপর নিপতিত হইলেন। পতনের বেগে মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগায় এবং বক্ষের উপর যাদবচন্দ্রের দেহের চাপ পড়ায়. বৃদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথ সহসা তাঁহার দন্তহীন মুখটি ব্যাদান করিলেন ও চক্ষু দুটী কপালে তুলিয়া নিশ্চেষ্ট হইলেন! সকলে তাহা দেখিয়া "হাঁ হাঁ" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং কনেষ্টবলেরা গোলমাল থামাইবার জন্য দ্বারের দিকে ছুটিল। যাদবচন্দ্র কনেষ্টবল্‌দিগকে পুনর্ব্বার আসিতে দেখিয়া নিমেষমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও ত্রৈলোক্য নাথের বিকৃত মুখভঙ্গী দর্শনে ভয়ে বিহ্বল হইয়া সহসা সেই জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথ যেরূপ বেগে পড়িয়াছিলেন এবং পড়িয়াই যে ভাবে মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে যাদব মনে করিলেন, বুঝি বা সেই পতনেই তাঁহার ভবলীলার অবসান হইল। খুনের দায়ে ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি বাহিরে আসিয়াই তৎক্ষণাৎ কাছারীর সীমা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যেরূপ বেগে ও ভয়চকিত ভাবে গমন করিলেন, তাহাতে তিনি কাছারী যাত্রী অনেক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত না

করিয়া কেবল পশ্চাদ্ভাগেই চাহিতে চাহিতে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে তিনি সহসা একটী কনেষ্টবলের সম্মুখে পড়িলেন। এই কনেষ্টবলটি কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া কাছারী অভিমুখে আসিতেছিল। সে যাদবচন্দ্রকে ভীত ও চকিত বদনে এবং দ্রুতপদে গমন করিতে দেখিয়া কিছু সন্দিহান্ হইল; এবং তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া "এও, তুম্ কাহে ইস্‌তর্ সে ভাগা যাতা হ্যেয়।" কনেষ্টবলকে দেখিয়াই যাদবচন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। সে কোনওরূপে শব্দ যোজনা করিয়া বলিল, "না বাবা, আমি তো ভাগা যাতা নাই; আমার চলনই এই রকম।" এই বলিয়া আরও দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। কনেষ্টবল কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "যহ জরুর পাগ্‌লা হ্যেয়।" এই বলিয়া সে গন্তব্য পথে চলিল। কনেষ্টবলকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া যাদবের যেন প্রাণ আসিল। কিন্তু তাহার অবাধ্য পদদ্বয় কিছুতেই সংযত হইতে চাহিল না। দ্রুতগতি অল্পক্ষণ মধ্যেই ধাবনে পরিণত হইল এবং তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে সহরের মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

বাজারের মধ্যে তিনি গতি কিঞ্চিৎ মন্দীভূত করিলেও, সদর রাস্তায় চলা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না; এই কারণে একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সহরের বহির্ভাগে উপনীত হইলেন। এইস্থান হইতে ষ্টেশন প্রায় এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইবে। কিন্তু তিনি ষ্টেশনে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল, হয়ত কনেষ্টবলেরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য অগ্রেই ষ্টেশনে গিয়াছে। এই কারণে অগ্রবর্ত্তী ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীতে আরোহণ করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু গাড়ীতে চাপিয়া তিনি কোথায় যাইতেছেন? বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, সেখানেও কনেষ্টবলেরা তাঁহাকে ধরিবে! তিনি কমিশনার সাহেবের কাছে যে দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি নিজের নাম ধাম দিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! নানারূপ চিন্তা করিয়া তিনি গভীর রাত্রিতে বাড়ীতে উপস্থিত হওয়াই স্থির করিলেন।

চারিক্রোশ পথ হাঁটিয়া তিনি পরবর্ত্তী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার পর যে গাড়ী আসে, সেই গাড়ীতে চাপিয়া তিনি গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, এবং সেখান হইতে হাঁটিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। রাত্রি দুইটার সময় বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তিনি গৃহিণীকে বলিলেন,—"আমি এখনই ক'ল্‌কাতা যাব।

গোটা পনর টাকা বার করে দাও ; বিশেষ কাজ আছে। ফিরে আস্‌তে কতদিন বিলম্ব হ'বে, তা বল্‌তে পারি না।"

গৃহিণী তাঁহার ভীত ও বিশুষ্ক মুখমণ্ডল দেখিয়া বলিলেন, "কি এমন জরুরী কাজ পড়েছে যে এখনই ক'ল্‌কাতা যাবে ?"

যাদবচন্দ্র রুক্ষ স্বরে বলিলেন,—"তোমায় এত কৈফিয়ৎ দিতে পারি না। জরুরী কাজ না পড়্‌লে ক'লকাতায় যাচ্ছি কেন ? তুমি কিন্তু কারেও বলো না যে, আমি রাত্রিতে বাড়ী এসে আবার ক'লকাতায় গেছি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে ব'লো তিনি কোথায় গেছেন তা জানি না।"

স্বামীর কথা শুনিয়া গৃহিণীর মনে ভয় হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তুমি বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছ, কখন যে আস্‌বে তাও ব'ল্‌ছ না। আর কাল ত্রয়োদশীতে পুরুলিয়া থেকে কারা রাণীকে দেখ্‌তে আস্‌বে, ব'লেছিলে না ?"

যাদব বলিলেন, "আস্‌বার তো কথা ছিল। কিন্তু রাণী কি এখানে আছে যে তারা দেখ্‌তে আস্‌বে ? আমি পুরুলিয়ায় গিয়ে তাদের আস্‌তে মানা করেছি। তারা কেউ এখানে আস্‌বে না। কিন্তু অপর কেউ আস্‌তে পারে, যেমন—যেমন—এই আর কি—দারোগা, কনেষ্টবল—এই সব লোক। বুঝ্‌লে ? তারা এলে ব'লো, আমি কোথায় গেছি তা' তোমরা জান না।"

রাণীর মাতার ভয় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন তুমি কি ক'রেছ গো, যে দারোগা কনেষ্টবল আস্‌বে ? আমায় সব কথা খুলে বল না ? তোমার কথা শুনে যে আমার বড় ভয় হ'চ্ছে।'

যাদবচন্দ্র বলিলেন, "আমি কি করবো ? আমি তো কিছুই করি নাই।"

রাণীর মাতা বলিলেন,—"রাণীর পিশেমশাইকে ওয়ারীন্ দিয়ে ধরাবার জন্যে তুমি তো আজ সকালে সাহেবের কাছে দরখাস্ত ক'রেছিলে। তারপর সাহেব তো এজলাস থেকে তোমাকে বার করে দেন। তারপর তুমি তোমার সেই হবু বুড়ো জামাইয়ের ঘাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে যাও। তারপর তুমি সেখান থেকে পালিয়ে যাও। এই সব তো শুনেছি। এর পর তুমি আরও কিছু করেছ নাকি ?

যাদবচন্দ্র ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "তুমি এসব কথা শুন্‌লে কোথায় ? তা হ'লে পুলিশে ধরবার জন্য এখানে এসেছিল নাকি ? সেই বুড়া ত্রৈলোক্য মুখুয্যেটা তা হ'লে মারা পড়েছে নাকি ?"

রাণীর মাতা স্বামীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—"না গো না, সে মারা

পড়্‌বে কেন ? ভির্‌মি হয়ে তার মূর্চ্ছা হয়েছিল। তার মুখে মাথায় জল দিলে পর তার চেতনা হয়। তুমি মেয়ের জন্যে বেশ জামাইটি পছন্দ ক'রেছিলে যাহোক। তুমি পুরুলিয়া গেলে পর কৈলাসপুর থেকে কালীপ্রসাদ এসেছিল, সেও তোমার পিছু পিছু পুরুলিয়া গে'ছল। আজ বিকেল বেলায় ফিরে যাবার সময় আমায় সব কথা বলে গেল।"

গৃহিণীর কথা শুনিয়া যাদবচন্দ্রের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন আঃ বাঁচলাম বাবা ! মুখুয্যেটা তাহলে মরে নাই ! আমি মনে ক'রেছিলাম, বুঝি মরেছে ! সে যে রকম করে হা কর্‌লে, আর চোখ কপালে তুল্‌লে,—দেখেই তো আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গে'ছল।

রাণীর মাতা বলিলেন, "তোমার কথা শুনে হাসিও পায় কান্নাও আসে। বলি, তোমার মেয়ের জন্যে কি এমনই বর ঠিক করতে হয় ? তোমার কেবল টাকা আর টাকা। টাকা নিয়ে তুমি কি কর্‌বে ? তোমার ছেলে না পিলে ? কে তোমার টাকা ভোগ ক'র্‌বে ! তোমার যা কিছু থাক্‌বে তা সবই তো তোমার মেয়েরা পাবে—তবে বাছাদের এত কষ্ট দেবার কারণ কি !" এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাণীর মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈষৎ সংযত হইয়া বলিলেন,—আর শুনেছ তো, তুমি যে মাড়োয়ারীকে টাকা ধার দিয়েছিলে, সে দোকান পাট তুলে দিয়ে দেশে পালিয়ে গেছে !"

এই সংবাদ শুনিয়াই যাদবচন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "অঁ্যা কি ব'ল্‌ছ তুমি ! মাড়োয়ারী দোকান তুলে দিয়ে দেশে পালিয়ে গেছে ! কে তোমায় এ খবর দিলে !"

রাণীর মাতা বলিলেন, "ঐ যে, কে তোমায় পত্র লিখেছে, পড়ে দেখ।"

যাদবচন্দ্র পত্র পাঠ করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় কিয়ংক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন পরে কপালে ঘা মারিয়া বলিলেন, ভগবান এমন কঠোর সাজাও আমায় দিলে ! দুটো মেয়ে বেচে আর তাদের সর্ব্বনাশ করে যে আমি টাকা নিয়েছিলাম গো ! সেই টাকা আমার গেল ! ও বাপ্‌রে—এ যে আমার ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত সুরু হ'ল ! এ যে তুষানলের চেয়েও বেশী হ'ল। এ যে যত দিন বাঁচব, কেবল দগ্ধে দগ্ধে মর্‌বো ! উঃ কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা ! মলেও কি এই যন্ত্রণা যাবে ! ঘোষাল মশাই—ঘোষাল মশাই, তুমি সত্যই বলেছিলে আমার ইহকাল পরকাল দুই গেছে। নরকেও আর আমার স্থান হবে না ! উঃ আমি কি করেছি গো ! আমি যে আমার বংশে কলঙ্ক দিয়েছি—আমার বাপ পিতামহকে নরকে

ডুবিয়েছি! না আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌ব না—এ মুখ আর কারেও দেখাব না।" এই বলিয়া তিনি ভূতলে আছাড় খাইয়া পড়িলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় ভূমিতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। রাণীর মাতা স্বামীর দুর্দ্দশা দেখিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ ও দুর্গারাণীর শুভ বিবাহের পাঁচদিন পূর্ব্বে কালীপ্রসাদ তাঁহার মাতুল ও মাতুলাণীকে কৈলাসপুরে লইয়া যাইবার জন্য পলাশডাঙ্গায় আসিলেন। যাদবচন্দ্র কালীপ্রসাদকে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন কালীপ্রসাদ কৈলাসপুরে আমি আর এ মুখ দেখাতে যাইব না। তোমার বাবা আমাকে হিত কথাই বলেছিলেন; কিন্তু আমি তাঁকে যা তা বলেছিলাম। তারপরেও, তাঁর বিরুদ্ধে ডেপুটী কমিশনার সাহেবের কাছে আমি দরখাস্ত করেছিলাম। সুতরাং তুমি আমাকে কৈলাসপুরে যেতে বলে আর লজ্জা দিও না। আমি জীবনে যে কুকর্ম্ম করেছি, তার ফল এখন ভোগ কর্‌ছি এবং কতকাল যে কর্‌বো, তা ভগবানই জানেন। অর্থের লোভে আমি দুটো মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছি—আবার আর একটী মেয়েরও সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়েছিলাম। দুর্গারাণীই আমাকে সেই গুরুতর পাপের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। হরনাথ ও দুর্গারাণীর মঙ্গল হোক; তারা সুখে থাক; আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, ধনে পুত্রে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক্। বাবা কালীপ্রসাদ আমি যে কাজ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলাম, সে কি পিতার উপযুক্ত কাজ? আমি রাগের মাথায় সেদিন বলেছিলাম যে আমি রাণীর মুখ আর কখনও দেখ্‌বো না। কিন্তু এখন তাকেই আমার মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ হচ্চে। কুটুম্বদের সঙ্গে আমি আর কোন মুখে আলাপ কর্‌বো! আমাদের বংশে যা কেউ কখনও করেন নাই, আমি তাই করেছি। আমার ব্যবহারে ও কার্য্যে তোমাদের মাথা হেঁট হয়েছে। প্রাণ দিলেও যদি এই কলঙ্কের ক্ষালন হয়, তাও দিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু হায়, এ কলঙ্ক কি আর ঘুচবে! কালীপ্রসাদ আমি কুলাঙ্গার হ'য়ে জন্মেছিলাম। আমি পিতৃ-পিতামহের নাম লোপ করেছি ও তাঁদিকে নরকস্থ ক'রেছি; আমি এ মুখ আর কারেও দেখাবো না। তুমি তোমার মামীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, সেই কন্যা দান কর্‌বে। আমি তাকে যেতে ও কন্যা দান কর্‌তে অনুমতি দিয়েছি। আমার মত পাপী লোক কন্যা দান কর্‌লে কন্যার অমঙ্গল

হবে যে! এই পর্য্যন্ত বলিয়া যাদবচন্দ্র ভেউ ভেউ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসাদ অনেক বুঝাইলেও যাদবচন্দ্র কৈলাসপুরে যাইতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তিনি মামী ঠাকুরাণীকেই সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ঘোষাল মহাশয় পুত্রের মুখে যাদবচন্দ্রের অনুতাপের বিবরণ অবগত হইয়া দুঃখিত হইলেন না, বরং মনে মনে আনন্দিতই হইলেন।

ধার্য্য দিবসে যথা সময়ে দুর্গা মন্দিরের প্রাঙ্গনে হরনাথের সহিত দুর্গারাণীর শুভ বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হইয়া গেলে, বৃদ্ধ পুরোহিত ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে "তারা—তারা জগদম্বা, তুই মা সত্য!" এই কথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন। হরগৌরীর মিলনে যেরূপ দেবতারা আনন্দিত হইয়াছিলেন, আজ এই হর-দুর্গার মিলনেও কৈলাসপুরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। হরনাথের জননীও কৈলাসপুরে আসায় নব দম্পতী কিছুদিন কৈলাসপুরেই থাকিলেন; সুতরাং উভয়কে বৌদিদি ও ভবানীর সুমধুর হাস্য পরিহাসের মধ্যে উক্ত দিবসগুলি কৈলাসপুরে কাটাইতে হইল।

অষ্টমঙ্গলার পর যখন হরনাথ বধূ সহ কৃষ্ণপুরে যাইতে উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে একদিন দুর্গারাণী হরনাথকে বলিল, আমি কৈলাস-গিরির সমস্ত মন্দির দেখেছি, কেবল বিষ্ণু-গিরিতে বিষ্ণুমন্দির আর ব্রহ্ম-গিরিটী দেখি নাই। বিষ্ণু-গিরিতে উঠা বড় শক্ত বলে বৌদিদি সেখানে আমায় নিয়ে যায় নাই। একদিন আমাকে ঐ দুটী গিরি দেখাবে না!

হরনাথ বলিলেন, "বেশ তো' কাল বিষ্ণুমন্দিরে নবান্ন হবে; কাল বৌদিদিকে ও ভবানী দিদিকে সঙ্গে নিয়ে চল। আমি তোমাদের বিষ্ণুমন্দির দেখিয়ে আন্‌বো। ব্রহ্ম-গিরিতে উঠ্‌তে পার্‌বে না। আর সেখানে কোনও দেবতার পূজাও হয় না।"

প্রাতঃস্নান করিয়া শৈলজা ও দুর্গারাণী বিষ্ণুর মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ভবানী যাইতে চাহিল না, সে বলিল, "আমি সেখানে দুই একবার গেছি, , নাম্‌বার সময় পা বড় থর্ থর্ ক'রে কাঁপে; আমি যাব না।" কালীপ্রসাদ শৈলজাকে যাইতে দেখিয়া বলিলেন, "কি গো, তুমি এক্‌লাই বৈকুণ্ঠে যাবে না কি? আর আমি এখানে প'ড়ে থাক্‌ব? তা হ'বে না, আমরা দু'জনেই বৈকুণ্ঠে যাব।"

হরনাথ, কালীপ্রসাদ, শৈলজা ও দুর্গারাণী বিষ্ণু-গিরিতে আরোহণ করিতে

লাগিলেন। পর্ব্বতটি দুরারোহ হইলেও প্রস্তরময় সোপান পরম্পরা যোগে তাঁহাদের উঠিতে বিশেষ কোনও কষ্ট হইল না। বিষ্ণুমন্দিরে উপনীত হইয়া শৈলজা ও দুর্গারাণী অতীব বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। সেই স্থানের বায়ু স্নিগ্ধ ও পবিত্র এবং প্রাকৃতিক শোভাও চমৎকারিণী। মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড পুষ্পোদ্যান। তাহার চারিদিকে কত মনোহর বৃক্ষ। এইস্থানে উপস্থিত হইলে সত্য সত্যই সংসার ভুলিয়া যাইতে হয়। পৃথিবীর পাপ-কোলাহল এই উচ্চ শিখর পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে না।

মন্দিরের অভ্যন্তরে ভগবান্ নারায়ণের ও ভগবতী লক্ষ্মীর মনোহারিণী মূর্ত্তি। সিংহাসনের নিম্নভাগে গরুড় করজোড়ে বসিয়া আছেন। পার্শ্বে নারদ বীণাযন্ত্র লইয়া ভগবানের গুণগান করিতেছেন। নর-নারায়ণ বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের স্তব করিতেছেন। দেবতাদিগকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিয়া সকলে মন্দিরের দালানে উপবিষ্ট হইলেন।

সেই মন্দিরের পূর্ব্বভাগে কিয়দ্দূরে একটী পর্ব্বতের চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। সেই পর্ব্বতটি নিবিড় বনে সমাচ্ছন্ন এবং সেখানে যাইতে হইলে, একটী গভীর উপত্যকা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়। পর্ব্বতের চূড়ায় একটী ক্ষুদ্র প্রস্তরময় মন্দির আছে। পূর্ব্বদিকে তাহার দ্বার থাকায়, তাহা নয়নগোচর হইতেছিল না।

কালীপ্রসাদ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হরনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হর, এই মন্দিরগুলি মহারাজ বিক্রমাদিত্য নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন ব'লে প্রবাদ আছে, তা শুনে থাক্‌বে। তিনি বৎসরের মধ্যে কিছুদিন এখানে এসে বাস কর্‌তেন। তিনি এরূপ সিদ্ধ পুরুষ ও ভক্ত ছিলেন যে, তিনি এই গঙ্গাহীন দেশে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান কর্‌তে না পেয়ে দুঃখিত হওয়ায়, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ এই গিরি-শিখরে মন্দাকিনী, গঙ্গা ও ভোগবতীর সৃষ্টি করেন। এই মন্দিরের পিছনে কোথা হ'তে মন্দাকিনীর জল পর্ব্বতের গায়ে অনবরত ঝরে পড়্‌ছে! ঐ জল পতনের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছ না? বিষ্ণুর সিংহাসনের নিম্নেই না কি একটি গভীর গর্ত্ত আছে; সেই গর্ত্ত হ'তে অনবরত জল বেরুচ্ছে।"

হরনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"এই পর্ব্বতমালার অবস্থান, এই মন্দিরগুলি কল্পনা ও রচনা সমস্তই অদ্ভুত। আমি মাঝে মাঝে এখানে আসি, এইগুলি যতবার দেখি, ততবারই নূতন বলে মনে হয় আর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। এই মন্দিরগুলির রচনা ও বিন্যাসে একটী চমৎকার তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, তা বোধ

করি আপনি কখন ভেবেও দেখেন নাই। পূর্ব্বদিকে ঐ দেখুন ব্রহ্ম-গিরি; মধ্যে এই দেখুন বিষ্ণু-গিরি, আর পশ্চিমে ঐ দেখুন কৈলাস-গিরি। ভগবান্ সূর্য্য ত্রিগুণাত্মক এবং সগুণ ব্রহ্মের প্রকাশক ও নিদর্শন। একই সূর্য্য গুণভেদে ত্রিধা বিভক্ত হ'য়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে প্রতিভাত হ'য়ে থাকেন। প্রভাতে ইনি রজোরূপী ব্রহ্মা, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা। নিশারূপ প্রলয়ে জীবজগৎ মৃতবৎ নিদ্রিত থাকে। প্রভাতে-সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলে চেতনা লাভ ক'রে সঞ্জীবিত হয়। সুতরাং প্রভাত-সূর্য্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিদর্শন। এই কারণে পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিকে ঐ দেখুন ব্রহ্ম-গিরি ও ব্রহ্মার মন্দির। মধ্যাহ্নে সূর্য্যদেব সত্ত্বরূপী বিষ্ণু। অর্থাৎ সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ ব্যতিরেকে বৃক্ষ, লতা ও ঔষধি কিছুই বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও ফলবান্ হয় না; জল বাষ্পে পরিণত হইয়া মেঘের সঞ্চার করে না; এবং বায়ু প্রবল হইয়া মেঘ সমূহকে নানাস্থানে পরিচালিত করে না। সুতরাং মধ্যাহ্নের সূর্য্য পালনকর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণুর নিদর্শন। এই কারণে, পর্ব্বতমালার ঠিক্ মধ্যস্থলে এই বিষ্ণুগিরি ও বিষ্ণুর মন্দির। সায়াহ্নে সূর্য্যদেব তমোরূপী মহেশ্বর। অন্ধকার যেরূপ সৃষ্টির সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করে, সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেও সেইরূপ সৃষ্টি চিহ্ন বিলুপ্তপ্রায় হয়। জীব সকল নিদ্রারূপ মৃত্যুর ক্রোড়ে লীন হ'য়ে প্রলয়ান্তকালের অপেক্ষা করে। এই কারণে সায়াহ্ন সূর্য্য ভগবান্ মহেশ্বরের নিদর্শন এবং এই পর্ব্বতমালার পশ্চিমদিকে ঐ দেখুন কৈলাস-গিরি। একই বস্তু গুণভেদে ত্রিধা বিভক্ত হইলেও, তিনই এক এবং একই তিন। এই সূর্য্যদেব আবার প্রণবেরও নিদর্শন। ইনিই ওঙ্কার স্বরূপ এবং ইহা হইতেই গায়ত্রী বা সাবিত্রী মন্ত্রের উদ্ভব। অ, উ, ম এই তিন বর্ণের সংযোগে ওঙ্কারের উৎপত্তি। ওঙ্কার উচ্চারণ কর্‌লেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপসনা করা হয়। প্রণবের একটি অব্যক্তাংশ অর্থাৎ যা অব্যক্ত নাদে মিশে যায়, সেটি ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মের ধাম। তাহা অব্যক্ত, কাজেই তাহা স্থূল চক্ষুর অগোচর। কিন্তু এই স্থানে নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে থাক্‌লে, সেই অনাহত নাদও অনুভূত হয় এবং চিত্ত স্বতঃই যোগারূঢ় হয়। মন্দিরগুলির এই অপূর্ব্ব কল্পনা কোনও মহাপুরুষের দ্বারা যে হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

এই বলিয়া হরনাথ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিলেন। কাহারও মুখ হইতে একটিও বাক্য নিঃসৃত হইল না। সকলেরই হৃদয়ে যেন একটী দিব্য ভাবের খেলা হইতে লাগিল। সহসা হরনাথ আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার মনে হয়, এই পর্ব্বতটি গিরিরাজ হিমাচলেরই যেন একটী ক্ষীণ অনুবৃত্তি। পবিত্র

হিমাচল দেবভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। হিমাচলের পূর্ব্বভাগের যে অংশ ব্রহ্মপুত্র ন ও ব্রহ্মদেশের সন্নিহিত, তাহা যেন ব্রহ্মার স্থান। নেপালের নীচে গণ্ডকী উৎপত্তি স্থল হইতে বদ্‌রিনারায়ণের ধাম পর্য্যন্ত হিমাচলের যে অংশ, তাহা যে বিষ্ণুর ধাম। এই বদরিনারায়ণের নিকটে গঙ্গারও উৎপত্তি বটে। আ বদরিনারায়ণ হ'তে কৈলাসপর্ব্বত পর্য্যন্ত হিমাচলের যে অংশ, তাহা মহাদেবে ধাম। দেখুন, এই পর্ব্বতের উপরে বিভিন্ন দেবতাদের মন্দিরগুলিও যেন উ প্রণালী অনুসারেই নির্ম্মিত হ'য়েছে!"

হরনাথের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ, শৈলজা ও দুর্গারাণী মনে বিচিত্র ভাবের উদয় হইল। বিষ্ণুর পূজা শেষ হইলে, সকলে ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইলেন। পর্ব্বতের পাদমূলে উপনীত হইলে, তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা যেন স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সুখময় কৈলাসপুর ও বৌদিদিকে ত্যাগ করিয়া যাইতে কষ্ট হইলেও, পতিগৃহে যাইতে দুর্গারাণীর মনে অতিশয় আনন্দ হইল। কৃষ্ণপুরের বাটীতে উপনীত হইয়া দুর্গারাণী শ্বাশুড়ী মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া গৃহকর্ম্মের সুব্যবস্থা করিত। সে গৃহ, গৃহদ্বার, রোয়াক, উঠান প্রভৃতি পরিষ্কৃত করিত; শয্যা আসন প্রভৃতি পরিচ্ছন্ন রাখিত, তৈজসপাত্র প্রভৃতি মাজিয়া ঘসিয়া ঝরঝরে করিত। সে শ্বাশুড়ীমাতাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া রন্ধনশালায় নানাবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জন এবং সকলের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিত। হরনাথের পুস্তক ও পুঁথিগুলি সে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিত। অপরাহ্নে সে কিছু অবসর পাইলে শ্বাশুড়ীমাতাকে রামায়ণ, মহাভারত, কিম্বা কোনও পুরাণের বাঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া শুনাইত, অথবা প্রতিবাসিনী সমবয়স্ক মহিলাদের সহিত গল্প করিত। সে একটী কাকাতুয়া ও একটী পাহাড়ে ময়না পুষিয়া তাহাদিগকে নিত্য স্বহস্তে আহার্য্য প্রদান করিত এবং তাহাদিগকে মানুষের মত কথা কহিতে শিখাইত।

এইরূপে সুখে তাহাদের দিন অতিবাহিত হইতেছিল, এমন সময়ে ক্ষেতু মাহাতো একদিন কৃষ্ণপুরে আসিয়া সংবাদ দিল যে, দুর্গারাণীর পিতার অসুখ হইয়াছে এবং তিনি তাহাকে ও জামাতাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। পীড়া কঠিন

হে, ইহা ক্ষেতুর মুখে শুনিলেও দুর্গারাণীর মন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। হরনাথ দুর্গারাণীকে লইয়া যাইবার জন্য একটী গো-যান ভাড়া করিলেন; কিন্তু গো-যানে যাইতে হইলে, পলাশডাঙ্গায় পঁহুছিতে বহু বিলম্ব হইবে, ইহা ভাবিয়া দুর্গারাণী স্বামীর সহিত পদব্রজেই পার্ব্বত্য সরল পথ দিয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। হরনাথ তাহাতে অসম্মত হইলেন না। পিতার পথ্যের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্ষেতুর হস্তে দিয়া দুর্গারাণী পরদিন প্রত্যূষেই পতির সহিত পিত্রালয় অভিমুখে যাত্রা করিল। ক্ষেতু অগ্রে অগ্রে যাইতে গাগিল; দুর্গারাণী গ্রামের বহির্ভাগে হরনাথের সহিত গল্প সল্প করিতে পথ আলোকিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে হরনাথের পরিচিত দুই একজন কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহারা মস্তক নোয়াইয়া করজোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং তাঁহার পশ্চাতে বধূঠাকুরাণীকে দেখিয়া তাঁহাকেও প্রণাম করিল। পর্ব্বতের পাদমূলে যেস্থলে হরনাথ ও শ্রীনাথবাবুর সহিত দুর্গারাণীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থলে আসিবামাত্র দুর্গারাণীর মনে বিচিত্র ভাবের উদয় হইতে লাগিল। দুর্গারাণী সলজ্জ বদনে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "এইখানেই আমাদের প্রথম দেখা।" হরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "হঁা।" দুর্গারাণী মনে মনে ভাবিল, সেই একদিন,, আর আজ একদিন! পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তাঁহারা শস্যক্ষেত্রের মধ্যে উপনীত হইল। এখন ক্ষেত্রে আর একটীও শস্য ছিল না। সমস্ত মাঠ ধূ ধূ করিতেছিল। গল্প করিতে করিতে তাহারা কখন যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ফেলিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। পলাশডাঙ্গার প্রান্তরে উপনীত হইবামাত্র দুর্গারাণীর মনে কেমন একটী লজ্জা ও সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে হরনাথকে বলিল, "তুমি একটু এগিয়ে চল; আমি তোমার পেছু পেছু যাচ্ছি।" হরনাথ তাহাই করিলেন। গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটী পরিচিতা স্ত্রীলোককে দেখিয়া দুর্গারাণী তাহার পিতার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "তিনি ভাল আছেন।—পথ্য করেছেন।" শুনিয়া দুর্গারাণীর মন প্রফুল্ল হইল। গ্রামের ছোট ছোট বালক বালিকারা দুর্গারাণীকে দেখিয়া রাণী দিদি এসেছে, রাণী দিদি এসেছে বলিতে বলিতে আহ্লাদে তাহার কাছে ছুটিয়া আসিল। রাণী তাহাদিগকে মিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট করিতে লাগিল। বালক বালিকাদের আনন্দের কোলাহল শুনিয়া মহিলারা গৃহ কর্ম্ম ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি গৃহের বাহির হইতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতার ন্যায় রূপবান হরনাথকে দেখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া ঘোম্‌টার আড়াল হইতে হাস্যমুখে রাণীকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। কেহ

কেহ বলিলেন "আহা জামাই তো নয়, যেন সাক্ষাৎ শিব !" কেহ কেহ বলিলেন আহা কৈলাস থেকে যেন শিবদুর্গাই আস্‌ছেন ! এইরূপ কথা শুনিতে শুনিতে দুর্গারাণী গৃহের সন্নিহিত হইয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া একেবারে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। দুই একটী বালক বালিকা অগ্রেই ছুটিয়া গিয়া রাণীর মাতাকে তাহাদের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল। রাণীর জননী কন্যাকে দেখিয়াই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহার পিতা একটী লাঠির উপর ভর দিয়া উঠানে বাহির হইলেন। রাণী পিতার চিন্তাক্লিষ্ট মলিন ও শীর্ণ মুখখানি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইল। যাদবচন্দ্র মনের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া রাণীর চিবুক ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন মা দুর্গারাণি ! দেখি মা তোর মুখ খানি। তুই যে আমার সাক্ষাৎ দুর্গা রে ! আমি কি তোর বাপ হবার যোগ্য। আমার মত হতভগা লোক কি আর আছে। এই বলিয়া তিনি বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করিলেন। দুর্গারাণীও বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিল। ইত্যবসরে ক্ষেতু মাহাতো আসিয়া উপস্থিত হইলে, যাদবচন্দ্র ঈষৎ সংযত হইয়া ক্ষেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্ষেতু জামাই বাবু এসেছেন ! ক্ষেতুর মুখে জামাতার আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে লাঠির উপর ভর দিয়া তিনি তাঁহার সাদর অভ্যর্থনার জন্য বহির্ব্বাটিতে গেলেন।

খোকা বহুদিন পরে মাসীমাকে দেখিয়া আহ্লাদে তাহার ক্রোড়ে উঠিল। সে অভিমান ভরে বলিল, "মাসীমা তুমি ভারি দুষ্টু; তুমি সেখান থেকে পাল্কী চড়ে চলে গেলে। কই আমাকে তো নিয়ে গেলে না ? আমি তোমার জন্য কত কাঁদ্‌লুম।"

মাসী-মা হাসিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন,—"সোণা ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, এবার তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব ? তুমি আমার কাছে থাক্‌তে পার্‌বে তো ?"

খোকা বলিল পার্‌বো।"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ। ১৩২১। মাঘ ও ফাল্গুন

যমুনা-বিহার।

(১)

গোলোকে যাঁহার নিত্য বিহার বিরজা নদীর পার।
পরম করুণ অবতীর্ণ হৈয়া প্রচারিলা সুধাসার ॥
ঐশ্বর্য্য-বিহীন মধুর সে রস জানাতে জগত জনে।
দুই দেহ ধরি রাধা-শ্যামরূপে প্রকট এ ব্রজ ভূমে ॥
বাজাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি।
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিহরে আজি ॥

(২)

সখীগণ করে চামর ব্যজন পবন মন্দে বয়।
নিরূপম রূপ হেরিলে নয়নে জনম সফল হয় ॥
বিনোদ বিলাসে বিনোদ দোলনে প্রেমে ঢল ঢল সাজ।
দুই দেহ ধরি রাধা-শ্যামরূপে প্রকট ব্রজেতে আজ ॥
বাজাও শঙ্খ, দাও জয় ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি।
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধা-প্যারী যমুনা উপরে বিহরে আজি ॥

(৩)

যে প্রেম-কণিকায় মাধবেন্দ্রপুরী বিল্বমঙ্গল আর,
গোস্বামী মহান্ত পেলে কলিযুগে ব্রজ-সেবা অধিকার ॥
যে প্রেমমূরতি হৃদয়ে উদিলে মনেতে বসে না গৃহের কাজ।
সেই প্রেমরাজ দুই দেহ ধরি যমুনা-বক্ষে বিহরে আজ ॥

বাজাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি।
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিহরে আজি॥

(৪)

একদিন যাঁর বাঁশরীর গান মৃগ পশুপক্ষী যত,
উৎকর্ণ হইয়া নীরবে শুনিত যেন বা মন্ত্রপূত।
যাঁর বেণুরবে ব্রজ-গোপীগণ যুবতী-ধরম ভুলিয়া যায়,
সে প্রেমমূরতি নাবিকের বেশে ঘাটে ঘাটে প্রেম মাগি বেড়ায়।
বাজাও শঙ্খ, দাও জয় ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি।
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিরহে আজি॥

(৫)

প্রকৃতির পারে কোথায় সে ধাম, যেথা নাই মায়া লেশ,
এখানে ত্রিগুণ, সেখানে নির্গুণ, অতুলনীয় সে দেশ।
লঙ্ঘিয়া সে নদী অকূল-পাথার, বৈতরণী যার নাম,
আপনা ইচ্ছায় আপনা প্রকাশ অপরূপ-রূপ শ্যাম।
বাজাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি,
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিহরে আজি॥

(৬)

গীতায় নিষ্কাম কর্ম্ম উপদেশ স্থাপন করিয়া যাঁর,
শান্তি নাহি পেয়ে ব্যাসদেব পুন ভাগবত লিখে সার।
সেই আদর্শের প্রকট মূরতি নবীন নীরদ শ্যাম,
বামে লয়ে আজ প্রেমের প্রতিমা, কেতকী চম্পকদাম।
বাজাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি,
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিহরে আজি॥

(৭)

মোহান্ধ জীবের তমঃ ঘুচাইতে, বহির্গৌর অন্ত শ্যাম
রূপেতে আবার নদীয়া উদ্যানে ফুটিল সে আপ্তকাম।
দিবস নিশায় সমান উদয় যাঁহার রূপের ভাতি,
সেই এক আত্মা লীলার কারণ দুইরূপে মাতামাতি।
বাজাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি।
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিহরে আজি॥

মোক্ষ]

ভক্তিতত্ত্ব।

বিরাট্ পুরুষ জীব-শরীরে তিন রূপে বৃত্তির দ্বারা অনুভূত হন। প্রথম প্রকাশ প্রাণরূপে, দ্বিতীয় প্রকাশ আমাদের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপে, এবং তাঁহার তৃতীয় প্রকাশ হৃদয়বৃত্তিরূপে। হৃদয়বৃত্তিই শেষ ও পরিণত বিকাশ। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই বৃক্ষাদি ও কোন কীটাদির মধ্যে কেবল প্রাণই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তার পর সৃষ্টির মধ্যস্তরে পশু পক্ষীদের মধ্যে প্রাণের বিকাশ তো আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিকাশ সাধন হইয়াছে। পরে সৃষ্টির তৃতীয় স্তরে মনুষ্যের মধ্যে হৃদয়বৃত্তি ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে যুগের পর যুগ বহিয়া যাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে এই হৃদয়বৃত্তি মনুষ্যের মধ্যে এক অপরূপ পরিণতি লাভ করিতেছে। যুগে যুগে যুগাবতারগণ এই ক্রম পরিণতির যুগোপযোগী আদর্শ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং মানবসমাজের মধ্যে সেই আদর্শ শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যান।

মানুষের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির বর্ত্তমান পরিণতির সূচনা কোন্ যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না,—তবে মানব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যে হৃদয়বৃত্তি বিকশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ক্রমশঃই তাহা বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

কোন্ প্রথম প্রভাতে প্রাচীন মানবগণ আপনাদের পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে একটি সত্য নিত্য জ্ঞানকে উপলব্ধি করিয়া পরস্পরের অধিকার স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং আপনাদের হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার সেই প্রথম আবির্ভাবকে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চরণ-প্রান্তে আপনাদের ভক্তি-অর্ঘ্যকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন—যদিও তাহা নির্ণয় করা কঠিন—তথাপি সেই দিন অতীত ইতিহাসের মধ্যে যে একটী উজ্জ্বল পৃষ্ঠা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥

কোন্ সুদূর অতীত কালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা, "কাহার ইঙ্গিতে এই মন বিষয়ে নিপতিত হইতেছে, কাহার প্রেরণায় এই প্রাণ নিযুক্ত হইয়া কার্য্য

করিতেছে, কে এই জনসমূহকে বাক্য বলিতে নিয়ন্তৃত করিল এবং কেই বা এই চক্ষু কর্ণকে স্ব স্ব ব্যাপারে পরিচালিত করিতেছে?"—প্রভৃতি বলিয়া সেই অনাদি কর্ত্তা পরমাত্মাকে জানিবার জন্য যে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যথা প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে জানিবার জন্য আকুল আগ্রহে আপনাদের সমস্ত বিরহ বেদনাকে স্পষ্ট করিয়া সরল অন্তঃকরণে ব্যক্ত করিয়া এই ভারতের আকাশ বায়ু ও সলিলকে আন্দোলিত ও ক্ষুভিত করিয়াছিলেন—আজিও তাঁহাদের সেই করুণ-গাথা আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

"ন চেদিহাবেদীন্মহতিবিনষ্টিঃ"—তাঁহাকে এখানে না জানিতে পারিলে মহাবিনাশ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া, ভয়-ব্যাকুল অন্তরে যাঁহারা পর্ব্বতে পর্ব্বতে অরণ্যে গিরিগুহায় নদী-তটে, সেই পরম সত্যকে জানিবার জন্য চিত্ত স্থির করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এবং এই বিশ্ব প্রভৃতির মধ্যে অবশেষে তাঁহার সাড়া পাইয়া এক দিন আনন্দে বলিয়া উঠিয়াছিলেন "ওঁ যো দেব অগ্নেই যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ যো ওষধীষু বনস্পতিষু অস্মৈ দেবায় নমঃ," তাঁহাদের প্রণত চিত্তের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের মর্ম্মকথা যেন স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

বিশ্ব-প্রকৃতির বিরাট্ ইঙ্গিতে বিস্মিত হইয়া শিশু-মানব প্রথম প্রথম মুগ্ধ হইতেন, ভীত হইতেন, কখন কখন আনন্দিত হইতেন; কিন্তু তখনও সেই বিরাট্-ব্রহ্মের মধ্যে তাঁহারা স্থির আশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহারা ইহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে কত নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা তখন তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে মোহে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চাহিতেন,—তাঁহার তুষ্টির জন্য বলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতে চাহিতেন, এবং দৃশ্যমান সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি ও জলে সেই পরম দেবতাকে দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে স্তোত্র রচনা করিতেন। অবশেষে এক শুভ্র-প্রভাতে কোন কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ বহু তপস্যার ফলে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বলিয়া ফেলিলেন "তোমরা কাহাকে পূজা করিতেছ? তিনি যে আমারি মধ্যে"———

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ বাচো হি বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষঃ চক্ষুঃ"—এইরূপে তাঁহাকে জানিতে হইবে—আপনার অন্তরের গভীরতম প্রদেশের মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে; তবেই সেই অমৃত পুরুষের জ্ঞান আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হইবে।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং।
অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥—মুণ্ডক

এইরূপে ক্ষীণপাপ হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহারা আপনার অন্তঃকরণে পরমাত্মার বরণীয়রূপ দেখিয়া আশ্বস্ত হইতেন, তখন তাঁহাদের নিকট পরমাত্মা আনন্দরূপে অমৃতরূপে অনুভূত হইতেন।

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥"

প্রবন্ধের এই অংশ পাঠ করিয়া কেহ যেন অনুমান না করেন আমি বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়দিগের মন্তব্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, বা ইহা ঠিক প্রাচীন মতগুলির অনুকূল চিন্তা-প্রসূত নহে। আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে আমি আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। শাস্ত্রানুকূল যে মত নহে আমি তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

সৃষ্টির আদি কেহ অনুমান করিতে পারেন না—এই জন্য সৃষ্টিকে অনাদি বলিয়া মান্য করা হয়। তবে বুঝিবার সুবিধার জন্য এক একটি মহাপ্রলয়ের পর যে সৃষ্টি-ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহাকেই সাধারণতঃ আদি সৃষ্টি বলিয়া ধরা হয়। আমাদের শাস্ত্রেও ক্রমোন্নতি আছে;—কিন্তু ঠিক পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদ যে ধরণের, সেরূপ ক্রমোন্নতি আমাদের মধ্যে স্বীকৃত হয় না। সেই জন্য আদি সৃষ্টিতে প্রথমে স্থাবর—তৎপরে কীটাদি, পরে পক্ষী, পশু এবং তৎপশ্চাৎ মানবের যে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ঠিক মানিতে পারি না। ব্রহ্মা যখন প্রথম মনোময় জগৎ সৃষ্টি করেন এবং স্বায়ম্ভুবাদি মনু, এবং প্রচেতাদি পিতৃগণকে কল্পনা করেন—তখন এই ত্রিলোকস্থ যাবতীয় পদার্থ ও জীবাদির এক সঙ্গেই সৃষ্টি হয়—তার পর এক একটি আদি পিতৃদেবকে শক্তিসমন্বিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সৃষ্টিকার্য্যের ভার তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন। তাঁহাদের কাজ অনেকটা বাগানের মালীর কাজের মতন। আদিস্রষ্টা বীজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—তৎপরে এই পিতৃলোকদিগের হস্তে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শনের ভার দিয়াছিলেন; তাঁহারা ইহার ক্রমশঃ উন্নতিসাধনে সদা তৎপর ছিলেন। এই সময় দৈবশক্তি-সম্পন্ন কতকগুলি ঋষি সমুৎপন্ন হ'ন। তাঁহাদের হস্তেই

ত্রিলোকের যাবতীয় বিদ্যা ও জ্ঞানের ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানী, এবং আপ্ত; তাঁহারাই বেদকে প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ঋষিরাও আপ্ত ছিলেন; কিন্তু ইঁহাদিগের মত অনাদিসিদ্ধ জ্ঞানী নহেন, পরবর্ত্তী তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আপ্ত হইয়াছিলেন, এবং মনুষ্যের ভাষায় এই পরমার্থ ও লৌকিক জ্ঞানকে জগৎ মধ্যে প্রচারিত করেন। ইঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ও স্থূল শরীর সম্পন্ন। অগ্রবর্ত্তী ঋষিদের এ স্থূল দেহ নাই;—তাঁহাদের দেহ সূক্ষ্ম, তেজোময়; ইঁহারা দেবতাদিগেরও পূজনীয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে যেমন বানর, তৎপরে অসভ্য আদিম মনুষ্য, এবং সেই অসভ্য মানবমণ্ডলী ক্রমশঃ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে এই বর্ত্তমান উন্নতির সীমায় দাঁড়াইয়াছে। আমরা এ কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস আদি মানবেরা পূর্ণ-বিজ্ঞানবান্ ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। তৎপরে পৃথিবীর বয়স যত বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মানবেরা স্থূলের প্রতি অধিকতর আসক্ত হওয়ায়—তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। এইরূপে স্থূল বাসনা যত বাড়িতে চলিয়াছে—ততই তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে অধ্যাত্ম ভাব মুদিত হইয়া গিয়াছে,—শেষে এমন দাঁড়াইয়াছে যে স্থূলকে ভেদ করিয়া তাহার বুদ্ধি সূক্ষ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। এখন সূক্ষ্মকে স্পর্শ করিতে গেলে বহু সাধ্যসাধনার প্রয়োজন,—নচেৎ তাহা কোন মতেই আয়ত্ত করা যায় না। এই সকল মানবমণ্ডলীর দুর্দ্দশা দেখিয়াই ঋষিরা জ্ঞানসমূহকে সঙ্কলন করিয়াছিলেন; নচেৎ প্রথম প্রথম এরূপ লিপিবদ্ধ গ্রন্থাদির কোন আবশ্যকতাই ছিল না। বাধা-হীন স্বতঃপরিস্ফুট জ্ঞান—জ্ঞানী ঋষিদিগের সকলেরই আয়ত্ত ছিল। তার পর কল্প-কল্পান্ত চলিয়া গিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে মানবের জ্ঞান সহস্র দিক্ হইতে প্রতিহত হইয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ভ্রম নষ্ট করিবার জন্য প্রতি যুগের শেষে শেষে যুগান্তরে, সিদ্ধ ঋষিরা যুগোপযোগী ভাবে পুরাণ সত্যের প্রকাশ করেন।

ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বিষয়ের সহিত চিত্তের অনাবশ্যক অতিরিক্ত আসক্তি হওয়ায়—অন্য বৃত্তিগুলি ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিতে পারে না। এ সব গুলি ধার করা জিনিষ নহে।

প্রথমে ঋষিরা পরমাত্মাকে পিতা, বন্ধু, জনিতা, বিধাতা বলিয়া জানিতেন; তখন আর ভয়ে বিস্ময়ে নহে প্রীতি দ্বারা প্রেমের দ্বারা সেই অব্যক্ত বিরাট্কে তাঁহারা উপাসনা করিতেন। সুতরাং ভক্তির মূল ব্যাপারগুলি উপনিষদের

ঋষিরা এইরূপে উপলব্ধি করিয়া জনসমাজে জিজ্ঞাসু শিষ্যদিগের নিকট এইরূপে প্রচার করিতে লাগিলেন;—

"শ্রেয়ো পুত্রাৎ শ্রেয়ো বিত্তাৎ" পুত্র হইতে ও বিত্ত হইতে শ্রেয়—এ কথাও শিষ্যদিগকে তাঁহারা বুঝাইলেন। ক্রমে তাঁহারা আরও বুঝিলেন যে পরমাত্মা কেবল প্রিয়তর নহেন—তিনি প্রেমময় প্রেমস্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই তিনি লভ্য।' তাই ভক্তি-জগতের আদিগুরু ভক্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন—

সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা॥ নারদ-সূত্র

যদিও ভগবান্কে সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও তাঁহাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা অসম্ভব। তথাপি সেই নিকটতর অথচ অজ্ঞাত পুরুষের প্রীতিসাধন এবং তাঁহাকে একান্ত ভালবাসাই মনুষ্যজীবনের একতম লক্ষ্য। শুধু তাহাই নহে, রৌদ্রদগ্ধ সংসার-মরুভূমিতে, তিনিই একমাত্র জুড়াইবার স্থান।

ভয়ে হ'ক শ্রদ্ধায় হ'ক যখনি আমরা আপনাকে ভুলিয়া তাঁহার দিকে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছি, তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছি,—তখনি সেই ব্যাকুলতা ভক্তিরূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছে।

এই ভক্তি হইতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই। সকলের হৃদয়েই এই ভক্তি কিছু না কিছু পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্নেহ ভালবাসা ও ভক্তি এ তিনটী একই পদার্থ, স্থানভেদে উপাধিভেদ মাত্র; নচেৎ স্বরূপতঃ ইহারা পৃথক্ বৃত্তি নহে। স্নেহ ও ভালবাসা তখনি ভক্তিরূপে পরিণত হয়, যখন তাহা সংসারকে অতিক্রম করিয়া ভগবৎ-চরণচুম্বনে আপনাকে সার্থক করিয়া তুলে। আমাদের যতগুলি বৃত্তি আছে, সকলই ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়। আমাদের মধ্যে এমন একজনও নাই যিনি কাহাকেও ভালবাসেন নাই। যে শিশু সেদিন মাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেও তাহার জননীর পানে আকুলনয়নে চাহিয়া থাকে; শিশু এই আগ্রহ দৃষ্টি কোথা হইতে পাইল? তাহার এ প্রাণের ব্যাকুলতা, নিবিড় নিঃসংশয়তা কোথা হইতে আসিল? তাই বলিতেছিলাম, এই ভালবাসা সকলেরই সহজাত সংস্কার। শিশু জননীকে ভালবাসিতে পারে বলিয়াই, সে যেমন নিবিড় ভাবে জননীতে আশ্রয় পায়, তদ্রূপ আমরাও ভগবানেতে নিবিড়ভাবে আশ্রয় পাইব যখন আমরা তাঁহাকে সরল শিশুর মত ভালবাসিতে পারিব। শিশু অল্প দিন সংসারে আসিয়াছে; সে সংসারের সমস্ত ব্যাপার হইতে ভীত হয়—কুণ্ঠিত

হয় ; কিন্তু সে জননীকে আঁকড়িয়া থাকে কেন ? এই যে অজ্ঞাত প্রীতির ভাব, এই যে বিশ্বাস, ইহাই বিকশিত হইতে হইতে ভক্তি ও প্রেমে পরিণত হয়। ভালবাসা কোথাও কিনিতে হয় না, ভালবাসা আমাদের জীবনের সহচর; এই ভালবাসাই আমাদের সংসার-পথের একমাত্র সম্বল। ভগবান্ নিঃসম্বলে, নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আমাদের এজগতে পাঠান নাই।

তিনি আমাদের সঙ্গেই এই মূল্যবান্ বৃত্তিটীকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই মূলধন লইয়া যিনি জগতের মাঝে কারবার চালাইয়া ধনী হন, তাঁহার গৌরবে পৃথিবী পরিপূর্ণ ও পবিত্র হয় এবং কবিগণ তাঁহার যশোগাথা গাহিয়া কৃতার্থ হন। ইহাই Bible এর Talent এর কাহিনী।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক কৃত্রিমতা শিক্ষা করি; ইহাতেই আমাদের 'সহজ ভক্তি' ভাবটী বাড়িয়া উঠিতে পারে না। সংসারের মধ্যে আমাদের আচার ব্যবহার সংস্কার, আমাদের সহজ প্রকৃতিটীকে ক্রমশঃই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন জীবন-পথের সেই একমাত্র সম্বলটীর স্বরূপ আর আমরা ঠাহরাইয়া উঠিতে পারি না। সংসারের বিবিধ আড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে আমাদের চিরসঙ্গিনীর কথা যখন বিস্মৃত হইয়া পড়ি, 'ইহা যে অন্ন জলের মত নিত্য প্রয়োজন' বিস্মৃতির বশে যখন আমরা এই সহজ সত্যটীকে ভুলিয়া গিয়া, কতকগুলি শুষ্ক অনুষ্ঠান ও কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলি, তখনি আমাদের চতুষ্পার্শ্বে বিবিধ বিরোধগুলি ক্রমশঃই বড় হইতে থাকে। সংসারই তখন আমাদের কাছে বড় হইয়া উঠে, এবং যাহার করুণার অমৃতধারা আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই অমৃতময় পুরুষই উহ্য হইয়া যান। এইরূপে যখন মানব-সমাজের মধ্যে স্বার্থের বিপুল অবয়ব ক্রমশঃ স্ফীত হইতে থাকে, তখনি সংসার তামসিক অন্ধকারে Spiritual darkness আচ্ছন্ন হইয়া যায়। আমাদের জীবনের লক্ষ্য,—গন্তব্য পথ কিছুই ঠিক থাকে না;—জীবাত্মা ভিতর হইতে হাহাকার করিয়া উঠেন; আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি না যে আমাদের প্রাণ কি চাহিতেছে।

ধন সম্পদ্ বিলাস ভোগ তাহার সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়। সে অব্যক্ত আবেগে সেই সকল গিয়া আঁকড়িয়া ধরে; এবং তাহার ভিতর তাহার ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল আছে কিনা দেখিয়া লয়। একে একে সেই সকলকে পরীক্ষা করিয়া দেখে, এবং পরিশেষে তাহা ফেলিয়া দিয়া কাঁদিয়া উঠে;—তাহার মধ্যে সে তাহার বাঞ্ছিতকে পায় না।

কিছু পাওয়ার জন্য এই যে আগ্রহ ব্যাকুলতা ইহাই সমস্ত জীবনকে সবেগে আবার পরমেশ্বরের পানে টানিয়া আনে। এই আকর্ষণকে যখন আমরা জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করি, তখনি আমাদের ভাব প্রগাঢ় হইয়া উঠে, শ্রদ্ধা প্রীতিতে প্রাণ ভরিয়া যায়; তখনি আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আলোক ফুটিয়া উঠে,—বেদনার ঝটিকা ও অবিশ্বাসের মেঘ বিদূরিত হইয়া যায়; আবার হৃদয়াকাশে আত্মার সুবিমল কিরণজ্যোতি ফুটিয়া উঠে।

যখন তামসিক অন্ধকার দেশ বিশেষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন তদ্দেশবাসীদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। সকল প্রকার দীনতা, নিশ্চেষ্টতা ও কৃপণতা বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া সত্য ধর্ম্ম ও বিশ্বাস,—বলকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কপটাচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পৈশাচিক তাণ্ডবে তখন দেশ টলমল করিতে থাকে। অধর্ম্মে ধর্ম্মবোধ, পীড়া দুর্ভিক্ষ, অনাচার, অত্যাচার মানব-সমাজের গন্তব্যপথকে অবরুদ্ধ করিয়া তুলে, পরম লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মানবের অন্তঃকরণ তখন পরিত্রাণের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে—এই সময় করুণানিধান ভগবানন্ "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ হন। এই পৃথিবী যুগে যুগে কতবার সেই পাপিত্রাণ-পরায়ণ, দীন-বৎসল ভক্ত-অবতার ও যুগাবতারগণের পদধূলিতে পবিত্র হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠে। পৃথিবীতে কত ধর্ম্ম কত সম্প্রদায়ই আছে,—তাহাদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠানের মধ্যে কত প্রভেদ। তবু, সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব আত্মায় সেই বিশ্বাত্মা প্রেমময়ের সদাভিলাষ সমস্ত বিশ্বের অন্তঃকরণকে আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছে। ভগবান্ কাহাকেও যে ত্যাগ করেন নাই, কোন দেশকেই বর্জ্জন করেন নাই,—তাহা বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই ভাবাপন্ন ভক্তগণের আবির্ভাবেই প্রমাণিত।

বৈদিক যুগে ভক্তির বিকাশ

বেদে যে ভক্তির কথা আছে, তাহা আমি আগেই বলিয়া আসিয়াছি। বেদ বিবিধ গাথায় ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন। অটল বিশ্বাসে পিতামহগণ পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভে কৃতার্থ হইয়া "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" বলিয়া গাহিয়া উঠিতেন; সরল শিশুর মত তাঁহাদের বিশ্বাস। পরমাত্মার প্রতি সে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভালবাসা পৃথিবীর সমগ্র সুধী-সমাজকে আজও বিস্ময়াভিভূত করিতেছে। তবে আধুনিক বৈষ্ণব-সমাজের মত তখন কোন ভক্ত-সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই। ভক্তিশাস্ত্র

বলিয়া তখন কোন পৃথক্ শাস্ত্রও ছিল না। প্রাচীনদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য ঋষিই প্রথম ভক্তি-সূত্র প্রণয়ন করেন; ইহাতেও কিন্তু 'প্রাণ মাতানো' গোচের ভক্তির যেন অভাব আছে। শাণ্ডিল্য সূত্রে ভক্তিটি কেবল দার্শনিক তত্ত্বে মাত্র দাঁড় করানো হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিকে শুধু তত্ত্বের হিসাবে দেখিলে তো চলিবে না। ভক্তির ক্রম-বিকাশ পুরাণের মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রথমে মহাভারতে গীতায়, পরে বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে এই ভক্তিতত্ত্ব সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মূর্ত্তিতে সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। দর্শনে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও অরূপ অব্যক্ত সত্তার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিন্ময় মূর্ত্তির ও মাধুর্য্যের কোন স্থান নাই। দর্শনে ব্রহ্মের অরূপ সত্তায় মন প্রাণকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করিতে পারিলেই, এই সৃষ্টি কি কি উপাদানে গঠিত তাহা জানিতে পারিলেই এবং ইহার মায়া-নাট্য-যবনিকা উন্মোচন করিয়া দিতে পারিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল। অবশ্য ইহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অপূর্ব্ব তর্কে মীমাংসিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সেখানেও ভগবানকে আমাদের হইতে বহু দূরে রাখা হইয়াছে। ভগবান্ যে কি নিবিড় অন্তরতর হৃদয়রাজ্যের সমাদৃত অধীশ্বর, অন্তরের অন্তরতম, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম 'নিজ জন', তাহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে তেমন করিয়া আলোচিত হয় নাই। বোধ হয় দর্শনে সেরূপ আলোচনা করার সুবিধাও নাই। পুরাণ ভগবানকে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াও, তিনি কেবলই যে তাহাই, —শুদ্ধ জ্যোতির্ম্মাত্র নির্ব্বিকল্প সমাধিলভ্য ধন, একথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। পুরাণকর্ত্তারা বলিয়াছেন এই যে বিরাট্ পরমাত্মা প্রয়োজন হইলে এই পৃথিবীতে আমাদের মত বেশে, আমাদের মত হইয়া, আমাদের কাজে উপস্থিত হন। তিনি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করেন; তিনি যুগে যুগে ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়া জগতের জীবগণকে কৃতার্থ করেন। পুরাণের মধ্যে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতেও ভক্তির মূর্ত্তি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে ভগবান্ কেবল সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্য করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি এখানে পুত্ররূপে, পিতারূপে, গুরুরূপে, পতিরূপে, প্রণয়িরূপে ভক্তের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। পৌরাণিক ভক্তদিগের মধ্যে ভগবান্ 'ঘরের মানুষের' মত হইয়াগিয়াছেন,—অন্ন জলের মত নিত্য ব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছেন। এখানে তাঁহারা ভগবানকে নিজ জন জানিয়া নিশ্চিন্ত। বেদের সে "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং" ইত্যাদি সব প্রার্থনা আর নাই। এখানে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের খুব মাখামাখি

ভাব,—যেন ভগবান্ ও ভক্ত দুই-ই মানুষ। তাই বিরহ-বেদনাতে কাতর ভক্তের মুখে এখানে শুনিতে পাই "হে দয়িত! তুমি পুরুষ, তোমার শক্তি অধিক; তাই বাহু ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে। কিন্তু তুমি আমার মনোমন্দির হইতে চলিয়া যাও দেখি; 'পৌরুষং গণয়ামি তে', তবে তোমার পৌরুষ বুঝিব।" ভগবানকে লইয়া এত মাখামাখি, এত অভিমান, এত স্পর্দ্ধা, একি সাধারণ প্রেমের কথা! পুরাণে ভগবানকেও বলিতে শুনি,—

'ন চ তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।'

এখানে মানুষের মতন ভক্তের উপর ভগবান্ অভিমান করিয়া থাকেন; ও ভক্তের প্রদত্ত ফল পুষ্প সমাদরে গ্রহণ করেন। স্নেহময়ী জননীর মতন তিনি ভক্তদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন-বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করেন; এবং তাঁহার কোমল করুণার্দ্র হৃদয় ভক্তের বিরুদ্ধে কোন রূঢ় কথা শুনিলে কাঁদিয়া উঠে। তখন মা যেমন শিশুর অপরাধ আপনার স্কন্ধে চাপাইয়া ল'ন, তিনিও ভক্তের কোন ত্রুটী এবং তজ্জনিত দণ্ড আসন্ন দেখিয়া ভয় স্নেহ-বিজড়িত স্বরে বলিয়া উঠেন,—

'কার প্রাণ নাশ করবি রে ভাই?
শোন মিতার আমার কোন অপরাধ নাই।
সে যে প্রেমে 'ওরে হ্যাঁরে', সে করে আমারে,
আমি তারে বড় ভালবাসি ভাই।'

অবশ্য আমি জানি না ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের বা ভগবদ্ভক্তির উচ্চাঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা; তবে ইহা নিশ্চয় জানি ভগবানকে 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' বলিয়া যখন ভাবি এবং তিনি 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' হইয়া যখন ভক্তের প্রাণ বিকম্পিত করিয়া তুলেন, তাহাপেক্ষা তাঁহার কমনীয়তা আরও শত গুণে বাড়িয়া উঠে। যখন তিনি ভক্তকে বলেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

সেই জন্যই পৌরাণিক ভক্তি, দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্ব অপেক্ষা, ভারতের সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ এখানে কেবল জ্ঞানে বা যুক্তির মধ্যে ভগবান্ স্থাপিত ন'ন; তিনি আমাদের চিরকালের সখা দয়িত রূপে নিত্য বিরাজিত। আমরা যত বড়ই দার্শনিক বা জ্ঞানী হই না কেন, পিতার পুত্রের

প্রতি অগাধ স্নেহ, জননীর সন্তানের জন্য বুকফাটা ভালবাসা ভ্রাতা ভগ্নীর পরস্পরের প্রতি সে স্বর্গীয় অনুরাগ, ভৃত্যের প্রভুর প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এবং স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্মিলন, আমাদিগকে স্বতঃই বিমুগ্ধ করে। এক অনির্ব্বচনীয় সুখস্পর্শে প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই ভাবগুলি কোথাও ধার করিতে হয় না; ইহারা মনুষ্য-হৃদয়ে স্বতঃই প্রস্ফুটিত হইয়া উক্ত কোন যুক্তি তর্কের অপেক্ষা রাখে না। কারণ যুক্তি তর্ককে ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলেও এই সহজ ভাবগুলি বিকশিত হইতে পারে না। কুতর্ক কুযুক্তির প্রলয়-বহ্নি-ধূমে এই কুসুম-সুকোমল মিলনমাধুরীর অপূর্ব্ব সুষমা বিনষ্ট হইয়া যায়। ভক্তেরা যখন ভগবানের সহিত এই সকল প্রেম প্রীতির সম্বন্ধগুলি গভীর ও সত্য ভাবে পাতাইয়া তোলেন, তখন তাহার শোভা আর ধরে না; মাধুর্য্য-রসে জীবন প্রাণ মধুময় হইয়া উঠে। তখনি ভক্তের নিকট এই নীলাকাশ, এই ধরণীধূলি, এই তরু-লতা-পুষ্প-শোভিত কানন, নদনদী, গিরিশ্রেণী, বিহগ-কাকলী, কলকলতান সমস্তই অপরূপ সুষমায় ভরিয়া উঠে। তখন বাস্তবিকই "মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সৈন্ধবঃ",—সর্ব্বত্রই মধু, সর্ব্বত্রই প্রেমানন্দ। এই জন্যই পৌরাণিক ভক্তদিগের স্থান, ভক্তি শাস্ত্রে খুব উচ্চে।

ভক্তির স্তর

প্রথমে মানব-প্রকৃতি স্বার্থ-সম্বন্ধে জড়িত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়;—যখন দেখে রোগ শোক দুঃখ মৃত্যু ব্যসন হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় নাই, দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ ব্যাধির কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তখন মানব-শক্তির অতীত কোন অতীন্দ্রিয় সর্ব্বশক্তিমানের কৃপার উপর নির্ভর করিতে প্রাণ আপনা হইতে আকুল হইয়া উঠে। তখন সে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় অথবা কোন সাংসারিক লাভের আশায়, তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। সেই জন্য ভক্তি প্রথম অবস্থায় সকাম, তার পর ভক্তি পরিপক্ক হইলে, তাহা নির্ম্মল নিষ্কাম ভক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু সকাম ভক্তও ভক্তিহীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ সে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

এখানে অর্থার্থী এবং আর্ত্ত ভক্তও সুকৃতিশালী বলিয়া গণ্য হয়। ভক্তির প্রথম যুগে সকাম ভক্তিই প্রবল ছিল। সকাম ভক্তদিগের মধ্যে ধ্রুবের নামই পুরাণে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। তিনি সকাম ভাবে ভগবানের উপাসনা

করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিয়া নিষ্কাম ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পিতার নিকট অবমানিত ও বিমাতা কর্ত্তৃক গঞ্জিত হইয়া, ধ্রুব অভিমানে জর্জ্জরিত হইয়া মনে মনে সেই দিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম।" অভিমান-কাতর রোরুদ্যমান ধ্রুবকে তাঁহার মাতা সুনীতি তাঁহার অপমানের কথা শুনিয়া বলিলেন, "বৎস পরের অপরাধ মনে লইবে না। যে অন্যকে দুঃখ দেয় সে সেই দুঃখ নিজে ভোগ করে 'মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা, ভুঙ্ক্তে জনো যৎ পরং দুঃখদস্তৎ'। তবে তুমি যদি নিতান্তই বিমাতার বাক্যে কষ্ট পাইয়া থাক, তবে তুমি পুরুষার্থ অবলম্বন করিয়া নারায়ণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হও—

"নান্যং ততঃ পদ্ম পলাশ লোচনা-
দ্দুঃখ চ্ছিদন্তে মৃগয়ামি কঞ্চন।
যো মৃগ্যতে হস্ত গৃহীত পদ্ময়া
প্রিয়েতরে রঙ্গ বিমৃগ্যমানয়া"।

'সেই পদ্মপলাশলোচন ভিন্ন তোমার দুঃখ হরণ করিবার আর কাহাকেও দেখিনা; পদ্মরূপ দীপ হস্তে লইয়া লক্ষ্মী এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার অন্বেষণ করেন'। শুভক্ষণে জননীর এই উপদেশ বাক্য শুনিয়া ধ্রুব গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। ধ্রুব তখন নিতান্ত শিশু, কিছুই বোঝে না, ভজন সাধনের ধার ধারে না। তথাপি যাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে এই অপমানের প্রতিশোধ হইতে পারে তাঁহার নিকট না গিয়া ধ্রুব থাকিতে পারিল না। বাসনার তীব্র জ্বালাময় আবেগ তাহাকে কিছুতেই থাকিতে দিল না। 'কোথায় ভগবান্' 'কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়' এসব বৃত্তান্ত জানিয়া লইবার অপেক্ষা না করিয়াও 'পদ্মপলাশলোচন কোথা তুমি' বলিয়া ধ্রুব ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। ধ্রুব সকাম আর্ত্ত এবং অর্থার্থী; কিন্তু তথাপি তিনি অনন্যমনা। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, 'ask it shall be given;' ধ্রুব সরল অন্তঃকরণে তীব্র আবেগে যেমনি তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন, অমনি তাহাকে জ্ঞান উপদেশ দান করিবার জন্য জগদ্গুরু করুণাময় নারদ উপস্থিত হইয়া দীক্ষা দান করিলেন। ভক্তিশাস্ত্রে গুরু-বাদের খুব প্রভাব। গুরু ভিন্ন কিছু হইবার নহে। অবশ্য পরোক্ষ-ভাবে এ কথা সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। গুরু আসিয়া ধ্রুবের হৃদয়-গ্রন্থি ছেদ করিবার উপদেশ দিলেন। ধ্রুবও তখন সাহসে বুক বাঁধিয়া 'নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্র দ্বারা ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্যায় তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়া

গেল, কণ্ঠাগত প্রাণ; তথাপি ধ্রুব তপস্যা হইতে বিরত হইবার পাত্র নহেন। কত মায়া, কত ভয় বিভীষিকা আসিয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তপস্যায় ধ্রুব অটল অচল। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" ধ্রুবের এই মূলমন্ত্র। তিনি একে একে বহির্জগৎ হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া একাগ্রমনে হৃদয়মধ্যে ভগবান্ বাসুদেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যার প্রভাবে দেবতারা পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না। প্রথমে অন্তরে সমুদিত হইলেন; ধ্রুব বিভোর হইল, তাহার আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না। তখন ভগবান্ ধ্রুবের বহির্দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আপনার রূপ সংহৃত করিলেন। ভয়-ব্যাকুল অন্তরে ধ্রুব বাহিরের দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরে যে রূপে তাঁহার মন ডুবিয়া গিয়াছিল, বাহিরেও সেইরূপ; দেখিয়া ধ্রুব আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ স্বয়ং পূর্ণ; তাঁহাকে দেখিলে সমস্ত আশা মিটিয়া যায়; তাঁহাকে দেখিলে কি আর বাসনার কল্মষ মনকে কলঙ্কিত করিতে পারে না, তখন আর কিছুরই অভাব থাকে?— 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ' সুতরাং পূর্ণস্বরূপ ভগবানকে পাইয়া, তিনি যাহা মনে করিয়া তপস্যারম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া গেলেন; অথবা তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইল। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ কিন্তু তাহা ভুলিলেন না। তিনি ধ্রুবকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া শেষে বলিলেন "তুমি বর লও। তুমি যে বলিয়াছিলে" ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম। 'আমি তোমার সেই বাসনা আজ পূর্ণ করিব।' পূর্ণ ধ্রুব তখন সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখিতেছেন, তাঁহার কি আর সোনা রূপায় বা রাজ্য ভোগাদিতে মন আছে; তিনি কাঁদিয়া বলিলেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচান্ বিচন্বনাপদিব্যরত্নং, নাথ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

ভগবানকে পাইয়া ধ্রুবের বিষয়-ভোগ-বাসনাকে তুচ্ছ বোধ হইল। এই গেল ভক্তির প্রথম স্তর; এবং ধ্রুবতেই তাহার পূর্ণ বিকাশ। ভগবানকে সকাম ভাবে ভজনা করিলেও, ভগবান্ই ভক্তকে নিষ্কাম করিয়া দেন।

ভক্তির দ্বিতীয়স্তর নিষ্কাম ভক্তি; ইহা শান্তরসাশ্রিত। শনক, সনন্দ, সনাতন, ভৃগু অম্বরীষ (অধিকাংশ ঋষি) ও ভীষ্মাদি রাজন্যবর্গ এইরূপ ভক্তির যজনা করিয়াছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ কবির সাহেব তাঁহার দোঁহায় ভক্তির লক্ষণও বর্ণন করিয়াছেন,—

'সহ কামী সুমিরণ করে পাওয়ে উচাধাম
নিরকামী সুমিরণ করে পাওয়ে অবিচল রাম"

নিষ্কাম ভক্ত পরমাত্মার অপূর্ব্ব শান্ত ভাবকে আশ্রয় করিয়া ভগবানেই সর্ব্ব কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া, নিশ্চল-মানস হইয়া, ধ্যান-যোগের দ্বারা ও একান্ত ভক্তির দ্বারা তাঁহাকে আরাধনা করেন। ভক্ত 'নিশ্চয়াত্মা, দৃঢ়-বুদ্ধি, ভগবানে অর্পিত-চিত্ত, সর্ব্ব প্রকার ক্ষোভ হইতে মুক্ত, শীতোষ্ণ মানাপমান স্তুতি নিন্দার অতীত হইয়া শুভাশুভ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং প্রিয় বস্তু পাইয়া হৃষ্ট বা অপ্রিয় ব্যাপারে দ্বেষ করেন না।' প্রহ্লাদ এই দ্বিতীয় স্তরের চরম বিকাশ। দৈত্য-বালকগণ যখন ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই প্রহ্লাদ আমরা তো ভগবানের উপাসনার কিছুই জানি না' কিরূপে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়?" দৈত্য প্রহ্লাদ বলিলেন "সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত সমত্বমারাধন-মচ্যুতস্য"; সকলকে সমান ভাবে প্রীতি কর, সকলের মধ্যে সমান ভাবে বিষ্ণু বিরাজিত, ইহা বুঝিতে পারিলেই তাঁহার উপাসনা হইবে।' ভক্ত প্রহ্লাদের আখ্যায়িকা কে না অবগত আছেন?

তিনি সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করিয়া, ঐশ্বর্য্যভোগে বিমুখ হইয়া, পিতৃরোষে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া, সেই পরাৎপর ভগবানকেই বরণ করিয়া লইলেন। ইহাতে তিনি যে নিজের জীবনকে কি সঙ্কটের মধ্যে নিপাতিত করিলেন, তাহা মনে হইলেও হৃৎকম্প হয়। কিন্তু দৃঢ়-নিশ্চয় দৈত্য-বালক এক ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই চাহিলেন না। পৃথিবীর সমস্ত প্রলোভনের সামগ্রী লাঞ্ছিত হইয়া চলিয়া গেল। সেই প্রহ্লাদকে যখন ভগবান্ বর দিতে চাহিলেন, তখন রাজ্য ধন সমৃদ্ধি চাওয়া দূরে থাক, তিনি বর লইতেই ইচ্ছা করিলেন না। বিঘ্নসঙ্কুল ভবসাগর পার হইবার জন্য তখন তিনি ব্যাকুল নহেন। তিনি বলিলেন, "হে ভগবান্ দুরত্যয় ভব-বৈতরণী পার হইবার জন্য আমি কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন নই। তোমার বীর্য্যসঙ্গীত রসে আমার চিত্তমগ্ন। অতএব আমার জন্য কোন চিন্তা নাই। কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া, মায়া সুখের জন্য বৃথা ভার বহন করে, সেই সকল ভগবদ্-বিমুখ লোকের জন্যই আমার চিন্তা।

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষো একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥

"হে দেব! মুনিরা প্রায় নিজেরই মুক্তি কামনা করিয়া থাকেন, সেই জন্য মৌন হইয়া তাঁহারা বিজনে ভ্রমণ করেন। তাঁহারা পরের জন্য জীবন সঙ্কল্প করেন না। কিন্তু এই কাতর অসুর-বালকগণকে ত্যাগ করিয়া, আমি একা মুক্তি লাভের ইচ্ছা করি না। তোমা বিনা ভ্রান্ত জীবের অন্য গতি নাই।" ইহা অপেক্ষা আর চিত্ত শুদ্ধি কি হইতে পারে? পরের জন্য আত্ম ত্যাগ, পরের জন্য সমস্ত দুঃখকে সমাদর করিয়া প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করার মত উচ্চ বিষয় আর কি থাকিতে পারে? ইহাই নিষ্কাম ভক্তির পরাকাষ্ঠা।

অম্বরীষ নামে এক জন রাজা ছিলেন তিনিও পরম ভাগবত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা বিষ্ণু সেবায় রত হইয়াছিলেন। ভাগবতে অতি সুন্দর সুমধুর শ্লোক দ্বারা তাঁহার চরিত্র আখ্যাত হইয়াছে। পুরাণ ও ইতিহাসে আর একজন মহাপুরুষের নাম আছে। তিনি একজন ভক্তি শাস্ত্রের আচার্য্য বলিয়া পরিগণিত; তাঁহার নাম হনুমান্। ইনি অনার্য্য হইতে পারেন, অসভ্য কুলে ইঁহার জন্ম হইতে পারে; কিন্তু ইঁহার ভক্তি, নিষ্ঠা, প্রেম অনার্য্যকুলে যে গৌরব প্রদান করিয়াছে, তাহা কোন যুগে মলিন হইবার উপায় নাই। দাস্য ভক্তির চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত সাধক, কি অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ-প্রভাব আপনার উপাস্য দেবতার চরণ-কমলে, আপনার হৃদয় মনকে চিরদিনের মত বিকাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সকরুণ অথচ সুদৃঢ় বাণীর মধ্যে তাঁহার কি জ্বলন্ত বিশ্বাস ও নিষ্কাম ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়! তিনি বলিতেছেন—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদপরমাত্মনি
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ।"

'জানি, জানকীনাথে ও পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই, তথাপি রামই আমার সর্ব্বস্ব!'

আমার মনে হয় মোটামুটি পুরাণ-বর্ণিত ভক্তি এক প্রকার বলিতে পারিয়াছি যে টুকু বলিতে বাকি আছে, তাহা চৈতন্যের জীবন প্রসঙ্গে বলিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।

ভক্তদের কি সাধুত্ব!! ভাগবতে আছে দেখিতে পাই দেবতারা বলিতেছেন—

"স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীম মদভ্র সৌহৃদঃ।
ভবৎ পদাম্ভোরুহনাবমত্র তে,
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥"

'হে স্বপ্রকাশ স্বয়ং এই সুদুস্তর ভীমভবার্ণব উত্তীর্ণ হইয়াও সকল জীবের অত্যন্ত সুহৃদ্ সেই করুণহৃদয় ভক্তগণ তোমার চরণকমল রূপ তরি অন্যের জন্য পশ্চাৎ রাখিয়া গমন করেন। তুমি ভক্তের অনুগ্রাহক, তাই তোমার চরণতরীর এত মহিমা। ভরতও রহুগণকে বলিয়াছিলেন,—

"রহুগণৈ স্তত্তপসা ন যাতি ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ
নচেজ্যয়া নৈরূপানন্দ গৃহাদ্বা বিনা মহৎপাদোরজোভিষেকং।

একজন ভক্ত কবি বলিয়াছেন,—

"সাধু ভজ সাধুভজ সাধুপার নাই
জগত জীবন রাম বাঁধা তাঁর ঠাঁই।"

তাতে ভগবান্ বলিতেছেন,—

"তবিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

ক্রমশঃ

মোক্ষ]

জ্ঞানেই প্রেম বা প্রেমেই জ্ঞান।

১ম। আচ্ছা তুমি নরহরি গোঁসাইকে চেন? তা'কে ভালবাস?

২য়। লোকটা কে বলত হে? আমি কি তা'কে চিনি?

১ম। তা'কে তুমি ভালবাস কিনা আগে তাই বল? তার পর তোমার কথার উত্তর দিব।

২য়। বাঃ, আচ্ছা লোক তো তুমি, আমি তা'কে কখন দেখ্‌লাম না, জান্‌লাম না, কখনও নামও শুনি নাই! অমনি শূন্যে শূন্যে ভালবাসা হয় কিনা?

১ম। কিন্তু সে বড় সুন্দর লোক ভাই; তা'কে তোমার ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে না?

২য়। আচ্ছা মজার লোক তো তুমি? আমি যার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, সে সুন্দর কি অসুন্দর তা কি করে ঠিক করব? আগে শুনি লোকটা কেমন, একবার চোখে দেখি, তার সঙ্গে পরিচয় হ'ক্, তার পর না ভালবাসা হবে?

১ম। কেন শূন্যে শূন্যে কি ভালবাসা জন্মায় না? না দেখে না শুনে কাহাকেও ভালবাসা কি যায় না?

২য়। ভালবাস্‌তে পারা যায় হয়ত, কিন্তু সে ভালবাসা যে কাকে ভালবাসা

তা' কিন্তু কোন দিনই ঠিক হয় না! এ সব কবি-কল্পনা মন্দ নহে! পাগলামী আর কা'কে বলে?

১ম। তবে এখন পথে এস। কাল যে অত জ্যাঠামী কর্‌ছিলে? প্রেমই বড়,জ্ঞান বড় নয়; জ্ঞান না থাক্‌লেও প্রেম হ'তে পারে,—অথচ প্রেমিকের সঙ্গে কোন খোঁজ খবর নেই! "জ্ঞানে প্রেম বাধা পায়—ভাল গজাইতে পারে না" বলে যে আস্ফালন কর্‌ছিলে; এখন যে বড় আমাকে পাগল বলা হচ্চে? হাঁ করে রইলে যে? আমার কথার উত্তর দাও? আসল কথা প্রেম বা জ্ঞান যে কি—তা আমরা মোটেই বুঝি না—কেবল কথা ল'য়ে মারামারি করি! তা'তে ঝগড়া বেড়ে উঠে বটে, কিন্তু জ্ঞান বা প্রেম একটুও ফুটে উঠে না। আমরা যেরূপ বিষয়াসক্ত এবং দুশ্চিন্তা-বিষে আমাদের চিত্ত যেরূপ জর্জ্জরিত, তা'তে ওদুটি বিষয়কে বুঝিতে পারা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়।

বহুদিন ধরিয়া শ্রদ্ধালুচিত্তে সাধুসঙ্গ ও ভগবদ্ভজনা করিলে, তবে ভাব বিশুদ্ধ হয়। ভাব বিশুদ্ধ হ'লে, তবে না প্রকৃত নিষ্ঠা আস্‌বে। তার পর রুচি—অর্থাৎ তাঁকে ভাল লাগা; তার পর আসক্তি, এবং তারও ঢের পরে প্রেম। এখন জ্ঞানই বল আর প্রেমের কথাই বল ওসব শুকপক্ষীর কথা বলার মত—একবারে বস্তুতন্ত্রতা-শূন্য। কিন্তু এই ভাল-লাগাটা যে কত বড় সাধনার ফল, তা' অপ্রেমিক আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিব না! প্রচণ্ড জ্বরাসুর যখন প্রবল বেগে ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসে, তখন তাহার দাপটে আর সবই ভুলিয়া যাইতে হয়; কেবল জ্বর তাহার নিজের অস্তিত্বটা ঘনঘন নাড়া দিয়া হাড় পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া বেশ করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। তদ্রূপ শুভমুহূর্ত্তে সৌভাগ্যের উদয়ে যখন ভগবানে লোকের রুচি এবং আসক্তি জন্মে, তখন সে এত প্রবল বেগে দেখা দেয় যে তখন আর কিছুই মনে থাকে না, কেবল প্রেমময়ই সমস্ত চিত্ত তাহার অধিকার করিয়া বসেন। ভক্ত তখন আত্ম ভুলে, জগৎ ভুলে; শুধু তাঁ'কেই চেয়ে বসে;—আর কিছুতে তার প্রয়োজনও হয় না, এবং সে জন্য কিছু সে আর চাইতেও পারে না। তখন ধন জন মান প্রতিষ্ঠা পায়ের তলে গড়াগড়ি যায়—সে ফিরেও তাকায় না! এই যে সকল ভুলে তাঁ'কে ভালবাসা—এরই নাম অনুরাগ। এখন দেখ কাহাকেও ভালবাস্‌তে হ'লে, ভালবাসা আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়ে না—যা'কে ভালবাস্‌বে তা'কে আগে জান্‌তে হয়। তার পর যদি সে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র হয়, তবেই তার উপর আমাদের ভালবাসা প্রগাঢ় হ'তে পারে! ভালবাসা অন্ধ এ কথা অনেককে বল্‌তে শুনি। পাত্রা-

পাত্র বিচার না করিয়া ভালবাসা নাকি আপনাকে অজানিত লোকের হাতে বিকাইয়া দেয়! কিন্তু এ কথা সত্য নহে; প্রেম অন্ধ নহে, কাম অন্ধ বটে! প্রেমকে কামের সহিত এক করিয়া দেখিলে চলিবে না। অপাত্রে ভালবাসা হয় না, হ'লেও টেঁকে না। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, ভালবাসামাত্রই প্রেম নহে। প্রেম অপার্থিব জিনিষ, তাহার সহিত দেহ বা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়।

যাহা মোহকর, যাহা 'নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা', যাহা মানসিক বিকৃতির ফল—তাহা কখনই প্রেম নহে। সুন্দর হইলেও যাহা ইন্দ্রিয়-মোহকর নহে, বরং যাহা দিব্যভাবের উদ্দীপক, যাহার ত্রিসীমানায় অসত্য কামভাব আসিতেই পারে না—যাহা হিমাদ্রি-বক্ষ-বিদারী বেগবতী ভাগীরথীর সাগরাভিমুখে অবিশ্রান্ত গতির ন্যায়—ভগবদভিমুখী নিত্য চঞ্চল ও আবেগময়ী তাহাই 'প্রেম' শব্দবাচ্য। কিন্তু তথাপি প্রেম বিচারবিমূঢ় অজ্ঞানন্ধতা নহে;—কারণ প্রেম মিথ্যাকে আঁকাড়িয়া চিরদিন অন্ধভাবে দিন কাটাইতে পারে না। তাহা সত্যের আলোকে পরীক্ষিত এবং সত্যের সুদৃঢ় বর্ম্মে আচ্ছাদিত;—তাই প্রেম অন্তরে সুরতরঙ্গিণীর মত বিগলিত হইলেও বাহিরে নিয়মের কঠোর দুর্ভেদ্য প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই জন্যই তো প্রেমের রাজ্যেও এত চুলচেরা বিচারের প্রয়োজন। প্রয়োজন এই জন্যই যে পাছে ভুল হইয়া যায়; প্রেমের নামে কাম বিকাইয়া যায়। অসুন্দর হইতে সুন্দরকে, অসত্য হইতে সত্যকে, নিরানন্দ হইতে আনন্দকে বাছিয়া না লইলে "প্রেমকে" পাওয়াই ভার হইবে। কিন্তু এই বাছিয়া লওয়াই, এই চিনিয়া লওয়াই জ্ঞানের কার্য্য; জ্ঞানই আলোক কি না। জ্ঞানের সাহায্যে বাঞ্ছিতকে চিনিতে পারিলেই বাঞ্ছিতের প্রতি অত্যন্তাসক্তি একান্তই স্বাভাবিক। সুতরাং প্রেমের জন্য যে জ্ঞানের খুবই প্রয়োজন এ কথা আমরা অস্বীকার করিব কিরূপে? ভগবানে নির্গুন ভক্তিই প্রেম। সেই প্রেমকে লাভ করিতে পারিলেই মুক্তি লাভ হয়। সারূপ্য সামীপ্যকেই ঠিক মুক্তি বলা যায় না! মুক্তি তাহাই যাহা সত্যের স্বরূপকে অবধারণ। আত্মজ্ঞান—দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র সত্ত্বা। "তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই! শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন "ভগদ্‌ভক্তিরেব মোক্ষহেতুঃ।" ভগবদ্‌ভক্তিই মুক্তির সোপান। "ভগবদ্ভক্তি-যুক্তস্য তৎপ্রসাদাৎ আত্মবোধতঃ স্বয়ং বদ্ধবিমুক্তিঃ স্যাৎ" ভগবদ্ভক্তের

ঈশ্বরপ্রসাদে আত্মজ্ঞান হেতু, সুখে বন্ধন মোচন হয়। গীতাতেও ভগবান্ বলিলেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥"

"যাহারা একনিষ্ঠ হইয়া আমাকে ভালবাসিয়া ভজনা করে,তাহাদিগকে আমি বুদ্ধি-যোগ দিই অর্থাৎ জ্ঞান দিই,যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে পায়।" এই জ্ঞান আর প্রেম অভিন্ন ; উভয়ই নিঃশ্রেয়সের হেতু। নদী যেখানে সমুদ্রেতে আপনাকে হারাইয়া ফেলে তাহাই মহাতীর্থে পরিণত হয়। তাহাই নদীর চিরবাঞ্ছিতকে পাওয়া, তাহাই নদী-জীবনের চরমলক্ষ্য, তাহাই নদী-জীবনের আত্মজ্ঞান বা মুক্তি!

ইহাই ভালবাসার চরম—সেই জন্যই ইহা প্রেমশব্দবাচ্য। আত্মাই সকল আনন্দের উৎস, এই আত্মাকে না জানিতে পারিলে অমৃত লাভ হয় না। তাই সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তির একমাত্র চেষ্টা সেই প্রেম পারাবার পরমাত্মাকে জানিতে পারা তাঁহার সহিত একাত্মতা লাভ করা। একের সহিত অন্যের যে আত্যন্তিক মিলন-বাঞ্ছা তাহাই আসক্তি। তা'র পর মিলন বা ভাব ; ইহাতেই আত্ম-বিস্মৃতি হয়। এই সময় ঠিক অর্পণের সময়। তার পর ব্রজগোপীকাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে যখন অর্পিত হইল, যখন সব 'চাওয়া' সব 'পাওয়া' তাহাদের মিটিয়া গিয়া, তাহারা যে কে তাহা ভুল হইয়া গেল, ও তাহাদের এক প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই রহিল না—তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহারা একাত্মতা লাভ করিলেন, ইহারই নাম প্রেম। এই প্রেমে নামরূপ সব মিটিয়া লয় হইয়া যায় ; আত্মজ্ঞানীর ঠিক ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভাগবতে আছে,—

"তাঃ নাবিদন্ ময়ি অনুষঙ্গবদ্ধ ধীরঃ স্বমাত্মানমদঃ তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়ঃ অব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আগে জানা, তার পর ভাব! এখন কথা হচ্চে যে কাহাকেও হঠাৎ তোমার জানবার ইচ্ছা হবে কেন? আগে কারও কাছে তার গুণাগুণ শুন, তবে না তাকে পেতে ইচ্ছা হবে। তবেই দেখ, প্রথমেই হ'ল "শ্রবণ"। তারপর নিজের মনের সঙ্গে বোঝা পড়া করা চাই, অর্থাৎ যাকে ধরচি, যাকে চাচ্চি সে যে সেই, সেটা বেশ করে বুঝে দেখা চাই ; এরই নাম হল "মনন" ; অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয় না হলে শুধু শাস্ত্রবাক্যে কিছু হয় না। তারপর নিদিধ্যাসন, তারও পরে ধ্যান, —তার পর ধ্যেয় বস্তুর ধারণা হয়। ধারণা মানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় মন বোঝা-বুঝি। এই ধারণা থেকেই তাঁরসঙ্গে গদগদ ভাব ; ভক্তিশাস্ত্রে ইহাকেই আসক্তি বা নবানুরাগ বলে। কিন্তু ইহাও "পরানুরাগ বা প্রেম" নহে! ধ্যানীরা যাহাকে সবিকল্প সমাধি বলেন, সে আরও এক ধাপ উচ্চে ; তাহাই ভক্তি শাস্ত্রে 'ভাব' নামে আখ্যাত। কিন্তু ইহার উপরেও আর এক ধাপ আছে। প্রিয়তম প্রণয়-পাত্রকে ভাল বাসিতে বাসিতে এমনি তাহার প্রতি প্রগাঢ় ভাল-বাসা জন্মিয়া যায়, যে তাকে দেখ্তে, তার কথা শুন্তে,তার সম্বন্ধে চিন্তা কর্তে, তার সঙ্গে বেড়াতে, তাহাকে খাওয়াতে, শুশ্রূষা করতে, তার কথা বলতে, এমন কি তাকে মনে করতেও ভক্তের প্রাণের মধ্যে এক নিবিড় অনাবিল আনন্দ রসের সঞ্চার হয়। সে আনন্দের সঙ্গে জগতের আর কোন আনন্দকে সে সমান ভাবতেই পারে না। সেই দয়িত, চিরবাঞ্ছিত প্রেমিক যদি তা'র গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তা'র 'নাওয়া খাওয়া' কাজ কর্ম্ম কর্ত্তব্য সবই মাথায় উঠে! তখন ভক্ত যে আনন্দে বিভোর, তার কাছে পৃথিবীর যশঃ মান ঐশর্য্য আত্মীয় স্বজন সমস্তই বিরস ও অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়! তখন তাহার হাবভাব চাল চলন পরণ পরিচ্ছদ সমস্তই এক অদ্ভূত গোছের হইয়া উঠে। তখন সে বলে—

"কাজ কি গো কুল, কাজ কি গোকুল, ব্রজকুল সব হ'ক প্রতিকূল, আমি যে সঁপেছি গো কুল অকূল-কাণ্ডারীর করে। কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে, কাজ নাই মোর গৃহবাসে, সে যার হৃদয় বাসে ; সেকি বাসে বাস করে লো॥" তখন সে জ্ঞানশূন্য মোহমুগ্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় কেবল তাহার প্রেমময়ের সঙ্গই বাঞ্ছা করে, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে চাহে না। তখন "শয়নে স্বপনে দেখে কাল রূপখানি।" সময়ে সময়ে এমন হয় যে ভক্তের—

"আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
"পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে।"

এমনই আত্ম-ভোলা, জগৎ-ভোলা ভাব ভক্তের হইয়া থাকে। ইহাই রাগানুগা বা আসল ভক্তি। কৃত্রিম ভক্তি বা বৈধী ভক্তি ইহার দিক্ দিয়াও যায় না ; সুতরাং প্রাকৃত ভক্তেরা ইহার মর্ম্ম বুঝিবে কিরূপে? অথচ আমাদের অধিকাংশেরই ভক্তি অনেক স্থলেই কৃত্রিম, বড় জোর বৈধী। সুতরাং আমাদের সে প্রেমভক্তির কথা বুঝিবার সম্ভাবনা কোথায়?

অন্য দিকে প্রগাঢ় ধ্যানীদের এমনই অবস্থা হয়, যে বিবিধ বিক্ষেপের মধ্যেও রোগ, শোক, দুঃখের হৃদয় বিদারী কোলাহলের মধ্যেও, তাঁহারা "কূর্ম্মাঙ্গানীব"

সর্ব্বত্র হইতে মনকে ফিরাইয়া আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। নির্ব্বাত স্থানে প্রদীপ-শিখার মত তাঁহাদের মন ব্রহ্মে অটল-প্রতিষ্ঠ। শীত উষ্ণ, লাভ অলাভ, হর্ষ বিষাদ, জন্ম মৃত্যু, কিছুই চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না। তখন সেই পরমাত্মৈকনিষ্ঠ জ্ঞানী দেখেন "যদি চৈক নিরন্তর সর্ব্ব শিবং, যজনঞ্চ কথং তপনঞ্চং কথং"। তখন জ্ঞানীর জ্ঞাননেত্রের নিকট এই আত্মবোধ প্রতিভাসিত হয়—

"নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ, ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুর্নচাহং নিজবোধরূপঃ।"

অর্থাৎ এখানেও নাম রূপের সব অবসান হইয়া গেল। পূর্ব্ব কথিত ভক্তদের অবস্থার সঙ্গে জ্ঞানীদের অবস্থার কেমন মিল রহিয়াছে! বাপু দুদিকেরই ঐ একই কথা। নাম রূপ না মিটাতে পার্‌লে, প্রকৃত ভক্তও হতে পার না, যথার্থ যোগীও হতে পার না। জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথ দুটা যে ঠিক একই পথ, তাহা অবশ্য বলা যায় না; তবে উভয়ই একই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেয়। বিভিন্নমুখী নদীর মত, গতি কিন্তু উভয়েরই সমুদ্রাভিমুখী। তবে ইহা সত্য যে জ্ঞানের পথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম, ভক্তি ও কর্ম্মের পথ আপক্ষাকৃত সরল ও সুগম। তবে ইহাও সত্য যে জ্ঞানের পথ বা ভক্তির পথ বা যোগের পথ, একই অধিকারীর পক্ষে অবলম্বনীয় নহে। তিনটি পথেরই তিন প্রকার অধিকারী আছে! যে যে পথের অধিকারী তাহার পক্ষে সে পথ অবশ্যই সহজ। জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ, যোগপথ পৃথক্ বটে, কিন্তু জ্ঞান, যোগ, ও প্রেম তিনটী পৃথক্ লক্ষ্যস্থল নহে। প্রত্যেক পথাবলম্বীকেই যোগ, প্রেম ও জ্ঞানকেই লাভ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান, প্রেম, যোগ তিনটির একই সাধ্যবস্তু—ইহাদের সাধনা তিন প্রকারের। জ্ঞানপথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম; এইজন্য যে সাধারণতঃ আমাদের চিত্ত দুর্ব্বল ও রজস্তমোভিভূত। বাসনা ও তমান্বিত বিক্ষেপের লীলা নিকেতন! সুতরাং এই সকল চিত্তে জ্ঞান-পথ কোন ফলদায়ী হয় না। জ্ঞানপথকে অতিক্রম করা ইহাদের পক্ষে অসাধ্য। কর্ম্ম বা যোগ দ্বারা চিত্ত কতকটা নির্ম্মল হইলে, তবে ভক্তির সঞ্চার হয়। ভক্তির আবেশে চিত্ত বিশুদ্ধ ও আর্দ্র হইলে, তবে বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হয়; তৎপরে জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা।

সেই জন্য জ্ঞান ও প্রেম আলাদা বস্তু নহে। যে মার্গই অবলম্বন কর, লক্ষ্যস্থলে আসিলেই বুঝিবে—যাহাকে বলে অপরোক্ষজ্ঞান বা আত্মদর্শন,

তাহা সত্য সত্যই 'প্রেম' শব্দ বাচ্য। ভক্তি আর জ্ঞান শুধু কথার মারপেঁচ মাত্র,—উভয় সাধনাই কঠিন; যাহার তাহার পক্ষে অধিগম্য নহে। এ পথ সহজ, ও পথ কঠিন এ কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র। কোন পথই সহজ নহে. অথচ কোনটাই একেবারে যে অনভিগম্য তাহাও নহে। প্রেমে আর জ্ঞানে বস্তুতঃ ভেদ না থাকিলেও, ভাবের একটু তফাৎ আছে;—সেইটা কি একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাই। ভগবান্ যে অনন্ত অসীম অথচ শাশ্বত সুন্দর ও প্রাণারাম, এটা আমরা দুটি জিনিষের ভিতর দিয়া লোককে বুঝাইয়া থাকি,—এক অনন্ত মহা-সমুদ্র, অপরটী সীমাহীন মহাকাশ। দুইটিই অনন্তের জ্ঞাপক; কিন্তু দুটিতে বিভাব দুই প্রকারের। দুইটিই সীমাহীন, ইন্দ্রিয় জ্ঞানে অলব্ধ; কিন্তু একটি অসীমের আনন্দে উৎফুল্ল, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহার সেই হর্ষ কূল ছাপাইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, কি এক অব্যক্ত প্রেম তাহাকে অনুক্ষণ আকুল করিয়া রাখিয়াছে। আর একটী স্তব্ধ গম্ভীর,—সেই কি যেন পাইয়া আপনাতে আপনি মগ্ন, কি গভীর বিস্ময়ে তাহার চিত্ত অসীমের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া মৌন হইয়া রহিয়াছে। এই মূক মৌন গম্ভীর শান্ত মহিমা; আর ওই আনন্দের কূলভাঙ্গা অসীম চাঞ্চল্য!! ইহা একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

আসল কথাটা শেষ হইতে বাকী আছে 'জ্ঞানই প্রেম" বলেছি কি না; এখন বুঝ জ্ঞানেই কি করিয়া প্রেম দাঁড়ায়। মনে কর, তুমি সত্য কথা ও সত্যবাদীকে খুব পছন্দ কর; এখন তুমি যদি লোকের মুখে শুনে এবং কতকটা বা নিজে পরীক্ষা করে জান্‌তে পার যে অমুক লোকটা বড় সত্যবাদী, তখন স্বতঃই তুমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হও। তারপর মনে কর যদু পরোপকার ও দয়াকেই মানুষের সর্ব্বপ্রধান গুণ বলে মনে করেন। এখন যদু যদি শুনেন অমুক ব্যক্তি বড় করুণাময়, বড় দয়ালু, পরের জন্য তিনি সহস্র ক্ষতি স্বীকার করেন; লোক সেবাতে তাঁর যত আনন্দ, এত আনন্দ তাঁর ধনসম্পত্তি সুখ বিলাসে কিছুতেই হয় না—পরের উপকারের জন্য এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হতেও তিনি প্রস্তুত। তা হ'লে এই সদাশয় মহাত্মার প্রতি যদুর ভক্তি না হইয়াই থাকিতে পারে না। আবার ধর, রাম বড় বিজ্ঞান ও তত্ত্বালোচনায় পক্ষপাতী; সুতরাং শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধালু হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি? কিন্তু ভাবিয়া দেখ তুমি যদি সেই সত্যবাদী পুরুষটীর কথা মাত্র শুনে থাক, কিন্তু তাঁকে কখন প্রত্যক্ষ কর নাই, এরূপ অবস্থায় যদি তিনি তোমার সামনে দিয়ে চলে যান—তবে "তিনিই এই বলে" কি বুঝতে পার,—না, তাঁরপ্রতি কোন

আকর্ষণ আসে? কেন না লোক যদিও সেই—তথাপি পরিচয় নাই কিনা; এইজন্য আকর্ষণ হইবে না। এইরূপ সত্ত এই পরিচয় না হলে, জানা না হলে, ভালবাসা হয় না। না দেখেও কেবল মাত্র গুণ শুনে যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করি, তখন আমরা স্বরূপতঃ কি করি, না তাঁর গুণের আদর করি? এই গুণের পরিচয় প্রত্যক্ষভাবে আমার না থাকিলেও অন্যের দৃষ্ট অর্থাৎ পরোক্ষানুভূতি আছে। সুতরাং বুঝাগেল কাহাকেও ভালবাসিতে হইলে তাহার সহিত পরিচয় থাকা চাই! কিন্তু এই যে "তদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ" তাঁহার দিকে আকর্ষণ হইবার কারণ কি? না; তাঁর গুণ আছে বলিয়াই। নির্গুণকে কেহ আদর করে না; পাথরের সহিত কাহারও প্রেম হয় না। ভগবানকে সর্ব্ব-গুণাধার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের নিত্য নব প্রস্রবণ "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং" বলে জানা গিয়াছে বা শুনা গিয়াছে বলিয়াই না আমরা তাঁহাকে চাই। সুতরাং জ্ঞানের কাজ জানা; তাহা হইয়া গিয়াছে। তারপর প্রেম আসিয়াছে। কতলোক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর জন্য পাগল হয়ে উঠে কেন? না তাঁ'তে এমনই কিছু মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়ের মোহকর জিনিষ আছে, যা দেখে বা শুনে তাঁ'কে পাবার জন্য লোকের এত আকর্ষণ হয়। জগতের সমস্ত রূপ রস গন্ধ তাঁ'রই মাধুর্য্য সংস্পর্শে মধুময় হয়ে উঠে। তাই না তাঁকে পাবার এত চেষ্টা!! ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ, আলোক স্বরূপ;—সেখানে কোন ধাঁধা নাই, সবই সেখানে স্পষ্ট; তিনি বল বিধাতা, শান্তিদাতা—তাই না তাঁর কাছে যে:ত লোকের এত ব্যাকুলতা!! সুতরাং ভগবানের প্রতি যে প্রেম, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানের অপেক্ষা রাখিতেছে। তিনি যদি আলোক না হয়ে ঘুরঘুটি অন্ধকারের মধ্যে, কালিমায় মুখ ঢেকে একটি 'জুজু বুড়ি' হয়ে বসে থাকতেন, তবে তাঁকে সমস্ত জীবন ধরে অন্বেষণ করবার কষ্টভোগকে বরণ করিয়া লইত কে? এবং কেইবা তাঁহার সঙ্গলাভের আকুল তৃষ্ণায় ছটফট করিয়া যুগযুগান্তর জনম-মরণের চড়কীতে 'চড়িয়া ঘুরপাক' খাইয়া বেড়াইত। তিনি আলোক বলেই না, লোকে অন্ধকারের ভয়ে তাঁ'র কাছে পালিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌চে! আর অন্ধকারকে এত ভয় করি কেন? ইহার মূলেও জ্ঞান আছে। কারণ অন্ধকার শুধু আঁখির দৃষ্টিকেই হরণ করে না, অন্ধকারে ধমাধম মাথা ঠুকিয়া যায়, ইহা জানা আছে; তাই আমরা আলোক এত ভালবাসি, এবং আলোককে এতটা চাহিয়া থাকি। অন্ধকারে হাঁচড় পাঁচড় কর্‌তে কেহই আমরা ভালবাসি না। আলোকই আমাদের পরমবন্ধু, আলোকই আমাদের জীবন-পথের সম্বল; তাই সকলেই আমরা জ্ঞানের পক্ষপাতী এবং

অজ্ঞানের বিরোধী। কিন্তু জ্ঞান ভক্তির বিরোধী নহে; যাঁহারা জ্ঞানকে ভক্তির বিরোধী মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। ভগবদ্‌-প্রেম যত অহৈতুকী-ই হ'ক, ভগবান্ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট জ্ঞান ভক্তের হৃদয়ে উজ্জ্বলরূপে আছে বলেই ভক্ত ভগবানকে তার সর্ব্বস্বধন বলে বুঝতে পারে। তিনিই তাহার পরমাশ্রয় এ কথা তা'র মনে মনে তা'কে কে যেন বলে দেয়। প্রেমের মূলে এই স্পষ্ট অথচ সহজ জ্ঞানটি আছে বলেই না, ভক্ত ভগবানের জন্য বিগতসন্দেহ। বৃকভানুনন্দিনী শুধু-শুধুই যে শূন্যের পানে চেয়ে কাল্পনিক শ্যামসুন্দরের জন্য কেঁদে কেঁদে ব্যাকুলা হয়ে বেড়াতেন, তা'তো নয়। সখীদের মুখে গুণ শুন্‌লেন, নিজে বাঁশী শুন্‌লেন; তাঁ'র জগৎ-মনোমোহন রূপ খানি আড়ালে আড়ালে দেখলেন; তবে না তাঁকে কৃষ্ণোন্মাদিনী করিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে জ্ঞান না হইলে প্রেম আসে না—এবং প্রেম না হইলেও প্রকৃত জ্ঞান আসে না। একটা লোককে, উপরে উপরে ভাসাভাসা, জানিতে পারি; কিন্তু যতক্ষণ তাঁহার সহিত ভালবাসা না জন্মিবে—তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত প্রীতির সহিত যতক্ষণ দেখিতে না শিখির' ততক্ষণ তাঁহার সম্যক্ পরিচয় পাইব না। একজন লোক একজনের সম্বন্ধে বলে বসে "ও লোকটা ভল নয়?" কিন্তু সে কেন ভাল নয়? তা'কে অপর একজন তো বেশ ভাল বল্‌চে। এর কারণ একজন আর একজনের চেয়ে তাকে বেশী ভালবাসে বলেই তাঁর গুণের অধিক পরিচয় পায়; অপরে পায় না। জ্ঞান ভক্তি পাশাপাশিই খেলা করিয়া বেড়ায়। ভক্ত কবি নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন;—

"জ্ঞান বিহঙ্গম যেখানে যাইতে চায়
ভক্তি-বিহঙ্গিনী উধাও হইয়া উল্লাসে উড়িয়া যায়।"

তবে চৈতন্যদেব যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চেয়ে জ্ঞানবর্জ্জিত শ্রদ্ধা ভক্তিকে অধিক প্রশংসা করেছেন? তা'ত করিবেনই। তিনি জ্ঞানবর্জ্জিত শুদ্ধাভক্তির প্রশংসা করেছেন; কিন্তু অজ্ঞান জড়িত ভক্তির তাই বলে উপাসনা করতে বলেছেন এ কথা বোলতে পারবে না। তবেই তার মানে হচ্চে যে যতক্ষণ জ্ঞেয়বস্তুকে জানা না যায় ততক্ষণ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে; কিন্তু জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয়কে লাভ করিলে আর জ্ঞানের আবশ্যক হয় না। তাই যে প্রেমময় পরমাত্মাকে জেনে তাঁর প্রেমিক হতে পেরেছে, তার আর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহার বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, সুতরাং প্রেম পরিস্ফুট হইতে পারে নাই, তাহার পক্ষেও যে জ্ঞান অনালোচনীয়, একথা আদৌ শ্রদ্ধেয় নহে। আমরা যে নামের দোহাই দিই তাহাতেও বলে "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং"—ইহা ছাড়া আর

গতি নাই। কিন্তু এই নাম-মহিমাতো কাহারও গড়া কথা নহে, আন্দাজি কথা নহে। এ সত্যটিও কাহারও জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইয়াছে, তবেই না তিনি এই সত্যতত্ত্বটি প্রচার করিতে পারিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিকেরা জ্ঞানকে জ্ঞেয়ের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। সুতরাং জ্ঞানলাভ হইলেই তাঁহাদের মতে যাহা পাইবার তাহা পাওয়া গেল। গীতায় আছে—

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীতে উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।

শ্রুতিতে আছে সেই আত্মাকে "বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি নান্যৎ পন্থা অয়নায়" শ্রুতিতে আছে "অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। ভূমৈব তেষাং সুখং।" অবশ্য এ জ্ঞান শুধু শাস্ত্রজ্ঞান নহে, ইহা অপরোক্ষ অনুভূতি। ইহাই সত্য জ্ঞান। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানকেই চরম লক্ষ্য বা সাধ্য বলেন না, তাঁহাদের পক্ষেও যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়াছি। অন্ধকারে বস্তুকে খুঁজিয়া পাইবার জন্যও প্রদীপের আবশ্যকতা আছে, বস্তু খুঁজিয়া পাইলে প্রদীপ নিভাইয়া দিলেও চলে। কিন্তু এই জ্ঞানদীপ একবার জ্বলিলে আর নিভিতে চায় না। সুতরাং প্রথমেই যখন জ্ঞানের প্রয়োজন তখন সকল চেষ্টাই প্রথমে এই জ্ঞানানুসন্ধানে লাগালেই হইল, বুদ্ধিমানের কার্য্য। একবার জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে পাইলে, তখন জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলেও চলে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে নহে। বস্তুকে পাইয়া জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলে চলে এইজন্য বলিতেছি যে বস্তুটি স্বয়ংই দীপ্তিময় অর্থাৎ কি না জ্ঞানময়! সুতরাং জ্ঞানকে তখন চাহি না বলিলেও কোন দোষের হয় না; কারণ জ্ঞান তাঁহাকে ছাড়িয়া নাই। না চাহিলেও সে থাকিবে। জ্ঞেয়ের সহিত এ জ্ঞান অচ্ছেদ্য-বন্ধনে জড়িত; এমন কি অভিন্ন। ইহাকেই ভাগবতে ঈশ্বরস্বরূপ বলা হইয়াছে "মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায় জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায়।" অবশ্য শাস্ত্রে আছে "জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ"—এজ্ঞান ঠিক সত্য জ্ঞান নহে;—ইহা পরোক্ষজ্ঞান বা সাধনাঙ্গ জ্ঞান, ইহা জ্ঞানের আভাস মাত্র। লৌকিক বিদ্যা, চিন্তা, কাল্পনাশক্তি, যুক্তি, হেতুবাদ প্রভৃতিই ইহার অন্তর্গত। এগুলি জ্ঞেয় বস্তুলাভের পর বাস্তবিকই আর কোন প্রয়োজনে লাগে না। সূর্য্যকে যতক্ষণ দেখা না যায় ততক্ষণই না প্রদীপ জ্বেলে কাজ সারতে হয়; সূর্য্য প্রকাশিত

হলে আর প্রদীপের আলোর কি দরকার? লৌকিকজ্ঞান যুক্তি এমন কি সাধন-জ্ঞানের উপাসনারও এই পর্য্যন্তই শেষ। সেইজন্য পূর্ব্বাপর আমাদের দেশে একটি প্রবাদ চলে আসচে যে 'গুরু-দর্শন হলে, আর সে দিন সাধন ভজন জপের কোন প্রয়োজন নাই।' কারণ যাঁর জন্য সাধনা তিনি স্বয়ং তখন সম্মুখে উপস্থিত।

সূর্য্য আর প্রদীপে যেমন খানিকটা মিলও আছে আবার বিরাট্ প্রভেদও আছে, লৌকিক আর সত্যজ্ঞানে ঠিক সেই রকম মিল ও প্রভেদ বর্ত্তমান। সূর্য্য স্বয়ংই প্রকাশস্বরূপ, প্রদীপ জ্বালিয়া সূর্য্যকে দেখিতে হয় না। সূর্য্যের প্রকাশ যতক্ষণ না থাকে ততক্ষণই প্রদীপের সার্থকতা, "তদ্রূপ যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি" অর্থাৎ যতক্ষণ তত্ত্ব বস্তুকে পাওয়া না যায় ততক্ষণই শাস্ত্রজ্ঞান, বিচার, বিবেক, বৈরাগ্য সাধনার আবশ্যক হয়; একবার তাঁহাকে পাইলে ইহাদের কার্য্য ফুরাইয়া আসে। সূর্য্য যেমন সমস্ত লোককে প্রকাশিত করেন এবং আপনাকেও প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ভগবান্ স্বকীয় জ্ঞানালোকে সরহস্য জাগতিক সমস্ত ব্যাপার এবং তাঁহার নিজের প্রকৃত স্বরূপকেও বুদ্ধির গোচর করিয়া দেন। সূর্য্যের যেখানে প্রকাশ সেখানে প্রদীপের যেমন একান্তভাবে প্রয়োজনাভাব, যেখানে স্বয়ং তিনি সম্মুখে সেখানে তত্ত্বালোচনা বা ব্রহ্মনিরূপণ প্রভৃতিও নিতান্তই অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। যাহারা তাঁহাকে চক্ষের সামনে দেখিতেছে, হৃদয়গুহায় প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছে—আর তাহারা তর্কবিতর্কের কূটকচালির মধ্যে যাইতে চাহিবে কেন? তাঁহারা তখন ভগবানের স্বরূপ সত্তার বিভোর-মগ্ন; "ব্রহ্ম কি" এ প্রশ্ন করিবার আর তাঁহাদের অবসর কোথায়? বস্তুকে পাইয়া তাঁহারা তো বিগত-মোহ—"পরং দৃষ্টা" তাঁহারা বিগত কাম! আর তাঁহারা কি চাহিবেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে যাহাতে ভগবানের স্বরূপ সত্ত্বার বোধ হয়, দেহের অভিমান বিগত হইয়া পরমাত্মাতে যখন অচল প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, যাহাতে তাঁহার সহিত নিরন্তর মিলন যোগে ত্বংএর সহিত অহংএর অখণ্ড অভেদ সপ্রমাণিত হয়, যাহাতে তিনি আপনার নিজ জন পরম সুহৃদ্ পরমাত্মা রূপে উপলব্ধ হ'ন—যে ভাবে 'তাঁহাকে" ছাড়িয়া "আমি" কিছু নয় বুঝিতে পারা যায়, যে ভাবে তন্ময় হইয়া এই বিশ্ব বাসুদেবাত্মক বলিয়া প্রতীতি হয়—তাহাই প্রকৃত জ্ঞান এবং ইহা প্রেমেরই নামান্তর! ভগবানের সহিত অখণ্ড মিলন ভাবকেই ভক্তেরা প্রেম নামে অবিহিত করিয়া থাকেন এবং এই প্রেমের সাধনার নামই ভক্তি। ভাগবত বলিতেছেন—এই ভক্তি যোগ বাসুদেবে প্রযোজিত হইলেই, আশু অহৈতুকী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥''

এখন দেখিলে জ্ঞান কিসে হয়! ভক্তিরই ফল জ্ঞান। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ভক্তিতে প্রেম উপস্থিত হয়। সুতরাং এই "জ্ঞান" ও "প্রেম" একই জিনিষ। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্যও পরা বৈরাগ্য! পতঞ্জলি যাহাকে "গুণ বৈতৃষ্ণম্ বৈরাগ্যম্" বলিয়াছেন! ভক্তজনবরেণ্য মহামতি নারদের আত্ম-কাহিনীতেও এই কথারই ইঙ্গিত আছে

"তস্মিংস্তদা লব্ধরুচে মহামতে, প্রিয় শ্রবণ স্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে। ১।৫।২৭ভাগ

"সেইমতি উৎপন্ন হইলে পর প্রপাঞ্চাতীত ব্রহ্মরূপে আমাকে চিনিতে পারিলাম।" নদী যেমন স্বভাবতঃই সমুদ্র পানে ধাবিত হয়, সেই রূপ ভাবে আত্মহারা হইয়া যাহার চিত্ত স্রোতের মত আপনাপনি যে ভগবৎসমুদ্র পানে ধাবিত হয় কাহারও প্ররোচনায় নহে, কোন ইষ্ট লাভের জন্য নহে, না যাইয়া থাকিতে পারে না তাই যায়, কোন কামাভিসন্ধি ইহাতে নাই—ইহাই ত' নিশ্চল ভক্তিযোগ।

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ ॥

ইহাই মানুষের পরম ধর্ম্ম "ইহার প্রভাবে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিষয়-রসকে পরিহার করে।" "সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম যতোভক্তিরধোক্ষজে"

আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলে ত?

২য়। নিশ্চয়ই শুনেছি! কিন্তু--

১ম। কিন্তু কি?

২য়! প্রেম আর জ্ঞান একই বস্তু বটে; কিন্তু ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম এই তিনটি পথ অতি প্রসিদ্ধ।

১ম। পথ তো তিনটাই বটে; কিন্তু তিনেরই গম্য স্থান এক কি না?

নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষই এই তিনটি পথের লক্ষ্য,—তাই এই তিনটিই যোগ শব্দে অভিহিত।

"যোগাঃ ত্রয়ঃ ময়া প্রোক্তাঃ নৃণাম্ শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায় অন্যমস্তি কুত্রচিৎ।"

কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটি মোক্ষের পথ, এ ছাড়া অন্য পথ নাই! ইহা

ভাগবতে ভগবানের উক্তি! তবে যদি বল এক বস্তুকে পে'তে এ তিনটি পথ কেন! তার কারণ আছে! জগতে সকলেই আমরা সমান অধিকারী নহি! অধিকারী সমান না হইলেও মোক্ষের ইচ্ছা তো সকলেরই হয়। তাই যার পক্ষে যেটা সুবিধা হয়, এইরূপভাবে আর্য্য ঋষিরা এ তিনটি মোক্ষের সনাতন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন! অধিকার সম্বন্ধে ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন তাহা তোমাকে শুনাইতেছি।

নির্ব্বিণ্নানাম্ জ্ঞানযোগঃ ন্যাসিনাম্ ইহ কর্ম্মসু।"

স্বভাবতঃই দুঃখবুদ্ধিতে কর্ম্ম ফলে বিরক্ত, সুতরাং জ্ঞানযোগ ত্যাগী বা সন্ন্যাসীর পক্ষে অবলম্বনীয়। আবার "তেষু নির্ব্বিণ্নচিত্তানাম্ কর্ম্মযোগঃ তু কামীনাম্।" যাহারা স্বভাবতঃই কামী, ফল-লাভেচ্ছু, সংসারবাসনা যাহাদের প্রবল এবং ভোগবিলাসে যাহারা অত্যন্ত আসক্ত, সেই সকল দুঃখবুদ্ধিশূন্য, কর্ম্মফলে অবিরক্ত পুরুষদের পক্ষে কর্ম্মযোগ নিঃশ্রেয়সের হেতু। সেই জন্য রাজ্য সুখাভিলাষী অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিলেন "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" কর্ম্মে তোমার অধিকার, জ্ঞানে তোমার অধিকার নাই। কিন্তু পাছে কর্ম্মীরা মনে করেন, তবে কোন কালেই বুঝি মুক্তি তাঁহাদের নাই,—তাই ভগবান্ তাঁহাদিগকে বলিলেন "মাভৈঃ" ভয়নাই—এই কর্ম্মই তোমাদিগকে মুক্তিদান করিবে। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।" যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া কর্ম্ম কর। "মা কর্ম্মফল হেতুঃ" ফল লাভই যেন কর্ম্মের কারণ না হয়—এবং "মা সঙ্গোস্তেহকর্ম্মণি" এবং সন্ন্যাসীদের মত কর্ম্ম অকরণেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়, তবে কি ভাবে কর্ম্ম করিবে।

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ"।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥

কর্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া এবং কর্ম্মফলে আসক্তিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম করে সে পাপে লিপ্ত হয় না। কেমন? না যেমন পদ্মপত্র জলে থাকিলেও জলে লিপ্ত হয় না সেইরূপ, কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলে বদ্ধ হয় না।

এই জন্যই তো ভগবান্ বলিলেন "যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলমং" সুকৌশল কর্ম্মই যোগ। অবশ্য এই রকম কর্ম্মে কুশলী কি প্রকারে হইতে হয়, তাহা ভগবান্ গীতায় অনেক রকম করে উপদেশ দিয়াছেন, এখানে সে সব কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গীতা শ্রদ্ধা করে পড়ে দেখ, সবই বুঝতে পারবে।

২য়। ভক্তি যোগ তবে কাহাদের জন্য?

১ম। ভক্তি যোগ "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণঃ নাতিসক্তঃ ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ভাগ

'কোনরূপে মৎকথাতে জাতশ্রদ্ধ, যে পুরুষ বিরক্তও নহে আর অত্যন্ত আসক্তও নহে, সেই পুরুষের জন্যই ভক্তিমার্গ প্রশস্ত।' ভগবান্ বলিয়াছেন যত দিন বৈরাগ্য বা মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মায়, ততদিন অবধি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥

২য়। তাহলে দেখচি আমাদের পক্ষে কর্ম্মযোগই শ্রেয়ঃ

১ম। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! জ্ঞান বা ভক্তি একবারে হয় না. ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরার্পিত-চিত্ত অভ্যাস করিতে করিতে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়; বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভক্তি লাভ হয় অর্থাৎ ভগবানে আসক্তি হয়; বিষয়ে দোষদৃষ্টি হেতু বৈরাগ্য হয়; তার পর জ্ঞান।

কাম]

দোল।

১

সখিরে

টুটল পিয়াসা মিটল গোল।
পরাণ আমার দোল দোল॥
বঁধুর উজল দিঠির সাথে।
ফাগুন পূর্ণ নিশিটি ভাতে॥
বিচ্ছেদ ব্যথা বেদনা-সাথী।
গহন কাননে গহীন রাতি॥
বক্ষের দ্বারে চক্ষের জল।
মিলনের পথে কণ্টক দল॥
মিলায়ে গিয়াছে সখি! সে সকল।
মঙ্গল মহ, মঙ্গল বল্॥

২

সখিরে

বঁধুর পিরীতি প্রাণে প্রাণে।
শান্তি, কান্তি কি যেন আনে॥
নব বসন্ত অন্তরে মম।
দীপিল ভাব কোমল কম॥
ভুবন বেড়ে কান্ত মোরে।
জড়ায়ে আদরে রয়েছে ক্রোড়ে॥
বঞ্চন মান অপমান-ভার।
তরাসে তাড়িত পরশে তার॥
কান্তিময় এ সখি! থল, জল।
মঙ্গল মহ মঙ্গল বল্॥

৩

সখিরে,

ধন্য জীবন, ধন্য হা।
"পুলকে পূরিত সকল গা"॥
শ্যাম বঁধু মম বাসর দুলাল।
কুল, লাজ, আজি কি সে জঞ্জাল॥
নাগর চাঢ পরাণ কান।
ছুটায়ে দিয়াছে সুখের বাণ॥
আমি যে কান্ত, কান্ত সে আমি।
রহুক এমন দিবস যামি"॥
টুটুক পিয়াসা, মিটুক গোল।
পরাণ আমার দোল দোল॥

'প্রসাদ'

মোক্ষ]

আত্মতত্ত্ব।

(কার্ত্তিক, ১৩২১ সংখ্যার পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হে শিষ্য! যাজ্ঞবল্ক্য আপনার মনোমধ্যে এই প্রকার বিচার করিয়া মৈত্রেয়ী স্ত্রীকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—"হে মৈত্রেয়ি, আমি এক্ষণে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতেছি। এই বার্ত্তা তুমি অঙ্গীকার কর। হে মৈত্রেয়ি! আমার গৃহে যত সুবর্ণ গাভী প্রভৃতি ধন আছে, সেই ধন দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ আমি তোমাকে দিতেছি; আর দ্বিতীয় ভাগ আমি কাত্যায়নীকে দিতেছি। আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলে এই ধন দ্বারা তোমাদের উভয় স্ত্রীর সুখ লাভ হইবে।" হে শিষ্য! এই প্রকার বচন যখন যাজ্ঞবল্ক্য মুনি মৈত্রেয়ী স্ত্রীকে বলিলেন, তখন সংসারভারাক্রান্তা এবং সংসার-দুঃখে কাতরা সেই মৈত্রেয়ী এই অবসর পাইয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে বলিল;—"হে ভগবন্, যে ধন প্রাপ্তি দ্বারা আমি মৃত্যুরহিত হইব, এরূপ ধন পাইতে আমি ইচ্ছা করিতেছি; আর যেধন প্রাপ্তি দ্বারা ইহলোকে মরণ প্রাপ্তি হয়, সেই ধন প্রাপ্তির ইচ্ছা আমি করিতেছি না। হে ভগবন্, সুবর্ণাদি ধন দ্বারা পূর্ণ এই সসাগরা পৃথিবী যদি কখন আপনি আমাকে দেন, তাহা হইলে সেই ধন প্রাপ্তি দ্বারা আমি অমৃতভাব প্রাপ্ত হইব, অথবা সেই ধন দ্বারা আমি অমৃত ভাব প্রাপ্ত হইব না; এই দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ আপনি নিশ্চয় করিয়া আমাকে বলুন। তদনন্তর বিচার করিয়া আমি আপনার ধন লইব।" ইহা যখন মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে বলিল, তখন যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সুবর্ণাদি ধন দ্বারা এই জীবের অমৃত

ভাব প্রপ্তি হয় না এই দ্বিতীয় পক্ষ অঙ্গীকার করিয়া মৈত্রেয়ীকে এই প্রকার বাক্য বলিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে মৈত্রেয়ি; এই সুবর্ণাদি রূপ নাশবান ধন দ্বারা কোন দেহধারী জীব মোক্ষরূপ অমৃত ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। তদ্বিপরীতে সেই সুবর্ণাদি ধন দ্বারা এই জীব মরণকেই প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে সুবর্ণাদি ধন বিষয়ে মৃত্যুর কারণতা অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা নিরূপণ করা যাইতেছে। ইহলোকে যত ধনবান্ পুরুষ আছে তাহারা রাজা হইতে, চোর হইতে এবং অন্য দুষ্ট পুরুষ হইতে, অনেক প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হে মৈত্রেয়ি, ইহলোকে এরূপ কোন ধনবান্ পুরুষ নাই যিনি চিন্তারহিত হইয়া কালযাপন করেন; পরন্তু এই ধনবান্ পুরুষের স্বপ্নাবস্থায়ও রাজা, চোর, অগ্নি আদির ভয় নিরন্তর থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, যখন স্বপ্নাবস্থায়ও ধনবান্ পুরুষ রাজাদির ভয় বিনির্ম্মুক্ত হন না, তখন জাগ্রত অবস্থায় রাজাদির ভয়রহিত কি প্রকার হইবেন? আর হে মৈত্রেয়ি, ইহলোকে ধনহীন যে নির্ধন পুরুষ তাহাদের ত রাজাদির ভয় নাই এবং বিশেষ রূপে রোগাদিও হয় না, সুতরাং সেই নির্ধন পুরুষের শরীরেও অনেক বল আছে এবং সেই নির্ধন পুরুষের জঠরাগ্নিও প্রজ্বলিত থাকে। অতএব এই জানা যাইতেছে যে, সেই নির্ধন পুরুষের উপর দৈবও প্রসন্ন এবং অনুকূল। এক্ষণে ধনী পুরুষের উপর দৈবের প্রতিকূলতা দেখান যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি, ইহলোকে যে ধনবান্ পুরুষ তাঁহার উপর বিশেষ রূপেত দৈব প্রতিকূল থাকেন। কারণ ইহলোকে প্রধানতঃ ধনী পুরুষই রোগীই থাকেন এবং সেই ধনবান্ পুরুষের ক্ষুধা হয় না এবং তাঁহার অসুখও অল্প হয়। এবং বহুধন প্রাপ্ত হইলেও সেই ধনীর তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না। আরও ধনী ব্যক্তি আপনার জ্ঞাতি বন্ধুবর্গের প্রতিও মনে মনে বিদ্বেষ রাখেন, সুতরাং সর্ব্বদা অসুখী থাকেন। এবং কোন কোন ধনীও কুকুরের ন্যায় প্রসিদ্ধই আছেন। তাঁহারা পুত্রাদি বন্ধুবর্গের সহিত বিদ্বেষ করেন। আর এই কার্য্য আমি করিব এবং এই কার্য্য আমি করিব না—এই প্রকার চিন্তা করিয়া নিরন্তর ব্যাকুলই থাকেন। এইরূপ চিন্তাযুক্ত সেই ধনবান্ পুরুষগণ কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ প্রাপ্ত হন না। আর ইহলোকে মহাত্মা দয়ালু পুরুষ নির্ধন ব্যক্তির প্রতি কৃপা করিয়া যেরূপ স্নেহ করেন, সেরূপ স্নেহ তিনি ধনবান্দিগের উপর করেন না। আর ইহলোকে ধনমদে গর্ব্বিত হইয়া এই ধনী ব্যক্তি যে প্রকার পাপ কর্ম্ম করেন, সেইরূপ পাপ কর্ম্ম এই নির্ধন ব্যক্তি রাজা প্রভৃতির ভয়ে করিতে সাহস করে না। আর ইহলোকে ধনবান্ পুরুষ

ধনমদে মত্ত হইয়া দেবতাদিগকেও অবজ্ঞা করে; গুরুকেও অবজ্ঞা করে, অতিথিদিগকে অবজ্ঞা করে এবং দেবতা ব্রাহ্মণদিগকেও অবজ্ঞা করে, বেদবেত্তা জ্ঞানী পুরুষকেও অবজ্ঞা করে। এই ধনবান্ পুরুষ স্বপক্ষে স্থিত জীবের এবং শত্রুপক্ষে স্থিত জীবের উপর উপদ্রব করে। এই সকল কারণে সেই ধনবান্ পুরুষ ইহলোকে এবং পরলোকে নানা প্রকার দুঃখ পাইয়া থাকে। কিন্তু ইহলোকে যে সকল নির্ধন দরিদ্র পুরুষ আছে, তাহারা অন্য জীবকে পীড়ন করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং তাহারা সেইরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। অতএব ধনবান্ পুরুষ অপেক্ষা নির্ধন পুরুষ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। হে মৈত্রেয়ি, যদি তুমি সুবর্ণাদিরূপ ধন লইতে স্বীকার কর, তবে ইহলোকে যেরূপ প্রসিদ্ধ ধনী লোকের জীবন হইয়া থাকে, সেই ধন দ্বারা তোমারও জীবন সেইরূপ হইবে। আর যেরূপ ইহলোকে ধনের আসক্তি প্রযুক্ত চলচিত্ত ধনবান্ পুরুষের মোক্ষরূপ অমৃত ভাব প্রাপ্তির আশা নাই, সেইরূপ ধনের আসক্তি দ্বারা তোমারও মোক্ষরূপ অমৃতের আশা থাকিবে না। হে মৈত্রেয়ি, ধনবান্ পুরুষের অমৃত ভাব প্রাপ্তি হইবে না, এ বিষয়ে কারণ এই যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষ তাহার নাম অমৃত। সেই মোক্ষরূপ অমৃত লাভ দেহাদিতে 'অহং মম' অভিমান নিবৃত্তি বিনা হইবে না। সুতরাং দেহাদিতে 'অহং মম' অভিমান নিবৃত্তি সেই মোক্ষরূপ অমৃতের কারণ। আর সেই 'অহং মম' অভিমান নিবৃত্তি অজ্ঞান নিবৃত্তি বিনা হইবে না, সুতরাং সেই অজ্ঞান-নিবৃত্তি 'অহং মম' অভিমান নিবৃত্তির কারণ। কিন্তু সেই অজ্ঞান নিবৃত্তি আনন্দস্বরূপ আত্মার জ্ঞান বিনা হইবে না। সুতরাং এই আত্মজ্ঞান অজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ। কিন্তু ধনের আসক্তি দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত ধনবান্ পুরুষের চিত্তে সেই আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আর সেই আত্মজ্ঞানের অভাব হওয়াতে ধনী পুরুষের অজ্ঞানও নিবৃত্তি হয় না। আর অজ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে অজ্ঞানের কার্য্যরূপ সূক্ষ্ম শরীরও নিবৃত্তি হইবে না। সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমানে সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রিত পুণ্য পাপ কর্ম্মও নাশ হইবে না। পুণ্য পাপ কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলে, পুনঃ স্থূল শরীর প্রাপ্তি অবশ্যই হইবে। এই স্থূল শরীর প্রাপ্ত হইলে, জীব পূর্ব্বজন্মের পুণ্য পাপ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ অবশ্যই ভোগ করিবে; এবং পূর্ব্বের সংস্কারবশে এই জীব পুনর্ব্বার পুণ্য পাপ কর্ম্ম করে এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর মরণানন্তর সেই অজ্ঞানী জীব পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ আত্মজ্ঞানহীন সেই ধনবান্ পুরুষ ঘটীযন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর সংসারে ভ্রমণ করে। এরূপ ধনী ব্যক্তির মোক্ষরূপ অমৃত

প্রাপ্তির কোন আশা নাই। সুতরাং সুবর্ণাদি রূপ ধন দ্বারা মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্তি হয় না; এই অর্থ সিদ্ধ হইল। হে শিষ্য! যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যখন মৈত্রেয়ীকে এইরূপ বলিলেন, তখন মৈত্রেয়ী বলিল, "হে ভগবন্, সুবর্ণাদিরূপ ধনপ্রাপ্তি দ্বারা যখন মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্তির আশা নাই, তদ্বিপরীতে মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়,—তখন মোক্ষ পাইতে অভিলাষিণী আমি মৈত্রেয়ী এই সুবর্ণাদি ধন লইয়া কি করিব? পরন্তু এই ধন দ্বারা আমার কিছুমাত্রও প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। অতএব আপনার সমস্ত ধন কাত্যায়নীকে দিন। আমার এই ধনপ্রাপ্তির ইচ্ছা নাই।" শঙ্কা। হে মৈত্রেয়ি! এই সুবর্ণাদি ধন যদি তুমি অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে তোমার শরীরের ভোগ ও তাহার রক্ষার জন্য আহারাদি ব্যবহার কিরূপে চলিবে? সমাধান। হে ভগবন্! ভোগ প্রারব্ধাধীন, তজ্জন্য জীবের চিন্তার কি কারণ আছে? ভোগ বিষয়ে প্রারব্ধ বা দৈব মুখ্য, এবং পুরুষকার গৌণ অর্থাৎ উপলক্ষ মাত্র; পরন্তু অপবর্গ বা মোক্ষ সম্বন্ধে দৈব গৌণ এবং পুরুষকার মুখ্য। যোগবাশিষ্টে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে। আহারাদি ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ সন্ন্যাস আশ্রম ধারণ করিয়া আপনি শরীরের নাশ পর্য্যন্ত ভিক্ষা অন্ন দ্বারা আপনার শরীর নির্ব্বাহ করিবেন, সেইরূপ আমিও এই শরীর নাশ পর্য্যন্ত ভিক্ষা অন্ন দ্বারা আপনার শরীর নির্ব্বাহ করিব। সুতরাং আমার জীবন রক্ষার জন্য আপনি কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তা করিবেন না। হে ভগবন্, পূর্ব্বে মাতার উদরে দশ মাস দশ দিন পর্য্যন্ত যে বিশ্বম্ভরদেব আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বম্ভরদেব এখনও আমাকে রক্ষা করিবেন। আর যে বিশ্বম্ভরদেব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল জীবের অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে নিরন্তর চালাইতেছেন, বিশেষতঃ ভক্তজনের ভার নিজেই বহন করিয়া থাকেন, সেই বিশ্বম্ভরদেবের প্রেমে যদি আমি অনন্যমনে নিরন্তর অনুরক্ত থাকি, তাহা হইলে তিনিই আমার শরীরের যোগক্ষেম বহন করিবেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় শ্রীকৃষ্ণদেব স্বয়ং বলিয়াছেন :—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" গীতা।

সুতরাং এরূপ বিশ্বম্ভর পরমাত্মা দেব বিদ্যমান থাকিতে আপনার শরীরের চিন্তা করা উচিত নহে। হে ভগবন্, যদি কখন ভিক্ষা অন্ন না পাইয়া আমার শরীর নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেও আমার ভয় নাই। তদ্বিপরীতে এই শরীর নাশ হইলে, আমি পরমেশ্বরের কৃপা বলিয়া মানিব। কারণ এই শরীর

বিষ্ঠা মূত্রাদি মল দ্বারা পূর্ণ; সুতরাং এই শরীর অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; এবং এই শরীর অনেক ব্যাধি দ্বারা গ্রাসিত; সুতরাং নানা প্রকার দুঃখের কারণ এবং এই শরীর অশুভ প্রবৃত্তি দ্বারা বহু পাপের কারণ। এরূপ নিন্দিত শরীরে আমার কিছুমাত্রও আসক্তি নাই। শঙ্কা হে মৈত্রেয়ি! তোমার শরীরে যদি তোমার আসক্তি না থাকে, তাহা হইলে এই শরীর রক্ষার জন্য তুমি অন্নাদি ভক্ষণ কি নিমিত্ত কর? সমাধান। হে ভগবন্! যেরূপ ইহলোক রাজার ভৃত্য কোন লোককে বলপূর্ব্বক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, সেইরূপ আমি মৈত্রেয়ী পরাধীনতা প্রযুক্ত ভোজনাদি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। শরীরের প্রতি অনুরূপ প্রযুক্ত আমি ভোজনাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হই না। চণ্ডীতে উক্ত আছে—

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥"

পুনশ্চ জানা যায়—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

এক্ষণে অন্ন-ভোজন-বিষয়ে দোষ নিরূপণ করা যাইতেছে। "হে ভগবন্, অন্ন ভোজন করিলে জীবের চিত্তে কাম ক্রোধ লোভ মোহ উৎপন্ন হয় এবং অন্নের ভোজন হইতে এই জীবে নিদ্রা তন্দ্রাদি দোষ জন্মে, এবং বিষ্ঠা মূত্রাদি মল বৃদ্ধিও অন্নের ভোজন দ্বারা হইয়া থাকে, এবং অন্নের ভোজন দ্বারাই এই জীবের নেত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন শরীর আপন আপন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। সেই নেত্রাদির প্রবৃত্তি হইতে এই জীবে অনেক প্রকার পাপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আহার-রহিত ক্ষুধাজয়ী, সেই ব্যক্তির নেত্রাদি ইন্দ্রিয় কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। হে ভগবন্! অন্ন ভোজন না করিলে এই জীবের এক ক্ষুধা-পীড়া উৎপাদন করে, কিন্তু অন্ন ভোজন করিলে এই জীবের কাম ক্রোধাদি অনেক শত্রু পীড়া প্রদান করে। হে ভগবন্! পূর্ব্বে কামরূপ দোষ আমাকে যে যে দীন অবস্থা প্রাপ্ত করিয়াছিল, আমার সেই সেই দীন অবস্থা আপনি জানেন। এই জন্য আপনার নিকট আমি সেই নিজের দীন অবস্থার বিষয় বলিতেছি না। হে ভগবন্, সেই কামরূপ বৃক্ষের গর্ভরূপ ফল আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের শীঘ্রই হয়। সেই গর্ভ-ধারণ সময়ে এবং সেই গর্ভ পরিত্যাগ কালে স্ত্রীলোকের যে দুঃখ হয়, তাহা নরকদুঃখ হইতে এবং মরণদুঃখ হইতে কোটী গুণ অধিক। হে ভগবন্, যেরূপ ইহলোকে

কুচ্‌লের বৃক্ষে জীবকে বিষরূপ ফল প্রদান করে, সেইরূপ এই কামরূপ বৃক্ষে আমার ন্যায় সকল স্ত্রীলোককে নানাপ্রকার দুঃখরূপ ফল প্রদান করে। সেই দুঃখের অনুভব যেরূপ আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের আছে, সেরূপ পুরুষের নাই। হে ভগবন্, এরূপ দারুণ দুঃখ সহ্য করিয়াও আমার এই শরীর নাশ প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। সুতরাং ইহা জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্মা স্ত্রীলোকের শরীরে কোন বজ্ররূপ উপাদান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হে ভগবন্, এই কামদ্বারা যে প্রকার দুঃখ আমি পাইয়াছি, সেই প্রকার দুঃখ ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি দ্বারাও আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত দুঃখ আমি আপনার চিত্তে অনুভব করিতেছি। আপনি তো সর্ব্বজ্ঞ; এই কারণে আপনার সমীপে সেই দুঃখ বর্ণন করিতেছি না। আর হে ভগবন্, অন্ন ভোজন করিলে যে কাম ক্রোধাদি অনেক প্রকার বিকার উৎপাদন হয়, সেই কাম ক্রোধাদি বিকার দ্বারা যদি কদাচিৎ আমার মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যু অপেক্ষা ক্ষুধা-জন্য মৃত্যুকে আমি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কারণ, যেরূপ ইহলোকে এক বীরপুরুষ একই বীরপুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, এক বীরপুরুষ অনেক বীরপুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। যদি কখন এক বীরপুরুষ অনেক বীরপুরুষের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে সে সেই যুদ্ধ দ্বারা ক্লেশই প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ কাম ক্রোধাদি অনেক বিকারের মধ্যে প্রবল যে এই ক্ষুধারূপ বিকার, সেই এক ক্ষুধার সহিত যুদ্ধ করিতে যদ্যপি আমি সমর্থ আছি, তথাপি অনেক কাম ক্রোধাদি বিকারের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সমর্থ নহি। সুতরাং হে ভগবন্, ধন গ্রহণ না করিলে যদি আমার এই শরীর নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আমার উপর হইতে দুর্গন্ধ শরীর রূপ ভার উঠিয়া যাইবে। এই শরীর রক্ষা করিবার জন্য আমার কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরাগ নাই। পরন্তু এই ভারত-খণ্ডে, একমাত্র মোক্ষ স্থানে, অধিকারী মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞান-হীন হইয়া, আমি মৈত্রেয়ী এই শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু যেরূপ আপনি আত্মজ্ঞান দ্বারা সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ আমিও আত্মজ্ঞান সম্পাদন করিয়া পশ্চাৎ যদি শরীর পরিত্যাগ করি তো ভাল হয়। সুতরাং হে ভগবন্, যদি আপনার আমার উপর দয়া হয় এবং আপনি মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্তির উপায় জানেন, তাহা হইলে তাহা কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ করুন, যদ্দ্বারা আমিও মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইব।

হে শিষ্য, এই প্রকার যখন মৈত্রেয়ী ধনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য প্রদর্শন

করিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য মুনি আপনার মনে এই প্রকার বিচার করিয়া মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন। এক্ষণে সেই বিচার নিরূপণ করা যাইতেছে। ইহলোকে যদ্যপি এই জীব ধন দ্বারা কামরূপ পুরুষার্থ এবং ধর্ম্মরূপ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারে বটে, তথাপি সেই ধনদ্বারা জীব মোক্ষরূপ অমৃত কখনও প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর ধনদ্বারা জীবের যে স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধরূপ কাম লাভ হয়, সেই কাম বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে তো জীবের দুঃখেরই সাধন। পরন্তু যেরূপ পথশ্রান্ত পুরুষের সমীপে দুঃখের কারণ যে পদ-প্রহার তাহাও সুখের কারণ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ বিষয়াসক্ত ভ্রান্ত পুরুষের নিকট, কাম নিজে দুঃখের কারণ হইলেও সুখের কারণ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। কিংবা বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বিষয়-জন্য সুখের সুখরূপতা সম্ভব নহে। কিন্তু সেই বিষয় জন্য সুখে দুঃখরূপতাই সম্ভব। পরন্তু বিষয়াসক্ত লোকের দৃষ্টিতে যদি কখন সেই বিষয়-জন্য সুখে সুখরূপতা অঙ্গীকারও করা যায়, তাহা হইলেও বিষয়ে কিংবা ধনে সেই সুখের কারণতা সম্ভব নহে। পরন্তু ব্রহ্মানন্দই আভাসরূপে প্রতিফলিত হয় মাত্র। প্রথমতঃ বিষয়ে সেই সুখের কারণতা সম্ভব নহে; কারণ বিষয় জড়। বিষয়ের লালসায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলে, তাহা নিরন্তর চঞ্চল থাকে। যখন সেই বিষয় লাভ হয়, তখন চিত্ত স্থির হইয়া যায়. সুতরাং তৎকালে সত্ত্বগুণের কার্য্য যে স্বচ্ছ মন তাহাতে ব্রহ্মানন্দ প্রতিফলিত হয়। এজন্য সেই আনন্দাভাসকে আমরা প্রকৃত আনন্দ বোধে ভ্রান্ত হই, বাস্তবিক তাহা আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দাভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিষয় জড়, সুতরাং তাহাতে কোন কালেই আনন্দ থাকিতে পারে না। যে বিষয় আজ আনন্দদায়ক, তাহা কাল পরম দুঃখের আস্পদ হয়। বিষয়ে আনন্দ থাকিলে এরূপ হইত না; উহা সকল কালেই এক রকম থাকিত। সুতরাং বিষয়ে সুখের কারণতা নাই স্থিরীকৃত হইল। দ্বিতীয়তঃ ধনেও সুখের কারণতা সম্ভব নহে; কারণ ধনহীন যে শ্বানাদি পশু তাহারাও আপনার স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিয়া বিষয়সুখ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্ত্রীরূপ বিষয়-জন্য সুখে ধনের কারণতা সম্ভব নহে। আর ধনহীন যে ভ্রমর তাহারাও নানাপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া সুখ লাভ করে। সুতরাং গন্ধরূপ বিষয়-জন্য সুখে ধনের কারণতা সম্ভব নহে। আর ধনহীন যে শুক কোকিলাদি পক্ষী তাহারাও আম্রাদি ফলের রস গ্রহণ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং রসরূপ বিষয়-জন্য সুখেও ধনের কারণতা সম্ভব নহে। আর বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের মন্দিরে

যে গাভী প্রভৃতি পশু থাকে এবং অন্য নির্ধন পুরুষ থাকে, তাহারাও নানাপ্রকার গীতবাদ্য শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখ লাভ করে; সুতরাং শব্দরূপ বিষয় জন্য সুখেও ধনের কারণতা সম্ভব নহে। আর ইহলোকে ধনহীন যে দরিদ্র পুরুষ তাহারাও বারাঙ্গনাদি সুন্দরী স্ত্রীর রূপ দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করে; সুতরাং রূপ-বিষয়জন্য সুখেও ধনের করণতা সম্ভব নহে। আর ধনহীন যে মক্ষিকাদি জীব, তাহারাও দুর্লভ রাজার স্ত্রীর স্পর্শ লাভ করিয়য়া সুখ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং স্পর্শ-রূপ বিষয়জন্য সুখেও ধনের কারণতা সম্ভব নহে। যদ্যপি ইহলোকে কোন কোন লোক ধনদ্বারা বিষয়সুখ প্রাপ্ত হয় বটে, সুতরাং ধন বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বিষয়সুখের কারণতা সম্ভব; তথাপি যে বস্তু সম্পূর্ণ কার্য্য-অভিব্যক্তির নিয়ম-পূর্ব্বক জনক হয় তাহাকে শাস্ত্রে কারণ কহিয়াছে; কিন্তু যে বস্তু কোন কোন কার্য্য-অভিব্যক্তির জনক হইবে তাহাকে শাস্ত্রে কারণ কহে নাই। আর যে বস্তু কোন কোন কার্য্যে ব্যক্তির জনক হইবে আর কোন কোন কার্য্যে ব্যক্তির জনক না হইবে, সেই বস্তুকে শাস্ত্রে 'কারণ' কহে নাই। যেরূপ মৃত্তিকা দণ্ড চক্র কুলাল এই চারি নিয়ম পূর্ব্বক সম্পূর্ণ ঘটের জনক, সুতরাং এই চারি, ঘটের কারণ। আর এই কুলালের গৃহে স্থিত যে রাসভ (গর্দ্দভ) যে যৎকিঞ্চিৎ ঘটের জনক, তথাপি সেই রাসভ সম্পূর্ণ ঘটের জনক নহে। এজন্য সেই রাসভ ঘটের কারণ নহে। কিন্তু অন্যথা সিদ্ধ হইতেছে। সেইরূপ এই ধন যদ্যপি পুরুষের বিষয় সুখের যৎকিঞ্চিৎ জনক, তথাপি এই ধন পশু আদি, সর্ব্বজীবের বিষয়-সুখের জনক নহে। সুতরাং এই ধন বিষয়সুখের কারণ নহে। কিন্তু রাসভের ন্যায় অন্যথা সিদ্ধ হইতেছে। কিংবা ইহলোকে ধনি-পুরুষ ধন দ্বারা সম্পূর্ণ বিষয়সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না; কিন্তু সেই ধনবান্ পুরুষ যৎকিঞ্চিৎ বিষয়সুখ প্রাপ্ত হন। সেই যৎকিঞ্চিৎ বিষয়সুখ নির্ধন পুরুষও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়জন্য সুখে ধনের কারণতা সম্ভব নহে। কিংবা যেরূপ বিষয়-জন্য সুখে ধনের কারণতা সম্ভব নহে, সেইরূপ স্বর্গাদিসুখের হেতু যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম বিষয়েও ধনের কারণতা সম্ভব নহে। কারণ মুদ্গল ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যে নির্ধন পুরুষ, তাহারাও অতিথি সেবা প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন. ইহা শাস্ত্রে শুনা যায়। সুতরাং ধন দ্বারাই এই পুরুষের ধর্ম্ম প্রাপ্তি হয়, এই প্রকার নিয়ম সম্ভব নহে। তদ্বিপরীতে কত ধনবান্ পুরুষ তো ধনমদে মত্ত হইয়া নরকই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শঙ্কা। স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন যে অশ্বমেধ যজ্ঞ, সেই যজ্ঞ ধন বিনা হয় না; সুতরাং ধনই স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন। সমাধান। অশ্বমেধ

যজ্ঞ বিনা অন্য কোন উপায় দ্বারা যদি কখন এই জীবের স্বর্গপ্রাপ্তি না হইত, তাহা হইলে ধন বিষয়েই স্বর্গের কারণতা সম্ভব হইত। পরন্তু স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রে তপ জপ ব্রত প্রভৃতি অনেক প্রকার সাধন কথিত হইয়াছে। সেই জপাদি সাধন দ্বারাও এই জীবের স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে।

অতএব ধনই স্বর্গ প্রাপ্তির সাধন এই প্রকার নিয়ম সম্ভব নহে। কিংবা যে বাদী ধনকে মোক্ষের কারণ স্বীকার করেন, সেই বাদীও ধনকে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ স্বীকার করেন না; কিন্তু যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্দ্বারা এই ধনকে মোক্ষের কারণ বলেন। সমুচ্চয় বাদীদিগের এই মত অদ্বৈত বাদীদিগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত বা খণ্ডিত হইয়াছে। স্বারাজ্যসিদ্ধি নামক গ্রন্থে বহু শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণে কথিত হইয়াছে—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপানাপহানির্নান্যঃ পন্থাশ্চেতি ভূয়ো বচোভিঃ।
জ্ঞপ্তে সাক্ষান্মুক্তিহেতুত্বসিদ্ধাবধ্যাসত্বং বন্ধনস্যার্থসিদ্ধম্॥

অর্থঃ। শ্বেতাশ্বতর বচন যথা,—দেবের জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববন্ধন নিবৃত্তি হইয়া যায়। সংসার অসার না হইলে শ্রুতি বাক্যের এরূপ কখন সম্ভব হইত না। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে হি অয়নায়" যজুর্ব্বেদের এরূপ বহু বচন দ্বারা বেদ সাক্ষাৎ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি কহিতেছেন; তাহাও সংসার মিথ্যা না হইলে হইতে পারে না। সুতরাং সংসার মিথ্যা ইহা অর্থ হইতেই সিদ্ধ হইতেছে। "জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে মিলিত হইয়া মুক্তি প্রদান করে" এই সমুচ্চয় বাদীদিগের মত নিম্নলিখিত ফুট নোট দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে! * সেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয় মাত্র। যজ্ঞাদি কর্ম্মে

---

* স্বারাজ্যসিদ্ধি নামক প্রমেয় গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় দ্বারা সমুচ্চয়-বাদ সংক্ষেপে সম্পূর্ণ রূপে নিরস্ত হইয়াছে। অতএব বিদ্বান্ মুমুক্ষু পাঠকমণ্ডলী ইহার অর্থ সবিশেষ অবগত হইয়া শ্রুতি-অনুকূল তর্ক বা মনন দ্বারা বেদান্ততাৎপর্য্য যে অদ্বৈত ভাব তাহা সম্যক্‌রূপে নিঃসংশয়িত ভাবে উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হইবেন। তাঁহাদের বোধ-সৌকর্য্যার্থে আমি এই শ্লোকদ্বয়ের সংক্ষেপ টীকা দিলাম।

"সত্যং ভাবং ন চিত্তির্ব্যপনুদতি যতঃ কর্ম্মনাশ্যো ঘটাদি-
র্মিথ্যাভূতং চ কর্ম্ম ক্ষপয়তি ন তথা চিত্তিঘাত্যং যতস্তৎ।
ইত্থং সিদ্ধে বিভাগে শ্রুতিশিখরগিরা চিত্তিঘাত্যঃ প্রতীতো
বন্ধো মিথ্যেতি সিদ্ধে ন তদপহতয়ে কর্ম্মজাতং সমর্থম্॥

টীকা।—লোকে ঘটাদি ভাব পদার্থঃ কর্ম্মনাশ্যঃ প্রহারাদি ক্রিয়াবিনাশ্যঃ প্রসিদ্ধঃ যতঃ অতঃ চিত্তিঃ জ্ঞানম্ সত্যং অনারোপিতং ভাবং ভাবপদার্থম্ ন ব্যপনুদতি ন নাশয়তি তথা কর্ম্ম ক্রিয়া মিথ্যাভূতম্ আরোপিতং শুক্তিরজতাদি ন ক্ষপয়তি ন নাশয়তি যতঃ লোকে তৎ মিথ্যাভূতং বস্তু চিত্তিঘাত্যম্ অধিষ্ঠানজ্ঞাননাশ্যম্ প্রসিদ্ধম্। ইত্থম্ অমুনা প্রকারেণ বিভাগে বস্তুস্বভাবভেদে সিদ্ধে সতি শ্রুতিশিখরগিরা বেদান্তবাক্যেন চিত্তিঘাত্যঃ জ্ঞানবিনাশ্যঃ সন্ প্রতীতঃ নিশ্চিতঃ

মোক্ষের কারণতা সম্ভব নহে। জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্পূর্ণ বিরোধী। জ্ঞান দ্বারা মনোনাশ হয়, সুতরাং মোক্ষের দিকে তাহার গতি। কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং জগতের দিকে তাহার গতি। যখন যজ্ঞাদি কর্ম্মেই মোক্ষের কারণতা সম্ভব নহে, তখন ধন বিষয়ে মোক্ষের কারণতা কিরূপ সম্ভব হইতে পারে? আর স্বর্গাদিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যেরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মের কারণতা রহিয়াছে, সেইরূপ জপ তপ ব্রতাদি কর্ম্মেও স্বর্গপ্রাপ্তির কারণতা আছে। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইল যে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ যদ্যপি একমাত্র ধনদ্বারা অনুষ্ঠান করা যায় বটে, তথাপি ধন দ্বারা মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্তি হইবে না। হে শিষ্য! মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যমুনি মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, "হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, ধনে বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া মোক্ষরূপ অমৃতপ্রাপ্তির সাধন যে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। হে মৈত্রেয়ি, ইহলোকে এই পুরুষ পুত্ররূপে প্রীতিযুক্ত হইয়া যে স্ত্রীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয় (আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ)। সেই স্ত্রীর নাম জায়া, এই প্রকার আত্মার জায়া এক তুমিই। কারণ এই তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিভাবাপন্ন আমি যাজ্ঞবল্ক্য তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। সুতরাং তোমার ন্যায় যে বিচারবতী স্ত্রী তিনিই জায়া নামে কথন করিবার যোগ্যা। আর তোমার ন্যায় বিচারবতী স্ত্রী ভিন্ন যত লৌকিক স্ত্রী আছে, তাহারা সকলেই অন্নবস্ত্র ভূষণাদি যাচ্ঞা করিয়া আপনার পতিকে নানা প্রকার ক্লেশ প্রদান করে, সুতরাং সেই সকল স্ত্রী জায়া নামে কথন করিবার

বন্ধঃ মিথ্যা ইতি সিদ্ধে তদপহতয়ে বন্ধবিনাশায় কর্ম্মজাতং অগ্নিহোত্রাদি পুণ্যকর্ম্মসমূহং ন সমর্থম্ নিজস্বভাবাদিতি ভাবঃ॥

নন্বেবমপি অজ্ঞানবিরোধি জ্ঞানস্য অবিরোধি জগদ্বন্ধনিবর্ত্তকত্বং কথমিত্যাশঙ্কামপনুদন্ জ্ঞানোপায়ে প্রবর্ত্তয়তি, আবিদ্য ইতি—

"আবিদ্যো হ্যেষ বন্ধো বিরমতি ন বিনা:বেদনং কর্ম্মজালৈ-
র্ম্মালোদ্ভূতোঽহিরস্তং ব্রজতি কিমু নমস্কারমন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ।
এবং নিশ্চিত্য নাগস্ত্বচমিব বিধিনা কর্ম্মবন্ধং বিধূয়
জ্ঞানোপায়ে শ্রীগুরুচরণমভিগতঃ সেবমানো যতেত॥"

টীকা।—গুরোঃ তত্ত্বনিষ্ঠস্য গুরোঃ শ্রীচরণম্ অভিগতঃ সম্মুখং গতঃ সন্ সেবমানঃ জ্ঞানোপায়ে শ্রবণাদৌ যতেত যত্নং কুর্য্যাৎ। কিং কৃত্বা এবং উক্তপ্রকারেণ নিশ্চিত্য নিশ্চয়ং কৃত্বা বিধিনা শাস্ত্রোক্তপ্রকারেণ কর্ম্মবন্ধং কর্ম্মবন্ধনম্ বিধূয় সম্যক্ ত্যক্ত্বা কঃ কিমিব নাগঃ সর্পঃ ত্বচম্ জীর্ণকঞ্চুকম্ ইব এবম্ কথম্ মালোদ্ভূতঃ মালায়াং কল্পিতঃ অহিঃ সর্পঃ নমস্কারমন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ উপায়ৈঃ অস্তম্ নাশম্ কিমু ব্রজতি কিন্তু ন ব্রজতি, তদ্বৎ এষ বন্ধঃ বেদনম্ অধিষ্ঠানজ্ঞানম্ বিনা কর্ম্মজালৈঃ কর্ম্মসমূহৈঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহৈঃ ন বিরমতি ন নশ্যতি। কুতঃ হি যতঃ আবিদ্যঃ অবিদ্যোদ্ভূতঃ অজ্ঞানমূলক ইতিযাবৎ শ্রুত্যাদ্যুক্ত জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বোক্ত্যন্যথানুপপত্ত্যাজ্ঞানাকার্য্য-বন্ধোঽজ্ঞানমেবেতি ভাবঃ।

যোগ্যা নহে; কিন্তু তাহারা ললনা, ভার্য্যা ইত্যাদি নামের যোগ্য। হে মৈত্রেয়ি! ইহলোকে আমার ন্যায় তুমিও ধনাদি পদার্থের কামনা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আত্মার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছ।

তোমার সেই নিষ্কাম বচন শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। সুতরাং স্ত্রীলোকের যে স্বাভাবিক লজ্জা ধর্ম্ম তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার সম্মুখবর্ত্তিনী হও। হে মৈত্রেয়ি! আমি তোমাকে মোক্ষরূপ অমৃতপ্রাপ্তির সাধন বলিতেছি; তুমি আপনার মন, নেত্র এবং অন্যান্য করণ সাবধান করিয়া শ্রবণ কর। এক্ষণে অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা আত্মার পরমানন্দরূপতা নিরূপণ করা যাইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! তোমার আমি পতি প্রিয় আর আমার তুমি জায়া প্রিয়া, এই বার্ত্তা তোমার ও আমার অনুভবসিদ্ধ। পরন্তু এ বিষয় এই বিশেষতা আছে। আমার তোমার শরীরের প্রতি যে প্রীতি আছে সেই প্রীতি তোমার সুখের জন্য নহে; কিন্তু আমার নিজের আত্মার সুখের জন্য, তোমার শরীরের উপর আমার প্রীতি আছে। আর হে মৈত্রেয়ি, তোমার যে আমার শরীরের উপর প্রীতি আছে, তাহাও আমার সুখের জন্য নহে; কিন্তু তোমার আপনার আত্মার সুখের জন্য তোমার, আমার শরীরের উপর প্রীতি আছে। এক্ষণে এই অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! এই জায়া যে আপনার পতির প্রতি প্রীতি করে তাহা পতির সুখের নিমিত্ত করে না, কামরূপ অগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া সেই জায়া কামরূপ অগ্নির শান্তি দ্বারা আপনার বিষয়সুখের নিমিত্ত এবং বস্ত্র ভূষণাদি প্রাপ্তি জন্য সুখের নিমিত্ত আপনার পতির প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে। শঙ্কা। হে ভগবন্! এই জায়া আপনার সুখের জন্য পতির প্রতি প্রীতি করে, এই কথা কিরূপে জানা যাইবে? সমাধান। হে মৈত্রেয়ি! যদি কখন পতির সুখের নিমিত্ত এই জায়া পতির প্রতি প্রীতি করিত, তবে যে সময়ে সেই পতি কোন পরস্ত্রীতে আসক্তি করিয়া সেই জায়ার প্রতিকূল হয়, সেই সময়েও সেই জায়ার আপনার পতির উপর প্রীতি থাকা উচিত। কিন্তু আপনার প্রতিকূল পতির উপর কোনও জায়া প্রীতি করে না; কিন্তু অনুকূল পতির উপর সকল জায়া প্রীতি করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা জানা যাইতেছে যে, সেই জায়া আপনার সুখের জন্যই পতির উপর প্রীতি করিয়া থাকে। পতির সুখের জন্য নহে। আর হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ এই জায়া পতির সুখের জন্য পতির প্রতি স্নেহ করে না, সেইরূপ এই পতিও সেই জায়ার সুখের জন্য জায়ার প্রতি

স্নেহ করে না। কিন্তু কামরূপ অগ্নির শান্তি দ্বারা আপনার বিষয়সুখের জন্য এবং অন্নপাকাদি গৃহের ব্যবহার নিমিত্ত সুখের জন্য সেই পতি আপনার জায়ার প্রতি প্রীতি করে। যদি কখন জায়ার সুখের জন্য পতি জায়ার প্রতি প্রীতি করিত, তাহা হইলে যে সময়ে জায়া ঋতুধর্ম্মবশতঃ অথবা কোন ব্যভিচারাদি কর্ম্ম-বশতঃ সেই পতির প্রতিকূল হয়, সেই সময়েও পতির জায়ার উপর প্রীতি হওয়া উচিত। কিন্তু আপনার প্রতিকূল জায়ার উপর কোনও পতির প্রীতি হয় না, কিন্তু অনুকূল জায়ার উপরই সকল পতির প্রীতি হইয়া থাকে। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, জায়ার সুখের জন্য পতির জায়ার উপর প্রীতি হয় না, কিন্তু আপনার সুখের জন্যই জায়ার উপর প্রীতি হইয়া থাকে। সুতরাং হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ ইহলোকে শর্করা স্বভাবতঃ মধুর এবং আপনার সম্বন্ধ দ্বারা সেই শর্করা অমধুর পদার্থকেও মধুর করে, সুতরাং সেই শর্করা মধুরতম; সেইরূপ এই স্ত্রীর এবং পুরুষের যে স্বয়ং-জ্যোতি আনন্দস্বরূপ আত্মা, সেই আত্মাই স্বভাবতঃ প্রিয়রূপ। আর সেই আনন্দস্বরূপ আত্মা আপনার তাদাত্ম্য সম্বন্ধ দ্বারা শরীরাদি অপ্রিয় পদার্থকেও প্রিয়রূপ করে। এই কারণে সেই আত্মাদেব প্রিয়তম। আর হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ জায়ার আপনার সুখের জন্য পতি প্রিয় এবং পতির আপনার সুখের জন্য জায়া প্রিয়া, সেইরূপ পুত্র সুবর্ণাদি ধন, গবাদি পশু, ব্রাহ্মণত্ব জাতি, ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি, ভূরাদি সপ্ত লোক, ইন্দ্রাদি দেবতা, ঋগাদি বেদ, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী, ইত্যাদি জগতে যত পদার্থ আছে, সেই পুত্রাদি পদার্থে যে জীবের প্রীতি হয়, তাহা সেই পুত্রাদি পদার্থের জন্য নহে; কিন্তু আপনার সুখের জন্যই এই জীবের পুত্রাদি পদার্থে প্রীতি হইয়া থাকে। যদি কখন পুত্রাদি পদার্থের সুখের জন্য সেই জীবের পুত্রার্থে প্রীতি হইত, তাহা হইলে যে সময়ে সেই পুত্রাদি পদার্থ এই জীবের প্রতিকূল হয়, সেই সময়েও সেই জীবের সেই পুত্রাদি পদার্থে প্রীতি হওয়া উচিত। কিন্তু আপনার প্রতিকূল পুত্রাদি পদার্থে কোনও জীব প্রীতি করে না, পরন্তু অনুকূল পুত্রাদি পদার্থেই সর্ব্ব লোক প্রীতি করিয়া থাকে। সুতরাং এই জানা যাইতেছে, এই জীব আপনার সুখের জন্যই সেই পুত্রাদি পদার্থে প্রীতি করিয়া থাকে। সেই পুত্রাদি পদার্থের সুখের জন্য কোনও জীব পুত্রাদিতে প্রীতি করে না। অতএব সর্ব্বজীবের আপন আত্মাই স্বভাবতঃ প্রিয় "ন বারে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বারে জায়ায়াঃ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বারে সর্ব্বস্য কামায়

সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" শঙ্কা। হে ভগবন্, পতি, জায়া, পুত্র ইত্যাদি যত কিছু পদার্থ জগতে আছে, তাহা যদ্যপি প্রতিকূল হইলে জীবের সুখের হেতু হয় না বটে, তথাপি অনুকূল হইলে এই জগৎ জীবের সুখের হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং আনন্দস্বরূপ আত্মার সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া এই জগৎ প্রিয়রূপ হয় না; কিন্তু স্বভাবতঃই এই জগৎ প্রিয়রূপ। সমাধান। হে মৈত্রেয়ি! এক আনন্দস্বরূপ আত্মা ব্যতিরেকে পতি জায়া পুত্র প্রভৃতি যে কিছু অনাত্ম পদার্থ আছে, সেই সমস্ত পদার্থ স্বভাবতঃ প্রিয় রূপ নহে এবং অপ্রিয় রূপ নহে; কিন্তু এই পদার্থ আমার সুখের সাধন, এই প্রকার অনুকূল জ্ঞান যে জীবের যে পদার্থে হয়, সেই জীবের সেই পদার্থ প্রিয়! আর এই পদার্থ আমার দুঃখের সাধন, এই প্রকার প্রতিকূল জ্ঞান যে জীবের যে পদার্থে হয় সেই জীবের সেই পদার্থ অপ্রিয়। এই কারণেই ইহলোকে যে পুরুষের ভ্রান্তি বশতঃ আপনার প্রিয় মিত্র বিষয়ে প্রতিকূল জ্ঞান হয় আর আপনার শত্রু বিষয়ে অনুকূল জ্ঞান হয়, সেই ভ্রান্ত পুরুষ আপনার মিত্রকে তো অপ্রিয় জ্ঞান করে এবং আপনার শত্রুকে প্রিয় জ্ঞান করে। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে অনাত্ম পদার্থের প্রিয়তা বিষয় অনুকূল জ্ঞানই কারণ এবং অনাত্ম পদার্থের অপ্রিয়তা বিষয়ে প্রতিকূল জ্ঞানই কারণ। স্বভাবতঃ কোনও অনাত্ম পদার্থ প্রিয়, অপ্রিয় নহে। এ বিষয় দৃষ্টান্ত। যেরূপ বায়ু স্বভাবতঃ উত্তপ্ত নহে শীতলও নহে, পরন্তু সেই বায়ু অগ্নির সম্বন্ধ দ্বারা উষ্ণ প্রতীত হয় এবং জলের সম্বন্ধ দ্বারা শীতল প্রতীত হয়। সেইরূপ এই অনাত্ম পদার্থ স্বভাবতঃ প্রিয়রূপ নহে; অপ্রিয় রূপও নহে; পরন্তু অনুকূল জ্ঞান দ্বারা সেই অনাত্ম পদার্থ জীবের প্রিয়রূপে প্রতীত হয় মাত্র এবং প্রতিকূল জ্ঞান দ্বারা সেই অনাত্ম পদার্থ জীবের অপ্রিয়রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। কিংবা ইহলোকে যে বস্তুর যে স্বভাব, সেই বস্তুর সেই স্বভাব কোন কালেও নিবৃত্ত হয় না। যেরূপ অগ্নির যে উষ্ণতা স্বভাব, সেই অগ্নি হইতে কোন কালেও নিবৃত্ত হয় না। সেইরূপ পতি জায়াদি অনাত্ম পদার্থ যদি স্বভাবতঃই প্রিয়রূপ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদা সেই পদার্থ প্রিয়ই প্রতীতি হওয়া উচিত। কিন্তু সর্ব্বদা সেই অনাত্ম পদার্থে প্রিয়তা প্রতীতি হয় না। কিন্তু আপনার স্থিতি কালে যে পতি জায়াদি অনাত্ম পদার্থ এই জীবকে সুখ প্রদান করিয়াছিল, সেই পতি জায়াদি অনাত্ম পদার্থ আপনার বিয়োগকালে এবং প্রতিকূল জ্ঞানকালে এই জীবকে পরম দুঃখ প্রদান করে। সুতরাং এই আনন্দস্বরূপ আত্মা ভিন্ন পতি জায়াদি

যাহা কিছু অনাত্ম পদার্থ আছে, তাহারা স্বভাবতঃ প্রিয়রূপ নহে। কিন্তু যে সময়ে জীবের সেই পতি জায়াদি পদার্থে অনুকূল জ্ঞান হইবে, সেই সময়ে সেই পতিজায়াদি পদার্থ প্রিয় বোধ হইবে। অতএব এই সিদ্ধ হইল যে, যে আনন্দ-স্বরূপ আত্মা আপনার সম্বন্ধ দ্বারা অপ্রিয় পদার্থকেও প্রিয় করিয়াছিল, সেই আনন্দস্বরূপ আত্মাই সর্ব্ব জীবের প্রিয়তম। এক্ষণে আনন্দস্বরূপ আত্মা বিষয়ে প্রিয়তমতা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য প্রথমে অপ্রিয়, প্রিয়, প্রিয়তম এই তিনের নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! এই পদার্থ আমি কখনই প্রাপ্ত হইব না, এই প্রকার জীবের দ্বেষের বিষয় যে দুঃখ এবং সেই দুঃখের সাধন যে সিংহ সর্পাদি সেই দুইএর নাম অপ্রিয়। আর এই পদার্থ আমার সুখের সাধন এই প্রকার জীবের জ্ঞানের বিষয় যে পতি জায়াদি পদার্থ তাহার নাম প্রিয়। আর সেই পতি জায়াদি প্রিয় পদার্থ প্রাপ্তি দ্বারা যে সাত্ত্বিক অন্তঃকরণের পরিণামরূপ সুখ, সেই সুখের নাম প্রিয়তর। আর যেরূপ পতি জায়াদি প্রিয় পদার্থে যে জীবের প্রীতি হয়, তাহা সেই পতি জায়াদি পদার্থের সমুদায়ের জন্য হয় না, কিন্তু আপনার সুখের জন্যই এই জীবের, সেই পতি জায়াদি পদার্থে প্রীতি হয়, সেইরূপ সেই প্রিয়তর সুখে যে জীবের প্রীতি হয়, তাহা সেই সুখের জন্য হয় না, কিন্তু আপনার আত্মার জন্যই সেই জীবের সেই সুখে প্রীতি হয়। যদি কখন সেই সুখের জন্য জীবের সেই সুখে প্রীতি হইত, তাহা হইলে শত্রুর সুখেও এই জীবের প্রীতি হওয়া উচিত; কিন্তু শত্রুর সুখে কোন জীবের প্রীতি হয় না। সুতরাং এই জানা যাইতেছে যে আপনার আত্মার জন্যই এই জীবের সেই সুখ প্রিয়তম হইতেছে। এই কারণে এই আনন্দ-স্বরূপ আত্মাই এই জীবের প্রিয়তম। এখানে প্রিয় হইতে যাহা অধিক তাহার নাম প্রিয়তর। আর প্রিয়তর হইতেও যাহা অধিক তাহার নাম প্রিয়তম। হে মৈত্রেয়ি! এরূপ প্রিয়তম আত্মার লেশমাত্র (১) আনন্দ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাদি লোকও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই কারণে সেই আত্মাস্বরূপ আনন্দ ব্রহ্মার আনন্দ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

---

(১) ঋগ্বেদ আনন্দবল্লী সপ্তমোহনুবাক্ প্রমাণ "সৈষাঽনন্দস্য মীমাংসা ভবতি" ইত্যাদি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মনীষাপঞ্চকে লিখিয়াছেন।—

"যৎ সৌখ্যাম্বুধিলেশলেশতঃ ইমে শক্রাদয়ো নির্বৃতা।
যশ্চিত্তে নিতরাং প্রশান্তকলনে লব্ধা মুনির্নিবৃতঃ
তস্মিন্ নিত্য সুখাম্বুধৌ গলিতধী ব্রহ্মৈব ন ব্রহ্মবিৎ।
যঃ কশ্চিৎ স সুরেন্দ্রবন্দিতপদো নূনং মনীষা মম॥"

হে মৈত্রেয়ি! স্বর্গলোক আদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যতপ্রকার বিষয়জন্য আনন্দ আছে, সেই সমস্ত আনন্দ অপেক্ষা অধিক এবং দ্বৈতভাবরহিত যে ব্রহ্মানন্দ তাহা এই জীবের আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু সেই ব্রহ্মানন্দ এই জীবের আত্মারূপই। এই কারণে সেই আত্মাস্বরূপ আনন্দই এই জীবের পরম পুরুষার্থ রূপ। এই পর্য্যন্ত আত্মাস্বরূপ আনন্দ বিষয়ে পরমপুরুষার্থতা নিরূপণ করা গেল।

আত্মার সাক্ষাৎকার নিমিত্ত শ্রবণাদি সাধনের বিষয় নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! যে অধিকারী পুরুষের করামলকের ন্যায় সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত আত্মসাক্ষাৎকার ইচ্ছা হইবে, সেই অধিকারী পুরুষ প্রথমে বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি, মুমুক্ষুতা এই চারিসাধন সম্পন্ন করিবেন। পরে সেই অধিকারী পুরুষ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেন। সেখানে গিয়া এই অধিকারী পুরুষ গুরুর মুখ হইতে "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ব্রহ্মাহমস্মি" ইত্যাদি অনেক শ্রুতিবাক্য বারম্বার শ্রবণ করিবেন। আর উপক্রম উপসংহারাদি ষট্-লিঙ্গ দ্বারা এই অধিকারী পুরুষ সেই বেদান্ত বচন সকলের অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে তাৎপর্য্য ইহা নিশ্চয় করিবেন। ইহার নাম শ্রবণ। এই শ্রবণ দ্বারা অধিকারী পুরুষের প্রমাণগত অসম্ভাবনা নিবৃত্ত হইবে। এখানে বেদান্ত শাস্ত্র জীবব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক অথবা ভেদপ্রতিপাদক এই প্রকার সংশয়ের নাম প্রমাণগত অসম্ভাবনা। এক্ষণে মনন নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! এই প্রকার গুরুমুখ হইতে বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া এই অধিকারী পুরুষ একান্ত স্থানে বসিয়া শ্রুতি-অবিরুদ্ধ তর্ক করিয়া সেই বচনের অর্থ মনন করিবেন। সেই তর্ক এই "যেরূপ ইহলোকে একই মৃত্তিকাদি কারণ, ঘটশরাবাদি অনেক কার্য্যরূপে থাকে, সেইরূপ একই অদ্বিতীয় পরমাত্মা অজ্ঞানের সম্বন্ধবশতঃ নানা জগৎরূপ হইয়া প্রতীত হয়। আর যেরূপ ঘট-শরাবাদি কার্য্য মৃত্তিকাদি কারণে লয় হয়, সেইরূপ এই সম্পূর্ণ জগৎ অধিষ্ঠান আত্মাতে লয়ভাব প্রাপ্ত হয়। আর যেরূপ মালার পুষ্পে সূত্রের তো অন্বয় আছে, কিন্তু পুষ্পের পরস্পর ব্যতিরেক থাকে সেইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধ অবস্থাতে আত্মার তো অন্বয় আছে, কিন্তু এই সমস্ত অবস্থায় পরস্পর ব্যতিরেক রহিয়াছে; ইত্যাদি নানাপ্রকার তর্ক করিয়া এই অধিকারী পুরুষ বেদবাক্যের অর্থ মনন করিবেন; এই মনন দ্বারা সেই অধিকারী পুরুষের প্রমেয়গত অসম্ভাবনা নিবৃত্ত হইবে। এখানে আত্মা ব্যাপক অথবা পরিচ্ছিন্ন, ইত্যাদি সংশয়ের নাম প্রমেয়গত অসম্ভাবনা। এক্ষণে নিদিধ্যাসন নিরূপণ

করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি ! এই মন অত্যন্ত চঞ্চল, সুতরাং সেই মনকে এই অধিকারী পুরুষ প্রথমে কোন বাহ্যপ্রিয় পদার্থে একাগ্র করিবেন। তদনন্তর এই অধিকারী পুরুষ সেই শিক্ষিত মনকে অন্তরাত্মা বিষয়ে একাগ্র করিবেন; যেন আত্মাতে একাগ্রতা সম্প্রাপ্ত এই মন পুনঃ বহির্মুখতা প্রাপ্ত হইবে না। ইহার নাম নিদিধ্যাসন। এই নিদিধ্যাসন দ্বারা এই অধিকারী পুরুষের বিপরীত ভাবনা নিবৃত্ত হইবে। অন্য বস্তুতে অন্য বুদ্ধির নাম বিপরীত ভাবনা। হে মৈত্রেয়ি ! এই প্রকার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা রহিত হইলে, অন্তরাত্মাতে একাগ্রতা প্রাপ্ত এই বিশুদ্ধান্তঃকরণ গুরু-উপদিষ্ট মহা-বাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ হইতে আত্মার সাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিবে। মহাবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ বিনা স্বতন্ত্র মন আত্মসাক্ষাৎকার কেন না উৎপন্ন করে ? সমাধান। হে মৈত্রেয়ি ! যেরূপ নেত্রাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয় কখন যথার্থ জ্ঞান রূপ প্রমা উৎপন্ন করে: আর কখন সেই নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দোষবশতঃ অযথার্থ জ্ঞানরূপ অপ্রমাও উৎপন্ন করে। 'যথার্থ জ্ঞান আমি উৎপন্ন করিব,' 'অযথার্থ জ্ঞান আমি উৎপন্ন করিব না', এই প্রকার আগ্রহ সেই নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের হইতে পারে না। সেইরূপ সর্ব্ববৃত্তির উপাদান কারণ যে এই মন, সেই মনও কখন যথার্থ জ্ঞানরূপ প্রমাকে উৎপন্ন করে; আবার কখন দোষের বলে অযথার্থ জ্ঞানরূপ অপ্রমাকেও উৎপন্ন করে। যথার্থ জ্ঞান আমি উৎপন্ন করিব, অযথার্থ জ্ঞান আমি উৎপন্ন করিব না, এই প্রকার আগ্রহ এই মনের হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদোষরহিত এই মহাবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ হইতে কেবল যথার্থ জ্ঞানরূপ প্রমাকেই উৎপন্ন করে; সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার উৎপত্তি বিষয়ে মহাবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণই প্রধান কারণ। শঙ্কা। হে ভগবন্ ! আত্ম সাক্ষাৎকার বিষয়ে যদি মহাবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণেরই প্রধানতা হয়, তবে মনের সহায়তা বিনাই এই মহাবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ আত্মসাক্ষাৎকার কেন না উৎপন্ন করে ? সমাধান। হে মৈত্রেয়ি ! যেরূপ নেত্রাদি বাহ্যইন্দ্রিয় জন্য যে ঘটপটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সেই সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিষয়ে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ঘটাদি বিষয়ের সহিত সংযোগাদি সম্বন্ধ বিনা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, সেইরূপ মহাবাক্য-রূপ শব্দ প্রমাণ দ্বারা মনে যে আত্মাকার বৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেই বৃত্তি জ্ঞান বিষয়ে সাক্ষাৎকারতা তখন সিদ্ধ হইবে যখন আত্মার সহিত মনের সংযোগ সম্বন্ধ হইবে। আত্মার সহিত মনের সম্বন্ধ বিনা সেই বৃত্তিজ্ঞান বিষয়ে সাক্ষাৎকাররূপতা সিদ্ধ হইবে না। এই কারণে মহাবাক্য জন্য আত্মসাক্ষাৎকার বিষয়ে আত্মার সহিত

শুদ্ধ মনের সম্বন্ধও অবশ্য অপেক্ষা করে। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে যে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এই তিন সাধনযুক্ত যে শুদ্ধ মন সেই মন গুরু-উপদিষ্ট মহাবাক্যরূপ শব্দ হইতে অদ্বিতীয় আত্মার সাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিবে। আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইলে এই অধিকারী পুরুষের কি ফললাভ হইবে ? সমাধান। হে মৈত্রেয়ি ! এই অধিকারী পুরুষের যখন শ্রবণাদি সাধন দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্তি হয়, তখন এই অধিকারী পুরুষের অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়া যায়। আর সেই অবিদ্যারূপ কারণ বীজ নিবৃত্তি হইলে পর, এই অধিকারী পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সম্পূর্ণ দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায়। আর সেই অবিদ্যারূপ কারণ বীজ নিবৃত্তি হইলে পর, এই অধিকারী পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সম্পূর্ণ দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায়। এই প্রকার কার্য্য সহিত অবিদ্যার ধ্বংস হইলে পর এই অধিকারী পুরুষের হৃদয়ে স্বয়ং জ্যোতি আনন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মা প্রাদুর্ভূত হন। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত ;—যেরূপ মেঘাদি নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধ নির্ম্মল আকাশ প্রতীত হয়, সেইরূপ কার্য্য সহিত অবিদ্যানাশ হইলে এই অধিকারী পুরুষের আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মা প্রতীত হয়। হে মৈত্রেয়ি ! যেরূপ স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রৎ অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষ সেই স্বপ্নের দুঃখ মিথ্যা জ্ঞান করে, সেইরূপ আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যারূপ নিদ্রা হইতে জাগ্রত সেই বিদ্বান্ পুরুষ এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চকে মিথ্যা জ্ঞান করে। হে মৈত্রেয়ি ! যেরূপ ভয়শূন্য চক্রবর্ত্তী মহারাজা স্বপ্নাবস্থায় যাইয়া নানাপ্রকার ভয়প্রাপ্ত হয় ; আর সেই স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইলে সেই মহারাজা সেই স্বপ্নের ভয়কে আপনার বিষয়ে মানে না, সেইরূপ এই পুরুষ বাস্তবিক সর্ব্বদুঃখরহিত হইয়াও আপনার আত্মস্বরূপকে অজ্ঞানবশতঃ নিজের বিষয়ে নানাপ্রকার দুঃখ কল্পনা করেন : আর আত্মসাক্ষাৎকারের পর এই বিদ্বান্ পুরুষ আপনার স্বরূপ বিষয়ে সেই সম্পূর্ণ দুঃখকে মিথ্যা জ্ঞান করেন। এক্ষণে আত্মার জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বপ্রপঞ্চ জ্ঞান সিদ্ধির জন্য প্রথমে অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যাইতেছে।

ক্রমশঃ—

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র (৺কাশীধাম)

কাম] স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা।

১

প্রেম-প্রতিমা হেম-মূরতি
চম্প-বরণী রাই,
নওল কিশোর কহত বিভোর
কিশোরী-বদন চাই' :—

২

"শয়ন-কুসুমদলে নলিন-চরণতল
সুন্দরি! করু বিনিবেশ ;
তুয়া পদ-পল্লব পরশ-পরাভব
অনুভব করাহ বিশেষ।

৩

"বহু পথ যাহয়ি আওলি তুঁহু ধনি!
ক্লান্ত চরণ অপসারি ;
সেই নূপুরাধিক অনুগত কিঙ্করে
রাখহ চরণে তুহারি।

৪

"শুন, শুন কমলিনি! বদন চন্দ জিনি'
প্রেম-অমিয়া করু দান,
দীঘ বিরহ পর তাপিত তুঝ হিয়া
মঝু হিয়ে করাহ সিনান।

৫

"যা'ক মিলন লাগি' ন গণয়ি কুল-আগি
কলঙ্ক করলি তু সার,
তা'ক হৃদয় মাহ ডার মরম-দাহ
অয়ি মম গীমক হার!

৬

"তুঁহুময়-মানস তুয়া দুখ-কাতর
শববত আছিনু রাই!
জীবয় অব জীউ,— ভুজঙ্গধর কহ—
সঙ্গম-কাম কানাই।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

চম্প—চম্পক। নওল—নবীন। চন্দ—চন্দ্র। করু—করুক্। তুঝ—তোমার। মঝু—আমার। সিনান—স্নান। যা'ক—যাহার। কুল-আগি—কুলাগ্নি। করলি—করিলে। তু—তুমি। মাহ—মধ্যে। গীমক—গ্রীবার। শববত—শববৎ। জীবয়—সঞ্জীবিত কর।

———

অর্থ] দ্বাদশী ব্রত।

(১)

একদা রাজা অম্বরীষ স্বীয় মহিষীকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন "প্রিয়ে, আমি তোমার সহিত দ্বাদশী ব্রত আচরণ করিতে ইচ্ছা করি ; এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়?" রাণী দেখিলেন রাজার প্রসন্নবদন অতি সুন্দর! সেই সৌন্দর্য্য

তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত পুলকে প্লাবিত করিয়া যেন কোন্ এক অনন্ত তুফানের সহিত মিলিয়া গেল। রাণী আত্মহারা।

রাজা। কি, উত্তর দিতেছ না যে?

রাণীর ওষ্ঠাধর একবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াই বিরত হইল। রাণী আত্মহারা ; স্বামী ও দেবতায় প্রভেদ কি? রাণী গভীর চিন্তামগ্ন—"শুনিয়াছি দেবতার রূপ, দেবতার সৌন্দর্য্য অনন্ত—এই যে আমার প্রত্যক্ষ দেবতা—এ সৌন্দর্য্যও 'ত' অনন্ত—এইরূপ নয়নে, নয়ন হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হইতে হৃদয়ে—তার পর? তার পর আর 'ত' জানি না—কোথায় মিশিয়া যাইতেছে। আর আমি—কত ক্ষুদ্র আমি—ওই রূপের পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে, কোথায় যেন মিশিয়া যাইতেছি—হারাইয়া যাইতেছি ; 'আমি' হারাই তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু এই যে আমার প্রাণের দেবতা, তাহাকেও যে হারাইয়া ফেলি! এ কেমন রূপ! এ কেমন ভাব! জানি না দেবতা কি? তাহাকে কি এমন চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি দিয়া আরাধনা করিয়া—এমন করিয়া প্রেমের তরঙ্গে আত্মবিস্মৃতির দেশে ভাসিয়া যাওয়া যায়? জানি না এতটা তন্ময়তা আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা?"

রাজা। "কি ভাবিতেছ?—"

রাণী এবার বড়ই লজ্জিত হইলেন, ভাবিলেন "আমি কি পাগল হইলাম!" লজ্জায় ও হর্ষে স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি সাবধানে বাষ্পগদগদ স্বরে রাজাকে কহিলেন, "রাজন্, আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী, দাসীকে এ কথা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? ব্রত নিয়মাদিতে যে অল্প-বুদ্ধি স্ত্রী জাতি অতিসহজেই আনন্দ লাভ করে, তাহা বুঝিয়াই বোধ হয় দাসীর প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবার জন্যই এই বিষয়ের উত্থাপন করিয়া থাকিবেন। আমি আপনার সহধর্ম্মিণী, আপনার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, দান তপস্যার ফলে আপনি যেমন আনন্দিত, আমিও আপনার চরণে অর্পিত-মতি ও আপনার লব্ধ কর্ম্মফলের ভাগিনী হইয়া বাসনাশূন্য চিত্তে আপনারই অনুবর্ত্তিনী হইয়া তৃপ্ত ও আনন্দিত আছি। আমাকে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?" রাজা বলিলেন, "এই ব্রত তোমার আনন্দদায়ক হইবে কিনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার অনুমতির জন্য নয়।" রাণী বলিলেন, "স্বামিন্, স্ত্রী জাতির দেহ, ইচ্ছা ও মন সকলই স্বামীর। অল্পবুদ্ধি ও মোহ বশতঃ যদিও আমার বলিয়া মনে হয়, তথাপি আজ আপনার সমক্ষে থাকিয়া "আপনার অনুবর্ত্তিনী হওয়াই, আমার একমাত্র আনন্দ" এই কথা বলিতে যে প্রীতির

অনুভব হইতেছে, অন্য উত্তর প্রদানে আমার তত আনন্দ হইতেছে না। প্রভু, ক্ষমা করুন, দাসীকে আদেশ করুন, কেমন করিয়া আপনার চির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া নারীজন্মের চরম স্বার্থকতা লাভ করিতে পারি।"

রাজা রাজ্ঞীর এতাদৃশ সুললিত ও মনোমত বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে রাজ্ঞীকে বলিলেন "প্রিয়ে, আমার একান্ত ইচ্ছা যে আমি তোমার সহিত এই ব্রত আচরণ করি। আমাদিগকে একবৎসর যাবৎ এই ব্রত আচরণ করিতে হইবে ও পরে উদযাপনের সময় ব্রত ও অতিথি জনের সেবা করিয়া যথা সৎপাত্রে বিহিত দানাদির দ্বারায় শ্রীভগবানে অর্পিতবুদ্ধি ও সমাহিত চিত্তে পারণাদির পর ব্রত সমাপন করিতে হইবে। বল সুশীলে, তুমি পারিবে কি না?"

রাণী বলিলেন,—"প্রভু উপবাসাদিতে ও নিয়মাদি পালনে আপনাদেরই ক্লেশ অধিক। আপনার যদি কোন ক্লেশ না হয় তবে দাসীর কি কষ্ট হইতে পারে?"

রাজা বলিলেন,—"ব্রতাদিতে উপবাস ও নিয়ম পালন তাদৃশ কঠিন নয়; কিন্তু তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম গ্রহণই তোমাদের পক্ষে দুষ্কর। কেন না, ফলকামনা ও অভিসন্ধিশূন্য হইয়া, এই ব্রত ও উপবাস করিয়া, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবানকেই সকল কর্ম্মের, সকল বিষয়ের, একমাত্র তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা তুমিও নয়, আমিও নই; ফলভাগী আমিও নই, তুমিও নয়; এবং এ সকল কর্ম্মের ভগবান্ ভিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্বও নাই। এই কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণ, কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মের ফল সকলই শ্রীভগবান্।"

রাণী কহিলেন "নাথ, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার চরণে অচলা ভক্তি রাখিয়া, এই ব্রত শ্রীভগবানেরই মহিমা প্রচার করিবার জন্য অর্পিত হইতে পারে।" "আমারও সেই ইচ্ছা" এই বলিয়া রাজা নিরস্ত হইলেন।

(২)

রাজর্ষি অম্বরীষ, অতি পুণ্যবান্ ও পরম ভাগবৎ ছিলেন। তিনি সসাগরা ধরার অধীশ্বর। তাঁহার অসীম ঐশ্বর্য্য, অক্ষয় সম্পদ্ ভূতলে অতুল। এতাদৃশ সৌভাগ্য রাজরাজেশ্বরেরও দুর্লভ। কিন্তু সেই ধীর রাজর্ষি ওই সকল বিভব স্বপ্নকল্পিত মাত্র বুঝিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইতেন না, এমন কি আসক্ত পর্য্যন্তও হইতেন না। রাজর্ষি সেই অতুল ঐশ্বর্য্য পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেন যে তাহার সেই ধন-রত্ন-রাশি, সাগরতীরস্থ অনন্তবিস্তৃত বালুকারাশির ন্যায় সুন্দর—সেই সৌন্দর্য্যে কামনা নাই, বাসনা নাই, দর্প অহঙ্কার নাই, মানব-জীবনের অভিসন্ধি

বা উদ্দেশ্যের কলঙ্ক-কালিমা কিছুই নাই; সৌন্দর্য্যে সেই অনন্ত শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমা প্রতি অণু পরমাণু পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিতেছে। অহরহঃ বিষয় লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে বিষয়ের পারগামী ও বিষয়ের অন্তরস্থিত একমাত্র শ্রীবাসুদেবেরই শ্রীপাদপদ্মে পদ্ম-সংলগ্ন সৌগন্ধির ন্যায় তাহার মন সততই সংলগ্ন ছিল। আর সেই বিষয় সেবন দ্বারাই রাজর্ষি মনের সাহায্যে সেই দুর্লভ চরণ-সরোজের অবিকৃত ও নিত্য নূতন সৌগন্ধিরাশি সেবন করিয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তাঁহার হস্ত শ্রীভগবানেরই কর্ম্মে, নাসিকা তদীয় চরণ-সংলগ্ন তুলসীর আঘ্রাণে, জিহ্বা তাঁহারই নামগানে ও শ্রীভগবানে অর্পিত অন্ন আস্বাদনে, তাঁহাতেই অর্পিত থাকিত। চক্ষু বাসুদেবেরই মূর্ত্তি দর্শনে, কর্ণ তাঁহারই গুণানু শ্রবণে, অঙ্গ, তদীয় ভৃত্যবর্গের অঙ্গস্পর্শে তাঁহাতেই অনুক্ষণ অর্পিত থাকিত। তাঁহার প্রজাগণ পর্য্যন্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজ্যে কামনার কোন আশ্রয়-স্থল ছিল না, সেই সান্ত প্রজাগণ শ্রীভগবানের সেবা ভিন্ন স্বর্গও কামনা করিতেন না। প্রজাগণ আপনাদিগকে শ্রীমৎ বাসুদেবের দাসানুদাস মনে করিতে পারিলেই গতাভিমান হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ধন্য জ্ঞান করিতেন ও সাক্ষাৎ আনন্দের ন্যায় বিচরণ করিতেন। তাঁহার রাজ্য বাসন্তী উদ্যানের সুমধুর ঝঙ্কারসদৃশ সতত হরিনামকীর্ত্তনে সুমধুর ধ্বনিত হইত; আর সেই ত্রিদিববাঞ্ছিত সুধাময় নামকীর্ত্তন ও তাহার স্বরলালিত্য, এই প্রপঞ্চের মায়া-আবরণ ভেদ করিয়া সাক্ষাৎ ভগবানকে ভক্তির দ্বারায় যেন বন্ধন ও আকর্ষণ করিয়া শ্রবণপথ দিয়া শ্রোতার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিত। তখন বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষী সকল শ্রীভগবানের জয়ধ্বনিসূচক কলরব করিয়া উঠিত; পশু সকল আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত—স্তনে দুগ্ধ ক্ষরিত হইত। বৃক্ষ সকল ভক্তিপুলকিত কলেবরে শিহরিয়া সর সর শব্দে শ্রীভগবানকে লক্ষ লক্ষ মস্তকে প্রণাম করিবার জন্য শাখা সকল অবনত করিত। এবংবিধ প্রজা ও রাজ্য লইয়া রাজর্ষি নিরন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ব্রতাদি আচরণ করিয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন।

(৩)

আজ কার্ত্তিক মাসের সেই শুভ দ্বাদশী। রাজা ব্রাহ্মণগণের বিধি ও নির্দ্দেশ অনুসারে মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ব্রত আচরণ করিতেছেন। রাজর্ষি এই সকল ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও দ্বৈতজ্ঞানবিবর্জ্জিত। আজি ওই সকল কর্ম্মের মধ্যে একমাত্র শ্রীবাসুদেবকে দর্শন করিয়া ক্রিয়ার

দ্বৈতের আনন্দময় ভাবে বিভোর। শত শত দ্রব্য দেব, দ্বিজ ও অতিথি-গণকে সম্প্রদান করিয়াই শ্রীভগবানেরই চরণ-অমৃত আস্বাদনে দ্রব্যাদ্বৈতের অতুল আনন্দে আনন্দিত। এই ব্রত মধ্যে পূজিত দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের ভক্তি বন্দন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতবুদ্ধি হইয়া ভাবাদ্বৈতের আনন্দময় ভাবে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। রাজর্ষি এই রূপে ব্রত সমাপন করিলেন। তৎপরে রাজর্ষি সেবা ও আতিথ্য দ্বারায় শত শত ব্রাহ্মণ ও অতিথি-গণকে পরিতুষ্ট করিলেন। ঋষিগণকে যে কোটী কোটী সবৎসা গাভী প্রাদন করিলেন তাহাদের সকলেরই খুর ও শৃঙ্গসকল স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্নাদি দ্বারায় সুসজ্জিত। সেই গাভীগুলি অতি সুশীলা ও সদ্‌গুণসম্পন্না। তাঁহারা তপস্যায় অনুগামী সিদ্ধির নায় তপস্বিরূপী রাজার অনুগমন না করিয়া, মূর্ত্তিমান্‌ সাক্ষাৎ তপস্যারূপী ঋষিদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তাহাতেই রাজা অভিমানশূন্য হইয়া ব্রতফলভোগী ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া বিহিত পরম্পরানুযায়ী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সাধারণ-সমক্ষে ব্রত-কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। অম্বরীষের রাজধানী জনপদ প্রান্তর আজ বারাণসীর ন্যায় পুণ্যক্ষেত্ররূপে বিরাজমান; কিন্তু পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতেও মানবগণকেও ব্রাহ্মণ ও ঋষিদিগের পদধূলি কামনা করিতে হয়, কিন্তু এই কামনাশূন্য দেশে ভকত-বৎসল হরি আপামর মানব-গণকে অনুকম্পা প্রকাশ করিবার জন্য অদ্ভুৎ খেলার সৃষ্টি করিলেন। কোটী কোটী গাভী বৎসের সহিত অবিরত ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে, সাধক-শ্রুত হৃদয়ধ্বনির ন্যায় একাগ্রমনের শ্রোতব্য হইয়া আকাশাচ্ছন্ন ধূলিপটলের দ্বারায় গো-ব্রাহ্মণের পদরজে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করত গমন করিতে লাগিল; আর আপামর সেই পদরজঃ অযাচিত ভাবে লাভ করিয়া, রাজার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগী হইয়া, কামনাশূন্য ও বাসনা-শূন্য হইয়া দুশ্ছেদ্য পশু-পাশ হইতে মুক্ত হইতে লাগিল। কোটী কোটী গাভী যেমন মুক্তবন্ধন হইয়া পূর্ণকাম ঋষিদিগের অনুগমন করিতে লাগিল, তেমনই কোটী কোটী মানব সেই আশীর্ব্বাদে ও ঋষিদিগের পদরজে ও রাজার পুণ্যে মুক্তবন্ধন হইয়া রাজার কর্ম্মফলের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ভকতবৎসল শ্রীহরি সেই অপূর্ব্ব শোভা স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া যেন স্বয়ং হৃষ্ট হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দময় ও জ্ঞানময় মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ব্রত সমাপ্ত হইল। এখন ব্রতাঙ্গের পারণা মাত্র অবশিষ্ট। সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও পুরোহিতগণ রাজাকে ব্রতাঙ্গ সম্পূর্ণ করিবার জন্য দ্বাদশীর পারণা করিতে আদেশ করিলেন। রাজা ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া আছেন। আতিথ্য ও দানাদি ক্রিয়াও শেষ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণ রাজাকে পারণা করিতে আদেশ করিলেন। রাজাও পারণার জন্য আসনে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে অগ্নিতুল্য তেজস্বী দুর্ব্বাসা অতিথি হইয়া সেই রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা ভগবান্‌ দুর্ব্বাসাকে দেখিয়া আনন্দে ও ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিলেন এবং আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য সমাদরপূর্ব্বক ঋষির নিকট প্রার্থনা করিলেন। দুর্ব্বসা রাজার সেই মনোমত বাক্যে প্রীত ও সম্মত হইলেন। মহর্ষি তখন রাজাকে কহিলেন, "রাজন্‌! আপনি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন আমি যমুনায় স্নান ও আহ্নিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া এখনই আসিতেছি"। মহর্ষি দুর্ব্বাসা যমুনাতীরে চলিয়া গেলেন। তিনি কোথায় গেলেন আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইতে লাগিল। রাজা অম্বরীষ স্থির হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ রাজার ব্রত শেষ করাইবার জন্য কেবল দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন কেহ কেহ অপূর্ব্বশোভাসম্পন্ন ও যেন অভিনবভাবে অভিব্যক্ত সুনীল আকাশপানে চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণের দয়া ও মহিমার সহিত, আকাশ কেমন সুন্দর-মিশ্রিত তাহাই যেমন আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তৎকালীন ভ্রমর ও মধুমক্ষিকাকুলের মনোরম সংগীত, বৃক্ষ-বল্লরীর মধ্য দিয়া সুদূরশ্রুত বায়ুর উল্লাসধ্বনি ও দূরস্থিত তটিনীর কুল কুল শব্দ যেন সেই ব্রত-সমাপ্তির আনন্দসমাচার ঘোষণা করিবার জন্যই সম্মিলিতস্বরে, পুলকিত কুল-বধূর সন্ধ্যা আরাধনার শঙ্খধ্বনির ন্যায় আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে—কেহ কেহ তাহাই শুনিতেছেন, আবার কেহ কেহ বা সেই স্বভাব-সংগীত শুনিতে শুনিতে আকাশ, শ্রবণেন্দ্রিয় ও স্ব স্ব অস্তিত্ব এই সকলের মধ্যে, কি এক মনোহারিণী শক্তির সুমধুর সংযোজনা ও সংগ্রহ শব্দ-মাত্র উপলক্ষ করিয়া, হৃদয়ে হৃদয়ে, লহরে লহরে মাধুরী বিস্তার করিতেছে, তাহাই একাগ্র অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন কোন কোন সাধু ঋষি যেন আরও অধিকতর আনন্দে নিমগ্ন হইয়া এই ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যে যে সংযোজনা-কারিণী শক্তি আছেন তাঁহার অনন্তলীলা-মাধুর্য্য বুঝিতে

পারিয়া এই প্রাকৃতিক সন্দৌর্য্যের মধ্যে ধ্যাননিরত তাপসের ন্যায় বসিয়া আনন্দমগ্ন ও আপনারই হৃদয়নিহিত ভাবরাশির মধ্যে আত্মহারা।

কিন্তু আর স্থির থাকা যায় না—সকলেই উৎকণ্ঠিত হইলেন। দ্বাদশী গতপ্রায়। দ্বাদশী উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ব্রত সম্পূর্ণ হইবে না, অঙ্গহীন থাকিয়া যাইবে। দ্বাদশীর মধ্যেই রাজাকে পারণা করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিশ্রুত হইয়া, আহ্বান করিয়া, মহাত্মা দুর্ব্বাসাকে অগ্রে পারণ না করাইয়া—সেই ব্রাহ্মণ অতিথির সেবা ফেলিয়া কেমন করিয়াই বা অগ্রে পারণা করেন! এই উভয় সঙ্কটে রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মনে মনে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরিরই শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে আর অর্দ্ধমুহূর্ত্তকাল মাত্র দ্বাদশী অবশিষ্ট আছে। কৈ?—দুর্ব্বাসা আসিলেন কৈ? কেন, দেব দুর্ব্বাসা ধর্ম্মপ্রাণ রাজার ব্রত পণ্ড কর? সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী রাজাকে জলমাত্র সেবন করিয়া ব্রতাঙ্গ সমাপন করিতে আদেশ করিলেন। রাজা তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভগবানে মতি রাখিয়া, সেই অর্দ্ধমুহূর্ত্ত সময় মধ্যে কেবল জলমাত্র সেবন করিয়া ব্রত সমাপন করিলেন; কেন না জলমাত্র সেবন ও উপবাস দুই-ই এক। ইহাতে ব্রতাঙ্গ পুর্ণ হইল ও আতিথ্যজন্য বিহিত উপবাসও অক্ষুণ্ণ রহিল। এইরূপে রাজর্ষি উভয় সঙ্কট হইতে ব্রাহ্মণদিগের বিধান অনুযায়ী উত্তীর্ণ হইলেন।

(৪)

এদিকে মহাত্মা দুর্ব্বাসা স্নানান্তে আতিথ্য গ্রহণজন্য রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা প্রত্যুত্থান করত অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সমাদর করিলেন। কিন্তু সেই ঋষি দুর্ব্বাসা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিবলে বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা তাঁহার অগ্রেই পারণা শেষ করিয়াছেন। তখন অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও সহজে কোপনস্বভাব ঋষি দুর্ব্বাসা ক্রোধে কম্পিতকলেবরে ও অতি রূঢ় স্বরে বলিলেন, "ওরে, মূর্খ! তুই আর কৃষ্ণভক্ত নহিস্; যে হেতু অতিথিকে আহ্বান করিয়া তাহার পূর্ব্বেই স্বয়ং পারণা করিয়াছিস্। তোর এই কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ কর।" রাজা শ্রীভগবানে বুদ্ধি বন্ধনপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছিলেন। দুর্ব্বাসার এতাদৃশ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভগবানেই বুদ্ধি স্থির করিয়া কুপিত ঋষিকে সান্ত্বনা করিবার জন্য রাজর্ষি সুমধুরবাক্যে মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ব্বাসা ক্রোধে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াই স্বীয় জটা ছিন্ন করিয়া তাহাতে এক প্রবল কৃত্যা

কল্পনা করিয়া রাজা অম্বরীষকে বিনাশ করিবার জন্য, সেই প্রবল ব্রহ্মদণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীষণ কৃত্যা, জ্বলন্ত শিখা বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি বর্ষণ করিতে করিতে অম্বরীষের দিকে ধাবিত হইল। রাজা স্থির—অচল, অটল; ভগবানে হৃদয় অর্পণ করিয়া প্রশান্তভাবে মহর্ষির কোপ শান্তির প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রজাবর্গ হাহাকার করিয়া উঠিল! রাণী শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন! পুরোহিতবর্গ কোলাহল করিয়া উঠিলেন। সেই প্রলয়াগ্নির মধ্যে, সেই ব্রহ্মদণ্ডোত্থিত অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে রাজা আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট;—অতি প্রশান্ত, অতি স্থির। তখন রাজর্ষি দেখিলেন একমাত্র ভগবানই জীবের হৃদয়ে, জীবের কর্ম্মে বিরাজমান! "ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থের সত্তা নাই—ব্রহ্মশাপের ও ব্রহ্মদণ্ডের, ভগবান্‌স্বতন্ত্র দ্বিতীয় সত্তা নাই। তখন দুর্ব্বাসাকে আহ্বানোদ্যত হইয়াই যেন রাজা পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। আর হৃদয় মধ্যে যেন বলিতেছেন "ভগবান্, তুমিই সত্য!—তুমিই সত্য!—তুমিই সত্য!" সেই ঘোরতর অগ্নি রাজর্ষিকে গ্রাস করিবার জন্য ভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাজর্ষি স্বীয় পদবীতে স্থির ও অবিচলিত। পূর্ব্ববৎ যুক্তকরে দণ্ডায়মান। হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছে,—"তুমিই সত্য! তুমিই সত্য!" সেই অগ্নিসন্তাপে চতুর্দ্দিক্ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল; যেন আকাশমণ্ডল ও দিক্ সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পশু, পক্ষী; প্রজা, স্বজনবর্গ; দ্বিজ, অতিথি; সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া, ভীত ও ত্রস্ত হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। আর "ওই স্থির রাজর্ষি বুঝি এই মুহূর্ত্তেই ভস্মীভূত হইয়া গেল" এই ভাবিয়া ভীষণ রোদনধ্বনি অতি কঠোর হৃদয়কেও বিচলিত করিল। হে ভগবান্, আজ তোমার ভক্ত তোমার পদে মতি রাখিয়া, অনাথের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে!—ব্রহ্মাগ্নিতে ভস্মীভূত হইবে!—কোথায় ভক্তবৎসল,—অসহায়ের সহায়, দীননাথ! এই প্রজাবর্গের এক মাত্র আশ্রয়তরু, ওই বজ্রাঘাতে নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে;—একবার তোমার দীননাথ নামের সার্থকতা রক্ষা কর—একবার তোমার ভক্তবৎসল নামের মহিমা প্রচার কর!

পাঠক, ওই দেখ ভগবানের আশ্চর্য্য মহিমা।—কে তুমি?—কে তুমি?—কে তুমি?—কোথা তুমি?—কে দয়াময় এই প্রচণ্ড অগ্নিকে অর্দ্ধ পথে অবরুদ্ধ করিলে? একবার দেখা দাও, লক্ষ লক্ষ সতৃষ্ণ নয়ন উর্দ্ধপানে চাহিয়া আছে। কেন এই প্রলয়োদ্যত জ্বলন্ত পাবক অম্বরীষের উপর পতিত না হইয়া, এক করালদর্শন অস্ত্রের উপর পতিত হইল!—সেই ভীষণ অস্ত্রের আকৃতি

চক্রের ন্যায়!—অবিরত ঘূর্ণায়মান! মুহুর্ম্মুহুঃ অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে! ব্রহ্মদণ্ড সেই সুমহান্ সুদর্শন চক্রের উপর পতিত হইয়া নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া গেল! ধন্য ভগবান্! ধন্য ভক্তবৎসল দয়াময়!—তোমার লীলা, অতি দুজ্ঞেয়!—অতি দুজ্ঞেয়!

মুহূর্ত্ত পরে সমবেত দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়াবিষ্ট-নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, ঋষি দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই অগ্নি মূর্ত্তিমান কালের ন্যায় তাঁহার অনুধাবন করিতেছে। আর প্রাণভয়ে ভীত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ ক্রোধ-বিমূঢ় দুর্ব্বাসা পলায়ন করিতেছেন। সেই ঋষির মস্তকোপরি সেই ভীমদর্শন চক্র অবিরত বিঘূর্ণিত হইতেছে। রাজা তেমনি স্থির—তেমনই ঋষি দুর্ব্বাসাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধনেত্রে, প্রার্থনা করিতে করিতে দণ্ডায়মান। দুর্ব্বাসা নক্ষত্র-বেগে ছুটিতেছেন। আর সেই অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান চক্র অসহ্য উত্তাপে দুর্ব্বাসাকে দগ্ধ করিতে করিতে পশ্চাৎ ধাবিত হইল। রাজা তখনও যেন হৃদয়ে ভাবিতেছেন—"তুমিই সত্য! তুমিই সত্য! তুমিই সত্য!" রাজা নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন দুর্ব্বাসা পলায়ন করিতেছেন আর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক করালদর্শন চক্র ধাবিত হইতেছে। রাজর্ষি ভাবিলেন "এ চক্র কে স্মরণ করিল? আমিত স্মরণ করি নাই, তবে কে করিল? অহো! ভগবান্ তুমিই রক্ষক! তুমি সত্য! জগৎ তোমাতেই স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত। জীবের যে মুহূর্ত্তে যাহা প্রয়োজন, দেব, তুমিই সেই মুহূর্ত্তে তৎস্বরূপ হইয়া সৃজন, পালন ও ধ্বংস করিয়া থাক; ইহাতে জীবের চেষ্টা মায়াকল্পিত মাত্র।" রাজা দেখিলেন সমাগত দর্শকমণ্ডলীর শোকাশ্রু এখন আনন্দ-অশ্রুতে পরিণত হইয়া উন্মত্ত প্রবাহিণী যমুনার ন্যায় অবাধে প্রবাহিত হইতেছে। রাজার যুগলনয়ন সেই সমবেদনার পূত অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। কি রাজা কি প্রজা, কি ঋষি কি চণ্ডাল, সকলেরই নয়নে প্রেমাশ্রু দরবিগলিতধারে প্রবাহিত হইল। তখন রাজর্ষি আবার যেন ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়াই বলিলেন "দেব দুর্ব্বাসা, আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন, আমাকে সত্যে সংরক্ষিত করুন, আমি আপনারই আগমনপ্রতীক্ষায়, জলমাত্র সেবন করিয়া রহিলাম।"

(৫)

দুর্ব্বাসা প্রাণভয়ে ভীত, অবিশ্রান্ত ছুটিতেছেন; আত্মরক্ষার জন্য লালায়িত—কেমন করিয়া নিস্তার হয়! পশ্চাতে জ্বলন্ত চক্র প্রতি মুহূর্ত্তে অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। অসহ্য উত্তাপে সর্ব্বশরীর দগ্ধপ্রায়। দুর্ব্বাসা যেখানেই পলায়ন

করেন, সেই অগ্নি উদ্গীরণকারী চক্র সেই খানেই তাঁহার অনুধাবন করে। দুর্ব্বাসা ভূমিতলে প্রবেশ করিলেন, জ্বলন্ত চক্র সেইখানে উপস্থিত হইল। পর্ব্বত কন্দরে লুকাইতে গেলেন, সেখানেও সেই চক্র তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সাগরজলে নিমগ্ন হইলেন, সেখানেও সেই চক্র তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। দুর্ব্বাসা অনন্যোপায় হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন, হায়! সেই অপ্রতিহতগতি চক্র সেখানেও প্রবেশ করিয়া দুর্ব্বাসাকে অসহ্য উত্তাপে দগ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে দুর্ব্বাসা কখন ভূতলে, কখন পাতালে, কখন শূন্যে, অন্তরীক্ষে, কখন বা স্থানান্তরে, এইরূপে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে, নিরন্তর বায়ুর ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন আর প্রচণ্ড অনল যেমন ভ্রমণশীল বায়ুকে উত্তাপে দগ্ধ করে, সেইরূপ চক্রও সেই ভ্রমণশীল ঋষিকে অবিরত দগ্ধ করিতে লাগিল। দিন নাই, রাত্রি নাই, একটী নিমেষের বিশ্রাম বা বিরাম নাই, সেই দগ্ধকারী চক্রের দ্বারায় উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। ঋষি কোথাও আশ্রয় পাইলেন না, অবশেষে তিনি আশ্রয় প্রার্থনায় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার চরণতলে পতিত হইলেন। হায়, সেই অহঙ্কারে মলিনবুদ্ধি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা যথোচিত জ্ঞানগর্ভ বাক্য কহিয়া বিদায় দিলেন আর বলিলেন, "দুর্ব্বাসা, তুমি তোমার আচরণে সেই দ্বন্দ্বাতীত শ্রীবিষ্ণুরই দ্বেষ করিয়াছ;—ও চক্র বিষ্ণুচক্র, আমি কেমন করিয়া উহাকে নিরস্ত করিব?" মহাত্মা দুর্ব্বাসা এই রূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অবশেষে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই মলিনবুদ্ধি ঋষির বুদ্ধি তখনও অহঙ্কারের মোহে এক ভ্রান্তি হইতে অন্য ভ্রান্তিতে মুগ্ধ হইতেছে। সেই পরম করুণাময়, সর্ব্বগুণের অতীত, দয়ার-সাগর মহাদেব তাঁহার এতাদৃশ দুর্দ্দশা দেখিয়া কহিলেন, "তপোধন, তুমি বিষ্ণু-ভক্তের প্রতি দ্বেষ করিয়া ভাল কর নাই—আমার ত্রিশূলেও ওই বিষ্ণু চক্র প্রতিরুদ্ধ হইবে না। তুমি বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষ করিয়াছ। সেই জন্য তোমার এই দুর্দ্দশা। যাও বৎস! নিষ্পাপ-অন্তরে সেই পতিতপাবন হরির চরণতলে আশ্রয় লও; তিনিই তোমার উদ্ধারের উপায় করিবেন।" তখন অনন্যোপায় হইয়া দুর্ব্বাসা স্বীয় কৃতকর্ম্মের অনুশোচনা করিতে করিতে বিষ্ণুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সেই ভীষণদর্শন চক্রও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মস্তকোপরি অগ্নি বর্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হইল।

এদিকে অম্বরীষের অন্তঃপুর একবারে শ্রীশূন্য—শোভা শূন্য। রাণী, উন্মাদিনীর ন্যায় লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, শূন্যনেত্রে আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন

—সে দৃষ্টিতে আশা নাই—সাহস নাই। যাহা যাহা মনুষ্য-জীবনের পরিচায়ক তাহার কিছুই নাই। কেশ রুক্ষ—আলু থালু—যেন অনাথিনী—যেন তপস্বিনী; সমস্ত জীবন কোন নিষ্ঠুর দেবতার পূজায় বিফলমনোরথ হইয়া দুর্ব্বহ জীবন-ভারে অবসন্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে অতিক্ষীণকণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুট ভাষায়, কাতর স্বরে ডাকিলেন "কোথা, দেব দয়াময়! অনাথের নাথ—দীন নাথ! কি কুক্ষণে দ্বাদশী ব্রত করিয়াছিলাম? রাজার বাক্যে সম্মত হইয়াছিলাম? কখন আত্মাভিমান করি নাই, স্বামিপদ চিন্তা ভিন্ন কখন অন্য বাসনা করি নাই। আর আমার প্রভু—আমার স্বামী আহা সেই করুণাময়, মনুষ্যরূপী দেবতা আমার—ভ্রমরের ন্যায় তোমারই পাদপদ্মে মত্ত আছেন। তোমার সেই প্রিয় ভক্ত—আমার প্রাণের দেবতা—অনশনে প্রাণপাত করিতেছেন। ক্ষীর সর নবনীতে যিনি আজীবন লালিত;—জীবনে কঠোরতা যাঁহার সবে মাত্র নূতন। সেই সুষমা কোমলহৃদয় আর কত সহিবে—জলমাত্র সেবন করিয়া আর কত কাল প্রাণ ধারণ করিবেন! দিনের পর দিন চলিয়া গেল, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, ঋতুর পর ঋতু চলিয়া গেল, এই সামান্য জল মাত্র সেবন করিয়া—আর ভরসা নাই, আর সাহস নাই; আর আশা নাই। দুর্ব্বাসা, তোমার কর্ম্মে বিধাতার এত লেখা লুক্কায়িত ছিল!—কেন দেব তোমার নয়ন-অনলে প্রথমেই আমি ভস্মীভূত হইলাম না?—এই জলটুকু দেখিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে!—জল?—না না এ জল নয়—প্রাণরক্ষাকারী অমৃত—কোথায় বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদন, এই প্রাণসঙ্কটে একবার মুখ তুলিয়া চাও; তোমার দয়ায় যেন এই জল অমৃততুল্য হইয়া আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করে। মা সাবিত্রি, যদি এ জগতে তোমরা সতীত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাক—এখনও যদি এ জগতে সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়োজন থাকে—যদি একান্তমনে স্বামি-সেবা করিয়া থাকি, তবে মা তোমার দয়ায় তোমার প্রসাদে এই জল যেন অমৃতরূপে আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করে। হে পঞ্চ-কন্যে, তোমরা যদি স্বামি-সেবার দ্বারায় স্ত্রীজাতীর মর্য্যাদা কখন রক্ষা করিয়া থাক, তবে যেন আমার শক্তি—আমার পরমায়ু—আমার ইন্দ্রিয়সামর্থ্য তোমাদের দয়ায় তোমাদেরই সতীত্বে ও পুণ্যে আমার স্বামি-সেবার জন্য যথার্থ অর্পণ করিতে পারি। আর এই জল—কয়েক ফোঁটা মাত্র জল—মা তোমাদের আশীর্ব্বাদে অমৃত হোক্, অমৃত হইয়া আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করুক।" অতি কষ্টে রাণী এইরূপে কিঞ্চিৎ বল সঞ্চার করিয়া ধীরে ধীরে জলপাত্র লইয়া অম্বরীষের নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাজা যুক্ত-করে নির্নিমেষ নয়নে দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দেখিলেন রাণী তাঁহার পারণার জল মাত্র লইয়া দণ্ডায়মানা। রাজা বলিলেন "প্রিয়ে, দুর্ব্বাসা 'ত' আইসেন নাই?—আমি অন্যমনস্ক ছিলাম—তিনি আসিয়া আবার বিমুখ হইয়া যান নাই 'ত'?

রাণী। প্রভু, প্রকৃতিস্থ হউন, ঋষি দুর্ব্বাসা কি জীবিত আছেন?—তাঁহার পশ্চাৎ কালের মত যে অগ্নি ও চক্র—"রাণী আর বলিতে পারিলেন না, রোদন করিতে লাগিলেন।"

রাজা। রাজ্ঞি, তুমি অতি অবোধ, ব্রহ্মহত্যা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। প্রিয়ে, আমাদের এই ব্রতে ব্রহ্মহত্যা হইবে?—এ মিথ্যা কল্পনাও পাপ।

রাণী। ভগবান্ না করুন; কিন্তু দেখুন দিনের পর দিন চলিয়া গেল, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, কিন্তু দুর্ব্বাসা ফিরিলেন কৈ?—আজ এক বৎসর পূর্ণ হইবে। প্রভু, অনুজ্ঞা করুন আরও কত কাল জলমাত্র সেবন করিয়া প্রাণ ধারণ করিবেন। আমি অল্প-বুদ্ধি, আপনার দাসী, আপনি পুরোহিতগণের সহিত পরামর্শ করুন—আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—প্রতি ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়িতেছে—আমার অন্তিমকালের বোধ হয় আর বেশী বিলম্ব নাই—নাথ, আমার পরমায়ু আপনাকে অর্পণ করিয়া যেন—

রাজা। রাজ্ঞি স্থির হও, ক্ষণমাত্র অপেক্ষা কর। ঋষিদের পারণার কাল এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই,—মহর্ষি দুর্ব্বাসা এখনও আসিলে আসিতে পারেন। চারুশীলে, স্থির হও, ভয়ের কোনও কারণ নাই। যে ভগবান্ সীতাদেবীকে অমৃত পান করাইয়া স্বীয় মহিমা জগতে প্রচার করিলেন, সেই ভগবান্ অমৃত-রূপে জলমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন, যে ভগবান্ বায়ুতে অধিষ্ঠিত হইয়া সমাধিমগ্ন যোগীদিগের দেহ প্রাণ ইত্যাদি সতত রক্ষা করিতেছেন, সেই ভগবান্ এই জলমধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তোমার ও আমার প্রাণ রক্ষা করিবেন। রাজ্ঞি! ধৈর্য্য ধর, আমরা ভগবানেরই সুকোমল কোলে রহিয়াছি। স্থির হও। যে ভগবান্ মৃত্তিকা মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বল্মীক-স্তূপের মধ্যে সমাধি-প্রাপ্ত বাল্মীকির প্রাণ রক্ষা করিলেন, তিনিই এই ভূতলে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের দেহ, প্রাণ, মন, ধর্ম্ম, সত্য সকলই রক্ষা করিবেন।

রাণী। না, প্রভু, বোধ হয় সেই দুর্ব্বাসা কোথাও হত-চৈতন্য হইয়া পতিত হইয়া থাকিবেন; তাই আমার ইন্দ্রিয় সকল এত বিকল—প্রতি অঙ্গ প্রাণহীন হইয়া আসিতেছে। মৃত্যু সন্নিকট হইতেছে—

রাজা দেখিলেন রাণীর প্রতি অঙ্গ অবশ হইতেছে—চক্ষু নির্জীবের ন্যায় স্থির—রাজা বিচলিত হইলেন না, স্থিরচিত্তে ঘটনা-স্রোতের গতি দেখিতে লাগিলেন।

রাণী। "ওই দেখ—ওই দেখ রাজন্—আমি কি দেখিতেছি—ওকে?—আমি—আমি—ওই দেখ রাজন্ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল!—তাহার উপর একটী কার মূর্ত্তি?—দুর্ব্বাসা?—দুর্ব্বাসা?—না—ওযে আমি—আমি—আমার চিতাগ্নি—আহা! অগ্নি এত শীতল!—" রাজা দেখিলেন দুর্ব্বল রমণী মানসিক বিকারে স্বপ্ন দেখিতেছে। কহিলেন 'রাজ্ঞি! স্থির হও—স্থির হও! যে ভগবানকে অগ্নি-মধ্যে দেখিতে পাইলে অগ্নিও শীতল বলিয়া অনুভব হয়, সেই ভগবানের কৃপায় প্রকৃতিস্থ হও—ওই দেখ রাজ্ঞি—ওই দেখ রাজ্ঞি তোমার স্বপ্ন সত্য হইয়াছে।"

রাণী। "দুর্ব্বাসা!—দুর্ব্বাসা!—জল নয়, অমৃত নয়, প্রাণ নয়, পরমায়ু—নয়,—দুর্ব্বাসা কৈ?—ভগবান্ দুর্ব্বাসা কৈ?—দুর্ব্বাসা—দুর্ব্বাসা—"

রাজা। রাজ্ঞি! প্রকৃতিস্থ হও!—ওই দেখ—চাহিয়া দেখ—দুর্ব্বাসা আসিতেছেন। এই কথা বলিতে বলিতে সেই ভীষণ উত্তাপে দহ্যমান ঋষি একেবারে রাজর্ষি অম্বরীষের চরণ-তলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিলেন।

রাজা। দেব—দেব—দুর্ব্বাসা—ক্ষমা করুন—আতিথ্য গ্রহণ করুন।

দুর্ব্বাসা। রাজন্! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনি বিষ্ণুভক্ত। আপনার প্রতি যে আচরণ করিয়াছি তাহাতে ত্রিলোকে কোথায় আশ্রয় পাইলাম না। স্বয়ং বিষ্ণুও আমায় আশ্রয় দিলেন না; তাঁহার আদেশমত আমি আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। এই ভীষণচক্র হইতে আমায় নিস্তার করুন—আপনিই এই চক্র নিরস্ত করিতে সমর্থ।

রাজা সেই মহাত্মা দুর্ব্বাসাকে এতাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন ও দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইবার পূর্ব্বেই সেই চক্রের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া সুদর্শন চক্র নিরস্ত হইল।

দুর্ব্বাসা সরল অন্তঃকরণে রাজার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন ও উভয়ে এক সঙ্গে বসিয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া পারণাক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রাণীর দুই চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল ও শ্রীভগবানের আশ্চর্য্য মহিমা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ শত শত নমস্কার করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

"দিশেহারা—"

———

হরিদ্বার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হরিদ্বারের প্রতিষ্ঠান সমূহ।

হরিদ্বার বেদ বেদান্ত ও শাস্ত্র চর্চ্চার একটী প্রধান স্থান। এখানে অনেকগুলি সংস্কৃত পাঠশালা ও বেদ-বিদ্যালয় আছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ সদাচারবান্, সদনুষ্ঠান-নিরত অকপট এবং ভজন-পরায়ণ। তাঁহাদের সহিত সদালাপে পরম আনন্দ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মুনি-মণ্ডল মহাবিদ্যালয়, বাল ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা, ঋষি-কুল বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। যাঁহারা প্রাচীন আদর্শের শিক্ষাপ্রণালীযুত এবং সদাচারপূত, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্রহ্মচারী দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এইগুলি দেখা কর্ত্তব্য। কনখল অভিমুখে যে রাজপথ গিয়াছে; উক্ত রাজপথের দক্ষিণ পার্শ্বে বাল ব্রহ্মচারি-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটী অবস্থিত। সুন্দর পুষ্পোদ্যান মধ্যে অধ্যাপনা-মন্দির ও ছাত্রাবাস। প্রাঙ্গণে একটী যজ্ঞ-বেদী। বাল ব্রহ্মচারীর বয়স অশীতি বর্ষের ন্যূন নহে; কিন্তু দেখিলে মনে হয় প্রৌঢ় বয়সে কেবল উপনীত, তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভ; তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ হইতে যেন তপস্যার জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। তিনি স্বয়ং অকৃতদার, তিনি ইচ্ছা করেন যাঁহারা পণ্ডিত বা সাধক তাঁহারা সকলেই অকৃতদার হইয়া থাকেন; বিবাহিত লোকের উপর তিনি একটু চটা; অনেক রাজা ও ধনী তাঁহার ভক্ত; ব্রহ্মচারী নানা স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি এক একজন অধ্যাপককে মাসিক ২৫, ৩০৲ টাকা বৃত্তি দেন। নিযুক্তকালে তাঁহারা অবিবাহিত কি বিবাহিত তাহা বলেন না; পরে দুই এক মাস পরে গলির মধ্যে এক তালা ঘর খোঁজেন। ব্রহ্মচারী বলেন "তোমরা বেদবেদান্ত পড়িয়া পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইয়াছ, তোমরা কেন রমণীর দাসত্ব কর? তোমরা বৃত্তি লও—খাও, খেলো ও "মৌজমে রহো"। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মচারীর আশ্রমটী বড় শান্তিময়, নিকটে লোকালয় নাই, পূর্ব্বদিক্ দিয়া ভাগীরথী কুলকুল ধ্বনী করিয়া দ্রুত গমন করিতেছেন, পাঠশালায় বসিয়া গঙ্গা-প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিদ্বারের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দর্শনযোগ্য বিদ্যালয়, আর্য্য সমাজীদের গুরুকুল। গুরুকুল একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার। ভীষণ দুর্গম জঙ্গল

পরিষ্কার করিয়া বিস্তৃত বিদ্যালয়, মন্দির, খেলার মাঠ, ছাত্রাবাস, পুস্তকাগার, উদ্যান, শিল্পালয়, চিকিৎসালয়, গোশালা, ছাপাখানা, গুরুকুল সমাচার ও Vedic Magazine নামক মাসিক পত্রের কার্য্যালয়, অধ্যাপক ও ছাত্রসমিতির গৃহগুলি বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। আর্য্যসমাজীদের এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে গবর্ণমেণ্টের বা কোন রাজা মহারাজার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। গুরুকুলের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা মুন্সী রাম নিজের অতুলনীয় অধ্যবসায়ে মধ্যবিত্ত অবস্থার আর্য্যসমাজীদের দানে এই সুবৃহৎ বিদ্যালয় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর্য্যসমাজীর সংখ্যা ৯২৪১৯ মাত্র [১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে]। তাঁহাদের মধ্যেও দুইটী শাখা,—একটী আমিষাশী ও অপরটী নিরামিষাশী। গুরুকুলের প্রতিষ্ঠাতারা নিরামিষাশী। মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের চেষ্টায় যে এত বড় একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

কনখল হইতে মাইল দুই গঙ্গার চড়া এবং উপলখণ্ডের উপর দিয়া চলিয়া পারঘাটার নৌকায় (ভাড়া ৴৫) গঙ্গা পার হইয়া মাইল ২।৩ কাশবনে (Tiger grass) হাঁটিয়া আসিলেই গুরুকুলে পৌঁছান যায়। এ স্থানের নাম কাঙ্গরী। কোন দর্শক উপস্থিত হইলেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা সযত্নে দেখাইয়া থাকেন এবং অতিথিসৎকার করিয়া থাকেন। তিন দিকে ঘন জঙ্গল, এক দিকে পার্ব্বত্য নদী কল কল রবে প্রবাহিত। গুরুকুলের প্রাকৃতিক দৃশ্যও বড় মনোরম।

গুরুকুলের উদ্দেশ্য—আমাদের প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্য্য প্রণালীর এবং গুরুগৃহে শিক্ষার পুনঃ প্রবর্ত্তন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই ভারতবর্ষ উৎসন্ন যাইতেছে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই আশ্রমের ব্রহ্মচারিগণ সংযত, সবল, বেদজ্ঞ ও ত্যাগী হইয়া ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার প্রকৃত ব্রাহ্মণের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁহারা এক দিকে বেদ বেদান্ত, সংস্কৃত কাব্য, দর্শন অধ্যয়ন করিবেন, অন্যদিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস হিন্দী ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা করিবেন। ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্প্রতি 'কীণ্ডার গার্টেন' প্রণালীর প্রবর্ত্তন হইয়াছে; এবং বিজ্ঞান শিক্ষা আলোচনার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার (Laboratary) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারিগণ ড্রিল, ফুটবল, ক্রিকেট খেলা ও অশ্বারোহণ ও নানারূপ ব্যায়াম করিয়া থাকেন। নয় বৎসর বয়সে উপনয়ন হইলে বালক গুরুকুলে প্রবেশ করে, এবং ২৪ বৎসর

বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে ফিরিয়া যায়। এই কয় বৎসর ছাত্রগণ বাটী যাইতে পায় না এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে বাধ্য হয়।

ছাত্রগণকে বোর্ডিং চার্জ্জ ও স্কুলের বেতন দশ পনেরো টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়। রন্ধনশালার কার্য্য ছাত্রগণই করিয়া থাকেন।

ছাত্রগণের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী এইরূপ—

প্রাতে ৪ কি ৪৷৷০ ঘটিকার সময় আশ্রমস্থ ঘণ্টানিনাদে ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ শয্যা ত্যাগ করত শৌচাদি করিয়া ব্যায়াম ও ড্রিল করেন। ব্যায়ামান্তে গঙ্গাস্নান করত ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে বৈদিক সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শাস্ত্রীয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়। তাহার পর দুগ্ধ পান করিয়া ৬-১৫ মিঃ হইতে ১০৷৷টা পর্য্যন্ত পাঠাগারে অধ্যয়ন করিতে হয়। অতঃপর নিরামিষ আহারান্তে ২-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত বিশ্রামের সময়। ২-৪৫ মিঃ হইতে ৫-১৫ মিঃ পর্য্যন্ত পুনরায় অধ্যয়ন করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে অধ্যয়নের সময় ২।১ ঘণ্টা কম হয়। বৈকালে কিছুক্ষণ ক্রীড়া ও ব্যায়ামের পর সন্ধ্যার সময় আবার আহ্নিক, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সমাধা করিতে হয়। নৈশ আহারের পর ছাত্রগণ দিনের পাঠ আবৃত্তি করেন। রাত্রি ৯ ঘটিকায় ঘুমাইবার সময়। ছাত্রগণকে দৈনিন্দন কার্য্যলিপি রাখিতে হয়। তাহা শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া থাকে। গুরুকুলের পুস্তকালয়ে ৬০০০ হাজারের অধিক পুস্তক আছে। এখান হইতে একটী সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা "গুরুকুলসমাচার" ও Vedic Magazine নামক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গুরুকুলে সংস্কৃত-উৎসাহিনী সভা, হিন্দী-সাহিত্যপরিষদ্ এবং অধ্যাপকসভা আছে। সংস্কৃত-উৎসাহিনী সভার ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। হিন্দী-সাহিত্যপরিষদে হিন্দী ভাষায় ভাল গ্রন্থ লিখিবার ও হিন্দীসাহিত্যের উন্নতি ও নাগরী অক্ষর দেশে প্রচারের চেষ্টা হয়। তাঁহারা বলেন হিন্দীই ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানের ভাষা, সুতরাং comman language ; ইহার বহুল প্রচারে ভারতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। গুরুকুলে একটী তাঁত খোলা হইয়াছে। ব্রহ্মচারিগণ তাহার প্রস্তুত কাপড়ই ব্যবহার করেন। গোশালার দুগ্ধ এবং বাগানের তরকারী ফলমূল ব্রহ্মচারিগণ আহার করেন। এক কথায় গুরুকুল একটা ক্ষুদ্র উপনিবেশস্বরূপ। আশ্রমটী নিজেই নিজের প্রায় সমস্ত ভার বহন করিয়া থাকেন।

জ্বালাপুরে গুরুকুলের একটী শাখা আছে। মূল গুরুকুলে প্রায় ২৷৷০ শত

ছাত্র, তন্মধ্যে অধিকাংশই পঞ্জাবী। বাঙ্গালী যে কয়জন আছেন তাঁহারাও পাকা পঞ্জাবী বনিয়া গিয়াছেন। ছাত্রেরা যোধপুরী breeches (পাতলুন ; পড়িয়া অশ্বারোহণ করে, আবার সচরাচর কাছা খোলা অবস্থায় থাকে এবং যজ্ঞশালায় হবন (হোম) করে। সকলেই জানেন আর্য্যসমাজ দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন। কিন্তু বেদের 'সায়নাচার্য্য' 'মহীধর' প্রভৃতি প্রাচীন ভাষ্যসঙ্গত অর্থ তিনি স্বীকার করিতেন না। নিজ বুদ্ধি বলে ও অলৌকিক ব্যাকরণ জ্ঞানের প্রভাবে নিজেই বেদের একরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারেই আর্য্যসমাজীরা চলিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবতা পুরাণ তন্ত্র স্মৃতি মানেন না! হিন্দুসমাজের আচার অনুষ্ঠান, জাতিভেদ, মূর্ত্তি পূজা মানেন না। বেদের যে স্থলে জাতিভেদ. মূর্ত্তি পূজা প্রভৃতির কথা আছে, তাঁহারা সেগুলি বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলেন। অথবা তাহার বিকৃতার্থ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু ইঁহারা পুরাণ, তন্ত্র এবং স্মৃতি-প্রোক্ত কর্ম্মকাল মানেন না। এবং তাঁহারা একেশ্বরব'দী ; কতকটা ব্রাহ্ম-সমাজের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস। তাঁহারা বৈদিক যজ্ঞ করেন বটে, তবে বলেন যে ইহাতে কোন দেবতা তৃপ্ত হয় না। ধূম প্রচুর পরিমাণে উত্থিত হইলেই মেঘ হয়, মেঘ হইতেই বৃষ্টি, ইহাই হবনের উদ্দেশ্য।

নিম্নশ্রেণীর উত্তোলন ও মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতিকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ইঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। এই শেষোক্ত প্রকরণটির নামই শুদ্ধিকরণ। পূর্ব্বে যে সমস্ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের জল চলিত না, আর্য্যসমাজে আসিয়া তাহাদের জল চলিতেছে। তাঁহারা তীর্থাদির ও মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন ; এবং সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানেন না।

গুরুকুলের আদর্শে সনাতনধর্ম্মাবলম্বীরা "ঋষিকুল বিদ্যালয়" নামক যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা হিন্দুর অবশ্য দর্শনীয়। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে জ্বালাপুর রোডের উপর, হরিদ্বার ষ্টেসনের অনতিদূরে ঋষিকুল আশ্রমটী স্থাপিত। তত্রত্য ব্রহ্মচারী বালকগণকে দেখিলে প্রাচীন-কালের ঋষিদের আশ্রমের কথা মনে পড়ে। এখানে গুরুকুলের ন্যায় বিলাতীভাবের লেশমাত্র নাই। ঋষিকুলের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদান্ত ও কর্ম্মকাণ্ডনিপুণ ঋষিকুমার প্রস্তুত করা,—যাহাতে তাঁহারা প্রাচীন প্রথায় সুশিক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষে সনাতনধর্ম্মের আদর্শ প্রচার করেন। অষ্টম বর্ষ হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক

বালক উপনীত হইয়া এই আশ্রমে প্রবেশ করিবেন ; এবং ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া পাঠ সমাপন করত বৈদিকপ্রথানুসারে সমাবর্ত্তন করিবেন। পাঠ্যাবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনীয় হেতু ভিন্ন ব্রহ্মচারিগণ গৃহে যাইতে পান না ; এবং মাতা ও সহোদরা ভিন্ন অন্য স্ত্রীর মুখ দর্শন করিতে পান না। ইচ্ছা করিলে ৭ম শ্রেণীর পণ্ডিতপরীক্ষা দিয়া ছাত্রগণ সমাবর্ত্তন করিতে পারেন। এই দ্বাদশ বৎসরে সমগ্র ব্যাকরণ, যজুর্ব্বেদ, কাব্য, স্মৃতি, জ্যোতিষ, পুরাণ, দর্শনশাস্ত্র ও ম্যাট্রিকুলেশন-পাঠ্য ইংরাজী ভাষা এবং অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল এবং সংস্কৃত রচনা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, তাঁহারা ষড়ঙ্গ বেদ বেদান্ত, দর্শন, সাহিত্যে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হয়েন। প্রথমতঃ হরিদ্বারের পাণ্ডা ও বণিক্গণের উদ্যোগে নৈনিতালের বিখ্যাত পণ্ডিত দুর্গাদাস পন্থ মহাশয় ইহা ক্ষুদ্রাকারে স্থাপিত করেন। পরে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম দেশবাসীর সাহায্যে উহা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রেজিষ্টারী হয়। কলিকাতার মারওয়ারীগণ ইহার প্রধান সহায়ক। তাঁহারাই ইহার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে এক সুপ্রসিদ্ধ পান্নালাল মুরারকা মহাশয়ই ২১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। সংপ্রতি ইহার বাৎসরিক ব্যয় ৩০ হাজার টাকা এবং ব্রহ্মচারীর সংখ্যা ১৫০ শতেরও অধিক। ছাত্রগণের নিকট কোনরূপ বেতনাদি লওয়া হয় না ; আশ্রমই ছাত্রদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারিগণের পিতা বা অভিভাবকগণ ব্রহ্মচারিগণকে কোনরূপ অর্থাদি দিতে পারিবেন না। ব্রহ্মচারি-গণের দৈনন্দিন জীবনযাপনপ্রণালী,—এইরূপ প্রাতঃ ৪টা হইতে ৬॥ পর্য্যন্ত শৌচ, স্নান, সন্ধ্যা ও যজ্ঞশালার সমিদাধান। ৬॥টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন, ৮—১০ পাঠশালার অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন। ১০—১২ ভোজন ও বিশ্রাম। ১২—২ পাঠাভ্যাস। ২—৫ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। ৫—৬॥ ক্রীড়া, ব্যায়াম ও ভ্রমণ। ৬॥—৮ শৌচ, সন্ধ্যা, সমিদাধান। ৮—৯ ভোজন। ৯—১০ অভ্যাস ; পরে দুগ্ধপানান্তর শয়ন।

ঋষিকুলেও ছাত্র-সভা ও অধ্যাপক সভা আছে, এবং ইহারও মহাসমারোহে গঙ্গা দশহরার সময়, পঞ্চ দিনব্যাপী সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে, এই সময় ঋষিকুলের হিতৈষী ও ট্রষ্টীগণ একত্রিত হইয়া ঋষিকুলে বিধি ব্যবস্থা আয় ব্যয় নির্দ্ধারণাদি করিয়া থাকেন। গত সন দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বাহাদুর এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান বৎসরে দেশপূজ্য পণ্ডিত

মদনমোহন মালব্য মহোদয় এই সাম্বৎসরিক মহোৎসবের সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং ভারতের নানা প্রদেশের পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। আমরা এই ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। ব্রাহ্মণ বালকগণ শুভ্র বর্ণের, ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণের ও বৈশ্যগণ হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। সকলেরই মুণ্ডিতমস্তক; এবং সকলেরই মুখে সরলতা ও সৌম্যতার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব যে কত উন্নত তাহা ইহাদিগকে দেখিলেই বুঝা যায়। ইঁহারা অধিষ্ঠাতার আজ্ঞা ভিন্ন কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে পারেন না। এবং ভূষণ, পুষ্প, মাল্য, চন্দন, ছত্র, দর্পণ, উপানৎ আদি ব্যবহার নিষিদ্ধ। প্রত্যেক নিবাস-গৃহেই এক একজন অধিষ্ঠাতা আছেন। অধিষ্ঠাতা মহাশয়ের আদেশানুসারে ব্রহ্মচারী বালকগণের সুমধুর বৈদিক সুরে "গঙ্গালহরী" স্তোত্র আবৃত্তি শুনিয়া, আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। বৈদিক সুরের কি প্রাণোন্মাদিনী ও উর্দ্ধগামিনী শক্তি তাহার আভাস পাইলাম। প্রাতে অপরাহ্নে যখন ইঁহারা গঙ্গার ক্যানেলের তীরে সন্ধ্যা বন্দনা করিতে সমবেত হয়েন, তখন যে অপূর্ব্ব শোভার উদয় হয় তাহা বর্ণনাতীত।

ঋষিকুলের উদ্দেশ্য মহান্। ভারতবর্ষে বোধ হয় ইহাই একমাত্র বিদ্যালয় যথায় সনাতনধর্ম্মানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু অর্থাভাবে অনুষ্ঠাতারা এখনও তাঁহাদের সংকল্পিত সকল ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে নাই। হিন্দুর দান নিত্য কর্ত্তব্য এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কার্য্যেও হিন্দু-সন্তানগণ আজিও প্রচুর দান করিয়া থাকেন। সকলেই যদি দান করিবার সময় ঋষিকুলকে স্মরণ করেন, তবে ঋষিকুল অচিরেই উন্নতি প্রাপ্ত হইবে। মায়াপুরী মাহাত্ম্যে আছে "বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দান করাই উচিত।" সুতরাং তীর্থযাত্রিগণকে অনুরোধ তাঁহারা যেন হরিদ্বারে গিয়া যথাসাধ্য ঋষিকুলে দান করেন। বিদ্যাদানের ন্যায় দান নাই; এবং ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম নাই। সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপরই নির্ভর করিতেছে। আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠা ভিন্ন সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি কদাচ সম্ভব নহে। ঋষিকুলের প্রতিষ্ঠাতাগণের ইচ্ছা আছে যে, কালে তাঁহারা বানপ্রস্থাশ্রমের ও সন্ন্যাসাশ্রমের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। কতিপয় গৃহনির্ম্মিত হইবে যাহাতে ধার্ম্মিক গৃহস্থগণ শাস্ত্রানুসারে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া, এই আশ্রমে থাকিয়া, বানপ্রস্থ ধর্ম্মাচরণ করিবেন; এবং বিদ্বান্ সন্ন্যাসিগণ এখানে ত্রিরাত্রি বা চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিবেন। হরিদ্বারের তীর্থযাত্রীর পক্ষে

ঋষিকুল দর্শন এবং তথায় সাধ্যানুসারে দান অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা দর্শন করিলে প্রাচীন ভারতের ঋষি-আশ্রমের কথা মনে পড়িবে।

কেহ সম্পূর্ণ ব্যয়ে গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেও তাহাতে দাতা ইচ্ছা করিলে তাঁহার বা তাঁহার পিতৃ-পিতামহের নামযুক্ত স্মারকলিপি সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়।

হরিদ্বারের আর একটী উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান কনখলের "রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম।" পরমহংসদেবের শিষ্যগণ অনাথ আশ্রয়হীন পীড়িত ব্যক্তিগণকে সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য এইরূপ সেবাশ্রম বৃন্দাবন, কাশী ও কনখল প্রভৃতি নানা স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। "দরিদ্র নারায়ণের" সেবাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। জীব-সেবার ন্যায় মহৎ-ধর্ম্ম আর কি আছে? পূর্ণ ভগবান্ই জীবরূপে ও জগৎরূপে লীলা করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলিতেন "ঐ যে, অনাথ দরিদ্র বা কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত দেখিতেছ, মনে করিও না তাঁহাকে দুই চার পয়সা দিয়া তুমি তাঁহাকে অনুগ্রহ করিলে। তোমার হৃদয়ে দয়াধর্ম্মের উদ্রেকের জন্য নারায়ণই দরিদ্র অনাথ এবং ঘৃণ্য ব্যাধিগ্রস্তের রূপে আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য তোমার হৃদয়ে দয়া করুণা প্রভৃতির সদ্গুণের উদ্রেক করিয়া তোমাকে মুক্তিপথে অগ্রসর করেন"। ভাগবতেই আছে,—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥

ঈশ্বরই জীবরূপে প্রতিভাত। সুতরাং যেখানে দরিদ্র রুগ্ন অনাথ দেখিবে, যেখানে কাহারও অশ্রুপাত হইতেছে, সেই খানেই ভগবৎ-বুদ্ধিতে তাঁহার সেবা করিবে। দরিদ্র দুর্ব্বল পীড়িত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের পূজা করেন।

রামকৃষ্ণমিশনের সন্ন্যাসিগণ এই মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে এক্ষণে সেবাশ্রমের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ১১।০ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬৯৭৪ জন নিরাশ্রয় রুগ্নের চিকিৎসা হইয়াছে, এবং ৯৪৫ জনকে আশ্রমের হাঁসপাতালে রাখা হইয়াছে। সাধারণের প্রদত্ত ভিক্ষালব্ধ অর্থ হইতেই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসিগণ এরূপ যত্ন সহকারে সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া থাকেন যে, অনেক রোগীই গবর্ণমেণ্টের

হাঁসপাতালে না গিয়া, মিশনের আশ্রমে গিয়া থাকেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের কার্য্যের বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দকে একটী দিল্লী-দরবার-মেডেল ১৯১২ সালে প্রদান করিয়াছেন, এবং হরিদ্বার মিউনিসিপ্যালিটী মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছেন।

আশ্রমের কার্য্যক্ষেত্র আরও প্রসারিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনায়, কর্তৃপক্ষ আরও গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কারণ মেলার সময় হরিদ্বারে বহু লোকের সমাগম হয়, এবং বর্দ্ধিত সংখ্যক রোগীর সেবা স্থানাভাবে করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তাই ইঁহারা আরও গৃহ নির্ম্মাণার্থ ভিক্ষার প্রার্থী হইয়াছেন। সকল ভারতবাসীর উচিত,—অর্থ সাহায্য করিয়া এই মহান্ সেবাধর্ম্মের সহায়তা করা। আগামী এপ্রেল মাসে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইবে, সেই সময় তথায় বহু লক্ষ ব্যক্তির সমাগম হইবে; রুগ্ন ব্যক্তির সংখ্যাও প্রচুর হইবে। বর্ত্তমানে মাসিক আশ্রমের ব্যয় দুই শত টাকার উপর। আশ্রমের কার্য্য প্রধানতঃ দাতাগণের অনিশ্চিত এক কালীন দানের উপর নির্ভর করিতেছে। কুম্ভমেলার সময় প্রচুর টাকার প্রয়োজন, সুতরাং সকলকেই করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন এই সময় যথাসাধ্য এই সেবাশ্রমে দান করেন। যাঁহারা এইরূপ দান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন উহা স্বামী কল্যাণানন্দ, পোষ্ট্ কনখল "রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম" এই ঠিকানায় টাকা পাঠান।

সেবক ও সন্ন্যাসিগণ সকলেই অবিবাহিত, শান্তমূর্ত্তি, সুশিক্ষিত এবং ভজনপরায়ণ। ইঁহারা সকলেই সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া আশ্রমের কার্য্যে প্রাণ ও মন নিয়োজিত করিয়াছেন।

হরিদ্বার ভারতপ্রসিদ্ধ তীর্থ, এখানে ভারতের সর্ব্বস্থান হইতেই যাত্রিগণ সমবেত হইয়া থাকেন। কত পীড়িত-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, কত দরিদ্র গৃহহীন তীর্থযাত্রী, ইঁহাদের কৃপায় রোগমুক্ত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বামী বিবেকানন্দের যে সকল মূলমন্ত্রের উপর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তাহার দুই একটী উদ্ধৃত করিতেছি। সকলেরই ইহা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করা আবশ্যক।

Sympathy for the poor, the down trodden, even into death this is our motto" for us its not to pity but to serve; ours is not the feeling of compassion, but of love, of the feeling of Self in all.

I see there are poor, because it is of my salvation, I will go to worship them, God is there. Some here are miserable for your and my salvation, so that we way serve the Lord, coming in the shape of deserved, coming in the shape of enratic, the leper and the sinner.

The life is short, the vanities of the world transient; but they alone live, who live for others, the next are more dead than alive.

Do you love your fellowmen? Where go to see for God. Are not all the poor, the miserable, the weak Gods? why not worship these first? Why go to dig a well on the banks of the Ganges.

"দরিদ্রের জন্য, পীড়িতের জন্য জীবনান্ত সমবেদনা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।" অপরের দুঃখ দেখিয়া কেবল দুঃখ করা আমাদের ধর্ম্ম নহে, সেবা করাই আমাদের ধর্ম্ম। দয়ার অনুভবই আমাদের ধর্ম্ম নহে, পরন্ত সর্ব্বজীবে প্রীতি ও সমদর্শনই আমাদের ধর্ম্ম।

"ঐ যে, দেখিতেছি কতকগুলি দরিদ্র রহিয়াছে উহারা তোমার আমার মুক্তির জন্য জীবন ধারণ করিতেছে। আমি তাহাদের নিকট গিয়া পূজা করিব। কারণ ভগবান্ তাহাদের মধ্যে আছেন। এখানে যে কতকগুলি দুর্ভাগ্য জীব তোমার আমার মুক্তির জন্যই অবস্থিতি করিতেছে, কারণ যাহারা পীড়িত কুষ্ঠাদি ব্যাধিগ্রস্ত পাগল বা পাপী, তাহাদের সেবা করিয়া আমরা জগদীশ্বরের সেবা করিতে পারি। জীবন ক্ষণস্থায়ী, পার্থিব-গর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিলীন হয়। যাঁহারা পরের জন্য জীবন ধারন করেন, তাঁহারাই জীবিত; এতদ্ভিন্ন লোক জীবিত নহে—মৃত।

"তুমি কি মানুষ ভালবাস? তাহা হইলে কেন তুমি পরমেশ্বরের অন্বেষণে (এখানে সেখানে) গমন কর। এই সমস্ত দরিদ্র, এই সমস্ত দুর্ভাগ্য, এই সমস্ত দুর্ব্বল, ইহারা কি ভগবান্ নহে? কেন তুমি তাহাদের (সেবারূপ) পূজা কর না? কেন তুমি গঙ্গাতীরে কূপ খননে প্রবৃত্ত হও?"

পুরাণ ও ইতিহাসে হরিদ্বার।

হরিদ্বার অতি প্রাচীন তীর্থ; তাই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণশাস্ত্রে হরিদ্বারের অনাদিকালবিস্তৃত পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যায়; যুগযুগান্তরের অসংখ্য

পুণ্যকাহিনীর স্মৃতি এই হরিদ্বারের সহিত জড়িত। প্রাচীন তীর্থগুলি ঋষিগণের আবাসস্থান ও তপস্যার অনুকূল স্থান। কয়েকটীর উল্লেখ তীর্থ-উৎপত্তিপ্রসঙ্গে করিয়াছি। সকল কাহিনীর উল্লেখ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। রামায়ণের সময় হরিদ্বার রামরাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল—হরিদ্বারের পিণ্ডদানাদি তীর্থকৃত্যের মন্ত্রোচ্চারণে তাহা জানা যায়। মন্ত্রে স্পষ্টতঃই উল্লেখ আছে যে, এই স্থান রামরাজত্বের অন্তর্গত ছিল। কতকাল হইতে তীর্থযাত্রিগণ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, কতকাল হইতে শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি হরিদ্বারের সহিত বিজড়িত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হরিদ্বারের সপ্তস্রোতা তীর্থে সপ্তঋষি তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানেই সুরধুনী গঙ্গা সপ্তঋষির প্রীতিসাধনার্থ সেই স্থানে আপনাকে সপ্ত ধারায় বিভক্ত করিয়াছেন, এই জন্য এই স্থান 'সপ্তস্রোতঃ' তীর্থ নামে অভিহিত। ভাগবৎ পাঠে অবগত হওয়া যায় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর শোকসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এই পুণ্যতীর্থে যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। [ভাগবৎ ১ম স্কন্ধ, ১৩ অধ্যায়।] এই পুণ্য তীর্থেই যখন মহামতি ভীষ্মের পিতামহ প্রতীপ রাজা ভাগীরথীতীরে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময় চঞ্চলা বালিকা বেশে গঙ্গা আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার দক্ষিণ জানুতে উপবেশন করেন, এবং যেরূপে তিনি শান্তনুকে বিবাহ করিয়া ভীষ্মজননী হন, তাহা মহাভারত-পাঠক অবগত আছেন। মহামতি ভীষ্ম যখন তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাদ্বারে পুলস্ত্য ঋষির সহিত যে তীর্থবিবরণ ও উপদেশাবলী শ্রবণ করেন, তাহা মহাভারতের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ করিয়া যখন মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করেন, তখন ভগবৎভক্ত বিদুরকে উপদেশ দিবার জন্য মৈত্রেয় ঋষিকে আদেশ দিয়া যান। এই বার্ত্তা ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয় ঋষির নিকট এই গঙ্গাদ্বারেই উপস্থিত হন। ভাগবতে আছে "দ্বারি দ্যুনদ্যা মৈত্রেয়মাসীনমগাধবোধং" অর্থাৎ অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মুনিবর মৈত্রেয় হরিদ্বারে আসীন ছিলেন। মৈত্রেয়কথিত ভাগবতী কথাপূর্ণ উপদেশামৃত "মৈত্রেয় বিদুর সংবাদ" ভাগবতের ৩য় ও ৪র্থ স্কন্ধে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ভগবান্ রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব, বলরাম, প্রহ্লাদ প্রভৃতি সকলের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে হরিদ্বারের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমৎ রামানুজ স্বামী, শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য প্রভৃতির তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ইতিহাসে হরিদ্বারের উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ প্রভাবের সময়ও হরিদ্বার প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ ছিল, তাহা আমরা চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাংর ভ্রমণবিবরণ হইতে জানিতে পারি। তিনি ৭ম শতাব্দীতে এই নগর দর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "ময়ুলো" (মায়াপুর) বা "ময়ুরো" গঙ্গাতীরের বহু জনাকীর্ণ এবং কুড়িলি—অর্থাৎ প্রায় ৩ মাইল পরিধিযুক্ত নগর। নগরীর অনতিদূরে গঙ্গাতটে একটী বৃহৎ দেবমন্দির আছে। ভারতের পঞ্চ প্রদেশের লোক ইহাকে "গঙ্গাদ্বার" বলিয়া থাকেন (১) এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শত সহস্র ব্যক্তি পাপস্খলন এবং পুণ্য সঞ্চয় উদ্দেশে এস্থানে আসিয়া স্নান করিয়া থাকেন। দানশীল রাজারা এস্থানে পুণ্যশালা (a house of merit) স্থাপন করিয়াছেন ; এই পুণ্যশালা হইতে দীনদরিদ্র, বিধবা এবং অনাথ বালকগণকে আহার্য্য ও ঔষধ বিতরিত হইয়া থাকে। এই নগরীর চারিদিকেই গঙ্গার শাখাপ্রশাখা প্রবাহিত।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থেও হরিদ্বারের বহুল উল্লেখ আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৩৯৮।১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ এই নগর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক সৈয়ফ-উদ্দীনের বর্ণনায় বিষ্ণুপদ পাহাড়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গঙ্গাদ্বার মন্দির সেই পাহাড়ের নিম্নে নির্ম্মিত ছিল। মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে হরিদ্বারের প্রসিদ্ধি 'আইনি আকবরি' হইতে জানা যায়। আবুল ফজেল লিখিয়াছেন "হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে মায়াদেবীর মন্দির অবস্থিত। এই স্থান হইতে আঠার ক্রোশ পর্য্যন্ত অতি পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।"

নানাকথা।

হরিদ্বার সমুদ্রবক্ষ হইতে ১০২৪ ফিট উচ্চে অবস্থিত। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্থায়ী লোকসংখ্যা ২৬০০০ হাজার। প্রত্যহই হরিদ্বারে বহু যাত্রীর সমাগম হইতেছে। বার্ষিক মেষসংক্রান্তির মেলার সময় লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয়। দ্বাদশ বার্ষিক কুম্ভমেলার সময় লোকসংখ্যা ২০।২২ লক্ষেরও অধিক হয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হরিদ্বার কণখল ও জ্বালাপুর একত্র করিয়া একটী মিউনিসিপ্যালিটী গঠিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যপ্রণালী চমৎকার। মিউনিসিপ্যালিটীর তীর্থের ও পথঘাটের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে এবং ক্রমশঃ নানারূপ উন্নতি হইতেছে। ইঁহাদের যত্নেই গঙ্গাতীরে প্রশস্ত চত্বর (Platform) ক্রমশঃ প্রস্তুত হইয়া যাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা

(1) The men of the five Indies call it "The gate of the Ganga river."

হইয়াছে। অধিকাংশ পাণ্ডার নিবাস জ্বালাপুরে, জ্বালাপুর হরিদ্বার হইতে দুই মাইল দূরে। তবে প্রায় সকল পাণ্ডারই হরিদ্বারে এক একটী বাসা এবং যাত্রিনিবাস আছে।

হরিদ্বার ও মায়াপুরে পূর্ত্তবিদ্যা সম্বন্ধীয় বুদ্ধি-গৌরবের বহুনিদর্শন আছে। এখান হইতে গঙ্গার ক্যানাল বা খাল গঙ্গা হইতে কাটিয়া লইয়া গিয়া গবর্ণমেণ্ট (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) জলহীন প্রদেশে জল প্রবাহিত করিয়া সে সকল দেশ উদ্ধার করিয়াছেন। যেখানে পূর্ব্বে জলাভাবে মরুভূমিবৎ ছিল, এই গঙ্গ-খালের কল্যাণে তাহা শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। মায়াপুর ও কণখলের নিকট হইতে খাল বাহির হইয়া ৬৩৫ মাইল প্রবাহিত হইয়া কানপুরের নিকট পুনরায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খাল নির্ম্মাণে এবং গঙ্গাতীরে 'ফেরো কনক্রীট্‌ প্রণালীতে যে সকল চত্বর প্রস্তুত হইয়াছে, এইগুলি পূর্ত্তবিদ্যার ছাত্রগণকে অভিজ্ঞাত ও তত্ত্ব লইবার জন্য Roorkee কলেজের ছাত্রগণকে কর্ত্তৃপক্ষ পাঠাইয়া থাকেন।

হরিদ্বারের বাজারটী ক্ষুদ্র হইলেও এখানে সকল প্রকার দেশী বিলাতি দ্রব্যই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে Soda water বরফ কুলফীপ্রভৃতি দ্রব্য ও বিক্রয় হয়। এই স্থান হইতে কেদার-বদ্রী-যাত্রীরা রওয়ানা হইয়া থাকেন; সুতরাং পর্ব্বত আরোহণোপযোগী লাঠি, কাপড় ও চামড়ার সকল প্রকার জুতা, কম্বল, শীতবস্ত্র, তীর্থমহিমা-ব্যঞ্জক মাহাত্ম্য গ্রন্থ, ও নানা শাস্ত্রগ্রন্থ, হিমালয় গমনের জন্য যান, 'ঝাম্পান কাণ্ডী' প্রভৃতি সমস্তই হরিদ্বারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ফলকথা গৃহী বা সন্ন্যাসীর এবং হিমালয় তীর্থযাত্রীর পক্ষে যাহা কিছু আবশ্যক, হরিদ্বারের বাজারে তাহার কিছুরই অভাব নাই। খাদ্যদ্রব্য খুব বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়। মূল্যও সস্তা; এখানকার দুগ্ধ, দধি, রাবড়ি ও ঘৃত উত্তম এবং সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। বলাবাহুল্য এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে মৎস্য মাংস বিক্রয় হয় না।

হরিদ্বার প্রবন্ধ শেষ হইল। ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে গেলে যেরূপ লিপি-কুশলতা, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, বর্ণনাচাতুর্য্যের আবশ্যক, আমার রচনায় তাহার একান্ত অভাব। আমি কেবল কতকগুলি শাস্ত্রবাণী ও জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি মাত্র। আশা করি ইহাতে তীর্থযাত্রীর কতকটা উপকার হইতে পারে। তবে আমার এ বিফলপ্রয়াশ কেন তাহার একটু কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক মনে করি। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "গরু যেমন পেটভরে জাব্‌ খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় বসে সেই সব খাবার উপরে ভাল করে

চিবাতে বা জাবর কাটতে থাকে, সেই রকম দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখবার পর সেখানে যে সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে উঠে, সেই সব নিয়ে একান্তে বসে ভাব্‌তে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়। দেখে এসেই সে সব মনথেকে তাড়িয়ে বিষয়ে রূপে রসে মন দিতে নাই; তাহলে ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না।" আমার এই প্রবন্ধলেখার উদ্দেশ্য "কেবল জাবর কাটার চেষ্টামাত্র এবং তীর্থগুলির স্মরণ করা।" কারণ শাস্ত্রেই আছে "তীর্থের স্মরণ পুণ্যবর্দ্ধক, তীর্থ দর্শন পাপনাশক এবং তীর্থে স্নান করিলে দুষ্কৃতকর্ম্মাগণেরও সুকৃতি সঞ্চিত হয়। যাহারা তীর্থ স্মরণ করেন দেবতারা তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন এবং শ্রদ্ধাসহকারে তীর্থস্নান করিলে পরম গতি লাভ হয়।"—

তীর্থানাং স্মরণং পুণ্যং দর্শনং পাপনাশনং।
স্নানং পুণ্যকরং প্রোক্তমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ॥
যে স্মরিষ্যন্তি তীর্থানি দেবতাঃ প্রীণয়ন্তি চ।
স্নান্তি চ শ্রদ্দধানাশ্চ তে যান্তি পরমাং গতিম্‌॥

বামনপুরাণ ৩৩ অধ্যায়ঃ।

(ক্রমশ) শ্রীপান্নাসাল সিংহ।

মহামায়ার খেলা।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

উমাপদ ব্রহ্মচারী জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন—"বুঝিলে ত, মা আমার কিরূপভাবে খেলা খেলিতেছেন—মা আমার যখন সেই রজতগিরিনিভ মহাদেবের মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাম পাদ স্থাপন করিয়া খেলা খেলিতে থাকেন, তখন সে খেলা আপাত-মধুর বোধ হইলেও, হিন্দুরা সে মূর্ত্তির পূজা করে না! যখন তিনি সেই বাম পাদ সেই ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া লইবার উপক্রম করিতেছেন এবং দক্ষিণ পাদ হরহৃদয়-চৈতন্যে স্থাপন করিয়াছেন সেই মূর্ত্তি—দক্ষিণ-কালিকা মূর্ত্তি, বাম পাদের যাহারা পূজা করে তাহারা বিশেষাভিমুখী ও বামাচারী।

বড় শক্ত কথা ভাই, মুখে বলিলে চলিবে না। জগতে হাসি কান্না সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ আছে ও থাকিবে—উহা ত খেলার কথা, তাহা লইয়া হর্ষ বা বিমর্ষ-

ভাব পোষণ করা কেন—সকল খেলার ভিতর দিয়া সেই এক গতির দিকে লক্ষ্য রাখা বড় শক্ত। সে যাক্—আমাদের এখন কর্ম্মের সময়—দেবীর সেই ভাব বুঝিতে না পারিলেও কেবল সেই ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া—জগতের সেবা কর—পাপী তাপী—রোগী—সকলকেই ডাকিয়া আন—হৃদয়ের কপাট খুলিয়া অকাতরে প্রাণ ভরিয়া ভালবাস—আপনি হৃদয়ে সব বুঝিতে পারিবে।"

এমন সময়ে নবকুমার আসিয়া বলিলেন দাদা! মাতাজী এই পথ দিয়া যাইতেছেন—একবার তাঁহাকে ডাকি—ব্রহ্মচারী বলিলেন আপত্তি কি?

সন্ন্যাসিনী প্রবেশ করিলেন; মুখে—

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ
পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষং॥

ব্রহ্মচারী দেখিলেন সন্ন্যাসিনী বস্তুতঃই রূপসী—ভস্মাচ্ছাদিত রূপ যেন চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। মনে হইল যেন ইঁহাকে কোন সময় দেখিয়া থাকিব—সন্ন্যাসিনীও দেখিলেন যে ব্রহ্মচারী যেন তাঁহার নিজের লোক—কিন্তু তাহার কারণ হৃদয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনী সম্মুখে মাতৃমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন—যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সন্ন্যাসিনী আগমন করিলে সকলেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, উপবেশন করিলে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নাম অনেক দিন হইতে শুনিয়াছি—আপনার অহৈতুকী সেবা-ধর্ম্মে আমরা পরম আনন্দিত—আজ আপনাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।"

সন্ন্যাসিনী। "ওকথা বলিবেন না—এ আশ্রমের কথা আমি কাশীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শুনিয়াছি—ও এই আশ্রমের সেবকদিগের সেবাধর্ম্ম স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। কাশীতে আসিয়াও বেশ বুঝিয়াছি যে মা আপনার দ্বারা এক মহৎ খেলা খেলাইতেছেন। আমি অনেক দিন পূর্ব্বেই এখানে আসিতাম, কিন্তু নানা কারণে আসা ঘটে নাই। অদ্য আশ্রম দর্শনে যে কি আনন্দ লাভ করিলাম তাহা কি বলিব।"

ব্রহ্মচারী। "আপনি থাকেন কোথায়?"

সন্ন্যাসিনী। "কিছুই স্থিরতা নাই, যে দিন যেখানে মায়ের ইচ্ছা হয় সেদিন সেখানেই থাকি।"

ব্রহ্মচারী। "আপনি কি আজন্ম ব্রহ্মচারিণী?"

সন্ন্যাসিনী। "আজ্ঞে না,—আমি বিবাহিতা এবং বিধবা; পিতা আমায় আদেশ করিয়াছেন; তাই এরূপ ভাবে সাংসারে খেলা করিতেছি।"

কাশীস্থ অনেক ভদ্রলোক সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এই আশ্রমে আসিয়া ব্রহ্মচারীর সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া থাকেন। বীরেন্দ্রবাবু আজ আসিয়াই দেখিলেন যে অপূর্ব্ব সম্মিলন, মাতাজীকে তিনি অনেক দিন দেখিয়াছেন এবং উঁহার সেবা-ধর্ম্মের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ব্রহ্মচারী ত তাঁহার জীবনের গতিই ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাই এই দুইএর মিলনে তিনি মহা আহ্লাদিত হইয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন—ও সন্ন্যাসিনীকে বলিলেন।

ব্রহ্মচারী। 'আপনি কত দিন গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন?

সন্ন্যাসিনী। আমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করি নাই,—তবে নির্দ্দিষ্ট গৃহে থাকি না এই মাত্র। পিতা আমাকে আদেশ দিয়াছেন যে তোমার সেবাই ধর্ম্ম। কিছু দিন আমি লোকালয়ের বাহিরে ছিলাম, বৃক্ষ লতা আমার সহচর ছিল। আমার মা দাঁড়াইয়া আছেন, সেখানেও তিনি আমার সম্মুখে থাকিতেন। কিন্তু সম্প্রতি পিতা বলিলেন—তোমার সংসারব্রত এখনও উদ্‌যাপন হয় নাই—এখনও তোমার বহু কর্ম্ম বাকী আছে—তাঁহারই আদেশে আমি কাশী আসিয়াছি।"

ব্রহ্মচারী। আপনার শিক্ষা প্রকৃতির কোলে সুসম্পন্ন হইয়াছে,—আপনার পিতা কি এখনও জীবিত?

সন্ন্যাসিনী। ঠিক জানি না তিনি কখন কোথায় থাকেন।

ব্রহ্মচারী তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইলেন।

বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, "আপনারা উভয়ে কিছু ধর্ম্মালোচনা করুন, আপনাদের কথা বড় হৃদয়াকর্ষক। আপনাদের মুখে শুনিয়া চিত্ত মা জগদম্বার প্রতি আকৃষ্ট হয়; আমাদের বিষয়াশক্ত চিত্ত আপনাদের উপদেশের ক্ষেত্র হউক।"

সন্ন্যাসিনী। কি বলিব বাবা মায়ের কথা কি বলিব, আমরা ভেদের মূর্ত্তি; তাই ভেদ ভিন্ন অভেদের দিকে চাহিতে পারি না—মা যে আমার সর্ব্বরূপে বিরাজিতা তা আমরা চাহিয়াও দেখি না। কি ভ্রান্তি—মায়ের গর্ভে শুয়ে আছি—তাঁরি স্পর্শে বেঁচে আছি, তাঁরি ভাষায় তাঁরি কথা তাঁরি সাথে কইছি কিন্তু তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তাঁর চেয়ে আপন কে আছে বাবা?

এই কথা বলিতে বলিতে সন্ন্যাসিনী যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন—হৃদয়ের কপাট যেন উন্মুক্ত হইয়া গেল—মুখে অনর্গল সেই একই কথা—কখনও মুখখানি ঈষৎ গম্ভীর কখনও বা হাসির রেখা কখনও বা গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে মিশামিশি। উপস্থিত সকলেই স্থির ও উদ্গ্রীব হইয়া শুনিতেছে—কি এক ভাবের ফোয়ারা ছুটিতেছে।

"কি ভ্রান্তি! মা যে আমার সর্ব্বাবস্থায় সামনে আস্‌ছেন; কিন্তু কৈ দেখ্‌তে ত পাচ্ছি না। পিপাসায় যখন কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসে তখন তিনি শীতল জল হয়ে দেখা দেন—ক্ষুধায় যখন কাতর হয়ে পড়ি অন্নপূর্ণাই অন্নরূপে দেখা দেন। ঐ দেখ মায়ের রূপের জ্যোতিঃ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, তারার মধ্য দিয়া চন্দ্রমার মধ্য দিয়া সেই মায়ের জ্যোতিঃ। কি আশ্চর্য্য! মা আমার সুখের হাসিতে হাসায়, আবার দুঃখের রোদনে কাঁদায়। স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ সকলের ভিতর দিয়াই যে মায়ের অপূর্ব্ব খেলা। মা আমার গভীর অরণ্যে বসিয়া তৃণের ফুলে ডালি সাজায়; আবার মেঘের অন্তরালে বসিয়া নানা বর্ণের ছবি আঁকেন। মা জগদম্বা—তুমি খেলা খেলিতে কি এতই ভালবাস? যদি খেল্‌তেই ভালবাস তবে আড়ালে কেন—একটু প্রকাশ হয়ে খেল্‌লেই ত ভাল হত। তুমিই আমাকে কখনও সংসারিণী ক'রে স্বামীর কোলে ঘুম পাড়াচ্ছ, আবার কখনও ভিখারিণীর সাজে সাজাচ্ছ। তুমি ত আমার পর নও—একেবারে আপনার; তবে কেন একটু প্রকাশ হচ্ছ না? বুকের মাঝে ধরে রয়েছ অথচ বুঝ্‌তে দিচ্ছ না—মায়ের স্তন ও পিতার স্নেহের মধ্য দিয়ে যে তুমিই উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছ কিন্তু প্রকাশ হচ্ছ না। আমি কিছু বল্‌তে চাই না, কিছু বুঝতে চাই না। তবে এই মাত্র বলি—যেন আর খেলায় মত্ত রাখিও না। খেলায় মত্ত ছিলাম বলে আবার খেলাচ্ছ—তাই করজোড়ে বল্‌ছি খেলা একবার সংহরণ কর—সাধ মিটেছে—একবার দুয়ার খুলিয়া দাও।

সন্ন্যাসিনীর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল আবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, আপনি কত দিন গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন!

ব্রহ্মচারী। আমি প্রায় দশ বৎসর এইরূপ ভাবে ভাছি—পাঁচ বৎসর আমার দীক্ষাগুরুর নিকট হিমালয়ের একটী আশ্রমে ছিলাম—তাঁহার উপদেশে এই স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়াছি। যত দিন মায়ের ইচ্ছা তত দিন এখানে থাকিব; তাঁহার ইচ্ছা হইলেই আবার কোথায় চলিয়া যাইব।

আমি দেখিতেছি যে আমরা উভয়েই এক উদ্দেশ্যে প্রেরিত—সুতরাং

আমাদের পরস্পর মিলিত হওয়া আবশ্যক। আপনি স্ত্রীলোক, সুতরাং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে আপনার কার্য্য বেশী হইবে। অবশ্য আপনার নিকট স্ত্রীপুরুষের ভেদ না থাকিলেও স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে আমাদের কার্য্য তেমন ফলবতী হইবে না। এই সেবা ধর্ম্মে যে সকল স্ত্রীলোক দীক্ষিত হইতে চান, আপনি তাঁহাদের ভার গ্রহণ করুন এবং তাঁহাদের জন্য আর একটী পৃথক্ মাতৃমন্দিরের শাখা স্থাপিত হউক।

বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"বেশ কথা আমি কাশীর মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিব এবং আশা করি এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিবেন।"

সন্ন্যাসিনী। এ সংকল্প অতি মহৎ—মায়ের ইচ্ছা হইলে ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। অবশ্য এবিষয়ে অনেকে ইতিপূর্ব্বেও আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন—দেখা যাক মায়ের কি ইচ্ছা।

ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসিনীর নিরহঙ্কার, বাক্যবিন্যাস ও জগদম্বার ভাবে বিভোর দেখিয়া হৃদয়ে পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন। সহসা জটাজূটবিলম্বিত গৈরিক বসনপরিহিত রুদ্রাক্ষমালা-শোভিত এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তথায় উপস্থিত হইলেন। আপনার তেজে দিক্ সকল আলোকিত করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে ত্রিশূলহস্তে তথায় উপনীত হইলেন। উপস্থিত নরনারী সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। সহসা যেন সেই আশ্রম মুখরিত হইয়া উঠিল; অপূর্ব্ব সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে সকলেই সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিয়া প্রণাম করিলেন। উমাপদ ব্রহ্মচারী, মাতাজি, নবকুমার সকলেই যুগবৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। ক্ষণেক পরে মাতাজি বলিলেন—"পিতঃ! সহসা আজ এখানে যে আপনার দর্শন পাইব, এ কল্পনা মনে আনিতে পারি নাই। আপনার দর্শনে হৃদয়ে যে কি আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহা কি বলিব! আপনি কখন আসিলেন? ভৈরবীদিদি ভাল আছেন ত?"

সন্ন্যাসী গম্ভীর বদনে বলিলেন, "হাঁ মা ভৈরবী ভাল আছে—আশা করি তুমিও মায়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছ। আমি বেশ বুঝিতেছি—তুমি মাকে মা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছ।"

নবকুমার বলিয়া উঠিল—"পিতঃ! এতদিন পরে এ অধমকে মনে পড়িয়াছে? কতদিন আপনার দর্শনলালসায় নিশি অতিবাহিত করিয়াছি, কত দিন আপনার জন্য কত চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু আজ আপনার দর্শনে ধন্য হইলাম। আমি এই আশ্রমে আসিয়া অবধি যে কি আনন্দে আছি তাহা আর কি বলিব।"

সন্ন্যাসী। বেশ নবকুমার—আমি এই রূপই আশা করিয়াছিলাম—এই কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ কর, তোমার ইহাই এখন কর্ত্তব্য।

উমাপদ ব্রহ্মচারী দেখিলেন এ কি! সুদূর জনমানবশূন্য হিমালয়ের গিরি-গুহায় যাঁহার অবস্থিতি, যাঁহার নিকট শিক্ষিত হইয়া এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলাম, এই যোগিনী ও নবকুমার তাঁহার পরিচিত ও বিশেষ কৃপার পাত্র। মহামায়ার কিরূপ খেলা তিনিই জানেন।

সেই মাতৃমন্দিরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ তখন শশধরের শুভ্র জ্যোৎস্নায় আলোকিত—সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার বিমল কিরণে সমস্ত আকাশে যেন আজ আনন্দ ধরিতেছে না। যেন চন্দ্রলোকের সেই আনন্দের তরঙ্গ আজ জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উমাপদ ব্রহ্মচারী অবাক্ হইয়া সেই সন্ন্যাসীর চরণে স্থির দৃষ্টি—যেন ঐ রাঙ্গা চরণ দুটী তাঁহার ভুক্তি মুক্তির আশ্রয়—যেন ঋদ্ধি সিদ্ধি সকলই সেই পাদপদ্মের মহিমা। ঐ চরণ দুখানি যেন তাঁহার জীবনের সার—সংসার-সাগরের তরণী—ধ্যানের বস্তু।

সহসা এই আশ্রয় বস্তুটী সম্মুখে সমুদিত হওয়ায় উমাপদ ব্রহ্মচারীর মুখে কথা নাই—হৃদয়ে কেবল সেই ভাবের ফোয়ারা। তাই নিস্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া সহসা সেই চারুচরণে আপনাকে লুটাইয়া দিল—মুখে বলিল—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সন্ন্যাসীর পাদস্পর্শে সেই বুভুক্ষিত তৃষ্ণাপীড়িত চিত্তক্লেশ বিদূরিত হইল—হৃদয়ের তমান্ধকার ক্ষণকালের জন্য কোন্ অন্ধকারের গভীর গহ্বরে লুক্কায়িত হইল। সন্ন্যাসী তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'দেখ উমাপদ! বিস্মিত হইও না। যে দিন তোমায় সমাধিগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া সুদূর হিমালয়ে গমন করি, সেদিন তুমি ভাব নাই যে আবার সংসারে যাইতে হইবে। সমাধি হইতে উত্তোলন করিয়া, তোমাকে পাঁচ বৎসর শিক্ষা দিয়া এই আশ্রম উদ্দেশ্যে প্রেরণ করি। সে কার্য্য তুমি বেশ সম্পন্ন করিয়াছ এবং যতদিন মায়ের ইচ্ছা এই কার্য্য করিতে থাক। মায়ের সংসারে খেলা কর—অবাক্ হইও না—স্থির হইয়া আমার কথা শুন।" মাতাজিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হেমলতা! নির্ম্মল কুমার তোমার সম্মুখে—বিচলিত হইও না। নির্ম্মলকুমার ও উমাপদ ব্রহ্মচারী একই; এক্ষণে উভয়ে মিলিয়া মায়ের সংসারে মহামায়ার ক্ষেত্রে সেবা কর।

তোমরা দুইটী ধারা পরস্পর মিলিত হইয়া—সেই বিভুর চরণে মিলিত হও। এ মিলন প্রেমের মিলন, কামের নহে। এ প্রেমে 'তুমি পুরুষ আমি স্ত্রীলোক' এ জ্ঞান নাই—এই প্রেমে একদিন ব্রজসেবার অধিকার মিলে। এ মিলনের ফল 'আমি' স্থাপন নহে—'তুমি' স্থাপন। আর নব-কুমার—যে হেমলতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলে, সেই হেমলতা তোমার সম্মুখে।" সকলেই নিস্তব্ধ—সহসা উন্মাদগ্রস্তা অৰ্দ্ধউলঙ্গিনী ধূলিধূসরিতা একটী স্ত্রীমূর্ত্তি তথায় প্রবেশ করিল—সন্ন্যাসী তাহাকে দৃষ্টিমাত্র আরোগ্য করিলেন। নবকুমার দেখিল—তাহার পত্নী—বীরেন্দ্রবাবু নিস্তব্ধ অবাক্—বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। সহসা সন্ন্যাসী "আবার আসিব" বলিয়া অন্তর্হিত।

(সমাপ্ত)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ স্বামী প্রণীত 'হিমালয় ভ্রমণ'—বাঙ্গালা ভাষায় বহুবিষয়ে প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু সে সকল পুস্তকের মধ্যে নাটক নভেলগুলি বিদেশীয় মালমসলায় প্রস্তুত বলিয়া সে সকলে খাঁটিভাব ও শিক্ষণীয় বিষয় প্রায় থাকে না। কেবল চিত্তচাঞ্চল্যকর বিলাস-ভাবপূর্ণ কথা থাকে বলিয়া একরূপ চিন্তাশীল সুধীগণের অপাঠ্য বলিলেও চলে। বর্ত্তমান সময়ে মাসিকপত্রিকা-গুলিও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের ছবি ও তদ্রূপ রঙে সঙে পূর্ণ থাকে। এই গ্রন্থখানি সেরূপ নয়। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে ছুটি লইয়া হাওয়া পরিবর্ত্তনের ব্যপদেশে রেল ষ্টীমার যোগে তীর্থভ্রমণ করেন মাত্র, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে পরমপূতঃ তীর্থের বর্ণনা ও তাহার মাহাত্ম্য, অনুষ্ঠানযোগ্য কার্য্যাবলির বিষয়ে শিখিবার যোগ্য কিছুই থাকে না। এই গ্রন্থ খানিতে পদব্রজে উত্তরাখণ্ডপরিক্রমণ অর্থাৎ হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, কেদারেশ্বর প্রভৃতি দর্শন, ভ্রমণ করিতে হইলে কোন্ কোন্ তীর্থ, কোন্ কোন্ পথে কি ভাবে কখন যাইতে হয় তাহার সুযোগ, পথের প্রান্তবাসীদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, আচার ব্যবহার ও খাদ্য দ্রব্যের বিবরণ, এবং তীর্থ ও উপতীর্থের সূচীপত্র, মাহাত্ম্য অতি সরল সুমধুর প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম প্রভৃতি ভূ-স্বর্গ তুল্য তীর্থভ্রমণে যাইবেন, তাঁহাদের এই বহিখানি একান্ত পাঠ করা

উচিত। বহিখানি সুন্দর বাঁধান, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। প্রথম সংস্করণ বলিয়া দুই একটী ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। আশা করি অন্য সংস্করণে নির্ভুল হইবে। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রি-সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ।

বিশেষ নিবেদন।

নানাবিধ সাংসারিক বিপৎপাতে আমাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বিদেশে থাকিতে হয়। তাহার উপর সহকারী কার্য্যাধক্ষ মহাশয় কর্ম্ম ত্যাগ করেন। এই সব কারণে পন্থা প্রকাশে বিলম্ব হইল। তাহাতে আমরা বড়ই লজ্জিত আছি। আশাকরি পাঠকগণ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

আগামী বৎসর হইতে পন্থার সুদুর্লভ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, হিন্দু সন্তানের নিত্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যা-বন্দনার ব্যাখ্যা, সহজ যোগ্য, প্রণবরহস্য ও 'মহামায়ার খেলা'-প্রণেতার লিখিত নূতন ধর্ম্মবিষয়ক উপন্যাস ও পান্নালাল বাবুর তীর্থভ্রমণ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

এখনও অনেকের নিকট পত্রিকার মূল্য বাকী আছে। তাহা পাঠান আবশ্যক। পাঠকগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি করিলে বাধিত হইব ইতি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ।] চৈত্র ১৩২১। [১২শ সংখ্যা

শিব-সঙ্গীত-লহরী

(১)

মম জীবন বাঞ্ছিত, শঙ্কর, তব
চরণ পরশ লাগিয়া
যেন তব ধেয়ানে মম দিবস-
যামিনী যায় কাটিয়া।
মম সব সঙ্গীত মাঝে
যেন পুলক ভরে বাজে
সুন্দর তব মঙ্গলময়
বন্দনা গীতি অমিয়া;
মম জ্ঞান কর্ম্ম সকলি
উঠয়ে যেন আকুলি
পূজিতে ও দেব-বন্দিত পদ
বিশ্ব-ভুবন ভুলিয়া
সার্থক কর, সুন্দর কর
পদ-পিয়াসী মম হিয়া।

(২)

রজত শুভ্র বরণাঙ্কিত
দেহ তোমার সুন্দর,
কোটী-ভাস্কর-রশ্মি আলোক
বিতরি নিরন্তর

বসুধা পূরিত তিমির রাশি
মঙ্গল ইঙ্গিতে পলকে নাশি,
করহ দীপ্ত মম অজ্ঞান-
তমসাবৃত অন্তর।
নিখিল জগত জন-শরণ
চিন্ময় শিব শঙ্কর।

(৩)

হাস হাস সবে হাস,
আর শিবপূজা রসে ভাস
কামনা যাতনা সব দূরে ফেলি
পূজ শিবপদ ভুবন ভুলি
ভবন বন্ধন কর মোচন
মন কালিমা নাশ;
শঙ্কর পদে সঁপিয়া প্রাণ
গাহ ঝঙ্কারি মহা বিমান
সত্য সুন্দর শিব মহেশ্বর
শঙ্কর দেব দেবেশ
(আর) হাস, হাস সবে হাস।

(৪)

তাঁর প্রেমে মজনারে মন
ওরে জানিবে তবে সে কেমন,
ঐশ্বর্য্য দূরে ফেলে
ভূত সনে সে নাচে খেলে
(ও রে) পূজিলে তাঁয় বিল্বদলে
অন্তিমে সে দেবে শরণ।

(৫)

অধম অভাজন আমি অতি দীনহীন
কলুষিত দেহ মন পাপেতে বিমলিন।
ভুবনের সবে মোরে কত ঘৃণাভরে চার
কহি কত কটুবাণী দূরে দূরে চলে যায়।
এভুবনে কেহ মোরে ভালতো নাহিবাসে

তাই প্রভু! ছুটে আজি এসেছি তোমারি পাশে।
জানি প্রভু, ও চরণে শরণ লহে যেই
সব দুঃখ গ্লানি হতে মুকতি লভয়ে সেই।
করুণা ভিখারী তব আমি প্রভু দীনহীন
কর দেব কর মোরে তব প্রেমানন্দে লীন।

(৬)

জয় শিব শঙ্কর ভোলা মহেশ্বর
চন্দ্রশেখর ত্রিপুরারি,
বৃষভবাহন, বল্কল-বসন,
ভীতিমগন ভয়হারী,
ভগবতী-সেবিত-চরণ-তলে
স্বীয় জটা-নির্গত গঙ্গা গলে
মধুর হাসে করুণা ভাসে
বন্ধন পাশে নাশকারী,
শ্মশান ভস্ম লেপিত অঙ্গে
প্রমথযূথ সহ নাচ রঙ্গে
ত্রিশূলকর, পিণাক ধর
সাধকবর প্রাণচারী,
জয় শিব শঙ্কর, ভোলা মহেশ্বর,
চন্দ্রশেখর ত্রিপুরারী।

শ্রীশ্রীশঙ্কর-চরণাভিলাষী দীনতম সেবক—
শ্রীহরিকৃপা চৌধুরী।

সাধনায় বিঘ্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তান্ত্রিকের পরমপ্রিয় গ্রন্থ "শাক্তানন্দতরঙ্গিণী" বোধ হয় শাস্ত্রানুসন্ধিৎসু সুধীমাত্রেরই পরিচিত। এই সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর অমানুষ জীবনেও অশ্রুতপূর্ব্ব সাধনবিঘ্নের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, বা সম্যক্ প্রকারে অতিরঞ্জন-রহিত কিনা

তাহা আমার বিচার্য্য নহে ; অপিচ এরূপ বিচার করিবার সাহসও আমার নাই। কারণ পণ্ডিতম্মন্যমান মানবের বুদ্ধিবৃত্তি অদ্যাপিও সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ের অঘটন-ঘটনপটীয়সী মহিমার মন্দিরদ্বারে উপনীত হইতে পারে নাই। কে জানে, আত্মম্ভরী মানবের অহঙ্কার-মলিন নয়নে কবে সেই মহতো মহীয়ান্ পরাপর পরমেশ্বরের শান্তোজ্জ্বল সুন্দর ছবি প্রতিভাত হইবে ? ফলতঃ অন্তর্জগৎ দূরে থাকুক, এই সতত পরিদৃশ্যমান বহির্জগতেরই বিচিত্র কার্য্যপরম্পরার সম্যক্ পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, মানবের অপ্রবুদ্ধমন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অমর কবি সেক্ষপীয়রের সঙ্গে বলিয়া উঠে—"There are more thengs in heaven and earth, Horatio than are dreamt of in your philosophy. এস্থলে এবিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সম্ভব অসম্ভব—জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুগণের হস্তে অর্পণ করিয়া আমি পূর্ব্বোক্তি কিম্বদন্তীটী যথাশ্রুত * বর্ণনা করিতেছি। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই সংক্ষিপ্ত আখ্যানটী অতি মনোহর ও সুশিক্ষাপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে। এক্ষণে সহৃদয় সুধীগণ ইহার যাথার্থ্য বিচার করিবেন।

সাধন-সৌধের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান অতিক্রম করিতে করিতে সাধক-প্রবর তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনরূপ পরম রহস্যময় সোপানসমীপে উপনীত হইলে, তাঁহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব অভিলাষ হয়। সামান্যা মানবীকে শক্তি-সাধনার সঙ্গিনী না করিয়া, সর্ব্বশক্তিসমষ্টিভূতা সেই আদ্যাশক্তিকে—সেই সর্ব্বার্থ-সাধিকাকে এই মহাসাধনার সহকারিণী করিতে তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। না হইবে কেন ? মানবের মুদিত চিত্তকোরক যখন সেই পূর্ণ প্রভাময়ের বিমল শুভ্র জ্যোতির প্রতিবিম্বস্পর্শে বিকশিত হইতে থাকে, তখন জোনাকীর চঞ্চল দিপ্তীতে তার তৃপ্তি হইতে পারে না। প্রাণ যখন পূর্ণতার সন্ধানে পাগল হইয়া উঠে তখন অপূর্ণ অংশের প্রলোভনে সে আর আকৃষ্ট হয় না। তাই আজি ব্রহ্মানন্দের ব্যাকুল চিত্ত মহাশক্তির স্ফুলিঙ্গ-রূপিণী মর্ত্ত্যরমণী উপেক্ষা করিয়া "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"র সঙ্গলাভে উৎসুক হইল। অমনি তিনি 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ঐ অচিন্তিতপূর্ব্ব সাধনার উত্তরসাধক হয় কে ? তিনি সিদ্ধিকামীর সর্ব্বথা রক্ষক ক্ষেত্রপাল ভৈরবকে মহাসাধনায় প্রসন্ন করিয়া এই ত্রিলোকবিস্ময়কর

* ঘাটাল হাইস্কুলের হেডমাষ্টার আমার পরমপূজ্য অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে এই আখ্যানটী প্রাপ্ত।—লেখক।

সাধনায় উত্তরসাধকত্বে বরণ করিলেন। তাঁহার উগ্র সাধনায় কামখ্যার মহাপীঠ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল ! দৈববাণী তাঁহাকে এই উৎকট অভিলাষ পরিহার করিতে আদেশ করিল। অবশেষে দেবীর আদেশে কামাখ্যাক্ষেত্রের রক্ষক তাঁহাকে বলপ্রয়োগে নিরস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষুব্ধ সাধক দলিতপুচ্ছ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া অভিশাপ-বিষে মহাপীঠের মহিমা বিলোপ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পুনরায় দৈববাণী হইল—"তুমি কল্য নগরপথে দুইটী যুবতীর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হইবে। তাহারাই তোমার অভীপ্সিত সাধনার সঙ্গিনী হইবে। কিন্তু তুমি আত্মশক্তির পরিমাণ না বুঝিয়া মহাশক্তির সঙ্গ লইলে, সাবধান হইও।"

আমরা আত্মজীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাই যে, অনেকেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধীর ভাবে উহার পরিণতির অপেক্ষা করিতে চাহেন না ; প্রাথমিক অনুষ্ঠান পরস্পর সুনিষ্পাদিত না হইতেই চরম ফল হস্তগত করিতে ব্যস্ত হয়েন ! আধুনিক যুগে এই অধীরতার এই অবিবেকিতার পরিণাম সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ! আমরা পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকারণের উপক্রমণিকা সম্যক্ অভ্যাস না করিয়াই সর্ব্বোপনিষদ্-সারভূতা গীতা লইয়া বসি এবং শাঙ্করভাষ্যের ভ্রমনিরসনে প্রবৃত্ত হই। বাঁশীটী হস্তে লইয়াই, গোপী-মোহনের যে বিশ্ববিমোহন তানে যমুনা উজান বহিয়াছিল, সেই প্রাণময় প্রেমময় স্বরলহরীর পুনরাবৃত্তি করিতে চেষ্টিত হই। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসার" 'অথ' ও 'অতঃ' ত্যাগ করিয়া প্রথমেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ে বদ্ধপরিকর হই। তাই আজি আমাদের অনুষ্ঠানসমূহ প্রাণহীন; তাই আজি আমাদের সাধনা সিদ্ধিদায়িনী নহে। সাধকপ্রবর ব্রহ্মানন্দেরও বুঝি এই পরমার্থপরিপন্থিনী কুমতির আবির্ভাব হইয়াছিল ; তাই তিনি আত্মশক্তির পরিমাণ করিতে চেষ্টা না করিয়াই সেই অনন্ত শক্তি-আবর্ত্তে ঝম্প প্রদান করিলেন। অথবা মোহান্ধ মানবের শিক্ষার জন্য সাধকপ্রবর আজ লীলাময়ীর লীলাবিলাসের নিমিত্তমাত্র হইলেন।

* * *

পথে এক জন তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী চলিয়াছেন ; সঙ্গে অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীদ্বয়। সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব পরিচয় পাঠকবর্গের অজ্ঞাত নহে। তিনি তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। সন্ন্যাসীর সহিত যুবতীদ্বয়কে দেখিয়া একদল লোক তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছে ; কেহ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়, কেহ ঔৎসুক্যের বশে, কেহ বা নিষ্কর্ম্মা বলিয়া, এই দলের পুষ্টিসাধন করিতেছে। সূর্য্যদেব

উর্দ্ধগগনে আরূঢ় হইয়া অনলময় কর বর্ষণে প্রকৃতিকে সন্তপ্ত করিতেছেন। সন্ন্যাসী যেন পথশ্রমে বড় কাতর হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গিনী দ্বয় চিরপ্রফুল্ল। রবিকরস্পর্শে ফুল্ল কমলের ন্যায় উজ্জ্বল—সুন্দর। সম্মুখে একটী গ্রাম, পথিপার্শ্বে শৌণ্ডিকালয়; বৃহৎপাত্রে মদ্য পরিরক্ষিত হইতেছিল। সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ মদ্য প্রার্থনা করিলেন। শৌণ্ডিক সন্ন্যাসী দেখিয়া অথবা সঙ্গিনীদ্বয়ের উপর কোন-প্রকার মন্দ অভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া যথেষ্ট মদ্য পান করিতে দিল। সন্ন্যাসী একপাত্র মদ্য নিঃশেষে পান করিয়া পুনরায় মদ্য প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষিত করিয়া সন্ন্যাসী শৌণ্ডিকের সমুদয় মদ্য উদরস্থ করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইলে ও শৌণ্ডিক মদ্যের মূল্য প্রার্থনা করিলে, সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "আমিত নিঃসম্বল। দেশের রাজাই তোমাকে মূল্য দিবেন।" এই সকল সংবাদ অবিলম্বেই স্থানীয় ভূম্যধিকারীর কর্ণগোচর হইলে, ঔৎসুক্য বশতঃ তিনি কতিপয় সঙ্গীসহ তৎস্থানে উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে শৌণ্ডিকের প্রার্থিত মূল্য দিতে বলিলে তিনি কহিলেন, "একজন লোকে এত মদ্য পান করিতে পারে কি? আমি স্বচক্ষে না দেখিলে প্রত্যয় করিতে পারি না। ভাল, আপনি আর মদ্য পান করিতে পারিলে, আমি সমস্ত মূল্য দিব।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমার আর পান করিতে ইচ্ছা নাই; তবে তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য যাহা দিতে চাও, পান করিব।" কিন্তু শৌণ্ডিকের আর মদ্য ছিল না; সে বলিল, "কর্ত্তা, মদ্য ত আর প্রস্তুত নাই; যাহা ছিল সন্ন্যাসী ঠাকুর খাইয়াছেন। এই পাত্রে যে মদ্য প্রস্তুত হইতেছে তাহা এখনও অত্যন্ত উত্তপ্ত, পানের অযোগ্য।" তখন ভূম্য-ধিকারী সন্ন্যাসীকে তাহাই পান করিতে বলিলেন। সন্ন্যাসী আপত্তি করিলে ভূম্যধিকারী বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তবে আপনি কেমন সন্ন্যাসী। আপনি এত মদ্য পান করিলেন, আর পুড়িয়া মরিবার ভয় করিতেছেন।" অগত্যা সন্ন্যাসী সুতপ্ত মদ্যরস আকণ্ঠ পান করিলেন। এই অনৈসর্গিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া সমবেত জনমণ্ডলী ভয়ে বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ভূম্যধিকারী সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন; শৌণ্ডিকের আর মদ্যের মূল্য চাহিতে সাহস হইল না। হায়! অল্পশক্তি ভ্রমান্ধ মানব, আপনার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মান-দণ্ডের সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিপুল রহস্যের পরিমাণ করিতে সবাই উৎসুক।

(ক্রমশঃ) শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

মোক্ষ]

সাধনার পথে।

(ষষ্ঠানুবৃত্তি)

বৎস! গ্রীক লোগস্ (Logos) শব্দে ভগবানের ব্যক্তভাব বা ঈশ্বরকেই বুঝায়। ইনিই দেবদেব স্বয়ংজ্যোতিঃ দৈবী চৈতন্য; এবং মহাপুরুষগণ এই চিন্ময়ের বিলাসের বা লীলার সম্প্রজ্ঞাত সাধক। মানবসমাজের ভাষায় বলিতে গেলে, ইঁহারা সেই দেবদেবের কর্ম্মাধ্যক্ষ;—ইঁহাদেরই ভিতর দিয়া দৈবী জ্যোতিঃ ও দৈবী চৈতন্য আমাদিগের উপর বর্ষিত হয়। আমরা মায়ার আবরণে আবৃত ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মাত্র; প্রথমতঃ সেই স্ফুলিঙ্গেরও পরে যে মহাসূর্য্য হইতে ঐ স্ফুলিঙ্গসমূহের উদ্ভব হইয়াছে, এবং উহারা যাঁহার প্রতিবিম্ব মাত্র তাঁহার স্বরূপ বোধের চেষ্টা করিতেছি। ঐ মহাসূর্য্যকে শাস্ত্রে 'কাষ্ঠা ও পরাগতি'রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিশেষ্য; পশ্যন্তী বাক্ অধিগত হইলেই ইনি দৃষ্ট হন। এই সম্বন্ধ ভাষায় ব্যক্ত করা বড় দুরূহ। তুমি বাক্যে ইঁহাকে যতটুকু প্রকাশ করিতে পার, তদপেক্ষা হৃদয়ে উঁহার বিষয়ে অধিকতর উপলব্ধি করিতে পারিবে।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তোমার নিকট এতই অপ্রীতিকর। কর্ম্মফল ভোগে আত্মসমর্পণের চেষ্টা ও বহির্ম্মুখী শক্তিনিচয়ের মোহ সত্ত্বেও তিতিক্ষার আচরণ শিক্ষা পরিণামে তোমাকে যে বর্ত্তমানাপেক্ষা সেই মহিমময় ঋষিগণের অধিকতর অনুগত, অবিচলিত ও অব্যভিচারী শিষ্য করিয়া তুলিবে এবং এরূপে তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে তোমাকে শীঘ্র শীঘ্র পৌঁছাইয়া দিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ঐরূপ অধিকারের মূল্য নাই; উহা অমূল্য ধন। অতএব তোমার পরীক্ষা যতই কঠোর হউক না কেন, উহাতে অভয় হারাইও না। পরন্তু ভেদের "আমি"কে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে চিরদিনের মত দাস হইয়া থাকিবার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা আছে, সে সাধ যত দিন পূর্ণ না হয়, ততদিন তাঁহাদের চরণে তোমার হৃদয়কে নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে।' কামের বন্ধন ছিন্ন করিয়া যদি আমরা ক্রমশঃই বিষয়ে অনাসক্ত হই, তাহা হইলে আমাদের বাহিরটা যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, চতুঃপার্শ্বে জগতের কল-কোলাহলের মধ্যেও সে অভিমত জীবন যাপন করা যাইতে পারে।

বাস্তবিকই তোমার যাদৃশ কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইতেছে তাহাতে তোমাকে কোনও উপদেশের কথা বলিতে আমার হৃদয় নির্ভিন্ন-প্রায় হইয়া যায়। কিন্তু বৎস! আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি যে শিষ্যের জীবনের সহিত অতি ভীষণ পরীক্ষা অভিন্নভাবে সংযুক্ত; এবং যদি কাহারও মুক্ত হইবার বাসনা থাকে, তবে তাহাকে অলোকসাধারণ ভীষণ স্রোতের বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। অনাদি কাল হইতেই এরূপ হইয়া আসিতেছে, এবং চিরদিনই এরূপই হইবে। যে নিয়মের ফলে ঐ প্রকার পরীক্ষা হয়, তাহাও ন্যায্য ও গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। যদি এই অস্ফুট বাক্য তোমার মনে শান্তি আনয়ন করে, তাহা হইলে তাহা পাইবে। কিন্তু আমি জানি তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা নিতান্তই ক্ষীণ সান্ত্বনা বাণী মাত্র। তুমি শুনিয়াছ যে ভক্তি-বিশ্বাসে পাষাণকেও বিচলিত করিতে পারা যায়। প্রহ্লাদের আখ্যায়িকাও ত' জান। এতদিনে তোমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া উচিত যে যে মহাজ্ঞানময় পুরুষ জীবাত্মার ক্রমাভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত করেন এবং যে মহর্ষিরা যোগীর সাধন সংগ্রামের উপর অনিমেষ দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারা অসীম করুণাময় ও অপার জ্ঞানবারিধি; এরূপ যে তাহা মানবের ধারণার অতীত। অতএব যদি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিসমূহকে তাঁহাদের মূল-আধারের সহিত একসুরে গাঁথা ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তিগত কামনা না রাখি, এবং অধ্যাত্ম মহাসূর্য্য হইতে যে আলোক আসে তদনুগত ভাবে ঐ শক্তিনিচয়ের প্রয়োগ করি, ফলতঃ যদি আমরা তাঁহাদের ও শ্রীভগবানের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করি,—আমাদের ক্ষুদ্র, অসার অনিত্য ও মায়িক ব্যক্তিত্বের ধ্বংসকারী যাহাই আপতিত হউক না কেন, তাহাতে আমাদের হৃদয়ের শান্তি বিচলিত করিবে না অথবা মহিমময়ী ভগবদিচ্ছার অনুগত ভাবে কর্ম্ম করিবার নিরপেক্ষ সঙ্কল্প ক্ষীণ করিবে না। এই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের পথপ্রদর্শিনী শ্রদ্ধা অবলম্বন কর; তাহা হইলে আর সবই লঘু হইয়া দাঁড়াইবে।

যদি আমি তোমাকে আমার জীবনের ইতিহাস বলি, এবং কিরূপে ও কীদৃশ ধৈর্য্যের সহিত আমি বহুবৎসর লোকের স্বেচ্ছাকৃত গঞ্জনা ও দুর্ব্যবহার সহ্য করিয়া আসিয়াছি তাহা বলি, তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিবে যে শুধু সর্ব্ব প্রকার শোকমোহের ভিতর দিয়াই প্রকৃত আত্ম-বিকাশ সম্ভবপর। লোকে যে শোকমোহাক্রান্ত হয়, তাহাতে এক প্রকারে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সে এখনও দুর্ব্বল এখনও সম্পূর্ণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই, এখনও অবিকশিত; এবং তজ্জন্যই তাহার আরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। অতএব তোমার অদৃষ্টে ধিক্কার দিও না। যোগবিদ্যার্থীর পক্ষে অসন্তোষ প্রকৃত ভাব নহে। ভক্ত সর্ব্বদাই স্বীয় ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকিবে, নতুবা তাহার ভক্তি একটা অস্বাভাবিক ভাব মাত্র, এবং উহা কামনার দ্বারা রঞ্জিত।

* * *

তোমার উন্নতির কথা শুনিয়া, এবং যখন অচিরভাবি পুত্রশোক তোমার হৃদয়কে মথিত করিতেছিল, তখন তুমি যে আমায় দেখিতে পাইয়াছিলে, তাহাও জানিতে পারিয়া সুখী হইলাম। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিও যে শ্রদ্ধাবান শিষ্যকে কখনও একাকী কষ্টভোগ করিতে দেওয়া হয় না।

এই পুণ্যভূমির সেবায় আমি অধিকারী হইব আশা করিতেছি। আমার দীন ভ্রাতৃগণ যদি এত সহজেই বিশ্বাস হারায় এবং সন্দেহকে নিজের চিত্ত আক্রান্ত ও অভিভূত করিতে দেয়, তবে কিরূপে তাহারা উন্নতির আশা করিতে পারে? আচ্ছা, কালেই তাহারা জানিতে পারিবে যে কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের সন্দেহরাশি মহাপুরুষগণ এবং তাহাদের মধ্যে ঘোর অন্ধকারের ব্যবধান সৃষ্টি করে।

এরূপ ব্যস্ততার সহিত লিখিত পত্রে তোমাকে যে ধ্যানের সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিব এরূপ মনে করি না। পরন্তু বাক্যের আড়ম্বরে আমি তোমাকে যাহা কিছু উপদেশ দিব, তদপেক্ষা তুমি অন্তলোকসমূহ হইতে যাহা পাইবে তাহাই অধিকতর উপযোগী হইবে। এজন্যই এ বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে আমি বরাবরই লেখা অপেক্ষা নীরব ব্যাখ্যান শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছি। বর্ত্তমানে অথবা যে কোনও সময়েই হউক না কেন যদি তোমার অনুভূতি শক্তি ক্ষীণ হয় অথবা তোমার শিক্ষাবিধায়ক মহাপুরুষগণের সমীপ হইতে আগত ভর্গ ধারণে তোমার চিত্ত অক্ষম হয়, তাহাতে নিরাশ হইয়া পড়িও না। যথা-সময়েই ঐ মোহঘোর কাটিয়া যাইবে এবং তুমি যে মধ্যবর্ত্তী সময়ে মোহ ও নৈরাশ্যে ডুবিয়াছিলে তজ্জন্য তোমার কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কারণ ঐ ঐ সময়েই বিপরীত উপায়ে নানা শিক্ষা প্রদত্ত হয়। উহার বিপরীত অবস্থা, জ্যোতিঃ ও চৈতন্যের স্বতঃ স্ফুরণও, যেরূপ প্রয়োজনীয় উহাও সেরূপ প্রয়োজনীয়, কারণ ঐ সময়েই আমরা আত্মার পরাগতি অনুভব করিতে সক্ষম হই। হৃদয়ে যখন স্বতঃই চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হয়, তখন সর্ব্বত্রই ভগবানকে ওত-প্রোতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। আর যখন বেদনা ও শোক মোহের অন্ধকারে হৃদয় শুষ্ক

হইয়া যায়, তখন তিনি যে পরাৎপর জ্যোতিঃ ও চৈতন্যের পরপারে অবস্থিত, ইহাই অনুভূত হয়।

কতকটা অন্যকাজের জন্য এবং প্রধানতঃ সাহায্যের অন্য উপায়গুলি অধিকতর কার্য্যকর হইবে এই বিবেচনায় আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই তোমাকে পত্র লিখিতে বিরত হইয়াছিলাম। অতএব তুমি যে উচ্চতর লোকে আমাকে মোটেই অনুভূতি করিতে পার নাই, ইহা তোমার পত্রে জানিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছি! তোমার স্থূল ভৌতিক মস্তিষ্কের উপর দিয়া অনেক প্রবল বাত্যা বহিয়া গিয়াছে বলিয়াই তোমার পার্থিব চৈতন্য উচ্চতর লোকের অনুভূতিসমূহ প্রতিবিম্বিত করিতে পারে নাই। এই জন্যই বাহ্য শমতা ও স্থূলে পবিত্রতার এত প্রয়োজন। ইহা কখনই সম্ভব নহে যে আমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া যে চেষ্টা করিয়াছি ও যাহাতে আমার তৃপ্তি হইয়াছে, সে সব তোমার উপর কোনই কাজ করে নাই। সে যাহাই হউক, আমি সর্ব্বদাই ভিতরের জ্যোতিঃ ও প্রত্যাদেশ লক্ষ্য করিয়াই চলিব, ও যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক জানেন সেই ঋষিদের চরণে ফল সমর্পণ করিয়া শান্ত ও নিশ্চিন্ত থাকিব।

মুহূর্ত্তের জন্যও কখনও ভাবিও না যে আমি তোমাকে পত্র লিখি নাই বলিয়া তোমার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। ধ্যানের সময় সর্ব্বদাই আমি তোমার কথা ভাবিয়াছি, এবং প্রেম, পবিত্রতা ও জ্ঞানরূপ দেবশিশুগুলিকে তোমার নিকট পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে যদিও তোমার ভৌতিক মস্তিষ্কে ও গুলি প্রতিবিম্বিত হয় নাই, তথাপিও তাহারা কখনও কখনও তোমার হৃদয়ের উপর উহাদের চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে।

আমাদের কাহারও সময় বড় সচ্ছন্দে কাটে নাই। অতএব তুমি যে দুঃখ পাইতেছ, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভাবিয়া দেখ সমস্ত ব্যক্ত জীবনটাই এই সব অসুখকর ও সুখকর বোধ ও অনুভূতিতেই পরিপূর্ণ। ইহাদের যে কোনটীরই অভাবে জীবন নীরস ও শুষ্ক হইয়া উঠে। যদি কেবল সুখদায়ক অনুভূতিগুলিই থাকিত, তাহা হইলে জীবন একটা অসহনীয় একঘেয়ে ভাবের হইয়া পড়িত; এবং সুখও পর্য্যন্ত দুঃখে পরিণত হইয়া যাইত। সে দুঃখ নির্দ্দেশ যোগ্য দুঃখ নহে, কিন্তু একরূপ নীরস যন্ত্রণাময় শূন্যতার মত। অভাব এবং উদ্বেগই পার্থিব জীবনকে রুচি ও আস্বাদ যুক্ত করে, এবং ভোগসমূহের রসপ্রদায়িত্ব বিধান করে। যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের ও বাহ্যানুভূতির রাজ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ না হই, যতদিন আমাদের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির (মধুকৈটবের)

অনুভূতি মাত্রও আছে, ততদিন আমাদের দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। কারণ শুধু তাহা হইলেই সুখভোগ সম্ভবপর হইতে পারে। বিশেষ ব্যক্তভাবাপন্ন জীব দুয়েতে একটু গতি একটু স্পন্দনকার্য্য দেখে তাহার সুখ ও দুঃখে এই ভাব আছে। ইহা জানিতে পারিয়া আমি মুহূর্ত্তের জন্যও অসন্তোষ প্রকাশ করি নাই, কদাপিও বিরক্ত হই নাই এবং কদাচ আমার মানসিক স্থৈর্য্য ও অন্তর্নিহিত শান্তি হারাই নাই। আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে তুমিও যখন প্রকৃতির এই ব্যাপার ও নিয়ম সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখন শমতা লাভ করিবে, এবং অনল ও সলিলের ভিতর দিয়া সমভাবে চলিয়া যাইতে পারিবে।

বৎস! তুমি কেন যে নৈরাশ্যকে তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দিবে তাহা বুঝি না। তুমি কি জান না যে নৈরাশ্য মানেই অসন্তোষ; শুধু তাই বা কেন, অকৃতজ্ঞতা। এটী দৈত্যশক্তিনিচয়কে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ছিদ্র প্রদান করে। তুমি কি ভুলিয়া যাও যে তুমি অনন্ত ধামের যাত্রী, অমৃতের পুত্র। তোমার যদি বিজয়ে অভিলাষ থাকে, তবে তোমার প্রাক্ সঞ্চিত কর্ম্মরাশি শীঘ্রই ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে। অতএব ভাবিয়া দেখত, সাধারণ মানুষে যে যন্ত্রণা বহুবৎসর ও বহুজন্ম ধরিয়া ভোগ করে, তাহা কয়েক বর্ষের ভিতর ঘন করিয়া ভোগ না করিলে সে কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে? কর্ম্ম বা কর্ম্মক্ষয়ে যে যাতনা আনে তাহাতে বিরক্ত হইও না। বরং শেষোক্তটীকে (কষ্টকে) তোমার ঋণের পরিশোধক, চিত্তের তনুভাবের সম্পাদক ও অচিরে আকাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তির সহায়ক মনে করিয়া সাদরে আহ্বান কর। হাঁ, স্বেচ্ছাকৃত বর্ত্তমান কর্ম্মের সহিত যাহার কোনও সম্বন্ধ নাই সেই দুঃখ-ক্লেশকে সাদরে আলিঙ্গন কর, এবং আমাদিগকে যে অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্যামিত্ব শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার বলে বীরের ন্যায় ধীরভাবে তাহাদের সম্মুখীন হও। তোমার বালোচিত স্বভাব স্বক্ষেত্রেই শোভা পায়, কিন্তু যখন তুমি যোগিজনের পরীক্ষা সমূহের সহিত সংগ্রাম করিতেছ তখন উহাকে শির তুলিতে দিও না। যুদ্ধ কর—মহাসেনাপতি, তাই বা কেন, সারথীদেবের আদেশানুবর্ত্তী সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধ কর—তাঁহার আদেশের শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্থাপন কর—তাহা হইলে তুমি অন্তর ও উপর হইতে শক্তি লাভ করিবে ও বিজয়ী হইবে। যুদ্ধের মুহূর্ত্ত সমাগত হইলে ক্রন্দন করিলেত চলিবে না।

তোমার মানসিক অবসাদ ও অন্যান্য কষ্টের কথা শুনিয়া আমি

দুঃখিত হইলাম। কিন্তু প্রিয়তম! এ গুলি সমস্তই আমাদের নির্বন্ধের বা চুক্তির ভিতর। অতএব কখন সাহসহীন হওয়া কদাপিও উচিত নহে; উহারা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি এবং সাধারণ পথে সকলেরই উহাদের অধীন হইতে হয়। * ইহারাই আমাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করে ও পরিণামে আমাদের বিকাশেরই সহায়তা করে। যখন সমস্তই অন্ধতমসাবৃত ও ভীষণ বলিয়া প্রতীত হয় তখন স্থির নির্ভয়ে দাঁড়ান,—যখন গুরুও পর্যান্ত যেন আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, এমন কি যাহা যাহা সত্য, তাহা সমস্তই ভ্রান্ত ও অসত্য বলিয়া বোধ হয় এবং দেবত্বও যেন ফাঁকা স্বপ্নের মত প্রতীয়মান হয়,—তখন দৃঢ়সংযুক্ত হইয়া অবস্থিতি ইহাই প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ। যে কেহই এরূপ ভাবে থাকে তাহাকে মহত্তর পদে উন্নমিত করিয়া লওয়া হয়।

জানিও, যে শোকমোহ চিত্তকে লঘু ও পবিত্র করে, ও আমাদের অন্তরাত্মার বিকাশ ও শুদ্ধির জন্য যতদিন উহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে ততদিনই উহারা সমাগত হয়। যখন জগতের সকলেই দুঃখ পাইতেছে, তখন দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা নীচ স্বার্থানুসন্ধিৎসা মাত্র। যতদিন সহজাত জীবগণের নয়নে বারিবিন্দুও থাকিবে, ততদিন প্রকৃত শিষ্য কখনই মুক্তির কথা ভাবিবে না। বৎস! তুমি কি মনে কর যে আমরা জীবনের জোয়ারভাটা অতিক্রম করিয়া গিয়াছি এবং সর্ব্বদাই ঐশী করুণার আলোকমাত্রায় নিমজ্জিত আছি। এরূপ ভাব মনেও স্থান দিও না। তুমি যেরূপ দুঃখ পাইতেছ, আমারও সেরূপ, হয়ত ততোধিক প্রবল ভাবেও কষ্ট পাইতে হয়, এবং আমার যে শুধু নিজের জন্যই কষ্ট পাইতে হয় তাহা নহে, পরন্তু উচ্চতর লোকে যাহারা আমার সহিত কর্ম্মসূত্রে যুক্ত হইয়াছে তাহাদের জন্যও ভোগ করিতে হয়। আমার ভিতর যখন চৈতন্য-শক্তি ক্ষীণ ভাবে প্রবাহিত হয়, তখন আমি জানি যে নিশ্চয়ই আমার প্রেমাস্পদ-গণের উপর উহার প্রতিবিম্ব বা ছায়া পতিত হইবে। (গর্ভস্থ ভ্রূণ যেরূপ মাতার সুখ দুঃখ দ্বারা অভিভূত হয়, তদ্রূপ গুরুর জীবনের আলোক ও ছায়া ও শিষ্যের অনুভব গোচর হয়; গুরু সেই মহাচৈতন্যের দৈবীগর্ভ)। এই জ্ঞান ও বোধ আমার ব্যক্তিগত জীবনের বিরসতা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আনয়ন করে। যখনই আমি তোমাদের কাহারও শোকমোহের কথা শুনি, তখন তজ্জন্য দুঃখানু-ভব না করিয়া থাকিতে পারি না। অতএব বৎস! কর্ম্মফলকে যত প্রফুল্লতার সহিত অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পার, কর; এবং জানিও যে তোমার যখন আমাকে ব্যক্ত ভাবে দেখিতে পাইলে ভাল হইবে, তখন তুমি তাহা দেখিতে পাইবে। এতদ্বিরোধী আকাঙ্ক্ষা মাত্রই বিকাশের পরিপন্থী হইয়া দাড়ায়, ও সে মহা নিয়মের কার্য্য ক্ষুণ্ণ (কার্য্যে ব্যাঘাত) করে। আমাদের ব্যক্তিগত কোনও অভিলাষ থাকা অকর্ত্তব্য। শুধু সেই মহাদেবের শ্রীচরণে আমরা নিঃশেষে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিব এবং তাঁহার আজ্ঞায় যাহা উপস্থিত হয় তাহাই লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব।

* দুঃখ সামান্য অর্থাৎ সকলের সাধারণ সম্পত্তি। উহা সর্ব্বদাই ভেদ ভাবের আমির মিথ্যা প্রত্যয় ধ্বংস করে। যথা ভাগবত ৭।১৫।২৪

পক্ষান্তরে, অন্যের সুখ দুঃখে আমাদের একেবারে নিরপেক্ষ থাকাও কর্ত্তব্য নহে; বরং যাহাদের সঙ্গে তুমি কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ তাহাদের জন্য ভাবিত হওয়াই উচিত। তাহারা নিজেরা যেরূপ তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করে তাদৃশ অনুভব করিও, যেন তোমার সহানুভূতি সম্পূর্ণ হইতে পারে এবং তুমি তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে অধিকতর সক্ষম হও। তুমি কি জান না যে যাহারা সম্পূর্ণ সহানু-ভূতি না করে, তাহারা সম্পূর্ণ সান্ত্বনাও দিতে পারে না। কারণ সহানুভূতি বস্তুতঃ ইহাই দেখায় যে আমাদের আমিটা প্রকৃতই এক, ইহা আত্মার সর্ব্বাত্মিকা ভাবের বিকাশ মাত্র। বর্ত্তমান কালের যে সব বৈদান্তিক মানুষকে তুষারের ন্যায় শীতল, এবং বিশ্বের নিকটে, নিজের নিকটে এমন কি বিশ্বপতির নিকটেও অপ্রয়োজনীয় হইতে শিক্ষা দেয়, তাহাদের নির্ম্মম ভাবুকতার অনুসরণ করি না; আমাদের প্রেম যতই মহত্তর, গভীরতর ও পবিত্রতর হইবে, সকলের জন্য আমরা যতই সহানুভূতি করিতে শিখিব, ততই অধ্যাত্মরাজ্যে আমাদের স্থান উচ্চতর হইবে ও আমরা ভগবানের ততই সন্নিকটে পৌছিব। একমাত্র প্রেমই জ্ঞানের স্পষ্ট ও অনন্যসাপেক্ষ বিভাব এবং পূর্ণতম অভিব্যক্তি।

বৎস! তোমাকে আমি আর অধিক কি বলিব; তুমিত জানাই যে আমার যথাসাধ্য আমি করি, এবং আজ্ঞা পাইলে, তোমার সাময়িক শোক মোহভার অপনয়ন করিতে আমার যতটা আনন্দ হইবে এরূপ আর কিছুতেই হইবে না। একজন তৎপর শিষ্যের হৃদয় হইতে ক্ষণকালের জন্যও অন্ধকার দুর করা অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত ও মহদ্ভাবোদ্দীপক কর্ত্তব্য আর কি হইতে পারে? অতএব মুহূর্ত্তের জন্যও মনে ভবিও না যে আমার আসিবার ইচ্ছার অভাব আছে। কিন্তু, প্রিয়তম! আমাদের পক্ষে অভিলাষ সংযম করিয়া রাখিয়া ভগবদিচ্ছারই সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইতে দেওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ কি? না,

তুমি এখনও 'এস. এস', বলিয়া কাঁদিবে, এবং তোমার বিলাপে আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করাইবে ?

প্রিয় বৎস ! নৈরাশ্যে কথনও অবসন্ন হইও না। উহা অহঙ্কারের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র। তুমি যে নীরসতা, শুষ্কতা ও শূন্যতা অনুভব করিতেছ, উহা সমস্তই মায়া মাত্র, এবং কালে উহার ঘোর কাটিয়া যাইবে। তোমার নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই।

কেন, প্রিয়তম, তুমি কি নিমেষের জন্যও, অতি অল্প কালের তরেও, প্রকৃত চৈতন্যের বা সত্যের আস্বাদ অথবা ভগবানের নিকট হইতে যে দৃষ্টি আসে তাহা লাভ কর নাই ? এবং সাংসারিকতার মেঘ ও কুজ্ঝটিকার মধ্যে এবং শারীরিক অভিলাষগুলির মধ্যে থাকিয়াও হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তুমি কি দীন ও অনুগত ভাবাপন্ন নহ ? অতএব তোমার পরিণাম উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে না বলিয়া কেন সন্দেহ করিতেছ ? গীতাই বলেন—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"

অর্থাৎ এই ধর্ম্মের স্বল্পও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে, আমার ভক্ত কথনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের ভগবদ্গীতা স্মরণে রাথ ও তোমার মনোনীত মার্গে সতত যুক্ত হইয়া নিত্যাভিযুক্ত হইয়া রহ। সবই অতঃপর ভাল হইয়া আসিবে। ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ বা আশঙ্কা যেন কদাপিও তোমার হৃদয়কে অভিভূত না করে। কারণ তাহা হইলে অসুরশক্তি সমূহকে নূতন নূতন মায়া সৃজন করিয়া তোমাকে আরও যন্ত্রণা দিবার নূতন অবসর প্রদান করা হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুগ্ধ।

(১)

ঘুরিব তোমারি লাগি হে হৃদিরঞ্জন,
ঘ্রাণে চিত্ত মাতোয়ারা রূপে মুগ্ধ আঁথিতারা
ঘুরিব উন্মত্ত পারা অনন্ত জীবন।

(২)

ঘুরিছে অনাদি কাল মুগ্ধ পৃথিবী,
নিরথি ভাস্কর শোভা সাতিশয় মনোলোভা
ছুটিয়াছে নিশি দিবা পরশিতে রবি।

(৩)

জ্বলিলে স্ফটিকাধারে জ্যোতি মনোহর,
মুগধ পতঙ্গগণে ঘেরিতার আবরণে
উৎসুক অক্লান্ত মনে ঘুরে নিরন্তর।

(৪)

পুষ্প-মধু গন্ধে মুগ্ধ মধুকর যত,
কুসুমের আশে পাশে ঘুরিতেই ভালবাসে
সুমধুর মৃদুভাবে গুঞ্জরি নিয়ত।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

রাই বিরহিণী।

কেন লো স্বজনী বল বারবার,
আমাতে কি আমি আছি হায়।
কেমনে ভুলিব মূরতি তাহার,
সতত যাহারে পরাণ চায়।
শিরায় শিরায় হৃদয় মাঝারে,
সে মূরতি লেখা কে মুছে হায়।
পলকে প্রলয় না হেরে যাহারে,
কেমনে পাসরি বলনা তায়।
ভালবাসা সখি জাননা কেমন,
কভু অমিয় কভু বা গরল।
কভু মারে কভু বাঁচায় জীবন।
আমার ভাগ্যে শুধু হলাহল।
চির সুধা ভাবি প্রণয়-সলিলে,
ঝাঁপ দিয়ে সখি সবাই ভাসে।

করমের দোষে ডুবি হলাহলে,
রেখেছি পরাণ পীযুষ আশে।
কি হ'ল আমার বুঝি না লো সখি,
আমি কে "সে" মম ? বুঝিতে নারি।
নয়ন চাহিলে তাহারে দেখি,
মুদিত করিলে অন্তরে হেরি।
নাহি ঘুম চোখে, সেথা সে বিরাজে।
স্বপন-আবেশ যদি বা হয়,
দেখি লো তাহারে মনোরম সাজে ;
নয়ন-নীরে যামিনী পোহায়॥
যমুনার জল আনিবারে যবে,
যাই লো ফিরি কতই নিরাশে।
স্খলিত পল্লব পতনের রবে,
চমকিয়া ভাবি ঐ শ্যাম আসে॥
কলস-তাড়নে কালিন্দী সলিলে,
খেলে লো চঞ্চল লহরীচয়।
ভাবি শ্যাম বুঝি কেলী করে জলে,
চিত তরঙ্গিত হতাশ হয়॥
একঠাই সবে বসন রাখিয়া,
চঞ্চল মনে স্ববাস না পেয়ে।
ভাবি শ্যাম তাহা লয়েছে হরিয়া,
পাইয়ে হৃদি যায় গো ভাঙ্গিয়া॥
গৃহে ফিরি যবে দেখি চেয়ে,
ওই তমাল কদম্বের তল।
ভাবি বুঝি শ্যাম র'য়েছে দাঁড়ায়ে,
ভগ্নহৃদয় হয় লো চঞ্চল।
পবন হিল্লোলে তরুশাখা দোলে,
ভাবি নটবর দুলিছে তা'তে।
আশে বুক বেঁধে দাঁড়াইল মূলে,
চলে যাই পুন ব্যথিত চিতে॥

বিহগপক্ষের সঞ্চালন স্বরে
কৌতুক করি দেয় করতালি।
লুকায়ে সে বুঝি, ভাবি মনি মনে ;
দুখের কাহিনী কাহারে বলি॥
নিকুঞ্জ কাননে বিহঙ্গম গায়,
মোহন মুরলী ভাবি ঐ বাজে।
আকুল পরাণে ছুটিলো তথায়,
বাধা ঠেলে পায় সকাল সাঁজে।
যাইয়ে কাননে ঝিল্লির শুনি,
ভ্রান্ত হৃদয়ে ভাবি মনে মনে।
ওই বুঝি তার নূপুরের ধ্বনি,
খুঁজিলো বৃথায় গহন বনে॥
পক্ষরবে পাখী তরুবাটি ছাড়ি,
কাঁপা'য়ে পল্লব পলা'য়ে যায়।
ভাবি সখা মোর, খেলে লুকোচুরী ;
নিমেষ তরে পাই সুখ তায়॥
চলিতে চলিতে কুঞ্জে কুঞ্জে সখি,
কণ্টক লতিকা বসন ধরিলে।
চমকিত হ'য়ে ফিরে চেয়ে দেখি
সে এসে বুঝি ধরেছে আঁচলে॥
নিজগৃহে বনে কিম্বা পরবাসে,
শুকসারী যবে করে আলাপন।
ক্ষণিকের তরে ভাবিলো উল্লাসে,
ডাকে বুঝি মোরে মদনমোহন॥
তা'র লীলাস্থল পুলিন কানন,
শান্তির আকর হয়েছে লো মোর,
তা'র নাম কথা হয় লো যখন,
তাহারে ভাবিয়া হইলো বিভোর॥
(সখি) আমি যা'র তরে হয়েছি এমন,
সে কি মোর তরে ভাবেলো আর ?

ভাবিতে ভাবিতে যাবে লো জীবন ,
তবুও না ছাড়ি ভাবনা তার।
মরমের ব্যথা মরমে মিশাই ;
স্মৃতি কই তার পারি হে ভুলিতে ?
আপনা ভুলিতে পারিবে লো রাই,
ভুলিতে তবু নারিবে মুরলী।

"শরচ্চন্দ্র"

অর্থ]

প্রায়শ্চিত্ত।

আহারাদির পর উপরে শুইয়া আছি, এমন সময়ে, শ্যামলাল আসিয়া খবর দিল "বাবু, নীচে একজন রোগী আসিয়াছে।" তাহাকে বলিলাম, "জানিয়া এস যে কি রোগ ও আমাকে এখনি যাইতে হইবে কি না।' আর যদি তেমন শক্ত অসুখ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে একটু অপেক্ষা করতে বল, আমি আধ ঘণ্টা পরেই নীচে যাইতেছি"।

শ্যামলাল ফিরিয়া আসিয়া বলিল "বাবু, রোগীর বড় যাতনা হচ্ছে, আপনাকে এখনি যাইতে হবে"।

আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না ; বৈঠক খানায় গিয়া দেখি রোগী একজন অপরিচিত যুবক। আমাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু, আমার এই ডান হাত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, অনবরত কাঁপিতেছে ও মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা হয়। এক এক সময় এত বাড়ে যে ইচ্ছে করে, আত্মহত্যা করে ফেলি ; সে যন্ত্রণা অসহ্য"। বলিতে বলিতে একটা অস্পষ্ট কাতর ধ্বনি করিয়া, চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, নিজের ডানহাত বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিল ; বোধ হইল যেন ভিতরে একটা প্রবল যাতনার সহিত যুদ্ধ হইতেছে ও তাহা নীরবে সহ্য করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। মুখমণ্ডল আরক্ত, চক্ষু দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

তাহার বেদনাযুক্ত হাত খানাকে একটু দেখিয়া বেদনার স্থান ও ধরণের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কোনই উত্তর দিতে পারিল না।

"কাঁধের কাছে ?"—না ?" "কনুইয়ের কাছে ?"—"না ?"

"কব্জীর কাছে ?"—"না ? সমস্ত হাত জুড়িয়া ব্যথা ও বড় যাতনা ! ডাক্তার বাবু রক্ষা করুন, আপনি ছুরি দিয়ে অস্ত্র করে দিন, যদি সেরে যায়।"

"কি রকমের কি ধরণের ব্যথা বলুন দেখি ?—খুব কন্‌কন্‌ করছে কি ?" "না।" "সিঙ্গি মাছের কাঁটার মতন বিঁধছে কি ?"—"না।" "ছিঁড়ে যাচ্ছে বা খসে যাচ্ছে এরকম কিছু মনে হয় ?"—"না। সমস্ত ভিতরটা কে যেন জোরে মুচড়ে দিচ্ছে। ওঃ গেলাম" ! তাহাকে কথাবর্ত্তায় অন্যমনস্ক রাখিয়া হাতটা পরীক্ষা করিতে লাগিলাম ; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে যন্ত্রণার একটু প্রশমন হইলে, যুবক বলিল "এই দেখুন হাত কাঁপছে ; এই রকম দিন রাত কাঁপে। আমি সংসারে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছি ; চাকরী বাকরী সব গিয়াছে। সে যাক্, যন্ত্রণার উপশম হলে বাঁচি। আচ্ছা ডাক্তার বাবু, অস্ত্র করে হাতটাকে বাদ দিলে উপকার হতে পারে না।"

আ। তা' বোধহয় দরকার হবে না ; আর তা'র ফলাফলও সম্পূর্ণ রূপ অনিশ্চিত।

যু। ডাক্তারী, কবিরাজী ঔষধ মালিস, দৈব মাদুলী ধারণ, মাটীমাখা প্রভৃতি অনেক করেছি ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। এখন আপনার কাছে এসেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি ছুরি চালিয়ে, কেটে কুটে দিয়ে, কোন উপকার করতে পারেন, তা করুন ; তা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।

"আপনার নাম কি ?" "হরগোপাল রায়।" "আসছেন কোথা থেকে ?" "কোন্নগর।" "এ অসুখ আজ কতদিন হয়েছে ?" 'প্রায় ছমাস।" "কোন আঘাত টাঘাত লেগেছিল কি ?" "না।" "কোন উচু জায়গা হতে পড়ে গিয়েছিলেন কি? "না।" "কোন ঠাণ্ডা জায়গায় বেশী দিন ছিলেন কি ?" "না।" "তবে এরূপ হবার কোন কারণ অনুমান করতে পারেন ?" "না।"

পুনরায় হাত খানাকে ভালরূপে পরীক্ষা করিলাম ; কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ইহা বাত নয় ; কেননা তা হলে অনবরত কাঁপচে কেন? হইতে পারে পক্ষাঘাতের পূর্ব্বলক্ষণ ; কিন্তু ছয়মাসের রোগ তথাপি কোন রূপ স্ফীততা বা কৃশতা হয় নাই। খুব সম্ভব ভিতরের পেশী ও স্নায়ু কোনরূপ জখম হইয়াছে ; কিন্তু তা'র কারণ কি ?

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার পূর্ব্বে মেহ কি উপদংশ রোগ হইয়াছিল কি ?" না।" "কোন গর্হিত কার্য্য করেছিলেন কি না ?" প্রশ্নটা যেন হঠাৎ

আমার মুখ দিয়া বাহির হইল। লোকটা কিন্তু শুনিয়াই যেন একবার চমকাইয়া উঠিল। আমারো কৌতূহল বাড়িল; সন্দেহ হইল, নিশ্চয়ই কোন না কোন গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। বলিলাম "বলুন না, না বল্লে চিকিৎসা করিব কি করে? বৈদ্যের কাছে রোগ লুকাইয়া রাখিলে, আপনাকেই ভুগিতে হইবে।"

যু। অন্যায় কাজ? হাঁ একটা অন্যায় কাজ করেছিলাম বটে। কিন্তু তার সঙ্গে এরূপ রোগের কোন সম্বন্ধ আছে কি না ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে শুনুন। আমাদের ওখানে পুরাণো বাঁধাঘাটের নিকট গঙ্গাতীরে অশ্বত্থতলায় এক প্রাচীন সাধু আসিয়া দিন কতক ছিলেন। সাধুটী সর্ব্বদাই মৌনী, অনাহারী ও ধ্যানস্থ। চারিদিকে মহা গুজব রটিয়াগেল, যে এমন সাধু কখন আসে নাই, কেহ কখন দেখে নাই। লোকে লোকারণ্য হইত ও পদধূলি লইয়া যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনাহারী; কিন্তু কেহ কিছু মুখের নিকট ধরিলে তাহা তিনি খাইতেন। আমরা কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক যুক্তি তর্ক করিয়া স্থির করিলাম, যে লোকটা নিশ্চয়ই বুজরুক ও জুয়াচোর; নহিলে প্রায় সমস্ত ক্ষণ মানুষ কখনো ধ্যানস্থ বা মৌনী থাকিতে পারে না। সঙ্গে নিশ্চয় জন কয়েক ওস্তাদ চেলা আছে; তারা এই সুযোগে কিছু উপায় করবার চেষ্টায় আছে: আর ওই বুজরুক বেটা চোক বুজে, মট্‌কা মেরে, বসে আছে। আর যদি বলেন অনাহারে থাকার কথা? তা হলে বলি যে তার মুখের ফাঁদে যা ধরা হত, তাতেই একজন বেশ 'খাইয়ে' লোকেরও পেটভরে যায়; তা'ছাড়া লোকে ক্ষীর, দই, লুচী, রাবড়ী, সন্দেশ, ও ক্ষীরেলা ছাড়া প্রায়ই কোন বাজে জিনিষ আনিত না; সুতরাং না খাটিয়া যদি বসে বসে এমন মুখের সাম্‌নে পেটভরা চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় পাওয়া যায়, তা' হ'লে আমরা অনেকেই এরূপ সাধু সাজতে পারি। তাই ভাবিয়া ঠিক করিলাম যে মুখের সাম্‌নে ধর্‌লেই যদি খায় ত বাছাধনকে এমন জিনিষ খাওয়াতে হবে যে আর এখানে সাধুগিরি না দেখাতে হয়।

পরামর্শ আঁটিয়া একদিন মধ্যাহ্ন কালে, অর্থাৎ যখন লোকজন ছিল না, কাঁটানটে শাক লইয়া তার মুখের সামনে ধরিলাম! একবার মনে হইল, না কাজটা ভাল হচ্ছে না, আবার মনে হ'ল দেখা যাক্ না, কত বড় বুজরুক্, কতক্ষণ সহ্য কর্‌তে পারে? মুখের নিকট ধরতে, সাধু ধীরে ধীরে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের ন্যায় অম্লান বদনে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন; আমিও মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। মনে মনে বলিলাম, 'বাপুহে, ঘু ঘু দেখেছ, ফাঁদত' দেখনি। আ'রাম ক'রে রাবড়ী মালাই খাও; এবার কাঁটা খাওয়ার সুখ দেখ।"

তার পর বেচারীর জিহ্বা ও ঠোঁট কাঁটাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তখন একটু কষ্ট ও অনুতাপ বোধ হইল, একজনের শরীর হইতে রক্তপাত হইলে কাহার না কষ্ট হয়! মনে হইল, 'না আর নয়, যা 'কর্‌বার তা' করে ফেলেছি আর কষ্ট দিব না।—কিন্তু ভাবিলাম বেটা নিশ্চয়ই সাধু নয়, কেন না সাধু হ'লে যোগবলে কাঁটার তীক্ষ্ণতা অনায়াসে লোপ করিত পারিত। সাধারণ মানুষ, তাই কাঁটাতে আমাদেরই ন্যায় দুর্দ্দশা পাইল। ভাবিলাম ও খুসী হইলাম যে, বেটাকে খুব নাকাল করেছি। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় সমস্ত কাঁটা ও শাক নিঃশেষ হইয়া গেল। আহার শেষ হইলে সাধু একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাতটা যেন একটু আড়ষ্ট ও ব্যথা বোধ হইল। ভাবিলাম অনেকক্ষণ হাতখানাকে এক ভাবে শূন্যে রাখাতে এইরূপ ব্যথা অনুভব হ'চ্চে। কিন্তু সে চাহনীতে কি যেন একটা ছিল, যেন তাহাতে আমার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল; যেন সে নীরব ভাষায় বলিল, "আমি ত' তোমার বা জগতের কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই; তবে তুমি আমাকে এরূপ ক্লেশ দিলে কেন?'

সে নীরব দৃষ্টির পর আর আমি তথায় থাকিতে পারিলাম না; কি যেন ভয়, অনুতাপ ও চক্ষুলজ্জা আসিয়া ঘেরিয়া ধরিল; কেমন যেন নিজেকে একটা অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলাম না। সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম। ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল, যে কাজটা গর্হিত হইয়াছে, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসা উচিত। গভীর রাত্রে আমাদের দলের জন দুইকে লইয়া সাধুর নিকট গমন করিলাম,—একলা যাইতে ভরসা হইল না,—কি জানি যদি মার্ ধোর্ দেয়,—তা' ছাড়া আর একটা অনির্দ্দেশ্য ভয়ও হইতেছিল।

অশ্বত্থতলায় গিয়া সাধুকে দেখিতে পাইলাম না, ভাবিলাম যে হয়ত' মুখে ঔষধ লাগাইবার চেষ্টায় কোথায় গিয়াছে। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষু স্থির; দেখিলাম সাধু আমাদের মাথার উপরে; ভূমি হইতে প্রায় দশ হাত উচ্চে,—সম্পূর্ণ নিরাবলম্বনে শূন্যে পদ্মাসন করিয়া বসিয়া আছে। তাহার মাথাটা প্রায়—গাছের ডাল স্পর্শ করিয়াছে। আমরা নির্ব্বাক্, বিস্মিত ও স্তম্ভিত; শূন্যে কিরূপে এই ভাবে একজন বসিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। সেই মুহূর্ত্তে বৃক্ষতল হইতে ভীষণাকার দুই ছায়া-মূর্ত্তি বহির্গত হইল,—মূর্ত্তিদ্বয় এত ভীষণ ও তাহাদের এরূপ ভ্রূকুটী, যে

আমরা আর ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা না করিয়া ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া আসিলাম।

পরদিন শুনিলাম,—সাধু স্থান ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই দিন হইতেই হাতের এই প্রকার অনবরত কম্পন ও দারুণ যন্ত্রণা; জানি না, ঐ ঘটনার সহিত আমার এই রোগের কোনরূপ সংস্রব আছে কি না?"

* * * * *

আমি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিলাম, হাতটীকে আরও দুই তিন বার ভালরূপে পরীক্ষা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। শেষে বলিলাম "নিশ্চয়ই--নিশ্চয়ই সংস্রব আছে; নিরীহ ভগবংতুল্য সাধুকে বিনা কারণে পাপ-বুদ্ধির বশীভূত হইয়া যে ক্লেশ দিয়াছেন, তাহারই ফলে এই যাতনা।—আমি যতদূর দেখিলাম তাহাতে বোধ হয় ডাক্তারি চিকিৎসায় কিছু হইবে না।"

যু। আপনার দ্বারা কোন উপকারের আশা নাই?

আ। না।

যু। তবে উপায়।

আ। এক উপায় দৈব কৃপা; দৈব উপায়ে যদি কিছু উপশম হয় ত' হবে। নহিলে চিকিৎসায় কোন আশা নাই; আমার যতদূর মনে হয়, তা'তে যদি আপনার তীব্র অনুতাপ হয় ও তদুপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে ভগবান্‌কে ধরুন, এবং সাক্ষাৎ ভগবান্ সদৃশ সাধু সন্ন্যাসিগণের শরণাপন্ন হউন;—হয়ত' এক দিন না এক দিন রোগ মুক্তি ঘটিবে।

যুবক চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল, তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। ইহার ছয় মাস পরে হঠাৎ এক দিন যুবকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। যুবক আমাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি সানন্দে বলিয়া উঠিল, "ডাক্তারবাবু আমি সেরে গেছি, আপনার উপদেশ মত কাজ করেই এ যাত্রা নিষ্কৃতি পেয়েছি। আপনার কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে।" অত্যন্ত কৌতুহল বাড়িয়া উঠিল।

যু। আপনার কথামত সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই অকপটে আত্মপাপ বর্ণন করিয়া তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিতাম। অবশেষে এক প্রাচীন সাধু বলিল ভয় কি? যদি তোমার মনে প্রকৃত অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের বাসনা উদয় হইয়া থাকে, তা' হ'লে নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি পাইবে। ক্ষণিক অহঙ্কারের মোহে, নাস্তিক্য বুদ্ধির দোষে, অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছ, তা'র ক্ষমা অবশ্যই আছে।"

আমি সাধুর পা দু'টী জড়াইয়া ধরিলাম। সাধু বলিলেন "আমাকে ধরিয়া কি হইবে।" বাবা তারকনাথের নিকট গিয়া পড়,—তিনি জগদ্‌গুরু—সকলের গুরু, সন্ন্যাসী মাত্রেরই গুরু, তিনি সদাশিব আশুতোষ। তাঁহার শরণাপন্ন হও, তিনিই মুক্তি দিয়া দিবেন।" মজ্জমান ব্যক্তি যেমন প্রাণের আশায় তৃণখণ্ড ধরিয়া বসে, সেইরূপ আশায় ৺তারকেশ্বরে ছুটিলাম।

ক্রমাগত নয়দিন অনাহার অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তার পর প্রত্যাদেশ পাইলাম। এ নয়দিন যে কি কষ্টে কাটিয়াছিল, তা' মুখে বলিতে পারি না—একেবারে অনাহার, রাত্রে নিদ্রা নাই।—তার উপর দুশ্চিন্তা—যদি দুরদৃষ্ট ক্রমে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হয়। প্রত্যাদেশ হইল যে, "যদি তীব্র দংশন-যাতনা সহ্য করিতে পারিস্, আর এক মাস ধরিয়া রাস্তায় পতিত শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য উচ্ছিষ্ট খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিস্, ত' রোগ হইতে মুক্তি পাইবি।"

দংশন যাতনা সহ্য করিতে অনায়াসে প্রস্তুত; কেননা দিবারাত্রি যে যাতনা ভোগ করিতেছিলাম তার তুলনায় দংশন-যাতনা যতই তীব্র হউক না কেন, তত প্রবল হইবে না। কিন্তু নর্দ্দামায় পতিত শৃগাল-কুকুর-ভক্ষ্য ঘৃণাকরজনক উচ্ছিষ্ট কি করিয়া খাই,—যাহা মেথর স্পর্শ করে না, ভদ্র সন্তান তাহা কিরূপে ভক্ষণ করিব? একবার মনে হইল পারিব না চলিয়া যাই। আবার দারুণ রোগ-যন্ত্রণা মনে হইল,—ভাবিলাম মরণ হয় না কেন—অবশেষে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণই স্থির করিলাম।

প্রথম দু' এক দিন পারিলাম না—বমনোদ্বেগ আসিল; অনাহারে—কাটাইলাম। তারপর—এ কষ্ট রহিল না,—উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের পার্শ্বেই পাতায় মোড়া উৎকৃষ্ট ভোগ রহিয়াছে দেখিলাম, এইরূপ প্রত্যহই থাকিত। বোধ হইত কে যেন আমারই নিমিত্ত সযত্নে দেবতার ভোগ রাখিয়া যাইত। দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল; চলিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে কোথা হইতে এক পাগল আসিয়া আমার ডান হাতের এই কব্জার কাছে ভীষণ ভাবে কামড়াইয়া দিল। বহুকষ্টে তা'র হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দেখি, যে ছাল, চামড়া, মাংস কাটিয়া শির ও হাড় বাহির করিয়া দিয়াছে ও বেগে রক্তস্রাব হইতেছে। চীৎকার করিতে করিতে দুধ পুকুরের জলে পড়িয়া হাত ডুবাইয়া ধরিলাম;—ঘাটের নিকটের জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল। দারুণ যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। মূর্চ্ছা ভঙ্গে দেখি দু'একজন লোক আমার শুশ্রূষা করিতেছে; জলপটী বাঁধিয়া

দিয়াছে ও রক্তস্রাব বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু একটা জিনিস সেই সঙ্গে লক্ষ্য করিলাম, যে পূর্ব্বের মত হাতের আর কাঁপুনী ও যন্ত্রণা নাই। এত যন্ত্রণাতেও আনন্দ উৎসাহ এবং ভরসা যেন মেঘান্তরিত রৌদ্রের অন্তরাল হইতে জাগিয়া উঠিল। আবার নবজীবন পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইলাম। তারপর ধীরে ধীরে ক্ষত ও তজ্জনিত স্ফীতি এবং প্রদাহের উপশম হইয়া গেল। সেই অবধি বেশ সুস্থ আছি। আপনার উপকার আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না।"

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম বাহুমূলে গভীর ক্ষতের চিহ্ন বর্ত্তমান।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

———

অর্থ]

চন্দ্রালোকে বারাণসী।

(সনেট্)

দেখিলাম বারাণসী নিশির হৃদয়-দেশে ;
বিশ্বেশ্বর বসে যেন ভুবনমোহন বেশে ;
শুভ্রকান্তি-সৌধময় স্ফটিক প্রতিমা প্রায়,
সুপ্রসন্ন সমুজ্জ্বল শুভ্র চারু চন্দ্রিকায় ;
পরিপূর্ণ শোভাধর শিরে শোভে শশধর,
ব্যোম জটা উজলিয়া উছলিছে চন্দ্রকর,
তারকা-কুসুম জালে সজ্জিত সুকেশ-দাম,
দিগম্বর বামদেব ত্রিভুবন-অভিরাম ;
সমাসীন যোগীশ্বর দিব্য যোগাসন পরে,
দুই ধারে দুই উরু অসি বরুণার ধারে ;
সম্মুখে সন্নদ্ধ সুখে বিশ্ববন্দ্য পদদ্বয়
অর্দ্ধচন্দ্র-অনুকারী জাহ্নবীর বারিময় ;
শশি-স্নাত সোপানের শত শ্রেণী সুবিমল
পদে যেন ভক্তার্পিত সচন্দন মাল্যদল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

———

অর্থ]

ব্রহ্মচর্য্য।

হিন্দুসন্তান মাত্রেই সনাতন ধর্ম্মসাধন মার্গে ব্রহ্মচর্য্য যে প্রথম অবলম্বনীয়, ও ইহা যে সাধনার একটী বিশেষ অঙ্গ তাহা অবগত আছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে আমাদের উত্থানশীল যুবক ও বালকবৃন্দ যাহাদের উপর হিন্দুর পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সর্ব্ব ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের অধিকাংশই এই ব্রহ্মচর্য্য অভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য, উদ্যমহীন, ও উন্মার্গগামী হইয়া তাহাদের উপর ন্যস্ত কর্ত্তব্যসমূহ, প্রাচীন সম্প্রদায়ের আশা ভরসা বীজাবস্থায়ই বিনষ্ট হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ তাহাদের স্বভাবজাত দোষ বলা যায় না ; শিক্ষার অভাব ও অসৎ সঙ্গও এই অধঃপতনের কারণ। তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, ও তাহাদের প্রাণে হিন্দুধর্ম্মের উজ্জ্বল বিভা বিস্তার দর্শন মানসেই ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

মনুষ্য-দেহধারী মাত্রেরই নিজের বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য ; কারণ, মানব-জন্ম বহু আরাধনা ও বহুভাগ্য-ফলেই লাভ হইয়া থাকে এবং ইহাই স্বর্গদ্বারের সোপান। যদি ইহার সদ্ব্যবহারই না করিলাম, যদি কহিনূরের ক্ষেত্রে আসিয়া মাটি কাটিয়া তাহার সন্ধানই না করিলাম, আর্য্যভূমে আর্য্যসন্তান হইয়া যদি "বিষধরসদৃশৈরিন্দ্রিয়ৈর্দষ্টগাত্রঃ" হইয়া অনার্য্যোচিত কার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করিলাম, তাহা হইলে এই মনুষ্যজন্মে ধিক্! আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভতরং নরজন্ম জন্তু-
স্তত্রাপি পৌরুষমতঃ সদসদ্বিবেকম্।
সংপ্রাপ্য চৈহিকসুখাভিরতো যদিস্যাৎ
ধিক্ তস্য জন্ম কুমতে পুরুষাধমস্য ॥"

"অতিশয় দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া এবং সেই জন্মে পুরুষকার ও সদসদ্ বিবেক প্রাপ্ত হইয়াও জীব যদি পার্থিব সুখ-ভোগেই একান্ত নিরত হয়, তাহা হইলে সেই কুমতি পুরুষাধমের জন্মই ধিক্।"

ধর্ম্মাচরণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; ইহা হিন্দুর নিত্য অনুষ্ঠেয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম অধিকার অনুসারে পালন করাই নর-নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম; না করাই পাপ। উহা "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা" এই ভাবে আচরণ করিবে। মৃত্যুর যখন অবধারিত কাল নাই, ধর্ম্মাচরণেরও কোন অবধারিত কাল থাকিতে পারে না। অতএব দেহ ও মনের উন্নতিকল্পে, চৈতন্যশক্তি আমাদের মধ্যে বিকাশ করার মানসে আমাদের আশৈশব যে সমস্ত ক্রিয়া করিতে হইবে। ভগবদ্ভাবে লীন থাকার জন্য আমাদের যে সকল অভ্যাস অবলম্বন করিতে হইবে, অষ্টাঙ্গ যোগের যমসাধানান্তর্গত ব্রহ্মচর্য্য তাহার মধ্যে একটী প্রধানতম। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আমি শুধু হঠযোগের একটী প্রক্রিয়া বা শারীরিক "কস্‌রৎ" বলিতেছি না। কিন্তু ইহা মানব-জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবৎ শক্তি বিকাশের সহায়রূপে অবশ্য পালনীয় এবং হিন্দুসন্তানমাত্রেরই দৈনন্দিন কর্ত্তব্য। তবে ক্ষেত্র ও অবস্থা অনুসারে যে যত দূর পারিবেন সে তত দূরই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন; স্বল্প হইতেই ক্রমশঃ বৃহতের দিকে অগ্রসর হইতে হয়; ভালর যতটুকু পাওয়া যায় তাহাই ভাল। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"

অতএব স্কুলে যাইতে হইবে, পড়া তৈয়ারী করিতে হইবে বলিয়া নিত্য ধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে উহাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া যথাসম্ভব আশ্রমোচিত ধর্ম্ম আচরণ করাই আর্য্যসন্তানের আর্য্যত্বের পরিচয়। এই আশ্রমোচিত ধর্ম্মই দেহ ও মনের পোষক ও উহাদের শক্তি বৃদ্ধিকারক; এবং ঐ শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যয়নাদির ফলসহজসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

মানবদেহে যত প্রকার শক্তি আছে ওজঃ (Human magnetism) তন্মধ্যে প্রধান, এবং ইহাই ব্রহ্মতেজ নামে অভিহিত। ওজঃই রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুর তেজ এবং সপ্তম ধাতু শুক্রই ইহার আশ্রয়স্থল। এই ওজঃ সর্ব্বদেহব্যাপী হইলেও মস্তিষ্কে ও হৃদয়েই বেশীর ভাগ সঞ্চিত থাকে। ইহা যাহার শরীরে যত বেশী থাকে সে সেই পরিমাণে শ্রীমান্, বুদ্ধিমান্, মেধাবী ও তেজস্বী হয়। সঙ্গীত, কবিত্ব, পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতি তত্তৎকার্য্যকারীর ওজের বিকাশানুযায়ী শ্রোতার

চিত্তাকর্ষক ও আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। আমরা ভাব বলিলে যাহা বুঝি তাহাতেও ওজের ক্রিয়া আছে, ওজের তারতম্য অনুসারে হৃদয়ে ভাবের উন্মেষ হয় ও অন্যের উপর তাহা বিস্তার করে। ভাবহীন ভাষা ও চেতনাশূন্য দেহ উভয়ই সমান। জগতে উন্নতিলাভ করিতে হইলে দেহে ওজের সংরক্ষণ বিশেষ আবশ্যক; এবং তাহার উপায় ব্রহ্মচর্য্য। কামভাব দমিত থাকিলে ঐ শক্তিই ওজরূপে পরিণত হইয়া থাকে; অতএব কাম রিপুর হস্ত হইতে সর্ব্বদা দেহ ও মনকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কারণ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ওজসংরক্ষিত দেহই সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, মহাশক্তি বিকাশের মন্ত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সপ্তম ধাতু শুক্র বা বীর্য্যই ওজের প্রধান আশ্রয়স্থল।

"ওজস্তু তেজো ধাতুনাং শুক্রান্তেষাং পরম্ স্মৃতম্"। সুশ্রুতঃ

অতএব বীর্য্যধারণই ওজঃ রক্ষার ও বৃদ্ধির একমাত্র উপায়; এবং এই বীর্য্যধারণই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া অভিহিত।—

"বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্"।

পক্ষান্তরে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই বীর্য্য লাভ হইতে থাকে—

"ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ"।

ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠবীর্য্যবান্-শরীরসম্পন্ন মহাযোগী দধিচীমুনির অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলে; দেবরাজ সেই বজ্র ধারণপূর্ব্বক অমিত-তেজা বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে কু-শিক্ষা ও কু-সঙ্গের ফলে অনেক বালক চিররুগ্ন-দেহ, স্ফূর্ত্তিবিহীন, লুপ্তস্মৃতি ও নষ্ট-সৌন্দর্য্য হইয়া অকর্ম্মণ্য ও অনেক স্থলে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। অপরিণামদর্শী ঐ সকল বালকগণ আশু সুখে মত্ত হইয়া, ভবিষ্যৎ জীবনকে দুর্ব্বহ ও ক্লেশের আগার বলিয়া মনে করে, মণিভ্রমে অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিয়া দগ্ধ হইতে থাকে। ব্রহ্মচর্য্যই বর্ত্তমানে কার্য্যসাফল্যের শ্রেষ্ঠ উপায় ও ভবিষ্যতের জীবানন্দদায়ক অমৃত।

মৈথুনকে প্রকৃতিগত ধর্ম্মে পরিণত করার নামই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য; অন্য কথায় কামের সুখলিপ্সা ও ভোগলিপ্সা পরিত্যাগ করাই ব্রহ্মচর্য্য।

এস্থলে মৈথুন ও প্রকৃতিগত ধর্ম্ম এই উভয়ই একটু বিশদভাবে বলা আবশ্যক।

মৈথুন সম্বন্ধে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"স্মরণং দর্শনং স্ত্রীণাং গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্
সমীচীনত্বধীস্তাসু প্রীতিঃ সম্ভাষণং মিথঃ।
সহবাসশ্চ সংসর্গঃ অষ্টধা মৈথুনং বিদুঃ।"

রমণীগণের চিন্তা, তাহাদিগকে দর্শন এবং তাহাদের গুণ ও কর্ম্মের প্রশংসা, তাহাদিগকে রমণীয় বলিয়া মনে করা, তাহাদের সহিত সপ্রেম এবং সানুরাগ সম্ভাষণ, তাহাদের সহিত এক সঙ্গে বাস,—এই অষ্ট প্রকার ব্যবহারকেই পণ্ডিতগণ মৈথুন বলিয়া নির্দ্দেষ করিয়াছেন। অন্য যে কোন প্রকারে শারীরিক বীর্য্যহানি হয় তাহাকেও মৈথুন বলা যায়। ব্রহ্মচারীর পূর্ব্বোক্ত কোন বিষয়েই আদৌ লিপ্সা থাকিবে না।

সর্ব্বাত্মিকাই প্রকৃতির ক্ষেত্র;—অতএব সর্ব্বভাবে, সর্ব্বসময়ে, সর্ব্বরূপে, যাহা সিদ্ধ, তাহাই প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। যেমন প্রাণের নিশ্বাস প্রশ্বাস, চোখের দেখা, শ্রবণের শোনা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, হজম হওয়া ও মলত্যাগ করা যেমন অন্ত্রের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, ইহারা যেমন কাহারও চেষ্টাসাপেক্ষ নহে, কামও যদি তদ্রূপ ব্যক্তিগত লিপ্সাশূন্য সর্ব্বমঙ্গলাত্মিক প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পরিণত হয়, তবেই ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়। প্রাকৃতিক কার্য্য মলমূত্রাদি ত্যাগের পর সুখ অনুভব হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ভোগের লিপ্সা নাই। লিপ্সাই অনিষ্টের মূল। লিপ্সার হস্ত এড়াইতে পারিলেই "ন লিপ্যতে স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।" সেই ভোগেচ্ছা-বর্জ্জিত নির্লিপ্ত অবস্থায়, সকলই ভগবানের প্রাকৃতিক বিলাস বলিয়াই সিদ্ধ হইতে থাকে। নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, রাগ, দ্বেষাদি সকলই ঐরূপ প্রকৃতিগত করাই যম সাধনের চরম; কিন্তু ঐ উর্দ্ধতম অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে প্রথম আমাদিগকে একটা শিক্ষাবস্থার ভিতর দিয়া আসিতে হইবে। বৃত্তিগুলিকে প্রকৃতিগত করার যে সব উপায় নির্দ্ধারিত আছে, তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা একলম্ফে এত উচ্চস্তরে পৌঁছিবার চেষ্টা "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"মত হাস্যাস্পদ হইবে। প্রথম হইতেই শাস্ত্রানুশাসন ও মহাপুরুষ বাক্যরূপ আইনের অধীন হইয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে; উহারা আশুকঠোর হইলেও পরিণামে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অশেষবিধ মঙ্গলপ্রদ। সাময়িক কঠোরতা অবলম্বনে আমরা ভবিষ্যতে অমৃতের অধিকারী হইতে পারিব।

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যাহা যাহা পালন করা কর্ত্তব্য ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতেই তাহার সার সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে গুরুকুলে বাসের যে প্রথা ছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহা লুপ্ত প্রায় বিধায় সেই বিষয় এই প্রবন্ধে নিরুক্ত রহিল।

* * * *

"সায়ং প্রাতরুপাসীত গুর্ব্বগ্ন্যর্কসুরোত্তমাম্।
সন্ধ্যে উভে চ যতবাগ্ জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্॥

* * * *

সুশীলো মিতভুগ্দক্ষঃ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
যাবদর্থং ব্যবহরেৎ স্ত্রীষু স্ত্রীনির্জ্জিতেষু চ॥
বর্জ্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্ব্রতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্মনঃ॥

* * * *

নস্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্।
সুতামপি রহো জহ্যাৎ * * *।
কল্পয়িত্বাত্মনা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ।
দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেৎ ততোহস্য বিপর্য্যয়ঃ॥

* * * *

অঞ্জনাভ্যঞ্জনোন্মর্দ্দস্ত্র্যবলেখামিষং মধু।
স্রগ্গন্ধলেপালঙ্কারাংস্ত্যজেয়ুর্যে ধৃতব্রতাঃ।

* * * *

এবং বিধো ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থো যতির্গৃহী।
চরন্ বিদিত বিজ্ঞানঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥"

* * * *

"ব্রহ্মচারী—গুরু, অগ্নি, সূর্য্য ও দেবতাদিগের উপাসনা করিবে এবং গায়ত্রী জপ ও ত্রিকালে সন্ধ্যা করিবে। এবং সায়ং প্রাতঃ উভয় সন্ধ্যাকালেই মৌনী হইয়া থাকিবে। সুশীল, মিতভোজী, কার্য্যদক্ষ, শ্রদ্ধাশীল হইবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্ত্রীদিগের এবং স্ত্রীজিত ব্যক্তিগণের সহিত কেবল প্রয়োজনমত ব্যবহার করিবে। গৃহস্থ ব্যতীত ব্রহ্মচারী মাত্রেই নারীঘটিত কথাবার্ত্তা পরিত্যাগ করিবে; কেন না প্রবল ইন্দ্রিয় সকল যতিরও মন হরণ করে। প্রমদা অগ্নিতুল্য, পুরুষ ঘৃতকুম্ভসদৃশ; নির্জ্জনে কন্যার সহিতও অবস্থিতি নিষিদ্ধ।

যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা দেহাদিকে অভাসমাত্র বিবেচনা করিয়া জীব স্বতন্ত্র হইতেছেন, ততদিন ভেদজ্ঞান থাকিবে। ভেদজ্ঞান হইতেই বিপর্য্যয়। ভোক্তা ও ভোগ্য এই ভেদজ্ঞান থাকে ত, স্ত্রীসঙ্গ পরিহার কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারিগণ অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, গাত্রসংবাহন, স্ত্রীসঙ্গ, চিত্রকর্ম্ম, আমিষ, মধু, মাল্য, চন্দন, অনুলেপন ও অলঙ্কার ত্যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, যতি অথবা গৃহী এই রূপ অনুষ্ঠানান্বিত হইলে বিজ্ঞেয় বস্তু বিদিত হইয়া পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।"

আহারের সঙ্গে দেহ ও মনের নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে ও আহার অনুযায়ীই প্রকৃতি গঠিত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মচারীর চৈতন্যশক্তি বিকাশে সহায়কারী সৎ প্রবৃত্তির অনুকূল সাত্ত্বিক আহারই বিশেষ আবশ্যক। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

আয়ু, সাত্ত্বিক ভাব, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ ও রুচিরবর্দ্ধক, রসযুক্ত এবং স্নেহযুক্ত, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী এরূপ এবং চিত্ত পরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

যাহাতে মন অপবিত্র করে, পশুভাব বৃদ্ধি করে ব্রহ্মচারীর সেইরূপ খাদ্য সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

এই মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের স্বকীয় কর্ম্মদ্বারা যে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইতে আমরা বাধ্য, তন্মধ্যে ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইতে ব্রহ্মচর্য্যই বিশেষ আবশ্যক।

"ঋষীণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন তপসা তথা"—

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

তপস্যা, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে মানবজীবনের প্রতিসম্পাদ্য বিষয়েই ব্রহ্মচর্য্য প্রধান সহায়। তাই শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"অথতেযদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেবতৎ ব্রহ্মচর্য্যেণহ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতে। অথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেবতদ্, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্টাত্মনমনুবিন্দতে।

ছান্দোগ্য।

(শিষ্টগণ) যাহাকে যজ্ঞ বলিয়া থাকেন, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই; ব্রহ্মচর্য্যেরই দ্বারা যে ব্যক্তি জ্ঞাতা হন তিনিই তাঁহাকে (ব্রহ্মলোকরূপ আত্মাকে) লাভ করেন। আর (শিষ্টগণ) যাহাকে পূজা বলিয়া থাকেন, তাহা ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্যেরই দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহারা আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীবিধুভূষণ সেন গুপ্ত।

আমি ভক্তি-বাঁধনে বাঁধিব।

কাম)

সখা! চারিদিকে দেখি আঁধার জগৎ
কোথা তুমি প্রাণ! লুকালে হে?
(আমি) নিবিড় তিমিরে ঘুরে যে গো মরি
তোর অমল আলোক পাই না যে।
ওরে! তুই যে রে সখা প্রাণের প্রদীপ
নিবিয়া কোথায় ভাতিছ হে?
তিমিরে পরাণ ছাইয়ে দিয়ে—
কাঁদায়ে ভাসায়ে গেলি যে রে!
ল'য়ে শোকের প্রবল হিল্লোলে
ভাসায়ে কোথায় যায় রে?
সেথা কি গো সখা ও চরণ-ছায়ে
শ্রান্ত-জীবন জুড়াবে হে?
বারেক পাইলে ও চরণ তোর
ভকতি-বাঁধনে বাঁধিব
তবে——শকতি বিহীন হইবি রে সখা
নারিবি ছেদিতে বাঁধন।

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র

ওঁ

তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রম্। (ভাষ্যব্যাখ্যাসমন্বিতম্)

সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থ :— সম্যগ্ [যথার্থঃ] দর্শনম্ [জিনদেবোক্তপদার্থেঽভিরুচিঃ] জ্ঞানং, চারিত্রঞ্চ—এতত্রিতয়ানাং সম্মিলিতানাং মোক্ষস্য (নির্ব্বাণস্য) মার্গঃ (উপায়ঃ) [বিজ্ঞেয়ঃ] ইতি। অত্র তু সম্যক্ শব্দস্য দর্শনাদি-পদেন প্রত্যেকেন সহ সম্বন্ধস্তাৎপর্য্যতঃ সমুন্নেয়ঃ, সর্ব্বমন্যদ্ ভাষ্যে সুস্পষ্টমস্তি ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ :— সম্যগ্দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, এবং সম্যক্ চারিত্র—এই তিনটী তত্ত্ব মিলিত হইয়া মোক্ষমার্গ নামে অভিহিত হয়। সম্যগ্দর্শন প্রভৃতি শব্দের অর্থ স্বয়ং গ্রন্থকার পরে বলিবেন ॥ ১ ॥

ভাষ্য-ব্যাখ্যা :—সম্যগ্দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, এবং সম্যক্ চারিত্র, সদাচরণ বা (জিনোক্ত-তত্ত্বানুশীলন) এই তিনটীকে মোক্ষের উপায়স্বরূপ জানিবে। উক্ত ত্রিবিধ মোক্ষমার্গের আমি লক্ষণ এবং পরীক্ষা ভেদ প্রভৃতি নিরূপণপূর্ব্বক বলিব। এইস্থলে কেবল শাস্ত্রের আনুপূর্ব্বিক রচনা প্রদর্শনের নিমিত্ত শুধু উদ্দেশমাত্র করিলাম (১)। এই তিন পদার্থ মিলিত হইয়া মোক্ষমার্গের সাধন হয়; যেহেতু এই তিনের মধ্যে একটীও না হইলে, অপর এক বা দুইটী মোক্ষের উপায় হইতে পারে না। এই নিমিত্ত ভগবান্ সূত্রকার এই তিনেরই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে পূর্ব্বে লাভ হইলে উত্তরের বা পরের লাভ হওয়া চাই। অর্থাৎ সম্যগ্দর্শনের প্রথমে লাভ হইলে তাহার পরবর্ত্তী সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্চারিত্র লাভ স্বীয় যত্ন বা অধ্যবসায় দ্বারা করা চাই। এবং উত্তরের বা সম্যক্ চারিত্রের লাভ হইলেও পূর্ব্বের লাভ অবশ্যই হইবে। যেহেতু প্রথম সোপান বা ভূমিকায় আরূঢ় না হইলে দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ করা

(১) পদার্থ সমূহের কেবল নাম দ্বারা উল্লেখ বা নিরূপণকে "উদ্দেশ" কহে। নাম্না বস্তুকীর্ত্তনমুদ্দেশঃ"। "শাস্ত্রাদৌ বস্তূনামুদ্দেশো লক্ষণং, পরীক্ষাবেতীত্যেতত্রয়ং কর্ত্তব্যমিতি" কাশ্যপীয়াঃ। "অসাধারণ ধর্ম্মো লক্ষণং, লক্ষিতস্য লক্ষণং সম্ভবতি নবা ইতি বিচারঃ পরীক্ষা"।

যায় না। [এখানে তাৎপর্য্য এই যে সম্যক্ জ্ঞানের লাভ হইলে সম্যগ্দর্শনের লাভ নিশ্চিত জানিবে] এবং সম্যগ্ চারিত্রের লাভ দ্বারা সম্যগ্দর্শনও জ্ঞান—এই উভয়ের নিয়ত লাভ হয়।) সূত্রে দর্শন প্রভৃতি পদের যে, সম্যক্পদ বিশেষণ দিয়াছে তাহা প্রশংসার্থের দ্যোতক (প্রকাশক) কিংবা বাচক, নিপাত দ্বারা (২) সিদ্ধ হইয়াছে; অর্থাৎ সুপ্রশংসিত শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রভৃতি মোক্ষমার্গের সাধন হইবে। কিংবা সম্-উপসর্গপূর্ব্বক অঞ্চ্ ধাতুর পর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'সম্যগ্'পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্যভিচার (দোষ) শূন্য অর্থাৎ নিয়ত সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় এবং অনিন্দ্রিয় দ্বারা যে, পদার্থের প্রাপ্তি হয় তাহাকে সম্যগ্দর্শন বলা যায়। এই দর্শন পদটী দৃশ্ ধাতুর পর ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। প্রশস্ত বা শ্রেষ্ঠ (নিন্দা ব্যভিচারাদি দোষরহিত যে দর্শন, তাহাকে সম্যগ্দর্শন বলে। (৩) অথবা সঙ্গত (নিরন্তর ব্যবধান শূন্য) যে দর্শন, তাহা সম্যগ্দর্শন পদবাচ্য। এইরূপ জ্ঞান এবং চারিত্রেতে সম্যক্ পদ যোজিত করিতে হইবে ॥ ১ ॥

তত্ত্বার্থ-শ্রদ্ধানং সম্যগ্ দর্শনম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ—তত্ত্বানাং (ভগবজ্জিনোক্তবাক্যানাং) [যৎ] শ্রদ্ধানং (সম্যগভিরুচিঃ বিশ্বাসো বা) [তদেব সম্যগ্ দর্শনম্ (যথার্থতত্ত্বজ্ঞানং) অর্থাজ্জিনদেবোক্তজীবাদি-তত্ত্বেষু সম্যগ্বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ] ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ ঃ—ভগবান্ জিনদেবোক্ত জীবাদিতত্ত্বসমূহে যে সম্যক্ শ্রদ্ধা, তাহাকে সম্যগ্দর্শন বলে ॥ ২ ॥

ভাষ্য-ব্যাখ্যা,—(ভগবান্ জিনদেবোক্ত কিংবা জিনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য) তত্ত্বস্বরূপ পদার্থের প্রতি শ্রদ্ধা (আস্তিক্য বুদ্ধি), অথবা তত্ত্ব (জীবাদি পদার্থ) জ্ঞান দ্বারা যে, অর্থের প্রতি শ্রদ্ধা তাহাকে তত্ত্বার্থশ্রদ্ধা কহে।

(২) "যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎসর্ব্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্"। যাহা লক্ষণ বা সূত্র দ্বারা সিদ্ধ হয় না, সে সমুদয় নিপাতন দ্বারা সম্পন্ন হয় জানিবে। নিপাত, নিরুক্ত, পৃষোদরাদি ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দ-সঙ্কেত বিশেষ।

(৩) পদার্থ দুই ভাবে প্রতিপন্ন হয়, এক ব্যুৎপত্তি-নিমিত্ত, অপর প্রবৃত্তি-নিমিত্ত ; ব্যুৎপত্তি পক্ষেও সম্যক্ পদ প্রশংসার্থের বোধক হইয়া দর্শন প্রভৃতি পদের বিশেষণ হয় ; এই জন্য প্রকারান্তরে বলিতেছেন—অর্থাৎ যে পূর্ণরূপে দ্রব্য ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সম্যগ্দর্শন প্রভৃতিতে জানিবে।

সেই তত্ত্বার্থশ্রদ্ধাকে সম্যগ্‌দর্শন (৪) (বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের মতে পরম তত্ত্বজ্ঞান) বলে। তত্ত্ব দ্বারা অর্থাৎ ভাবরূপ (যথাযথরূপ) নিশ্চয়কে সম্যগ্‌দর্শন নামে অভিহিত করা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—যে পদার্থ যেরূপ, সেরূপে তাহার যে অবধারণ করা হয় তাহাকে সম্যগ্‌দর্শন কহা যায়। তত্ত্ব পদার্থ,—জীব, অজীব প্রভৃতিকে বলে, তাহা পরে স্পষ্টরূপে বলা হইবে। সেই তত্ত্বরূপ যে, জীবাদি পদার্থ সে সমুদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা—অর্থাৎ সে সকল পদার্থের যথার্থরূপে বিশ্বাস (নিঃসংশয় প্রত্যয়) করাকেও তত্ত্বার্থশ্রদ্ধা বলিয়া উক্ত হয়। এইরূপ প্রশম,—অর্থাৎ রাগাদির উৎকটতার অভাব; সংবেগ,—সংসারে শরীর ভোগ প্রভৃতিতে ভয়; নির্ব্বেদ,—সাংসারিক বিষয়ের প্রতি ঘৃণা বা তুচ্ছবোধপূর্ব্বক বৈরাগ্য, বৈরাগ্য অনুকম্পা—সকল জীবে দয়া, এবং এই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পদার্থ-সমূহে আস্তিক্য বোধের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাবরূপ যে তত্ত্বার্থশ্রদ্ধা তাহাই সম্যগ্‌ দর্শনের পদবাচ্য হয়॥ ২॥

তন্নিসর্গাদধিগমাদ্বা ॥ ৩॥

অন্বয়ার্থঃ—(ইদং পূর্ব্বসূত্রোক্তং সম্যগ্‌দর্শনং) নিসর্গাৎ (পরোপদেশনিরপেক্ষাৎ স্বরূপাৎ) অধিগমাৎ বা (জৈনাচার্য্যোপদেশাৎ) [অথবা তদিতি—তদা সম্যগ্‌দর্শনং পরামৃশ্যতে জায়তে ইতি শেষঃ]॥ ৩॥

সূত্রার্থ ঃ—সেই পূর্ব্বসূত্রে উক্ত সম্যগ্‌দর্শন নিসর্গ অর্থাৎ পরের উপদেশ-নিরপেক্ষস্বরূপ হইতে, এবং অধিগমদ্বারা অর্থাৎ আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৩।

ভাষ্য-ব্যাখ্যা ঃ—এই সম্যগ্‌দর্শন দুই প্রকার হইয়া থাকে। এক,—নিসর্গত (স্বাভাবিক) সম্যগ্‌দর্শন, অপর অধিগম (গুরূপদেশাদি দ্বারা) জনিত সম্যগ্‌ দর্শন। নিসর্গ—পরিণাম, স্বভাব, এবং অন্যের উপদেশশূন্য, এই সকল একার্থের বাচক বা পর্য্যায়ক শব্দ। জ্ঞান এবং দর্শনস্বরূপ যে, উপযোগ, সে উপযোগের সহিত সংযুক্ততাই জীবের লক্ষণ, ইহা পরে ব্যক্ত করিয়া বলা যাইবে। সে জীবের অনাদিকাল হইতে সিদ্ধ এই সংসারে স্বীয়কর্ম্ম বা অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা ভ্রমণ হইতেছে; এবং নিজ নিজ কর্ম্মের অনুযায়ী নরক

(৪) সম্যগ্‌দর্শন প্রভৃতিকে কোন কোন আচার্য্য "রত্নত্রয়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (১) সম্যগ্‌দর্শন (২) সম্যক্ জ্ঞান (৩) সম্যক্ চারিত্র। ভগবান্ জিনদেবের সর্ব্বজীবের কল্যাণের নিমিত্ত যে উপদেশ, সেই উপদেশে বিশেষ অভিরুচির নাম সম্যক্ শ্রদ্ধা, যথা—"রুচির্জ্জিনোক্ততত্ত্বেষু সম্যক্ শ্রদ্ধানমুচ্যতে"॥

তির্য্যক্, মনুষ্য, ও দেবজন্ম গ্রহণে বন্ধনিকাচনের উদয়, এবং নির্জ্জরা (সপ্ত পদার্থের মধ্যে ষষ্ঠ পদার্থ) অপেক্ষা রক্ষা-কারকরূপে নানা প্রকার পুণ্য পাপ ফলের যে, জীব অনুভব করিয়া থাকে, তাহার জ্ঞান এবং দর্শনরূপ উপযোগ স্বভাব হইতে অল্প অল্প পরিণাম, অধ্যবসায় এবং অন্যান্য স্থানাদিতে প্রাপ্ত হইয়া অনাদিকাল হইতে মিথ্যাজ্ঞানে আবদ্ধ থাকিলেও পরিণাম বিশেষে বা কর্ম্মের পরিপক্কতা হইতে ভাববিশেষে অপূর্ব্ব (অভিনব) কার্য্য এইরূপে হইয়া থাকে যে, তাহা ভিন্ন অপর কোনও উপদেশাদিশূন্য কোন সময়ে যে সম্যক্‌দর্শন উৎপন্ন হয় তাহাকে নিসর্গ সম্যগ্‌দর্শন বলে। অভিগম, অধিগম, আগম, নিমিত্ত শ্রবণ, শিক্ষা, ও উপদেশ এই সব সমানার্থক জানিবে। এই অধিগম-পরোপদেশ প্রভৃতি দ্বারা যে তত্ত্বার্থের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় তাহাকে অধিগমজ সম্যগ্‌দর্শন বলে॥ ৩॥

অত্রাহ—তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানং সম্যগ্‌দর্শনমিত্যুক্তং। তত্র কিং তত্ত্বমিতি অত্রোচ্যতে—পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে, তত্ত্বরূপ অর্থের প্রতি যে, সম্যক্ শ্রদ্ধা তাহাকে সম্যগ্‌ দর্শন বলে। এখানে তত্ত্ব শব্দদ্বারা কোন্ কোন্ পদার্থের গ্রহণ করিতে হইবে এই শঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত পরসূত্রের অবতারণ হইতেছে।

জীবাজীবাস্রব-বন্ধ-সম্বর-নির্জ্জরামোক্ষাস্তত্ত্বম্॥ ৪॥

অন্বয়ার্থঃ—সূত্রেণানেন সপ্তানাং জীবাদিতত্ত্বানাং স্বরূপং বক্তি। তচ্চ জীবঃ, অজীবঃ, আস্রবঃ, বন্ধঃ, সম্বরঃ, নির্জ্জরা, মোক্ষঃ, এতে সপ্ত শাস্ত্রস্যাস্য প্রতিপাদ্যং তত্ত্বং (পদার্থঃ) ইত্যর্থঃ॥ ৪॥

সূত্রার্থ ঃ—তৃতীয়সূত্রে তত্ত্বের উদ্দেশ মাত্র করা হইয়াছে। এই সূত্রে তত্ত্বের স্বরূপ কথিত হইল; সেইতত্ত্ব,—জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সম্বর, নির্জ্জরা, মোক্ষ, এই সাতটীতে সম্যক্‌রূপ শ্রদ্ধা করিলেই সম্যগ্‌দর্শনের বিকাশ হইবে॥ ৪॥

ভাষ্য-ব্যাখ্যা ঃ—(সপ্ত পদার্থের সংক্ষিপ্ত মূল দুই পদার্থ;—জীব ও অজীব।) জীব—মনুষ্য প্রভৃতি; অজীব—আকাশাদি। আস্রব, (৫) বন্ধ, সম্বর, নির্জ্জরা, এবং

(৫) আস্রব শব্দের অনেক প্রকার অর্থ আছে। তন্মধ্যে সংক্ষিপ্ত অর্থ এই—পুরুষকে (জীব বা মানুষকে) ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সমূহেতে যে প্রবৃত্ত করায় তাহাকে 'আস্রব' বলে। যে হেতু ইন্দ্রিয় দ্বারাই পৌরুষ-জ্যোতি (পুরুষসম্বন্ধি জ্ঞান প্রকাশ) বিষয় সমূহকে স্পর্শ করত অনন্ত রূপাদি জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। উপযোগ, আস্রব, বন্ধ, এই তিনটী বিষয় খুব জটিল ও নানার্থযুক্ত; উত্তরোত্তরে এই সকল বিষয় প্রাঞ্জলরূপে বলা যাইবে। শ্রীমদ্‌বাচকাচার্য্য মতে বন্ধের হেতু চারিটী, মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ, কষায়। মিথ্যাদর্শন দুই প্রকার,—এক মিথ্যাকর্ম্মের উদয় হইতে

মোক্ষ—এই সাত ভাগে বিভক্ত যে পদার্থ তাহাই তত্ত্ব। অথবা জীব প্রভৃতি সাতটী পদার্থ তত্ত্ব নামে কথিত। সেই সাত প্রকার তত্ত্বস্বরূপ পদার্থের পরে লক্ষণ এবং ভেদ নিরূপণপূর্ব্বক বিস্তাররূপে বলা হইবে ॥ ৪ ।

নাম স্থাপনা দ্রব্য ভাবতস্তন্ন্যাসঃ ॥৪॥

অন্বয়ার্থঃ—নাম, স্থাপনা, দ্রব্য (এবং) ভাবশ্চ (এতেষামনুযোগৈঃ জীবাদীনাং সপ্তানাং তত্ত্বানাং ন্যাসঃ [লোকে প্রসিদ্ধিঃ] ভবতীত্যর্থঃ) অত্রানুযোগপদেন সর্ব্বেষাং গণিপিটকার্থানামভিধানম্ ॥৫॥

সূত্রার্থ ঃ—নাম স্থাপনা দ্রব্য এবং ভাব—এই সকলের অনুযোগ দ্বারা জীব প্রভৃতি সপ্তপদার্থের বা তত্ত্বের ন্যাস হইয়া থাকে ; অর্থাৎ লোকে ব্যবহার হয়। (অনুযোগ শব্দদ্বারা সকল গণিপিটকার্থের কথন জানিবে ; অধিক বিবরণ ভাষ্য-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য) ৫ ॥

ভাষ্য-ব্যাখ্যা ঃ—নাম প্রভৃতি যে, চারিটী অনুযোগের দ্বার আছে, তাহাদের দ্বারা জীব প্রভৃতি সপ্তপদার্থের ন্যাস (লোকে প্রসিদ্ধি) হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিস্তাররূপে পদার্থের লক্ষণ এবং বিধান (জীবাদির প্রভেদ সংখ্যা প্রভৃতি) দ্বারা জ্ঞান হওয়ার নিমিত্ত যে, ব্যবহারের উপযোগ তাহাকেই ন্যাসের লক্ষণ বলা যায়। অর্থাৎ নাম প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বারা উদ্দিষ্ট জীবপ্রভৃতি পদার্থের সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান হইবে। যেরূপ নাম জীব, স্থাপনা-জীব, দ্রব্য-জীব, এবং ভাব-জীব। নাম, সংজ্ঞা, এবং কর্ম্ম এই সকল শব্দ পর্য্যায়-বাচক বা একার্থের বোধক। চেতনাযুক্ত কিংবা অচেতন বস্তুর ব্যবহারের নিমিত্ত যে, 'জীব' এইরূপ নাম বা সংজ্ঞা করা হয় তাহাকে 'নাম-জীব' বলে। এবং কাষ্ঠ, পুস্তক, চিত্রকর্ম্ম (চিত্রশিল্প) ও অক্ষক্রীড়া (পাশা খেলা) কার্য্যে যে, জীবের স্বরূপ স্থাপনা করা হয় তাহাকে "স্থাপনা জীব" কহে ; অর্থাৎ কাষ্ঠ, পুস্তক, চিত্রকার্য্য (চিত্রাঙ্কন শিল্প বা ছবি প্রভৃতি আঁকা), অক্ষনিক্ষেপ (পাশা প্রভৃতি ক্ষেপ করা) দ্বারা যে জীবের স্থাপনা করা হয় তাহাকে 'স্থাপনাজীব' বা

(হইলে) পরের উপদেশনিরপেক্ষ যে, নৈসর্গিক তত্ত্বার্থশ্রদ্ধা তাহা অপর পরোপদেশসাপেক্ষ। উক্ত মিথ্যাদর্শনাদিবশতঃ কিংবা যোগবশতঃ এবং কষায়যুক্ত বলিয়া জীবকর্ম্মভাবযোগ্য যে পদার্থ-সমূহ তাহাদিগকে যে গ্রহণকরে তাহাকে 'বন্ধ' বলে। আত্মা প্রদেশ সমূহেতে কর্ম্মের প্রবেশ বা সম্বন্ধ হওয়াকে 'বন্ধ' বলে। অস্রবকে নিরোধ করে যে তাহাকে 'সম্বর' বলে। আত্মার (জীবের) প্রদেশ হইতে কর্ম্মচনিয়ের এক দেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াকে (ভিন্ন হইয়া যাওয়াকে) "মোক্ষ" বলে। এই দর্শনের দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। তার পর এই তত্ত্ব সকলের বিবরণ আরও বিস্তার রূপে মোক্ষশাস্ত্রের অনুবাদে বলিব)।

দ্রব্য পদার্থ বলে। দেবতাদিগের প্রতিমাতুল্য অর্থাৎ এইটী ইন্দ্র, এইটী রুদ্র, এইটী বিষ্ণু, এরূপে পাষাণ বা ধাতু-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিসমূহের যে, স্থাপনা হয় তাহাদিগকে 'স্থাপনা-জীব' বলে। গুণপর্য্যায়রহিত ও অনাদি পরিণাম বা রূপান্তর প্রাপ্তি স্বভাবযুক্ত এবং প্রজ্ঞা দ্বারা যাহাকে স্থাপিত করা হয় তাহাকে 'দ্রব্যজীব' বলে। অথবা ইহা ভঙ্গবর্জ্জিত হয়। যেমন অজীবরূপ হইতে বর্ত্তমান দ্রব্যের শ্রেষ্ঠরূপে দ্রব্যত্ব হইতে পারে তাহাই 'দ্রব্যজীব' হইবে। কিন্তু ইহা অনিষ্ট বা অনভিপ্রেত হয় ; এবং ভাবদ্বারা ঔপশমিক, ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশমিক, ঔদয়িক ও পারিণামিক, ভাব-দ্বারা যুক্ত, এবং উপযোগলক্ষণ-সমন্বিত জীব সংসারী ও মুক্ত এবংবিধ দুই-প্রকার জীবের কথা পরে বলা যাইবে। এই নিয়মে অজীব আদি সকল পদার্থেতে নাম নিক্ষেপ বিধির অনুসরণ করা চাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ-শাস্ত্রী।

কাম]

বিরহে।

মালতী মল্লিকা যূঁথি
সুরভিত বনবীথি
গোলাব করবী বেলা
পারুল ক'রেছে আলা ;
মাধবী লতাটী ধীরে
জড়ায়েছে সহকারে ;
চম্পক চামেলী কলি
আকুল বকুলগুলি,
কৌমুদী রজত ভাতি
চকোর রয়েছে মাতি
ঝরে সুধা নিরমল
জাগিছে তারকাদল

শোভিছে নিকুঞ্জ আজি
পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্পরাজি ;
শুধুই বাজে না বেণু
নাহি সে প্রাণের কানু
শূন্য নীপতরুবর
নাহি শাখে গোপবর
বিফল চাঁদনী যামী
সজনী লো শ্যামবিনি
প্রাণ করে হায় হায়
বুক না বাঁধিতে চায়
হ'ক দেহ অবসান
ক'রে শ্যাম নাম গান।

শ্রীলীলাদেবী।

কেন ?

১

হে চিরসুন্দর তব সুন্দর ভবনে
পাঠালে আমারে যবে করিবারে খেলা,
দিয়েছিলে সাজায়ে কতনা যতনে,
তুষিতে মানস মম কবলিত হেলা।

২

দিয়েছিলে মাতৃবক্ষে পীযূষনির্ঝর,
ততোহধিক মধুময় অপার্থিব স্নেহ ;—
বিমল আনন্দ উৎস উল্লাস মুখর
প্রিয়পরিজন পূর্ণ সুখময় গেহ !

৩

নিয়েছ সুন্দর দেহ স্বাস্থ্যসুখ ভরা,
সদা হাস্যময় তাহে প্রফুল্ল যৌবন,
প্রেমময়ী প্রিয়ম্বদা প্রাণমনোহরা,
বিদ্যাবুদ্ধি পদৈশ্বর্য্য সুখের সাধন।

৪

সংসার সামগ্রী যত সকলি প্রচুর
দিয়েছ আমারে, কিন্তু হৃদয়ের মাঝে
কি যেন অভাব এক রয়েছে অপূর—
কা'র তরে যেন স্থান শূন্য পড়ে আছে !

৫

অসার খেলনা পেয়ে ভুলি তোমা পাছে
তাই বুঝি অপূর্ণ অভাব দেছ হেন !
নহে এত সুখৈশ্বর্য্য আনন্দের মাঝে
লুকান এ দীর্ঘশ্বাস, ব্যাকুলতা কেন ?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পন্থার নূতন বৎসরের নূতন আয়োজন।

নানাবিধ দৈব বিপৎপাতে উৎপীড়িত হওয়াতে পন্থার কর্ম্মকর্ত্তাগণ যথাসময়ে পন্থা প্রকাশ করিতে না পারায় গ্রাহকদিগের নিকটে বড়ই লজ্জিত আছেন। এরূপ গোলযোগের মধ্যে পন্থা প্রকাশ করিতে পারিব এ বিষয়ে অল্পই আশা ছিল। ইহার উপর পন্থার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় হঠাৎ কার্য্য ত্যাগ করায় আফিসের কার্য্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা হয়। কি সামাজিক জীবন কি ব্যক্তিগত জীবন, কি পত্রিকার জীবনে এইরূপ সুখ দুঃখ বিপদ্ সম্পদ্ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবের খেলা না হইয়া থাকিতে পারে না।

সে যাহা হউক, আগামী বৎসরের জন্য আমরা 'পন্থার' নূতন বন্দোবস্ত করিতেছি। সহৃদয় ধনী ও ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন বর্ম্মণ মহাশয় 'পন্থার' কার্য্য বিভাগের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। বৈশাখ মাস হইতে 'পন্থা' আফিস ১৫ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রহিল। গ্রাহকগণ পন্থার মূল্য পত্রাদি ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ উক্ত ঠিকানায় 'পন্থা' আফিসে তাঁহাকেই লিখিবেন। বড়ই সুখের বিষয় বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালী জাতির কর্ত্তব্যে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বাবুর মত লোকের প্রবৃত্তি জন্মিল। কর্ম্ম বিভাগ আমার হস্ত হইতে আরও সুনিপুণ, সুদক্ষ ব্যক্তির হস্তে যাওয়াতে, 'পন্থার' সম্পাদকতা কার্য্যে বিশেষ অবসর পাইব বলিয়া আশা হয়। নূতন বৎসরের পন্থার বিশেষত্বের মধ্যে এইগুলি থাকিবে—

(১) সন্ধ্যা বন্দনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুর অনুষ্ঠান কর্ম্মগুলির গভীরতম মর্ম্ম পণ্ডিত ও ধ্যানী উভয়বিধ লেখকের সাহায্যে উদ্ঘাটিত হইয়া হিন্দুসমাজকে উপহার দেওয়া হইবে। হিন্দু দেখিবেন যে কি গভীরতম ভাবে বৈদিক ও তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানগুলি গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

(২) যোগানন্দ ভারতী মহাশয় তীর্থ দর্শন ও কুম্ভমেলা উপলক্ষে এদেশে না থাকাতে তাঁহার অনুভবসিদ্ধ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় নাই।

এক্ষণে তিনি সহজ যোগ, ভাগবতের উপদেশ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক ক্রমে লিখিতে আরম্ভ করিবেন। শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় বেদান্তের রহস্য মূলক প্রবন্ধ ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশ করিবেন।

(৩) বৈষ্ণব শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম নানাবিধ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।
(৫) দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব সুরঞ্জিত চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

(৪) 'মহামায়ার খেলা' প্রণেতা আর একটি নূতন অথচ জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্বলিত উপন্যাস আরম্ভ করিবেন।

"মহামায়ার খেলা" শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে; যাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাহার মধ্যে 'পন্থার' অগ্রিম দেয় মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অর্দ্ধ মূল্যে ঐ উপন্যাসখানি উপহার পাইবেন। অতএব আশাকরি সহৃদয় গ্রাহকগণ তৎপর হইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন। ইতি ১২ই বৈশাখ, ১৩২২।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।